পরিতৃপ্ত হইয়া বলিয়া উঠেন—হে প্রিয়তম, পৃথিবীতে তোমার সৌন্দর্যের তুলনা কোথায়, তোমার মাধুর্যের অন্ত কোথায়? যে সাধকগণ কান্তাভাবে ভগবানের ভজনা করেন, তাঁহারা বলেন, কে তুমি নিরুপমা, তোমার অপরূপ রূপের ছটায় দুর্বার প্রবল বেগে আমায় আকর্ষণ করিতেছ? পৃথিবীতে একমাত্র মানুষই তাহার সহজাত কামকে এই ভাবে প্রেমে পরিণত করিতে পারে।

পৃথিবীতে তাঁহারাই ধন্য যাঁহারা সত্যের পূজারী, সৌন্দর্যের উপাসক, শিবের সাধনায় দৃঢ়ব্রত। প্রতীচ্যের বহু দার্শনিকের মতে শ্রীভগবানই সত্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণের পূর্ণতম আদর্শ, তিনি সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্। কিন্তু আমাদের দেশের ঋষিগণ তাঁহাকে কোথাও 'সুন্দরম্' বলেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, তিনি রসস্বরূপ, 'রসো বৈ সঃ', তিনি 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্,' তিনি 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্'; ভক্ত বিল্বমঙ্গল বলিয়াছেন তিনি 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং'।

পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন, বিশ্বের মূলে আছেন যে পরম সত্তা, তাঁহার সম্পর্কে প্রাচীন [illegible]দের ধারণা অসম্পূর্ণ ছিল, কেননা, তিনি যে সত্যস্বরূপ ও [illegible] এ উপলব্ধি তাঁহারা লাভ করিলেও তিনি যে চিরসুন্দর এই অনুভূতি তাঁহাদের ছিল না। অধ্যাপক মহাশয় যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত নহেন, তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। তাঁহার মনে কখনও হয়তো এই প্রশ্নের উদয় হয় নাই যে, যাঁহারা সেই পরম সত্তাকে 'আনন্দরূপমমৃতম্' বলিয়াছেন, 'রসো বৈ সঃ' বলিয়াছেন, তাঁহারা কখনও তাঁহার সম্পর্কে 'সুন্দরম্' কথাটির প্রয়োগ করেন নাই কেন? এই প্রশ্নটিই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিগণ কিন্তু অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণের ও মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকার রূপের বর্ণনায় নিজেদের কবিত্ব-শক্তি একেবারে উজাড় করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, শ্রীভগবানের দেহ অপ্রাকৃত, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, আর তাঁহার সেবায়ই আমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের সার্থকতা। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

'বংশী গানামৃতধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥
* * *
কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম জানিহ সে শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে॥
কৃষ্ণের অধরামৃত, কৃষ্ণগুণ সুচরিত
সুধাসার স্বাদু বিনিন্দন।
তার স্বাদ যে না জানে জন্মিয়া না মৈল কেনে
সে রসনা ভেকজিহ্বা সম॥
মৃগমদ নীলোৎপল মিলনে যে পরিমল
যেই হরে তার গর্ব মান।
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাসা ভস্ত্রার সমান॥
কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি।
তার স্পর্শ নাহি যার, যাউ সেই ছারখার,
সেই বপু লৌহ সম জানি॥'

ইহার পরও কি বলিতে হইবে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের দৃষ্টিতে ভগবান চিরসুন্দর নহেন?

বৈষ্ণবগণ বলেন, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য অনন্ত, মাধুর্যও অনন্ত। কুরুক্ষেত্র-মথুরা-দ্বারকায় তাঁহার ঐশ্বর্যলীলা, আর বৃন্দাবনে তাঁহার ঐশ্বর্য প্রকট হইলেও মাধুর্যলীলাই প্রধান। মধুর লীলায় তিনি 'গোপবেশ বেণুকর নব-কিশোর নটবর,' স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার 'ললিত ত্রিভঙ্গ' ও 'ভ্রূধনু-নর্তনই' গোপীগণের চিত্তকে আকর্ষণ করে। পঞ্চশরের দর্প হরণ করেন বলিয়াই তিনি মদনমোহন, মন্মথ-মন্মথ। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতনকে বলিয়াছেন—

'মুক্তাহার বকপাঁতি ইন্দ্রধনু পিঞ্ছ তথি
পীতাম্বর বিজলী-সঞ্চার।
কৃষ্ণ নব জলধর জগৎ শস্য উপর
বরিষয়ে লীলামৃত ধার॥'

এই ভুবন-ভুলানো রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া চণ্ডীদাস যেন তাঁহার সকল কবিত্বশক্তি নিঃশেষ করিয়া দিয়া অবশেষে উপলব্ধি করিয়াছেন, 'কিছুই বলা হইল না।' বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে তাঁহার বপু, বদন ও মৃদুস্মিতের কথা বলিতে গিয়া শুধু বলিয়াছেন 'মধুরং' আর 'মধুগন্ধি'।

'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্॥'

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ মধুর, বদনখানি মধুর, তাঁহার মৃদু হাস্যও মধুগন্ধি। তাঁহার সকলই যে মাধুর্যে পূর্ণ। লীলাশুকের ভাবে আবিষ্ট মহাপ্রভু সনাতনকে বলিতেছেন—

'কৃষ্ণাঙ্গ লাবণ্যপুর, মধুর হৈতে সুমধুর,
তাতে সেই মুখসুধাকর।
মধুর হইতে সুমধুর তাহা হৈতে সুমধুর,
তার সেই স্মিত-জ্যোৎস্নাভর'॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন সম্পর্কে 'রম্য', 'রুচির' প্রভৃতি বিশেষণ পদের প্রয়োগ দেখা যায় সত্য, কিন্তু কোথাও শ্রীভগবানের সম্পর্কে 'সুন্দর' কথাটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

'তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তম শ্লোক যশোঽনুগীয়তে॥'

—সেই সঙ্কীর্তনই রম্য, রুচির, নিত্যই নব, উহা নিত্যকাল মনের মহোৎসব, উহা মনুষ্যগণের শোকার্ণব-শোষণ যদ্দ্বারা উত্তম শ্লোকের যশ (শ্রীভগবানের মহিমা) কীর্তিত হয়।

অবশ্য শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মার স্তুতিতে মহামায়ার সম্পর্কে 'অতিসুন্দরী' কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়।

'সৌম্যাঽসৌম্যতরা শেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী'।

তুমি ভক্তদিগের প্রতি সৌম্যা বা প্রশান্তা, আবার দৈত্যগণের প্রতি অসৌম্যতরা অর্থাৎ ততোধিক রুদ্রা, সকল সুন্দর বস্তু অপেক্ষাও তুমি সুন্দরী (অর্থাৎ তোমার সৌন্দর্যের তুলনা নাই)।

তথাপি এ কথা সত্য যে, সৌন্দর্যতত্ত্ব বা Aesthetics পাশ্চাত্যের সামগ্রী কিন্তু রসতত্ত্ব বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে বিশেষরূপে ভারতের দান। রস বস্তুটি যে শুধু প্রাকৃত জগতেই আস্বাদনীয়, তাহা নহে; অপ্রাকৃত জগতেও ইহা আস্বাদ্যবস্তু। রাধাপ্রেমে বিলসিততনু শ্রীগৌরাঙ্গের দিব্য জীবনকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরূপ গোস্বামী 'উজ্জ্বলনীলমণি' নামে রসশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। দণ্ডী, মম্মঠ, বিশ্বনাথ, জগন্নাথ প্রভৃতি যেমন কাব্যের বিশ্লেষণে সূক্ষ্ম বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীরূপ তেমনই অপ্রাকৃত রসলীলার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

এখন প্রশ্ন এই—শ্রীভগবান প্রাচীন ভারতীয়ের দৃষ্টিতে রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ হইয়াও সৌন্দর্যঘন হইলেন না কেন? আমাদের মনে হয়, তিনি রসস্বরূপ বলা হইলেই এ কথাও বলা হয় যে তিনি সৌন্দর্যের ঘনীভূত মূর্তি কিন্তু তাঁহাকে 'সুন্দর' বলিলে তাঁহার স্বরূপ সম্যক্ প্রকাশিত হয় না।

আবার রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে এ কথাও আমাদের স্বীকার করিতেই হয় যে, সংসারে যেমন স্থূল সৌন্দর্য আছে, তেমনই সূক্ষ্ম সৌন্দর্যও আছে। কোন সৌন্দর্য স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, কোন সৌন্দর্য বা সূক্ষ্ম অনুভূতিগ্রাহ্য, আর এই সূক্ষ্ম অনুভূতি সংসারে অতি অল্প লোকেরই আছে। কিন্তু রস বস্তুটি সর্বদাই সূক্ষ্ম, ইহা আস্বাদনীয়, বিশ্বনাথের ভাষায় ইহা অখণ্ড, স্বপ্রকাশ ও আনন্দচিন্ময়; সেই জন্য যাঁহারা তাঁহাকে 'সুন্দর' বিশেষণে বিশেষিত না করিয়া 'রসো বৈ সঃ' বলিয়াছেন, তাঁহারা অধিকতর সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ, 'সুন্দর' পদটি আপেক্ষিক বা Relative, সংসারে কুৎসিত বা অসুন্দর আছে বলিয়াই মানুষের সৌন্দর্যতৃষ্ণা এমন বলবতী। কিন্তু 'রসস্বরূপ' কথাটি আপেক্ষিক নহে। রস এমন একটি বস্তু অন্য কোন ভাষায় যাহার অনুবাদ করা যায় না।

চতুর্থতঃ, মানুষের মনে সৌন্দর্যের সঙ্গে স্থাণুত্বের যেন একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, যেমন আমরা বলি 'তাজমহল সুন্দর'; আবার কখনও আমরা বর্তমান কালের সীমার মধ্যে কোন বস্তুকে দর্শন করি বলিয়াই তাহা আমাদের চোখে সুন্দর বলিয়া প্রতিভাত হয়, যেমন আমরা বলি 'নানা ফুলে গ্রথিত এই মালাটি কেমন সুন্দর!' কিন্তু যখন আমরা বলি, শ্রীভগবান রসস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ, তখন আমরা অনুভব করি যে তিনি নিত্য হইয়াও নব-নব, তাই তাঁহার প্রতি অনুরাগও 'তিলে তিলে নূতন হোয়'। শ্রীরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন, 'প্রেমের গতি সর্পের গতির মতই কুটিল।' শ্রীভগবানের রূপমাধুর্যের এই 'নিত্য নবীভবনের' দিকটি 'সুন্দর' এই বিশেষণের দ্বারা তেমন পরিস্ফুট হয় না, যেমন হয় 'রসময়' এই বিশেষণটির দ্বারা।

এই জন্যই আমরা 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এই তিনটি পদকে একত্র গ্রথিত করি নাই। ইহার কারণ পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণের চেয়ে ভারতীয় ঋষি বা মহাজনদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল গভীরতর ও ব্যাপকতর, আর শব্দপ্রয়োগের ব্যাপারে তাঁহারা ছিলেন অতিমাত্রায় সতর্ক।

আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে বিশ্ব-দেবতার সম্পর্কে 'সুন্দর' কথাটির ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তিনি শুধু 'সুন্দর' নহেন, তিনি রসঘন, আনন্দস্বরূপ ও অমৃতস্বরূপও বটেন। আর তিনি যে সৌন্দর্যেও অনুপম, তাহা তো আমরা সকলেই স্বীকার করি। কিন্তু যাঁহারা ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' এই সূত্রটি আবিষ্কার করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহাদের সুবুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। তাঁহারা যে ভারতীয় সাধনার মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বাস্তবতার ধারা

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কোনও একটি যুগের সাহিত্যকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা চলে না। পূর্ববর্তী যুগের সাহিত্যের সঙ্গে পরবর্তী যুগের সাহিত্যের যোগাযোগটা অবিচ্ছিন্ন। সাহিত্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা যুগের গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে না। বিংশ শতকের সাহিত্যে একান্ত স্বাভাবিক রূপেই বিগত শতকের প্রভাব পড়েছে। কালের প্রভাবে সামাজিক বিবর্তনের ফলে আধুনিক সাহিত্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে যা পূর্বে ছিল না। এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করেও বলা যায় যে, বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মূল ধারা পূর্ববর্তী শতাব্দীর খাতেই বয়ে এসেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রভাবকে মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করা যায়। একটি ব্যক্তিগত; অন্যটি ভাবগত। উনবিংশ শতাব্দীর অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক শতাব্দীর সীমানা অতিক্রম করে সাহিত্য সাধনা করেছেন। টলস্টয়, ইবসেন, চেকভ, হাউপ্টমান, ভেরগা, স্ট্রীণ্ডবার্গ, হার্ডি প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বর্তমান যুগের প্রথমার্ধের অনেক লেখককে স্পর্শ করেছে। ভাবগত প্রভাবটা এর চেয়ে অনেক বেশী গভীর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান ভাবধারাগুলি অতি সহজেই শতাব্দীর কৃত্রিম গণ্ডী অতিক্রম করে একালের সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল রিয়ালিজমের আবির্ভাব। যদিও রোমান্টিসিজমের আধিপত্য এই শতকের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ, তথাপি ১৮৩০ সনে রিয়ালিজমের যে সূত্রপাত হয়, তাই উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দান। ক্লাসিসিজম আঙ্গিকের উপর জোর দেয়; রোমান্টিসিজমের প্রেরণা স্বপ্ন ও কল্পনা; এবং জীবনের বাস্তব ছবি আঁকা রিয়ালিজমের আদর্শ। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে কোনও এক যুগে কোনও একটি ধারা সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করে। তবে কোনও বিশেষ লেখকের রচনা কিংবা কোনও যুগের সাহিত্যকে ক্লাসিসিজম, রোমান্টিসিজম অথবা রিয়ালিজমের বিশুদ্ধ নিদর্শন বলে চিহ্নিত করা যায় না। হোমারের কাব্যেও রিয়ালিজমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রোমান্টিক লেখকের মধ্যে রিয়ালিজম এবং রিয়ালিস্ট লেখকের মধ্যে রোমান্টিসিজমের দৃষ্টান্তও সচরাচর মেলে। শাতোব্রিয়াঁ, মাদাম দ্য স্তাল, ভিনি, দুমা (বড়), হুগো, স্কট প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক লেখকেরা উপন্যাসকে সাহিত্যের আসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এঁদের পূর্বে গ্যেটেও তাঁর উপন্যাসে প্রাধান্য দিয়েছেন রোমান্টিকতাকে। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যেরও মূল প্রেরণা রোমান্টিসিজম। এই রোমান্টিক লেখকদের পাশাপাশি ছিলেন একদল বাস্তববাদী লেখক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী লেখকেরা শুধু যে আধুনিক উপন্যাস আরম্ভ করেছেন তাই নয়; একে সমৃদ্ধ করে সাহিত্যের এক শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাখায় পরিণত করেছেন।

বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক স্তাঁদালকে (১৭৮৩-১৮৪২) আমরা প্রথম বাস্তববাদী ঔপন্যাসিকের গৌরব দিতে পারি। ১৮৩০ সনে প্রকাশিত 'লালকালো' উপন্যাসে তিনি সমসাময়িক ফরাসী সমাজের যেরূপ বাস্তব চিত্র এঁকেছেন পূর্বে তা দেখা যায় নি। স্তাঁদাল তাঁর যুগের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। তাই সাহিত্যে বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা হতে বিলম্ব হয়েছিল। প্রসিদ্ধ সমালোচক তেন (Taine) স্তাঁদালের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলেছেন No one has taught us better how to open our eyes and see—চোখ খুলে জীবনকে কী ভাবে দেখতে হয় তা স্তাঁদালের মত আর কেউ আমাদের শেখায় নি। চোখ খুলে দেখবার ক্ষমতাই বাস্তববাদী লেখকের সবচেয়ে বড় শক্তি।

স্তাঁদালের পরে এলেন বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০)। বালজাক 'হিউম্যান কমেডি' সিরিজের অন্তর্গ

উপন্যাসগুলিতে ফরাসী সমাজকে নিখুঁতভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন।

ফরাসী সাহিত্যে বাস্তবতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের (১৮২১-৮০) 'মাদাম বোভারি' এবং 'একটি সরল হৃদয়'। তাঁর পূর্বে উনবিংশ শতাব্দীর অন্য কোনও ফরাসী লেখক জীবনের এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং নিখুঁত বর্ণনা দেন নি।

রাশিয়ান সাহিত্যের ঝোঁক বরাবরই বাস্তবতার দিকে। গোগোলের (১৮০৯-১৮৫২) 'দি ক্লোক' রাশিয়ান সাহিত্যে রিয়ালিজমের সূত্রপাত করেছে। এর পরে ডস্টয়েফেস্কি (১৮২১-৮১), টুর্গেনিভ (১৮১৮-৮৩) এবং টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০) রাশিয়ান সাহিত্যে বাস্তবতার ধারাকে পুষ্ট করেছেন।

নাট্য-সাহিত্যে বাস্তবতা আনলেন নরওয়ের লেখক হেনরিক ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬)। নাটকে এরূপ তীব্র সমাজ-সমালোচনা তাঁর পূর্বে কেউ করেন নি। ইবসেনের রচনা জার্মান সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বার্নার্ড শর (১৮৫৬-১৯৫০) উপরে তাঁর প্রভাব তো সর্বজনবিদিত।

ফরাসী বা রাশিয়ান সাহিত্যের মত রিয়ালিজম উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে পাওয়া যাবে না, তবে ডিকেন্স (১৮১২-৭০), থ্যাকারে (১৮১১-৬৩) ও ট্রলোপ (১৮১৫-৮২) সমসাময়িক জীবন ও সমাজের বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জোলা (১৮৪০-১৯০২) বাস্তবতার আদর্শকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান। রিয়ালিজমের এই প্রসারকে বলা হয় ন্যাচারিলিজম বা অতি-বাস্তবতা। তেন তাঁকে এই অতিবাস্তবতার আদর্শ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। জোলার আদর্শে বিশ্বাসী অনুরক্ত নবীন লেখকের সংখ্যাও কম ছিল না। এঁদের মধ্যে মোপাসাঁর (১৮৫০-৯৩) নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে। জোলা বিশ্বাস করতেন যে, বৈজ্ঞানিক যেমন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে একটি তত্ত্ব সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তেমনই উপন্যাসও লেখকের পরীক্ষালব্ধ একটি সামাজিক সমস্যা। বালজাকের 'হিউম্যান কমেডি'র মত জোলা 'রুগোঁ-ম্যাকার' (Rougon-Macquart) নামে একটি উপন্যাসের সিরিজ রচনা করেন। এই সিরিজের কুড়িটি উপন্যাসে জোলা একটি পরিবারের জীবনযাত্রার ইতিহাস প্রায় বৈজ্ঞানিকের মত বর্ণন করেছেন। মানুষের জীবনে বংশগতির (heredity) প্রভাব যে কত বড় রুগোঁ-ম্যাকার সিরিজে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখানো হয়েছে।

ন্যাচারালিস্ট লেখকরা জীবন সম্বন্ধে কোনও সংস্কার বা আদর্শবাদে বিশ্বাস করতেন না। বৈজ্ঞানিকের মত নৈর্ব্যক্তিকভাবে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। জীবনের ক্লেদাক্ত ও ঘৃণ্য দিকটা হুবহু ফুটিয়ে তুলতে তাঁদের দ্বিধা ছিল না। জীবনের সঙ্গে যার যোগ আছে তা যত ঘৃণ্য ও নীচ হোক না কেন, সাহিত্যের আসরে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। অতিবাস্তববাদী লেখকেরা জীবনের স্থূল দিকটার উপরই জোর দিয়েছেন; এক টুকরো জীবনের অতি সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়ে তাকে সজীব করে তুলতে পারার মধ্যেই লেখকের কৃতিত্ব। এ বর্ণনায় শালীনতার খাতিরে কিছুই গোপন করলে চলবে না। জোলা পতিতালয়ে বাস করে বারবনিতাদের জীবনযাত্রার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে।

ফ্রান্সের বাইরে সাহিত্যে এই অতিবাস্তবতার প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। জার্মানি, ইংলণ্ড, স্পেন, ইতালি প্রভৃতি দেশে অনেক লেখক অতিবাস্তবতার আদর্শকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ফন্টেইন (১৮১৯-১৮৯৮), হাউপ্টম্যান (১৮৬২-১৯৪৬), হার্ডি (১৮৪০-১৯২৪), ভেরগা (১৮৪০-১৯২২) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে বাস্তবতা ও অতিবাস্তবতার প্রাধান্য সুস্পষ্ট। নিছক রোমান্টিক রচনার যুগ শেষ হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। তার কারণও আছে। এই বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক বিদ্যার যুগে রোমান্স সৃষ্টির সুযোগ একান্তরূপে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। মনের ছায়াচ্ছন্ন কোণে রোমান্সের যে শেষ আশ্রয়টুকু ছিল, ফ্রয়েডের আবিষ্কার তাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নিয়েছে।

বর্তমান শতাব্দীর বাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করা যায় টমাস মান, আর্নল্ড বেনেট, আইভান

বুনিন, সিগ্রিদ উন্‌সেত্‌, সমারসেট মম প্রভৃতির নাম। এঁরা প্রত্যেকেই কুশলী ঔপন্যাসিক। শিল্পী হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব সম্বন্ধে এঁরা সর্বদাই সচেতন। জীবনের যথার্থ রূপায়ণ এঁদেরও লক্ষ্য; কিন্তু ন্যাচারালিস্ট লেখকদের মত নির্বিচারে সব-কিছু পাঠকের সামনে তুলে ধরতে এঁরা আগ্রহশীল নন। মানবতার আদর্শ এঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান প্রেরণা। মানুষের পক্ষে যা কল্যাণপ্রসূ নয়, তেমন সাহিত্য-সৃষ্টির মূল্য কী? এঁরা বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেছেন বটে, কিন্তু বাস্তবাতীত এক মহত্তর জীবনের ইঙ্গিত ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে এঁদের রচনায়। অবশ্য আর্নল্ড বেনেট প্রধানতঃ গল্পকার। অন্য লেখকেরা বাস্তব জীবনের সঙ্গে এক মহত্তর জীবনের আদর্শের যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছেন।

টমাস মান (১৮৭৫-১৯৫৫) 'বুডেনব্রুকস' ও অন্যান্য রচনায় সমসাময়িক য়ুরোপীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বাস্তব ছবি দিয়েছেন। কিন্তু সেখানেই তাঁর কাজ শেষ হয় নি। মানুষের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে তিনি প্রশ্ন করেছেন এবং সে প্রশ্নের উত্তর পাঠকদের দিতে চেষ্টা করেছেন। জোসেফের কাহিনীতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের "Origin, his essence, his goal" সম্বন্ধে আলোচনা করা।

আর্নল্ড বেনেটের (১৮৬৭-১৯৩১) 'দি ওল্ড ওয়াইভ্‌স্ টেল' মধ্যবিত্ত ইংরেজ-সমাজের জীবন্ত আলেখ্য। ছবি হিসাবেই এর প্রধান মূল্য।

আইভান বুনিন (১৮৭০-) চেকভ, টুর্গেনিভ ও টলস্টয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে রাশিয়ার সামাজিক জীবনের বাস্তব ছবি এঁকেছেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা 'দি ভিলেজ' এবং 'দি জেণ্টেলম্যান ফ্রম সানফ্রান্সিসকো' থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। বুনিনের কাহিনীর মধ্যে স্থানে স্থানে দর্শন ও বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য থাকায় সুখপাঠ্যতার অন্তরায় হয়েছে।

উন্‌সেত্‌ (১৮৮২-১৯৪৯) তাঁর উপন্যাসে সমসাময়িক সমাজের ছবি দেবার চেষ্টা করেন নি। বিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার রীতি প্রয়োগ করে তিনি মধ্যযুগের স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার জীবন্ত ছবি দিয়েছেন। তাঁর বই পড়ে মনে হবে যেন কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। Kristin Lavransdatter-এ লেখিকার রচনারীতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাওয়া যাবে।

সমারসেট মম্ (১৮৭৪-) সুখপাঠ্য গল্প-লেখক। অবশ্য বাস্তবতামূলক গল্প। গল্পকার হিসাবেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। তবে, 'অফ হিউম্যান বণ্ডেজ', 'দি রেজরস্ এজ' প্রভৃতি উপন্যাসে একটি জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখা যায়।

বর্তমান শতাব্দীতে উল্লেখযোগ্য ন্যাচারালিস্ট লেখকের সংখ্যাও কম নয়। বাস্তববাদী ও অতিবাস্তববাদী লেখকদের রচনাপদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়, সে সম্বন্ধে উপরে একটু আভাস দিয়েছি। পার্থক্যটা প্রকৃতিগত নয়, মাত্রাগত। সুতরাং কোথায় রিয়ালিজমের শেষ এবং ন্যাচারালিজমের শুরু তার নিশ্চিত নির্দেশ পাওয়া সম্ভব নয়। পূর্ববর্তী বাস্তববাদী লেখকদের রচনায় অতি-বাস্তবতার লক্ষণ কোথাও কোথাও পাওয়া গেলেও জোলাই প্রথম সচেতনভাবে নতুন রীতি গ্রহণ করেন এবং প্রধানতঃ তাঁর রচনাই পরবর্তী অতিবাস্তবতার ধারাকে প্রভাবান্বিত করেছে। আর একজন লেখক বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ও আমেরিকান অতিবাস্তববাদী লেখকদের প্রভাবান্বিত করেছিলেন। তিনি হেনরিক ইবসেন। ইবসেনকে অতিবাস্তবতাবাদী লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা না গেলেও তাঁর সাহিত্যজীবনের শেষভাগে রচিত সামাজিক নাটকে ('দি লীগ অব ইয়ুথ' প্রভৃতি) অতিবাস্তবতার বীজ সুস্পষ্ট। অতিবাস্তববাদী লেখকদের রচনা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে সত্য, কিন্তু বাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে যে গভীরতা পাওয়া যায় এঁদের মধ্যে তার অভাব আছে।

বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান সাহিত্যে অতিবাস্তবতার প্রাধান্য সুস্পষ্ট। ষ্টিফেন ক্রেইন (১৮৭১-১৯০০) এবং বিশেষ করে ফ্র্যাঙ্ক নরিস (১৮৭০-১৯০২) আমেরিকায় প্রথম অতিবাস্তব পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। কিন্তু থিওডোর ড্রেইজারের (১৮৭১-১৯৪৫) হাতে পড়ে অতিবাস্তবতার ধারা আমেরিকান সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ড্রেইজার বাস্তব অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। সমাজে যা দেখেছেন তা উপন্যাসে ও নাটকে যথাযথরূপে বর্ণনা করেছেন,—ভদ্রতার

াশ পরিয়ে অপ্রিয় সত্যকে রীতি-সম্মত করবার আগ্রহ ছিল না। অনাবৃত সত্য প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে ঃও পেতে হয়েছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সিস্টার রি' অশ্লীলতার অভিযোগে নিষিদ্ধ হয়েছিল; আর টি উপন্যাস—'দি জিনিয়াস'—নিষিদ্ধ হয়েছিল অন্য রণে। এই উপন্যাসে তিনি পাপের জয় ও পুণ্যের াজয় দেখিয়েছিলেন বলে গোঁড়া খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে ল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ড্রেইজার সমাজ-ন পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সাময়িক আমেরিকান সমাজে যত ক্লেদ, যত কুশ্রীতা ল ড্রেইজার তাদের বাস্তব রূপ পাঠকের সামনে উপস্থিত র শুধু যে পাঠকদের সাহিত্যরস উপভোগের সুযোগ য়েছেন তাই নয়, এর ফলে সমাজেরও প্রভূত উপকার ছে। তাঁর 'অ্যান আমেরিকান ট্রাজেডি' একটি সত্য া অবলম্বনে রচিত। এক দল চরিত্রহীন ভদ্রবেশী কের হাতে আমেরিকান তরুণীদের সম্মান এবং জীবন কিরূপ বিপন্ন, সে সম্বন্ধে আমেরিকান নাগরিকরা এই ন্যাস পড়ে বিশেষরূপে সচেতন হয়। ড্রেইজারের কা বাস্তব চিত্রগুলি প্রথমে পাঠকদের নিকট এতই মনে হয়েছিল যে, তারা প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

ড্রেইজারের পরেই উল্লেখ করতে হয় সিনক্লেয়ার য়ের (১৮৮৫-১৯৫১) নাম। সামাজিক গলদগুলি াথে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্য তিনিও ড্রেইজারের প্রথমে অপ্রিয়ভাজন হয়েছিলেন। সমাজের বিশেষ কটি গোষ্ঠীকে নিয়ে তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস রচিত। াথাও ডাক্তার, কোথাও পাদরী, কোথাও বৃহৎ ব্যবসায়ী, ত্যাদির জীবনযাত্রা তাঁর বিষয়বস্তু। এঁদের সম্বন্ধে ভুল খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেষণ করবার জন্য নিজে যথেষ্ট রিশ্রম করেছেন; আবার বিশেষজ্ঞদের সহায়তাও গ্রহণ তে হয়েছে। তাঁর 'অ্যারোস্মিথ' উপন্যাসে চিকিৎসা-া সম্বন্ধে যে-সব কথা আছে তাদের আলোচনা বিশেষজ্ঞ ড়া সম্ভব নয়।

আর্নেস্ট হেমিংওয়েকেও (১৮৯৮-) অতিবাস্তববাদী খক হিসাবে স্বীকার করা যেতে পারে। তাঁর ত লেখকের কর্তব্য হল "to put down what see and what I feel in the best and simplest way I can tell it." এর মধ্যে অতি-বাস্তববাদী লেখকের নীতি ব্যক্ত হয়েছে।

হেমিংওয়ের লেখক-জীবনের গুরু শ্রীমতী গারট্রুড স্টেইন (১৮৭৪-১৯৪৬) ছিলেন অতিবাস্তববাদী লেখিকা। হেমিংওয়ে, এজরা পাউণ্ড, শেরউড অ্যাণ্ডারসন প্রভৃতি তরুণ লেখকদের উপর তাঁর প্রভাব পড়েছিল। অতিবাস্তবতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ব্যতীত তাঁর রচনায় একটি বিশেষ লক্ষণীয় রীতির প্রয়োগ করা হয়েছে। সেই রীতিটি হল দৈনন্দিন জীবনে মানুষের যুক্তিহীন কথাবার্তাকে উপন্যাসে স্থান দেওয়া। তাঁর পাত্রপাত্রীদের মুখে যে ভাষা তিনি দিয়েছেন তা পালিশ করা ভাষা নয়। বাস্তব জীবনে লোকে যে ভাবে কথা বলে ঠিক সেই ভাষাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। এর ফলে কোথাও কোথাও তাঁর কাহিনী দুর্বোধ হয়ে উঠেছে।

আধুনিক যুগের অন্যান্য আমেরিকান অতিবাস্তববাদী লেখকদের মধ্যে জেমস টি. ফারেল (১৯০৪-), জন ডস প্যাসাস (১৮৯৬-), স্কট ফিটুজারাল্ড (১৮৯৬-১৯৪০) হেনরি মিলার (১৮৯১-) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজী সাহিত্যে অতিবাস্তববাদী লেখকের সংখ্যা এবং সাহিত্যে তাঁদের প্রভাব খুবই কম। জন গল্স্ওয়ার্দিকে (১৮৬৭-১৯৩৩) কেউ কেউ বাস্তববাদী, কেউ বা অতিবাস্তববাদী লেখক বলে থাকেন। নগ্ন দারিদ্র্য, অশ্লীলতা, নীচতা ইত্যাদি তাঁর রচনার বিষয়বস্তু নয় বলে অনেকের তাঁকে অতিবাস্তববাদী লেখক হিসাবে স্বীকার করতে দ্বিধা আছে। জোলার রুগোঁ-মাকার সিরিজের মত গল্স্ওয়ার্দি 'ফোরসাইট সাগা' সিরিজের সাহায্যে একটি পরিবারের ভাঙনের ইতিহাস অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনার সূক্ষ্মতা অতিবাস্তবতার লক্ষণাক্রান্ত। অতিবাস্তববাদী লেখকেরা সাধারণতঃ সমাজের নীচুতলার অথবা নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের কথা বলে থাকেন; গল্স্ওয়ার্দির প্রধান চরিত্রগুলি অভিজাত অথবা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কিন্তু সামাজিক নাটকগুলিতে ('জাস্টিস', 'স্ট্রাইফ', ইত্যাদি) তিনি বাস্তব জীবনের খুব কাছাকাছি এসেছেন।

উপরে আমরা যে-সব অতিবাস্তববাদী লেখকের কথা উল্লেখ করেছি তাঁদের অধিকাংশই প্রধানতঃ উপন্যাস-

লেখক। নাটকে অতিবাস্তবতার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন ইবসেন; তাঁর পরে জার্মান লেখক হাউপ্টমান এই ধারাকে সাফল্যের পথে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছেন। উপন্যাসে অতিবাস্তবতার আদর্শ যেরূপ সাফল্যের সহিত রূপায়িত হয়েছে, নাটকে প্রায় তদ্রূপ সাফল্যের কৃতিত্ব হাউপ্টমানের। নাটকে যে জীবনের এমন বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব পূর্বে তা কেউ ধারণা করতে পারে নি। সাধারণ শ্রমজীবী নরনারীর বেদনাক্লিষ্ট জীবনের কাহিনী তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু। 'বিফোর ডন' এবং 'দি উইভার্স' হাউপ্টমানের অতিবাস্তব নাটকের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। শুধু যে নাটকের বিষয়বস্তু-নির্বাচনে হাউপ্টমান অতিবাস্তবতার প্রমাণ দিয়েছেন তাই নয়; নাটকের আঙ্গিক ও প্রযোজনার ব্যাপারেও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

যদিও হাউপ্টমানের অতিবাস্তবতামূলক নাটক বিংশ শতাব্দীর পূর্বক্ষণে রচিত হয়েছিল, তথাপি বর্তমান শতাব্দীতেও তাদের প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। পরবর্তী কালে হাউপ্টমান অতিবাস্তব পদ্ধতি ত্যাগ করেছিলেন।

অতিবাস্তববাদী ফরাসী লেখকদের মধ্যে জুল রোমাঁ ও মার্টিন দু গারের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। রোমাঁর (১৮৮৫-) সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি চব্বিশ খণ্ডের উপন্যাস 'মেন অব গুড উইল'। নায়ক পীয়ের জালেজ্ এবং অন্যান্য প্রধান চরিত্রগুলির বর্তমান শতাব্দীর প্রায় প্রথম চল্লিশ বৎসরের জীবনযাত্রা এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এই সুদীর্ঘ কাহিনীতে অতিবাস্তবতার পদ্ধতি অনুসারে রোমাঁ চল্লিশ বছরের ফরাসী জীবনযাত্রার ধারা এবং বিচিত্র ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়াছেন। অন্যান্য অতিবাস্তববাদী লেখকের সঙ্গে তাঁর দুটি পার্থক্য লক্ষণীয়: (১) রোমাঁ তাঁর চরিত্রগুলি স্বাধীনব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হিসাবে আঁকেন নি; এরা গোষ্ঠীর অংশমাত্র; ব্যক্তির চেয়ে তাঁর কাছে সমাজের প্রাধান্য বেশী। সমাজের মধ্য দিয়েই মানুষকে সাফল্য অর্জন করতে হবে। সমাজ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিকে বলা হত Unanimism। জর্জ দুয়ামেল (১৮৮৪-) এবং আরও কোন কোন ফরাসী লেখক এই তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। (২) কোথাও কোথাও রোমাঁ মনের গতিপথ অনুসরণ করে তাঁর চরিত্রের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। পুথিগত সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনাও তাঁর রচনার অতিবাস্তবতা স্থানে স্থানে ক্ষুণ্ণ করেছে।

এক দিক থেকে বিচার করলে মার্টিন দু গার (১৮৮১-) বোধ হয় বর্তমান কালের সর্বাপেক্ষা 'রক্ষণশীল' অতিবাস্তববাদী ঔপন্যাসিক। তাঁর দশ খণ্ডের উপন্যাস Les Thibaults একটি ফরাসী পরিবারের অবক্ষয়ের কাহিনী। রোমাঁর 'মেন অব গুড উইল' অপেক্ষা দু গারের উপন্যাসের মিল জোলার রুগোঁ-মাকার সিরিজের সঙ্গে বেশী। রোমাঁর কাহিনীতে সকল শ্রেণীর লোকের আনাগোনা দেখতে পাই। দু গার দেখিয়েছেন একটি শ্রেণীর এবং বিশেষ করে একটি পরিবারের লোকদের। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদী লেখকদের মত সূক্ষ্ম বর্ণনার উপর তিনি জোর দিয়েছেন, ঘটনা-সংস্থানের দ্বারা চমক সৃষ্টির প্রয়াস নেই। বৈজ্ঞানিকের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির দ্বারা জীবনকে পর্যবেক্ষণ করে অতিবাস্তবতার আদর্শের প্রতি তিনি নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

বাস্তবতা রাশিয়ান সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ান লেখকরা বাস্তবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ১৯১৭ সন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর বাস্তববাদী গ্রন্থ রচিত হয়েছে অনেক। বাস্তবতামূলক উপন্যাস রচনার জন্য যে অবাধ স্বাধীনতা প্রয়োজন বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় তেমন স্বাধীনতা পাওয়া কঠিন ছিল।

বিংশ শতাব্দীর অতিবাস্তববাদী রাশিয়ান লেখকদের মধ্যে ম্যাক্সিম গোর্কির (১৮৬৮-১৯৩৬) নাম সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। তিনি নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমজীবীদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছেন। তাঁর রচনা এই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রভায় উজ্জ্বল।

গোর্কির সাহিত্যসাধনাকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়: গোর্কি ত্রিশ বছর বয়সের পূর্বে যে-সব কাহিনী লিখেছেন তার মধ্যে তিনি দেখিয়েছেন যে, জনসাধারণ চরম দারিদ্র্য ও দুর্দশার মধ্যে বাস করলেও তাদের মনুষ্যত্ব এখনও বেঁচে আছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের রচনায় জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তিনি তাদের চরিত্রের নীচতা, দীনতা এবং কুশ্রীতাকেও

পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই সময়কার রচনার মধ্যেই অতিবাস্তবতার প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত 'দি লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্'। এই নাটকের চরিত্রগুলির কেউ চোরাই মালের কারবার করে, কেউ মাতাল, কেউ জোচ্চোর; আবার অন্যেরা কঠোর পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। সবাই থাকে শহরের একটা নিম্নশ্রেণীর হোটেলে। একদিন এক রহস্যময় তীর্থযাত্রী সেই হোটেলে এসে উপস্থিত হল। লোকটি তাদের জড়তা ত্যাগ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। এ রকম একজন লোকের উপস্থিতি আশার সৃষ্টি করল হোটেলের বাসিন্দাদের মনে। আগন্তুকের ভবিষ্যতের রঙিন চিত্র সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পেরেও একটি জীবনবিদ্বেষী চরিত্র বলছে, Everybody lives for something better to come.

গোর্কির তৃতীয় পর্যায়ের আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলি নিছক সাহিত্য হিসাবে তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি পাবে।

অতিবাস্তববাদী লেখকদের আদর্শ হল জীবনের যথাযথ নিখুঁত বর্ণনা দেওয়া। ব্যাখ্যা বা তত্ত্ব যোগ করা তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু গোর্কির বই পড়ে স্পষ্টই মনে হবে লেখক শুধু জীবনের ছবি আঁকেন নি, তাঁর একটি বক্তব্যও আছে। সে বক্তব্য এই যে, বিরূপ সামাজিক পরিবেশের জন্যই মানুষের জীবন বিকৃত হয়।

আলেকজান্দার কুপ্রিনের (১৮৭০-১৯৩৮) 'ইয়ামা দি পিট' উপন্যাসটি বিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান সাহিত্যে অতিবাস্তবতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওডেসার পতিতালয়ের বারবনিতাদের জীবনযাত্রার যে নিখুঁত ছবি তিনি দিয়েছেন তা একমাত্র জোলার 'নানা'র সঙ্গে তুলনীয়। পতিতাবৃত্তির কারণ ও কুফল সম্বন্ধেও কুপ্রিন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মিখাইল শলোকভের (১৯০৫-) চার খণ্ডের উপন্যাস 'দি কোয়ায়েট ডন'-এ বাস্তব ও অতিবাস্তব রচনা-রীতি পাশাপাশি পাওয়া যাবে। ১৯১০ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত কসাক জাতির বিবর্তনের বিবরণ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। টলস্টয়ের 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস'-এর প্রভাব কাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রেমের উপকাহিনীর উপর পড়েছে 'অ্যানা কারেনিনা'র ছায়া। শলোকভ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকায় কসাকদের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। একটি গোষ্ঠীর কথা বলতে গিয়ে তিনি ব্যষ্টির চরিত্রায়ন উপেক্ষা করেন নি। বরং ব্যক্তির জীবনকে যথাযথ রূপে ফুটিয়ে তুলে গোষ্ঠী সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করেছেন। শলোকভের ঝোঁক বিশদ বর্ণনার উপর। একটি ঘটনার খুঁটিনাটি বিবরণ উপস্থিত করতে তিনি ভালবাসেন। চরিত্রের সমালোচনা করায় প্রোষিতভর্তৃকা যুবতী বৃদ্ধ শ্বশুরকে যে ভাবে শিক্ষা দিয়েছিল তার তুলনা অতিবাস্তব সাহিত্যেও পাওয়া যায় না।

বিজ্ঞান ও কলকারখানার যুগে সাহিত্যে অতি-বাস্তবতার ধারা প্রচলিত হয়েছে। শহর ও ফ্যাক্টরির জীবনের সঙ্গে অতিবাস্তব সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। বিজ্ঞান ও ব্যাবহারিক শিল্প সমাজে যে পরিবর্তন এনেছে, জীবনে যে অজ্ঞাতপূর্ব দীনতা, ক্লেদ ও গ্লানি দেখা দিয়েছে, ন্যাচারালিস্ট লেখকরা প্রধানতঃ তারই ছবি আঁকবার চেষ্টা করেছেন। অতিবাস্তববাদী লেখকদের নাগরিক জীবনের প্রতি এই আকর্ষণের প্রতিক্রিয়া কোনও কোনও লেখকের মধ্যে দেখা যায়। এঁরা নাগরিক সভ্যতা থেকে দূরে শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে কাহিনী সৃষ্টি করেন। নাগরিক জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রকৃতির কোলে ফিরে যাবার জন্য যেন আহ্বান জানান এঁরা।

এই ধরনের রচনার মধ্যে ক্নুট হামসুনের (১৮৫৯-১৯৫২) 'গ্রোথ অব দি সয়েল' অগ্রণী। নরওয়ের উত্তরাঞ্চলে এক খণ্ড পতিত জমির উপর প্রথম কেমন করে একটি গ্রাম্য সমাজ একটু একটু করে গড়ে উঠেছে সেই চিত্তাকর্ষক বিবরণ এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। নায়ক আইজাকের মধ্যে আমরা আদিম মানবের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই; লেখক তার চরিত্র সহানুভূতির সঙ্গে এঁকেছেন। আইজাকের বুদ্ধি বেশ মোটা, কিন্তু সে সৎ ও হৃদয়বান। এই নতুন উপনিবেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের খুব বিশদ ও নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

ক্নুট হামসুনের মত ফরাসী লেখক জাঁ জিওনো (১৮৯৫-) কৃষক-জীবনের চিত্রকর। অবশ্য 'গ্রোথ অব দি সয়েল-এর মত বৃহৎ পটভূমিকা জিওনোর কোনও বইয়েই নেই। তথাপি গ্রাম্য পরিবেশ ও কৃষক-জীবন সম্বন্ধে

হামস্থনের দৃষ্টিকোণের সঙ্গে জিওনোর অনেকটা মিল আছে। কিন্তু জিওনো সর্বত্র নৈর্ব্যক্তিক থাকতে পারেন নি এবং স্থানে স্থানে মনোবিশ্লেষণ দ্বারা পাত্র-পাত্রীর কাজের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ ও অন্য সকল প্রাণীর যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, এই উপলব্ধি জিওনোর অনেক কাহিনীতে পাওয়া যায়।

উইলিয়াম ফকনার (১৮৯৭-) হামস্থনের মত গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করেন না—যদিও তিনি আঞ্চলিক লেখক। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে তাঁর প্রায় সকল উপন্যাসের পটভূমিকা। উত্তরাঞ্চলের অসম প্রতিযোগিতায় দক্ষিণাঞ্চল আর্থিক ও নৈতিক ভাঙনের মুখে চলেছে। ফকনার ওই অঞ্চলের জনশ্রুতি, কুসংস্কার, আচার, ব্যবহার ইত্যাদির নিপুণ প্রয়োগের দ্বারা একটি নতুন জগৎ সৃষ্টি করেছেন। এ জগতে খুন, যৌন অপরাধ, গোষ্ঠীগত কলহ ইত্যাদি লেগেই আছে। ১৯৪৯ সনে নোবেল পুরস্কার আনতে গিয়ে ফকনার এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, সাহিত্যের বিষয় হল "the human heart in conflict with itself"। ফকনার তাই বাইরে থেকে জীবনের যে ছবি দেখা যায় শুধু তার হুবহু ছবি দিয়ে তৃপ্তি লাভ করেন নি। তিনি তাঁর পাত্র-পাত্রীদের মানসিক দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণও করেছেন। সাম্প্রতিককালের সাহিত্যে আমরা এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। সাহিত্য-সৃষ্টির একটি বিশেষ পথ ধরে লেখকরা আজকাল বড়-একটা চলতে চান না। আজ কোনও লেখককে শুধু বাস্তববাদী অথবা রোমান্টিক বলে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। একজন লেখকের মধ্যে বিভিন্ন ধারার সংমিশ্রণ ঘটেছে দেখতে পাই।

উপরে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে বাস্তববাদের ধারা সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হয়েছে। বাস্তববাদী সকল লেখক এবং তাঁদের সকল বইয়ের আলোচনার সুযোগ এখানে নেই।

বন্দে পুরুষোত্তমম্

সুনীলকুমার লাহিড়ী

নররূপে প্রভু এসেছ তো বহুবার—
দূরিতে ধরার যুগ-জঞ্জালভার;
এলে রঘুপতি রাঘবের বেশে ত্যাগে ও শৌর্যে নরোত্তম—
দুখের দাহনে মহোত্তম।

কপিলাবস্তু নগরে যখন এলে,
রাজৈশ্বর্য তেয়াগিলে অবহেলে—
জরা-জর্জরে সেবায় ভরিলে ব্যথাচঞ্চল হে সন্ন্যাসী;
মুখে বরাভয় মধুর হাসি!

হিংসা-দ্বন্দ্বে কালো এ বসুন্ধরা,
নরপশুদের ঘাত-প্রতিঘাতে ভরা;
নির্বাণ লভি আগত কালের বোধিশিখা জ্বালি অনির্বাণ—
চেয়েছ মানবে করিতে ত্রাণ।

বেথ্‌লেহেমেতে শুনি মন্দুরা-মাঝে
তব আহ্বান-শুভসংগীত বাজে;
হে যুগস্রষ্টা, কণ্টকভারে হাসিমুখে শিরোভূষণ করি—
শত লাঞ্ছনা লইলে বরি।

ক্রুশ-নিবদ্ধ দেহখানি তব বহে,
কত যন্ত্রণা হাসিমুখে গেছ সহে,
তবু করুণা-সঘন-নয়ন হইতে সুন্দর ক্ষমা ঝরিয়া—
দিল অমৃতে ধরা ভরিয়া।

এলে নদীয়ায় প্রেমবন্যায় বহি—
প্রেম-বিতরণে অঙ্গে আঘাত সহি—
বিভেদের বিষ নাশিয়া গড়িতে মহাজাতি একসূত্রে গাঁথা
প্রেমের ঠাকুর পতিত-ত্রাতা।

যুগে যুগে তুমি এসেছ যে লীলাময়,
ন্যায়ের দণ্ড বহি চির-নির্ভয়;
তুমি মরতা নিয়েই অমরতা লভি, অমৃতের সন্ধান
বারে বারে প্রভু করেছ দান।

জানি যুগে যুগে আসিবে দর্পহারী,
সৃষ্টির-ভরা পাপে হয়ে এলে ভারী—
মন্দুরা-পূত মন্দির সে তো পরশে তোমার জ্যোতির্ময়—
লীলাভূমি তব তীর্থ হয়।

বাংলা নাটক-প্রসঙ্গ

রথীন্দ্রনাথ রায়

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নাট্য-সাহিত্যই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী সমস্যাসঙ্কুল অংশ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয়, এমন কি চতুর্থ দর্শক পর্যন্তও, নানা বিপর্যয় ও রূপান্তর সত্ত্বেও বাংলা নাটকের মূল প্রবাহটি খুব বেশী শীর্ণ হয় নি। রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালের শেষ দিক থেকেই বাংলা নাট্যধারা মন্দগতি হলেও, একেবারে মরু-বালুকার নীরস অন্তঃপুরে তার ক্রমবিলীয়মান ধারা হারিয়ে ফেলে নি। কিন্তু সাংস্কৃতিক জগতের নানা দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সৃষ্টিমুখর গৌরব-দীপ্ত অধ্যায়টি আজ আর নেই। নূতন নাটক রচনার তেমন প্রয়াস নেই, উদ্দীপনার স্রোতে ভাটা পড়েছে, আর রঙ্গমঞ্চগুলিও অর্থানুকূল্য ও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ক্রমশঃ হতশ্রী হয়ে পড়ছে। বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের এই শোচনীয় দুর্দশা যে-কোনও সংস্কৃতিবান মানুষের কাছেই আজ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। জাতীয় জীবনের সঙ্গে নাটকের একটি প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে। এ ক্ষেত্রে নাটকের এই ক্রমাবনতি অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ।

অথচ, চিরকাল এমন ছিল না। সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক—নানা শ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে নাটকের একটি গভীর যোগ ছিল। বাঙালী-মনের বিবিধ ভাব-বিপ্লবকে নাটক মূর্ত করে তুলেছিল। সৃষ্টির প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও জনপ্রিয়তাও ছিল বিস্ময়কর। নাটক শুধু স্থূলত্ত প্রচারধর্ম বা আর্টচর্চার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না, অন্তর্ভেদী জীবন-সমালোচনারও একটি প্রথম শ্রেণীর মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলন, নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ, ধর্মীয় সংঘাত, নব হিন্দুধর্মের অভ্যুত্থান প্রভৃতি নিয়ে নাটক ও প্রহসন রচিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের এক বিধবা-বিবাহ নিয়েই বহু নাটক, প্রহসন ও সামাজিক নক্শা-নাটক রচিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেও বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদ-দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে আরম্ভ করে অনেকেই জাতীয়-ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। তখনকার কালের রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে এই সমস্ত নাটকের মূল্য কম ছিল না। প্রকৃত পক্ষে ত্রিশের পর থেকেই বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যায়। যদিও রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টি তখনও অব্যাহতভাবেই চলেছে, তবু নাটকের এই দৈন্য ক্রমশঃ সুপ্রকট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের উত্তরপর্বের নাটকগুলির আস্বাদন স্বতন্ত্র ধরনের। গভীর ভাবসত্য, সঙ্গীতবহুলতা ও সংলাপের ঐশ্বর্য তাঁর নাটকগুলিকে শিল্পোৎকর্ষের চূড়ান্ত সীমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটাতে পারে নি। কারণ সাধারণ দর্শকদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকের রসগ্রহণ করা সম্ভবও ছিল না। তা ছাড়া উনিশ শতকীয় বাংলা নাটকের মধ্যে যে সমস্ত অতি-নাটকীয় উপাদান ও অতিরঞ্জনের আতিশয্য ছিল, তাও অনেক সময় সাধারণ দর্শককে পরিতৃপ্ত করেছে। গিরিশচন্দ্রের বহুখ্যাত সামাজিক নাটকগুলিও এই মানসিকতা থেকে মুক্ত নয়। উত্তরপর্বের রবীন্দ্র-নাটকের যে ভাবস্থির প্রশান্তি ও শান্তমধুর রসাবেশ, তা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের দাবি কোনকালেই মেটাতে পারে নি। নূতন কালের নাট্যকারেরা জীবনের ও সমাজের নূতন সমস্যার ওপরে আলোকপাত করেছেন, কিন্তু ক্ষণিকের জন্য উন্মাদনার সৃষ্টি করলেও, তাঁরাও নাটকের শীর্ণপ্রায় ধারাটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন নি। বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এই দৈন্যের কারণ কী? বিশেষ কোনও একটি বিষয়কেই কারণ হিসেবে নির্দেশ করা যায় না। নাট্যকার-দর্শক-পরিচালক-অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি পরস্পরের কাঁধে দোষারোপ করেন, তা হলেও এর কারণ নির্ণীত হবে না। নাটক যৌথ শিল্প, সুতরাং সার্থকতা ও ব্যর্থতার কারণও যৌথ।

এক দল সমালোচক মনে করেন যে, এ যুগ ঠিক নাটক-রচনার পক্ষে অনুকূল নয়। অবশ্য তাঁরা পৃথিবীর ইতিহাসের নাটক-রচনার চূড়ান্ত কালকেই পর্যবেক্ষণ করে এই মন্তব্য করেছেন। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

"নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, সকল যুগে ও দেশে নাটকের উৎকর্ষ জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ অবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত থাকে। পেরিক্লিসের যুগে গ্রীক নাটক, চতুর্দশ লুইয়ের যুগের ফরাসী নাটক ও এলিজাবেথের যুগের ইংরাজী নাটক সকলেই জাতীয় জীবনের উন্নতি ও উন্মাদনার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। নাটক যেন উন্নতিশীল, বীরত্বমণ্ডিত, গৌরবময় জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক সাহিত্যিক অভিব্যক্তি। আবার ইহাও দেখা গিয়াছে যে, জাতির যৌবনের দৃপ্ত তেজ ও উন্মাদনা কাটিয়া গেল, চিন্তাশীলতা ও দার্শনিক তত্ত্বানুশীলতা জাতীয় জীবনকে অধিকার করিলে নাট্যসাহিত্যের উৎস সেখানে শুকাইয়া যায়। ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগে অনেক প্রতিভাবান কবি নাটক লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অতুলনীয় কবি-প্রতিভা নাটককে ঠিক জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, নাটকের মূল রহস্যটি তাঁহাদের নিকট ধরা দেয় নাই।"[১]

বিশ্ব-নাট্যসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচকের এই বিচার প্রণিধানযোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের দৈন্য আলোচনা-প্রসঙ্গে এই মন্তব্যটিকেও যথেষ্ট বলে মনে হয় না। তার কারণ গ্রীক নাটক, এলিজাবেথীয় নাটক কিংবা সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাটক পৃথিবীর নাট্যরচনার ইতিহাসে তিনটি সর্বোত্তম অধ্যায়। বাংলা নাটকে কোনদিনই সেই অভ্রভেদী সমুন্নতির যুগ আসে নি—এমন কি গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত বাংলা নাটকের সর্বাপেক্ষা সৃষ্টিশীল অধ্যায়েও না। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় পরাধীনতাও ছিল আত্মপ্রকাশের এক দুস্তর বাধা। গত কুড়ি-পঁচিশ বছরের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য নাট্য-প্রচেষ্টা দেখা যায় না। সুতরাং নাট্যরচনার সর্বোত্তম সিদ্ধির কার্য-কারণ সম্পর্কগুলি সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়। গিরিশচন্দ্র এমন কি দ্বিজেন্দ্রলালের কালেও যে নাট্যধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত হয়েছে, সে প্রবাহ কোন্ মরুভূমির রিক্ততার মধ্যে অন্তর্হিত হল, এবং কেন ?

২

বাংলা দেশের সমাজ-জীবনের দ্রুতগতি পরিবর্তন এর একটি প্রধান কারণ। আমোদ-প্রমোদ ও অবসর-বিনোদনের মাধ্যম বর্তমানকালে অনেক বেশী বেড়েছে। বর্তমানকালে জনচিত্তরঞ্জনের নানা উপায় ও পদ্ধতি হয়েছে। চলচ্চিত্রের ক্রমপ্রসারণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার 'বিচিত্রানুষ্ঠান', নৃত্য-গীতসম্বলিত বহু বিচিত্র উৎসব-অনুষ্ঠান জনচিত্তকে অবসর-বিনোদনের সুযোগ দিয়েছে। স্বল্পব্যয়ে দর্শক ও শ্রোতারা এই সমস্ত অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাঁদের আনন্দ পরিতৃপ্ত করে থাকেন। বর্তমান জগতের আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপায় সিনেমা। শুধু কলকাতা নয়, মফস্বল-শহর, এমন কি সুদূর পল্লী-অঞ্চল পর্যন্ত সিনেমার সর্বগ্রাসী প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। অবশ্য সিনেমা-প্রীতির মূলে একটি অর্থনৈতিক কারণও বিদ্যমান। সিনেমার তুলনায় থিয়েটার দেখা অনেক বেশী ব্যয়সাধ্য। উচ্চতর মূল্যের টিকিট কিনে থিয়েটার দেখার চেয়ে অনেক কম মূল্যে সিনেমা দেখা যায়। থিয়েটার কায়া, সিনেমা ছায়া। কায়ার চেয়ে ছায়ার রহস্য মানুষকে অনেক বেশী রোমাঞ্চিত করে। সিনেমা যন্ত্রচালিত—তাই যন্ত্রের সাহায্যে যে-জাতীয় উপকরণ পরিবেষণ করা যায়, রঙ্গমঞ্চে তা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। অবশ্য আধুনিক রুচি ও সিনেমার প্রভাবের ফলে রঙ্গমঞ্চগুলির ব্যবস্থাপনায় কিছু পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু যন্ত্রজীবিত ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সিনেমার সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। আজকাল থিয়েটারের মধ্যেও কিছু কিছু সিনেমার টেকনিক এসে পড়েছে, তবু সিনেমার সর্বপ্রকার কলাকৌশল থিয়েটারে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, সিনেমার আসল রূপ আলোক-চিত্রণের ওপরে অনেকখানি নির্ভরশীল। আলোক-চিত্রণের এমন একটি মায়াশক্তি আছে, যা দর্শকদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কিন্তু শিল্পীর আত্মপ্রসাদ সিনেমার চেয়ে

---

১ রবীন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্য : বাংলাসাহিত্যের কথা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

থিয়েটারে অনেক বেশী। সিনেমায় নানা যান্ত্রিক উপকরণ ও ব্যবস্থা অভিনয়ের ত্রুটিকেও ঢেকে দিতে পারে। রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-নির্ভর সিনেমার আকর্ষণ ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। থিয়েটার আজ আর তেমন পৃষ্ঠপোষকতা পায় না।

এখানে লেখকদের সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য আছে। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাট্য-সাহিত্যের উন্নতি-অধোগতির ইতিহাস বিশেষভাবে জড়িত। চারদিকের এই শৈথিল্য ও বিমুখতার জন্য ভাল নাটক রচনার দিকে তেমন ঝোঁকও নেই। বর্তমানকালের শক্তিশালী লেখকেরা উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার দিকেই প্রধানতঃ তাঁদের প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রেখেছেন। প্রথম শ্রেণীর শক্তিশালী লেখকদের মধ্যে নাট্যকার নেই। শরৎচন্দ্রের কাল থেকেই এই ধারা চলে আসছে। অবশ্য কোন কোন শক্তিশালী লেখক নাটক লেখেন নি, এমন নয়; কিন্তু তাঁদের নাটক-রচনার 'অংশকালীন লেখক' বলা যায়। শরৎচন্দ্রের নাটক সম্পর্কেও ঠিক এই কথাই বলা যায়। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ 'অংশকালীন' নাট্যকার ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের সময়ের অধিকাংশ অংশই নাটকরচনায় নিয়োগ করেছেন।

কিন্তু এর জন্য লেখকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। রঙ্গমঞ্চের তাগিদেই এক সময় নাটক রচিত হয়েছে। বাস্তবিকপক্ষে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হলে নাটক রচনা করা কতকটা ব্যর্থ শ্রমমাত্র। নাটক যে যুগে সবচেয়ে বেশী হয়েছে সে যুগে রঙ্গালয়ের দিক থেকে নাটকের একটি চাহিদা ছিল। নাটকের চাহিদা হয়েছে, কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী নাটক নেই। গিরিশচন্দ্রের মত যশস্বী নাট্যকারও অভিনয়োপযোগী নাটকের অভাবে নাটক রচনা করেন।[২] বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের পটভূমিকায় জাতীয়-ভাবোদ্দীপক ঐতিহাসিক নাটকের একটি চাহিদা ছিল—তাই দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ তখন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু দিন-কাল পরিবর্তিত হয়েছে। নাটক লিখলে তাকে মঞ্চস্থ করা কঠিন। মঞ্চের পোষকতা না পেলে, কতদিন আর নাটক লেখার উদ্যম থাকে! নাটকরচনার এই বাধা-বিপত্তি দেখেই অনেক তরুণ নাট্যকার-যশোলিপ্সুর উদ্যম অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষ ও পরিচালকদের দায়িত্বও কম নয়। ব্যবসায়-বুদ্ধিকৈবল্যের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তাঁরা নাটক নির্বাচিত করেন। অবশ্য অর্থাগমের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু তাকেই যেন একালে সর্বস্ব করে তোলা হয়েছে। ব্যবসায়-বুদ্ধি ছাড়াও যে একটি আদর্শের দিক আছে, সে কথা তাঁরা মনে রাখেন না। সুলভ অর্থাগমের পথের দিকে নজর রাখলে নাট্যশিল্পের সমুন্নতি কোনদিনই হবে না। রঙ্গমঞ্চ অপেক্ষা সিনেমায় নিশ্চিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক বেশী, এইজন্য ধনীর পৃষ্ঠপোষকতাও সিনেমার দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। ফলে রঙ্গমঞ্চের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃই অন্ধকারময় হয়ে উঠেছে।

অনেকে নাটকের এই দুর্গতির জন্য দর্শকসাধারণের রুচিকে দোষ দিয়ে থাকেন। যখন দেখা যায় মারামারি, খুন-জখম, অদ্ভুত-উদ্ভট ঘটনা নিয়ে রঙ্গমঞ্চ গরম করে তোলা হচ্ছে—দর্শকের ভিড়ও কম নয়, তখন দর্শক-সাধারণের রুচিবোধকে খুব প্রশংসা করা যায় না। উনিশ-শতকীয় উদ্ভট কাহিনীর মোহ এখনও দূর হয় নি। এখনও যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে এই-জাতীয় নাটক সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়, তার জন্য দায়ী দর্শকের রুচি। একটু সূক্ষ্ম সংঘাত, কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত জীবন-সমালোচনা যে সমস্ত নাটকে থাকে তার সম্পর্কেই শোনা যায়: 'মশাই, এ নাটক কি দর্শকে নেবে!' তাই আজও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে পুরনো দিনের জনপ্রিয় নাটকগুলিকেই একাধিকবার অভিনীত হতে দেখা যায়। দর্শকদের পক্ষে এ বিষয় নিশ্চয়ই প্রগতিশীলতার পরিচয় দেয় না। যেখানেই মননশীলতার বা বুদ্ধিবৃত্তির স্পর্শ থাকে, তাকেই যেন আমরা এড়িয়ে চলেছি। এমন কি সমকালীন সমাজ-জীবনের সূক্ষ্মতর ঘাত-প্রতিঘাতগুলিও যেন দর্শকদের তেমন সমর্থন পায় না। দেশে শিক্ষার প্রসার হচ্ছে—কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চগুলির অধিকাংশ অনুষ্ঠান-সূচী দেখলে

২ '...গিরিশ ভাবিলেন একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও অকাতর শ্রম ব্যতীত অবনতির অন্ধকূপে পতিত ব্যবসায়কে পুনরায় উন্নতির সোপানে আরূঢ় করা অসম্ভব। নাটক লিখিতে হইবে, কেন না রঙ্গালয়ে অভিনয়ের উপযোগী পুস্তকের জন্য বার বার বিজ্ঞাপন দিয়াও বাহির হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না।'—গিরিশ-প্রতিভা, পৃষ্ঠা ৩৬ : হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।

মনে হয় যে, আমরা যেন সেই গিরিশচন্দ্রের যুগেই পড়ে আছি!

৩

বাংলা নাটকের দৈন্য ও রঙ্গমঞ্চের শ্রী-হীনতা সত্ত্বেও কয়েকজন নাট্যকার একালের উপযোগী করে নূতন টেকনিকে নাটক রচনা করেছেন। বিস্তৃত মঞ্চনির্দেশিকার মাধ্যমে নাট্যকার অভিনেতাদের সুবিধা করে দিয়েছেন। মন্মথ রায়ের পৌরাণিক নাটকগুলি বাংলা পৌরাণিক নাটকের ইতিহাসে নূতন সুর-সংযোজন করেছে। পুরাণের ভক্তিভাব-বিহ্বলতা ও আধ্যাত্মিকতার স্থানে তিনি এক বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। পৌরাণিক চরিত্রগুলির মধ্যে আধুনিক জীবনসুলভ বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেছেন। পুরাণের প্রচলিত নৈতিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা স্বীকার না করে তিনি অনেক সময় আধুনিক যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করেছেন। শচীন সেনগুপ্ত ও মহেন্দ্র গুপ্ত ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষীণধারাটিকে লালন করেছেন। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় এখনও দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি।

সাম্প্রতিক বাংলা নাট্যধারায় সামাজিক নাটকেরই প্রাধান্য। আধ্যাত্মিকতা ও ভক্তিভাবের ক্রমবিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক নাটকও বিলোপের পথে চলেছে। ইংরেজ চলে যাওয়ার পর ঐতিহাসিক নাটকগুলির আবেদনও কমে এসেছে। অবশ্য ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টির সম্ভাবনাও আছে—দেশ-বিদেশের সাম্প্রতিক নাট্যধারার আলোচনা করলে নূতন ধরনের ঐতিহাসিক নাটকের স্বরূপ ও সম্ভাবনা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রে ঠিক এ কথা বলা যায় না। আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজজীবনের নানা জটিল সমস্যা সামাজিক নাটককে নূতন পথে পরিচালিত করেছে। এই দিক দিয়ে বিধায়ক ভট্টাচার্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। 'মাটির ঘর'কে সাম্প্রতিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক বলা যায়। তিন ভগ্নীর জীবন-সমস্যার ট্র্যাজিক অভিব্যক্তি এ যুগের সমাজজীবনের একটি নির্মম ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত করেছে। প্রবীণ নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সামাজিক নাটকগুলির মধ্যে রোমান্স রস আছে। নাটকীয় সংলাপ রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। 'তটিনীর বিচার' নাটকটিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক বলা যায়।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যরচনায় হাত দিয়েছেন। ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর অনেক বড়, তথাপি নাট্যকার তারাশঙ্করের ভূমিকাটিও অশ্রদ্ধেয় নয়। তাঁর বহুখ্যাত নাটক 'দুই পুরুষ' অসাধারণ মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু নাটকের মূলগত অভিপ্রায়কে অতিক্রম করে সুশোভন চরিত্রটি প্রাধান্য লাভ করেছে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে গভীর জীবনদর্শন ও বেদনা-রসিকতার দিক থেকে এই চরিত্রটি তুলনাহীন। 'কালিন্দী' তাঁর ওই নামীয় উপন্যাসেরই নাট্যরূপ। উপন্যাসের 'এপিক' প্রসারতা ও চারিত্রিক সংঘাত নাটকের মধ্যে তেমন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। 'পথের ডাক' নাটককে সমস্যামূলক নাটক বলা যায়, এখানে আধুনিক যুগের সমাজ-সমস্যার বহুধা-বিভক্ত রূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে।

আধুনিক যুগের কয়েকজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক নাটকের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করেছেন। কথাসাহিত্যিক "বনফুল" টেকনিক রচনায় অদ্বিতীয় শিল্পী। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর টেকনিক-চাতুর্য সর্বাধিক জয়যুক্ত হয়েছে। সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের ইতিহাসে নূতন ধরনের চরিত-নাটক রচনা করে তিনি বাংলা নাটকের পরিধি বিস্তার করেছেন। নূতন টেকনিকে লেখা 'শ্রীমধুসূদন' ও 'বিদ্যাসাগর' নাটকদ্বয়ে তাঁর প্রতিভার মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। উনিশ শতকের বিচিত্র ভাবাশ্রয়ী সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় নাট্যকার মানুষ-মধুসূদন ও মানুষ-বিদ্যাসাগরকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'রামমোহন' নাটকের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের চরিত-নাটকের ধারাটিকে সমৃদ্ধতর করেছেন। এই দুজন শক্তিমান শিল্পীর পথ অনুসরণ করে এ যুগে আরও কয়েকটি চরিত-নাটক লেখা হয়েছে।

কথাসাহিত্যিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোজীবনের স্বরূপটি তাঁর নাটকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিটোল গল্পরস, ঐতিহাসিক রোমান্স, রহস্য-সুনিবিড় পরিবেশ ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল কৌতুকরস শরদিন্দুর উপন্যাস ও

গল্পগুলির প্রাণ। তাঁর 'বন্ধু,' 'ডিটেকটিভ' প্রভৃতি নাটকের মধ্যেও রোমান্সের মাধুর্য ও স্বতস্ফূর্ত কৌতুকরস বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এ যুগের আর একজন শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক নাটক রচনায় প্রায় সমভাবেই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, ইনি হলেন মনোজ বসু। দক্ষিণ বাংলার নদীমাতৃক জনপদজীবনের তিনি দরদী রূপকার। বাংলা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনগুলি তাঁর লেখনীমুখে সত্য হয়ে উঠেছে। সমাজ-জীবনের নানা অসঙ্গতিকেও তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর 'প্লাবন' নাটকের প্লাবন শুধু বহিরাশ্রয়ীই নয়, সামাজিক প্লাবনও বটে, আধুনিক কালের সামাজিক ও পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনী। 'নূতন প্রভাত' আশাবাদী নাট্যকারের প্রাগ্রসর দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। 'বিপর্যয়' নাটককে সমাজজীবনের ট্র্যাজেডি বলা যায়। 'রাখিবন্ধন' নাটকে মনোজ বসুর কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের বিষয়বস্তুকেই রূপ দেওয়া হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শবাদ ১৯৪৭-এ কেমন শোচনীয় পরিণতি লাভ করেছিল তার চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে।

সাম্প্রতিক কালের নাট্য-সাহিত্যে প্রহসন, কমেডি কিংবা বিদ্রূপাত্মক নাটকের সংখ্যা-স্বল্পতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যধারার ইতিহাসে প্রহসন, কমেডি ও সামাজিক ব্যঙ্গবিদ্রূপমূলক নাটক একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল প্রভৃতি খ্যাত-কীর্তি নাট্যকারেরা নাটকের এই ধারাটিকে পুষ্ট করে-ছিলেন। একালে বিদ্রূপাত্মক নাটক রচনায় প্রমথনাথ বিশী সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাক্-চাতুর্যে ও শ্লেষ-বিদ্রূপপ্রয়োগে তিনি নিপুণ শিল্পী। সংলাপ-রচনায় তিনি যে বুদ্ধিদীপ্ত ও মার্জিত সূক্ষ্ম শ্লেষ-চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বাংলা নাটকের ইতিহাসে মূল্যবান সংযোজন। দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত বাঙালী নাট্যকারেরা হাস্যরসাত্মক নাটক রচনায় অনেক ক্ষেত্রে মোলিয়েরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। প্রমথনাথ সেই পরিত্যক্ত সূত্রটি নিয়ে নূতন করে মোলিয়ের-ধর্মী হাস্যরসকে পরিবেষণ করার চেষ্টা করেছেন।

জলধর চট্টোপাধ্যায়ের দুখানি নাটক রঙ্গমঞ্চে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল—নাটক দুটি হল 'রীতিমত নাটক' ও 'পি-W-ডি'। নাট্যশিল্পের দিক দিয়ে দুটি নাটকেই অনেক অসঙ্গতি আছে—বহিরাশ্রয়ী উত্তেজনা ও ঘটনাপ্রাধান্য যেন নাটক দুটিকে ভারাক্রান্ত করেছে। কিন্তু সুদক্ষ অভিনয়গুণে দুটি নাটকই অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অর্ধোন্মাদ অধ্যাপক দিগম্বর মজুমদারের ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অভিনয় প্রথমোক্ত নাটকটিকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। অয়স্কান্ত বক্সীর 'ভোলা মাস্টার' নাটকটিরও নাট্যমূল্য খুব বেশী নয়, কিন্তু সুদক্ষ অভিনয়গুণেই অসাধারণ মঞ্চ-সাফল্য লাভ করেছে।

৪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর কালের নাট্য-সাহিত্যের ধারা আলোচনা করলে দেখা যায় যে, নাটকের ধারা একেবারে ক্ষীণতম সৃষ্টির পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সামাজিক জীবনের মর্মান্তিক পরিবর্তনগুলি কথাসাহিত্যের দর্পণে ছায়াপাত করেছে, কিন্তু নাটক রচনায় যেন তেমন ভাবে প্রতিফলিত হয় নি। কয়েক জন নাট্যকারের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় ও কয়েকটি ছোটখাট নাট্য-প্রতিষ্ঠানের ঐকান্তিক উদ্যমে নাটকরচনার ক্ষীণ ধারাটি কোনক্রমে সক্রিয় আছে। অবশ্য নাটকগুলি প্রধানতঃ এ যুগের সামাজিক সমস্যার ওপরে ভিত্তি করেই লেখা। গণতান্ত্রিক দৃষ্টির অধিকতর সম্প্রসারণের ফলে নাটকগুলির মধ্যে নূতন ধরনের গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এই নূতন ধারার নাট্যকারদের মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক আন্দোলন, মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সমস্যা, দেশ-বিভাগের পর পাকিস্তানের হিন্দুদের দুরবস্থা প্রভৃতি রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলিকে তিনি নিপুণ বিশ্লেষণ ও গভীর সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তুলসী লাহিড়ীর নাটকগুলিতেও শোষণধর্মী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিকৃত রূপকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের দুঃখ-দৈন্যের অর্থনৈতিক কারণগুলিকেও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন।

সাম্প্রতিককালে কয়েকটি নাট্যসম্প্রদায় তাঁদের নূতন

সৃষ্টির ভেতর বাংলার নাট্য-আন্দোলনকে সজীব করে রেখেছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় গণনাট্য-সঙ্ঘের প্রচেষ্টা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' যুদ্ধোত্তর যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাটক। 'বহুরূপী' সম্প্রদায়েরও কয়েকখানি নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই শ্রেণীর নাটক উপকরণ ও মঞ্চসজ্জার দিক থেকে যতদূর সম্ভব সরল ও সহজ—বাস্তব জীবনের সঙ্গে যতদূর সম্ভব এক করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। কংগ্রেস-সাহিত্য-সঙ্ঘের নৃত্যগীত-সম্বলিত নাটক 'অভ্যুদয়' এক সময় ভারতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসকে রূপায়িত করেছিল। নবনাট্য-আন্দোলনের মধ্যে 'লিটল থিয়েটার' ও 'ক্রান্তিশিল্পী সঙ্ঘে'রও একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কিন্তু এই আন্দোলন ছোট এক-একটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে ওঠার জন্য একটি সার্বজনীন আন্দোলনের সৃষ্টি করতে পারে নি।

নাট্যসাহিত্য জাতীয় জীবনের এক মহাসম্পদ। একে উন্নত করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলেরই। সরকার, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশক, অভিনেতা, নাটকের প্রযোজক, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ প্রত্যেককেই সম্মিলিত ভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। পরস্পরকে দোষারোপ করে কোন কাজই সিদ্ধ হবে না। জাতীয় নাট্যশালা ও স্টুডিওর প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী ও প্রযোজকদের উৎসাহিত করতে হলে তাদের উপযুক্ত সম্মান ও পুরস্কার দিতে হবে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীত-একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু তার ক্ষেত্রকে আরও প্রশস্ত করতে হবে। এর সঙ্গে নাট্য-সমালোচনা ও নাট্যতত্ত্বের গবেষণাকেও সংযুক্ত করতে হবে।

মঞ্চেরও কিছু আভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রয়োজন। নাটকও যে সাহিত্য-সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ, এই বোধ আবার নূতন করে জাগিয়ে তুলতে হবে। অনেকে মনে করেন নাটকের উপাদান বর্তমান যুগে নিঃশেষিত হয়েছে, এই উপাদান-দৈন্যই নূতন নাটক সৃষ্টির পক্ষে বাধার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু অভিযোগটি সম্পূর্ণ অমূলক বলে মনে হয়। সমাজ-জীবন দ্রুতগতিতে বিবর্তনের পথে চলেছে। জীবনের মধ্যেও নূতন জিজ্ঞাসা আসছে। অতীতের জীবন-সমস্যা আর বর্তমান কালের জীবন-সমস্যা ঠিক এক নয়। কিন্তু তীব্র আলোড়ন ও তুমুল হৃদয়াবেগকে এখন অন্যপথে রূপ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, শেক্সপীয়রের মত অনন্যসাধারণ নাট্যপ্রতিভার আবির্ভাব সত্ত্বেও পশ্চিমী নাট্যসাহিত্যের বিচিত্র ধারা থেমে থাকে নি। জীবনের মৌলিকদ্বন্দ্বের ক্ষেত্র কোনদিনই নিঃশেষিত হবে না। গ্রীকপুরাণবর্ণিত ফিংক্স্ পাখির মত পুরাতন কলেবর থেকে নূতন সমস্যা ও জিজ্ঞাসার উদ্ভব হবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবন বা ভাব-জীবনের মধ্যে এমন অনেক সূক্ষ্ম বিষয় আছে, যা নাটকে রূপায়িত হয় নি। আধুনিক নাটক সেই সূক্ষ্ম জগতের মধ্যে প্রবেশ করবে। আধুনিক নাটকের ট্র্যাজেডিও তেমনি সূক্ষ্মতর হয়ে উঠবে। বিখ্যাত নাট্যসমালোচক মনে করেন যে নাটকে bold effect-এর প্রয়োজন, তাই উপন্যাস-গল্পে যে সূক্ষ্মতা ফোটানো যায় নাটকে তা সম্ভব নয়।[৩] কিন্তু এ কথাও ঠিক যে আধুনিক নাটকের মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম ঘাত-প্রতিঘাত, এমন কি ভাবাত্মক জীবনের গভীরতা পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। ইবসেনের সমসাময়িক কথা-সাহিত্যিকেরা বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতায় ও সাঙ্কেতিকতায় তাঁর নাটককে খুব বেশী অতিক্রম করেছেন বলে মনে হয় না।

আধুনিক ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে বাহ্য আড়ম্বর তুলে দেওয়ার দিকে একটি ঝোঁক এসেছে। আমাদের জাতীয়-নাটককে জয়যুক্ত করতে হলেও ব্যয়সাধ্য বাহ্য আড়ম্বর বর্জন করতে হবে। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

"জাতীয় নাট্যশালার নাম দিয়ে যদি কোন নাট্যশালা গড়ে তোলা হয় পশ্চিমের অনুকরণে, তা ব্যয়বহুল আড়ম্বর প্রদর্শনের স্থান ছাড়া আর কিছুই হবে না। আজ যখন পশ্চিমে চেষ্টা হচ্ছে Picture-frame stage তুলে দেবার, তখন আমরাই বা আমাদের যাত্রার আসরে নাট্যকে স্থান দেব না কেন? যাত্রাকে নূতন করে কালোপযোগী করে গড়ে তুলব না কেন?"[৪]

নাট্যাচার্যের এই মন্তব্যটিকেও বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে—পুরাতন যাত্রাকে নূতনভাবে উজ্জীবিত করা যায় কি না। নাটকের এই সাময়িক নির্জীবতাকে কাটাতে হবে—সংস্কৃতিবান বাঙালীদের নিকট আজ এই প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। জড়ত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা নাটক নূতন প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠুক, এই আমাদের আন্তরিক প্রত্যাশা।

৩ 'The theatre will always be compelled to subsist on bold effects; always will the stage call for physical action; the characters, whatever subtlety be introduced, must always be delineated in a manner alien to that which has created such a revolution in the modern novel.'

—The English Theatre : A. Nicoll. Page 194

৪ দেবকুমার বসু সম্পাদিত 'বাংলা নাটক' গ্রন্থের "নাট্যের রূপ" প্রবন্ধ : শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

তিন বছরের বাংলা কবিতা

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

বর্তমানের ভূমিতে বিচরণ করা বিপজ্জনক—এ কথা সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করেন। বর্তমানের চেহারাটা অতি-নৈকট্যের ফলে আমাদের কাছে যথার্থ রূপে দেখা দেয় না। নিরাসক্ত দৃষ্টিতে বর্তমানের বিচার অসম্ভব। তাই গত তিন বছরের (১৩৬২ থেকে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) বাংলা কবিতার পর্যালোচনা করতে দ্বিধা বোধ করছি। এই তিন বছরে কবিতার প্রবহমাণ ধারাটিকে নতুন ও পুরনো কবিরা পুষ্ট করে তুলেছেন এবং কারুর সাধনাই মূল্যহীন নয়। একটি স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে সকল কবির স্বতন্ত্র বিচার সম্ভব নয় এবং তাতে অমর্যাদা হবার আশঙ্কা বেশী। তাই গত তিন বছরের বাংলা কবিতার যে কটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ধারা অনুরাগী কাব্যপাঠকের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, মাত্র তারই সিংহাবলোকন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৩৬২, ৬৩, ৬৪ সাল—এই তিন বছরে যাঁদের কবিতার বই বেরিয়েছে এবং যাঁদের বই বেরোয় নি, তাঁদের সবার কথাই মনে রেখে এ আলোচনার সূত্রপাত। এই তিন বছরে যে কটি কবিতার পত্রিকা আমাদের চোখে পড়েছে সেগুলি হল 'কবিতা' (বুদ্ধদেব বসু), 'একক' (শুদ্ধসত্ত্ব বসু), 'কৃত্তিবাস' (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়), 'পূর্বমেঘ' (তারাপদ রায়), 'অধুনা' (শক্তিব্রত ঘোষ)। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রথম দুটি ছাড়া বাকিগুলি অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিদের দ্বারা প্রকাশিত ও পরিচালিত। এটি নিঃসন্দেহে শুভ লক্ষণ। গত তিন বছরে কলকাতা ও মফস্বলে বহু কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ও হচ্ছে। সেগুলিতে যোগদানকারী কবি ও শ্রোতার সংখ্যাও উৎসাহপ্রদ।

এই তিন বছরে যাঁদের কবিতার বই বেরিয়েছে তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: গোবিন্দ চক্রবর্তী (অরণ্যমর্মর), মণীন্দ্র রায় (কৃষ্ণচূড়া), রামেন্দ্র দেশমুখ্য (জনসমুদ্র), পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য (তৃতীয় নয়ন), দিলীপ রায় (দুই আর দুই), ফণিভূষণ আচার্য (ধূলিমুঠি সোনা), অরুণাচল বসু (পলাশের কাল), গোপাল ভৌমিক (বসন্তবাহার), কৃষ্ণ ধর (যখন প্রথম ধরেছে কলি), রাম বসু (যখন যন্ত্রণা, দৃশ্যের দর্পণে), অমলেন্দু গুহ (লুইত পারের গাথা), সুকুমার রায় (সেই কন্যাকে), মানবেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (একান্তর), শঙ্খ ঘোষ (দিনগুলি রাতগুলি), সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত (দূরান্তিক), বটকৃষ্ণ দে (মনোগন্ধা), বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (লখিন্দর), রাজলক্ষ্মী দেবী (হেমন্তের দিন), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (একা এবং কয়েকজন), দিলীপ দত্ত (চীনে কবিতা), প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত (এক ঋতু), শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় (অজ্ঞাতবাস), শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (সোনার হরিণ), কুমারেশ ঘোষ (নতুন মিছিল), শান্তি পাল (ঝড় ও ঝুমঝুমি) বিশ্বনাথ চক্রবর্তী (উছল সবুজ), শিবদাস চক্রবর্তী (শূন্যপ্রান্তরের গান), সমর সোম (যাদুকরী), এবং নেতৃস্থানীয় কবিদের মধ্যে নাম করতে পারি, অরুণ মিত্র (উৎসের দিকে), বিষ্ণু দে (শ্রেষ্ঠ কবিতা), অমিয় চক্রবর্তী (পালা বদল), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (দশমী), প্রেমেন্দ্র মিত্র (সাগর থেকে ফেরা), জীবনানন্দ দাশ (রূপসী বাংলা), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (শ্রেষ্ঠ কবিতা), সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা)। কেবল এঁরাই নন, আরও আছেন: বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, সজনীকান্ত দাস, প্রমথনাথ বিশী, কালিদাস রায়, অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র সিংহ, অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন দে, বাণী রায়, উমা দেবী, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, প্রভাকর মাঝি, সুশীল রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, আলোক সরকার, অরুণকুমার সরকার, অরুণ সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, দীপংকর দাশগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, দুর্গাদাস সরকার, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, কল্যাণ-কুমার দাশগুপ্ত, শিশিরকুমার দাশ, আনন্দ বাগচি, শক্তিব্রত ঘোষ, অম্বুজ বসু, অসিতকুমার, পঞ্চানন বিশ্বাস, অশোক-

বিজয় রাহা, নরেশ গুহ, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জিত সিংহ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্ত সিংহ, অরুণ ভট্টাচার্য, সুনীলকুমার লাহিড়ী, সুনীল চট্টোপাধ্যায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দিনেশ দাস।

গত তিন বছরে চল্লিশটি কবিতাগ্রন্থ বেরিয়েছে এবং নবীন-প্রবীণ এক শো জন কবি বাংলা কবিতার ধারাকে পুষ্ট করেছেন। বাংলা কবিতা গত দশকের ঔদাসীন্য ও অনাদর কাটিয়ে উঠে আবার জননন্দিত হয়েছে এবং কবিরা পাঠকের আন্তরিক শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এহ বাহ্য। এখন বিচার্য, এই তিন বছরে বাংলা কবিতা কী রূপ নিয়েছে, কোন্ নতুন পথের সন্ধানে ফিরেছে, কোন্ অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা ও জীবনযন্ত্রণায় কবিরা পীড়িত হয়েছেন, কটি নতুন পথের দেখা পাওয়া গেছে? এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বর্তমানকালের পটভূমিকায় কবিতার গভীরে পৌঁছতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত পাঠক-হৃদয়েই তার উত্তর মেলে, সেখানে সমালোচকের ভূমিকা অবান্তর।

তবু গত তিন বছরের কবিতার চরিত্রগত পরিবর্তন ও গুণগত বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনায় একটি রূপরেখা অঙ্কনের প্রয়াসেই এই প্রবন্ধের সূচনা।

২

১৩৬২ থেকে ৬৪—এই তিন বছরের কবিতা পড়লে মনে হয়, বাংলা কবিতা আবার সুস্থতায়, স্বাভাবিকতায়, হৃদয়-বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করেছে। তৃতীয় ও চতুর্থ দশকের আঙ্গিকসর্বস্বতা, দুর্বোধ্যতা ও কষ্টকল্পিত মননশীলতার হাত থেকে বাংলা কবিতা মুক্তিলাভ করেছে, তা এই পর্বের কবিতা পাঠে বোঝা যায়। তত্ত্ব এবং ভঙ্গি, দুয়েতেই চাতুর্য তথা পাণ্ডিত্যের মিশাল দিয়ে অজস্র বিদেশী চিত্রকল্প ও উপমার মাধ্যমে একটি দুর্বোধ্য পরিবেশ সৃজনের সর্বনাশা নেশা থেকে আজকের কবিরা মুক্তি পেয়েছেন—এটি এই পর্বে স্পষ্ট হয়েছে। আবেগপ্রধান বিশুদ্ধ প্রেরণাধর্মী কবিতা, যা বিশ শতকের চতুর্থ দশকে নিন্দিত হয়েছিল, তা আবার সম্মানিত হয়েছে। এই আবেগধর্মিতা, সুস্থতা ও হৃদয়ানুভূতির প্রাধান্য যে ফিরে এসেছে, তা কেবল প্রবীণ কবিদের লেখায় দৃষ্ট হয় নি, নবীনদের কবিতায়ও তা দেখা গেছে। সুরেলা কণ্ঠে জীবনের সমস্ত আবেগকে প্রকাশ করার প্রবণতা আজ সামান্য লক্ষণে পরিণত হয়েছে। ঐতিহ্যবিরোধিতা ও রবীন্দ্রবিরোধিতা—দুয়েরই সমাপ্তি ঘটেছে; ব্যক্তিক অনুভূতি যে অগ্রাহ্য করার নয়, তা সাম্প্রতিক কবিরা মেনে নিয়েছেন।

এই প্রত্যাবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করি প্রবীণদের মধ্যে—বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে-র কবিতায়। এই মন্তব্যের সমর্থনে উপস্থিত করব—অমিয় চক্রবর্তীর 'ইয়ং কল্যাণী' ও 'সংলাপ' কবিতা দুটি (পালাবদল)। যে কবি-মন একদিন আন্তর্জাতিক হবার দুরন্ত সাধনায় মেতেছিল, সে কবি-মন আজ এ কথাই বলছে—

চেয়েছি আলোর ঘরে এই দিন
দাঁড়িয়ো সিঁড়িতে,—প্রীতা,
মাধুর্য সংসারে মঙ্গলিতা,
এই দিন।
সানাই নাই বা থাকে, রঙিন পত্রালি শোকধ্বনি,
জেরেনিয়মের সারি, নিচে রাস্তা, কার্নিসের
কোণে ঐ জেগে
নীলাক্ষী দিগন্তে ফুল-তোলা
নাইলন্ জরির পাড় মেঘে-মেঘে,
গুঞ্জনিত এরোপ্লেন দূরদেশী—
তোমার নতুন লগ্ন হোক।—
(ইয়ং কল্যাণী অজরা মর্তস্য অমৃতা গৃহে)

বাংলা কবিতায় যে পালা-বদল হচ্ছে, তার পরিচয় এখানেই পাই। এই পরিচয় আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যে। সেখানেও প্রত্যাবর্তনের সুরটি—অজানা থেকে পরিচিত গৃহাঙ্গনে, বিদেশী কাব্যজগতের মোহ থেকে আপন হৃদয়ানুভূতিতে প্রত্যাবর্তনের সুরটি নিঃসংশয়রূপে ধ্বনিত হয়েছে। এই কাব্যের সংহত দীপ্ত চরণনিচয়ের বাণী-লাবণ্য আমাদের এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছিয়ে দেয় যে, বাংলা কবিতার আঙ্গিক ও ছন্দ নিয়ে দিশাহারা পরীক্ষার দিন শেষ হয়েছে। কবি সমস্ত pretension ত্যাগ করে বলেছেন—

কোথাও প্রবাসী নই!
এ সমুদ্র, নারিকেল বন,

কবেকার ফেলে-আসা দুরাশার মত
আদিগন্ত পাল অগণন,
সব বুঝি আছে মনে,
শোণিত-স্মরণে।
স্বাদ নিতে আসি শুধু
ভান-করা নব পর্যটনে। ('স্মৃতি')

কবির অন্বিষ্ট এখন বাহিরে নয়, মনের গভীরে—

মত্ততা ছেড়ে মনের গভীরে এস না,
নেশা নয় থাক পরম পাওয়ার এষণা।
চারা পোঁতাটাই নয়ক আসল সত্য,
আছে কিনা দেখ হৃদয়ের আনুগত্য। ('সত্য')

এই 'হৃদয়ের আনুগত্য'ই আলোচ্য পর্বের কবিতার প্রধান লক্ষণ—এবং তা সুস্থ জীবনেরই লক্ষণ। আর এই সুস্থতার অনিবার্য পরিণতি প্রেমকবিতা। গত তিন বছরের হৃদয়-অনুভূতির প্রাধান্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকবিতার চর্চাও বেড়েছে। প্রবীণ কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যও গূঢ় মনন থেকে সরল হৃদয়াবেদনের ক্ষেত্রে পৌঁছেছেন; তার প্রমাণ পাই তাঁর 'জর্নাল' শীর্ষক কবিতাগুলিতে। যেমন, 'মধ্যদিনে' কবিতাটি—

ক্ষীণমধ্যা কে ছিল মৌমাছি
তা ভেবেই হয়তো এ প্রৌঢ় মনে আছি,
তবু কি ভুলতে পারি সেই ঝরা ফুলের পরাগ
এসেছিল যা মেখে সে গায়ে,
যা নিয়ে এ মনের বিনাশ
শুরু হবে গুণে গুণে প্রতি মুহূর্তের মৃত্যুশ্বাস।
জানি নে যে আছি কোন্ দায়ে—
কাকে দেয়া যায় তার কতটুকু ভাগ॥

(আনন্দবাজার বার্ষিক ১৩৬৪)

একটি প্রৌঢ় বিষণ্ণ অপরাহ্ণের হৃদয়বেদনার সুরে আপ্লুত এই কবিতা পালা-বদলের ইঙ্গিত দেয়। এমন কি, বিষ্ণু দে—যাঁর আনন্দ ছিল দুর্বোধ্যতায় ও স্বচ্ছন্দ বিহার ভিন্‌দেশী কাব্যলোকে—তিনিও এই হৃদয়াবেদনের ধারা-বর্ষণে স্নাত হয়েছেন, বলেছেন—

আমিও তো, শুধু চোখ নয়, সারা মনেপ্রাণে
মেঘের কাঙাল।
দগ্ধ মাটি হাহাকারে আমারও স্নায়ুতে আনে
মুমূর্ষু আকাল···
আমিও চেয়েছি অহর্নিশ ধারাজল।
তাই আজ দূর্বাদলশ্যাম অভিরাম বৃষ্টি শুনি,
বৃষ্টি দেখি, ছাটে ছাটে গন্ধে গন্ধে ভরে নাই ঘ্রাণ,
মনে মনে আমিও সত্তার পোড়া শ্বেত রুই, বুনি;
হয়ে যাই থরোথরো ফসলের শিষ।
আমারও স্নায়ুতে আজ মাটির আষাঢ়
পাকে পাকে হয়ে ওঠে বর্ষার উৎসব;
হৃদয় ভাসায়, নামে ঢল,
মুক্তাবিন্দু গেঁথে গেঁথে লাবণ্যে চৈতন্য ভরি,
গলায় পরাই তাকে যার বাহু আমার গলায়।
শরীরের অন্ধকার হয়ে ওঠে মেঘময় গান,
তীব্র ছটা সূর্যোদয়—সূর্যাস্তের স্তব।
অঙ্কুরে অঙ্কুরে তাই আজ
আমারও কবিতা দোলে প্রসন্ন হাওয়ায়
আসন্ন আশ্বিনে আহা ধানের মঞ্জরী॥

('কবিতা'—আনন্দবাজার বার্ষিক ১৩৬৪)

শরৎপ্রসন্ন স্নিগ্ধ পরিবেশে আমরা সহজভাবে ঘ্রাণ নিতে পারি বাংলা কবিতার নতুন ফসলের। বোধ করি, আলোচ্য পর্বে বাঙালী কাব্যপাঠকের এইটি সবচেয়ে বড় লাভ।

আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই পর্বে লক্ষ্য করা যায়। অমিয় চক্রবর্তীর উপরি-ধৃত 'ইয়ং কল্যাণী অজরা মর্তস্থ অমৃতা গৃহে' কবিতাটিতে সংসার-মাধুর্যে প্রীত আচ্ছন্ন কবিমনের দেখা পাই। এই পরিচিত সংসারের মাঝে আবার নতুন করে রোমান্সের উদ্ঘাটন এখানে লক্ষ্য করি। এর জন্য কোন মননপ্রয়াসের প্রয়োজন ঘটে নি, অন্তরঙ্গ হার্দ্য সুরে একটি ভাল-লাগাকে শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এখানে। এই অনুত্তেজিত নিরুত্তাপ শান্ত কণ্ঠের পিছনে একটি দৃঢ় জীবনপ্রত্যয়ের আভাস পাই। এই পর্বের অন্যতম তরুণ কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় এই সুরের ও বক্তব্যের অনুস্থিতি লক্ষ্য করি। যেমন, তাঁর 'নিজের বাড়ি' কবিতাটি—

ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই শান্ত উঠোন,
এই খেত, ওই মস্ত খামার—

সব-ই আমার।
এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি
ইচ্ছে মতন জানলা-দুয়ার খুলতে,
ইচ্ছে মতন সাজিয়ে তুলতে
শান্ত, সুখী, একান্ত এই বাড়ি।...
ভাবতে ভাল লেগেছিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে
হঠাৎ কোথাও চলে যাব।
ফিরে এসে আবার যেন দেখতে পারি,
যে-নদী বয় অন্ধকারে, তারই বুকের কাছে
বাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।
ওই যে বাড়ি, ওই তো আমার বাড়ি॥
(শারদীয় দেশ, ১৩৬৪)

শান্ত সুরে গৃহ, সংসার ও প্রেমের বন্দনায় মুখরিত এই কবিতা পালা-বদলের অন্যতম স্বাক্ষর।

৩

তরুণতম কবিদের মধ্যে দুটি সুর সহজেই ধরা যায়—একটি প্রেমসাধনার সুর, অপরটি প্রকৃতিবন্দনার সুর। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ দাবি করতে পারেন—আলোক সরকার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরবিন্দ গুহ, শঙ্খ ঘোষ এবং আনন্দ বাগচী।

আলোক সরকারের কবিতা বিশুদ্ধ গীতিমূর্ছনা, সেখানে আর কিছুই প্রাধান্য লাভ করে নি। প্রেমের একটি শান্ত প্রকাশ এঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, যার মূল নির্জন চিন্তার গভীরে। যেমন—

বাড়ি ফিরে টেবিলে দীপ জ্বালব।
একটি গোপন চিরকিশোর অনিদ্রিত ফুলে
আমার ইপ্সিতার মুখ তাকে কি আমি জানব?
তুমি কেমন সহজ নিজকূলে
তোমার জলে তারা আসে নিজেই পাল তোলে।
আমার জল তাদের সমরাগে,
না—যদি হয় তারা আমায় ভোলে। (প্রতিবন্ধ)

অথবা—

যখন মেঘ হেমন্তের একা
বিকেল বেলায় মাটির দাওয়ার মত নিবিড় সুর
জলের ভাষায় ডাকে আমায় আমার নামে,
ছোটবেলার নামে
আমার ঘর, আমার দেশ! পরিশ্রমী দূর
পার হলে পাব তাকে কিশোর প্রণামে। (প্রবাসী)

এখানে প্রেম ও প্রকৃতির রোমান্সে দূর গ্রামস্মৃতি এক অনাস্বাদিত-পূর্ব ব্যঞ্জনা ও অর্থগৌরবে সমৃদ্ধ হয়েছে। সুদূর স্মৃতির অনুষঙ্গে, নির্বাচিত বিশেষণ প্রয়োগে, নিবিড় অনুভবে এ-সব কবিতা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিতায় অনুভূতির যে গভীরতা, প্রকাশের যে গাঢ়তা, আবেদনের যে আন্তরিকতা বর্তমান, তার সাফল্য তর্কাতীত। কবির সম্বল হৃদয়-আবেদন, কিন্তু তার বহুবিস্তার ঘটেছে, আর রূপকল্পের যে অভিনবতা তা তাকে সংহত রূপ দান করেছে। এ মন্তব্যের সমর্থনে উল্লেখ করি, 'অন্ধ বাউল' কবিতাটি (কৃত্তিবাস, ষষ্ঠ সংকলন ১৩৬২)—

আয় তাকে করবি চুরি,
সে আছে কোথায় কেউ জানে না—
অথবা সে যেন অধরা সুবাস
হাওয়ায় ছড়ানো হাস্নুহেনা!...
অন্বেষণের অন্ধ আয়না
ছুঁড়ে ফেলে ঘরে আয় রে আয়,
তাকে খুঁজে আর কেউ তো যায় না!
তোর কেন তবে একার দায়?
অন্যকাননে যাস সে চোর,
নিজেকেই আয় করবি চুরি।
যাকে চেয়েছিস গোপনে সে তোর
বুকের আকাশে থির বিজুরী!

হৃদয়ের গভীরে সেই 'পরম পাওয়ার এষণা'য় কবির এই যাত্রা।

'কৃত্তিবাস', 'শতভিষা', 'পূর্বমেঘ', 'অধুনা'—এই চারটি কবিতাপত্রে যে তরুণতম কবিরা মিলেছেন, তাঁদের কাব্যপাঠে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি—এঁদের হাতে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ কেবল নিরাপদ নয়, তা প্রতিশ্রুতিসমৃদ্ধ। বেদনাবিদ্ধ যুগের আর্ত কবিমনের অমৃতযন্ত্রণার ফসল তাঁরা ঘরে তুলেছেন, এবং সে ফসল যত্ন করে রক্ষা করার যোগ্য। এঁরা যে মূলতঃ

হৃদয়াবেদনে বিশ্বাসী, তার প্রমাণ এঁদের কাব্যে ছড়িয়ে আছে। আশ্বাসের কথা এই যে, আজ থেকে পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে যাঁরা তরুণতম কবি ছিলেন, তাঁদের সেদিনের লেখায় যে অনাচার, বিশৃঙ্খলা, বল্‌গাহীন উন্মাদনা ও মত্ততা ছিল, তা আজকের তরুণতমদের লেখায় নেই। এই সুস্থ চেতনাই এ পর্বের তরুণতম কবিদের কাব্যকে চিহ্নিত করেছে। রবীন্দ্র-স্বীকৃতির দুটি প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করছি—

তাই যন্ত্রণার মাঝে…
একমাত্র তুমি আলো হয়ে প্রাণ হয়ে প্রেম হয়ে
আমাদের সকলের হয়ে জন্মেছিলে।
(জন্মলগ্ন—শিশিরকুমার দাশ)

এবং

আমাকে বেঁধেছো ঋণে দুটি হাতে আকাশের মত,
নিবিড় আশ্বাস দিলে এ মাটির ধূসর জীবনে।
(ধূলিমুঠি সোনা—ফণিভূষণ আচার্য)

আলোচ্য পর্বের অন্যতম লক্ষণ, গোড়ায় বলেছি, আঙ্গিকের অতিপ্রাধান্য থেকে বাংলা কবিতা মুক্তি পেয়েছে। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতৃস্থানীয় কবিরা এই দোষ থেকে মুক্ত হয়েছেন তা অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু তরুণতম কবিদের মধ্যে সে আশঙ্কা রয়েছে। অতিকথন, একই শব্দ বা শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তি (যেমন, 'জন্মলগ্ন' কাব্যে 'মনে কি পড়ে, মনে কি পড়ে সেদিনের কথা আজকে সখি'), নেতিবাচক শব্দসমষ্টির পুনরাবৃত্তি (যেমন 'মাটির বেহালা' কাব্যে 'না—আমি নই'), একই চিত্রকল্পের বহুলপ্রয়োগ (যেমন, 'ধূলিমুঠি সোনা' কাব্যে 'রাত্রির মত হৃদয়', 'আকাশের মত উপমা'), গল্পসর্বস্ব বিবৃতিমূলক পদ্যকে কবিতা বলে চালানোর প্রয়াস (যেমন, 'অশোকের সময়ের গ্রাম' কাব্যে অনামিকা ভাদুড়ীর বর্ণনা), দুরুচ্চার্য দুর্বোধ্য অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার, অথবা কয়েকটি তৎসম শব্দের বহুলপ্রয়োগ (যেমন 'অনিকেত', 'বেদনা', 'যন্ত্রণা', 'দীপ্ত', 'সংরাগ', 'জিজ্ঞাসা', 'আশ্লেষ', 'বিক্ষত যৌবন') তরুণতমদের কাব্যসাধনাকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছতে দিচ্ছে না। তথাপি উপযুক্ত কবিদের লেখায় এমন একটি দৃঢ় প্রত্যয়, কাব্যবোধ ও সংযত শিল্পনৈপুণ্য লক্ষ্য করেছি, যার ফলে আশান্বিত না হয়ে পারি না।

আমার মনে হয়, তরুণতম কবিরা বরং অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের কাছ থেকে এ বিষয়ে পাঠ নিতে পারেন।

৪

এ প্রসঙ্গে যদি মননপ্রধান কবিদের উল্লেখ না করি, তা হলে প্রত্যবায় ঘটে। অজিত দত্ত, অরুণ মিত্র, অরুণকুমার সরকার, হরপ্রসাদ মিত্র, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিরা ইনটেলেকটের সঙ্গে বিশুদ্ধ হৃদয়ানুভূতির পরিণয় সাধনের জন্য যে প্রয়াস চালাচ্ছেন, তা এখানে স্মর্তব্য। এঁদের কবিতা কখনও আবেগের দ্বারা প্লাবিত হয় না, সর্বদাই আবেগের রাশ তাঁরা টেনে রাখেন। যেমন, শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'সুরভি' কবিতাটি ('একক', কার্তিক-পৌষ ১৩৬৪)—

কেন কেন এ আকাশে আলো তুমি মুছে দিতে চাও ?
কেন তুমি বসন্তের আশীর্বাদ দু হাতে ঘোচাও ?
আকাশে সূর্যের রঙ, নীচে তার মরকত মায়া,
তোমার দু চোখে দেখি তারই প্রতিচ্ছায়া !
বাইরে শরৎ জাগে, কি লেখে সে আকাশে প্রান্তরে,
নামে তার মন্ত্র দেখি তোমাকে জড়িয়ে এই ঘরে।
তুমি যে এখনও আছ এ প্রত্যয়, এ সুরভি,
ফুলের পাপড়ি দিয়ে মূঢ় মন আজও আঁকে ছবি !
সংসার লোকের ভিড়, প্রত্যহের গোলামি ও ক্ষুধা,
তবু তুমি উঁচুসুর, নীলাকাশ, জীবনের সুধা !

শেষ দুটি চরণে আবেগকে বেঁধে রাখার কী নিপুণ প্রয়াস !

হরপ্রসাদ মিত্রের কবিতায় একটি বিপরীত চিত্র পাই। সেখানে আবেগ স্বতঃই বুদ্ধিশাসিত, সংক্ষিপ্ত ভাষণে তা তির্যক্‌ভাবে প্রকাশিত, ছন্দের দ্রুত ও মন্থর গতিতে, চরণের দৈর্ঘ্যে ও সংকোচনে, প্রতীক চিত্র ও সমাসোক্তির প্রয়োগে এই আপাত-বৈপরীত্য একটি সুন্দর এফেক্ট এনেছে। এর সমর্থনে উল্লেখ করতে পারি 'অপমৃত্যুর সাক্ষী' কবিতাটি (শারদীয় দেশ ১৩৬৪)—

আলোটা টিমটিমে,
ঘাট-টা নির্জন,
রাস্তা ঝিমঝিম।
কে যেন এলো সেই
ঠাণ্ডা জলেতেই

ডুবতে, মরতে।
কারণ জীবনের নোঙর হারিয়েও বৃথাই ভাসতে
আদৌ চায় নি সে।
বেকার ত্নুনিয়ায়
একটি শূন্য।

জন্ম-মরণের অথৈ পারাবারে উঠছে বুদ্বুদ,
রেকাবে বেতো পায়ে ঠাণ্ডা রক্তের কেবলই ঝিন্‌ঝিন্।
'আমি তো অকর্মণ্য, তোমরা সাক্ষীই'—কে যেন বললে।
কপালে ভিজে হাওয়া, সামনে তমসার গভীর মৌন।

'ভালো তো বাসতাম, ভালো তো বাসতাম'—ঘুরলো কান্না;
রাতের আবছাতে হঠাৎ চিঁহি-চিঁহি ঘোড়াটা ডাকলো।
'আমি তো নির্ব্যাজ, আমি তো নির্দোষ,' বুড়ো সে ঘোড়াটা;
বল্‌গা খোলা তার,—কারণ দেরি নেই সেটারও মরতে।

তখন নদীটার নিকষ দর্পণে জোনাকি লাখে-লাখ।
অনেক জগতের সাক্ষী আকাশের নীচে সে ঘোড়াটা।
মনেও পড়ে নাক' কবে সে ছিল কোন্ তাতার যোদ্ধার!

এই শ্রেণীর কবিতায় যাঁর নৈপুণ্য তর্কাতীত, সেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই পর্বে প্রকাশিত 'দশমী' কাব্য আমার প্রতিপাদ্যের সমর্থনে উল্লেখ করতে পারি। একদিন তাঁর কবিতায় প্রবেশাধিকার ছিল না সাধারণ কাব্যপাঠকের, কেন না দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের মুহুর্মুহু উল্লেখ ও বিশ্বকাব্যে কবির স্বেচ্ছাবিহার পাঠককে ভীত ও পরাজিত করেছিল। কিন্তু 'দশমী' কাব্যে পাঠক সাহস করে প্রবেশ করতে পারেন। এবং আমার বিশ্বাস, সুধীন্দ্রনাথ যদি বাক্-বৈখরী ও পাণ্ডিত্য ত্যাগ করেন, তা হলে বাংলা কবিতার অনেক উপকার হবে। 'দশমী'তে তার ইঙ্গিত পেয়ে খুশী হয়েছি।

আর একজন, যিনি প্রেমের কবিতা না লিখে কাব্য-জীবন শুরু করলেন এবং দুঃখকে উচ্চ হাসি ও ব্যঙ্গে প্রকাশ করলেন, সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আলোচ্য-পর্বে প্রকাশিত 'কবিতা সংকলন' একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাজনীতি একদিন বাংলা কাব্যে তাণ্ডব নৃত্য চালিয়েছিল, সুখের বিষয় এই তিন বছরের কবিতায় দেখি, সে অপমৃত্যুর পথ থেকে বাঙালী কবিরা চলে এসেছেন। সেজন্যই স্তালিন-প্রশস্তিমূলক কবিতা-সংকলন 'কালের রাখাল' কাব্যপাঠকের আন্তরিক শ্রদ্ধা দাবি করতে পারে না। পরিবর্তমান রাজনীতির জগতে স্তালিন-প্রশস্তির আজ ঠাঁই কোথায়, বুদ্ধিমান পাঠক-মাত্রেই তা জানেন, সুতরাং এই উপলক্ষ্যসর্বস্ব রাজনীতির কবিতা আলোচনার অযোগ্য। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়? তাঁর শক্তি অবশ্যস্বীকার্য, তাঁর কবিতাসংকলন অগ্রাহ্য করার বস্তু নয়। তাই তাঁর কাছে বিনীত নিবেদন—'আমরা যাবো', 'রাস্তার গল্প,' 'মামা-ভাগ্নের গল্প', 'দাঁড়ানো,' 'এক যে ছিল'-জাতীয় কবিতা না লিখে তিনি 'সন্ধ্যামণি,' 'পারুল বন'-জাতীয় কবিতা লিখুন, 'পদাতিক'-পর্বের দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রত্যাবর্তন করুন। তাঁর হাতে যে আয়ুধ আছে, তা খুব কম বাঙালী কবির আছে, তার যেন আর অপপ্রয়োগ না হয়!

৫

বর্তমান শতকের প্রথমার্ধে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে যে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ গড়ে ওঠে এবং রবীন্দ্রানুগত্য ও রোমান্টিক কাব্যভাবনাকে সম্বল করে যে কাব্যধারা প্রবাহিত হয়েছিল, তার দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। 'ভারতী'-যুগের নিশ্চিন্ত জীবন-অনুধ্যান, সংশয়হীন কাব্যোল্লাস, মঞ্জুল বাণীবন্ধে গ্রামজীবনের রোমান্টিক চিত্রণের যুগ আজ অবসিতপ্রায়। এ যুগের যে দুই-একজন কবি এখনও লিখছেন, তাঁদের মধ্যে নাম করতে পারি—কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, সজনীকান্ত দাস ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। প্রথমোক্ত দুজন তাঁদের অর্ধ-শতাব্দীর কাব্যসাধনার শেষে আজ পরিশ্রান্ত এবং আধুনিক কাব্যান্দোলনের প্রতি তাঁদের হৃদয়ের সমর্থন নেই, তা এঁদের আলোচ্যপর্বে প্রকাশিত কবিতা পড়লেই বোঝা যায়। গ্রামবাংলা, বৈষ্ণব ভাবুকতা, রোমান্টিক বিরহবেদনা, সংসার ও গার্হস্থ্যজীবনপ্রীতি, প্রকৃতি-ধ্যান সম্বল করে এঁরা একদিন যাত্রা শুরু করেছিলেন, আজ আর সে সম্বল নিয়ে 'বেচাকেনা চলিবে না': এ অনুভূতি এঁদের কবিমনকে আচ্ছন্ন করেছে। তথাপি বিদগ্ধ নাগরিক চতুর ব্যঙ্গদিগ্ধ কবিমানসিকতার পাশাপাশি এই ভক্তিমেদুর pastoral কাব্যধারাটি এঁরা বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করে এসেছেন, এজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ

কিন্তু অবসিত-প্রায় কাব্যধারার বিদায়বেলার গান এই পরিবর্তমান কাব্যলোকে এঁরাই গেয়েছেন। তার প্রমাণ পাই কবিশেখর কালিদাস রায়ের 'কবির বিদায়' কবিতাটি (বেতারজগৎ, ১৮৭৯ শকাব্দ):

বিদায় নিল লুকোচুরি শিউলি যুঁইএর বনে,
বিদায় নিল সজল চোখে ন'বছরের ক'নে।...
ধনপতি সাধুর পায়ের উদ্ধত দাপট
ভেঙে দিল খুল্লনা মার চণ্ডীপূজার ঘট।
ধানদূর্বার আশিস গেল, মায়ের হাতের ফোঁটা,
হৃৎকমলের পাপড়ি ঝরে রইল শুধু বোঁটা।
যুগের হাওয়া বদলে গেল, নিভিয়ে দিল ঝড়,
বঙ্গমাতার আঁচল আড়ের দীপটি মনোহর।
কবির যত পুঁজিপাটা বিদায় নিল সবি,
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি।

পরিবর্তমান কাব্যধারার সঙ্গে তাল রেখে বাকি যে দু'জন কবি এগিয়ে চলেছেন, তাঁদের আলোচ্য পর্বে রচিত কবিতায় যে প্রাণস্পন্দন ও সজীবতা লক্ষ্য করি, তাতে মনে হয় এঁদের কাছে আমাদের প্রাপ্তি এখনও শেষ হয় নি। সে দুজন: সজনীকান্ত দাস ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। এঁদের কবিতায় সাম্প্রতিক দিনের অশান্ত আত্মজিজ্ঞাসা ও পথসন্ধানের ব্যাকুলতা ধরা পড়েছে, এখানেই এঁরা সমাজ-সচেতন কবি। বিশেষতঃ ব্যঙ্গ কবিতায় সজনীকান্ত, অজিতকৃষ্ণ বসু, পরিমল গোস্বামী, কুমারেশ ঘোষের যে সাফল্য তার মূলে আছে এই সমাজ-সচেতনতা ও পরিবর্তমান অস্থির কাব্যবিশ্বাসের দোলাচলচিত্ততা। একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারি না। মুগ্ধ আত্মরতি ও নিশ্চিন্ত রোমান্টিক প্রেমসাধনা আজকের দিনে কী অভ্যর্থনা পেতে পারে, তারই চমৎকার বর্ণনা পাই সজনীকান্তের 'বৃন্দাবনের প্রতি মথুরা' সনেটটিতে (শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৬৪):

ফরমাশ করেছ বন্ধু, লিখিবারে প্রেমের সনেট—
যে প্রেম সনেট-প্রসূ, রাজপথে শুষ্ক বহু দিন।
তাহারে যতই ডাকি বলে সে যে, "ইট ইজ ট্যু লেট।"
হৃদয়ের পিণ্ড জুড়ে বসিয়াছে লিভার ও স্পীন।
শূন্য মধু-বৃন্দাবন, ঝোলে সেথা 'টু-লেট'-ট্যাবলেট,
মথুরার করণিকে বেণু ভেঙে হল আলপিন।
রাজাকে করিতে খুশী ভারে ভারে মদ আসে ভেট,—
নিধুবনে কেকাকুহু স্তব্ধ, বাজে ক্যানেস্তারা-টিন।
তাই তো নিবিষ্ট মনে লিখিতেছি ভুয়া আত্মস্মৃতি,
প্রেমের সমাধি 'পরে গড়িতেছি তাসের প্রাসাদ—
স্পেডকে রয়াল ডেকে লভি যে চরম আত্মপ্রীতি,
একমুখী ভালবাসা হয় বহুমুখী সাম্যবাদ।
বাল্যে যাঁর রাসলীলা তাঁরি কণ্ঠে ভগবদ্গীতি,
কুঞ্জে যে কূজিল প্রাতে, সন্ধ্যায় সে করে আর্তনাদ॥

৬

আলোচ্য তিন বছরে বাংলা কবিতা আরও দুটি ধারায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। প্রবীন ও নবীন কবিদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হওয়ায় আমরা লাভবান হয়েছি। সে দুটি ধারা হল, অনুবাদ-কবিতা এবং নাট্য-কবিতা ও কাহিনী-কাব্য। অনুবাদ-কবিতা যে কত সমৃদ্ধ ও উৎকর্ষমণ্ডিত হতে পারে, তার প্রমাণ পাই বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ইংরেজী, ফরাসি ও জর্মান কবিতার অনুবাদে। বিষ্ণু দের 'হে বিদেশী ফুল', সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'প্রতিধ্বনি', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আলোক সরকারের 'ভিনদেশী ফুল' পড়লে বোঝা যায় সত্যেন্দ্রনাথের অনুবাদ-কর্ম থেকে এঁদের অনুবাদ-কর্ম কত অগ্রসর ও সার্থক। দ্বিতীয় যে ধারা, তা নাট্য-কাব্য ও কাহিনী-কাব্য। এ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন সুশীল রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। একটি নতুন উজ্জ্বল সম্ভাবনার দুয়ার এঁরা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আর এই-সব সাহিত্যকর্ম আমাদের একটি অনিবার্য সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়ে দেয়। তা হল বাংলা কবিতা আবার সুরেলা ও গীতি-আশ্রয়ী হয়েছে, ছন্দ ও আঙ্গিকে সুস্থতা এসেছে, দুর্বোধ্যতা ও উদ্ভটতার দিন শেষ হয়েছে। এই অতি-সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার শেষে এ কথা বলতে পারি ১৩৬২ থেকে ৬৪ এই তিন বছরের বাংলা কবিতা প্রতিশ্রুতিতে উজ্জ্বল, সার্থকতায় ভাস্বর; তা আন্তরিকতায় গভীর, হৃদয়াবেগ-প্রকাশে অকুণ্ঠ। তাই এ বিশ্বাসে এই পর্যালোচনায় সমাপ্তি, 'The Poetry of the earth is never dead'।

আধুনিক বাংলা সমালোচনা

গুরুদাস ভট্টাচার্য

ইতিহাসের পট ও ভূগোলের ভূমিতে ব্যক্তির ভূমিকা। এই তিনের সুসমঞ্জস যোগাযোগে সাহিত্য-শিল্পের রূপ ও রূপান্তর, স্থিতি ও গতি, সৃষ্টি ও সমালোচনা। জীবনের ঋতুবদলে সাহিত্যের পালাবদল। তখন বদলে ফেলতে হয় সমালোচনার দৃষ্টিকোণ ও রীতিপদ্ধতিকেও। তাই প্রাগাধুনিক কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক সমালোচনার সাদৃশ্য সামান্যই।

গ্রীক পোএটিক্‌স ও ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র সাহিত্যের উচিত-অনুচিত কর্তব্যের নির্দেশিকা; তত্ত্বনির্ভর অনুশাসন, বৈয়াকরণ বিশ্লেষণ। সাহিত্যের সটীক বিচার বা আস্বাদনের ক্ষেত্রে এই শাস্ত্রকে প্রয়োগ করা হয় নি, যেমন হয় আধুনিককালে। টীকা-ভাষ্য-কারিকার ধ্রুপদী রীতি থেকে ইংরেজী সমালোচনা মুক্তি পেল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিলগ্নে। ওআর্ডস্‌ওঅর্থের Preface to Lyrical Ballads তার একটি আরম্ভরেখা। ইউরোপের অন্যান্য কয়েকটি দেশে এর আগে থেকেই নব্য রীতির ধারাপাত। আমাদের দেশে, উনবিংশ শতাব্দীতে। সুষ্ঠু ও আদর্শ রূপ দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রাচ্য অলঙ্কারশাস্ত্রকে একেবারে ত্যাগ না করতে পারলেও পাশ্চাত্ত্য বিচার-পদ্ধতিকেই তিনি স্বীকার ও স্বকীয় করেছেন। তার দুটি সুস্পষ্ট রূপ ফুটে উঠল: এক দিকে, নির্দিষ্ট শৃঙ্খলিত সূত্রধার অবরোহী আলোচনা; অন্য দিকে কাব্যপাঠান্তে উচ্ছ্বসিত রসোপলব্ধির আরোহী আলোচনা তথা আস্বাদন। নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষ—উভয় সমালোচনা-রীতির ভিত্তি স্থাপিত হল বঙ্কিমী সংস্কারযুগে। রবীন্দ্রনাথ এই দুটি রীতির মধ্যে ঐক্য আনলেন: যুক্তিতে এল আবেগ, দৃষ্টিতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ভাবনা-ভঙ্গীর নিবিড় একতা। চিত্তের একই মহলে বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক-রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব আর সানন্দ-নন্দনী-রসবাদী কাব্যতত্ত্ব। তাঁর নিরপেক্ষ-সমালোচনা নিতান্ত সংখ্যালঘু; অধিকাংশই আন্তররসে রসান্বিত ব্যক্তিসাক্ষিক সমালোচনা—কাব্যের বিচারণায় নবমূল্যায়ন—অনুপম New Creation। আধুনিক বাংলা সমালোচনার ইমারৎ গড়ে উঠল রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতিযুগে।

[এই দুই যুগের সমালোচনার বিস্তৃত ইতিহাস ও তত্ত্বনির্ণয় পত্রান্তরে একদা করেছি। বর্তমানে ভূমিকাটি সংক্ষেপে বিবৃত হল। অতঃপর আলোচ্য প্রবন্ধের সীমান্ত-রেখার শুরু।]

২

নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে যখন একটি কি দুটি সহজ সুন্দর পথ তৈরি হয়ে যায় তখন বেশ কিছু দিন ধরে চলে সেই রাজপথ-পরিক্রমা। এদিকে জীবন অগ্রসর হতে থাকে নিজের নিয়মে; সাহিত্যের আসরে জমায়েত হয় নতুন শিল্পী, নবীন শিল্প, নব্য-কলা। তখন আবার বহু পথ ও তার মধ্য থেকে নবতর পথের অনুসন্ধান। বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ যে পথ তৈরি করে দিলেন, সমকালীন ও পরবর্তী সমালোচকবৃন্দ চললেন তার ওপর পা ফেলে ফেলে; সেই সঙ্গে স্বকীয় পদচিহ্ন এঁকে এঁকে। প্রিয়নাথ সেন, অজিত চক্রবর্তী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই ধারাকে বহন করেছেন। রবীন্দ্রযুগে স্বীয় রীতিতে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দুইজনেই সত্যশিবসুন্দরের উচ্চবিত্ত উপাসক, আত্মলীন সৃজনলীলার পূজারী ও নন্দনতাত্ত্বিক রসমুখী সমালোচনার নিষ্ঠাবান মালাকর।

কলাকৈবল্যবাদী অবনীন্দ্রনাথের মনোভাব ফুটে ওঠে 'শিল্পায়নে'র ভূমিকায়: 'স্বপক্ষ সমর্থন করতে আমি একটুকুও চেষ্টা না করে সেই অল্পসংখ্যক পাঠক যাঁরা জানতে চান শিল্পকে, তাঁদের দরবারে পেশ করছি এই সমস্ত চিন্তা।' তাঁর সমালোচনার সৃষ্টি প্রচুর নয় কিন্তু দৃষ্টি মধুর: 'শিল্পবুদ্ধি ও রসবোধের দ্বারা চালিত হচ্ছে যে মানুষের দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সেই শিল্পী নাম পেলে শিল্পরসিক বলে বলা চলল তাকে। শুধু শিল্পের আধারে নয়, তাঁর সূক্ষ্মসন্ধানী সুন্দরের দৃষ্টি সংস্কৃতির অন্যান্য

ক্ষেত্রকেও আলোকিত করেছে। ব্রত তথা লোকধর্ম সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক বিচারণার সূত্রপাত তাঁর 'তন্বী' গ্রন্থে; যেখানে শুধু অনুষ্ঠানের দিক নয়, সৃষ্টি সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য অপূর্ব: 'কতক চিত্রকলা নাট্যকলা গীতিকলা ইত্যাদিতে মিলে একটুখানি কামনার প্রতিচ্ছবি, কামনার প্রতিধ্বনি, কামনার প্রতিক্রিয়া, মানুষের ইচ্ছাকে হাতের লেখায় গলার সুরে এবং নাট্যনৃত্য এমনি নানা চেষ্টায় প্রত্যক্ষ করে তুলে ধর্মাচরণ করছে। এই হল ব্রতের নিখুঁত চেহারা।' ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির ক্ষেত্রেও তিনি এনেছেন অভিনবত্ব—'সংকীর্তিত ও সংচিত্রিত ভাষা'।

'সবুজপত্রে'র মুখপত্রের ধুয়া ছিল 'ওং প্রাণায় স্বাহা'। প্রাণশক্তি ঋজুতা ভারতীয় রসবোধ ফরাসী মেজাজ সবার ওপর উচ্চচূড় ইন্‌টেলেকট্‌ মিলিয়ে প্রমথ চৌধুরীর মনের ও মননের গঠন। বিশ্লেষণী সমালোচনায় তাঁর অনীহা, অথচ তাঁর মত বিশ্লেষণক্ষমতা আবেগমুখী বাংলা সাহিত্যে অসুলভ। পরিচ্ছন্ন মন, শৃঙ্খলিত যুক্তিধারা, সহৃদয় রসবাদ, অজড় অদীন প্রকাশ। ক্লাসিক-প্রীতি সত্ত্বেও নির্মোহ আধুনিকতা। প্রত্যয়ে কলাকৈবল্যবাদী, প্রকাশে নিখুঁত কলাকার। ভাবে বহুশ্রুতত্ব, ভাষায় চাবুক। অবনীন্দ্রনাথের ভাষা যেমন খাঁটি শিল্পের, ইম্‌প্রেসনিজম্‌-এর; প্রমথ চৌধুরীর ভাষা তেমনি খাঁটি গদ্যের, রিয়েলিজম্‌-এর। রীতিরাত্মা তাঁর সাহিত্যের। তাঁর দৃষ্টি ছিল আর্টের অভিমুখে, দৃষ্টিকোণ ছিল সায়েন্সে অভিষিক্ত। তাঁর নীতি: The proper study of mankind is man; রীতি—of a conscious search for ordered beauty (লিটন স্ট্র্যাচী)। তাই তিনি জীবন-রসিক ও মননশীল। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ভাবশিষ্য।

ডাউডেন বলেছিলেন, শেক্‌স্‌পীয়রকে যদি জানতে চাও, তাঁর থেকে দূরে সরে দাঁড়িয়ে জগৎ-রহস্যের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁকে দেখো। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তী ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় অনেকটা এইভাবে সমালোচনা করতেন। কালক্রমে আসর আরও বড় হল, পট আরও বিস্তৃত হল। বিশ্লেষণ হয়ে উঠল গভীর ও ব্যাপক। এই তুলনামূলক বিচার বিচারণার প্রসার শশাঙ্কমোহন সেনের 'বাণীমন্দির', 'বঙ্গবাণী'তে। কিন্তু পাণ্ডিত্য ও প্রসাদগুণ সর্বত্র মাধুর্য ও প্রসাধনের সহগামী হতে পারে নি। এই দিক থেকে সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ অনেক প্রসাধিত। এই ধারাকে রসময়তা দান করেছেন মোহিতলাল মজুমদার। 'প্রবাসী'তে "কবিকথা"য় ও পরে 'শনিবারের চিঠি'তে সাহিত্য সমালোচনার মূল সূত্র ও কাব্যতত্ত্ব নির্ণয়ে তাঁর লক্ষ্য ছিল: 'সকল কালের সাহিত্য হইতে সাহিত্যের স্বরূপ ও স্বধর্মকে উদ্ধার করিয়া উদার রসবোধে প্রতিষ্ঠা করা।' তাঁর সাধ্য—আস্বাদ্যতে ইতি যে রস, তাই-ই; সাধন—শব্দ ছন্দ অলংকাররীতির বিশ্লেষণ; সাধনা—'জাতির জীবনের বেলাভূমি হইতে রসের আদানপ্রদানই সাহিত্যের সত্য সাধনা।' সেই সত্যকে তিনি দেখেন বঙ্কিম-নায়কত্বে, রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে নয়। কারণ সমালোচনার দৃষ্টিভূমিতে তিনি নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে মনে করতেন। তাঁর সমালোচনার কেন্দ্র সীমিত কিন্তু পরিধি বিস্তৃত, গভীর ও নির্ভীক, যুক্তিনিষ্ঠ ও আবেগ-কল্লিত। সুশীলকুমার দে-র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত ঐতিহাসিক, বাক্‌ভঙ্গি সহজ। 'নানা নিবন্ধ' ও 'দীনবন্ধু মিত্র'এর প্রাবন্ধিক বাঁধুনি দৃঢ়পিনদ্ধ না হলেও সরলতায় ব্র্যাণ্ডিস মারিএটের রচনাকে স্মরণে আনে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনারীতি শিল্পশাস্ত্রসম্মত, বিশ্লেষণ ভাবাবেগ-বিরহী, ভাষা ওজনে ভারী। সুবোধ সেনগুপ্তও এই পথের অনুগামী, ভাষার ওজন অনেক কম।

আলোচ্য পর্যায়ের সমালোচকবৃন্দ মূলতঃ শাস্ত্রানুগামী। স্টপফোর্ড ব্রুকের মত এঁরা সাহিত্যিকের ভাবজীবনের আলোচনা করেন, লেগুই-কাজামিআঁর ধরনে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে রত হন, মুলটন-রিচার্ডস-কম্পটন-রিকেটের সমরেখায় বিচারের মানদণ্ডটি তীক্ষ্ণ ও সজাগ রাখেন। ইতিহাস অপেক্ষা ভাবজীবন তথা মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্য রচনার দিকেই এঁদের প্রবণতা বেশী। ক্রমে, আরও অনেক দিকে আমাদের সমালোচনা ছড়িয়ে পড়ল। কয়েকটির উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য।

কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতার পটভূমিকায় কোলরিজ-ওঅর্ডসওঅর্থের কবিমানস ও কাব্যের মূল্য নিরূপণ করতে চেয়েছিলেন হাজলিট। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রবন্ধে এই রীতির সমাবেশ দেখা যায়। মোহিতলালেরও। 'সব পেয়েছির দেশে', 'কল্লোল যুগ',

'চলমান জীবন' ইত্যাদি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। শারীরিক সংস্থানের দিক থেকে মানসিক বিন্যাসের বিচার নৃতাত্ত্বিক রীতি। এই রীতিটি সাহিত্যিক বিচারণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন প্রমথনাথ বিশী 'চরিত্রচিত্র' ও (শশাঙ্কমোহন সেনের অনুসারী) 'শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে। প্র. না. বি. যখন দৈহিক রেখাগণনা করে কবিচিত্তের ভাগ্য নির্ণয় করেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত তখন ভৌগোলিক পটসীমায় কবিচিত্তের অসীমতার সন্ধান করেন। তাঁর মতে, (বাইরন-উপম) নবীনচন্দ্র সেনের ঢেউ-খেলানো মনটি চট্টলের দান। কারণ 'কবি চোখ মেলিয়া এক দিকে দেখিয়াছেন শুধু উচ্চশির পাহাড়-পর্বতের লীলা, অন্য দিকে দেখিয়াছেন সীমাহীন সাগর অন্তরাবেগে সে শুধু উচ্ছ্বসিয়া উঠিতেছে।' হাক্সলেও বলেছিলেন, ওঅর্ডসওঅর্থ যদি উষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসী হতেন, তবে তাঁর প্রকৃতিপ্রীতি জাতমাত্র গলদ্‌ঘর্ম হত; তিনি দেখেছেন যে প্রকৃতিকে সেখানে—'Europe is so well gardened that it resembles a work of art, a scientific theory, a neat metaphysical system।

কিন্তু আলোচ্য সমালোচকবৃন্দ কেবল যে এই এক-একটি একমেব মানদণ্ডেই সাহিত্যের বিচার করেছেন তা নয়। এগুলি এক-একটি স্ফুলিঙ্গ। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য অলঙ্কারশাস্ত্রের সমবায়ে, সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সমাবেশে, রসবোধ ও যুক্তিশৃঙ্খলার সমন্বয়ে, শিল্পশাস্ত্রবোধ ও মননশীলতার সমাহারে এঁদের সমালোচনা বিচিত্রগামী ও সংহতরূপ। এবং আজকের সমালোচনারীতির এই প্রবাহটিই মেদবহুল। হরপ্রসাদ মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি এই ধারার সমালোচক।

বঙ্কিমী আমলের যে আস্বাদনমূলক সাপেক্ষ আলোচনাকে রবীন্দ্রনাথ পরিণত করলেন অনুপম ব্যক্তিগত প্রবন্ধে, তাকে আর ফিরে পাওয়া গেল না আগামীকালের বহুবিচিত্র নিবন্ধে। কিন্তু এর সগোত্র আর একটি রীতি আত্মবিকশিত হল বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায়।

৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে ঐতিহ্য এতদিন বয়ে চলেছিল বাঙালীর জীবনে ও মননে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রবল ধাক্কায় তাতে ফাটল ধরল। চলমান জীবনের জোড়াতালি-দেওয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ভেঙে পড়ল, মধ্যবিত্তের পায়ের তলাকার মাটি সরে যেতে লাগল, বদল হতে লাগল বেঁচে থাকার মূল্যমান। সেই সঙ্গে চিন্তা ও চেতনাও। এক দিকে সাগরপারের মানুষদের সঙ্গে আত্যন্তিক ব্যবধান রচিত হল, অন্য দিকে ওপারের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দৃষ্টি-সৃষ্টির ঢেউ এপারে এসে মনকে দুলিয়ে দিল। রবীন্দ্রযুগের পাশাপাশি আর একটি যুগ-কণিকা দেখা দিল—তার নাম 'কল্লোল যুগ'। প্রগতির আবর্তে কল্লোলীয় সাহিত্য নতুন ভাব-ভাষা-ভঙ্গি নিয়ে আবির্ভূত হল। সেই সঙ্গে নতুন সমালোচনাও কল্লোলিত হয়ে উঠল। আলোচ্য সমালোচকগণ সকলেই কবি-সাহিত্যিক। সাপেক্ষিকতা ও কলাকৈবল্যবাদের যোগে ব্যক্তিতান্ত্রিক সাহিত্যব্যাখ্যা এঁদের বিচারপদ্ধতি; তার মূল ভিত্তি ব্যক্তিগত ভাল-লাগা—মন্দ-লাগা। এঁদের সাহিত্যতত্ত্ব যুক্তি-আশ্রয়ী নয়, ভাবাশ্রিত, সমালোচনা ততটা নয় যতটা কাব্যতত্ত্ব। প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন, 'আমি যখনই কোনও মতকে সত্য বলে মনে করি, তখনই মনে করি যে তা সকলের পক্ষে সত্য।' অবন ঠাকুরের তুলিতে—'আমার নিজের চোখে অনন্য-সাধারণ সুন্দর ঠেকল যা তা অন্যের কাছে অসাধারণ রকমের অসুন্দর যদি ঠেকে তবে দোষ দেব কাকে?' আর বুদ্ধদেব বসুর লেখনীতে—'If I cannot make the reader...share the pleasure with me, I can at least hope he may be persuaded to recognise the validity of my experience, though not drawn to the experience itself.' ('An Acre of Green Grass')। ভাবরীতির দিক থেকে এঁরা এলিঅট, এজরা পাউণ্ড, সি. ডে. লুই, স্পেণ্ডার, অডেনদের সমানধর্মী। প্রকাশের দিক থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। স্বকীয় কবিহৃদয় ও স্বীয় সাহিত্য-ধারণা থেকে আত্মবোধাশ্রয়ী সাহিত্যসন্দর্শন ও সাহিত্য-দর্শন এবং সেই মানদণ্ডে সাহিত্যপাঠ তথা বিচার তথা আস্বাদন তথা তত্ত্ব। সমজাতীয় পাশ্চাত্ত্য কবি-সমালোচকদের মত এঁদের রচনাতেও সর্বজনীন সাহিত্যিক সত্যের বিবৃতি ইতিউতি প্রকাশিত। যেমন জীবনানন্দ দাশের: 'জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার

সংজ্ঞাকে নিয়ে আসতে পারা যায় তত তাকে শিল্পপ্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব।' এই জীবনের সংজ্ঞা 'কল্লোল যুগে'—'যে মহৎ শিল্পী তার কাছে সমাজের চেয়ে জীবনই বেশী অর্থান্বিত।' এই পদ্ধতির সমালোচনা অনেকটা আত্মীয় প্রবন্ধ, মন্মথ দৃষ্টিপাতে দ্বৈপায়নী স্বাতন্ত্র্য, যার সূত্র—the recollection of my own pleasures।

এরই পাশাপাশি আর একটি ধারাকে সমালোচনার স্রোতে ভাসমান দেখা যায়—ফ্রয়েডীয় বিশ্লেষণ-পদ্ধতি। অবদমিত যৌনবাসনার উর্ধ্বতিত রূপই সাহিত্য-শিল্প—এই নীতিপথে দেশকালনিরপেক্ষ বাসনাকামনার প্রদীপ আলোকে কবিপ্রতিভার বিচার একদা বাংলার সমালোচনাক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেছিল। জীবিত-মৃত বহু পত্র-পত্রিকায় তার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই রীতির একটি চরম উদাহরণ প্রমথ পালের 'শরৎ সাহিত্যে নারীচরিত্র'; সুস্থ বিশ্লেষণ নন্দগোপাল সেনগুপ্তের প্রবন্ধাবলীতে। 'লিবিডো'-ভিত্তিক বিচার ক্রমেই মনোবিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় পরিণত হতে থাকে, এবং পূর্বোক্ত প্রবাহ দুটির সঙ্গে তার মিশ্রণও হতে থাকে। সংস্কৃতির (বিশেষতঃ মিথ্-এর) সমাজগত যৌনমনস্তত্ত্ব-মূলক বিশ্লেষণের যে পথ ও পদ্ধতি সি. জি. ইয়ুং-এর সন্ধিৎসায় রূপ পেয়েছে, তার অনুগমন বাংলা সাহিত্যে একান্তভাবে অনুপস্থিত।

যুদ্ধোত্তর ভাবনার আকাশে আর একটি নতুন ধারা আত্মপ্রকাশ করল—ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ। শিল্প-শাস্ত্রের সূত্রপথে বিচার নয়, অন্যনিরপেক্ষ কবিপ্রতিভার স্বরূপ নির্ধারণ নয়, নিজস্ব ভাল-লাগা মন্দ-লাগার মাপকাঠিতে রসবিচার নয়। শিল্প ও শিল্পীকে সমকালীন পারিপার্শ্বিক দ্বান্দ্বিক বিবর্তনের অন্যতম উপাদান বলে গ্রহণ করে ঐতিহাসিক বিচারণা। এই ধারার সমালোচকের মতে, সাহিত্য সমাজের ফল; অতএব সমালোচনার উদ্দেশ্য হবে সমাজমুখী, সাহিত্যের সামাজিকতার মূল্য ও পরিমাণ নির্ণয়। শ্রেণী-সংঘাতমুখর ইতিহাসের সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলেছে সাহিত্য; সেই ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে সাহিত্যের উৎস-সন্ধান করতে হবে। প্রথম অনুসন্ধিৎসু বোধ হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। 'পরিচয়' 'অগ্রণী' 'নতুন সাহিত্য' ইত্যাদি পত্রিকার মাধ্যমে এই রীতির আবর্তিত বিবর্তন।

ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষাপটে বাংলার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিচার শুরু করেছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। 'লোকসাহিত্য' ও 'সাহিত্য' (সাহিত্য সৃষ্টি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য) দ্রষ্টব্য। তাঁরই মুখে শোনা—'সংসার মুখে যাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধন-জন-মান চায়। ধনপতির মত ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না, বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল। তাই শক্তি যখন সকলকে শোষণ করিতেছিল, উচ্চ যখন নীচকে দলন করিতেছিল, তখনই সে প্রেমের কথা বলিয়াছিল।' এই যে 'তখনকার কাল' দিয়ে 'তখনকার সাহিত্য'-বিচার—এ তো ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক রীতির মূল কথা। তথাপি দুয়ে অনেক প্রভেদ; উভয়ের নিশানা এক হলেও নিশান আলাদা। আধুনিক ঐতিহাসিক সমালোচক মার্কস্-এঙ্গেলস্-লেনিনের ব্যাখ্যাত সূত্রকে অবলম্বন করে, কড্ওয়েল-এরেনবুর্গ প্রভৃতির অনুসরণে এই রীতির অনুশীলন ও প্রয়োগ করেন। বিমলচন্দ্র সিংহ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নীহাররঞ্জন রায়, গোপাল হালদার, বিষ্ণু দে, নীরেন্দ্রনাথ রায়, অরবিন্দ পোদ্দার, শিবনারায়ণ রায় প্রভৃতির লেখনীমাধ্যমে ঐতিহাসিক সমালোচনা-পদ্ধতি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমেই সুষ্ঠু রূপ লাভ করতে থাকে। আবার ব্যর্থ অনুকরণও অনেক ক্ষেত্রে—যেখানে ঝাঁজটি ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের, কিন্তু আস্বাদ শিল্প তথা রসবাদের কিংবা শূন্যবাদের। একেবারে শেষেরটির উদাহরণ—গুণময় মান্নার 'রবীন্দ্রনাথ'।

৪

সাময়িক পত্রের ইতিবৃত্তের সঙ্গে সমালোচনার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুতঃ, আধুনিক সমালোচনার আবির্ভাব পত্রিকাবাহনে। উনবিংশ শতাব্দীর সেই ঝড়-বাদলের দিনে আলোর রেখার মত নানা নতুন উদ্যম দেখা দিতে থাকে। 'ক্লব' 'সোসাইটি' তাদের অন্যতম। এই সব জায়গায় মাঝে মাঝে সাহিত্যালোচনা হত; পঠিত প্রবন্ধগুলির লিখিত রূপ সাময়িক পত্রে বিবৃত হত। সাগরপার থেকে ভাসিয়ে-আনা বিদেশী বইগুলির সটীক ও

সমূল্য তালিকা ইংরেজী কাগজে নিয়মিত বিজ্ঞাপিত হত। তার অনুকরণে প্রাথমিক স্তরের বাংলা সাময়িকী সমালোচনাও ছিল গ্রন্থপরিচিতির তুল্য: 'ভারতবর্ষীয় বর্তমান গ্রন্থকারকুলের কল্যাণ সাধনাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য' (কালীপ্রসন্ন সিংহ)। সমালোচক তখন 'সাহিত্যের সংবাদদাতা'। বঙ্কিমচন্দ্র এই ধরনের সংক্ষিপ্ত সাংবাদিক সমালোচনার বিরোধী ছিলেন; কারণ—'গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে। কেবল সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক নহি।' কিন্তু অনিচ্ছা স্থায়ী হতে পারে নি। ১২৭৯ সালের কার্তিক মাস থেকে বঙ্গ-দার্শনিক রিভিয়্যু-রসের পরিবেষণা শুরু হল। দুটি নমুনা আস্বাদন করা যেতে পারে: 'বীরাঙ্গনা উপাখ্যান' সম্পর্কে—'এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে কয়েকটি কাব্যেতিহাস কীর্তিত, এবং কয়েকটি আধুনিক স্ত্রীলোকের চরিত্র সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই।' 'কাব্যমালা' সম্পর্কে—'কাব্য মিষ্টান্নের ন্যায় অখণ্ড মধুর। এই মিঠাইয়ের ময়রা কে, তাহা গ্রন্থে প্রকাশ নাই। আমরা জানিও না। জানিতে পারিলে তাহার দোকানে কখন যাইব না। তাঁহার দ্রব্যগুলিন্ একে তেলে ভাজা, তায় বাসি।'

বুক-রিভিয়্যুর প্রথমকালের এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে হতে প্রচার-বান্ধব-ভারতী-সাধনা-সবুজপত্রে বিচিত্র বিস্তৃতি লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ-পরিচিতিকে আরও সাহিত্যিক করে তুললেন। সেই পথে পুস্তক-পরিচয়ের ক্রমিক আত্মপরিচয়। কোথাও সামান্য সটীক উল্লেখ, কোথাও ভালমন্দের একটু লিপিলেখ থেকে বিস্তৃত আলোচনার প্রসার। ইঞ্চি আর কলাম্ মেপে সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট, নিষ্প্রমাদ মুদ্রণ, ছাপা বাঁধাই সুন্দর, অথবা স্পেস্ মেক্-আপার্থে কিঞ্চিৎ বক্রোক্তি কি কাব্যোক্তির রীতি এখন বিগতযৌবনা। আবার সার্থক সমালোচকের হাতে 'গ্রন্থবার্তা' সাহিত্য হয়ে ওঠে, যা মনকে দুলিয়ে দেয়, যা রমণীয়। চেস্টারটন, প্রিস্টলী, বেনেট কি হিলেয়ারী বেলক-এর রূপরেখামনোহর সাংবাদিক প্রবন্ধের মত।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় একটি কথা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাংবাদিকতা অনেকটা অটোক্র্যাট; তার কবলে পড়ে সাহিত্যের যে রূপান্তর ঘটে তা তার সত্য রূপ নয়। সংবাদপত্রধৃত সমালোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু তার দাবি মেটাতে 'রম্য সমালোচনা'র আবির্ভাব অনভিপ্রেত। কম্প্টন-রিকেটের বকলমে—'The literature of today is like the young lady of Riga who went for a ride on a tiger. Journalism is the tiger, and the two should ever prove good friends ;···They returned from the ride with the lady inside, and a smile on the face of the tiger'। আমাদের সমালোচনা তথা 'সাহিত্যবিদ্যাবধূ'র এই আকাঙ্ক্ষা যে জাগে নি তা নয়, কিন্তু যাতে সীমা না অতিক্রম করে সেদিকে সমালোচকের সজাগ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

৫

এই হল বাংলা সমালোচনার সূচীপত্র। তার কথা-শরীরের ইতিহাস বিরাট ও বিচিত্র, বিভিন্ন রীতির মধ্যে সামান্য সাদৃশ্য ও তীরকাঠির ব্যবধান। সাদৃশ্য কোথাও ঐক্যমুখী, কোথাও ব্যবধান বিপরীতমুখী। আধুনিক বাংলা সমালোচনার ঐশ্বর্য এখানে; আবার সমস্যাও এখানে।

সদ্য-আলোচিত রীতিগুলিকে দু ভাবে শ্রেণীবিভক্ত করে দেখা যেতে পারে। প্রথমতঃ প্রকৃতির দিক থেকে। এজরা পাউণ্ড দুটি শ্রেণীনির্ণয় করেছেন: লিটারেরি ও আকাদেমিক—ভাববাদী সাহিত্যিক সমালোচনা ও গবেষণা-মূলক অধ্যাপকোচিত সমালোচনা। প্রথমটিতে, ব্যক্তিগত কাব্যবোধ ও দার্শনিকতার প্রশ্রয়ে রস-আলোচনা; দ্বিতীয়টিতে, সাহিত্যতত্ত্ব বা দর্শনতত্ত্বের আশ্রয়ে সূচীবদ্ধ বিচারণা। একটিতে ব্যক্তির সাক্ষ্য, অন্যটিতে বস্তুর স্বাক্ষর। বলা বাহুল্য, কবি-সমালোচক পাউণ্ডের রায় কবি-প্রবন্ধের সপক্ষে।

নীতি বা দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে বাংলা সমালোচনাকে আর এক ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। প্রথম, রসমৌল কলাকৈবল্যবাদী সমালোচনা; দ্বিতীয়, যুক্তিনিষ্ঠ শিল্প-শাস্ত্রবাদী সমালোচনা; তৃতীয়, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী সমালোচনা। কলাকৈবল্যবাদী আত্ম-অনুভূতিনির্ভর ছায়া বা রস-সমালোচনার অনুরাগী; শিল্পশাস্ত্রবাদী শাস্ত্রীয় সূত্র অনুসরণে বিশ্লেষণের পক্ষপাতী; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী

তিহাসের বাস্তব কার্যকারণের ভিত্তিতে বিচারণায় বিশ্বাসী। প্রথম দুই ধারার আলোচনায় সমাজজীবনের তিবৃত্ত উল্লিখিত হলেও শিল্পী ও শিল্পকে অনন্যপরতন্ত্র লে মেনে নেওয়া হয়; শেষ ধারার আলোচনায় শিল্পী ও শিল্পের অনন্যত্ব উল্লেখ করেও উভয়কে বহুবচনান্বিত সামাজিক শক্তির স্ফুলিঙ্গ বলে মনে করা হয়।

[সাংবাদিক সমালোচনাকে একটি স্বতন্ত্র রীতি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সে কেবল ভঙ্গি ও প্রকাশ-বৈচিত্র্যের দিক থেকে। ভাবের বিচারে, এগুলি ওপরের তিনটি রীতির কোন-না-কোন একটির আওতায় পড়ে। সুতরাং স্বতন্ত্র আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।]

আধুনিক সমালোচনা-পদ্ধতির প্রায় সবগুলিই বাংলা সাহিত্যে অনুশীলিত হয়েছে। কতকগুলি বাতিল হয়ে গেছে, কতকগুলি আমরা অতিক্রম করে এসেছি, কতকগুলির অনুশীলন করছি। এবং সকলের রূপ মোটামুটিভাবে উল্লিখিত তিনটি শ্রেণীতে সংহত হয়েছে বলা যেতে পারে। এদের আবার নানা উপশ্রেণী, সমালোচকভেদে বৈচিত্র্য-পার্থক্য স্বাভাবিকভাবে বিদ্যমান। ফলে, একই গ্রন্থের বিচিত্রগামী ও বিভিন্নমুখী, এমন কি বিপরীত সমালোচনাও প্রকাশমান। এই অবস্থা যেমন চিত্তের সজীবতার লক্ষণ, তেমনই সমস্যারও লক্ষণ। কেউ কেউ বলতে পারেন: থাক্ না সবগুলিই; একই বইয়ের ভিন্ন রীতির সমালোচনা চিন্তার খোরাক জোগাক পাঠকচিত্তে, ভাবের আন্দোলন দোলা দিতে থাকুক ভাবুক হৃদয়কে।

উত্তম ও সাধু প্রস্তাব। ব্যক্তি যখন স্বতন্ত্র, রুচি ও রসবোধ যখন বিভিন্ন, তখন নানা দিক থেকে সমালোচনা ভাবিয়ে তুলুক মনকে। বিশেষতঃ যখন আজকের দিনের মানুষের ভাবনা একটা শ্রেণীবদ্ধ রেখার বাইরে সহজে যেতে চায় না। তার সামনে তৈরী হোক আরও কয়েকটি রাস্তা; সে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকুক; তুলনামূলক বিচার করুক; তারপর প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাক সেই পথে, যে পথে গেলে সে সবচেয়ে সুখী ও খুশী হয়।

কিন্তু আমার বক্তব্য এদিক থেকে নয়।

যাকে জানতে চাই বুঝতে চাই তাকে সর্বাংশে সম্পূর্ণভাবে জানাই তো সত্য করে জানা। আলোচিত রীতিগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেই আছে সত্যজ্ঞানের আভাস। তাদের স্বতন্ত্র 'কোটারি'তে বহুধা-বিভক্ত করে রেখে নয়, কাকেও বিয়োগ করে নয়, সবগুলির সামঞ্জস্য বিধান করে তবেই সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভের অভিমুখে অগ্রস্থিতি সম্ভবপর হতে পারে।

সাহিত্য ব্যক্তির, বস্তুর, আবার শিল্পেরও। তাতে মন আছে, মাটি আছে, গড়নও আছে। ব্যক্তিগত অনুভূতি ও শাস্ত্র-অনুগামী সমালোচনা এর একটি বা দুটিকে জানায়; মাটি তথা সমাজজীবনের সঙ্গে শিল্প ও শিল্পীর যোগকে ততটা পরিস্ফুট করে তোলে না। বাংলা সমালোচনায় বিজ্ঞানবুদ্ধির চেয়ে ভাবাবেগের প্রাবল্য একটু বেশী; আলোচ্য রীতি দুটি সেই ভাবের আবেগকে আরও বেগবান করে তোলে। ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক সমালোচনা (অন্ততঃ এখনও পর্যন্ত এই রীতিটি যেভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে) সাহিত্য ও ইতিহাসের সম্পর্ক তথা সাহিত্যিকের পরিবেশ-নির্ভরতাকে পরিস্ফুট করে তুলতে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কার্যকারণ ও শ্রেণীসংঘাতকে যতটা প্রাধান্য দেয়, ততটা সমাজনৈতিক অন্যান্য বিষয় ও বিষয়ী সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্পর্কে নয়। অপিচ সৃষ্টির উৎস-সন্ধানে ও মূল্য নিরূপণে রীতিটি যতটা কুশলী, পাঠকচিত্তকে রসের গভীর অবগাহনে নিয়ে যেতে ততটা সক্ষম নয়। অথচ সাহিত্যরসের আস্বাদন (প্রাচীন নয়, আধুনিক অর্থে) তো কায়িক ছায়ামাত্র নয়, যেমন মাটি নয় আকাশের মত নিরুদ্দেশ। সাহিত্যের রসাস্বাদ পেতে চাই শিল্পের আধারে; সেই সঙ্গে চাই মনের সবুজ তাপ আর মাটির শ্যামলিমাকেও।

দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রথম সংস্করণ পাঠকালে রবীন্দ্রনাথের মানসিক প্রতিক্রিয়া: 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার যে আছে, তাহা আমরা জানিতাম না,—তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয় স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।' দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠান্তে: এই গ্রন্থের মধ্যে 'বাংলাদেশের বিচিত্র শাখা-প্রশাখাসম্পন্ন ইতিহাস-বনস্পতির বৃহৎ আভাস আমরা দেখিতে পাইয়াছি।' 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' সৃষ্টি নয়, ইতিহাস; কিন্তু আমাদের প্রয়োজন ওই আস্বাদন-প্রক্রিয়াকে—যা থেকে কবি করলেন সমালোচনা, কবি-কাব্য-ইতিহাস মিলিয়ে অপরূপ বিশ্লেষণ। এই জানাই

তো সত্য করে সমগ্রভাবে জানা—সামাজিক পট, সাংসারিক ভূমিকা, সৃষ্টিকৌশল স্রষ্টার প্রতিভা সব মিলেমিশে কেমন করে হল সেই একটি অপূর্ব মালা। জানাতেও হবে এমনি ভাবে। এক দিকে যেমন 'All history must be studied afresh, the condition of existence of the different formation of society must be individually examined; তেমনই অন্য দিকে মনে রাখতে হবে, 'man creates...according to the laws of beauty'; 'রূপ ফোটানো এবং রস পছানো এই দুই কাজ হল শিল্পীর'। ইতিহাসকে জানতে হবে গভীর ও ব্যাপক ভাবে, দৃষ্টিপ্রদীপ জ্বালতে হবে সুন্দরের সন্ধানে। মাটি ফুল আর সেই ফুল যে গাছের।...অতএব।

অতএব উল্লিখিত রীতিগুলিকে গ্রহণ-বর্জনের মাধ্যমে যোগ করলে সু-ফলশ্রুতির সম্ভাবনা। এক নয়, একাকার নয়, ঐক্যবদ্ধ করে, বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্য-বিধান করে যে সমালোচনারীতি পাওয়া যাবে তাই সত্য ও সম্পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা হয়ে উঠবে। শুধু যোগ নয়, আরও কিছু।

ইতিহাস ও ভূগোল, সমাজ ও সংসার, দেহ ও মন, ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা, ধর্ম ও কর্ম, বাস্তব ও কল্পনা, প্রজ্ঞান ও বিজ্ঞান, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, এক ও বহু—সব মিলিয়ে মানুষ: এই হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের গোড়াকার কথা। সেই 'all-sided being' মানুষের রচনা সাহিত্য-শিল্প। তার সমালোচনাও 'all-sided manner'-এ হওয়া উচিত। শুধু উচিত নয়, নান্য পন্থাঃ। কারণ এই-ই বিজ্ঞানসম্মত sociological approach—সমাজবিদ্যার অনুগামী সর্বতোমুখী সমালোচনা। আগে তত্ত্বের কাঠামো তৈরি করে তার দ্বারা সাহিত্যের বিচার নয়; তাতে তথ্যের অনেকখানিই বাইরে পড়ে থাকে। আগে তথ্যের সমাবেশ; তারপর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ মাধ্যমে সেগুলির স্বরূপ নির্ণয়। মাপকাঠি হবে সর্বঙ্কর সমাজবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান। এর মধ্যে সবাইকে ধরবে, সবই ধরবে। সৃষ্টিকালে অন্তরঙ্গ-বহিরঙ্গ প্রাচীন-নবীন ঐতিহ্য-স্বকীয় আত্ম-সমাজ ব্যক্তি-বস্তু ইত্যাদি যতগুলি কার্যকারণ শিল্পের মধ্যে নিহিত হওয়া সম্ভব, সে সমস্তের সম্পূর্ণ বিচার এই সমাজতাত্ত্বিক বিচারণার মাধ্যমে হতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক এষণার পথে আজকের সমালোচনা-রীতি সমস্যার সমাধান: যেখানে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ, আবে ও যুক্তির সমন্বিত মুক্তি, সত্যের সম্পূর্ণ ও স্বতঃ উদ্ঘাটন কাল-কলা-কলাবিদের মাটি-মন-মূর্তির অসংশয়িত সমাহার। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রজ রবীন্দ্রনাথ পূর্বোল্লিখিত তাঁর প্রবন্ধ দুটি এই সার্বিক রীতির দৃষ্টান্ত তাঁর 'সমাজ' গ্রন্থের "ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা" এ রীতিপদ্ধতির প্রদর্শক। এবং এইখানেই প্রচলিত ঐতিহাসিক সমালোচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক আলোচনার মূলগত পার্থক্য।

এই পথ ধরে আলোচনা বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়ে গেছে; এবং আরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে পাশ্চাত্ত্য সমাজবিজ্ঞানীদের ঘনিষ্ঠ মানস-সাহচর্যে। শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বিনয় ঘোষ, আশুতোষ ভট্টাচার্য, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সাম্প্রতিক গবেষণা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মূলতঃ ধর্ম-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সমাজবিজ্ঞানী সমালোচনার মানদণ্ডটি প্রযুক্ত। আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতির আসরে এর প্রয়োগকলার যে পরীক্ষা চলছে, তাতে সাফল্য অদূরপরাহত।

ঐতিহাসিক দ্বান্দ্বিক সমালোচনা এই সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অভিমুখে যেতে চাইছে; যাঁরা কলাকৈবল্যবাদী বা শিল্পশাস্ত্রবাদী তাঁরাও এর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারছেন না। তার পরিচয় সম্প্রতিকালের বিভিন্ন সমালোচনায় আভাসিত। আজকের পথবাহুল্যের মাঝে এই ঠিকপথ নিরূপণের সমস্যা বাংলা সমালোচনাক্ষেত্রের সামনে। রসবোধ ও ইতিহাসবোধ, শিল্পী ও শিল্প, পরিবেশ ও আবেশ সব মিলিয়ে সবাইকে নিয়ে সার্বিক সমালোচনার সত্যতম পথের মুখোমুখি আমরা। এখন নিজেকে জানা, পরকে জানা, পথকে চেনা: তা হলেই জানতে পারব মানুষকে জীবনকে জগৎকে সত্যকে সমগ্রকে; নিজেকেও। সমালোচনা তো সাহিত্যের নয় সমাজের নয় শিল্পের নয় বিজ্ঞানের নয়; আসলে মানুষেরই: The proper study of mankind is man। সাহিত্য-সমালোচনার মাধ্যমে আমরা সেই জীবনধৃত total মানুষকেই জানি, যে মানুষ সামাজিক মননশীল আবার আত্মনিষ্ঠ রসিক শিল্পী। বৈজ্ঞানিক সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা আমাদের সেই কাব্য-জিজ্ঞাসা তথা জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরলোকে পৌঁছে দিতে পারে। সুলভ করতে পারে সেই প্রতিভাকে যাকে উদ্দেশ করে সোপেনহুর একদা বলেছিলেন—'Criticism is a rare avis, almost as rare as the Phœnix which appears only once in five hundred years'।

প্রবন্ধ-সাহিত্য, প্রবন্ধ-লেখক ও বুদ্ধিজীবীর সমস্যা

নির্মল মুখোপাধ্যায়

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের সমস্যা রয়েছে এবং সে সম্পর্কে আমরা ক্রমশঃই সচেতন হয়ে উঠছি, এ উক্তি ছল্যমাত্র। বাংলা ভাষায় ভাল প্রবন্ধ হচ্ছে না, তেমন ান চিন্তাশীল মনের সন্ধানও তাতে পাওয়া যাচ্ছে না— অভিযোগও প্রবন্ধ-উৎসাহী পাঠক করেছেন। আমি জেও এ কথা ভেবেছি, এবং এই সূত্র ধরেই বাংলা প্রবন্ধ- হিত্যের দু-একটা সমস্যার কথা উল্লেখ করব। আমার সম্পর্কে কোন সংশয় নেই যে, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য ্যাই গতিহীন এবং তার প্রকৃতি একান্তভাবেই অনির্দেশ্য নিরাকার। কিন্তু এ উক্তিও যথেষ্ট নয়। মৌলপ্রশ্ন চ্ছ সেই গতিশূন্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যায় কি না, ইটে দেখা। আর এও মনে হয় যে, বাংলা প্রবন্ধ- খকের নিজস্ব সমস্যাকেও বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ্রতার স্বরূপ-বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত করেই অনুধাবন করা নকটা সহজ ও যুক্তিযুক্ত। কারণ, বাংলা প্রবন্ধ- হিত্যের বর্তমান অবস্থার গভীরে যেমন এক দিকে রয়েছে াজগত, ভাবগত এবং ভাষাগত কারণ, তেমনই প্রচ্ছন্ন প্রত্যক্ষ ভাবে রয়েছে ভাবগত, ভাষাগত ও সমাজগত রবেশ-সঞ্জাত প্রবন্ধ-লেখকের নিজস্ব সমস্যা। এবং ভিন্ন প্রবন্ধ-লেখকের ভাবমণ্ডলে সেই সমস্যার গভীরতা ্যাপকতার মৌলপ্রশ্ন।

২

প্রথমেই একটা তাত্বিক প্রসঙ্গ অনিবার্য। প্রবন্ধ- হিত্য বলতে যে মৌলভাবটি বুঝি সেইটে পরিষ্কার । তুলতে চাই। নতুন ভাব ও চিন্তা-আশ্রয়ী ধ্যানের ার মাধ্যমে যুক্তিগত রূপায়ণ ও প্রতিষ্ঠাই মনে হয় ন্ধের মৌলসত্তা। অবশ্য, সাহিত্য মাত্রই ভাবনা ও নের ভাষাগত (ভাষা-নিরপেক্ষ অন্য মাধ্যম-আশ্রয়ীও ে পারে) ও যুক্তি-আশ্রয়ী রূপায়ণ, এ সম্বন্ধে কোন হ নেই। কিন্তু, প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে অন্যান্য হিত্যকর্মের পার্থক্য এই ক্ষেত্রে যে, প্রবন্ধ-সাহিত্য ভাব ও ধ্যানের শুধু ভাষা-আশ্রয়ী যুক্তিগত রূপায়ণ নয়, তা পাঠকের যুক্তি ও বুদ্ধির কাছে আবেদন রেখে যুক্তি ও বুদ্ধি-গত অভিজ্ঞতার প্রসার ও বিস্তার ঘটায়। এর অর্থ এই নয় যে, কাব্য ও অন্যান্য শিল্পকর্মের ভিতর দিয়ে আমরা কোন জ্ঞান লাভ করি না কিংবা কোন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হই না। আসল কথা, প্রবন্ধ-সাহিত্য ও অন্যান্য সাহিত্য-কর্মের মধ্যে যে পার্থক্য তা জ্ঞানবিদ্যা-জনিত— epistemological। প্রবন্ধের জ্ঞান বিজ্ঞানজাত জ্ঞান- পর্যায়ভুক্ত। মানুষী যে চেতনার বিকাশ ও উপলব্ধি হয় বিজ্ঞানে, প্রবন্ধ-সাহিত্য-সঞ্জাত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা সেই চেতনাকেই ক্রমপ্রসারিত ও স্পন্দিত করি। তবুও এ সিদ্ধান্ত গ্রাহ্য হয় না যে, প্রবন্ধ-সাহিত্য এবং বিজ্ঞান সমার্থবাচক কিংবা প্রবন্ধ মাত্রই বৈজ্ঞানিক প্রতিজ্ঞার সমন্বয়। প্রবন্ধ-সাহিত্য যে জ্ঞান জন্মায়, সেইটে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-পাঠে যে অভিজ্ঞতা ঘটে এবং সত্তার (existence) যে পরিচিতি আনে, তা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্য-সম্বন্ধীয় আলোচনায় হয় না। অথচ, এ দুয়ের মধ্য দিয়েই পাঠকের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের বিস্তার হচ্ছে। তবে, এ দুয়ের প্রকৃতি কী? প্রথম ক্ষেত্রে পাঠক একটি অনন্ত অভিজ্ঞতা ও অনুভবের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হচ্ছেন; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, পাঠক ওই-জাতীয় অভিজ্ঞতার অর্থ সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে একাত্ম হচ্ছেন। কাব্যের ক্ষেত্রে পাঠক অনুভব, ভাব ও অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়ান—ওই অভিজ্ঞতা পাঠক-হৃদয় ও চিত্তে প্রত্যক্ষভাবে উদ্‌ঘাটিত ও প্রতিবিম্বিত। অধিকন্তু, কোন কাব্য-আলোচনা কিংবা শিল্পতত্বই শিল্পের মূল্য উপলব্ধি (value realization) প্রত্যক্ষভাবে কোন ভাবেই ঘটায় না—তার যাথার্থ্য উপলব্ধির সহায়তা করে। শিল্পে পাই realization of meaning, প্রবন্ধ-সাহিত্যে পাই analysis of meaning। উভয়ই মূল্যাশ্রয়ী; কেন না, অর্থ মাত্রই মূল্য- বাচক। কাজেই, analysis of meaning এবং realization of meaning—এর মধ্যে কোন বিরোধ

দেখি না। উভয়কেই মূল্য উপলব্ধি ও অভিব্যক্তির দুইটি স্বতন্ত্র মাধ্যম বলে গণ্য করতে হয়। অনিবার্যতঃ, কাব্য এবং প্রবন্ধের উপলব্ধি স্বতন্ত্র ও অনন্য। হয়তো এ কারণেই গভীর ধ্যানযুক্ত ও চিন্তা-প্রসূত মৌলিক প্রবন্ধ অনেক সময় কাব্যের ভ্রম জন্মায়।

৩

প্রবন্ধ-সাহিত্যের এই মৌলচরিত্র থেকেই এ কথা উপলব্ধি করা অনেকটা সহজ যে, ভাবনা ও ধ্যানের সার্থক ও যথার্থ রূপায়ণে উৎসাহী কোন নূতন প্রবন্ধ-লেখকের একটি অন্যতম সমস্যা ভাষা-মাধ্যম। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে আমরা প্রচুর গ্রহণ করেছি; তাঁদের ব্যবহৃত ভাষা ও শব্দ আমরা নিজেদের অজ্ঞাতেই ব্যবহার করে চলেছি। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, স্বীকার করতে হবে যে আমরা যে ভাবে এবং ভাষায় ধ্যানকর্ম ও ভাবনা-গুলিকে গ্রথিত করতে ও সাজাতে চাই—সহৃদয় পাঠকের কাছে পরিবেষণ করতে উৎসাহী হই, তার কোন কার্যকরী নির্দেশ রবীন্দ্রনাথেও পাই না, প্রমথ চৌধুরীতেও পাই না। আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে বলা যায় যে, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাষা-ভাণ্ডার এখনও দরিদ্র ও দুর্বল। এমন কি, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত ভাষাসম্পদকেও যাঁরা আপনাদের ভাবনার দ্বারা কিছুটা নতুন ভাবে জানতে চেষ্টা করেছিলেন, এবং নিজেদের ভাবকে কিছুটা বা ব্যক্ত করতেও পেরেছিলেন, তাঁদের ভাষা-আশ্রয়ী প্রধান দিকটা বড় কার্যকরী বলে মনে হয় না। কেননা, তাঁদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি এতই মেজাজী ও আত্ম-কেন্দ্রিক সুরে বাঁধা যে, তা শুধু কিছু বিশেষ ধরনের বক্তব্য প্রকাশেই সহায়তা করতে পারে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ লেখক-গোষ্ঠী সম্পর্কে এ উক্তি প্রায় দ্বিধাহীন ভাবেই করা যায়। এঁদের প্রবন্ধের বক্তব্য ও যুক্তি ব্যক্তিগত মেজাজের প্রভাবে মাঝে মাঝে এতই প্রভাবান্বিত যে, অনেক ক্ষেত্রে তা বুদ্ধির কাছে ততটা আবেদন জানায় না; বরং তা পাঠক-চিত্তে কতকগুলো বিশেষ শব্দ-কেন্দ্রিক রূপকর্ম রূপেই প্রতিভাত হয়ে ওঠে। এঁরা ততটা ভাবান না যতটা ভাবের (emotion) উদ্‌বোধ জাগান। অবশ্য আমি জানি, সব প্রবন্ধই কোন না কোন ভা (emotion) উদ্‌বোধক অর্থাৎ ভাবের উদ্‌বোধন রচন প্রতি পাঠকের চিত্ত-সংযোগের অনিবার্য পরিণতি। এ রচনার দোষ ঘটে না; কিন্তু যেখানে ওই ভাবই প্রধান হ উঠতে চায়, বিষয়বস্তু কিংবা বক্তব্যের যুক্তিকে ক্ষীণ কর তোলে, সেখানেই আপত্তি। আমার মনে হয়, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের এ-দিকটা অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল ও প্রতিষ্ঠিত এর অন্যান্য কারণ উল্লেখ না করে এখানে আমি শু একটা ভাষাগত কারণ নির্দেশ করতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী-কৃত বাংলা প্রবন্ধের ভাষা ভাবের (emotion) বিষয়কে যতটা স্পষ্টতর ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব, ভাব-অতিরিক্ত ও পরিশোধিত বুদ্ধি ও যুক্তিকে ততটা নয়। অবশ্য, এখানেই প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্যভঙ্গি ও ভাষা নিয়ে তর্ক ওঠে। ওই তর্কে অংশ গ্রহণ না ক আমি শুধু বলতে চাই যে, প্রমথ চৌধুরীর বক্তব্য ও বলা ভঙ্গিতে বুদ্ধি ও যুক্তির আভাস স্পষ্ট; এবং তিনি নিজে বুদ্ধির উপর আস্থাবান থেকেও তার বক্তব্য প্রকাশ-মাধ্যমকে পরিপূর্ণ বুদ্ধি ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের একান্ত বুদ্ধিনির্ভর ও যুক্তিপ্রধান ভাষা গড়ে ওঠার জন্য যে ধরনের পরিধি-বিস্তীর্ণ সর্বতোমুখী মানস-বিবর্তন ও চিত্ত-জাগরণের অনিবার্যতা স্বীকার্য, নান ঐতিহাসিক কারণে তা বাংলা দেশে স্পষ্ট হয়ে উঠলে তা সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ইতিহাস, ইতিহাস-দর্শন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান-দর্শন কিংবা সাহিত্যতত্ত্ব ও দর্শনের উল্লেখযোগ্য কোন চিহ্ন বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে নেই। বিগত শতকের চিত্ত-জাগরণের সূচনায় সে সম্পর্কে কিছু উৎসাহ ও প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। কিন্তু, ক্রমবর্ধমান প্রচেষ্টা ও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তা কোন নির্দেশ্য আশ্রয়ভূমি স্থাপন করতে পারে নি। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তুলনা করে কোন কিছু প্রমাণ কর অসমীচীন। শুধু স্মরণ করা যেতে পারে, দীর্ঘদিনের মানস-বিবর্তন ও ঘটনা-সংঘাতের মধ্য দিয়ে ইংরেজী ভাষা আজ যে পর্যায়ে উপনীত তাতে আজ অন্ততঃ কো নতুন লেখক এই অনুযোগ করেন না যে, তাঁর বিষয় বক্তব্যকে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ভাষা প্রতিবন্ধক। শু তাই নয়, আর্নল্ড জে. টয়েনবীর সম্প্রতি-সমাপ্ত ইতিহাস

গ্রন্থের সঙ্গে এডওয়ার্ড গিবনের তুলনায় পাঠকমাত্রই অনুভব করবেন যে, টয়েনবীর কত আগেই ইতিহাস-চর্চার ভাষা কত বুদ্ধি ও যুক্তি-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। জ্ঞানের অন্যান্য দিকে এই একই কথা বলা যায়। ফরাসী ভাষা সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। আঠারো শতকের আগে থেকে শুরু হলেও আঠারো শতকের সর্বত্রগামী ও সর্বতোমুখী চিন্তা-বিপ্লব ও চিত্ত-জাগরণের মধ্য দিয়ে ফরাসী ভাষা চিন্তাশীল ভাবের যোগ্য প্রকাশ-মাধ্যম প্রস্তুত করে দিয়েছে। জর্মান প্রবন্ধ-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। আমি আগেই বলেছি, এ-কথা স্মরণ করার মধ্যে বাংলা ভাষার মৌলসীমাবদ্ধতা কিংবা সংকীর্ণতা প্রমাণ করার যুক্তিহীন প্রচেষ্টা নেই। শুধু মননশীল রচনায় ও বক্তব্য প্রকাশে উৎসাহী আধুনিক প্রবন্ধ-লেখকের সমস্যার সূত্র হিসেবেই ব্যাপারটা দেখতে হবে। কারণ, এ কথা তো ইতিহাস-গ্রাহ্য যে প্রচলিত ভাষা নূতন লেখকের ভাবনা-রসে আপ্লুত ও ধ্যান-বিধৃত হয়ে কিছুটা নূতন ভাবে ব্যাপ্ত হয়ে উঠবেই। কিন্তু, এখানে তো প্রতিভা ও মনীষার প্রশ্নও এসে যায়। বলা বাহুল্য, সেইটে একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশ্ন, যার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

৪

নূতন প্রবন্ধ-লেখক শুধু এই ভাষাগত সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নেই। তিনি অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে আছেন আরও ব্যাপক সমস্যার সঙ্গে। প্রবন্ধ-লেখক তাঁর প্রায়-আয়ত্ত কিছু ভাব প্রকাশেই উৎসাহী। আমার নিজের ধারণা, ভাবের সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য একটা পরিবেশের প্রয়োজন। এমন কি, চিন্তার ইতিহাস স্মরণ করলেও দেখা যাবে অনুকূল পরিবেশের অভাবে অনেক বড় ও যথার্থ সৃষ্টিশীল চিন্তাকর্মও দীর্ঘদিন মর্যাদা পায় নি; শুধু তাই নয়, যথার্থভাবে নিজেকে প্রকাশও করতে সমর্থ হয় নি। কিছু মহৎ চিন্তা করলেই যে তা স্বীকৃতি ও বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ পাবে, এমন নিশ্চয়তা নেই। বিখ্যাত দার্শনিক আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেড তো এ সত্যটি একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।

একজন প্রবন্ধ-লেখক, সমাজে যিনি বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত, তাঁর পরিবেশ বলতে আমরা প্রধানতঃ কয়েকটি অবস্থার সমাবেশ বুঝি। প্রথমতঃ, প্রচলিত বুদ্ধি, চিন্তা ও আদর্শগত অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধিজীবীর নিজস্ব সামাজিক অস্তিত্বের অবস্থা। এবং তৃতীয়তঃ, প্রচলিত আদর্শ ও চিন্তার গোষ্ঠীবিন্যাস ও অভিব্যক্তির প্রকৃতি। এ তিনের সমাবেশে গঠিত বাংলার বুদ্ধিজীবীর পরিবেশে একটা অসঙ্গত ও সাযুজ্যহীনতার লক্ষণ অতিমাত্রায় প্রকট। বিগত অর্ধ শতকের নব-জাগৃতি ও চিত্ত-জাগরণ-বিরোধী শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রসার ও ব্যাপ্তি বাংলা বুদ্ধি, চিন্তা ও আদর্শের ভিত্তিভূমিকে কক্ষচ্যুত করেছে। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, হিন্দু পুনরভ্যুত্থান এবং সর্বশেষে সাম্যবাদ বুদ্ধিজীবীর মানসকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছে। বুদ্ধিজীবীর চেতনার প্রাথমিক স্তরে যে বুদ্ধিবাদ ও যুক্তিবাদের সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল তা দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায়। এর মধ্যে সাম্যবাদও এসে পড়েছে। আমার নিজের ধারণা, সাম্যবাদ ও মার্ক্সবাদের প্রতি বাংলার বুদ্ধিজীবী অতিমাত্রায় ঝুঁকে পড়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ, বাংলার বুদ্ধিজীবীর চেতনায় যুক্তি-বিরোধী সত্তার নির্জ্ঞান অধিকার ও বিস্তার। ইউরোপে বুদ্ধিজীবীর একটি অংশের সাম্যবাদের প্রতি আকর্ষণ মূলতঃ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্য-কারণজনিত। কিন্তু, বাংলার বুদ্ধিজীবীর সেই আকর্ষণটা বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তা হয় নি বলেই এ সন্দেহ আরও বেশী। চিন্তার ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে তাই দেখা গিয়েছে যে, সাম্যবাদ ও মার্ক্সবাদের প্রতি উৎসাহী ও সচেতন হয়ে ওঠা সত্ত্বেও বাংলার চিন্তা-জগৎ বুদ্ধি ও যুক্তির বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয় নি। অর্থাৎ, সাম্যবাদ এবং মার্ক্সবাদের প্রতি বাংলার বুদ্ধিজীবীর যে নিবিড়তা এবং যে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ততটা বুদ্ধি ও যুক্তি-আশ্রিত নয়, যতটা অনুভব-কেন্দ্রিক। বুদ্ধিজীবীর ওই আকর্ষণ ঘটেছিল সেই অনুভবে যা একদা জাতীয়তাবাদকে সার্বভৌম শক্তি বলে গ্রহণ করেছিল।

অন্য দিকে, মার্ক্সবাদ কিংবা সাম্যবাদ-নিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী-মানস জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণাতেই লালিত-

পালিত হচ্ছিল। এবং তা অত্যন্ত সংকীর্ণ পথে পরিচালিত হয়েছিল। এর ব্যাবহারিক নজির পাওয়া কষ্টসাধ্য নয়। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বছরের মধ্যে ওই মানস-সঞ্জাত কোন উল্লেখযোগ্য ধ্যানকর্মের পরিচয় পাওয়া কষ্টকর। কিছু ভাল ও সুলিখিত রচনা অবশ্যই হয়েছে।

আসল কথা, এর পিছনে একটা ঐতিহাসিক ও সমাজগত কারণ রয়েছে, এবং সেইটি এখানে স্মরণীয়। আমাদের নব-জাগৃতি ও চিত্ত-জাগরণের মধ্য দিয়ে সনাতন ও সাবেকী ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের মৌল-ভিত্তিটিই ভেঙে গিয়েছিল। অথচ, পরিবর্তে তেমন কোন বলিষ্ঠ, প্রতিশ্রুত ও আত্মপ্রত্যয়শীল মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি; এবং মূল্যবোধ ও জীবনবোধের ক্ষেত্রে একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয় ক্রমবর্ধমান ধর্ম-আশ্রিত ও মিথ্-সর্বস্ব চেতনার বিকাশের মধ্য দিয়ে। নব-জাগৃতির যুক্তিবাদী ধারার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেশবচন্দ্র-প্রবর্তিত চিত্ত-উদ্‌বোধনের সুর প্রবল হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে, অনেকটা ইউরোপীয় রেনেশাঁস ও রিফর্মেশনের সঙ্গে বাংলার নবযুগ ও ধর্ম-আন্দোলনের একটা বড় সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু, ইউরোপের চিত্তজাগরণের যুক্তিবাদী ধারা এতই বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী ছিল যে তা সামাজিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। বাংলার ক্ষেত্রে তা হয় নি। কাজেই, এক দিকে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও বুদ্ধিবাদের টান এবং অন্য দিকে সনাতন ও ধার্মিক ভারতবর্ষের সর্বগ্রাসী আকর্ষণ, এ দুয়ের চাপে বাংলার বুদ্ধিজীবী প্রায় সূচনা থেকেই বিপর্যস্ত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট, আত্ম-নিপীড়িত এবং শ্রান্ত। এই সুযোগেই মিথ্-(myth)-এর প্রতি মমত্ববোধ ও আকর্ষণ বড় হয়ে উঠেছে। সমাজতত্ত্ববিদের মতে, একটা মিথ্ ছাড়া কোন সময়েই সমাজ চলে না; তেমনই, ব্যক্তি-মানস নিশ্চয়তা, শান্তি ও আত্মনির্ভরতার সন্ধানে মিথের দিকে অগ্রসর হয়ে যায়। জাতীয়তাবাদ, সনাতন ভারতবর্ষের দিকে ফিরে তাকানো কিংবা সাম্যবাদের প্রতি ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা—এ সবই মিথের অনুসন্ধানের আগ্রহ ও উৎসাহ-যুক্ত।

বাংলার বুদ্ধিজীবী বুদ্ধিকে সত্য উদ্‌ঘাটন ও উপলব্ধির চরম আশ্রয় বলে গ্রহণ করতে পারে নি কোনদিনই—এই আমার বিশ্বাস। বুদ্ধিজীবী তাই চিন্তা ও আদর্শের সীমিত গণ্ডীর মধ্যেই অবগাহন করে চলেছেন। এই জন্যই বোধ হয়, Scholarship এবং imagination-এর সার্থক সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বাংলা বুদ্ধিজীবীর রচনায় দুর্লভ।

আধুনিক ও সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন যে, অধিকাংশ আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে সাধারণ সাহিত্য-সমালোচনা কিংবা উনিশ শতকের বাংলার মানস। এ বিষয়বস্তু গুরুত্বহীন, এমন উক্তি অবশ্যই কেউ করবেন না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখার সময় এসেছে। আধুনিক বুদ্ধিজীবীর চিত্তে উনিশ শতকের মানস স্বভাবতঃই আকর্ষণীয় বিষয়। এবং সঙ্গতভাবেই, ওই মানসের বিশ্লেষণ তাঁদের বুদ্ধি ও মননকে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবেই। কিন্তু ওই চিন্তা ও ভাবের তথ্যগত উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণ কী ভাবে এবং কোন্ দিক দিয়ে আমাদের চেতনাকে স্পন্দিত করবে, হয়তো সেইটে আজও ততটা পরিষ্কার নয়। অধিকন্তু, কেনই বা আমরা ওই দিকে এত গভীরভাবে মগ্ন হয়ে পড়ছি, সে সম্পর্কেও হয়তো আমরা খুব একটা সচেতন নই। নইলে, বাংলার বুদ্ধিজীবী চিন্তা, ভাবনা ও জ্ঞানের অন্যান্য দিক অনুধাবন কিংবা explore করতে এতটা অনীহা দেখাতেন না। সাহিত্য-আলোচনা পড়ছি, কিন্তু সাহিত্য ও শিল্পতত্ত্বের প্রতি এত উদাসীনতা ও বৈরাগ্য কেন? নিজেদের দেশের মহারথীদের প্রতি এত আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা, কিন্তু এ যুগের বড় বড় চিন্তা ও চিন্তাবীরদের প্রতি এত বিজাতিভাব কেন? শুধু দেশের নয়, বিদেশের বুদ্ধিবাদী, যুক্তি-কেন্দ্রিক, মূল্য-সন্ধানী ও মূল্য-আশ্রয়ী এবং সর্বোপরি, মানবতান্ত্রিক মতগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখতে আপত্তি কোথায়? অথচ, এটা বর্তমান বাংলার বুদ্ধিজীবীর একটা বড় ও প্রধান দায়িত্ব বলে জ্ঞান করি। শুধু পিছনের দিকে এবং অতীতের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা সম্ভব, এ বোধ ইতিহাসের ভুল-পাঠের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমার সন্দেহ এই যে, বুদ্ধিকে বুদ্ধিজীবী স্বীয় অস্তিত্বের সার্বভৌম সত্তারূপে গ্রহণ করতে বেশ কুণ্ঠা বোধ করছেন অথবা গ্রহণ করতে পারছেন না। এই সঙ্গেই দেখুন আমাদের চিন্তা ও আদর্শের গোষ্ঠীগত বিন্যাস কী ভাবে গড়ে উঠছে। এটা তো সবাই জানে যে, আদর্শ ও

অর্কেস্ট্রায়

অসিতকুমার

রাস্তায় রোদ পড়েছে উপুড় হয়ে,
ক্লান্ত রোদের ধারা—
বিকেলের চোখ জলে জলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
তাকায় উপায়-হারা।
চেয়ে চেয়ে দেখি শহরের কোলাহলে
অর্কেস্ট্রায় বাজায় কে একতারা!

২

কি জানি অবুঝ পরমাণুদের নাচে
হয়তো কোথাও অর্থ লুকোনো আছে।
কেন যে অন্ধ আদিম ঘূর্ণিপাকে
জিজ্ঞাসা জাগে, প্রাণ চমকিয়ে থাকে!
কেন যে সবুজ পাতায় পাতায় ভরে
মৃত্যু নিজেকে রেখেছে গোপন করে।
হয়তো অবুঝ পরমাণুদের নাচে
সবুজ পাতার স্বপ্ন জড়ানো আছে।

৩

আমিও ভেসেছি অনেক স্রোতের পর,
ভেঙেছি অনেক, গড়েছি অনেক ঘর,
অনেক দেবতা-দানব গড়ার পর
পৌঁছেছি এইখানে—

রাজার কুমার গতিবেগে দুর্ধর,
ধূধূ করে জলে উধাও তেপান্তর,
কখনও সওদা মাথায় সওদাগর,
চলেছি স্রোতের টানে।
রাত্রির হাওয়া কানে কানে কথা বলে,
লোকান্তরে কি অলোকের আলো জ্বলে?
মেঘদুর্গে কি জীয়নকন্যা জাগে?

অথবা কি জল, পাথর পলির শেষে,
আদিম পঙ্ক উধাও নিরুদ্দেশে?
সময়ের শব পুষ্পধনুর বেশে
বিদ্রূপ করে অজস্র অনুরাগে!

কেন সংশয়? প্রাণ কি প্রবঞ্চনা?
কেশরে কেশরে বীজের সম্ভাবনা,
মিথ্যা দ্বিধায় হৃদয় অন্যমনা—
কেন বিদ্রোহ? নেতি নেতি করে কারা?

ওঠে পড়ে ঢেউ। আলো নেভে, আলো জ্বলে।
ছায়া আর কায়া আসে যায় দলে দলে।
অবচেতনার অস্ফুট কোলাহলে
অর্কেস্ট্রায় বাজায় কে একতারা!

অসিতকুমার

চিন্তা বর্তমান সমাজ-সংস্থায় গোষ্ঠীনিরপেক্ষ ভাবে ব্যক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব।

ব্যক্তি-মনন ও চিত্তের বিভিন্ন ভাব ও উপলব্ধি গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় গোষ্ঠীর আশ্রয় নিয়েই প্রকাশ পাবে, এতে আক্ষেপ করে লাভ নেই। কিন্তু যেখানে ওই চিন্তা ও ভাবনাগুলি গোষ্ঠী-চেতনা ও অনুভবের অঙ্গ হয়ে পড়তে চায় এবং পড়ে, সেখানেই শঙ্কা। এ বিপদ ও শঙ্কার কারণ ইউরোপে অত্যধিক ঘটেছে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিগত চেতনার বর্তমান পর্যায়ে তা আরও বেশী মারাত্মক পরিণতি লাভ করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ গোষ্ঠীর আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা মূলতঃ পূর্বনির্দিষ্ট সত্য আদর্শ ও আবেগ-সঞ্জাত উত্তেজনা। কাজেই, গোষ্ঠী ও গোষ্ঠী-চেতনা যতই প্রধান হয়ে ওঠে এবং যতই গোষ্ঠী-স্বার্থ ব্যক্তি-মানসকে আন্দোলিত করতে শুরু করে ততই আদর্শ ও চিন্তার যুক্তিবিরোধী সত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। এ ভাবেই ব্যক্তিমনন তার স্বাধীনতা হারাতে বাধ্য হয়ে পড়ে। আর স্বাধীনতাহীন ব্যক্তি তার বুদ্ধির সার্বভৌমত্ব রক্ষায় অসমর্থ ও অক্ষম। বলা বাহুল্য, বর্তমান আলোচনায় গোষ্ঠী, গোষ্ঠী-চেতনা, সামাজিক সংগঠন, চিন্তার স্বাধীনতা ও ব্যক্তি-সত্তার মৌলসমস্যার কোন বিশেষ দিক উল্লেখ করতে চাই না। আমার বক্তব্য এই যে, বুদ্ধিকে (reason) প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এমন গোষ্ঠীর অভাব বাংলা দেশের তরুণ ও নূতন বুদ্ধিজীবী খুব বেশী অনুভব করছেন। অথচ, যাকে আমরা যথার্থ চিত্ত-জাগরণ বলি সেইটে এ ভাবেই সম্ভব।

ভারতীয় সাহিত্যের ঐক্য

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালীদের একটা অপবাদ আছে যে, আমরা নাকি অতিরিক্তভাবে আত্মসচেতন ও নিজের গোষ্ঠীর মধ্যেই ভাবের আদানপ্রদান ও রসসংগ্রহে পটু। এই দুর্নাম হয়তো নিছক নির্জলা মিথ্যাভাষণ নয়। সুজলা সুফলা নদীমেখলা বাংলা দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে ভারতের অন্য প্রদেশেও যুগে যুগে যে রসোজ্জ্বল সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে তার সম্যক্ পরিচয় আমরা কতটুকু রাখি? এই অচেতনতা ঠিক ইচ্ছাকৃত নয়, এর একটা প্রধান রসবান ও ফলবান কারণ, বাঙালীর নিজের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য এমনই দীপ্তিময় যে তা নিয়ে সগৌরবে মশগুল থাকা চলে। মধ্যযুগের কোমলকান্ত পদাবলী বা বৈষ্ণব সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি বেমালুম হজম করে এক শতাব্দীর মধ্যে বাঙালী সাহিত্যে যে যুগান্তকারী বিপ্লব এনেছে তাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন—Achievement enough in a century। তবু দক্ষিণের কবি ও স্রষ্টা সুব্রহ্মণ্য ভারতী যে কথা বলেছেন সে কথা মনে পড়ে: "ভারতমাতার ত্রিশ কোটি মুখ, তিনি আঠারটি ভাষায় কথা কন, কিন্তু তাঁর মন একটি।" যুগ যুগ ধরে এই শাশ্বত মনকে খুঁজতেই ছুটেছেন ভারতের সাধকশিল্পী যোগী-ভোগী জ্ঞানী-গুণীর দল, হিমমজ্জিত তুষারশৃঙ্গ হতে লবণাম্বুরাশির ধার পর্যন্ত—কন্যাকুমারিকা থেকে বদরিকা, দ্বারকা থেকে পরশুরাম-ক্ষেত্র। সেই মনকে তাঁরা খুঁজেছেন শুধু প্রকৃতির বাইরের বর্ণাঢ্য সমারোহের মধ্যে নয়, ঘটনার সমাবেশের মধ্যে নয়, চঞ্চল জনতার উচ্ছ্বাসের মধ্যে নয়, একান্তে নিভৃতে নিজের অন্তরের অমৃতলোকেও। তাই শত বৈচিত্র্য, শত বিভেদ, শত বিবাদের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল একটি ঐক্যের সুর। ঐতিহাসিক তাকেই বলেছেন—unity in diversity। নানা বিচ্ছেদ-বিতর্কের মধ্যে আমরা দেখি "The whole of India bears the impress of certain common movements of thought and life resulting in the development of certain common ideals and institutions"।

ইতিহাসের বৃহত্তর পরিধিতে দেখা যায় যে দশম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতে বৌদ্ধধর্ম ক্ষীণ হয়ে এসেছে, জৈনধর্ম লুপ্ত বা হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে এবং সারা ভারতবর্ষ জুড়ে মন্দিরে মন্দিরে শিব, বিষ্ণু ও দেবী এই ত্রিদেবতার পূজা হচ্ছে। দর্শনে ও ভাষ্যে আমরা পাচ্ছি পরমাত্মা, জীবাত্মা, মায়াবাদ, পুনর্জন্ম, চাতুর্বর্ণ্য ইত্যাদি তত্ত্বগুলি। সমাজে চলেছে [illegible]স্ত্র-সূত্রস্মৃতির অনুশাসন। তখনও ভারতে ইস্‌লামের প্রচণ্ড শক্তি সমাজদেহে বিরাট ধাক্কা দেয় নি। এক কথায় বলা যেতে পারে, মনের ও জ্ঞানের দিক থেকে সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী হতেই ভারতের একটি যজ্ঞসম্ভব ভাবমূর্তির অখণ্ড রূপের ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি—এটা রাজনৈতিক নয়, এটা সাংস্কৃতিক, ভাবনৈতিক ও রসসমৃদ্ধ। আচার্য শঙ্করের চারিধামে চারিটি মঠ এই ঐক্যেরই প্রতীক। তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বা মাধ্যমিক ন্যায়কে আত্মসাৎ করেছিলেন, না, তার বৈরী ছিলেন—এসব কথা অবান্তর না হলেও তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের পরিধিতে তিনি যে মহান্ ও বিরাট্‌কে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন তার প্রতিক্রিয়া আজও দেখি শুভ্রকিরীটি জ্যোতির্মঠে বসেও যাঁর কথা শুনি, যে তত্ত্ব আওড়াই, সমুদ্রধৌত গোবর্ধন মঠেও তাঁরই কথা বলি, শৃঙ্গেরীতে তাঁরই চর্চা করি। সৃষ্টির ধারা আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে যুগে যুগে ঝাঁপতালের লয়ে এগিয়ে চললেও সে আকস্মিকের মালা-গাঁথা নয়, কারণ ঐতিহ্যের বীজ অমর, সে শুধু রূপ থেকে রূপান্তরে চলে।

ভারতীয় মনের এই যে ঐক্য, এই যে জীবনবীক্ষা (Wellenschung), বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যের মধ্যে তার প্রকাশ দেখেছি। জানি রক্তচক্ষু সমালোচক এখনই বলবেন যে, ভারতবর্ষ আবার এক ছিল কবে, তার সংস্কৃতিতে, তার ঐতিহ্যে ঐক্যের সুর খুঁজে বার করা হয়তো রসিকচিত্তের, কল্পনাপ্রবণ মনের কণ্ডুয়নবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে পারে; কিন্তু এহ বাহ্য আগে কহ আর—তথ্যের, হার্ডফ্যাক্টের নিগড়পাশে বন্দী

ইতিহাসকে ভাবালু করে ঘোরালো করায় সার্থকতা থাকলেও সত্য নেই। এই প্রশ্নের সমাধান বা সুষ্ঠু বিচার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অসম্ভব। শুধু প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য হতে দু-একটি উদাহরণ দিয়েই বক্তব্যটিকে পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টা করব। সে বক্তব্যটি হচ্ছে এই—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্যে যুগে যুগে যে প্রকাশ দেখেছি তার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত unity of thought and theme আছে। মধ্যযুগে এই ঐক্যের একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ পেয়েছি বৈষ্ণব সাহিত্যে, শৈবগাথায়, রামায়ণী কথায়, গল্প বলবার ভঙ্গি কাব্যের রীতিতে, নাটকের পদ্ধতিতে। আধুনিক কালে দেশভক্তি, স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম, পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে মানবতাবোধ, যুক্তিবাদী সুনিষ্ঠ চিন্তার ধারা সমগ্র ভারতবর্ষকে একটা অখণ্ড ভাবসমুদ্রের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

বৈষ্ণব সাহিত্যের কথাই ধরা যাক। প্রাচীন কাল হতেই বিষ্ণু ও কৃষ্ণকে আশ্রয় করে যুগে যুগে দেশে দেশে এক বিরাট দর্শন ও সাহিত্য বটক্রমে পরিণত হয়েছে, তার প্রমাণ মিলবে দক্ষিণে, পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, মিথিলায়, তামিলনাদে, বাংলায়, আসামে, গুর্জরে, মহারাষ্ট্রে, রাজস্থানে, উত্তরপ্রদেশে। ঋগ্বেদে আমরা বিষ্ণুসূক্তে বিষ্ণুর উল্লেখ পেয়েছি। তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখি, মিত্র, বরুণ, অর্যমা, ইন্দ্র, বৃহস্পতির সঙ্গে বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী বিষ্ণুও আমাদের কল্যাণকারী হউন 'শংনো বিষ্ণু রুরুক্রমঃ' এই প্রার্থনা আছে প্রথম অনুবাকে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ ছান্দোগ্যোপনিষদে যখন দেবকীপুত্র শুধু একজন মানুষ, যাঁর মথুরানগরীতে যাদবজাতির অন্তর্গত সাত্বত বৃষ্ণিকুলে জন্ম, ঘোর আঙ্গিরস যাঁর গুরু, পুরুষযজ্ঞবিদ্যা যিনি শিক্ষা করেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে (খ্রীঃ-পূঃ পঞ্চম শতাব্দী) তিনি ক্ষত্রিয়প্রধান ভক্তির পাত্র। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে (খ্রীঃ-পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী) তিনি দেবতা। বেসনগর গরুড়স্তম্ভে তিনি দেবদেব। মহাভারতে শিশুপাল, জয়দ্রথ, কংস তাঁকে স্বীকার করেন না। কিন্তু সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকে, মহাকবি অশ্বঘোষের রচনাতে, নাগার্জুনের লেখায়, কালিদাসের কাব্যে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে, আনন্দবর্ধনাচার্যের ধ্বন্যালোকে এই বৈষ্ণব সংস্কৃতির পরিচয় পেয়েছি। এর পরিচয় পেয়েছি শুধু শঙ্কর, যামুন, নিম্বার্ক, মধ্ব, জ্ঞানেশ্বর, বল্লভের দর্শনে ও সাধনমার্গেই নয়, আড়বারদের অপূর্ব সাহিত্যে; শুধু বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহবাদ বা 'পঞ্চরাত্র' বা সাত্বত আগমেই নয়, সেই হরিচরণ স্মৃতিসার, সরস-বসন্ত-সময়-বন-বর্ণনমুনগত মদনবিকারকে ছাড়িয়ে

সঞ্চরদধর সুধা-মধুর ধ্বনি মুখরিত মোহন বংশং।
বলিত দৃগঞ্চল চঞ্চল মৌলিক কপোল বিলোলাবতংসম্॥

বাংলার বৈষ্ণব সাহিত্যে যে মধুর রসের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, গোবিন্দদাসের ভাষায় যে "রসনিরমাণ" আমরা দেখেছি, শত শত মাইল দূরে শত শত বছর পূর্বের দক্ষিণের বৈষ্ণব আড়বারদের সাহিত্যেও তার প্রকাশ দেখি। জানি, পণ্ডিতরা বলবেন যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদ ও দক্ষিণের বৈষ্ণববাদ এক নয়, একনাথ বা জ্ঞানেশ্বর যা বলেছেন মহাপুরুষীয়া শঙ্করদেব বা পুষ্টিমার্গী বল্লভাচার্য তা বলেন নি, অণ্ডাল বা গোদাদেবীকে দক্ষিণের মীরাবাই বলা ভুল, মাধবকন্দলীর রামায়ণীকথা তুলসীদাসের রাম-মানসচরিতের সঙ্গে মেলে না, কাম্বানের রামায়ণ মূল বাল্মীকিকেও হার মানায়। কিন্তু সংস্কৃতির বিরাট ঐক্যকে বহন করে সাহিত্যেও যে তার প্রকাশ আছে তারই দু-একটি উদাহরণ দিই। অনেকের ধারণা যে, দক্ষিণের বৈষ্ণব সাহিত্যে নায়িকাভাব নেই, মাধুর্য রসের চেয়ে দাস্যভাব ও সখ্যভাবই প্রবল, কিন্তু অণ্ডালের 'তিরুপাবৈ' ও 'নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ী' দুই দিব্য প্রবন্ধেই নায়িকাভাব প্রবল দেখি।

বাংলা সাহিত্যে যখন পড়ি, 'আকুল শরীর মন বেআকুল মন' নায়িকা চলেছেন—

লীলাজলধি তীরে চলু ধাই
প্রেমতরঙ্গে অঙ্গ অবগাই

তখনি মীরার দোঁহায় পড়ি

সখী মোর নীঁদ নসানি হো
পিয়া কো পংথ নিহারতে সব রৈণ বিহানী হো

—সখী মোর নিদ্রা গেল নষ্ট হয়ে, প্রিয়ের পথ চেয়ে রাত্রি হল ভোর।

আবার দেখি আড়বার-কবি (শ্রীশঠকোপ স্বামী)

মস্তক-বিক্রয়

শ্রীজয়ন্তনাথ রায়

বয়স তখন বছর পঁচিশ প্রাণেও ছিল শখ,
ঘর সাজাতাম টুকিটাকি অনেক জিনিস কিনে,
সহজ কথায়, ভাগ্যে তখন টাকাও ছিল কিছু,
শখ-মেটানো সন্ধ্যা-সকাল কাটত দিনে দিনে।

তখন বোধ হয় ইংরেজী সন (যাকৃগে কিছু হবে),
কিসের যেন ছুটি ছিল, ঘুরতে গেলাম তাই—
কাছাকাছি, সমুদ্দুরের কোল-ঘেঁষা এক দেশে
(বলব না নাম, সব-কিছুরই নাম করতে নাই)।

সকাল বিকেল সময় কাটে আপন মনে মনে,
কোথাও ভাল শঙ্খ খুঁজি, কোথাও তালের ছাতা,
ফেরার দিনে হঠাৎ পেয়ে নিয়ে এলাম কিনে
লাল-পাথরের প্রকাণ্ড এক বুদ্ধদেবের মাথা।

শোবার ঘরের একটা কোণায় মেঝেয় রেখে তাকে
মনে মনে বলি, এখন কিচ্ছু বলো নাকো—
রাখার মত যে কটা দিন জায়গা না পাই খুঁজে,
সেই কটা দিন রাজপুত্তুর এইখানেতেই থাক!

মনে মনেই আবার বলি, ভাগ্য ছিল বটে—
রাজার ছেলে ভিক্ষু হয়েও বিশ্বে আসন পাতা।
বিম্বিসারের রত্ন-খচা মাথার মুকুট থেকে
তোমার পায়ে বিকিয়ে গেল লক্ষ কোটি মাথা।

* * *

কয়েক বছর বাদে এবার নিজের কথা বলি।
ইতিমধ্যে পাল্‌টে গেছে ভাগ্য-রথের চাকা।
ঋণের পরে ঋণ শুধতে আবার করি ঋণ,
জ্বালা দিয়ে জ্বালা জুড়াই, লজ্জাকে দিই ঢাকা।

দেনার দায়ে একে একে অনেক কিছু গেল—
অনেক কিছু প্রিয় জিনিস, ঘরগুলো প্রায় ফাঁকা।
পাওনাদারের আবার তাড়ায়, আর কিছু না [illegible]।
সেদিন শেষে বের করলাম শোবার ঘরে রাখা—

এতটা দিন যেটা ছিল, এত বছর ধরে,
নিত্য চোখে দেখব বলে ভাল রাখার নামে
মিথ্যে করে রেখেছিলাম মেঝের 'পরে যেটা,
সেইটা শেষে বেচে দিলাম এক শো টাকা দামে।

হায় মৃগদাব, হায় বেণুবন, গন্ধকুঠি বিহার,
হায় সুজাতা, অম্বপালী, হায় আনন্দ, আজো
মহান হতেও মহান যিনি, পুণ্য নামে যাঁর
আজ এশিয়ার আধেক জুড়ে তোমরা আজও বাঁচ—

নিত্য-কালের দীপ্তি যিনি বিশ্বভুবন-মাঝে,
লক্ষ কোটি বিকিয়ে গেছে চরণতলে যাঁর,
তাঁর চাইতেও কোথায় যেন একটু উঁচু আমি—
দৈন্য-মাখা এই জীবনের এইটা অহঙ্কার।

দুঃখ পেলাম সত্যি বটে চোখেও এল জল,
শখের জিনিস বিকিয়ে গেল, দুঃখ হওয়ার কথা,
তবুও হাসি, তোমরা পায়ে বিকিয়ে গেলে যাঁর,
আমার দেনায় বিকিয়ে গেল মহান তাঁরই মাথা।
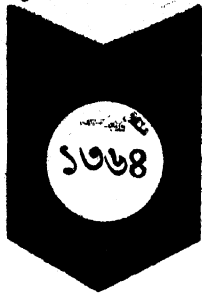
বিগত বৎসরে (১৩৬৪ সালে) প্রকাশিত বাংলা বইয়ের একটি নির্বাচিত তালিকা নিয়ে সংকলন করে দেওয়া হল। তালিকাটি বিষয়-ওয়ারী ভাবে না করে প্রকাশক-ওয়ারী ভাবে করা হল। এর দ্বারা নানাবিধ বই সম্পর্কে যেমন একটা ধারণালাভের সুবিধা হবে, তেমনি বিভিন্ন প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনার রুচি, প্রবণতা ও প্রকৃতি-অনুধাবনেরও কতকটা সহায়তা হতে পারে। আজকের এই উন্নত প্রকাশন-প্রয়াসের যুগে প্রকাশকদের শ্রেণী ও গোত্র-নির্ণয়ের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমরা মনে করি। প্রকাশক-প্রতিষ্ঠান মাত্রই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ওই ব্যবসায়ের ঘোষিত উদ্দেশ্যের গণ্ডীর মধ্যে থেকেও সাহিত্যিক আদর্শবাদের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করা যায়। এ-জাতীয় নিষ্ঠাবোধের তারতম্যেই প্রকাশকদের কৌলীন্যের তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং প্রকাশকদের সাহিত্যানুরাগ, সৎসাহিত্যে রুচি, সৎসাহিত্য প্রচারের মাধ্যমে জাতিগঠনের মনোভাব—এসবও হিসাবের মধ্যে গণনা করতে হবে বইকি। শুধু টাইটেলের সংখ্যাধিক্য দিয়ে যেন আমরা প্রকাশকের সাফল্য নিরূপণ না করি। সংখ্যার সাফল্য ভাববহুলতার ইঙ্গিত করে; কিন্তু ভারের চেয়ে ধারের মূল্য বেশী, সে কথা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থ-নির্বাচনের কাজটি অতিশয় দুরূহ। হয়তো সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রতি আকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হল না, কোন কোন ভাল বই অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়; সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিই এই জন্য গোড়ায় আমরা মার্জনা চেয়ে রাখছি। উল্লেখ-যোগ্য বইয়ের অনুল্লেখ অসাবধানতা বা অজ্ঞতাপ্রসূত হতে পারে; কিন্তু ইচ্ছাকৃত কখনই নয়।

সিগনেট প্রেস

রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ দাশ। ৩৲

৫৯টি সনেটের একটি সংকলন। পরলোকগত কবি জীবনানন্দ দাশের কাব্যকৃতির এক নূতন দিক এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। বাংলা দেশের মাটি-জল-হাওয়াকে যে তিনি কত প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন 'রূপসী বাংলা'য় তারই প্রদীপ্ত স্বাক্ষর রইল। দেশপ্রেম ও কাব্যগুণে মিশে বইটি একটি অনন্যসাধারণ রূপবৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

কুলায় ও কালপুরুষ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ৫'৫০

মননশীল কবি ও প্রবন্ধকারের নূতন প্রবন্ধ-গ্রন্থের সংকলন। সুধীন্দ্রনাথের চিন্তা উজ্জ্বল, মৌলিক, বহু-অধ্যয়নপুষ্ট। গদ্যসাহিত্যে দুরূহ তথা ভাবসমৃদ্ধ বিষয়ের উপস্থাপনায় তিনি কৃতী, কিন্তু তাঁর ভাষার চাল সহজ-বোধ্যতার পথ বেয়ে চলে না, এইটেই যা শুধু আক্ষেপের।

বিচিত্র বিবাহ : অমিতাকুমারী বসু। ৩৲

বিশাল দেশ ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নানা বিবাহ-বিধি প্রচলিত। অঞ্চলভেদে স্ত্রী-আচারেরও রকমারির অন্ত নেই। লেখিকা এই গ্রন্থে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবাহ-অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে সংকলন করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। অনেক আনুষ্ঠানিক গান ও তার অনুবাদ বইটিতে দেওয়া আছে। তাতে বইয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

রূপচিন্তা : সুবিমল বসু। ৩৲

দৈহিক রূপচর্চা ও প্রসাধনকলা সম্পর্কে একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। লেখক চিকিৎসক, চিকিৎসকের দৃষ্টি-কোণ থেকে বইটি লিখিত। সুতরাং রূপচর্চা যাতে না

বিলাসে পর্যবসিত হয় সে বিষয়ে অবশ্যই লেখকের সতর্ক দৃষ্টি আছে।

এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

রবীন্দ্র-কাব্যালোক ঃ শ্রীঅমিতা মিত্র। ৫৲

রবীন্দ্র-কাব্যসাহিত্যের নানা দিক নিয়ে লেখিকা এই গ্রন্থে সুনিপুণ আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্র-সৌন্দর্যদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য, বৈষ্ণব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য, পাশ্চাত্ত্য সৌন্দর্যবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির পার্থক্য—এ সকল বিষয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও লিপি-নৈপুণ্যের সঙ্গে বইটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রচুর উদ্ধৃতিতে পূর্ণ চমৎকার একটি রবীন্দ্র-প্রবেশক গ্রন্থ।

রবীন্দ্রনাট্য-পরিক্রমা ঃ অশোক সেন। ২৲

রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের সুদক্ষ আলোচনা। লেখক নাট্যকলা সম্পর্কে বিদেশে হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, রবীন্দ্র-নাট্যকলার পর্যালোচনায় সেই অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়েছে।

সমকালীন সাহিত্য ঃ নারায়ণ চৌধুরী। ৩৲

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সুবিস্তৃত পর্যালোচনা।

মহাভারতে বিদুর ও গান্ধারী ঃ ত্রিপুরারি চক্রবর্তী। ১'২৫

বিদুর ও গান্ধারী চরিত্রের সুনিপুণ বিশ্লেষণ। সুবিজ্ঞ অধ্যাপক মহাভারত সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে যে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিয়ে আসছেন তারই একটি উপাদেয় আংশিক সংকলন।

রূপম্ ? ঃ সুবোধকুমার চক্রবর্তী। ৩'৫০

মধুরাংশ্চ ঃ সুবোধকুমার চক্রবর্তী। ৪'৫০

শক্তিমান নূতন লেখকের স্বচ্ছন্দ লেখনী-প্রসূত দুটি সুন্দর উপন্যাস। দ্বিতীয় বইটিতে কাহিনীর সঙ্গে ভ্রমণের রস মেশানো আছে।

পুরনো বই ঃ নিখিল সেন। ৪৲

কয়েকটি পুরাতন দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থের আলোচনা। সাহিত্যে তথ্যান্বেষীদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হবে।

বেঙ্গল পাবলিশার্স

আসধারা ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩'৫০

প্রতিভাবান লেখকের অভিজ্ঞ লেখনীপ্রসূত একটি জনপ্রিয় উপন্যাস।

গঙ্গা ঃ সমরেশ বসু। ৫'৫০

গঙ্গা নদীর জেলে জীবনের উপর চমৎকার উপন্যাস। এই বৎসর আনন্দবাজার-দেশ-পুরস্কারপ্রাপ্ত। এই বইটির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' ও সম্প্রতি-প্রকাশিত ৺অদ্বৈত মল্ল-বর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' গ্রন্থদ্বয় যুক্ত করলে বাংলা সাহিত্যে ধীবর-জীবন সবিশেষ মর্যাদা পেয়েছে বলতে হবে।

পূর্ব-পার্বতী ঃ প্রফুল্ল রায়। ৮৲

নাগা-পাহাড়ের চিত্র ও চরিত্র অবলম্বনে লিখিত একটি অভিনব স্বাদের উপন্যাস। লেখক বয়সে তরুণ হলেও তাঁর সহজাত প্রতিভার অসংশয় পরিচয় রয়েছে [illegible]টির রচনা-নৈপুণ্যের মধ্যে।

সপ্তপদী ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৲

বর্ষীয়ান কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর গত দু-তিন বছরে যে কটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন বিষয়বস্তুর মহিমার দিক দিয়ে এটি নিঃসন্দেহে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা।

বৃষ্টি, বৃষ্টি ঃ মনোজ বসু। ৫'৫০

প্রবীণ লেখকের নূতন পপুলার উপন্যাস।

ইংলণ্ডের ডায়েরী ঃ শিবনাথ শাস্ত্রী। ৪৲

উনিশ-শতকীয় বাংলার দ্বিতীয়ার্ধের একজন বিশিষ্ট মানুষের মনোজীবন অনুধাবনের পক্ষে এই ডায়েরী বিশেষ কাজে আসবে।

বিগত দিন ঃ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩'৫০

বর্ষীয়ান লেখকের বিগত দিনের একটি রঙীন স্মৃতি-চিত্র। প্রীতি ও প্রসন্নতার আমেজে ভরপুর।

সোবিয়েতের দেশে দেশে ঃ মনোজ বসু। ৬৲

লেখকের সোভিয়েট-ভ্রমণের মনোজ্ঞ বিবরণ। ঘরোয়া ভঙ্গিতে লেখা, পাঠকের সঙ্গে আত্মীয়তার স্পর্শে নিবিড়।

সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ ঃ জগদীশ ভট্টাচার্য। ৬৲

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সংকলন। 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত। সুপরিচিত কবি ও সমালোচকের গূঢ় হৃদয়সংবেদনপূর্ণ একটি বিশিষ্ট সাহিত্যগ্রন্থ। মধুসূদন ও রবীন্দ্র-কবিজীবনের উপর নূতন আলোকপাত।

বাংলা-গল্প-বিচিত্রা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩'৫০

বিগতকালীন ও সমকালীন কয়েকজন বিশিষ্ট গল্প-লেখকের রচনানৈপুণ্যের আলোচনা। গ্রন্থকার স্বয়ং সুপরিচিত গল্পকার; সুতরাং তাঁর এই প্রবন্ধগুচ্ছের আকর্ষণ আরও অধিক।

সাহিত্যমেলা : ক্ষিতীশ রায় সম্পাদিত। ৫৲

কয়েক বৎসর পূর্বে অন্নদাশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে শান্তি-নিকেতনে যে সাহিত্যমেলার অনুষ্ঠান হয় তাতে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর নির্বাচিত সংকলন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নূতন সাহিত্য চিন্তার একটি আধার-গ্রন্থ।

বি[illegible]গর ও বাঙালী সমাজ : ১ম ও ২য় খণ্ড : বিনয় ঘোষ। ৩৲, ৭৲

আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এক মূল্যবান জীবনী। প্রথম খণ্ডটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালার সংকলন। চরিত-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী : হুমায়ুন কবীর। ২৲

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমস্যা সম্পর্কে মূল্যবান চিন্তার সংকলন। বিদেশের শিক্ষায়তনসমূহের অভিজ্ঞতার দ্বারা মন্তব্য পুষ্ট।

গল্পসংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড : বনফুল। ৪৲

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বনফুলের সুনির্বাচিত গল্প-সংগ্রহের দ্বিতীয় খণ্ড। লেখকের গল্পরচনানৈপুণ্যের নতুন করে পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিষয়ের উদ্ভাবনা ও আঙ্গিক দুই-ই চমৎকার।

গল্পসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড : মনোজ বসু। ৪৲

প্রবীণ গল্পকার মনোজ বসুর ছোটগল্পের এক সুষ্ঠু সংকলন। রোমান্স-রস অধিকাংশ গল্পের প্রধান উপজীব্য। রথীন্দ্রনাথ রায়ের ভূমিকাটি সুলিখিত।

নাভানা

বসন্তপঞ্চম : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ২'৫০

কুশলী গল্পলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের নূতন গল্পগ্রন্থ।

এম. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

কালিদাসের মেঘদূত : বুদ্ধদেব বসু। ৫'৫০

কালিদাসের মেঘদূতের মূলানুগ কাব্যানুবাদ। বহু চিত্র শোভিত। সংস্কৃত-সাহিত্যে বুদ্ধদেব বসুর প্রবেশ-প্রয়াস। ভূমিকাটি সুবিস্তৃত। অনুবাদকের বক্তব্যের সঙ্গে সর্বত্র একমত হওয়া সম্ভব নয়, তবে লেখায় আধুনিক বলিষ্ঠ মননের ছাপ সুস্পষ্ট।

এই গ্রহের ক্রন্দন : দীপক চৌধুরী। ৬৲

দীপক চৌধুরীর সর্বাধুনিক উপন্যাস এবং সম্ভবতঃ তাঁর এযাবৎ-প্রকাশিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা।

মন্দিরময় ভারত : অপূর্বরতন ভাদুড়ী। ৫৲

ভারতের মন্দির-শিল্পের সুললিত বিবরণ।

আনন্দীবাঈ ইত্যাদি গল্প : পরশুরাম। ৩৲

প্রখ্যাত রস-সাহিত্যিক পরশুরামের নূতন কয়েকটি গল্পের সংকলন।

আরও বিচিত্র কাহিনী : তুষারকান্তি ঘোষ। ৩৲

তুষারকান্তি ঘোষের বিচিত্র কাহিনীর আরও একগুচ্ছ সংকলন।

মিত্রালয়

শুভায় ভবতু : অবধূত। ৫৲

অবধূতের নূতন উপন্যাস। নিছক কাহিনীরসসন্ধানী এক শ্রেণীর পাঠকের ভাল লাগবে।

আবার জীবন : সুভাষ সমাজদার। ৩'৫০

তরুণ গল্পলেখক সুভাষ সমাজদারের প্রথম উপন্যাস।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি : বিমলচন্দ্র সিংহ। ৪৲

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে কয়েকটি সুলিখিত প্রবন্ধের সংকলন। চিন্তা-সাহিত্যে লেখকের নূতন সমৃদ্ধ দান।

একালের চোখে : অচিন্ত্যেশ ঘোষ। ৩৲

নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা কয়েকটি সমাজ-সমস্যার সার্থক প্রবন্ধ-রূপায়ণ।

শবরী : সুনীলকুমার লাহিড়ী। ১'৫০

প্রতিশ্রুতিময় তরুণ কবির প্রথম কবিতা-সংকলন গ্রন্থ। লেখকের ভাষা ও ভাবের স্বচ্ছতা ও ছন্দের বোধ প্রশংসনীয়।

নিশিগন্ধা : বিমল কর। ৩৲

উদীয়মান কথাসাহিত্যিক বিমল করের নূতন উপন্যাস।

রাজাশাখা : অনুরূপা দেবী। ২'৫০

সদ্য-লোকান্তরিতা শ্রদ্ধেয়া লেখিকার শেষ গল্পসংকলন।

লঘুপাক : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ৩৲

কয়েকটি লঘুরসের গল্পের সমষ্টি। রচনাগুলি হাস্যে সমুজ্জ্বল।

জনরব : হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৲

মঞ্চে সু-অভিনীত একটি প্রগতিশীল নাটক।

বিহার সাহিত্য ভবন

কেষ্টনগরের পুতুল : দীপক চৌধুরী। ২'৭৫

দীপক চৌধুরীর নূতন গল্প-সংগ্রহ।

কালপেঁচার বৈঠকে : বিনয় ঘোষ। ৩'৫০

কালপেঁচা সিরিজে নূতন সংযোজন। সুপরিচিত লেখক বিনয় ঘোষের আধুনিক সমাজভাবনা সম্বলিত মনোজ্ঞ গ্রন্থ।

তিমির বলয় : সরোজকুমার রায় চৌধুরী। ৩'৫০

প্রবীণ কথাসাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীর জনপ্রিয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। ঘর-ছাড়া এক বাউল-দম্পতির কাহিনী।

প্রজ্ঞা প্রকাশনী

অনেক সাগর পেরিয়ে : চিত্রিতা দেবী। ৪৲

সরস ভ্রমণ-কাহিনী।

আজব নগরী : শ্রীপান্থ। ৩৲

রম্যরচনার সংকলন।

গ্রন্থম

একাঙ্ক নাটক সংকলন। ৩৲

পুরস্কারপ্রাপ্ত কতকগুলি একাঙ্কিকার সংকলন। সব কটি নাটিকাই তরুণ লেখক কর্তৃক লিখিত ও নূতন সমাজ-চৈতন্যের দ্বারা উদ্দীপিত।

রীডার্স কর্নার

আধুনিক বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতি : শুদ্ধসত্ত্ব বসু। ২'৫০

আধুনিক বাংলা কবিতার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যের মনোময় আলোচনা। কবি-অধ্যাপক শুদ্ধসত্ত্ব বসু আধুনিক কাব্য আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং কাব্যামোদী পাঠকের নিকট তাঁর আলোচনার আবেদন অনস্বীকার্য।

ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়

সপ্তপর্ণ : কিরণশঙ্কর রায়। ৩৲

রাজনৈতিক নেতা পরলোকগত কিরণশঙ্কর রায় এ[illegible] সময় সাহিত্যক্ষেত্রেও সুপরিচিত ছিলেন। প্রমথ চৌধুরী *'সবুজ পত্র'*-গোষ্ঠীর তিনি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর সে[illegible] সময়কার লেখা *'সপ্তপর্ণ'* গল্পগ্রন্থ একদা বিদগ্ধ মহলের প্রশংসা অর্জন করেছিল। গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ করে প্রকাশক সকলেরই ধন্যবাদভাজন হলেন।

ভারতী লাইব্রেরী

প্রাণগঙ্গা : অবিনাশ সাহা। ৫৲

সুবৃহৎ উপন্যাস। আন্তরিকতার স্পর্শে [illegible]টি নিবিড়। সাম্প্রদায়িক সৌভ্রাত্রের মঙ্গলময় বাণী উপ[illegible]সটির ভিতর উদ্‌ঘোষিত।

পপুলার লাইব্রেরী

কেরালার গল্পগুচ্ছ : অনুবাদ—বি. বিশ্বনাথম। ২'৫০

মালয়ালম্ ভাষায় রচিত চোদ্দটি বিশিষ্ট ছোটগল্পের অনুবাদ।

ভারতের মুক্তি-সন্ধানী : যোগেশচন্দ্র বাগল। ৫৲

ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে বাংলার জননায়কদের দান অসামান্য। প্রখ্যাত গবেষক যোগেশচন্দ্র বাগল এই গ্রন্থে এইরূপ কয়েকজন প্রসিদ্ধ বাঙালী জননেতার জীবনী ও কর্মের আলোচনা করেছেন।

ডি. এম. লাইব্রেরী

রত্ন ও শ্রীমতী : অন্নদাশঙ্কর রায়। ৩'৫০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের পরিণত মনন ও অনুভবের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ নূতন উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড।

দেওয়াল : বিমল কর। ৬৲

লেখকের উচ্চাকাঙ্ক্ষী জনপ্রিয় উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড। সাম্প্রতিক বাঙালী সমাজের বাস্তবধর্মী চিত্রণ।

শেষ বৈঠক : উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩'৫০

বৈঠকী আলোচনার সরস সংকলন। সরসতার ফাঁকে ফাঁকে সমাজ ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক চিন্তাপূর্ণ কথাও বইটিতে গ্রথিত রয়েছে। বর্ষীয়ান লেখকের দীর্ঘস্থায়ী সাহিত্য-জীবনের সমৃদ্ধ ফলশ্রুতি এই আলোচনা-গ্রন্থটি।

শুক্লপক্ষ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ৩৲

কুশলী গল্পলেখকের উপন্যাস-সংসারে সার্থক অনুপ্রবেশ।

রচনাটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হওয়ার কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

অরণ্য আদিম : রমাপদ চৌধুরী। ৩৲

বাংলা-বিহার-সীমান্তের আদিবাসীদের সভ্যতার সংস্পর্শে আসার শিল্পময় কাহিনী।

প্রিয়-অপ্রিয় : জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ২'৫০

নিপুণ গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নূতন গল্পগ্রন্থের সংকলন।

পূর্বরাগ : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ২'৫০

জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের নূ[illegible]ন্যাস।

গ্র[illegible]গার-বিজ্ঞান : সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। ১০৲

বাংলায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান সম্পর্কে একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। প্রত্যেক গ্রন্থাগারে সংরক্ষণযোগ্য পুস্তক।

নিরীক্ষা

গ্রাম নদী বন : মৃত্যুঞ্জয় মাইতি। ১'২৫

উদীয়মান কবির নতুন কবিতা-সংকলন। কবিতাগুলির ভিতর খাঁটি বাংলা দেশের জল হাওয়া মাটির সুগন্ধ পরিকীর্ণ।

নিউ এজ পাবলিশার্স

নটী : মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য। ৩'৫০

শক্তির প্রতিশ্রুতিসম্পন্না নতুন লেখিকার লেখা একটি সুন্দর উপন্যাস।

লেখকের কথা : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২'৫০

প্রখ্যাত লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য-ভাবনা ও আত্মকথামূলক রচনাসমূহের সংকলন।

জিজ্ঞাসা

ভারত-জিজ্ঞাসা : ত্রিপুরাশঙ্কর সেন। ৩৲

ভারতের ধর্ম ও দর্শনের শ্রদ্ধাসম্মত সাহিত্য-পরিচয়।

রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা: সাধনকুমার ভট্টাচার্য। ৬৲

নাট্যালোচনায় লেখকের শক্তি ও অভিজ্ঞতার নূতন দান।

হিন্দু সাধনা : অনুবাদ—স্বর্ণপ্রভা সেন। ৩৲

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Hindu View of Life-এর অনুবাদ।

নিউ স্ক্রিপ্ট

গল্পলোক : সুবোধ ঘোষ। ৪৲

খ্যাতনামা গল্পলেখক সুবোধ ঘোষের কয়েকটি বিশিষ্ট গল্পের সংকলন।

ইণ্ডিয়ানা

রবীন্দ্র-মানস : অরবিন্দ পোদ্দার। ৩'৫০

সমাজ-চৈতন্যের পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-কাব্য ও ব্যক্তিত্বের সুনিপুণ বিশ্লেষণ। মননশীলতা ও শিল্পদৃষ্টির সমাহার।

মৌচোর : সলিল সেন। ২'৭৫

সুন্দরবন অঞ্চলের পটভূমিকায় রচিত একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর নাটক। মঞ্চে সু-অভিনীত।

কবি নজরুল : সংস্কৃতি পরিষদ্ সংকলিত। ৩৲

নবীন-প্রবীণ দশজন বিশিষ্ট লেখকের কবি নজরুল-সম্পর্কিত রচনার সংকলন।

মিত্র ও ঘোষ

শ্রেষ্ঠ কবিতা : কুমুদরঞ্জন মল্লিক। ৫'৫০

কবির কবিতাসমূহের সুনির্বাচিত সংকলন। কবিকে সামগ্রিকভাবে বোঝবার পক্ষে একটি অপরিহার্য সহায়ক গ্রন্থ।

কবি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৲

'কবি' উপন্যাসের নাটকীকৃত রূপ। মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত।

মিশ্র রাগ : নরেন্দ্রনাথ মিত্র। ৩'৫০

লেখকের কয়েকটি সুলিখিত গল্পের সমষ্টি।

নব নায়িকা : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ৩'৫০

পঞ্চতপা : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ৬'৫০

কথাসাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দুইটি সুলিখিত গ্রন্থ। প্রথমটি গল্প-সংগ্রহ; দ্বিতীয়টি উপন্যাস।

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা : সরলাবালা সরকার। ৩'৫০

প্রবীণা লেখিকার সাহিত্যবিষয়ক কতকগুলি রচনার সংকলন।

বিদ্যাসাগর-রচনাসম্ভার, ভূদেব-রচনাসম্ভার, রমেশ-রচনাসম্ভার : প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত। ৮৲, ৮৲, ১০৲

সম্পাদকের লিখিত সুবিস্তৃত ভূমিকা সহ তিন প্রসিদ্ধনামীয় লেখকের রচনাবলীর সংগ্রহ।

জীবন-জাহ্নবী : রামপদ মুখোপাধ্যায়। ৬·৫০

একটি পল্লী-কিশোরের ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠার ও লেখকজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কাহিনী।

বিচারপতি : অনুরূপা দেবী। ৩৲

জ্যোতিঃহারা : অনুরূপা দেবী। ৬·৫০

'বিচারপতি' উপন্যাস-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবীর নূতন উপন্যাস। 'জ্যোতিঃহারা' উপন্যাসটি নূতন সংস্করণে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে।

ছাত্রদের প্রতি : মহাত্মা গান্ধী। ৪·৫০

ছাত্রসমাজের উদ্দেশে গান্ধীজী বিভিন্ন সময়ে যে সকল রচনা ও বক্তৃতা প্রচার করেছেন তারই একটি অনূদিত প্রামাণ্য সংকলন। অনুবাদক শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীগুরু লাইব্রেরি

সোহাগপুরা : গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ৪৲

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

দেবদত্ত এণ্ড কোম্পানী

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার (১ম) : কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য। ৮৲

গ্রন্থাগার-আন্দোলন ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারসমূহের একটি সুবিস্তৃত ইতিহাস।

ইস্ট এণ্ড কোং

বাংলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী : রথীন্দ্রনাথ রায়। ৭৲

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যজীবনের সকল দিক নিয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা।

বিচিত্র সাহিত্য : সুকুমার সেন।

লেখকের সাহিত্য-প্রবন্ধাবলীর সংকলন। দুই খণ্ডে বিভক্ত।

ত্রিবেণী প্রকাশন

রাধা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭৲

অগ্রণী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞ লেখনীপ্রসূত একটি চমৎকার উপন্যাস। গ্রাম-জীবনের অভিনব রূপালেখ্য।

ধূপছায়া : সৈয়দ মুজতবা আলী। ৪৲

রম্যরচনার সংকলন।

পরমায়ু : সন্তোষকুমার ঘোষ। ৩·৫০

আঙ্গিক-নিপুণ কয়েকটি গল্পের সমষ্টি।

তৃষ্ণা : সমরেশ বসু। ৩৲

শিল্পশক্তিমান লেখকের নূতন গল্পসংগ্রহ।

চীনে লণ্ঠন : লীলা মজুমদার। ৩·২৫

মেয়েলী ছাঁদে লেখা কমনীয়-মধুর উপন্যাস।

সত্যব্রত লাইব্রেরি

কবিয়াল এণ্টনি ফিরিঙ্গি : মদন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫৲

কবিয়াল এণ্টনি ফিরিঙ্গির জীবনকথা। উপন্যাসে আমেজযুক্ত।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য : নিরঞ্জন চক্রবর্তী। ৮৲

উনিশ শতকের কবিওয়ালাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনাপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। কবিগানের বিপুল সংগ্রহ বইটির অন্যতম আকর্ষণ।

কলকাতার কাছেই : গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ৫·৫০

লেখকের একটি উচ্চাভিলাষী সুলিখিত উপন্যাস।

অবনীন্দ্র-চরিতম্‌। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর। ৫৲

শিল্পিগুরু অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁরই অন্যতম এক শিল্পশিষ্য লিখিত ভক্তিপ্লুত জীবনকথা। রচনার ভাষাভঙ্গি আরও সুগঠিত হওয়ার অবকাশ ছিল।

শরৎ-সাহিত্যের মূলতত্ত্ব : হুমায়ুন কবির। ১·৫০

সুপণ্ডিত লেখক কর্তৃক শরৎ-সাহিত্যের বিশ্লেষণ।

পুরাতনী : ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

মাতা জ্ঞানদানন্দিনীর জীবন-কথা ও পিতা সত্যেন্দ্র-নাথের পত্র-সংকলন।

শিশুর জীবন ও শিক্ষা : শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য। ৪·৭৫

শিশু-মনস্তত্ত্ব ও শিশুর শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের লিখিত একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ।

প্রজ্ঞাপারমিতা : অজিতকৃষ্ণ বসু। ৬৲

অজিতকৃষ্ণ বসু ওরফে "অ. কৃ. ব." লিখিত 'প্রজ্ঞাপার-মিতা' একটি নির্দোষ কৌতুকহাস্যদীপ্ত সুন্দর উপন্যাস।

ইষ্ট-লাইট বুক হাউস

ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী : পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত। ৭.৫০

নূতন-পুরাতন ৪৩ জন বিশিষ্ট রসসাহিত্যিকের রসরচনার সংকলন।

কথামালা প্রকাশনী

কবিতার বিচিত্র কথা : হরপ্রসাদ মিত্র। ৮৲

জীবিত ও মৃত প্রসিদ্ধ বাঙালী কবিদের কবিকৃতি সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা।

ভাগ্যবলাকা : গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ৬৲

'ইস্পাতের স্বাক্ষর'-এর রচয়িতার নূতন উপন্যাস।

মনোবাসিতা : সুবোধ ঘোষ। ৩৲

লেখকের নূতন গল্প-সংগ্রহ।

বিশ্বভারতী

চি[illegible] (৬ষ্ঠ খণ্ড) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৪৲

[illegible]র পত্রাবলীর নূতন সংকলন।

সাহিত্যপাঠের ভূমিকা ; সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। ০'৫০

সংক্ষিপ্ত পরিসরে সাহিত্যের মৌলতত্ত্বের আলোচনা।

প্রাকৃত সাহিত্য : মনোমোহন ঘোষ। ০'৫০

প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যের পর্যালোচনা।

বাংলার নব্য সংস্কৃতি : যোগেশচন্দ্র বাগল। ১'৫০

বাংলার নবজাগৃতির উপর নূতন আলোকপাত।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অভয়ামঙ্গল : আশুতোষ দাস সম্পাদিত। ৭৲

শিব-সঙ্কীর্তন বা শিবায়ন : যোগীলাল হালদার সম্পাদিত। ৮৲

দ্বিজ রামদেব-কৃত 'অভয়ামঙ্গল' ও রামেশ্বরকৃত 'শিবায়ন'-এর নূতন সুসম্পাদিত সংস্করণ।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

বিদ্যাসাগর : মণি বাগচী। ৭৲

প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের একটি সুলিখিত জীবনী-গ্রন্থ।

অভিজিৎ প্রকাশনী

অণুর উত্তরায়ণ : শিবতোষ মুখোপাধ্যায়। ৫৲

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ একটি মনোরম গ্রন্থ।

শৈলপুরী কুমায়ুন : চিত্তরঞ্জন মাইতি।

মন ভ্রমণ-কাহিনী।

বাক্

সমাজ ও সাহিত্য : সুশোভন সরকার। ৩'৫০

সমাজ ও সাহিত্যের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ।

নিশান্তিকা : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। ৩৲

কবি যতীন্দ্রনাথের নূতন কবিতাগুচ্ছ।

বিদ্যোদয় লাইব্রেরী

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শন : ভূজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য। ৫৲

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সুবিস্তৃত আলোচনা।

পরিভাষা-কোষ : সুপ্রকাশ রায়। ১০৲

বাংলায় প্রথম পরিভাষা সম্পর্কিত কোষ-গ্রন্থ (Dictionary of Terms)।

বক্তব্য : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ৫৲

মননশীল লেখকের চিন্তাদীপ্ত প্রবন্ধের সংকলন।

ভারতীয় মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭) : প্রমোদ সেনগুপ্ত। ১০৲

সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী

স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা : নরহরি কবিরাজ। ৫৲

জাতীয়তাবাদী মুক্তি-আন্দোলনে বাংলার অবদান সম্পর্কে মননদীপ্ত আলোচনা।

মার্কসীয় অর্থনীতির ধারা : পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। ১'২৫

নামেই গ্রন্থের পরিচয়।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স

বিজ্ঞানের ইতিহাস (২য় খণ্ড) **:** সমরেন্দ্রনাথ সেন। ১২৲

লেখকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। ভারতীয় বিজ্ঞান, আরব্য বিজ্ঞান, ইউরোপীয় রেনেশাঁ ও আধুনিক বিজ্ঞানের পর্যালোচনা।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

গল্প-সংগ্রহ : সরলাবালা সরকার। ৫৲

বিচিত্র পরিবেশের স্বাদমধুর ৩৬টি গল্পের সংকলন। সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

অরুণিমা প্রকাশনী

নূতন ঊষা : গজেন্দ্রকুমার মিত্র। ৩৲

সুপরিচিত সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের নূতন গল্প-সংগ্রহ।

হারানো ছন্দ : মীরাটলাল। ২৲

নূতন লেখকের প্রশংসাযোগ্য উপন্যাস।

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী

বাংলার বাউল : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ২৫৲

বাংলার বাউল-সম্প্রদায়, বাউল গান ও বাউল-দর্শন সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা-সম্বলিত এক বিশালায়তন গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায় ও মর্মজ্ঞতার নিপুণ সমন্বয় ঘটেছে।

নতুন জাপান : কালীপদ বিশ্বাস। ৮৲

জাপান-ভ্রমণের কাহিনী। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর জাপানের সমাজ-জীবন সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

ডাক্তার বিধান রায়ের জীবন-চরিত : নগেন্দ্রকুমার গুহ রায়। ৮৲

পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর জীবনী ও কৃতি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত-গ্রন্থ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

অক্ষয়কুমার বড়াল গ্রন্থাবলী : সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। ১৫৲

অক্ষয়কুমার বড়ালের সমগ্র কাব্যগ্রন্থাবলীর সুসম্পাদিত সংস্করণ। 'শনিবারের চিঠি'তে ইতঃপূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত।

রামেন্দ্রসুন্দর রচনাবলী (বিবিধ) : সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। ১৩৲

রামেন্দ্রসুন্দরের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ও ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি এই গ্রন্থে একত্র সংকলিত হয়েছে।

কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের বাশুলীমঙ্গল : সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুভেন্দুসুন্দর সিংহ রায় সম্পাদিত। ৪৲

একটি নবাবিষ্কৃত মূল্যবান পুরাতন পুথির সুসম্পাদিত সংস্করণ। বিষয়বস্তুর বিচারে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে তুলনীয়, তবে এতে কালকেতুর উপাখ্যান নেই, তৎপরিবর্তে মার্কণ্ডেয় পুরাণের সমস্ত চণ্ডীকাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস

রম্যাণি বীক্ষ্য : সুবোধকুমার চক্রবর্তী। ৬'৫০

দক্ষিণ-ভারতের সুবিস্তৃত ভ্রমণ-কাহিনী। দাক্ষিণাত্যের ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, মন্দির-স্থাপত্য, ভাস্কর্যকলা, সঙ্গীত-নৃত্য ইত্যাদি সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য বিবরণীতে পূর্ণ। বইটিতে ভ্রমণের সরসতার সঙ্গে ইতিহাসের তথ্যকথার সুষ্ঠু সংমিশ্রণ ঘটেছে।

ঝড় ও ঝুমঝুমি : *শান্তি পাল।* ১'৫০

'ঝড় ও ঝুমঝুমি' দেশপ্রেমমূলক কবিতা ও শিশু-কবিতার একটি সুন্দর সংকলন। শিশুকবিতাগুলি চমৎকার আবৃত্তিযোগ্য।

পথ বেঁধে যাই : বিভুল চৌধুরী। ২'৫০

স্বাধীনতা ও বঙ্গবিভাগ-পরবর্তী ত্রিপুরা রাজ্যের পশ্চাদ্‌পটে একটি অভিনব স্বাদের কথা-কাহিনী [illegible] তৈরির গল্প।

অগ্নিহোত্র : হরেন্দ্রনাথ রায়। ৩৲

বর্তমান আণবিক যুগের পটভূমিতে লিখিত সম্পূর্ণ অভিনব বিষয়বস্তুক উপন্যাস। জাপানে বাঙালী যুবকের বিস্ময়কর আবিষ্ক্রিয়ার কাহিনী।

পঞ্চপ্রদীপ : মণীন্দ্রনারায়ণ রায়। ২'৫০

প্রবীণ সাংবাদিকের মনোরম একটি গল্প-সংগ্রহ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় : মনোরঞ্জন গুপ্ত। ১'২৫

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সুলিখিত সচিত্র জীবনী। প্রতি বাঙালী গৃহে সংরক্ষণযোগ্য গ্রন্থ।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স

স্বপ্নমঞ্জরী : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। ৩৲

কতকগুলি সুখপাঠ্য গল্পের সংকলন।

এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স

স্ফুলিঙ্গ : প্রবোধকুমার সান্যাল। ৩'৫০

জনপ্রিয় লেখকের নূতন সাহিত্যোপহার।

সীমাস্বর্গ : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২'৭৫

এক দেবদাসীর প্রেম-কাহিনী অবলম্বনে রচিত স্নিগ্ধ উপন্যাস।

অন্তরঙ্গ : প্রফুল্ল রায়। ৩৲

শক্তিমান তরুণ লেখকের গল্প-সংকলন। মেঘনা-পারের বেবাজিয়া-জীবন অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য।

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

বৈশাখ (বেতালপঞ্চবিংশতি)

বৈশাখ, বেতাল তুমি, জানি তবু তোমার পঁচিশে
জন্ম নিয়েছিল এক কবি; আজ তারি পক্ষ শুরু
এবারের মত। হায় কত মাসী-পিসী, মেসো-পিসে,
এবং অনেকে আরো তাঁহারে বলেছে কবিগুরু।

স্বপ্নে [illegible]ছিনু তাঁরে আমারি এ জানালার ধারে
[illegible]লের 'পরে উপবিষ্ট; স্নিগ্ধ মুখে হাসি
করুণা-নির্ঝর যেন। কম্প্রকণ্ঠে শুধাইনু তাঁরে,
"কহ মোর কোন্ পুণ্যে, হে ঠাকুর, এ টেবিলে আসি
লইলে আসন?" তিনি কৃপা-কণ্ঠে কহিলেন, "ওরে,
আমারে বাসিলে ভাল রক্ষা কর্ রক্ষা কর্ মোরে
মোর ভক্তদল হতে।"
"সে কী কথা?" কহিলাম আমি।
"সত্য কথা।" কন তিনি আবেগে টেবিল হতে নামি।

"সত্য কথা।"—কন তিনি, "আমার গানের শ্রদ্ধাছলে
চলিছে অসহ শ্রাদ্ধ হেথা হোথা কৃষ্টির জঙ্গলে
ন্যাকা ও নেকীর কণ্ঠে নাকী নাকী ভৌতিক বেসুরে,
কভু বা বেতালে হায় আমার পঞ্জর ফুঁড়ে ফুঁড়ে
আমারে হানিছে ওরা বারে বারে আমারি সঙ্গীতে।
মোর নামে পুরস্কার তিরস্কছে দানের ভঙ্গিতে।
আমার বাণীর ব্যাখ্যা চর্বিত-চর্বণ-চক্রাকারে
ঘরাইছে মাথা।..."
দেখি পড়ে আছি জানালার ধারে।

(তবু !!!)

ব্যর্থ তবু ব্রায়োনিয়া বিড়ালের বুকের অসুখে।
মহাকাল গড়াগড়ি খায়
মহা নর্দমায়,
অসংখ্য ক্ষুদ্রের হাতে ব্যর্থ কাঁদে বিরাটের বাঁশী,
হে উদাসী,
রুক্ষ ব্যথা লক্ষ্যহারা বিরহী যক্ষের সূক্ষ্ম বুকে,
তবু ব্যর্থ ব্রায়োনিয়া বিড়ালের বুকের অসুখে।

বিষের অন্তরে বসে অমৃত করিছে হাহাকার
বারংবার,
টেলি-ভীষণের ভয়ে আর্তকণ্ঠে কাঁদিছে বেতার
দুনিয়ার ঘরে ঘরে,
সে কান্না পড়িছে চাপা মহাকাল-রথের ঘর্ঘরে।

জবাবেরে ব্যর্থ করে বারে বারে জাগিছে জিজ্ঞাসা
তুচ্ছ করি উচ্চ নাসা;
কোথা কোন্ প্রাণীহীন ধ্বনিহীন অন্ধকারে
জন্দহীন নিস্তব্ধতা রূপহীন ধ্যানের জোয়ারে
একা জাগে মহাশূন্যে ফাঁকা মাথা ঠুকে ঠুকে ঠুকে
ব্যর্থ তবু ব্রায়োনিয়া বিড়ালের বুকের অসুখে।

খাঁটি কথা

কিংশুক-মঞ্জরী দিয়ে কেমনে করিবি তুই জয়
হিংসুকের হিংসুটে হৃদয়?
চন্দন-গন্ধেরে হায় নর্দমা হর্দম করে ভয়।
"পঙ্কেই পঙ্কজ শোভে" যতই বলিস করে ঘটা,
পঙ্কজের 'পরে তবু পঙ্ক যে রে চিরদিন চটা।

* * *

আমার নগরে কেন ভেসে এলো অরণ্যের সুর?
মোটরের ভেঁপু আর রিক্‌শার ঠুন্‌ঠুন্ ধ্বনি,
ট্রাক, বাস, সাইকেলের হট্টগোল, ট্রামের ঘর্ঘর,
মনে হয় নগরের অবসন্ন আর্তনাদ যেন।
সেই আর্তনাদ যেন ছাপায়ে উঠিয়া
নাগরিক কর্ণে মোর গুঞ্জরিল অরণ্যের সুর
দূর বহুদূর হতে।

যাব কি অরণ্যে তবে? হে সখি, যাবে কি মোর সাথে,
নগরেরে পিছে ফেলে?
সখি কহে, হায়, যদি অরণ্য-অন্তরে চলে যাই
কেমনে শুনিব তবে দূর হতে অরণ্যের সুর?

* * *

জীবনে অনেক বাণী ব্যর্থ হয়ে যায়,
অনেক ব্যর্থতা জানি বাণী হয়ে জেগে থাকে তবু।
হিমালয় লক্ষ্য করে দৃষ্টি হানে অ্যাণ্ডিজ পাহাড়,
সাহারার আলিঙ্গন বাঞ্ছা করে গোবি মরুভূমি,
চেরাপুঁজি-বক্ষ 'পরে মুষলধারায় বার বার
মেঘেরা খসায় পুঁজি যুক্তহস্ত কাপ্তানের মতো
রিক্ততার মন্ত্র-ভরা মিঠে অভিযানে।
দিল্লীর লাড্ডুতে যদি দু দিকেই পস্তানোর খোঁচা,
খাওয়ার বৈঠক থেকে কেন তবে পড়ি মিছে বাদ?

নদীর ওপারে আকাশের কোণে একখণ্ড কালো মেঘ জমে ছিল। না, জমে ছিল না;—ভেসে চলেছিল ধীর মন্থর গতিতে নিরুদ্দেশের দিকে। সেইদিকে তাকিয়ে মনের গভীরে আবার ডুব দিল সুবিনয়। ডুবুরির মত খুঁজতে চাইল একটা উপলব্ধির মুক্তোকে—যাকে না পেলে মন ওর হয়তো কোনদিনই মুক্তি পাবে না।

ফেলে-যাওয়া মেঘের রঙে সে অপর্ণার চুলের রঙকে দেখতে পেল। অপর্ণার চুলও ছিল ঠিক অমনি কালো। মেঘবরণ চুল। কথাটা মনে হতেই মনের অতলে স্মৃতির আলোড়ন উঠল—কথা কয়ে উঠল একসঙ্গে অনেকে।

সেদিন সন্ধ্যায়ও গঙ্গার ধারে এমনি বসে ছিল ওরা। সুবিনয় বলেছিল, ওগো রাজকন্যে, তোমার ওই মেঘবরণ চুলের মাঝে আমাকে কি লুকিয়ে রাখতে পার না!

কথাটা শুনে অপর্ণা খুশী হয়েছিল খুব। বড় বড় উজ্জ্বল চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসেছিল।

সে কবেকার কথা? ঠিক মনে পড়ে না সুবিনয়ের। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, সেদিনের ও-কথা ওর নিজের কথা ছিল না। একটা বাংলা মাসিক পত্রিকার পাতাতেই কোন কবিতায় সে ওকথা পেয়েছিল।

তারপর আরও কত সন্ধ্যা অমনি এসেছে। অপর্ণার চুলের অন্ধকারের মাঝে মুখ গুঁজে পড়ে থেকেছে সুবিনয় কত সময়। ওই চুল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে খেলা করেছে কত রাত্রে। কত কবিতায় পড়া, গল্পে পড়া কথা শুনিয়েছে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে। স্মৃতির গভীর হাতড়ে সেই-সব দিনকে, সেইসব কথাকে তুলে আনতে চাইল ও এখন।

বারে বারে ঘা-খাওয়া প্রত্যাশাটা আবার মনের মাঝে নড়েচড়ে উঠল। মনে হল যেন একটা সেতুবন্ধের নিশানা দেখতে পেয়েছে ও।

ওপারের কালো মেঘটা ভেসে ভেসে দিগন্তের কোলে গিয়ে পড়েছে। এখান থেকে কত দূর ওটা—খুব কি বেশী! এখান থেকে কি ওর গন্ধকে পাওয়া যায় না! এখান থেকে কি ওর স্পর্শকে ঠোঁটে হাতে বুকে মেখে নেওয়া যায় না!—মনে মনে ভাবল সুবিনয়। দু-হাতের আঙুলের ডগায় আর ঠোঁটের উপরে একটা চিকন মসৃণ স্পর্শকে পেতে চাইল, নিশ্বাসে চাইল একটা মৃদু গন্ধকে। মনে হল যেন এটুকু পেলেই ও সবটুকু পাবে।

এই চাওয়ার একাগ্রতায় সমস্ত দেহ-মন ওর উন্মুখ হয়ে উঠল। হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল থরথর করে। সমগ্র সত্তাকে যেন একটা চাওয়ার বিন্দুতে জড়ো করে অনেকক্ষণের একটা প্রত্যাশাকে মেটাতে চাইল মন। কিন্তু পেল না কিছু।

অনুভবকে নিবিড় করার আগ্রহে, চাওয়ার প্রার্থনায় দু চোখ কখন যে বুজে এসেছিল তা বুঝতে পারে নি সুবিনয়। যখন চোখ মেলল, দেখতে পেল, কালো মেঘটা দিগন্তের ওদিকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোথাও কালোর কোন চিহ্ন নেই আর। শুধু শূন্য ফ্যাকাশে আকাশ চোখের সামনে চিরন্তন সত্যের বিভীষিকা হয়ে ঝুলতে লাগল।

আর, হঠাৎ কিছুতেই যেন মনে করতে পারল না সুবিনয় যে অপর্ণার চুলের রঙটা ঠিক কেমন ছিল।

যে আতঙ্কটা অনেকক্ষণ থেকে মনের কোণে গা ঢাকা দিয়ে গুড়ি মেরে বসেছিল, এখন হঠাৎ সেটা শ্বাপদের মত হিংস্র থাবা মেলে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিকারের ওপর। সব রঙ, সব রেখা, সব গন্ধ যেন ভেঙেচুরে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। কিছুই চেনা যায় না আর পৃথক করে।

বিহ্বল ভয়ে শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি আ[illegible] থেকে চোখ নামিয়ে নিলে সুবিনয়। অবোধ শি[illegible]খে তাকাল জ্বলন্ত চিতার দিকে। প্রবল স্রোতের মুখে ভেসে যেতে থাকা অসহায় মানুষ যেমন হাতের কাছের দুর্বল ঘাসের টুকরোকেও আঁকড়ে ধরতে চায়, ঠিক তেমনি আগ্রহে ক'টা রেখা আর ক'টা রঙকে জড়িয়ে ধরতে চাইল ওর ব্যাকুল দৃষ্টি। ক'টা রেখা আর রঙকে আর সব রেখা আর রঙ থেকে চিরদিনের জন্যে আলাদা করে নিতে চাইল ওর আকুল মন।

কিন্তু পারল কি?

আগুনের শিখারা তখন অপর্ণার মুখখানাকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। চুলের কালো পটভূমি অদৃশ্য। বড় নগ্ন নিরাবরণ মনে হল সেই মুখ।

কিন্তু ও মুখ কার? ভাল ক'রে তাকাতে যেন চিনতেই পারল না সুবিনয়। মনে হল যেন ও মুখ অপর্ণার নয়, আর কারও—অন্য কোন মেয়ের—যে মেয়েকে সুবিনয় কোনদিন দেখে নি, কোনদিন চেনে নি।

মৃত্যুর অপরূপ হাত অপর্ণার মুখে তার আশ্চর্য কারুকার্য এঁকে দিয়ে গেছে। ওর সমাজ, ওর শ্রেণী, ওর শিক্ষা ও মুখে যে রেখার টান দিয়েছিল, দিনগত আচরণে যে রূপ আর রঙ বুদ্ধির অগোচরেই তিলে-তিলে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল, তার সব নিঃশেষে ধুয়ে মুছে নিবে গেছে। এখন ও মুখ প্রথম দিনের শিশুর মতই স্বাভাবিক। মৃত্যুতে জীবনের সব কৃত্রিম রেখা আর রঙেরই অবসান। সেই অবসানের প্রান্তে পৌঁছে গেছে অপর্ণা। এখন ওকে আর চেনা যাবে কী করে!

না, চিনতে পারেও না সুবিনয়। জীবনে কখনও সে এ চেহারা দেখে নি অপর্ণার—দীর্ঘ আঠারো বছরের দাম্পত্য-জীবনের কোন অসতর্ক মুহূর্তেও না। মনে হয়, উনিশ বছর আগের এক দুপুরে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে প্রথম যেদিন ও মুখ চোখে পড়েছিল, সেদিনও এত অপরিচিত মনে হয় নি ওকে।

শিশুর মত ভয় পাওয়া বিস্ময়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুবিনয় চিতার উপরের ওই অপরিচিত মুখের দিকে।

ও কার মুখ ! কে ও !

ওই অপর্ণা। ওই তার দেহ, ওই তার মুখ। ও আমারই স্ত্রী—সব চেয়ে ভালবাসার পাত্রী। আমার জীবনের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আর পরিচয় শুধু ওরই সঙ্গে—বারবার অবুঝ মনের কানে কানে বলতে চাইল সুবিনয়। কিন্তু কেন জানি না একটা অস্পষ্ট অজানা ভয়ে কিছুতেই বলতে পারল না কোন কথা।

শুধু মনে মনে দুর্বিনীতের মত একটা জিজ্ঞাসা কেবলই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল : এই যে অপর্ণা চেনার সীমানা পেরিয়ে গেল, এর কারণ কি শুধু মৃত্যুর স্পর্শই—[illegible]ছু নয় ?

[illegible]টা যদিও মনে পরিষ্কার হল না, তবুও কেমন যেন [illegible]কটা রহস্যময় অনুভূতি মনকে জানিয়ে দিলে যে তা নয়—আসল কারণের বাসা ওদের নিজেদেরই মধ্যে।

কিন্তু সে কি ?—সে কোথায় ? কিছুই পরিষ্কার করে ভাবতে পারল না সুবিনয়। শুধু বিস্ময়ে ভয়ে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল চিতার দিকে। লেলিহান আগুনের স্পর্শে অপর্ণার মুখ আর শরীর ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে লাগল, ভস্মীভূত হতে লাগল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘটতে লাগল অনেক দিনের লালিত একটা প্রত্যয়ের অপমৃত্যু।

* * *

এমন যে ঘটবে, ঘটতে পারে, এ কথা ভাবে নি কোনদিন সুবিনয়। ভাবাটা ওর পক্ষে সম্ভবও ছিল না কখনও। মাল্‌টিমিলিওনেয়র নিরঞ্জন মুখার্জির একমাত্র ছেলের কাছে জীবন সরলরেখায় আঁকা নানান রঙের একটা সুরম্য ছবিই ছিল শুধু। তাতে না ছিল ডাইমেনশনের জটিলতা, না ছিল রেখার ঘোরপ্যাঁচ। প্রথমে সাহেবী স্কুল, তারপর ইউনিভার্সিটি, এবং পরিশেষে অকস্‌ফোর্ড-কেম্ব্রিজ অথবা য়ুরোপ-আমেরিকার অন্য কোথাও দু-চার বছর কাটিয়ে আসা। এর পরের যে-অধ্যায়, সেও ঠিক এমনিই—সুন্দরী শিক্ষিতা কোন মেয়েকে ভালবেসে বিবাহ, নিরুদ্বেগ এবং নিঃশঙ্ক বৈজ্ঞানিক দাম্পত্য-জীবন পালন, এবং স্বর্ণপ্রসূ দীর্ঘ কর্ম-জীবনের অবসানে সস্ত্রীক কোন হিমশৈলে অবসর যাপন। ঠিক একটার পর একটা ধাপে ধাপে আসে, ধাপে-ধাপে পার হয়ে যায়। নিরঞ্জন মুখার্জির সমাজের সবার জীবনই এই একই ছকে বাঁধা। তাঁর ছেলের জীবনেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকা ছকে জীবন বিবর্তিত হয়েছে. ধরাবাঁধা নিয়মে, এবং মন তার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলেছে যন্ত্রের মত। বাঁধা ছকে কোনদিন ছন্দপতন ঘটে নি। কিছু চেয়ে না পাওয়ার দুঃসহ যন্ত্রণা জীবনে কোনদিন আসে নি বলেই সে বোঝার অবকাশ পায় নি কখনও যে সত্যিই সে কী চায় আর না চায়। এই ভাল এই মন্দ, এ ভালবাসি ও ভালবাসি না—এমনি অনেক ধারণা অনেক আগে থেকেই তৈরি হয়ে আছে, এবং মন শুধু সুবোধ বালকের মত তাকে মেনে নিয়েছে বলেই কোনদিন সে অনুভবের সুযোগ পায় নি যে জীবনের সব-কিছুর মূল্যবোধই চরম অভিজ্ঞতার নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে ছাড়া পাওয়া যায় না। যাকে সহজে পাওয়া যায়, পড়ে পাওয়া যায়, সে শুধু ফাঁকি মেকি। তা দিয়ে মনকে বোঝানো যেতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে ভরা যায় না।

সুবিনয়ের কেরিয়ার ছেলেবেলা থেকেই উজ্জ্বল। সুন্দর স্বাস্থ্য এবং বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমলে ছেলে। স্কুলের পরীক্ষায় বরাবর প্রাইজ পেয়ে এসেছে। ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাতেও তা-ই। য়ুরোপেও ঘুরে এসেছে বার দুয়েক। জীবনে উন্নতি করা বলতে আমরা যা বোঝাই, তার প্রস্তুতিতে কোন দিকেই ঘাটতি ছিল না ওর। আর সবার উপরে, সব কিছু ছাপিয়ে ছিল ওর বাবার অগাধ বিত্ত। জীবন যে ওর সবদিক থেকেই ভরে উঠবে, এতে কোন সন্দেহই কেউ করে নি কখনও। ও নিজেও না।

অপর্ণার সঙ্গে ওর প্রথম পরিচয় যখন, ইউনিভার্সিটির শেষ পরীক্ষা শেষ হতে ওর তখনও বাকি—আর অপর্ণা সবে ফিফথ্ ইয়ারে ঢুকেছে। একে ভাল ছেলে তায় ধনীপুত্র—কাজেই ছাত্রমহলে ওর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। আর সেই আকর্ষণে অপর্ণাই যেচে এসে আলাপ করে।

সেদিনের কথা এখনও ভোলে নি সুবিনয়। ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে বসে ছিল। সুন্দর সপ্রতিভ একটি মেয়ে এসে নমস্কার করে বললে, আপনিই তো সুবিনয় মুখার্জি ?

প্রতি-নমস্কার জানাতে-জানাতে উত্তর দেয় সুবিনয়, হ্যাঁ। কেন বলুন তো ?

আপনার কথা শুনেছি অনেক।—বলে মেয়েটি, আপনার তো ইংরেজী। আমারও। ফিফথ্ ইয়ার।

তার পর একটু থেমে স্মিত একটু হেসে যোগ করে দেয়, আমায় একটু হেলপ্ করবেন ?

হেলপ্ ? কী ব্যাপার ?—জিজ্ঞাসু চোখে চায় সুবিনয়।

এই পড়াশুনোর ব্যাপারে আর কি।—হাসিমুখেই বলে মেয়েটি, এই দেখুন না, প্রমিথিয়ুস আন্‌বাউণ্ড-টা বুঝতে পারছি নে কিছুতেই। আপনি যদি কাইণ্ডলি একটু—বলেই ওর মুখের দিকে হাসি-হাসি চোখ তুলে প্রশ্ন করে, কষ্ট হবে ?

না না, কষ্ট কিসের ?—সুবিনয় ব্যস্ত হয়, এ তো ভালই—আমারও এই সুযোগে ভাল করে পড়া হয়ে যায়।

পড়া বোঝানো শুরু হল সেইদিন থেকে। কিন্তু পাঠটা কেবল বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না—মনের রাজ্যেও

গিয়ে প্রবেশ করল। পড়া বোঝা অল্প দিনেই মন-বোঝাবুঝিতে পরিণত হল।

হওয়ায় বাধা ছিল না কোথাও। বয়ঃসন্ধি পেরনোর পর বয়সের নিজের ধর্মে সুবিনয়ের মনে যে আসঙ্গের লিপ্সা জেগেছিল বিশেষ সমাজের হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিয়ে নিয়ে তার তৃপ্তিরও একটা বিশেষ মূর্তি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই আমি চাই, এই আমার ভালবাসা, এমনি হলেই আমি তৃপ্ত হব—এমনি ক'টা স্থির ধারণার ছবি বই থেকে গান থেকে কথা থেকে সমাজের নানা দিক দিয়ে এসে অনুভূতির জায়গা দখল করে নিয়েছিল মনে।

আর, সেই ধারণার বিশেষ চেহারার সঙ্গে আশ্চর্যভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল অপর্ণার। হয়তো অন্য কোন মেয়ে হলেও ঠিক অমনিই হত। কিন্তু সে কথা সেদিন সুবিনয় ভাবতে পারে নি। মনে হয়েছিল, অন্য কেউ নয়, শুধু ও—ওই অনন্য মেয়ে। শুধু ওকেই ও ভালবাসতে পারে।

মনে হবার হয়তো কারণও ছিল যথেষ্ট—উপরে না হোক, আড়ালে অগোচরে। অপর্ণা যে বংশের মেয়ে সে বংশও সুবিনয়দের থেকে কোন অংশে খাটো নয়। অনেক পুরুষের বনেদী জমিদার ওরা। ওর চেহারাতেই সে-কথার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যেত। বংশ বংশ ধরে অর্থের জোরে দেশের সেরা সুন্দরী মেয়েদের ঘরে নিয়ে আসার ফলে রূপ তিল তিল করে ও-বংশের ধারায় সঞ্চিত হয়েছিল। সেই তিলতিলে জমে-ওঠা রূপের যেন তিলোত্তমা ছিল অপর্ণা। না, শুধু দেহের রূপেই নয়—মনের রূপেও। বাংলার জমিদারেরাই নাকি এককালে এ দেশের সংস্কৃতির ধারক-বাহক ছিলেন। কথাটা সত্যি কি না জানি নে। সত্যি হলে মানতেই হয় যে অপর্ণার রক্তেই সংস্কৃতির বীজ ছিল। আজকাল আমরা যাকে কালচার বলি, সে কালচার ওর কিছু কম ছিল না কোন দিকে। নাচটা ও ভালই জানত, গানেও গলা মন্দ ছিল না। আর, বিয়ের আগে কিশোর বয়সে নাকি আঁকার দিকেও ঝোঁক ছিল যথেষ্ট। এ ছাড়া, আচারে-ব্যবহারে কথায়-বার্তায়, এমন কি স্মিত হাসির ভঙ্গিতে পর্যন্ত ওর কালচারের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যেত।

রূপে এবং গুণে অনন্যা এ মেয়ে যে যে-কোন ছেলেরই আকাঙ্ক্ষিত হবে, এটা খুব স্বাভাবিকই ছিল। তা ছাড়া, সুবিনয়ের মনের অবচেতনায় হয়তো ওর বংশের কথাটাও কাজ করেছিল। শ্রেণীর মিল না থাকলে হয়তো সেখান থেকে এ আসঙ্গে সায় পাওয়া সহজ হত না।

সে যাই হোক, সুবিনয় যখন একটি অভিজাত বংশের সুন্দরী মেয়েকে ভালবাসল; এবং অপর্ণা যখন নিরঞ্জন মুখার্জির একমাত্র সুদর্শন এবং শিক্ষিত ছেলেকে হৃদয় দিল, তখন উভয় পক্ষের অভিভাবকদের তরফ থেকে কোন আপত্তিই ওঠে নি। উভয় পক্ষই ছিল শিক্ষিত, এবং আজকাল যাকে আমরা প্রগতিশীলতা বলি সেই সব মতামতের পৃষ্ঠপোষক। কাজেই, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা এবং প্রেমের মর্যাদা দিতে তাঁরা এতটুকু দ্বিধা করেন নি।

না করে যে ভালই করেছিলেন, সেটা প্রমাণ হয়েছে পরে। অপর্ণা আর সুবিনয় সারা জীবন ধরে একটা আদর্শ দম্পতির উদাহরণ হয়ে রয়েছে। আদর্শ বিবাহিত জীবনের কথা উঠলে সমাজের সকলেই ওদের কথাই উল্লেখ করে এসেছে এতদিন ধরে। কন্‌জুগ্যাল হারমনি বলতে যা বোঝায়, তা ওদের মাঝে পুরোমাত্রাতেই বর্তমান ছিল। দীর্ঘ আঠারো বছরের কোন দিন কোন কারণে মতান্তর পর্যন্ত হয় নি—মনান্তর তো দূরের কথা।

হ্যাপী কাপল, আদর্শ দম্পতি—এমনই সব কথা চারিদিকে শুনে শুনে ওদের নিজেদের ধারণাও [illegible] কখন বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গেছে তা ওরাও জানে না। [illegible]তে ওদের আসাটা যে শুধু পরস্পরের জন্যেই, এ কথা ওরা বিশ্বাস করেছিল মনে-প্রাণে। আর তাই, কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে নি কখনও। বিয়ের পর সুবিনয় দুবার বিলেত গেছে, অপর্ণাকে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে।

এ রকম অবস্থায় বিচ্ছেদের চিন্তাটা যে মর্মান্তিক হবে, সে তো জানাই। হয়েছিলও তাই। মৃত্যুর কথা ওরা ভাবতেও পারে নি কখনও।

অপর্ণা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত, আমি মরে গেলে তুমি কি করবে বল তো? আবার একটা বিয়ে করবে?

সুবিনয়ও তেমনি সুরে উত্তর দিত, হুঁ। তাই ই তো। আমার ভাবনা কিন্তু তোমাকে নিয়ে। মরার পরে যা খুশী কর, দেখতে আসব না। কিন্তু বেঁচে থাকতেই না কর কিছু আবার। যা দিনকাল পড়েছে!

শুনে রাগ করত অপর্ণা: যাও, তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করাও দায়। এমন সব কথা বলবে!

ওর রাগ দেখে হাসত সুবিনয়।

হাসত। কিন্তু যখনই মনে পড়ত ওসব কথা, কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত ও। ওদের কেউ যে অপরকে ছেড়ে যেতে পারে কখনও, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

তাই, ডাক্তার যখন জবাব দিয়ে গেলেন, তখন হঠাৎ যেন ঘুমঘোর থেকে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে সচেতন হয়ে উঠল সুবিনয়। নিষ্ঠুর নিয়তি যেন অসহায় বলির পশুকে ঘাড় ধরে অমোঘ হাড়িকাঠের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল। এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তবু বিশ্বাস করতে হবে। মেনে নিতে হবে।

কিন্তু কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? যাবে! কী করে সইতে পারবে ও একে—যাকে সওয়া যায় না কিছুতেই?

সারাদিন সারারাত অপর্ণার রোগশয্যার পাশে বসে থেকেছে সুবিনয়। আর মনে মনে আকুল হয়ে প্রার্থনা

করেছে কেবলই : ঈশ্বর, এ যেন না হয়। এ যেন না হয়। এ আমি সইতে পারব না কিছুতেই।

নার্স বারে বারে উঠে যেতে বলেছে, বিশ্রাম নিতে বলেছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও সরে নি সুবিনয়। যেন ও উঠে গেলেই অপর্ণা চলে যাবে। যেন ও পাশে বসে থাকলেই ধরে রাখতে পারবে তাকে।

কিন্তু ধরে রাখা গেল না। চোখের সামনেই ধীরে ধীরে শেষ-মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। চলে গেল অপর্ণা। ধরে রাখার জন্যে একটা হাতও বাড়াতে পারল না সুবিনয়।

কিন্তু যা মনে করেছিল সুবিনয়, তার কিছুই ঘটল না। বহুদিনের একটা অভ্যাসকে হঠাৎ ছেড়ে দিতে হলে যতটা বাধা [illegible], তার চেয়েও কিছু বেশী—একটা বেদনা, একটা শূন্য[illegible]র কিছু অংশকে ভরে দিল। কিন্তু সমস্ত সত্তা [illegible]করে কোন যন্ত্রণা ঠেলে উঠল না মনের মর্মমূল থেকে, রক্তে রক্তে সঞ্চারিত হল না কোন কালকূটের অসহ্য দহন। উন্মাদ হয়ে গেল না বেদনায়, চেতনাও হারাল না—যেমন ও হবে বলে ভেবেছিল।

আর, তারপর থেকেই চলেছে এই আত্মজিজ্ঞাসা—আত্মবিশ্লেষণ। চিতার আগুনে পুড়ে অনেক দিনের একটি প্রত্যয়ের মৃত্যু ঘটেছে সেদিন। কিন্তু সেই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে আর একটি সত্যের অঙ্কুর। সে সত্য এত নিষ্ঠুর, এত কঠিন এবং এমন নগ্ন যে তাকে সহজে গ্রহণ করার মত মনের শক্তি ছিল না সুবিনয়ের। তাই সেদিন শ্মশান থেকে ফেরার পথে ও চোখের জল চেপে রাখতে পারে নি। বন্ধুরা তাকে ওর শোকের অশ্রু বলেই মনে করেছে। মনে করাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তারা ওকে জীবনের নশ্বরতা এবং প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী শক্তির কথা বলে মামুলী প্রথায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে সব কথা ওর মনে একটা অক্ষম অপরাধ-বোধের ক্ষোভ ছাড়া আর কিছুই জাগাতে পারে নি।

শুধু সেদিনই নয়—তার পরেও। সেদিন শ্মশান থেকে ফিরে ছেলেমেয়েদের মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেবার পর সেই যে নিজের শোবার ঘরে ঢুকেছে সুবিনয়, আর বড় একটা বেরোয় নি। চাকরবাকরদের বলে দেওয়া আছে যে, কোন কারণেই যেন ওকে না ডাকে কেউ। এ কদিনের মধ্যে কেউ ডাকেও নি। সহানুভূতি জানাতে এসেছে অসংখ্য লোক—আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী—বাদ যায় নি কেউ-ই। কিন্তু বাড়ির লোকজনের মুখে ওর নির্দেশের কথা শুনে কেউই ওকে ডাকে নি—মর্মান্তিক শোকের দুঃসহ ব্যথার মধ্যে বিরক্ত করতে চায় নি ওকে।

এমন কেন হল! কেন ও যেমন চেয়েছিল তেমনি হল না সব!

প্রশ্নের যদিও শেষ হয়েছে, কিন্তু ক্ষোভের শেষ হয় নি এখনও। চিতার আগুনে সেদিন যে দুঃসহ সত্যকে
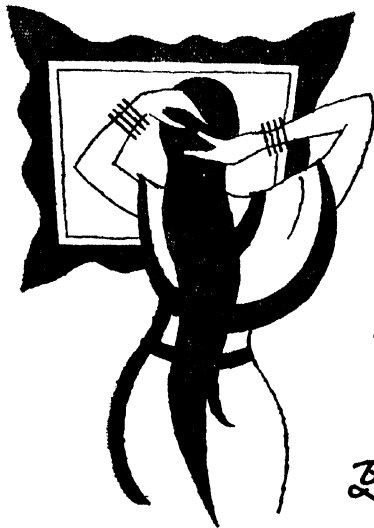
পেয়েছে, তাকে মেনে নিতে বাধ্য হলেও এখনও আত্মস্থ করে নিতে পারে নি সুবিনয়। এখনও মন খুঁজছে চারিদিকে যদি কোথাও ওর নিষ্ঠুর থাবা এড়িয়ে পালানোর পথ থাকে। এখনও মনে মনে চলেছে তার ব্যাকুল অন্বেষণ। কিন্তু পথ কি আছে কোথাও ?

কখন দুপুর ঘুরে গেছে, রোদ পড়ে গেছে, সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকার চারিদিকে নেমে এসেছে, কিছুই জানতে পারে নি সুবিনয়। নিজের মনের গভীরে মগ্ন হয়ে ছিল। বাইরের জগতের কোন আলো কোন রঙ কোন শব্দ ওকে স্পর্শ করতে পারে নি। ঘরের মাঝে অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে চেতনা ফিরল। উঠে গিয়ে ডান দিকের জানলাটা খুলে দিল সুবিনয়।

এক ঝলক ভীরু আলো বিষণ্ণ বাতাস মেখে ছুটে এল ঘরের মাঝে। একটা গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে একটুক্ষণ খোলা জানলার সামনে দাঁড়াল সুবিনয়।

ঠিক জানলাটার সামনেই জাস্টিস্ ব্যানার্জির বাড়ির বাগানে কারা যেন বসে আছে! ভাল করে তাকাতে চিনতে পারল সুবিনয়। জাস্টিস্ ব্যানার্জির মেয়ে আর তার ভাবী স্বামী। নরম সবুজ ঘাসের ওপরে পা ছড়িয়ে বসেছে মেয়েটি, আর তার পায়ের কাছে বসে এক দৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটি। কী যেন গভীর কথায় মগ্ন ওরা!

এত দূর থেকে কোন কথাই ওদের শোনা যায় না। কিন্তু ওদের সব কথাই যেন বুঝতে পারে সুবিনয়। না বোঝার কিছু নেই এখন আর ওর কাছে।

আমার সমস্ত মনের আকাশ তুমি গোধূলির আলোর মত ভরে রয়েছ। তুমি আমার আকাশ, তুমি আমার বাতাস, তুমি আমার পৃথিবী।—বলে ছেলেটি।

ঠিক এমনি কথাই বলেছিল সুবিনয় উনিশ বছর আগে অপর্ণাদের বাড়ির বাগানে। শুনে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অপর্ণা হেসেছিল। কেমন করে যেন হেসেছিল ?

হঠাৎ মনে পড়ে না সে কথা।

ঘরের দেয়ালে অপর্ণার ছবি টাঙানো আছে। ওর প্রথম সন্তান হবার পরেই একজন বিখ্যাত আর্টিস্টকে দিয়ে সে ছবি আঁকিয়েছিল সুবিনয়। অপর্ণার হাসির কথা মনে হতে সেই ছবির দিকে তাকাল ও।

জীবন্ত অপর্ণা যেন আবার ঠোঁটভরা হাসি আর সারা গা-ভরা খুশি নিয়ে ফিরে এল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে সে হাসিকে নিমেষেই চিনতে পারল সুবিনয়। সারা জীবন ওর মুখে ওই হাসিই দেখে এসেছে ও। কোনদিন কোন কারণে মুখ থেকে ও-হাসি মুছে যায় নি; বা ঠিক করে বলতে গেলে বলা যায়, মুখ থেকে হাসি মুছে যাবার মত কোন-কিছু ঘটে নি জীবনে।

সুবিনয়ের মনে হল, এই মুহূর্তে প্রণয়ীর স্তুতিভাষণ শুনে ঠিক এই রেখাই ফুটে উঠেছে জাস্টিস ব্যানার্জির মেয়ের মুখে। ঠিক এমনিই ফুটে ওঠে।

সারা জীবন মুখে ওরা ওই রেখাই ধরে রাখে, যাকে আমরা নাম দিয়েছি রূপ, যাকে আমরা নাম দিয়েছি কালচার। কিন্তু ও-রেখা কি কোনদিন ভেঙেচুরে যায় না—কোন আবেগের তাড়নায়, কোন ভালবাসার বেদনায়, জীবন-যন্ত্রণায় ?

অপর্ণার মুখভরা সুন্দর উজ্জ্বল স্মিত হাসির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জানতে ইচ্ছে হল সুবিনয়ের, মিলনের মুহূর্তের অসহ্য আনন্দে আর সৃষ্টির মুহূর্তের অসহ্য বেদনায়ও কি ও-মুখের ও-রেখা এঁকেবেঁকে যায় নি ?

কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে অসহ্য বির[illegible] মুখ ফিরিয়ে নিল সুবিনয়। আস্তে আস্তে আবার ই[illegible]রে ফিরে গিয়ে বসল। চোখ ঢেকে নিল দু হাতে।

* * *

কতক্ষণ এমনি বসে ছিল ঠিক নেই। যখন সময়ের জ্ঞান ফিরল, তখন রাত অনেক। সারা ঘর ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরে গেছে। খোলা জানলা দিয়ে নির্মেঘ ঝকঝকে আকাশ দেখা যাচ্ছে। চারিদিকে কোথাও কোন সাড়া-শব্দ নেই। বাইরে অনেক রাত—অনেক ঘুম।

চোখ মেলে তাকাতেই অপর্ণার ছবিটার দিকে দৃষ্টি পড়ল। রূপালী জ্যোৎস্নায় হাসছে অপর্ণা।

কিন্তু হঠাৎ যেন ওকে আর চিনতে পারল না সুবিনয়। চিতার উপরে মৃত্যুর হাতে কারুকার্য-আঁকা যে মুখ ও দেখেছে, সেই তো সত্যিকারের অপর্ণার মুখ—বেদনার রেখা ভরা, অনুভবে অপরূপ।

তবে এ মুখ কার ? কে এ ?

ধীরে ধীরে মনে পড়ল, এ মুখও অপর্ণার— জীবনের মুখোশ-পরা। এমনি মুখই সারা জীবন ছিল অপর্ণার। এমনি রেখা আর রঙকেই সারা জীবন মুখে ধরে রেখেছিল সে।

কথাটা মনে পড়তেই চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত অর্থহীন হাসিভরা খুশী-খুশী মুখখানার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ অসহ্য বেদনায় ভরে গেল সুবিনয়ের মন।

সারা জীবন ও মনে করে এসেছে যে, ও সুখী, ও ভালবাসে। কিন্তু জীবনে কখনও ও বুঝতেই পারে নি যে ভালবাসা কাকে বলে।

হায় রে, বোকা মেয়ে!—মনে মনে বিড়বিড় করে গভীর মমতায় বলল সুবিনয়।

আর, এই মুহূর্তে ওর মনে হল, দীর্ঘ উনিশ বছর পর ও যেন অপর্ণাকে সত্যিই ভালবাসতে পারল এখন।

নিবারণের সমিস্তে

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ও-রাস্তা দিয়ে এলে-গেলে একবার করে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছি, এই মাসখানেক ধরে। এক জোড়া জুতোর ফরমাশ দিয়েছি, আজ পর্যন্ত হয়ে উঠল না।

বললাম, কী গো নিবারণ, আর কত ঘোরাবে?

নিবারণ ব্যস্ত হয়ে উঠল; একটা লেডিজ স্থ হাতে নিয়ে এক[illegible] দেখছিল, একটু যেন লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি প[illegible]য় রেখে হাত দুটো ঝেড়ে বলল, এই যে আসুন বাবু, [illegible]জ্ঞে হোক, প্রাতঃপ্রেণাম হই।...টুলটা মুছে দে রে ভাল করে।

রাস্তার ওপরই ছোট্ট একখানি ঘর, চারিদিকে কাটা চামড়া আর যন্ত্রপাতি ছড়ানো, একটা সেলাইয়ের কল। এক পাশে একটি নীচু ছোট্ট চৌকো টুল, একটি বছর দশেকের ছেলে—নিবারণের সম্বন্ধী একটা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিচ্ছিল। আমি বললাম, না, বসলে চলবে না, কাজ রয়েছে। বলছিলাম, না পার তো না-হয়—

আজ্ঞে, বসুন একটু, য্যাখন কপালগুণে পায়ের ধুলো পড়লই।...জুতো তো প্রায় শেষ করে এনেছিনু, তার পর এক সমিস্তেয় পড়ে গেনু যে অকস্মাৎ—

আবার তোমার সমস্যাটা কী? আমাকেই এক সমস্যায় ফেলে রেখেছ এই তো জানি।

আজ্ঞে, কঠিন সমিস্তে, ওরা তো কত ধানে কত চাল বোঝে না, বলে দিয়েই থালাস; ওই নেপার মুখে শুনুন না।...তুই আগে যা, যা দিকিন বাবুকে একটা গোলফেলেক সিগ্রেট এনে দে, দে-কাঠির বাক্সটাও একবার চেয়ে নিবি। ও কী, হাতটা ধুয়ে নিতে হবে না?...চলল নাপ্যে!

উঠে বসে প্রশ্ন করলাম, তার পর?

নিবারণ হাঁটু দুটো দু হাতের বেড়ের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে বলল—লজ্জিত ভাবেই একটু দ্বিধাভরে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেমে থেমে বলল, আজ্ঞে, অই আসুক, শুনবেন খন। কথাটা হচ্ছে ওদের না হয় হায়া-লজ্জা বলে জিনিস নেই, ইস্কুলে জলাঞ্জলি দিয়েছে, কিন্তু আমি এখন আপনার সামনে লজ্জার মাথা খেয়ে মুখ খুলি কী করে?

নিবারণের বাড়ি মার্টিন লাইনে আমার মামার বাড়ির গ্রামে। পরিবারটি মামাদের অনুগত, কাজে কর্মে প্রয়োজনমতো মেয়ে-পুরুষে এসে খেটে দিয়ে যেত, প্রসাদ পেত। মনে পড়ে, বাড়ি গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছি কতদিন।

ছেলেবেলার কথা। তার পর মাস দুয়েক হল, পথ চলতে জুতোর তলায় হঠাৎ একটা কাঁটা উঠে অসুবিধায় পড়ায় রাস্তার ধারেই ওর দোকানটা দেখে সেটা ঠুকিয়ে নিতে গিয়ে পরিচয়টা পেলাম। বাঙালীর জুতো-সেলাইয়ের দোকান দেখা যায় না। আমিই জিজ্ঞাসাবাদ করতে টের পেলাম, নিবারণ মামাদের গাঁয়ের দুর্লভের ছেলে। গাঁয়ে রোজগার নেই। মাস পাঁচেক হল শহরে এসে দোকানটি খুলেছে। বাইরে থাকি, মামার বাড়ি যাওয়া-আসা কমে গেছে, আমায় জানবার কথা নয় ওর, পরিচয় পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সেই দিন থেকেই খাতির চলছে। এদিক দিয়ে গেলে একটু দাঁড়িয়ে যাই, নিবারণ যায় মাঝে মাঝে গ্রামে, খবর আনে—একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে।

তার পর জুতোর ফরমাশটা দিলাম।

বেশ লাগে ছেলেটাকে। বছর ছাব্বিশ-সাতাশ বয়স, তেল-চুকচুকে কালো রঙ, মাথায় বাবরী চুল, গলায় এক গোছা কালো সুতোয় একটা তাবিজ ঝোলানো; দেহে-মনে কোথাও যেন শহরের ছোপটা এখনও ধরে নি।

গল্প করার মধ্যে বেশ একটা সলজ্জ সমীহ ভাব আছে। মাথা নীচু করে জুতো সেলাই করতে করতেই করে গল্প, এক-একবার চোখ তুলে হেসে চায়, কখনও গম্ভীর হয়ে ভ্রূ নাচিয়ে মাথাটা দুলিয়ে দেয়, গল্পের তারতম্য অনুযায়ী।

এক এক সময় গল্প করতে করতেই বেশ প্রাণখোলা হয়ে পড়ে, বেশ খানিকটা যেন অন্তরঙ্গ। রেখে-ঢেকে কথা বলতে পারে না। নেপার জন্যে 'সমিস্তে'র কাহিনীটা তুলে রাখলেও, আরম্ভ করল শেষ পর্যন্ত নিজেই নিবারণ। ও সিগারেট নিয়ে এলে একটু লজ্জিতভাবে বলল, তোর

প্রত্যাবর্ত্তন
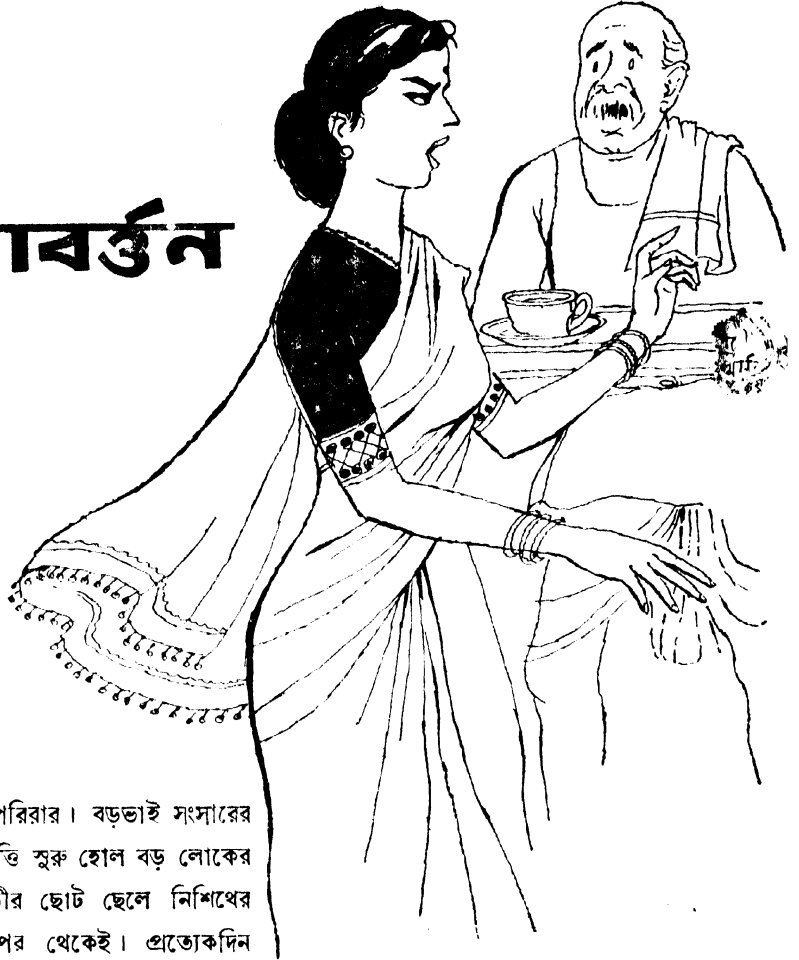
স্বচ্ছল একান্নবর্ত্তী পরিরার। বড়ভাই সংসারের কর্ত্তা। কিন্তু বিপত্তি সুরু হোল বড় লোকের মেয়ে সিপ্রা এ বাড়ীর ছোট ছেলে নিশিথের বৌ হয়ে আসার পর থেকেই। প্রত্যেকদিন অশান্তি লেগেই আছে। একদিন চাকরের হাত থেকে ময়লা বলে চায়ের পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সিপ্রা। আরেকদিন বড় বৌদি রান্না করতে করতে সিপ্রাকে কি একটা ফরমাস করেছিল। সিপ্রা যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করেছিলেন ওঁকে। "আমি কি আপনাদের বাড়ীর ঝি হয়ে এসেছি?" নিশিথের কানে সব কথাই পৌঁছত—কিন্তু অন্যভাবে। সিপ্রা আস্তে আস্তে নিশিথের মনটা দাদাবৌদির বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলল। ওকে বোঝাল ওদের ঠকিয়ে দাদাবৌদিরা নিজেরা সব গুছিয়ে নিচ্ছেন। নিশিথ প্রথম প্রথম বিশ্বাস করতনা। "যাঃ তা কি করে হবে? বড়বৌদি আমায় কোলে পিঠে করে নিজের ছেলের মত মানুষ করেছেন।" কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ওর মনেও সন্দেহের বিষ ঢুকলো। এক-

দিন সত্যই দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে বিষয় সম্পত্তি ভাগবাঁটোয়ারা করে আলাদা হয়ে গেল নিশিথ। সিপ্রার প্ররোচনায় নিশিথরা এসে উঠল সাহেবী পাড়ার এক বিরাট ফ্ল্যাটে। তারপর সুরু হোল এক অদ্ভুত জীবনযাত্রা। নিশিথ বলল "সিপ্রা এভাবে চললে দেউলিয়া হয়ে যাব।" সিপ্রা বলল "সে দায় তোমার। বিয়ে করার সময় মনে ছিলনা?" সিপ্রার জীবনযাত্রা অব্যাহত রইল। এরমধ্যেই ঘটল আর এক বিপর্যায়। নিশিথের [illegible]নী গেল লিকুইডেশনে। ফলে ওর কাজটা [illegible] নিশিথ জানালনা সিপ্রাকে। দুহাতে বেপরোয়া টাকা ধার করতে লাগল। কিছুতেই হার মানবেনা ও। একদিন খুব জ্বর নিয়ে ফিরে এলো নিশিথ। সে জ্বর বেড়েই চলল। জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য হয়ে রইল নিশিথ। সিপ্রা পড়ল অকূল সমুদ্রে। কি ভাবে চলবে এখন? দাদাবৌদির কথা ভাবতেই ও শিউরে উঠল। ওঁরা নিশ্চয়ই অপমান করে তাড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ভেবে কোথাও কোন কূলকিনারা না পেয়ে ও দাদাকেই একটা চিঠি লিখল কিছু টাকা ধার চেয়ে আর সব কথা জানিয়ে। ৭ দিন অপেক্ষা করেও কোন উত্তর পেলনা। ও জানতো পাবেনা। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল সিপ্রা। এতদিনকার কৃতকর্ম্মের জন্যে আজ ওর অনুশোচনার শেষ নেই। হঠাৎ দরজার কড়া ঠকঠক করে উঠল। সিপ্রা কোন পাওনাদার ভেবেই দরজা খুলতে গিয়েছিল। কিন্তু দেখল দরজার সামনে দাদা আর বৌদি। দাদা শুধু জিজ্ঞেস করলেন "নিশি কোথায়?" তারপর জড়িয়ে ধরলেন জ্বরে নিশিথকে। "দাদা! আঃ!" নিশিথ নিশ্চিন্ত আরামে চোখ বুঁজল। বৌদি বুকে তুলে নিলেন সিপ্রাকে —"আমার পাগলি মেয়ে!" সিপ্রার দুচোখ দিয়ে অঝোর ধারে জল গড়িয়ে পড়ছে।

প্রায় ছমাস পর। নিশিথ মোড়ায় বসে আছে। সিপ্রা রান্না ঘরে। সিপ্রা বড় বৌদিকে বলল "আজ আমি চচ্চড়ি রান্না শিখব দিদি"— "আচ্ছা, একটু 'ডালডা' নিয়ে আয়তো ভাঁড়ার থেকে!" "ডালডা' তো নেই দিদি—বয়াম একেবারে খালি। একপোটাক আনিয়ে নেব?" "দুর পাগলি, 'ডালডা' বয়ামে কেন থাকবে, 'ডালডা' আছে 'ডালডার' টিনে আর 'ডালডা' তো একটু আনানো যায়না, পুরো টিনই আনতে হয়।" "কেন 'ডালডা' বুঝি খোলা পাওয়া যায়না?" "না, কখনও না। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র শীলকরা টিনে। তাই তো 'ডালডা' সবসময় এত তাজা আর ভাল।" "কেন কাকীমা তো খোলা 'ডালডা' আনাতো!" "সেটা 'ডালডা' নয়রে পাগলি! 'ডালডা' খুব জনপ্রিয় বলে অনেক আজে বাজে জিনিষ ডালডার নামে কাটছে। 'ডালডা' পাওয়া যায় একমাত্র হলদে খেজুর গাছ মার্কা টিনে।" "তুমি 'ডালডা' কেন ব্যবহার কর দিদি? 'ডালডা' নাকি শরীরের পক্ষে ভাল নয়?" "কে বলেছে? 'ডালডায়' ভাল ঘিয়ের সমান ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। ভিটামিন 'ডি' ও যোগ করা হয় এতে। তাই ডালডা স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ভাল। এতে খরচও কত কম!"

নিশিথ প্রসন্ন মুখে ওদের কথা শুনে চলে। সিপ্রাকে ভুল বোঝার পালা এবার ওর শেষ হোল।

নোতুন দিদিমণির কথা হচ্ছেল, বাবুকে বল্লু, নেপা আসুক, তার কাছেই শুনবেন।

তার পর আমি দেশলাই সিগারেট নিয়ে জ্বালতে যে অল্প অন্তরালটা সৃষ্টি হল, তাতে নিজেই শুরু করে দিল—অন্য একটা জুতো টেনে নিয়ে সেলাই করতে করতে, সমিস্তের গোড়াপত্তন হল প্রথম পক্ষের ইয়েটা···মানে, আপনার দাসী আর কি, সেটা তো মারা গেল—

তাই নাকি!—চকিত হয়ে সহানুভূতির স্বরে প্রশ্ন করলাম।

আজ্ঞে হ্যাঁ। এই আষাঢ় গেলে ঠিক ছ মাস হবে। দিন চারেকের অসুখ, কবরেজ বদ্যি ডাকতে দিলে না, সাবড়ে গেল।···এই নেপারই বুন ছেল তো, জিগোন না, যেন ডেড়কোর ওপর কে জ্বলন্ত পিদিমকে এক ফুঁয়ে নিব্যে দিলে। না রে?

নেপা একটু লজ্জিতভাবে ঠোঁট টিপে হাসল।

সতী-লক্ষ্মী ছেল, যাবার ছেল চলে গেল। এখন বাবা মা কাকী সবাই ধরে বসেছে, আবার একটা বিয়ে কর। আর ইচ্ছেটা ছেল না—একটা করে নে' আসি, তারপর বলা নেই কওয়া নেই, সটকে পড়ুক ওই রকম করে! ওই করি আর কি বসে বসে! তার চেয়ে এ দিব্যি আছি, কারুর তোয়াক্কা নেই।···তার পর ভেবে দেখনু, এই তো রোজগারের জন্যে শহরে চলে এসেছি, বুড়ো-বুড়ীদের দেখে কে সেখানে? বল্লু, তা হলে দেখো এক থাঁদা বোঁচা যা হয়।

একটু মুখটা তুলে বলল, মানে, যায়ই টেঁসে তো তার জন্যে আর মনে কোনও···মানে, নেপার বুনটা ছিল আবার—

প্রাণটা খুলে আসছে আস্তে আস্তে তবে, শেষ না করে আবার মাথা হেঁট করে জুতোয় মন দিল।

ওর মনের কথাটা আমার স্পষ্ট করে দেওয়াটা ঠিক হবে কি না ভাবছি, নিবারণ অন্য দিকে গিয়ে পড়ল—

ঠিক করেছে ওরা একটা দেখে শুনে। শুনছি ইদিকে যাহোক-তাহোক করে একরকম আছে, কিন্তু ফ্যাসাদ বাধিয়েছে অন্য দিক দিয়ে।

ফ্যাসাদটা কিসের?—প্রশ্ন করলাম আমি।

ওই যে আইন হয়েচে মেয়েদের পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হবে—সব জেতের! ফ্যাসাদ বেধেচে ওইখেনে। ইস্কুলে পড়ে।

অঘটনটা সম্বন্ধে আমার মনের ভাবটা কী বোঝবার জন্য সেলাই ছেড়ে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে চেয়ে রইল।

আমি মাঝামাঝি গোছের একটা মন্তব্য প্রকাশ করলাম, তাই তো!

তাইতেই বোধ হয় খানিকটা উৎসাহ পেল নিবারণ, প্রাণটা আর একটু যেন গেল খুলে, বলল, আপনার কাছে লুকুলে তো চলবে নি, নেপার বুনও আবদার করত, ফরমাশটা করে এটা ওটা চাইত। তার ধরন [illegible] অন্যরকম, রুপোর একটা গোট কি গিল্টিসোনা[illegible]কটা আংটি, দিয়েছিও। এখন ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, এর আবদার তো অত হালকা হবে নি, সেই দাঁড়িয়েছে সমিস্তে।

এ বলে কী?—ধীরে ধীরে মুখের ধোঁয়াটা ছেড়ে প্রশ্ন করলাম।

ওই নেপাকেই সুদোন না। এও ওর বুনই কিনা; সে ছেল একেবারে আপুন বুন, মায়ের পেটের, এ হল গিয়ে পিসতুত বুন। ওকে দিয়ে বলে পাট্যেচে।

নেপার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলে সে লজ্জিতভাবে একটু নীচু করে নিল মুখটা, তারই মধ্যে দৃষ্টি একবার নিবারণের পাশটায় গিয়ে পড়ল।

নিবারণ বলল, ওই তো বল্লু আপনাকে, ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, তার আবদার তো ঠানদিদের মতন সেকেলে হবে নি। নেপাকে দিয়ে বলে পাট্যেচে, এক জোড়া জুতো গড়ে দিতে হবে।

সেলাই থেকে দৃষ্টি তুলে আরও প্রত্যাশী হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ভাষাটা অনুযোগেরই, তবু কোথায় যেন একটু গর্ব লেগে রয়েছে। চরম অঘটন, এবার কী বলা বেশ জুতসই হবে ভাবছি, নিবারণ আরম্ভ করে দিল—

আপনার জুতোটা নিয়েই পড়েছিনু, ভাবনু, ফরমাশটা দিলেন বাবু, একটু মনের মতন ছাঁট-কাট করে সাপ্লাই দিই, আপারটা কেটে এগিয়েছি খানিকটে, নেপা এসে বলল, ওসব একটু তুলে থুতে হবে নিবারণদা, আর্জেন্টি অডার।··· বল্লু, আর্জেন্টি অডারটা আবার কার? বাবুর জুতো

দাপ্পাই না দিয়ে আমি এখন কিছুতেই হাত দিচ্ছি নে।··· না, কার আর্জেন্টি—এই দেখো বলে একখানা পায়ের মাপ দেওয়া কাগজ সামনে মেলে ধরলে। বললে, কালীদির ফরমাশ, মেমেদের মতন গোড়ালি উঁচু জুতো চাই, বাজার থেকে কেনা নয়, নিজের হাতে তৈরি, বিলিতী জুতোর মতন লেবেল দেওয়া। ন্যাও, কী করবে করো।··· কালীদি হল ওর পিসতুত বুন, যার সঙ্গে বিয়ের কথাটা হচ্চে। বল্লু, হবে নি, বল্ গে তোর কালীদিকে।···নেপা বললে···বল্ না রে, কী বলছেল তোর কালীদি।

[illegible]কটু মুখ ঘুরিয়ে হাসল।

[illegible] বলে চলল, নেপা বললে, বলেচে—জুতো না পরে [illegible]নি ঘর ছেড়ে, কপাট আঁকড়ে দাঁইড়ে থাকবে। ইস্কুলে-পড়া মেয়ে তো, বলে যে—গাজুরি বের করে নিয়ে যাওয়া—সে সব দিন গেচে। নিন, সমিস্থে নয়? আর একটা সিগ্রেট [illegible]য় বাবুর জন্যে।

বললাম, থা[illegible] এখন। একটা দরকারী কাজে বেরিয়েছি, আর একদিন এসে গল্পটা শুনতে হবে। তুমি ফিনিশ করে ফেল। তার পর, খবর ভাল তো?

নিজেই একটু হেসে বললাম, খবর তো উঁচুদরের, কী বলো?

লজ্জিতভাবে হেসে, মাথাটা হেঁট করে কাজে মন দিল।

দুদিন পরে একটু অন্যমনস্ক হয়েই বেরিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দোকানের তাকে জুতো জোড়াটার ওপর নজর পড়ে গেল। রাঙা আর বাদামী চামড়ার গোড়ালি-তোলা জুতো, পালিশ খেয়ে ঝকঝক করছে।

এগিয়ে গিয়ে বললাম, এই তো সমস্যা তোমার মিটিয়ে ফেলেছ নিবারণ!

নিবারণ কাজ থেকে মুখ তুলে ব্যস্তই হয়ে উঠল, যেমন হয়। বসবার আর সিগারেটের ব্যবস্থা করে। আজ একটু নিষ্প্রভ হাসি মুখে করে বলল, আজ্ঞে, মিটল আর কোথায়?

বললাম, কেন, জুতো তো ওই তৈরী দেখছি। হয়েছেও দিব্যি, বাঃ!

আরও একটু যেন বিষণ্ণই হয়ে গেল, বলল, এক সমিস্থে মেটুতে অন্য এক এসে হাজির। বিয়ের আর দিন নেই তো একেবারে। মনে কল্লু, কাজ কী, ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, ওদের বিশ্বাস নেই, একটা র‍্যালা করে দিলেই হল, তার চেয়ে ফ্যাসাদের কাজটা সেরেই ফেলি আগে, তার পর নিশ্চিন্দি হয়ে বাবুর কাজটা ধরব। মনে একটা অশান্তি লেগে থাকলে তো হবে নি ঠিক। চার দিন ধরে একরকম আহার-নিদ্রে ছেড়ে ফিনিশ করে নিয়ে এয়েচি, আজ্ঞে হ্যাঁ, আহার-নিদ্রে ছেড়েই বইকি, আপনারটার দিকে মনটা পড়ে রয়েছে তো। ফিনিশ করে এনেচি। আজ নেপা আর এক খবর নে এল গাঁ থেকে।···শুধিয়ে দে না রে বাবুকে।

নেপা সিগারেট দেশলাই হাতে তুলে দিয়ে মুখ নীচু করে একটু হেসে বলল, ও বিয়ে হবে নি। অন্য মেয়ে দেখচে।

কেন, কী হল আবার?—রোমান্সটা বেশ জমে আসছিল, একটু উদ্বিগ্ন হয়েই প্রশ্ন করলাম আমি।

চামড়া কাটছিল, বাটালিতে একটা চাপ দিয়ে মুখটা একটু বিকৃত করে নিবারণ বলল, বেশী রস হলে যা হয় তাই হয়েচে। হবে কি? ইস্কুলে-পড়া মেয়ে তো।···একটা আবদার করে পাট্যেছেল, তা তার হচ্ছে ব্যবস্তা, চুপ করে বসে দেখ্। তা নয়, ঢাক পিটিয়ে দিয়েচে, বরকে দিয়ে মেমেদের মতন জুতো গড়াচ্চে, পায়ে চাপ্যে শ্বশুর-বাড়ি যাবে, না হয় যাবে না। স্কুলের সঙ্গীরা আচে তো, তাদের কাচে বাহাদুরিটে নিতে হবে নি? এক কান থেকে পাঁচ কান, পাঁচ কান থেকে দশ কান—ক্রেমে সমস্ত গাঁ এখন জেনে গেচে এই—এই কাহিনী। বাবা বেঁকে বসেচে, ও মেয়ে ঘরে আনবু নি।

বললাম, এঃ, এতটা বাড়াবাড়ি করতে গেল কেন দুর্লভ? জুতো না দিলেই হত। সত্যি বিয়ের কনে তো আর কপাট জাপটে ধরত না!

ভেতরকার কথাটা না জানলে তো আপনি বুঝবেন নি, ব্যাপারখানা আসলে কী। মা যে বাবার মাথাটা চিব্যে খেয়ে রেখেছে উদিকে; রোজ সকালে পাদোদক খেয়ে তার পর কিছু মুখে দেবে তো! তা মা সেকেলে মানুষ করে এয়েচে বলে তোমার একেলে পুত্র-বউও তাই করবে? কন না আপনি।

তা কখনও করে? এঃ, এমন ভুলটা দুর্লভ করতে গেল কেন?

সহানুভূতি পেয়ে ভাবটা বদলে আসছে নিবারণের। বলল, তা করুক। কিন্তু আমিও বাপকা-বেটা, এসা মতলব বের করেচি, এক ঢিলে দুটো পাখিই না ঘায়েল করি তো আমার নামে একটা কুকুর পুষে রাখবেন।

মতলবটা কী শুনতে পাই না?

বিয়ে যদি করি তো ওই মেয়েকে—ইস্কুলে-পড়া হোক, মেমসাহেবী চাল দেখাক, কুচ পরোয়া নেহি।

রোমান্স ফিরে আসছে দেখে প্রশ্ন করলাম, মেয়েটি বড় পছন্দ?

তিনটে গাঁ ছাড়িয়ে বাড়ি, মেয়ে চোখেই দেখি নি তার পছন্দ আর অপছন্দ। ইদিকে ঠিক করেচি ওকেও জুতো সাপ্লাই দোব না, দেখি কী করে!

গোলমেলে ঠেকায় ওর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে চাইলাম। নিবারণ বলল, বুঝলেন না ছকটা?

বললাম, যতদূর বুঝেছি, বিয়েটা তো ভেস্তেই যাবে।

যাক, তাই তো চাই। ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়ো বয়সে নাতি-নাতনী নিয়ে কাটাবার শখ হয়েচে, একেবারে মূলে হাবাত। কিন্তু তা হবে নি, এই বলে দিনু, নিকে রাখুন। জুতো তো আর যাচ্ছে না, ছেলে অন্য বিয়ে করবে না, ওর বাপের সঙ্গে যোগসাজোস করে ঠিক ওইখানেই ঠিক করবে বিয়ে। তার পর সামলাও ঠেলা, ইস্কুলে-পড়া মেয়ে, যাখন বলচে, একটা হুজ্জৎ লাগাবেই কনে বিদেয়ের সময়। পাড়ায় মর্যোদা আচে বুড়োর, তা নাহক মাথাটা হেঁট হল তো?···তার পর এনারও কেমন আবদার, জুতো পায়ে না দিয়ে বেরুব নি, তা বিয়ে করা কনে, চল্ ছুঁড়ী বলে যাখন হিড়হিড় করে টেনে নে যাবে, পারবি রুখতে তুই?

রাগ, আক্রোশ, অভিমান সবগুলো একসঙ্গে জুটেছে; এদিকে শত দোষ থাকলেও ইস্কুলে-পড়া মেয়ের আকর্ষণটা যে খুবই প্রবল সেটা বুঝতেও দেরি হয় না। এখন আমার মনের ভাবটা যাই হোক।

অথচ তিন জনের তিন দিকে কেমন উলটো টান, বিয়েটা যে ভেস্তে যাবেই সেটা বেশ স্পষ্ট। মেয়েটা ছেলে-মানুষ, শেষ অবধি যে কপাট জড়িয়ে ধরবেই এমন কথা নয়, তবে দুর্লভকে বেশ চটিয়েছে, নিবারণ যাই বলু আমি তাকে যতটা জানি, মেয়ে এরকম হালফ্যাশানের যং টের পেয়েছে, কোন মতেই ঘরে আনতে চাইবে না।

মনটা দমে গেছে। আস্তে আস্তে সিগারেট টান টানতে সমস্যাটা নিয়ে মনে মনে নাড়াচাড়া কর লাগলাম। একরাশ বকে গিয়ে বোধ হয় মনটা হাল হয়েছে। নিবারণ সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে যাচ্ছিল, থে গিয়ে মুখ তুলে বলল, মরুক গে, যা হবার তাই হবে, এঃ সমিস্তে হয়েছে, জুতো জোড়াটা নিয়ে করি কী?

কেন, বিক্রি করে দেবে। যেমন দেখছি—

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। নি[illegible] উপায়, সেই হিসেবে মুখ দিয়ে খানিকটা বেরি[illegible]য়ে নিজের গালে নিজের থাপ্পড়ের মত বাজল।

নিবারণ সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা নীচু করে সেলাইয়ে দিয়েছিল। নিতান্ত ম্লান কণ্ঠে, মুখটা নীচু করেই বলল, ইঁ তাই তো করব, মেহনত হয়েছে তো।· নিয়ে গিয়ে দে না বাড়ি বাড়ি নেপা—যা দেয়।

মুখটা তুলেছে, আমার বুকটা যেন মোচড় দিয়ে উঠ কী করে বের করতে পারলাম কথাটা? কী করে সামলা যায়?

যতটুকু বুদ্ধি সদ্য সদ্য জুটল খাটিয়ে, যতটুকু বাঁচি নেওয়া যায় এ অবস্থায় তার চেষ্টা করে, তাড়াতা বললাম, না না, সে কি হয়? এ জুতো অত খেটে করে যার-তার হাতে কি বেচা যায়? তবে নে[illegible] য বেচবেই ঠিক করেছ তো এক কাজ করবে না হয়—

বলুন।—মুখ তুলে চাইল নিবারণ।

দেখি জুতো জোড়াটা!

ওর হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখ বললাম, তোমার হাত হয়েছে ভাল, কদিনই বা শহ এসে বসেছ। আমার জোড়াটাও একটু এই রকম লাগিয়ে করতে হবে বাপু, করবে তো?

ওর মনটা একটু অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চাই। হল, প্রশংসায় মুখটা আবার একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠে বলল, আজ্ঞে, তা করবু নি? কী যে বলেন! আপন জুতো। এ তো হালফ্যাশান করে এক রকম দায়ে স করে ফিনিশ করে দিয়েছি।

তা হলেও সরেস মাল হয়েছে। তাই বলছিলুম, যার-তার হাতে বেচতে যাবে কেন! আমার একটি নাতনী পাদরীদের স্কুলে পড়ে, দারুন শৌখিন, গোড়ালিটা আরও না তুলে দিতে হয়, তা দাও তো তার জন্যেই না হয় নিয়ে যাই।...হ্যাঁ, এই মাপ, সেদিকে ঠিক আছে।

সাময়িকভাবে ওদিকটা ভুলে গেছে নিবারণ, এক গাল হেসে বলল, আজ্ঞে, সে তো আমার সৌভাগ্যি।

তা হলে দাও একটু কাগজে মুড়ে। দাম কী দিই ?

দেন যা হয় একটা।

ত[illegible]

[illegible] খু[illegible]

[illegible]ঠিক দেবেন। না, বেশী হল ?

না, [illegible]হরে এসে বসা তোমার ভুল হয়েছে বাপু।—একটু ধম[illegible]র সুরেই বললাম, টাকা চোদ্দর কমে কোন কারবারী এ জুতো ছাড়তে পারে ? তোমায় অত আর দিলুম না, এই [illegible]রাটা টাকা ধর।...উঠি, দেরি হয়ে গেল।

কথাটা আচমকাই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু ভালই হল ; জুতা জোড়াটাই তো আপাততঃ 'সমিস্তে' হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিবারণের, দেখত আর আপসাত ; চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

সরে গিয়ে কিন্তু দেখছি আমার সমস্যায় এসে দাঁড়িয়েছে। কথাটা সামলাতে নাতনীর নামে কিনে তো নিলাম, তার কিন্তু ও-জুতো পায়ে দিতে এখনও অন্ততঃ পাঁচ বছর দেরি। সেও না হয় অন্য কোন ব্যবস্থা করা যেত একটা, কিন্তু সমস্যাটা অন্য দিক দিয়ে ঘোরালো হয়ে উঠল।

ঘরে চোখের সামনেই রাখা জুতো জোড়াটা নজরে পড়ে আর মনটা হু-হু করে ওঠে।...আহা, বিয়েটা হবে না ? হলেও ওই রকম একটা অশান্তি সৃষ্টি হবে শুভকাজে ? তাও না হয় নাই হল, কনে-বউ, অতটা সাহস নিশ্চয় হবে না, কিন্তু ওই রকম মনমরা হয়ে প্রথম শ্বশুর-বাড়ি আসবে—ছেলেমানুষ !

ক্রমে এই যেন আমার জপমালা হয়ে দাঁড়াল। ঘুরে-ফিরে মনটা ওইতেই ফিরে আসে, আহা, হয়তো পায়েও দিত না মেয়েটা, তোলাই থাকত বাক্সে, তবু বিয়ের দিনের একটা সাধ মিটত তো।...মনটা এক-একবার ছ্যাঁত করেও উঠছে—যদি সত্যই বিয়েটাই ভেঙে যায় ? ছেলেটা বড় ভাল—মনে মনে একটি স্কুলে-পড়া কিশোরীকে পাশে দাঁড় করিয়ে বেশ ভাল লাগছিল আমার। স্মিত নত দৃষ্টি—আবদার শোনে এমন মনের মত বর পেয়েছে।...এখন দূরে দূরে দুটি বিরহক্লিষ্ট বিচ্ছিন্ন মুখ...

বড় অশান্তিতে পড়ে গেলাম।

দিন চারেক এইভাবে কাটার পর হঠাৎ একটা নূতন আইডিয়া এল মাথায়। নিজে একটু এর মধ্যে পড়ে দেখলে হয় না ? অনেক দিন যাইও নি মামার বাড়ি।' বেশ একটি প্ল্যান মাথায় গজিয়ে উঠতে লাগল। তাড়াতাড়ি একবার নিবারণের দোকানের দিকে গেলাম। দেখি, তালা বন্ধ। বিয়ে করতেই চলে গেল নাকি নিবারণ ? বুকটা ধক্ করে উঠল—কি রকম কি হবে ? সেই মেয়েই, না, অন্য একটাই ঠিক হল ?

পাশের বাড়ির রকের সিঁড়িতে একটি যুবক হেলান দিয়ে দাঁতে কুটো কাটছিল, জিজ্ঞেস করতে বলল, কাল চলে গেছে তালা এঁটে।

মনের আগ্রহেই প্রশ্ন করে বসলাম, বিয়ের জন্যে গেছে কি ?

একটু হেসে বলল, কী করে বলি বলুন ? আমায় তো নেমন্তন্নপত্র দেয় নি !

আর কাউকে জিজ্ঞেস না করে বাসায় ফিরে এলাম। বেরিয়েই পড়ি কপাল ঠুকে, যা হচ্ছে সামনে গিয়েই দেখি।

একটু বাধা পড়ে গিয়ে দিন চারেক দেরি হয়ে গেল আমার।

অনেক দিন পরে মামার বাড়ি গেছি, প্রশ্নে-উত্তরে নানা কথা এসে পড়ছে, তার মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে আমি নিবারণের বিয়ের কথাই ভাবছি, তারপর এক সময় কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন করে বসলাম, মুচিপাড়ার সেই দুর্লভ—বেঁচে আছে মামীমা ?—সেই যে আমাদের বাড়িতে আসত ?

বেঁচে থাকবে না কেন ? ও মা, সে যে বিয়ে দিলে তার ছেলের সেদিন—

দিয়ে দিলে বিয়ে ?...মেয়েটা—

মুন্সীর হাটে মেয়ের বাড়ি। আমাদের সে দেখাতে

নিয়ে এল বেটা-বউ···দিব্যি ফুটফুটে মেয়েটি—শুনলুম ইস্কুলে পড়ত, তা দেখলুমও সাজগোজে বেশ একটু চেকনাই—

জুতো পরে এসেছিল ?···মানে—

আবার মনের উদ্বেগে বোকার মত বেরিয়ে গেল কথাটা। মামাতো বোন চোখ কপালে তুলে বলল, জুতো পরে আসবে! কী বলছ গো তুমি!

মামীমা সহজভাবেই নিলেন। ওকে বললেন, তুই আজই এসেছিস, জানিস না।···হ্যাঁ, উঠেছিল একটা ঘোঁট—দুর্লভের বেটা-বউ নাকি জুতো পরে আসবে বলেছে। তা—তা কখনও পারে বাবা? এল দিব্যি দু পায়ে আলতা পরা, সাজগোজে একটু ছিমছাম—ওরাও তো হয়ে উঠছে ক্রমে ক্রমে—

মনটা হালকা হয়েও এক জায়গায় একটু ভারী হয়ে রয়েছে। কী ভাবে নিলে দুর্লভ পুত্রবধূকে, কী ভাবে রয়েছে ইস্কুলে-পড়া মেয়ে?

সন্ধ্যায় একটু বেশ গা-ঢাকা হয়ে এলে আস্তে আস্তে দুর্লভের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম।

বাইরে একটা কাঁচা দেয়ালের দালান, একটু ভাল করে গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া, নীচেটা শান। চালের বাতা থেকে একটা লালঠেন ঝুলছে—নতুন, নিশ্চয় বিয়ে উপলক্ষে কেনা। দালানের মধ্যে একটা চৌকি, ওপরে মাদুর পাতা, দুটো মোড়াও রয়েছে। আগেকার চেয়ে একটু শ্রী হয়েছে দুর্লভের বাড়ির।

লোকজন বাইরে কেউ নেই। ডাক দিলাম, দুর্লভ আছ?

উত্তর এল, কে? বোস, এনু।

অনেক পরিবর্তন হয়েছে দুর্লভের, অন্য জায়গায় হলে বোধ হয় চিনতে পারতাম না। বললাম, চিনতে পার আমায়? এই আলোর কাছে এসে দেখ দিকিন।

বেশ কাছেই মুখ নিয়ে এল। ঠাওর করে বলল, কই, চিনতে তো পারলুম নি বাবুকে। তা কি কুদ্দেশ্য নিয়ে পায়ের ধুলো পড়ল? বস্তাজ্ঞে হোক।

বললাম, আমি হচ্ছি বাঁড়ুজ্জেদের ভাগনে, ছেলেবেলায় কত এসেছি, খেয়েও গেছি বাড়িতে, মনে আছে?

বাঁড়ুজ্জে মশাইদের ভাগনে!—একটু চোখ পিটপিটি ভাবল দুর্লভ, তার পরেই উল্লসিত হয়ে উঠল।

ও, দাঁড়ান···শৈল ঠাকুর—শৈল ঠাকুর! তা হবে বইকি, এত বড়টি তো হবেন। কী সৌভাগ্যি! বস্তা হোক, বস্তাজ্ঞে হোক।

আনন্দে কী করবে যেন ভেবে উঠতে পারছে না একটা মোড়া তুলে নিয়ে এসে পাশে রেখে বলল, বসু আগে, কী সৌভাগ্যি আজ আমার! বেটার এই নোতু বিয়ে দিনু—তা দেখুন, আপনাদের পায়ের আশীর্বাদে ব পয়মন্ত বউ এনেছি ঘরে—

মোড়াটায় বসতে বসতে বললাম, মাম[illegible] সেই কথাই শুনে তো তাড়াতাড়ি ছুটে এলু[illegible]বেটা বিয়ে দিলে, তা লুচি সন্দেশ কই আমার?

মোড়া বা চৌকিতে কোন মতেই বসল [illegible] দুর্লভ। সামনে, হাত দুয়েক দূরে নীচেয় বসে[illegible] আমি মোড়া ওপর। গল্প হতে লাগল আমাদের [illegible]কেবারে সে ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করে। বিয়ে-বাড়িতে লোক সমাগম হয়েছে—মেয়ে বোন, তাদের ছেলেমেয়ে। ডে ডেকে পরিচয় করে দিতে লাগল। বাড়ির ভেতর একটা পেট্রোমা[illegible] লাইট জ্বলছিল, সেটাও বাইরে আনিয়ে নি আমার খাতিরে, বলল, শৈল ঠাকুর এয়েছেন আ করে—কী সৌভাগ্যি আমার—বড় আলোটা সদরে এনে ট্যাঙো দে।

খানিকটা রাত পর্যন্ত গল্পগুজব করে বললা[illegible], এখ তা হলে উঠি দুর্লভ। কই, কেমন পয়মন্ত বউ করেছ দেখালে না তো?

সি কী কথা! দেখাব নি? বলে, ছিছরণের দা আপনার। ঠিক করেছিনু নাইয়ে ধুয়ে সকালে বামু বাড়িতে পাট্যে দোব, দুজনাকে একসঙ্গে—নেপা আবার কোথায় বেইরেছে কিনা—

বললাম, তা নয় দিও। এখন একবারটি দেখি, একট

কী যে বলে, ইয়ে লেগে রয়েছে তো।

এই আনি তা হলে, নিজেই নেসচি।

কত যেন কৃতকৃতার্থ হয়ে ভেতরে চলে গেল।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি ভিড় হয়েছে মাঝখানে গোছের। গল্প করছি, মেয়েটি একটু আড়ষ্ট হয়ে দুর্লভে

সঙ্গে এসে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে আমায় প্রণাম করে দাঁড়াল। দিব্যি ফুটফুটেটিই। বললাম, সরে এসো তো মা।

আর একবার বলতে হল, পাড়াগাঁয়ে এখনও ওসব বালাই তো একেবারে উঠে যাই নি। এগিয়ে এলে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে, আলোয়ানের মধ্যে থেকে একটা পুলিন্দা বের করে বললাম, ধর এটি, তোমার শাড়ি ব্লাউস আছে।

দ্বিতীয় পুলিন্দাটি বের করতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম, একটা তো রিস্‌কই নিচ্ছি, দুর্লভ কী ভাবে নেবে কে [illegible]। তারপর বের করে নিলাম, বললাম, বাজার [illegible] খুঁ[illegible] এক জোড়া ভাল জুতো বড় নজরে পড়ে গেল [illegible]র জন্যে নিয়েই নিলুম, আজকাল তো হয়েছে এ সব।···[illegible] বল ?

মোড় [illegible] একটু খুলেই ধরলাম।

একটু [illegible] ব্যাঁকিয়ে গেল বুড়ো, ক্ষণিকের জন্য মাথার মধ্যে কী একটা [illegible] খেলে গেল। তার পর মুখে একটু যেন কৌতুকের হাসি ফুটল, বলল, তা এনেচেন যখন পছন্দ করে, দেবেন বইকি, এতে আমি কী বলব, আমার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে আপনার ওপর কথা কইব? তা যদি বললেন তো বেটীর একটা সাদও ছেল। তবে, বেমানান হয়তো আমাদের ঘরে। তা এবার তো দিব্যি মানানসই হয়েই এল ঘরে, বামুনের আশীর্বাদ—

কাগজটা ফেলে দিয়ে জুতো দুটো সামনে বাড়িয়ে বললাম, তা হলে একবার পায়ে দিয়ে দেখো তো মা, আন্দাজে কেনা, খুঁতখুঁতুনিটা যাবে।

আরও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। দুর্লভই তাগাদা দিল, দে, পায়ে দিয়ে গড় কর্‌ আর একবার। কত ভাগ্যি দেখছিস নে!

নিবারণ হঠাৎ এসে পড়ল, ভিড় দেখে কৌতূহলী হয়ে একেবারেই দালানে উঠে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আমার নজর পড়ে গেল জুতোর ভেতর রাঙা চামড়ায় ওর নাম লেখা লেবেলটায়, কড়া আলোয় সোনার জলের লেখাটা চিকচিক করছে। বউ তখন আধা-ঘোমটার মধ্যে মুখটা নীচু করে বাঁ পাটা গলাতে যাচ্ছে জুতার মধ্যে।

প্রতীক্ষা

সলিল মিত্র

চাঁদের প্রদীপে আর তেল নাই। ভীরুর মতন
লঘু পায়ে হেঁটে হেঁটে শুক্লা রাত ক্লান্ত হয়ে আসে,
তবুও তোমাকে ভাবি আর মোর আকাঙ্ক্ষা তখন
উজ্জ্বল আলোর মত জ্বলে ওঠে মনের আকাশে।
চিন্তার আকৃতি নিয়ে মোর মন একা জেগে থাকে
আর জাগে শেষ রাত চাঁদের স্তিমিত বাতি জ্বেলে;
তোমার নির্জন নাম মনের দিগন্তে ছবি আঁকে,
মরমী স্মৃতির ছবি ভিড় করে মনের ইজেলে।

প্রতীক্ষার ক্লান্ত ছায়া ব্যথাকীর্ণ মনের দেয়ালে
নির্জন রাত্রির মোহে কী আশ্বাসে ইতস্ততঃ কাঁপে,
আমার অমর আশা প্রত্যাশার মুখর আলাপে
রাতের তিমির ছিঁড়ে কথা কয় আরেক সকালে।
কামনার মালাখানি বুকে নিয়ে আজও জেগে আছি,
তুমি কাছে এলে আমি তোমাকেই দেব মালাগাছি।

পীরুর হাসি

অমলা দেবী

কি একটা ছুটির দিন। বৈঠকখানায় বসে একটা ইংরেজী গল্পের বই পড়ছিলাম। হঠাৎ বন্ধু অমরনাথের হাঁক শোনা গেল, আছ নাকি হে? বইটা বন্ধ করে সাড়া দিলুম, আছি, এস, এস। অনতিবিলম্বে অমরনাথ ঘরে ঢুকল। দীর্ঘ একহারা গঠন; শ্যামবর্ণ; লম্বাটে মুখের ছাঁদ; মাথার সামনে টাক। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। পায়ে স্যাণ্ডেল। আমার বাল্যবন্ধু, স্কুল ও কলেজে সহপাঠী। স্থানীয় আদালতে ওকালতি করে। বৎসর কয়েক হল জনসেবাও শুরু করেছে। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার নির্বাচিত হয়েছে। আমাদের ওয়ার্ড থেকেই দাঁড়িয়েছিল। সেই জন্য মাঝে মাঝে কর্তব্য হিসাবে আমাদের পাড়ায় আসে; পাড়ার লোকদের সুবিধা-অসুবিধার খোঁজ নেয়। এলেই অবশ্য আমার বাড়িতে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে যেতে ওর ভুল হয় না।

একটা চেয়ার টেনে বসে আমার হাতের বইটার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে অমর বলল, কী বই পড়ছ? বইটার নাম বলতেই মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলল, ও-ই কর। ওদিকে শহরে কী কাণ্ড ঘটেছে খবর রাখ কি?

প্রবল ঔৎসুক্যের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার?

অমর ঠোঁট দুটো চেপে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। সভয়ে বলে উঠলাম, অসুখ-বিসুখ শুরু হয়েছে নাকি? কলেরা বসন্ত—

অমর ঘাড় নেড়ে জানাল, তা নয়।

বললাম, জাপানী ফ্লু?

অমর বলল, ওসব নয়। ওর চেয়ে সাংঘাতিক। ওদের তো প্রতিষেধক আছে, প্রতিকার আছে; কিন্তু যা হয়েছে, তার কিছুই নেই। একবার ধরলেই সাবাড়।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

অমর নড়ে-চড়ে বসে মুখের ভাব বদলে, মুচকি হেসে বলল, পীরুর আক্রমণ হয়েছে।

সবিস্ময়ে বললাম, পীরু! সে আবার কী?

অমরনাথ হেসে বলল, রোগ নয়, লোক। পীরু অর্থা[illegible] পিয়ারী, আমাদের স্কুলের সেকেণ্ড মাস্টার দীননাথবাবু[illegible] ভাগনে—

মনে পড়ল। আমাদের স্কুলে পড়ত, আমাদের চেয়ে [illegible] ক্লাস নীচে। বয়সেও কিছু ছোট ছিল আমাদের চেয়ে[illegible] তবু আমাদের সঙ্গেই খেলা করত, বেড়াত, আড্ডা দিত[illegible] তখনকার দিনের চেহারাটাও মনে পড়[illegible] গঠন; মাংসল দেহ। মুখের গড়নটা [illegible] পেয়ারার মত। সেই জন্য ওর ক্লাসের ছেলে[illegible] না প্যারীমোহন হলেও, ওকে পেয়ারামোহন বলে ডাকত[illegible] মাথায় চুল ছিল কম। কপালটা উঁচু ও [illegible]। ছো[illegible] ছোট চোখ। ভ্রূ ছিল না বললেই হয়। [illegible]একটা মোটা ঠোঁট দুটো বেশ পুরু। উপরের ঠোঁ[illegible] বাঁকা, সামনে দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা। সাধার[illegible] ছেলে ছিল কিন্তু নিজেকে সে অসাধারণ বলে ভাবত। পড়াশু[illegible] খুব বেশী ছিল না; কিন্তু দু-চারটা ভাল ভাল বইয়ের না[illegible] দু-চারজন বড় বড় লেখকের নাম মুখস্থ করে রাখত, আ[illegible] সময়মত ভারিক্কি চালে আমাদের শুনিয়ে আমাদের তা[illegible] লাগিয়ে দিত। আমরা হয়তো সকলে মিলে কোন একা[illegible] বিষয়ের আলোচনা করছি। ও চুপ করে দূরে দাঁড়ি[illegible] থাকত, আর মাঝে মাঝে বাঁকা ঠোঁটটাকে আরও বাঁকি[illegible] এমন একটা হাসি দিত যে, তা চোখে পড়বামাত্র আমাদে[illegible] বুকের ভিতরটা হিম হয়ে আসত; মনে হত, ওর বিদ্[illegible] বুদ্ধি জ্ঞান আমাদের চেয়ে ঢের বেশী; আমাদের সামা[illegible] বিদ্যা-বুদ্ধির তাল-ঠোকাঠুকি দেখে ও অবজ্ঞার হা[illegible] হাসছে। আমাদের আলোচনা সঙ্গে সঙ্গে থিতিয়ে আসত[illegible]

একটা ঘটনা মনে পড়ল। তখন প্রথম শ্রেণীতে পড়ি[illegible] একটা হাতে-লেখা পত্রিকা বার করেছিলাম আমরা[illegible] তাতে আমার একটা কবিতা বেরিয়েছিল। একদি[illegible] ক্ষুদিরামবাবু, যিনি আমাদের বাংলা পড়াতেন, টিফিনে[illegible] ঘণ্টায় আমাদের কয়েকজনকে ডেকে পাঠালেন। পীরু সঙ্গ নিল আমাদের। ক্ষুদিরামবাবু আমাদের পত্রিক[illegible]

প্রকাশিত লেখাগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। আমার কবিতা সম্বন্ধে বললেন, তোর কবিতাটি বেশ হয়েছে। কবিতা লেখায় হাত আছে তোর। লিখতে থাক্, ছাড়িস নে, ভবিষ্যতে—। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল পীরু। হঠাৎ কোঁক শব্দ করে হেসে উঠল। শুনেই আমার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠল। ওর মুখের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম, ওর বাঁকা ঠোঁটে সেই সাংঘাতিক বাঁকা হাসিটা জলজ্বল করছে। দেখেই মাথা থেকে পা পর্যন্ত সিরসির করে উঠল, মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। ক্ষুদিরামবাবু আর কী কী সব বললেন, কিছুই আমার কানে গেল না। তারপর ছাত্রাবস্থায় শিক্ষকদের অনেকের কাছ থেকে এবং পরে বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে কবিতা লেখবার জন্য বহু উৎসাহ পেয়েছি। কিন্তু আর কবিতা লিখতে পারি নি। যখনই লিখতে শুরু করেছি, তখনই ওর সেই বাঁকা হাসি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাবের উৎস শুকিয়ে গেছে, হাতের কলম থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

বললাম, দীননাথবাবুদের তো কেউ এখানে নেই। তবে ও এখানে এল কেন?

অমর বলল, আমাদের স্কুলে মাস্টারী চাকরি পেয়েছে।

এতদিন কোথায় ছিল?

ছিল নানা জায়গায়, করেছে নানা রকমের চাকরি। কিন্তু কোথাও টিকতে পারে নি। এখানে এসে জুটেছে শেষে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে চাকরি বাগাল কী করে?

অমরনাথ বলল, রামজীবনবাবুর সুপারিশে। উনি স্কুল-কমিটীর একজন জাঁদরেল মেম্বার। দীননাথবাবুর সঙ্গে নাকি খুবই খাতির ছিল ওঁর।—একটু চুপ করে থেকে বলল, রামজীবনবাবুর অবশ্য একটু সুবিধে হয়েছে। এই পাড়ার মাথার দিকে, ওই পুকুরটার কাছের মাঠটায় কয়েকখানা পুরনো বাড়ি রামজীবনবাবু কিনেছেন। ওর মধ্যে যে বাড়িটা সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে ছোট, সেটার এতদিন কোন ভাড়াটে জোটে নি। পীরু ওই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছে।

প্রশ্ন করলাম, ওর স্ত্রী ছেলে-মেয়েরা ওর সঙ্গে এসেছে তো?

অমর বলল, ছেলেপিলে নেই। স্ত্রী অবশ্য আছেন। তবে কাছে থাকেন না। ওর হাসির শক খেয়ে খেয়ে হার্টের রোগ হয়েছে তাঁর। বাপের বাড়িতে থাকেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি এ সব খবর পেলে কোথায়?

জবাব দিল, ওর কাছ থেকেই। আমার বাড়ি গিয়েছিল যে! কাল সকালে একটা মামলার সম্বন্ধে পরামর্শ করবার জন্যে আমার এক বন্ধু উকিলের বাড়ি যাবার জন্যে বেরিয়েছি, দেখতে পেলাম পাশের মাঠটা দিয়ে কে আমার বাড়ির দিকে আসছে। বেঁটেখাটো একটি লোক, পিঠটা কুঁজিয়ে, মাথাটা নামিয়ে থুরথুর করে আসছে, [illegible] মাঝে মাথাটা উঁচিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে [illegible] চেনা-চেনা মনে হল। কাছে এসে মুখ তুলতে[illegible] পারলাম। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালাম। নি[illegible]র সব খবর দিল একে একে। শেষে বলল, এখা[illegible]থেকে যাব ভাবছি। মামা এখানে দেহরক্ষা করেছে[illegible]মিও তাই করব। মনে মনে বললাম, আমাদের [illegible] করবে কে? প্রকাশ্যে বললাম, বেশ, বেশ। তার[illegible]রই উঠল। বাড়ির বাইরে এসে চলবার উপক্রম করেই থমকে দাঁড়িয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করল। যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তোমার সব পরিচয় দিলাম। জিজ্ঞাসা করল, এখনও লেখে-টেখে নাকি? বললাম, গল্প লেখে আজকাল। শুনেই ওর বাঁকা ঠোঁটে সেই হাসিটা ক্ষণেকের জন্য চেগে উঠল। তার পরই গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, গল্প লেখা যার তার কাজ নাকি! বলেই ঝড় ঝড় করে কয়েকজন বিদেশী নাম-করা গল্প-লিখিয়ের নাম করে বলল, এঁদের কর্ম কি যাকে-তাকে সাজে! বাংলা সাহিত্যে যে-সে লোক হাত লাগাতে শুরু করেছে, এর আর বেশীদিন নেই—

মনে মনে রাগ হল ওর কথা শুনে। জোর করে হেসে বললাম, তাই নাকি? বললে না কেন, এক হাসিতে তো কবিতা লেখা শেষ করে দিয়েছ, আর একটা হাসি ঝেড়ে দিয়ে গল্প লেখাও নিকেশ করে দাও—

আরও কিছুক্ষণ গল্প করে অমর বিদায় নিল। কিন্তু পীরুর কথাটা মনের গায়ে কাঁটার মত বিঁধে খচখচ করতে লাগল। যতদূর সম্ভব তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলাম।

কিন্তু একই শহরে কাছাকাছি বাস করে কেউ কাউকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে পারে কি?

আমাদের পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে ভবতারণবাবুর খ্যাতি-প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী। মোটা মাইনের সরকারী কাজ করতেন। বৎসর কয়েক হল অবসর নিয়ে বাড়িতে বসে পেনশন ভোগ করছেন। বাড়িখানিও বেশ বড়। দোতলা। অনেকখানি জায়গা জুড়ে কম্পাউণ্ড। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় ভবতারণবাবুর বৈঠকখানায় আড্ডা বসত। পাড়ার জনকয়েক কর্মভারমুক্ত প্রৌঢ় এই আড্ডাতে জমায়েত হন এবং রাত্রি দশটা পর্যন্ত গল্প-গুজবে, আলাপ-আলোচনায়, কোন কোন দিন তাস-পাশা খেলায় [illegible] দিতেন। আমরাও জন কয়েক প্রতি রবি[illegible] নিয়মিত ভাবে এখানে হাজিরা দিই।

পী[illegible] এল একদিন। দেখেই চিনল আমাকে। আমারও [illegible]নতে দেরি হল না। ওর মাকুন্দ মুখটা আরও ভরাট ও চ[illegible] হয়েছে ; ছোট ছোট চোখের দৃষ্টি আরও ধারালো হয়ে[illegible] ব্যা[illegible]কটা আরও মোটা ও উপরের ঠোঁটটা আরও পুরু ও [illegible] ও বাঁকা হয়েছে। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আ[illegible] ? বললাম, ভাল।

ভাল! আ[illegible]কাল ও কথাটা বলবার সৌভাগ্য বেশী লোকের নেই।—সঙ্গে সঙ্গে সেই মারাত্মক হাসিটা ওর ঠোঁটে ঝিলিক মারল। দেখেই আমার বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। মনে হল, ভাল থাকাটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ হয়েছে ; আর বেশীদিন ভাল থাকতে হবে না।

পীরু প্রত্যেক রবিবার এই সান্ধ্য আসরে যোগ দিতে লাগল।

একদিন দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। ভবতারণবাবু বলতে লাগলেন, আমাদের দেশের প্রত্যেকটি লোকের মধ্যে সততা, নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার অভাব হয়েছে। লোভ, স্বার্থপরতা ও আত্মম্ভরিতার বৃদ্ধি হয়েছে। কাজেই নানা দিকে নানা বিশৃঙ্খলা ও বিভ্রাট ঘটছে ; দেশের লোক নানাভাবে নানা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। এই সময়ে দেশে যদি অসাধারণ চারিত্রিক ও মানসিক শক্তিসম্পন্ন কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটত, যাঁর চরিত্র-মাহাত্ম্যে দেশবাসীর চরিত্র উন্নত হত, কর্তব্য-বোধ জাগ্রত হত, যিনি নির্ভুল অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেশবাসীকে কল্যাণের পথে চালিত করতেন তা হলে সারাদেশের যে চরম দুর্গতি আসন্ন হয়ে উঠেছে, তা থেকে দেশ মুক্তি পেত। অনেকক্ষণ আলোচনার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ সময়ে তোমাদের, মানে, লেখক-সম্প্রদায়ের উচিত এমন সব জিনিস লেখা যা পড়ে দেশের লোক নিজেদের ঠিকভাবে চিনতে পারবে, নিজেদের ভুল বুঝতে পারবে—

পাশেই বসে ছিল পীরু। হঠাৎ বলে উঠল, কজন ওদের লেখা পড়বে?

ভবতারণবাবু বললেন, ভাল লেখা হলেই পড়বে। আমার নাম করে বললেন, বেশ লেখে। নাম-করা কাগজে ওর লেখা বেরোয়।

পীরু বলল, লেখায় যদি কাজ হত, তা হলে বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথের পর দেশে আর অমানুষ কেউ থাকত না।

আড়চোখে পীরুর দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম, ওর বাঁকা ঠোঁটে বাঁকা-হাসিটা ঝকমক করে উঠেছে। বহুদিন আগে যা হয়েছিল আজ আবার তাই হল। মাথাটা ঝিমঝিম্ করে উঠল, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা দেহটা সিরসির করে উঠল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, গল্প আর লিখব না, অন্ততঃ পীরু যতদিন আছে ততদিন লিখব না।

সান্ধ্য আসরে যাওয়া বন্ধ করলাম। একদিন অমর এল। বলল, কী হে! আড্ডায় যাচ্ছ না যে?

বললাম, পরীক্ষার খাতা নিয়ে পড়েছি ভাই। ও শেষ না করে কোথাও নড়ছি না।

অমর বলল, পীরু নিয়মিত যাচ্ছে। খুব খাতির জমিয়েছে ভবতারণবাবুর সঙ্গে। ভবতারণবাবু একদিন বলছিলেন, যে-সে লোক নয়, খুব পড়াশুনা—ফরাসী সাহিত্য গুলে খেয়েছে—

অনেকক্ষণ গল্প করে অমর বিদায় নিল।

মাসখানেক পরে ভবতারণবাবু হঠাৎ মারা গেলেন। সমস্ত ব্যাপার জানতে দেরি হল না।

ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল ভবতারণবাবুর। সপ্তাহ খানেক ভুগে সেরে উঠলেন। যেদিন প্রথম আড্ডায় যোগ দিলেন, পীরু ছিল সেদিন।

পীরু জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছেন?

ভবতারণবাবু জবাব দিলেন, ভালই।

ভাল!—বলেই হাসল পীরু।

ভবতারণবাবু ওর হাসি দেখেই বলে উঠলেন, না না, ভাল নয়। বুকের ভিতরটা কী রকম করছে—

শুয়ে পড়লেন তখনই। ধরাধরি করে সকলে তাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। সেই দিনই ভোর রাত্রে মারা গেলেন।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, হঠাৎ কী হল! ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা কথা বলেই কাত!

সান্ধ্য আসর ভেঙে গেল ভবতারণবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে। পাড়ার অনেকে, বিশেষ করে, পাড়ার প্রৌঢ়রা পীরুকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন।

পীরুর অনেকদিন খবর পাই নি। মাসখানেক পরে অমর আসতেই ওকে পীরুর খবর জিজ্ঞাসা করলাম। অমর বলল, পীরু আজকাল সকাল-সন্ধ্যেয় কোথাও যায় না। ওর বাড়ির সামনের মাঠটায় পায়চারি করে। মাঝে মাঝে ওর বাড়ির কাছেই একজন ডাক্তার আছেন, তাঁর ডিসপেন্সারিতে বসে; দু-একদিন কাছাকাছি প্রতিবেশীদের বাড়িতে হামলা করে—

প্রশ্ন করলাম, ওখানে কোন নতুন ডাক্তার বসেছে বুঝি?

অমরনাথ বলল, মাস ছ-সাত হল ভদ্রলোক এসেছে এখানে। পাকিস্তানে প্র্যাকটিস করত। টিকেও ছিল অনেকদিন। আর সুবিধে হল না। এখানে এসে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। রামজীবনবাবুর একটা বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। বৈঠকখানা-ঘরটায় ডিসপেন্সারি করেছে। ভাল চিকিৎসা করে, পাড়ায় নামযশ হয়েছে এর মধ্যেই। প্রতিবেশী তো ওকে ছাড়া প্রায় আর কাউকে ডাকে না। অন্য পাড়া থেকে, এমন কি শহরের বাইরে থেকেও রোগী আসছে। একটু হেসে বলল, তবে পীরু ভর-করা থেকে গোলমাল শুরু হয়েছে।

বললাম, কী হয়েছে?

বলল, বাইরের রোগী প্রায় একদম বন্ধ; প্রতিবেশীরাও বেশী ডাকছে না।

প্রশ্ন করলাম, কী করে হল?

বলল, পীরু মাঝে মাঝে ডিসপেন্সারিতে গিয়ে বসত। বাইরের হয়তো কোন রোগী এল। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করল। রোগী জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারবাবু ভাল হয়ে যাব তো? ডাক্তার বলল, ভাল হবে বইকি। পীরুও ফোড়ন কাটল, নিশ্চয়ই ভাল হবে। রো ওর মুখের দিকে তাকিয়েই দেখল, ওর ঠোঁটের সেই বাঁ হাসি। মুখ শুকিয়ে গেল তার। তার পরদিন সে আ এল না। হয়তো অন্য পাড়া থেকে বা শহরের বাইরে থেকে কোন রোগী আসছে। রাস্তায় দেখা হল পীরুর সঙ্গে। পীরুকে জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারবাবুর বাড়ি কোথায়? পীরু দেখিয়ে দিল হাত বাড়িয়ে।

আপনার সঙ্গে আলাপ আছে কি?—জিজ্ঞাসা করল রোগীটি।

পীরু ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

কেমন ডাক্তার বলতে পারেন?

পীরু এবার হেসে বলল, ভাল।

সেই হাসি দেখার পর রোগী আর ডাক্তারের বাড়ি ঢুকল না।

পাড়াতে অনেকগুলি শক্ত রোগীর চিকিৎসা করছিল ডাক্তার।

ইনফ্লুয়েঞ্জা নিয়ে শুরু করে নিমো... প্রায় দাঁড়িয়েছিল ডাক্তারের চিকিৎসার গুণে রোগীগুলো সারবার পথে এসেছিল। রোগী দেখতে যাবার সময়ে পীরু ডাক দিত কী ডাক্তারবাবু, যাচ্ছেন নাকি দেখতে?

ফেরবার মুখে খবর নিত, কেমন দেখলেন?

ডাক্তারবাবু হয়তো বললেন, ভালই।

পীরু হেসে বলল, বেশ।

বেশ! হাসি দেখেই ডাক্তারের আশা-ভরসা ধসে পড়ত। তা ছাড়া প্রতিবেশী হিসাবে পীরু নিজে রোগীদের খবর নিতে শুরু করল। দু-চারদিন খবর নিতেই আর হাসির শক দিতেই রোগীগুলো একে একে টেঁসে গেল।

ফলে পাড়ায় ডাক্তারবাবুর সুনামে চিড় ধরেছে। আর পীরুর সম্বন্ধেও পাড়ায় একটা বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে।

তার পর?

তার পর আর কী? রামজীবনবাবুর ভাড়াটেরা পীরুকে তাদের ঘাড়ে চাপানোর জন্যে রামজীবনবাবুকে গালাগালি করছে। আর ডাক্তার অন্য কোথাও উঠে যাবার জন্যে চেষ্টা করছে।

শুনলাম, স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যেও পীরু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। পীরু এর মধ্যেই সকলকে তার ভাব-ভঙ্গি

তালমাফিক বুকনি, বিশেষ করে তার সেই মারাত্মক হাসি দিয়ে নিঃসংশয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা কেউ কিছু জানে না, নেহাত ছোট একটা শহর বলে, সামান্য বিদ্যার পুঁজি নিয়ে তারা কোন রকমে করে খাচ্ছে। আর সে নিজে বিদ্যের জাহাজ। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি—সকল শাস্ত্র সে গুলে খেয়েছে। সব বিদ্যের চরম করে ফেলেছে।

বলা বাহুল্য, এই আত্মজ্ঞান লাভ করে শিক্ষকরা পীরুর উপরে প্রসন্ন হয় নি।

স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক যদুপতিবাবু ইকনমিক্সের এম. এ.। বেশ পড়াশুনা আছে। তার কথাবার্তায়, আলাপ-আলোচনায় তার জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষকদের বসবার ঘরে প্রায়ই নানা বিষয়ে আলোচনা করে; ওর ভক্তরা সব শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনে। পীরুও সেই আলোচনা শুনেছে এবং মাঝে মাঝে হাসি দিয়ে যদুপতিবাবুকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছে। তবে যদুপতিবাবুর দেহ শক্ত-পোক্ত, স্বাস্থ্য ভাল, বিশেষ করে হার্ট খুব জোরালো। পীরুর হাসি তাকে কাবু করতে পারে নি। তবে পীরু নাকি কোন এক শিক্ষকের কাছে বলেছে, যদুবাবু গিলেছেন অনেক, হজম হয় নি কিছুই। ঢেকুর তুলে তুলে সকলকে ব্যতিব্যস্ত করে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, পীরুর মন্তব্যটা যদুপতিবাবু ও তার ভক্তদের কানে পৌঁছেছে। তারা নাকি ওর ওপরে মারমুখী হয়ে উঠেছে!

আদিত্যবাবু স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক। ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে পাস করেছে। আর্থিক অবস্থা ভাল নয় বলে আর পড়তে পারে নি, স্কুলে চাকরি নিয়েছে। আদিত্য ভাল ছেলে ছিল, পড়ায়ও ভাল। ছাত্রমহলে সুনাম আছে। পীরু একদিন নাকি ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করেছে, আদিত্যবাবু কেমন পড়ান? সকলেই সমস্বরে বলে উঠেছে, খুব ভাল। খুব জানেন।

পীরু বাঁকা ঠোঁটটা হাসিতে আরও বাঁকিয়ে বলেছে, খুব জানেন! বড় বড় বৈজ্ঞানিকরাই বলেন, তাঁরা জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে পাথর কুড়োচ্ছেন। তোমাদের আদিত্যবাবুর এখনও সমুদ্রতীরে যাবার টিকিট কেনাই হয় নি।

আদিত্যবাবু শুনে খুব রেগেছে। রামজীবনবাবুর কাছে গিয়ে নালিশও করেছে।

হঠাৎ একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল। স্কুলের হেডপণ্ডিত মশায় তারাপদবাবু বহুদিন স্কুলে চাকরি করছেন। অবসর নেবার সময় আসন্ন হয়েছে। পণ্ডিত ব্যক্তি। বিশেষ করে হিন্দুধর্ম-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য। সুবক্তা। শহরের হিন্দুধর্ম-সংক্রান্ত সভা-সমিতি হলে বক্তাদের তালিকায় তাঁর নাম সর্বাগ্রে থাকে। বাইরে থেকেও নিমন্ত্রণ আসে। অনেক পণ্ডিতব্যক্তিদের সভায় বক্তৃতা করেছেন এবং প্রশংসা অর্জন করেছেন।

সেদিন স্কুলের ছাত্রদের একটা সভায় তারাপদব[illegible] বক্তৃতা করছিলেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল—গীতা-মাহাত্ম[illegible] চমৎকার বক্তৃতা করছিলেন। সকলে মনোযোগের স[illegible] বক্তৃতা শুনছিল। পীরু বসে ছিল ঠিক সামনে। বক্তৃ[illegible] করতে করতে তারাপদবাবুর দৃষ্টি পড়ল পীরুর মুখে[illegible] ওপরে। দেখলেন, পীরুর ছোট ছোট চোখ সাপে[illegible] চোখের মত জলজল করছে, আর ওর বাঁকা ঠোঁটে বাঁ[illegible] হাসিটা সঙ্গিনের মত উঁচিয়ে রয়েছে। দেখেই হাতে[illegible] কাছে জল-ভরা গ্লাস তুলে ঢকঢক করে সব জলটা খে[illegible] ফেললেন। আর সামনের দিকে না তাকিয়ে এ-পাশ [illegible] পাশ তাকিয়েই প্রায় বক্তৃতা শেষ করে এনে[illegible]। এ[illegible] সময়ে ভাবের ঘোরে সব ভুলে গিয়ে [illegible]দি[illegible] তাকাতেই পীরুর ওপরে আবার চোখ [illegible] তখনও দেখলেন, সেই হাসিটা পীরুর ঠোঁটে [illegible] বক্তৃতা শেষ করে বসে পড়লেন। সভাভঙ্গের [illegible] বললে[illegible] শরীরটা বড় খারাপ মনে হচ্ছে। একটা রি[illegible] করে বা[illegible] গেলেন। গিয়েই বিছানা নিয়েছেন। [illegible] ওঠেন নি[illegible] দিনরাত বুক ধড়ফড় করছে, মাথা ঘুরছে[illegible] মাসের ছু[illegible] জন্য দরখাস্ত করেছেন। খুব সম্ভব আ[illegible] আসবেন ন[illegible]

স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে, শহরের অ[illegible]কর মধ্যে, পী[illegible] ফোবিয়া ধরে গেছে। পীরুর সঙ্গ সভয়ে পরিহার কর[illegible] সবাই।

অনেক দিন পীরুর খবর পাই নি। অমর এল একদি[illegible] খবর এল পীরু কাত হয়েছে। গালে প্রকাণ্ড ফোড়া।

জিজ্ঞাসা করলাম, তার পর?

বলল, পাড়ায় পরামর্শ-সভা বসেছে; তাতে সর্বসম্মি[illegible] ক্রমে স্থির হয়েছে, সে ফোড়া অমনই চাড়িয়ে থাক্, যত[illegible] থাকে কোন প্রতিকারের প্রয়োজন নেই।

কারণ, ফোড়ার তাড়সে গালটা ফুলে ওর সেই হাসি[illegible] চাপা পড়েছে। ডাক্তার কিন্তু ফোড়া কাটবার জ[illegible] ছুরিতে শান দিচ্ছে।

দিন কয়েক পরে খবর পেলাম, ফোড়া যথাসম[illegible] পেকেছে এবং ডাক্তারবাবু তাকে ফুঁড়ে-ফেড়ে সাব[illegible] করেছেন। পাড়ার সকলে ফলাফল সাগ্রহে প্রতী[illegible] করছে।

ফোড়ার ঘা শুকিয়ে গেল কিছুদিনের মধ্যে। বি[illegible] গালের চামড়াটা কুঁচকে গিয়ে, টান পড়ে পীরুর ওপরে[illegible] বাঁকা ঠোঁটটা অনেকটা সোজা হল। ফলে পীরুর ঠোঁ[illegible] থেকে সেই মারাত্মক হাসিটা মিলিয়ে গেল চিরদিনের জ[illegible] পরিবর্তে, একটি ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসি সদা-সর্বদা এঁটে রইল।

সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

অমর এল একদিন। বলল, পীরুর শ্বশুর সরজমি[illegible] তদন্ত করে গেছেন। পীরুর অবস্থা দেখে সন্তুষ্ট হয়েছে[illegible] পীরুর বউ নাকি আবার ওর কাছে ফিরে আসবে।

নিয়তি

"সম্বুদ্ধ"

খাও খাও, খাইয়া দেখ।

না।

কেন খাইবে না ?

প্রভুর [illegible]ষেধ। খাইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইবেন।

[illegible] হইবেন, জান ?

[illegible]

[illegible]র্খ। এই উদ্যানে যেখানে যাহা-কিছু আছে সমস্তই [illegible]র্শ করিবার, ভোগ করিবার অধিকার তোমাকে দিয়াছেন ; [illegible]শুধু একটিকে কেন নিষেধ করিলেন, সে প্রশ্ন কোনদিন তো[illegible] মনে হয় নাই ?

ইহা বিষ[illegible] নির্দোষ হইলে তিনি নিষেধ করিতেন না।

যেটুকু ভাবিয়াছিলাম, তুমি তাহার চেয়ে অধিক মূর্খ। বিষ হইলে তিনি নিষেধ করিতেন না।

তবে ?

ইহা অমৃত। খাইলে তুমি তাঁহার মতই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিময়ী হইবে। যে গুণে তিনি তোমার প্রভু, সেই গুণ তখন তোমারও আয়ত্ত হইবে, তাঁহাতে ও তোমাতে আর বৃহৎ-ক্ষুদ্রের প্রভেদ থাকিবে না। এই জন্যই নিষেধ করিয়াছেন।

নারী ভাবিতে লাগিল।

সর্প কহিল, অত কী ভাবিতেছ ? সময় সংক্ষেপ, তিনি আসিয়া পড়িলে আর তোমার খাওয়া হইবে না। খাইয়া ফেল, ভাবিতে হয় পরে ভাবিও।

নারী তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইল। কহিল, তুমি কে ?

আমি ? আমি তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী।

তোমাকে তো আর কোনদিন দেখি নাই !

আমি এখানে থাকি না।

কোথায় থাক ?

অনেক দূরে। সে কথা থাক্।

কেন এখানে থাক না ?

ও কথা ছাড়। আগের কাজ আগে সারিয়া লও।

আমি খাইব না। তাঁহার অবাধ্য হইব না।

আবার বলে, না ! তুমি তাঁহার শক্তিতে মুগ্ধ, তাঁহার আজ্ঞাতে দাস। যে শক্তির বলে তাঁহার প্রভুত্ব, সেই শক্তি লাভ করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না ? আশ্চর্য !

তোমাকে দেখিতে এমন কেন ?

কেমন ?

তোমার দেহই শুধু আছে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাই। হাত নাই, পা নাই, নাক নাই, কান নাই। শুধু একটা মাথা আর একটা দেহ। তাহাও কতখানি দেহ, আর কতখানি লেজ, বোঝা যায় না—সমস্তটাকেই হঠাৎ লেজ বলিয়া ভুল হইয়া যায়। তোমার হাত-পা কিছু নাই কেন ? সকলের তো আছে !

নাই, প্রয়োজন হয় না বলিয়া। যাহারা শুদ্ধ দৈহিক শক্তির বলে প্রাত্যহিক কাজ-কর্ম করিতে বাধ্য হয়, ওসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহাদের প্রয়োজন।

তুমি কি কোন কাজ কর না ?

কেন করিব না ? করি। বুদ্ধিবলে করি। আমার দেহে তাই দুইটি মাত্র অংশ। বুদ্ধি উদ্ভাবনের জন্য মস্তক, এবং সেই বুদ্ধিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য একটি স্নিগ্ধ-গতি মসৃণ দেহ।

লেজ ?

বলিতে চাও বল। কিন্তু আসল কথাটা ভুলিয়া যাইতেছ। খাইবে না ফলটা ?

খাইয়া কী হইবে ?

কতবার বলিব ? শক্তিলাভ করিবে—জ্ঞানের শক্তি। তোমার প্রভু তোমাকে পরিচালনা করেন, কারণ তাঁহার জ্ঞান আছে—তোমার নাই। সেই জ্ঞানের অধিকারিণী যদি হইতে পার, তখন তোমাতে তাঁহাতে প্রভেদ থাকিবে না। হয়তো তখন তুমিই তাঁহাকে চালনা করিবে।

করিয়া লাভ ?

এখন বুঝিতেছ না, কারণ এখনও তুমি জ্ঞানহীনা।

জ্ঞান লাভ করিলে বুঝিবে, অপরকে নিজের ইচ্ছায় চালনা করিতে পারাই জগতে শ্রেষ্ঠ সাধনা, সার্থকতা।

বুঝিলাম না।

আচ্ছা, আবার বুঝাইতেছি। ওই যে তোমারই মত আর একটা জ্ঞানহীন প্রাণী গাছের ছায়ায় পড়িয়া ঘুমাইতেছ, তোমাকে ও ভালবাসে?

আদম? নিশ্চয়ই বাসে। উহারই পঞ্জরাস্থি হইতে আমার সৃষ্টি, আমাকে ভালবাসিবে না?

তুমি উহাকে ভালবাস?

নিশ্চয় বাসি।

ও আনন্দিত হইলে তুমি হৃষ্ট হও? ও দুঃখ পাইলে তোমার কষ্ট হয়?

নিশ্চয়ই।

তোমার প্রভুকে ও ভয় করে। তিনি যখন রুষ্টনেত্রে তাকান, কর্কশকণ্ঠে আহ্বান করেন, ও ভয়ে জড়সড় হইয়া যায়। জান?

জানি।

তোমার সেটা ভাল লাগে?

না।

তবে?

তবে কী?

তবে, কেন তুমি চাহিবে না যে, ভয়কে ও জয় করুক? এমন শক্তিলাভ করুক, যেন আর কোনদিন কাহাকেও দেখিয়া ও ভয়ে সঙ্কুচিত না হয়, নিজেকে ক্ষুদ্র, ক্ষীণ বলিয়া না গণ্য করে?

কে বলিল চাহি না?

চাও? তবে কেন তাহার সুযোগ পাইয়াও হেলায় হারাইতেছ?

কী সুযোগ?

এই ফল খাও। উহাকেও খাওয়াও।

খাইলে কী হইবে?

জ্ঞান আসিবে। জ্ঞানই শক্তি। আত্মপ্রত্যয় আসিবে। আত্মপ্রত্যয়ে ভয়ের বিনাশ। তখন দেখিবে, তোমাদের প্রভু আর তোমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারিতেছেন না। তিনি তোমাদের চেয়ে বৃহৎ, তোমাদের চেয়ে মহৎ এই ভ্রান্তি তোমাদের ঘুচিয়া যাইবে। তখন দেখিবে, ইচ্ছা করিলে তোমাদের প্রভুকে তোমরাই স্বেচ্ছায় চালাইতে পার।

তুমি কেবল 'তোমাদের প্রভু' 'তোমাদের প্রভু' করিতেছ কেন? তিনি কি তোমারও প্রভু নহেন?

আমার!—সর্প ঈষৎ হাস্য করিল: আমার প্রভু তিনি হইতে চাহিবেন কোন্ দুঃখে? যে তাঁহাকে ভয় করে, নিজের চেয়ে মহত্তর মনে করে, তিনি তাঁহার প্রভু। আমি তো ভয় করি না।

কেন? তিনি কি তোমার চেয়ে মহত্তর [illegible]?

কোন্ গুণে? তুমি অজ্ঞান, তোমার অ[illegible]াগ লইয়া তিনি তোমাকে নিজের অধীন করিয়া [illegible] হন; সে অজ্ঞতা কাটিলে তোমার অধীনতারও অবস[illegible] হইবে, এই ভয়ে তোমার জ্ঞানলাভের পথ প্রা[illegible]যত্নে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। আমি—আমি কে[illegible] কেহই নই, পরিচিতও নই, আমি সেই জ্ঞান তোম[illegible] লাভ করাইয়া দিবার জন্য প্রাণপণ করিতেছি। মহৎ [illegible]ন, না, আমি?

কিন্তু তোমার কেন এত আগ্রহ, তাহাই তো বুঝিতেছি না আমি।

বুঝিবে না, কারণ তুমি অজ্ঞান। জ্ঞানের সন্ধান যে পাইয়াছে সে জানে, জ্ঞানের আনন্দ একা একা আস্বাদনে সুখ নাই, যথাসাধ্য অন্যকেও জ্ঞানলাভে সাহায্য করাতেই জ্ঞানের সার্থকতা।

সত্য বলিতেছ?—এ প্রশ্ন ইভ করিল না। করা সম্ভব ছিল না, সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ সে ত[illegible] শেখে নাই।

সর্প কহিল, এত কী ভাবিতেছ? বলিলাম, খাইয়া দেখ, এ সুন্দর সুযোগ। খাও, দেখিবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেহে মনে অপূর্ব চেতনার সঞ্চার হইবে। তখন নিজে হইতেই মনে হইবে, আদমকে ডাকিয়া তুলি, উহাকেও খাওয়াই।

কিন্তু খাইয়া যদি অনিষ্ট হয়?

কী অনিষ্ট হইবে?

কী অনিষ্ট তাহা জানি না। আমি নিজের অনিষ্ট ভাবিতেছি না। আমার যাহা হয় হউক। কিন্তু আদমের যদি অনিষ্ট হয়?

সর্পের মুখশ্রী কুটিল হইয়া উঠিল। কহিল, তোমাদের

অনিষ্ট করিয়া আমার কিছু লাভ আছে? আমারই ভুল হইয়াছিল, মূর্খকে শুভ কথা বলিতে নাই। আমি চলিলাম।

ইভ ব্যাকুল হইল, কহিল, রাগ করিও না, চলিয়া যাইও না। রাগ করিবার কথা আমি কী বলিলাম?

চলিয়া যাইব না তো কী করিব? অরণ্যরোদনে কাহার আগ্রহ বল? রাগ আমি করি নাই। তোমার কথায় রাগ কেন করিব? আমি তো জানি তুমি বুদ্ধিহীনা, তোমাদের প্রভু আদমের পঞ্জর লইয়া তোম[illegible] সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আদমের মস্তিষ্কের একটি ক[illegible] তোমার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করেন নাই। মহৎ ম[illegible] ইহাই কি তাঁহার মহত্ত্বের, তোমার প্রতি করু[illegible] পরিচয়?

জা[illegible]। তাঁহার কার্যের আলোচনা কোনদিন করি নাই, তাঁহ[illegible] করুণাময় বলিয়াই জানিয়াছি। এখন—

এখন?

এখন তে[illegible]র কথা শুনিয়া মনে হইতেছে, হয়তো তোমার কথা[illegible] ঠিক।

সর্পের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। কহিল, হইতেছে তো? এই দেখ। আমি জ্ঞানী, আমার মুখের কথা শুনিয়াই তোমার মনে সংশয় জাগরিত হইল। যেখানে সংশয়, সেইখানেই অনুসন্ধিৎসা, সেইখানেই জ্ঞান। তাই তো বলিতেছি, ফল খাও, দেখিবে তখন তোমার নিজেরই জ্ঞান বিকশিত হইবে, ভাল-মন্দ আপনিই সমস্ত বুঝিতে পারিবে।

আমি খাইব না। আদমকে খাওয়াইব।

কেন?

নিষিদ্ধ খাদ্য নারীর খাইতে নাই। আদম পুরুষ, পুরুষদের খাইলে দোষ হয় না। আর, আদম জ্ঞানী হউক, আদম শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করুক, আমার তাহাতেই আনন্দ। আমি নারী, শক্তি লইয়া কী করিব?

সর্পের চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, পুরুষ-নারী পুরুষ-নারী করিতেছ, পুরুষ কী, নারী কী, তাহাই কি জান তুমি?

জানি না?

না, জানিলে জানিতে। তখন বুঝিতে, এমন করিয়া বলিতে না।

একটু থামিয়া কহিল, আর তুমি নিজে খাইবে না বলিতেছ, তুমি না খাইলে চলিবে কেন?

কেন চলিবে না? আদমের হউক, তাহাতেই আমার হইবে।

কী আশ্চর্য কথা! তুমি না খাইলে আদম খাইবে কেন?

কেন খাইবে না?

ইহারই নাম নারীবুদ্ধি। এই সহজ কথাটা এতক্ষণে বুঝাইতে পারিলাম না—পাছে তোমরা এই ফল খাও, জ্ঞান লাভ কর, শক্তি লাভ কর, পাছে তাঁহার প্রভুত্ব তাঁহার মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়, এই ভয়ে তোমাদের প্রভু—

প্রভুর ভয়?

আজ্ঞা হাঁ।—সর্পের ওষ্ঠ মৃদুহাস্যরঞ্জিত হইল : তাঁহারও ভয় আছে, মনে মনে তিনিও তোমাদের ভয় করেন, পাছে তোমরা তাঁহার তুল্য, তাঁহার অপেক্ষাও শক্তিধর হইয়া উঠ, এই ভয়ে তিনি সতত অস্থির। এই ভয়েই তিনি তোমাদের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, নানাবিধ কাল্পনিক ভীতি আর সংস্কার দিয়া তোমাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদের ভয়কে দূর কর, তখন দেখিবে, তিনিই তোমাদের ভয় করিতেছেন।

বেশ তো। আদম খাক।

কী জ্বালা! তুমি না খাইলে আদম খাইবে কেন?

কেন খাইবে না? আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিব।

তবেই হইয়াছে! তুমি বুদ্ধিহীনা, তোমাকে বুঝাইতেই আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। আদম পুরুষ, মস্তিষ্ক-সম্পন্ন বুদ্ধিমান। তুমি বুঝাইবে তাহাকে?

কেন? তুমি।

আমি কি চিরদিন বসিয়া থাকিব?

তবে কী হইবে?

তাহাই তো বলিতেছি। আদমও কুসংস্কারে, অন্ধ ভীতিতে বদ্ধ, তোমার সাধ্য নাই যুক্তি দিয়া তাহাকে বুঝাও। কিন্তু তুমি যদি ফল খাও, তোমার বুদ্ধি-জ্ঞান বিকশিত হইবে; তখন তাহাকে বলিয়া বুঝাইবার মত ধীশক্তি তুমি নিজেই লাভ করিবে।

ইভ অন্যমনস্ক। কহিল, তা বটে।

সর্প কহিল, শুধু তাহাই নহে, তোমাদের প্রভু যখন

আসেন, তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতে তোমার চক্ষু ধাঁধিয়া যায়, তাঁহার এমন অলৌকিক দীপ্তি। তাই না?

হাঁ।

সে দীপ্তি কিসের, জান? জ্ঞানের দীপ্তি। ফল খাও, দেখিবে, তোমারও দেহে মনে এক অপূর্ব চেতনা জাগিয়া উঠিবে, তোমারও দেহের ভঙ্গিতে মুখের ভাষায় চোখের দৃষ্টিতে এক অপূর্ব দীপ্তির সঞ্চার হইবে। তোমার সে নবলব্ধ শক্তি তখন তুমি নিজেই অনুভব করিবে। আদমকেও তখন তোমার এত করিয়া বুঝাইতে হইবে না—আমি যেমন এতক্ষণ ধরিয়া তোমার পায়ে বৃথা মাথা খুঁড়িলাম।

ছি ছি ছি!

তখন দেখিবে, তোমার শুধু একবার বলার অপেক্ষা, আদম নিজেই সাধিয়া ফল খাইবে। আদমের গৌরবে তোমার গৌরব বলিতেছ, তাহার জন্যই এই ফল আগে তোমার খাওয়া প্রয়োজন। খাইবে?

ইভ মুহূর্তকাল ভাবিল, অদূরে বৃক্ষতলে তৃণশয্যায় নিদ্রিত আদমের দিকে চাহিল, তারপর শান্তস্বরে কহিল, খাইব। কিন্তু, এত বড় গাছ, পাড়িব কী করিয়া?

সর্প সহর্ষে কহিল, সেজন্য ভাবিও না, ফল আমি আগেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।

শুষ্ক পত্রস্তূপ ঠেলিয়া দুইটি ফল সে বাহির করিল। কহিল, এই নাও। একেবারে গাছপাকা।

ইভ ফল হাতে লইল। সুন্দর মসৃণ ফল, স্বচ্ছ-শ্বেতাভ আবরণের তলদেশে হইতে উজ্জ্বল স্বর্ণাভ দ্যুতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

সর্প কহিল, আবার ভাবে! খাও।

ইভ কহিল, খাইতেছি তো।

ইভ আবার আদমের দিকে চাহিয়া দেখিল, বড় ফলটি তাহার জন্য ডান হাতের মুঠায় ধরিয়া রাখিল, বাম হাতে অন্যটিকে মুখে তুলিয়া নিঃসংশয়ে কামড় বসাইল।

সর্পের মুখে গভীর পরিতৃপ্তি ও প্রসাদ। সে একটু দূরে সরিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

প্রথম গ্রাস মুখে লইয়া ইভের গা কেমন করিয়া উঠিল। মুখের মধ্যে কী রকম একটা অস্বস্তি, একটা চিড়বিড়-করা ভাব, কিছু-মিষ্ট কিছু-কষার স্বাদ। খাইতে তাহার জিহ্বা জড়াইয়া আসিল, ভাল করিয়া না চিবাইয়াই সে চোখ-মুখ বুজিয়া কোন মতে সেটাকে গিলিয়া ফেলিল।

সর্প তৃপ্তস্বরে কহিল, তাড়াহুড়া করিতেছ কেন? বেশ ধীরে সুস্থে চিবাইয়া খাও।

তাহার কথা ইভের কানে গেল কিনা সন্দেহ। এক মুহূর্ত সে থামিয়া রহিল, তারপর কহিল, না, খাইয়াছি যখন, শেষ পর্যন্তই খাইব।

আর সে দ্বিধা করিল না, এক-একটি কামড়ে ফল ভাঙিয়া লইয়া, বেশ আস্তে সুস্থে চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতে লাগিল। দুই-তিন গ্রাস খাইতেই মুখের [illegible]স্তির ভাব কাটিয়া গেল। দেখিল, ভালই লাগিতে[illegible]। কামড়ে কামড়ে সমস্তটা ফল সে নিঃশেষ করিল[illegible]পর ধীরে ধীরে ঘাসের উপরে বসিয়া পড়িল। তাহার রক্তধারায় কী একটা অব্যক্ত আনন্দ, একটা [illegible] উচ্ছ্বাস ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে, সমগ্র দেহ [illegible] ব্যাপিয়া একটা অপূর্ব অনুভূতির শিহরণ, যেন ঢে[illegible]পর ঢেউয়ের মত আসিয়া তাহার সমস্ত চেতনাকে [illegible]ভিভূত করিয়া ফেলিতেছে।

সর্প পরম তৃপ্তিভরে জিহ্বা বাহির করিয়া নিজের দুই ওষ্ঠ লেহন করিল, ফিসফিস করিয়া কহিল, যাও, এবার আদমকে জাগাও।

তাহার সে কথা ইভের কানে গেল না, সে তখন নিজের অকারণ পুলকে নিজে বিহ্বল। তাহার নয়নে বিহ্বলতা, দেহে মধুর আলস্য, মনে একটা অজ্ঞাতপূর্ব ধীর গম্ভীর তরঙ্গোচ্ছ্বাস, বহুক্ষণ সে সেই একই ভাবে তৃণশয্যায় বসিয়া রহিল, সমস্ত বহির্জ্ঞানরহিত হইয়া নিজের অভ্যন্তরে এক নূতন চেতনার উপলব্ধিতে নিমগ্ন হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নের সূর্য অপরাহ্নে ঢলিয়া নড়িল, পারিজাত-শাখার ফাঁকে তাহার স্বর্ণবর্ণ রশ্মি ইভের দেহে আসিয়া পড়িল। তখন ইভের চমক ভাঙিল। দেহের দিকে চাহিল, দেখিল, সূর্যের সেই স্বর্ণবর্ণ রশ্মি আর তাহার গাত্রবর্ণ এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে; তুষারবর্ণ দেহ তাহার, সে দেহের অভ্যন্তর হইতে যেন স্বর্ণের আভা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। ফলটিতেও এমনিই ছিল। সূর্যের উষ্ণ স্পর্শ তাহার দেহে; অনুভব করিল, দেহের অভ্যন্তরেও ঠিক এমনই একটা মধুর উষ্ণতা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে।

অপরাহ্ণের স্নিগ্ধ বায়ু তাহার দেহে আসিয়া লাগিল, সে বায়ু অন্য দিনের মত নহে, তাহার প্রবাহে কী এক নূতনতর স্পর্শ! মনের মধ্যে এক আশ্চর্য অনুভব! সে যেন যাহা ছিল আর তাহা নাই, অথচ কী যে হইয়াছে তাহাও জান বুঝিতেছে না, শুধু তাহার সমগ্র দেহ মন সত্তা ভরিয়া একটা অধীর চেতনা থরথর করিয়া কাঁপিয়া ফিরিতেছে।

গাছের তলায় আদম তখনও নিদ্রিত। তাহাকে ডাকিতে হইবে। এই আনন্দ, ইহার ভাগ তাহাকে না দি[illegible] যায় না। ইভ উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া, [illegible] চক্ষু মেলিয়া তাকাইল। তাহার সুঠাম সুতনু [illegible]। এই দেহকে সে প্রত্যহ দেখিতেছে, মন্দাকিনী[illegible]জলে প্রতিবিম্বিত তাহার প্রতিরূপকে প্রত্যহ চাহিয়া দে[illegible]শ। আজ দেখিল, দেহ আর সে দেহ নাই, নূতন কী [illegible] হইয়া গিয়াছে! দুটি বাহু, বাহুমূল হইতে করাঙ্গু[illegible] [illegible]টি চরণ, উরুমূল হইতে পদাঙ্গুলি, উচ্চাবচ দেহকা[illegible]—বার বার করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সেই বাহু, সেই উরু, সেই দেহ সবই আছে, অথচ যেন সবই নূতন অভিনব—এমন একটা বর্ণ-গৌরব, একটা ছন্দ-লাবণ্য তাহার মধ্যে তরঙ্গে তরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, ইহার কল্পনা তো সে স্বপ্নেও করে নাই।

সর্প আবার কহিল, যাও, আদমকে ডাক।

ইভ কহিল, যাই।

নিদ্রিত আদমের পার্শ্বে ইভ গিয়া দাঁড়াইল। ডাকিল, আদম!

আদম জাগিল না।

ইভ নত হইয়া তাঁহার বাহু ধরিয়া নাড়া দিতে গেল। স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমগ্র দেহশ্রী যেন অসহ্য বেদনায় ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল; থরথর করিয়া কাঁপিয়া শিথিলদেহে সে আদমের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। অস্পষ্ট জড়িত স্বরে ডাকিল, এই!

আদম চক্ষু মেলিয়া চাহিল, তারপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। সবিস্ময়ে কহিল, তোমার কী হইয়াছে, ইভ?

ইভ কথা কহিল না।

আদম কহিল, অসুখ করিয়াছে?

ইভের মুখে ভাষা নাই। কষ্টে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

কী হইয়াছে, আদম বুঝিবে না। ইভ বুঝিয়াছে। আদমের দৃষ্টি পড়িবামাত্র ইভের সমস্ত দেহ বিদ্যুৎপ্রবাহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, দেহের রক্তস্রোত প্রচণ্ডবেগে তাহার মস্তকে মুখে কণ্ঠে বক্ষে আসিয়া পুঞ্জীকৃত হইয়াছে। অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিয়াছে, সে অনাবৃতদেহা। শঙ্কিত ত্রস্তনেত্রে চাহিয়া দেখিল, সর্প অদৃশ্য হইয়াছে।

ইভের মুখ আরক্ত, সমস্ত দেহে রক্তিম আভা। দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, চক্ষু আনত, সজল। দেখিয়া আদম ভয় পাইল। কহিল, কী হইয়াছে, বল? অসুখ করিয়াছে?

ইভ উত্তর করিল না। ধীরে ধীরে হাতটি ঈষৎ বাড়াইয়া ফলটি আদমের সম্মুখে ধরিল। নিঃস্বর কণ্ঠে কহিল, খাও।

কী এটা?—আদম ফলটা হাতে লইল, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, তারপর মুখ তুলিয়া দূরে গাছটির দিকে তাকাইল। কহিল, খাইব? কেন?

তারপর হঠাৎ বুঝিল, কহিল, তুমি খাইয়াছ?

ইভ কষ্টে কহিল, হাঁ, তুমি খাও। আদম কহিল, খাইয়াছ! কী সর্বনাশ! তাই তোমার মুখ চোখ এমন লাল হইয়া উঠিয়াছে। তুমি শোও। আমি ঔষধ খুঁজি।

আদমের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি ইভের সর্বাঙ্গ বাহিয়া ঘুরিতে লাগিল। ইভের ইচ্ছা করিতে লাগিল, সে এখনই মরিয়া যায়। দুই বাহু সম্মুখে জড়ো করিয়া, করপুটে মুখ ঢাকিয়া, দুই জানু সংবদ্ধ ও সংকুচিত করিয়া সে প্রাণপণে নিজেকে লুকাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু হায়, যাহার সর্বাঙ্গই অনাবৃত, সে কোন অঙ্গ টানিয়া কোন অঙ্গকে ঢাকিবে?

মূর্খ আদম কিছুই বুঝিল না, অধিকতর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল, অত জড়সড় হইতেছ কেন? শীত করিতেছে? তুমি শুইয়া পড়, আমি শুষ্ক পত্র আহরণ করিয়া আনি।

বড় দুঃখে ইভের হাসি আসিল, চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, মূর্খ।

আদম কহিল, কী বলিলে? মুখ? কী হইয়াছে মুখে?

হাতের ফলটা মাটিতে ফেলিয়া দিল আদম। ইভের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেল, কহিল, উঃ, কী গন্ধ! এত তীব্র গন্ধ ওই ফলের? গন্ধেই তো বোঝা উচিত ছিল বিষ। কেন খাইলে?

ইভের ওষ্ঠাধর সিরসির করিয়া উঠিল। পক্ববিম্বফলবৎ স্ফীত ও রক্তবর্ণ অধর লীলাভরে বক্র করিয়া কহিল, মূর্খ। বোকা।

ফলটাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, খাও।

আদম সহসা কহিল, দাও, খাইব। তুমি যখন খাইয়াছ, তোমার যখন মৃত্যুলক্ষণ সর্বাঙ্গে পরিস্ফুট, আমি আর কেন বাকী থাকিব? দাও।

ইভ বলিতে গেল, সেজন্য নহে, ফল বিষ নয়।

বলা হইল না, কিছু বলিবার পূর্বেই আদম তাহার হাত হইতে ফল কাড়িয়া লইল, ঘজ্ঞ ঘজ্ঞ করিয়া গোগ্রাসে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল। কহিল, আর ভয় নাই, এবার দুইজনেই একত্র মরিব।

ইভের পার্শ্বে বসিয়া, আদম তাহার স্কন্ধদেশে নিজের বাহু ন্যস্ত করিল। কহিল, ভাবিও না। একত্র ছিলাম, একত্রে মরিব, তবে আর দুঃখ কিসের?

ইভের অবশ অঙ্গ আদমের বুকে লতাইয়া পড়িল। অধরে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল, মরিব না।

আদম কহিল, মরিব, তাহাতে দুঃখ নাই। শুধু এই দুঃখ রহিল—এমন জীবনখানা, আর কিছুদিন বাঁচিয়া যাইতে পারিলাম না। দেখিয়াছ ইভ, আজ বায়ু যেন অন্য দিনের চেয়ে বেশী স্নিগ্ধ, সূর্যের কিরণ অন্য দিনের চেয়ে বেশী সুখস্পর্শ! এমন কেন হইল? আজ আমাদের শেষ দিন বলিয়া কি?

ইভের বাহু আদমের কণ্ঠে বেষ্টিত হইল, কহিল, শেষ দিন নয়। আজ আমাদের প্রথম দিন বলিয়া।

আদম বুঝিল না, কহিল, প্রথম দিন কিসের?

ইভের চোখে রহস্যময় হাসি ফুটিয়া উঠিল, কহিল, জীবনের।

আদম কহিল, কী বলিতেছ বুঝিলাম না। কিন্তু আশ্চর্য, ইভ। শুধু বায়ু আর রৌদ্র নয়, তোমার দেহের স্পর্শও যেন আজ অনেক মধুর লাগিতেছে। মৃ আসন্ন বলিয়াই কি?

ইভ ভ্রূভঙ্গি করিয়া কহিল, মৃত্যু আসন্ন বলিয়া। অ ঘাড়টা একটু নামাও না।

আদম কহিল, কেন?

ইভ কহিল, জানি না। বোকা একটা।

আদম কহিল, ইভ, সত্যই কি আজ আমরা মরিব?

ইভ কথা কহিল না। আদমের মাথাটাকে টানিয় আরও একটু নামাইতে চেষ্টা করিল। নিজের মুখটাকে আরও একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিল।

আদম কহিল, অমন করিতেছ [illegible] কা হইতেছে?

ইভ হাসিয়া কহিল, ভীষণ।

কোথায় কষ্ট?

তুমি বুঝিবে না। বল তো, আমরা [illegible]?

আমরা? আমরা কী? কী [illegible]ছ তুমি, কিছু বুঝি না।

আদমের কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠি[illegible], ইভ কি প্রলা[illegible] বকিতেছে?

হাঁ। আমরা কী? জান না? নারী আর নর তাহার অর্থ জান?

আদম কহিল, শান্ত হও ইভ, উত্তেজিত হইও না এখনই সুস্থ হইয়া যাইবে।

ইভের মুখে আসিল, মূর্খ, বর্বর। বলিল না হঠা[illegible] তাহার মনে হইল, আদমের দোষ নাই, আদম এখনও বুঝিতেছে না। বুঝিবে—ফলটা এইমাত্র খাইল তো একটু হজম হউক, তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পাউক, পাইলেই বুঝিবে।

আদম সহসা কহিল, ইভ, এ কী হইল?

ইভ কহিল, কী?

আমার সকল গাত্র স্বেদসিক্ত হইতেছে, মুখ পরিশু[illegible] —এমন কেন হইল?

ইভের মুখে সেই অপূর্ব হাসিটি আবার ফুটিয়া উঠিল বাহুবন্ধন আরও নিবিড় করিয়া, আদমের ক্রোড়ের মধ্যে নিজেকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, কহিল, এখনই বুঝিবে, কেন।

আদম কহিল, এই বোধ হয় মৃত্যু। দেখি, হাতটা ছাড়িয়া দাও। আমি প্রার্থনা করিব, এ ভাবে মরিতে পারিব না। প্রভুকে ডাক, তিনি আসিয়া রক্ষা করুন।

ইভ ত্রস্ত হইয়া কহিল, কর কী? এখন প্রভুকে ডাকিও না। কী মূর্খ তুমি!

কিন্তু ইভের কথা কানে যাইবার পূর্বেই আদমের ব্যাকুল কণ্ঠ গগনব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে: হে প্রভু, হে জিহোভা বজ্রপাণি, শীঘ্র আসুন, আমরা বিপন্ন।

ইভ [illegible]র মুখে হাত চাপা দিল, কহিল, চুপ চুপ চুপ, [illegible]

[illegible] গম্ভীর নির্ঘোষ শ্রুত হইল: যাইতেছি আদম [illegible]

ইভ [illegible] ফেলিল। আদমের ব্যাকুল বাহুপাশ হইতে নিজে[illegible]কিতে যুক্ত করিয়া, ত্রস্তা হরিণীর মত বেগে গিয়া ঘন[illegible]গুল্মের মধ্যে নিজেকে গোপন করিল।

নির্মেঘ আ[illegible]শ মেঘবৎ নির্ঘোষ ক্রমশ নিকটবর্তী হইল। ইভ অ[illegible]চ্চকণ্ঠে বারংবার ডাকিতে লাগিল, এই, এই বোকা, শীঘ্র পলাইয়া আইস।

একবার, দুইবার, তিনবার। আদম শুনিতে পায় না। তখন ইভ অকস্মাৎ 'উঃ' বলিয়া আর্তচিৎকার করিয়া উঠিল। সেই চিৎকারে আদমের সম্বিৎ ফিরিল, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল, কহিল, খুব কষ্ট হইতেছে, ইভ?

ইভ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে মাটিতে বসাইয়া ফেলিল, কহিল, শীঘ্র, লুকাও, এই ঝোপ মুড়ি দাও।

কেন?

কেন! হাঁদারাম। প্রভু রাগ করিতেছেন। বজ্রধ্বনিতে বুঝিতেছ না?

রাগ কেন?

কেন আর, ফল খাইয়াছি। তাঁহার নিষেধ ছিল না?

সর্বনাশ! এখন?

সে পরে ভাবিব। এখন আগে তো লুকাও।

আদম আর দ্বিরুক্তি করিল না। ইভের পাশের ঝোপটির মধ্যে ঢুকিয়া নিজেকে পত্রগুল্মে আবৃত করিয়া ফেলিল।

কিছুক্ষণ কাটিল। তারপর হঠাৎ আদম কহিল, এই, শুনিতেছ?

ইভ অস্ফুটস্বরে কহিল, না।

শোন না, একটা কথা বলি।

বল না, একটা কথা শুনি।

কাছে আইস, নহিলে বলা যাইতেছে না।

কেন, বলার কি ঠ্যাং ভাঙিয়াছে? আমি আসিতে পারিব না।

আমি আসি?

উঁহু। এখানে বড় কম ঘাস।

আঃ, শোনই না।

আঃ, বলই না।

আমার কী রকম যেন লাগিতেছে!

কী রকম? চিত্ত চঞ্চল? হিয়া অধীর?

কী জানি! বোধ হয়।

খুব ভাল। কথা বলিও না। চুপ করিয়া পড়িয়া থাক।

আইস না। ধুৎ, আমার ভাল লাগে না।

আবদার থাক্। প্রভুকে ডাকিতে কে বলিয়াছিল? এবার চুপ কর, ওই বুঝি আসিলেন।

সত্যই। সমস্ত গগন-পবন উদ্ভাসিত করিয়া জিহোভার দাবানলবৎ উজ্জ্বল মূর্তি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইল।

বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ, ডাকিলেন, আদম!

আদম ভয়ে চুপ।

উত্তর না পাইয়া জিহোভা বিস্মিত হইলেন। সে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। তাহাকে ডাকিয়াও তিনি সাড়া পাইতেছেন না? আবার ডাকিলেন, আদম! ইভ!

লতাগুল্মের মধ্যে ঈষৎ শব্দ শ্রুত হইল। কিন্তু উত্তর আসিল না। জিহোভার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কঠোর কণ্ঠে কহিলেন, যদি থাক উত্তর দাও। না দিলে বুঝিব ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা করিতেছ। ইভ! আদম!

এবার আদম উত্তর দিল, প্রভু!

কোথায় তুমি?

এই যে।

আদম ঝোপের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। জিহোভা কহিলেন, এতক্ষণ উত্তর দাও নাই কেন?

ভয়ে, প্রভু।

ভয় কেন?

আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি। ফল খাইয়াছি।

ফল খাইয়াছ! কী ফল? ইভ কোথায়?

এই যে প্রভু।

ইভ সেই লতাগুল্মের মধ্যেই উঠিয়া বসিল।

ওখানে কেন? এইখানে, আমার সম্মুখে আইস।

আদম ইভের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ইভ কহিল, আসিতে পারিতেছি না, প্রভু।

কেন?

ইভ আরও কিছু লতাপাতা টানিয়া নিজের চারিপাশে স্তূপ করিল। নতনেত্রে কহিল, প্রভু, আমি—

কী তুমি? বল।

ইভ উত্তর করিল না, আরক্ত নতমুখে বসিয়াই রহিল।

জিহোভার কণ্ঠ আবার কঠোর হইল: উঠিয়া আইস।

ইভ নড়িল না।

আদম ব্যস্ত হইয়া কহিল, প্রভু, ও উলঙ্গ।

উলঙ্গ!—জিহোভার মনে হইল, তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন। নন্দন-কাননের এই নিভৃত আশ্রয়ে ইহাদের রাখিয়াছেন। এ চেতনা ইহাদের মনে কে জাগাইল? এ অনিষ্ট কাহার দ্বারা সম্ভব হইল?

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া, মাটির দিকে তাকাইয়া, জিহোভা ভাবিতে লাগিলেন।

সেই অবসরে ইভ নিঃশব্দ ভাষায়, হাত ও চোখের ইঙ্গিতে আদমকে ধমক লাগাইল: এই, এই ভূত!

আদম তাড়াতাড়ি গাছের পাতালতা যা হাতে ঠেকিল, এক গোছা টানিয়া লইয়া নিজের দেহমধ্য কথঞ্চিৎ আবৃত করিল।

জিহোভা হঠাৎ মুখ তুলিলেন, কহিলেন, এ কী!

আদম কহিল, প্রভু লজ্জা করিতেছে।

জিহোভার মুখশ্রী মেঘাচ্ছন্ন হইল। কহিলেন, বুঝিয়াছি। ফল খাইয়াছ, তাহার অর্থ, ওই গাছের ফল?

হাঁ, প্রভু।

কেন খাইলে?

উত্তর দিলে ইভকে অপরাধী করা হয়। আদম চুপ করিয়া রহিল।

কেন খাইলে, বল? এ বুদ্ধি কে দিল? বল, নহিলে কঠিন দণ্ড পাইবে। বল।

ইভ কথা কহিল। জড়িমাহীন, স্পষ্ট কণ্ঠে কহিল, প্রভু, আমি খাওয়াইয়াছি।

কেন?

আদম কহিল, না, প্রভু। আমি আপনিই খাইয়াছি।

ইভ যে বলে, সে তোমাকে খাওয়াইয়াছে।

মিথ্যা বলিয়াছে প্রভু, আপনার ক্রোধ হইতে আমাকে বাঁচাইবার জন্য।

জিহোভার মুখ কঠিন হইল। ক[illegible]হারই মধ্যে মিথ্যা বলিতেও শিখিয়াছ? বেশ বেশ, [illegible]এষের প্রথম ফল দেখা দিয়াছে দেখিতেছি। কি[illegible]তোমাকে বাঁচাইবার জন্য ইভ মিথ্যা বলিল, না, ই[illegible]বাঁচাইবার জন্য তুমি মিথ্যা বলিলে—কী প্রকারে বু[illegible] ইভ, তুমি কেন খাওয়াইয়াছ?

আদম কহিল, প্রভু, ইভ ভুলক্রমে [illegible]াছিল। আমার মনে হইল, এ তো বিষফল, ইভ নিশ্চয় মরিয়া যাইবে। তাই, তাহার সঙ্গে একত্রে মরিব বলিয়া আমিও খাইলাম।

ইভ, এ কথা সত্য?

ইভ কহিল, অনেকখানি সত্য, প্রভু। কিন্তু আমিও ওকে খাইতে বলিয়াছিলাম।

কেন? একত্র মরিবার জন্য?

না। জ্ঞানলাভের জন্য।

বটে। ওই ফল খাইলে জ্ঞানলাভ হয়—এ কথা কে বলিল?

হয় তো। খাইবার পরই তো চেতনা হইল, আমি নারী; লক্ষ্য হইল, আমরা উলঙ্গ।

জিহোভার মুখ করুণ হইল। কহিলেন, হায় হতভাগিনী, কী স্বাস্থ্যকর জ্ঞানই লাভ করিয়াছ! কিন্তু সে কথা যাক। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এই ফল খাইলে জ্ঞানলাভ হয়—এ কথা কে শিখাইয়াছে তোমাকে?

এক প্রাণী। তাহাকে আর কোনদিন দেখি নাই।

কিরূপ প্রাণী? আমার মত?

না।

তোমাদের মত?

না।

তবে? কাহার মত? তোমাদের পরিচিত কোন্ প্রাণীর মত তাহার রূপ?

কাহারও মত নহে। সেরূপ আকৃতি আর কখনও দেখি নাই।

বেশ, তাহার বর্ণনা দাও। কীরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাহার?

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই নাই। শুধু একটা মাথা, তাহাতে নাক-কান কিছু নাই, চোখের পাতা-পাপড়িও নাই; আর বাকীটা সমস্তই একটা দীর্ঘ লেজ।

সর্বনা[illegible] তাহার দেখা কোথায় পাইলে?

[illegible]। আসিল, আদম তখন ঘুমাইতেছিল। আ[illegible]ক করিয়া বুঝাইল, তাহার যুক্তিতে তর্কে মুগ্ধ হ[illegible] ফল খাইলাম।

তা[illegible]? সে কোথায় গেল?

জানি [illegible] ফল যখন খাইলাম, তারপরও বহুক্ষণ ছিল। আম[illegible]লিতেছিল, আদমকে জাগাও, আদমকে খাওয়াও।

আদমকে য[illegible]ন ডাকিতে গেলাম, যখন হঠাৎ মনে হইল আমি—ইভ ঢোঁক গিলিল—হঠাৎ মনে হইল সে আমাকে দেখিতে পাইতেছে, তখন তাহাকে খুঁজিলাম। আর দেখিতে পাইলাম না।

পাইবেও না। কিন্তু আমি এই ফল খাইতে বারণ করিয়াছিলাম। তাহার কথায় খাইয়াছ। কেন খাইলে?

ইভ কহিল, সে বলিল, খাইলে জ্ঞান হয়। জ্ঞান হইতে শক্তিলাভ হয়, নির্ভয় হওয়া যায়। আদম জ্ঞানী হইবে, আপনার সমান বা আপনার অপেক্ষাও শক্তিধর হইবে, নির্ভয় হইবে—এই আশায় আমি নিজে খাইয়াছি, আদমকে খাওয়াইয়াছি।

জিহোভার মুখে বড় করুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল। কহিলেন, হায়, হতভাগিনী!

ইভ সহসা ফুঁসিয়া উঠিল। কহিল, হতভাগিনী কে?

ক্রমশ টের পাইবে। শক্তিধর হইতে চাহিয়াছ। শক্তিধর আশ্রিতকে পালন করে, রক্ষা করে—এই কথাই জানিয়াছ। সেই আশ্রিতকে আঘাত করার, দণ্ড দেওয়ার অপ্রিয় কর্তব্যও যে সেই শক্তিধরেরই, এ কথা কি জান?

ইভ কহিল, দণ্ড আমাকে দিন, আমিই অপরাধিনী।

জিহোভা কহিলেন, অপরাধ উভয়েরই। জ্ঞানলাভে নির্ভয় হইবে? হায় ভাগ্য! ইহারই মধ্যে তো দেখিতেছ। জ্ঞানলাভের মধ্যে হইয়াছে এইটুকু—শিখিয়াছ তোমরা নর ও নারী, বুঝিয়াছ তোমরা উলঙ্গ। সংসারে কি ইহাই চরম জ্ঞান? এই জ্ঞানলাভের ফল কি হইয়াছে দেখ—তোমরা দুইজন পরস্পরের লজ্জী, পরস্পরকে দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইতেছ। আমি তোমাদের চির-আশ্রয়-স্থল, আমার সম্মুখে আসিতে ভীত হইতেছ। ভয়ের পথ দিয়া কি নির্ভয়ের আবির্ভাব হয়?

আদম নির্বাক। ইভ কহিল, প্রভু, তবে কি আমরা ভুল করিলাম?

জিহোভা কহিলেন, আগাগোড়া। দোষ তোমাদের নয়, দোষ সেই পাপাত্মার। সে ইচ্ছা করিয়াই তোমাদের বিভ্রান্ত করিয়াছে।

করিয়া তাহার লাভ?

সে তুমি বুঝিবে না। আমার অভিপ্রায়কে, আমার স্বপ্নকে ব্যর্থ করিয়া দিল, ইহাই তাহার আনন্দ।

কেন? কে সে?

সেও আমারই সৃষ্টি। সেই ছিল আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় অনুচর। যে-শক্তির লোভ তোমাদের দেখাইয়াছে, সেই শক্তির লোভে সে অন্ধ উন্মত্ত হইয়াছিল, বাধ্য হইয়া আমি তাহাকে নন্দন হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলাম। আশা ছিল, তোমাদের মধ্য দিয়া আমার সৃষ্টির স্বপ্ন সার্থক হইবে। হইল না—ক্ষণিকের ভুলে সে তোমাদিগকে স্বর্গচ্যুত করিয়া গেল। স্বর্গে আর তোমাদের স্থান নাই। তোমাকে হতভাগিনী বলিয়াছি ইভ—সে আমার ভুল, হতভাগ্য আমি নিজে। নহিলে, বার বার চাহিলাম নিজের কল্পনামত উত্তম সৃষ্টি করিব, নিষ্পাপ স্বর্গলোক প্রতিষ্ঠিত করিব। বার বারই কেন পারিলাম না?

ইভ কহিল, প্রভু, আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়াছে বলিলেন। কী প্রকারে, দয়া করিয়া তাহা বলুন।

জিহোভা কহিলেন, শুনিতে চাও? শোন, বলি। এখনও বুঝিবে, পরে আর বুঝিবে না—বুঝিবার শক্তিই হারাইবে। সুস্থ সহজ বুদ্ধি তোমাদের মধ্যে আমি সঞ্চারিত করিয়াছিলাম, সেই বুদ্ধি অবশিষ্ট থাকিতে থাকিতে শুনিয়া লও।

ইভ কহিল, বলুন।

জিহোভা কহিলেন, শোন। জ্ঞান, শক্তি, নির্ভয়—ইহার সত্য স্থান কোথায়? মস্তকে। হৃদয়ে। প্রবৃত্তিতে। সেই জ্ঞান শক্তি নির্ভয়ের যেখানে অবমান, সেইখানেই গ্লানি আর লজ্জা। তাহা হইলে যথার্থ গ্লানি আর লজ্জার স্থানও হইবে মস্তকে, অন্তরে। নিজের প্রবৃত্তি, নিজের রুচি যদি এমন হয় যে তাহার জন্য গ্লানি বোধ করিতে হয়, লজ্জা সেইখানেই। যেখানে নিজেকে লইয়া গ্লানি নাই, সেইখানেই নির্ভয়।

তোমরা মানব, আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি রুচি প্রবৃত্তির ধারক ও বাহক, ইহাই তোমাদের পরিচয়। সেই পরিচয় যেখানে ক্ষুণ্ণ হইল, লজ্জাও সেইখানেই। মানুষের মনুষ্যত্ব মহত্ব কি শারীরিক বস্তু? সে তোমাদের মধ্যে যে জ্ঞান উদ্রিক্ত করিয়াছে তাহাতে তোমরা এইটুকুই মাত্র বুঝিয়াছ তোমরা নর ও নারী; বুঝিয়াছ, তোমাদের লজ্জার স্থান অনাবৃত দেহ বা তাহারও অংশবিশেষ। ইহাকে কি প্রকৃত জ্ঞান বলে? এটা হীনজ্ঞান, হীন-চেতনা। এই চেতনাই সে তোমাদের মধ্যে জাগাইয়া দিয়া গিয়াছে। এখন বুঝিলে?

ইভ কহিল, বুঝিলাম।

জিহোভা কহিলেন, বোঝ নাই। বোঝ যে নাই, তাহাও এখনই বুঝাইয়া দিব। দেখ, বিপদ বুঝিয়া তোমরা আমাকে ডাকিলে, কিন্তু আমি যখন আসিলাম, ভয়ে লুকাইয়া রহিলে। নির্ভয় হইবার কল্পনা করিয়াছ, ভয় আসিল কেন? আসিয়াছে গ্লানিবোধ হইতে। সহজবুদ্ধি এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহার বলে বুঝিয়াছ, অন্যায় করিয়াছ। অন্যায়ের বোধ হইতে ভীতির জন্ম; অন্যায় যে করে না, সে-ই নির্ভয়। সে নির্ভয় কি হইয়াছ? না, যে নির্ভয় মনে ছিল তাহাও হারাইয়াছ? ভাবিয়া দেখ।

তারপর আমি ডাকিলাম, সাড়া দিলে, আমার সম্মুখে আসিতে পারিলে না। এখনও পারিতেছ না। লজ্জা। লজ্জা হীনতায়। সে কি অঙ্গবিশেষের ব্যাপার? তোমাদের দেহ, আমার নির্মিত। বানাইতে আমার লজ্জা হয় নাই, থাকিতে তোমাদের লজ্জা কেন? আমি তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, তোমাদের দেহের প্রতিটি অঙ্গ আমার নির্মিত। সেই আমারই সম্মুখে সেই দেহ লইয়া আসিতে তোমরা কুণ্ঠিত। ভাবিয়া দেখ, ইহা কি স্বাভাবিক?

লজ্জা, মনোবৃত্তিতে চিন্তায় আচরণে হীনতা প্রকাশ পাইলে, তাহার জন্য। সমস্ত লজ্জাবোধ যদি দেহকে লইয়াই ব্যাপৃত অবসিত হইল, তবে প্রবৃত্তির হীনতার জন্য যে লজ্জা প্রয়োজন তাহা আসিবে কোথা হইতে? এই মিথ্যা লজ্জা লইয়া তোমরা ঘুরিয়া মরিবে; সত্যকার হীনতা যেখানে, সেখানে লজ্জাবোধ রহিত হইবে।

এখন বুঝিলে, কী সর্বনাশ তোমাদের [illegible] করিয়া গিয়াছে?

আদম করজোড়ে কহিল, প্রভু, আর [illegible] হইবে না। আমরা ভুল করিয়াছি, অন্যায় করি[illegible] সে ভুলের সংশোধন কীরূপে হইবে বলুন। ক্ষমা [illegible]।

জিহোভা কহিলেন, ক্ষমা? ক্ষমা ক[illegible] অধিকারী আমি নই। কৃতকার্যের ফলভোগ [illegible] করিয়া কেহ পরিত্রাণ পায় না। পায়, মার্জনা। [illegible] হইতে, মন হইতে কৃত অপরাধকে যদি নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিতে পার, নিজেকে আবার পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিতে পার, মার্জনা তাহারই নাম।

আদম কহিল, কীরূপে তাহা হইবে, আদেশ করুন।

জিহোভা কহিলেন, শোন। অন্যায়ের শেষ তাহার ক্ষালনে। দেহগত যে জ্ঞান ও লজ্জাবোধ তোমাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকে মন ও চেতনা হইতে নিঃশেষে নির্বাসিত করিতে হইবে, ইহা সহজসাধ্য নহে। বার বার সেই জ্ঞান তোমাদের মনঃপটে আসিয়া উদিত হইবে, বার বারই তাহাকে সবলে উপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। কৃচ্ছ্র সাধনের দ্বারা ইহাকে যখন সমূলে অবলুপ্ত করিতে পারিবে, তখনই মন ও চিত্ত পুনরায় নির্মল হইবে, স্বস্থ হইবে। নন্দনে তোমাদের ভ্রষ্ট স্থানও আবার তোমাদের করায়ত্ত হইবে।

ইভ কহিল, কিন্তু প্রভু, হ্রীই নারীর প্রধান শ্রী।

জিহোভা কহিলেন, হাঁ, কিন্তু সে মানসিক হ্রী, শারীরিক হ্রী মাত্র নহে। শ্রীও মানসিক উৎকর্ষের দ্বারা প্রকট—শারীরিক সৌন্দর্যই যথার্থ শ্রী নহে।

আদম কহিল, প্রভু, আমরা এখন কী করিব?

জিহোভা কহিলেন, চিরাগত প্রথা অনুসারে,

তোমাদের অবিলম্বে নন্দন হইতে বিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে হয়। সে দণ্ড আমি তোমাদের এখনই দিতে চাহি না—মর্ত্যলোক বড় প্রলোভনের স্থান, সেখানে গেলে তোমরা আরও অধিক আত্মবিস্মৃত হইবে বলিয়া আমার আশঙ্কা। আপাততঃ তোমরা এইখানেই থাক। মনকে নিষ্পাপ কর। যে মিথ্যা-লজ্জার বোধ জন্মিয়াছে তাহাকে এই দণ্ডে পরিহার কর। এই পত্রাবরণই তোমাদের সহজ সরল নগ্নতাকে প্রকট ও কুৎসিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাকে নিঃ[illegible]যে দূর কর।

[illegible]হিল, প্রভু, আমি প্রস্তুত। ইভ কহিল, আ[illegible]হি। প্রভু, লজ্জাই নারীর ভূষণ।

[illegible]ভা কহিলেন, এক কথা কতবার বলিব! ভূষণ, সে মান[illegible] লজ্জা—যে লজ্জাবোধ মানুষকে সৎপথে রাখে, অসৎপথে [illegible]শ্রয় দেয় না। আর, শুধু এই লজ্জাকে নহে—এ তো উপ[illegible]মাত্র—মূল পাপ যেখানে, সেই শারীর-বোধকেই বর্জন[illegible]তে হইবে তোমাদের। তুমি নারী, আদম নর—এই ভেদবোধ তোমাদের ছিল না। ইহাকে ভুলিয়া যাও।

ইভ কহিল, ক্ষমা করিবেন প্রভু। ভেদবোধের মধ্যে কী নিবিড় আনন্দ থাকিতে পারে তাহা আমরা জানিতাম না, এখন জানিয়াছি। ইহাকে বর্জন করিতে পারিব না।

জিহোভার মুখশ্রী অন্ধকার হইল। কহিলেন, এ কথার অর্থ বোঝ?

ইভ কহিল, বুঝি প্রভু। কিন্তু আপনিও ভাবিয়া দেখুন, ফলভক্ষণে না হয় জাগরিতই হইয়াছে, কিন্তু আমাদের অন্তরে ইহার সৃষ্টি তো আপনিই করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন একা আমাদের দোষ দিতেছেন কেন?

জিহোভা কহিলেন, জ্ঞানলাভের ফল ফলিতেছে। আদম, এখনও ভাবিয়া দেখ। এখনও সময় আছে। ইহার পর আর আমারও সাধ্য হইবে না তোমাদের নিয়তিকে বাধা দিই।

ইভ কহিল, কাজ নাই নন্দনে। চল আদম, আমরা পৃথিবীতেই যাই। নন্দনে অনেক ভিড়। পৃথিবীতে থাকিব শুধু আমরা দুইজন—তুমি নর আমি নারী, আর কেহ থাকিবে না। আমাদের সেই-ই স্বর্গ।

জিহোভা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, দুইজন! দুই অচিরাৎ দুই লক্ষ কোটি জনে পরিণত হইবে, তখন কাঁদিয়া কূল পাইবে না। হউক, আমার আর বলিবার কিছু নাই। তোমাদেরও তো এইই শেষ কথা?

আদম ইভের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করিল, তারপর কহিল, হাঁ প্রভু। আপনার নির্দেশ পালন করিতে পারিলাম না, ক্ষমা করিবেন।

জিহোভা কহিলেন, ফল ফলিতেছে। বেশ, স্বর্গচ্যুত হইতে সাধ হইয়াছে। যাও, মর্ত্যলোকের মজা বুঝিয়া আইস।

আদম কহিল, এখনই যাইব?

জিহোভা কহিলেন, ব্যস্ত হইও না। অক্ষয় মর্ত্যবাস সম্মুখে। নিয়তিকে জাগ্রত করিয়াছ, মর্ত্যলোকেও সে তোমাদের সহচারিণী হইবে। তোমাদের সেই নিয়তির স্বরূপ আমি বলিয়া দিতেছি, পার তো সতর্ক হইয়া চলিও।

ইভ আদম উভয়েই কহিল, বলুন প্রভু।

জিহোভা কহিলেন, সত্যের চেয়ে তোমরা বস্ত্রকেই মহত্তর বলিয়া মান্য করিলে; মর্ত্য-জীবনে তোমাদের সমগ্র চেতনা তাই সত্যলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়া বস্ত্রলোকেই কেন্দ্রায়িত হইয়া থাকিবে। নির্ভয়? তখন দেখিবে ভয় কাহাকে বলে। দেখিবে এই মোহের বশে পিতা কন্যাকে, কন্যা পিতাকে, মাতা পুত্রকে, পুত্র মাতাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, ভগিনী ভ্রাতাকে সতত ভয় করিবে। পরস্পর হইতে নিজেকে আবৃত রাখিবার অস্বাভাবিক সাধনার ফলে সমস্ত মানবজাতি অচিরাৎ বিবরবাসী বন্যজীবের ন্যায় এক আত্ম-জুগুপ্সু জাতিতে পরিণত হইবে।

তখন বুঝিবে, অন্নচিন্তা অপেক্ষাও বস্ত্রচিন্তা চমৎকারা। অন্নের অভাব আভ্যন্তরীণ, তাহা লোকচক্ষুর অগোচর; বস্ত্রের অভাব বাহ্যিক, লোকচক্ষুর গোচর। অতএব অন্নক্লেশ স্বীকার করিয়াও বস্ত্রের আঢ্যতা মানবের বরণীয় হইবে; সন্তান-সন্ততিক্রমে তোমাদের বংশ যতই বর্ধিত হইবে, বস্ত্রসমস্যা ততই ভীষণমূর্তি ধারণ করিবে। তখন বস্ত্রের সংস্থানের জন্য মানব-মানবী স্বেচ্ছায় আপনাকে ও সন্তানকে অন্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিবে।

দেহ সতত লুক্কায়িত থাকিবার ফলে বস্ত্রেই মানুষের

পরিচয় বিজ্ঞাত হইবে। বস্ত্রের বৈসাদৃশ্য দ্বারাই মানুষে মানুষে মর্যাদা ও শ্রেণীর বিভাগ হইবে; জাতিতে ও অন্তরে এক থাকিয়াও কেবল বস্ত্রের বিভিন্নতা দ্বারাই তাহারা কে কাহার স্বজাতি ও কে বিজাতীয় তাহা নির্ণয় করিবে এবং আত্মঘাতী কলহে পরস্পরকে বিনষ্ট করিবে।

কালক্রমে মানবজাতি অসংখ্য উপজাতিতে পরিণত হইবে। যাহারা চতুরতর, তাহারা প্রভূত ও বিচিত্র বস্ত্র উৎপাদন করিবে, এবং সেই বস্ত্রে কণ্ঠাকর্ষণ করিয়া অন্য জাতিকে নিজের পদানত করিয়া রাখিবে। ইতর জাতিরা বস্ত্রের প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় উক্ত চতুরতর বস্ত্র-ব্যবসায়ী জাতিদের পদাশ্রিত হইতে চাহিবে।

বস্ত্রের দ্বারাই সামাজিক মানমর্যাদা নির্ণীত হইবে, কিন্তু সে নির্ণয়ের মানদণ্ড সর্বত্র ও সর্বদা এক থাকিবে না। মহার্ঘ বস্ত্রের মহিমা অধিক, অতএব মহার্ঘ বস্ত্রের প্রচলন বাড়িবে; বস্ত্রের মহার্ঘতাহেতু তাহার আয়ত্তলভ্য পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পাইবে। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াইবে যে, ইভ, তুমি এই মুহূর্তে যে উডুম্বর-পত্রটিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ, তোমার বংশধররা ইহা অপেক্ষাও স্বল্পতর আবরণে আপনাকে আবৃতজ্ঞান করিবে, এবং সেই বস্ত্র-স্বল্পতাকেই পরম কাম্য ও অনুকরণীয় বলিয়া গণ্য করিবে। পক্ষান্তরে, যাহারা স্বল্পতা-ভীত, তাহারা আবরণ-বস্ত্রের পরিমাণকে ক্রমশ বর্ধিত করিয়া করিয়া এমন অবস্থাতে উপনীত হইবে যে, কোন্ বস্ত্রের অভ্যন্তরে কে রহিয়াছে তাহা স্থির করিবার কোন উপায় থাকিবে না, ফলে ঈষৎ অনবধানে একের নারী অবলীলাক্রমে অপরের গৃহগতা হইয়া পড়িবে।

বস্ত্রের মোহে তুমি আকৃষ্ট হইয়াছ ইভ—যে স্ত্রীর তুমি এত স্তবগান করিলে, সেই শারীর-স্ত্রী বহুলাংশে বস্ত্রলে হইতে সঞ্জাত। এই মোহবশে তুমি স্বেচ্ছায় মর্ত্যবা স্বীকার করিলে; এমন একদিন আসিবে যখন মর্ত্যলোকে নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার আশায় তোমা দুহিতারা সেই বস্ত্রকেই একমাত্র বান্ধব জানিয়া তাহা অঞ্চলতলে আশ্রয় অন্বেষণ করিবে—কেহ-বা সে অঞ্চ নিজের গ্রীবায় সংযুক্ত করিবে, কেহ-বা সেই অঞ্চলে অগ্নি সংযোগ করিবে।

আমার আর কিছু বলিবার নাই। আমি‌ই হতভাগ্য যাহা রচনায় উদ্যোগী হইয়াছিলাম তাহা [illegible] না আমিও আর নূতনতর কোন সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত [illegible]—কী হইবে বারংবার এই মিথ্যা বিড়ম্বনায়? [illegible] শে সৃষ্টি, এই পরিচয় লইয়া তোমরাই বিরাজ কর।

জিহোভা অন্তর্হিত হইলেন।

আদম কহিল, প্রভু ক্ষোভে আমা[illegible] ত্যাগ করিয় গেলেন।

ইভ কহিল, কচু। আমরা তাঁহার সমান জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিব, এইজন্যই স্বর্গে আর আমাদের স্থান নাই। নিজের ভয়ে তিনি আমাদের নির্বাসিত করিলেন।

আদম ও ইভের সম্মুখে অকস্মাৎ গভীর গহ্বর প্রকাশিত হইল। তাহার মধ্যে দীর্ঘ সরণি—মর্ত্যলোক পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। অস্তায়মান সূর্যের রক্তবর্ণ কিরণে তাহার উপরের কয়েকটি সোপান আলোকিত, তাহার নিম্নে সোপানশ্রেণী ক্রমশ ছায়াচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। তলদেশে গভীর অন্ধকার।

আদম ইভের হাত ধরিল, কহিল, চল।

পলাশডাঙায় বিপ্লব

দীপক চৌধুরী

শশধরবাবু প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে হাওড়া স্টেশনে পৌছলেন। টিকিট তাঁর আগেই কেনা ছিল। বার্থও রিজার্ভ করা আছে। সঙ্গে মালপত্র কিছু নেই। শুধু একটা [illegible]বোল ইঞ্চি মাপের অ্যাটাচি হাতে ঝুলিয়ে নি[illegible]তিনি। ষাট বছরের মত বয়স বটে, কিন্তু এখ[illegible] বুড়ো বলা যায় না। হাতের কব্জিতে প্রবল [illegible]র্থ্য রয়েছে। অ্যাটাচিটা এত শক্ত করে ধরে রেখেছেন তিনি যে, কুলীরা পর্যন্ত টান মেরে তাঁর হাত থেকে ছি[illegible]তে পারে নি। ট্যাক্সি থেকে নামবার পরেই একটা [illegible] খপ করে অ্যাটাচিটা ধরে ফেলে বলেছিল, বুঢ়াব[illegible]। [illegible]টা হামি নিয়ে যাচ্ছি। দিন।—এই বলে সে বেশ [illegible]জারেই টান মেরেছিল। কিন্তু ছিনিয়ে নিতে সে পার[illegible] না। শশধরবাবু মৃদুভাবে হাসলেন একটু। তারপর ছুটে চললেন পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে। ফটকের মুখে এসে পৌছবার আগে অন্য একজন কুলী অ্যাটাচিটায় বার বার দুবার টান মেরে বলে উঠল, বুঢ়াবাবু, মালটা ছেড়ে দিন। এবারও শশধরবাবু বললেন না কিছু, শুধু একটু হাসলেন। প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ঢুকে পড়লেন তিনি। হাতের কব্জিতে অত বেশী জোর না থাকলে শশধরবাবু ভারতরাষ্ট্রের ট্রেনে চেপে যাতায়াত করতেন না। করলেও, রাত্রির ট্রেনে উঠে বসতেন না তিনি। আজ তো পুরো রাত্রিটাই তাঁকে ট্রেনের কামরায় বসে থাকতে হবে। ভোরবেলা পলাশডাঙায় নেমে যাবেন তিনি।

প্রথম শ্রেণীর প্যাসেঞ্জারদের নাম-লেখা লিস্ট হাতে নিয়ে টিকিট-চেকার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। শশধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে, আমার কামরাটা কোন্ দিকে হবে মশাই ?

কী নাম আপনার ?

শশধর মুখার্জি।

ও, এই তো সামনেই।

শশধরবাবু দেখলেন, কামরার গায়ে তাঁর নাম-লেখা কাগজখানা লাগানো রয়েছে। তাঁর নামের তলায় আরও একজনের নাম লেখা আছে। বাইরে থেকেই উঁকি দিয়ে তিনি দেখলেন, কামরায় কেউ নেই। শশধরবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, অন্য প্যাসেঞ্জারটি বুঝি যাচ্ছেন না ? টিকিট ক্যান্সেল করেছেন নাকি ?

টিকিট-চেকার বললেন, এখনও সাত-আট মিনিট সময় রয়েছে, এর মধ্যেই এসে পড়বেন।

কে মশাই এই এস. কে. মিত্র ? চেনেন নাকি ?

আজ্ঞে না।

বোধ হয় বুড়ো মানুষই হবেন। কী বলেন ?

তা তো বলতে পারব না। আপনি উঠে পড়ুন। দেখি সাব্, আপনার টিকিটটা!

বুক-পকেট থেকে টিকিটখানা বার করে শশধরবাবু বললেন, মনে হচ্ছে, ট্রেনে আজ ভিড় নেই। ব্যাঙ্ক-স্ট্রাইকের জন্যে মানুষের চলাফেরা করতে অসুবিধে হচ্ছে। আপনার কী মনে হয় ?

মিটে যাবে।

না না, আমি জিজ্ঞেস করছি মিস্টার এল. কে. মিত্র বোধ হয় আর এলেন না। সহযাত্রী আর কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না ?

আর কেউ নেই। সবাই এসে গেছেন।—এই বলে টিকিট-চেকারটি তাঁর লিস্টের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পুনরায় বললেন, আপনি এবার উঠে পড়ুন। একলা ট্র্যাভেল করতে ভয় পাচ্ছেন নাকি ?

কামরায় উঠে পড়ে শশধরবাবু জবাব দিলেন, ষাট পেরিয়ে গেছি বটে, কিন্তু ভয়-টয় আমার নেই। আমি হচ্ছি গিয়ে মশাই, বিপ্লবী যুগের শশধর মুখার্জি। যতীনদার নাম শুনেছেন তো ?

কোন্ যতীনদা ?

আরে মশাই, বাঘা যতীন—যাঁর নামে রিক্রিউটীরা

যাদবপুরে একটা কলোনি খুলেছে। সেদিন ট্রামে বসে দেখলুম, লোয়ার সারকুলার রোডের ওপর মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা তাঁর নামে একটা হস্টেলও খুলেছে। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে: বাঘা যতীন ছাত্রাবাস। এবার চিনলেন তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—টিকিট-চেকারটি সরে যাচ্ছিলেন।

শশধরবাবু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ধারে-কাছে আপনাদের একজন মিস্ত্রী নেই?

মিস্ত্রী কেন?

জানলা-দরজাগুলো ভেতর থেকে ঠিকমত বন্ধ করা যায় কি না একবার দেখে দিয়ে যেত।

এই যে, এসে গেছেন বোধ হয়।—ঘুরে দাঁড়িয়ে টিকিট-চেকার জিজ্ঞাসা করলেন, কী নাম আপনার?

এস. কে. মিত্র।—ভদ্রলোকটির সঙ্গেও মালপত্র কিছু ছিল না। শুধু একটা বিশ ইঞ্চি মাপের সুটকেস তিনি হাতে করে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছেন। বয়স বেশী নয়। শশধরবাবু মনে মনে হিসেব করে দেখলেন, হ্যাঁ, পঁচিশ কি ছাব্বিশের মতই হবে।

কামরায় উঠে মিস্টার মিত্র একটি কথাও বললেন না। হাতঘড়িতে সময় দেখলেন শুধু। তারপর সুটকেসটা গদির ওপর বালিশের মত করে ফেলে রাখলেন। সঙ্গে যখন বিছানা-বালিশ নেই, তখন যে তিনি সুটকেসটার ওপর মাথা রেখে শুয়ে পড়বেন সে সম্বন্ধে শশধরবাবুর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

একটু বাদেই গাড়ি ছাড়ল। শশধরবাবু উবু হয়ে বসে বেঞ্চির তলায় টর্চ লাইট ফেললেন। গাড়িতে আলোর জোর ছিল খুব। ভারতরাষ্ট্রের নতুন কারখানা থেকে এই সবে কামরাটা তৈরী হয়ে এসেছে। সব-কিছু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। শশধরবাবু তবুও কামরার চতুর্দিকে অন্ধকার দেখতে পেলেন। ক্ষয়ে-যাওয়া ব্যাটারির বুকে সুইচ টিপে টিপে তিনি টর্চের আলো জ্বালতে লাগলেন। না, শেষ পর্যন্ত কামরার কোথাও তিনি সন্দেহজনক কোনও কিছুই দেখতে পেলেন না। কিন্তু স্নানঘরটায় কেউ যদি লুকিয়ে থাকে? অসম্ভব নয়। শশধরবাবু টর্চ লাইট জ্বালিয়ে স্নানঘরে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

গম্ভীরপ্রকৃতির মিস্টার মিত্র এবার একটু বিস্মিত বোধ করলেন। স্নানঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে, অথচ ভদ্রলোকটি কেন টর্চ লাইট জ্বাললেন? মনোযোগ দিয়ে বুড়োমানুষটির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করতে লাগলেন তিনি। তা ছাড়া অন্য একটা ব্যাপারও তাঁর চোখে পড়ল। ভদ্রলোকটি সেই থেকে অ্যাটাচিটা এক মুহূর্তের জন্যেও হাতছাড়া করেন নি। একটু আগে তিনি স্নানঘরে ঢুকলেন, তাও অ্যাটাচিটা হাতে নিয়েই ঢুকলেন।

শশধরবাবু যখন ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন ট্রেনটা প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসেছে। গতিও খানিকটা বেড়েছে। শশধরবাবু এসে [illegible] দিতে বসলেন। দরজা দুটো ভেতর থেকে তি[illegible] করে দিয়েছিলেন। এবার কী করা যায়? যুবকটি[illegible] পরিচয় জানা দরকার। আলাপ-আলোচনা শুরু করা[illegible] নাকি? শুয়ে পড়বার জন্যে তিনি প্রস্তুত হয়ে আসে[illegible]। ঘুমবার তো কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। [illegible]তবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে শশধরবাবু কখনও ট্রেনে [illegible] ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কলকাতা থেকে পলাশডাঙায় আসেন নি। মেরুদণ্ড খাড়া রেখে সোজা হয়ে বসে থাকেন। আর আজ তো আরও বেশী সতর্ক থাকতে হবে। দেশময় গণ্ডগোল। সকাল থেকে ব্যাঙ্কে ধর্মঘট শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রই হোক আর ব্যাঙ্কই হোক, কারও উপরেই যেন দু-দশ মিনিটের বেশী নির্ভর করা যাচ্ছে না। সারা দেশ জুড়ে যখন এই রকমের অরাজকতা চলেছে তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন কার ভরসায়? যুবকটিই বা ঘুমবার চেষ্টা করছেন কই? জানলার দিকে মুখটা ঝুঁকিয়ে দিয়ে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন। ইচ্ছে করলে শশধরবাবুও তাঁর নিজের দিকের জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। চেয়ে রইলেন মিস্টার মিত্রের দিকে। পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া, হাওড়া থেকে পলাশডাঙার মধ্যে যে দেখবার মত কোনও কিছু আছে তা তিনি জানেন না। এইবার নিয়ে হয়তো এক শো কুড়িবার তিনি যাওয়া-আসা করলেন। বছর তিরিশ আগে লাইনের দু ধারে গাছ-পাতা কিছু ছিল, বিস্তীর্ণ মাঠের বুকে মসৃণতার ঢেউ বইতেও দেখা যেত। কিন্তু এখন? হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এলেই তো ক্ষতের পরিধি বাড়তে থাকে।

প্রকৃতির ফাটা বুক দিয়ে তিন শিফ্‌টের ধোঁয়া বেরোয়—লোহা-লক্কড়ের আর্তনাদ ট্রেনে বসেও শোনা যায়। মিস্টার মিত্র তবে কী দেখছেন ?

পূর্ণিমার চাঁদ। হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানির কারখানাটার ফাঁক দিয়ে পুরো চাঁদটা তিনি দেখতে পেলেন না। গোটা চারেক চিমনির মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। মিস্টার মিত্র এবার জানলার ওপর মুখ ঠেকিয়ে বসলেন।

সবই লক্ষ্য করছিলেন শশধর মুখার্জি। তিনি বুঝতে পেরেছেন ভদ্রলোকটির মনের অবস্থা ভাল নয়। আপন মন নির্জনতা খুঁজছে। হাতঘড়িতে সময় দেখলেন শশধরবাবু। প্রায় এক ঘণ্টা আগে গাড়িটা হাওড়া স্টেশন ছেড়ে এসেছে। এবার তিনি কোলের ওপর থেকে অ্যাটাচিটা নামিয়ে রাখলেন গদির ওপর। গদিটার দিকে দৃষ্টি পড়ল তাঁর। কষ্ট পেলেন শশধরবাবু। গদিটার গায়ে হাত বুলতে বুলতে তিনি বলে উঠলেন, আহা, এমন করে বুকের ওপর ছুরি টানল কে ? একেবারে দু ভাগ করে দিয়েছে !

সহসা মুখ ঘুরিয়ে ফেললেন মিস্টার মিত্র। জিজ্ঞাসা করলেন, কার বুকে কে ছুরি মারল ?

হাত বুলতে বুলতে শশধরবাবু জবাব দিলেন, এই দেখুন, নতুন গদিটা দু টুকরো হয়ে গেছে। আমরা শুধু গভর্মেণ্টকে দোষ দিই, নিজেদের দোষ দেখি না। স্নান-ঘরে গিয়ে দেখে আসুন, জানলার কাচটা যেন কে ভেঙে দিয়েছে। এই লাইনের খবর রাখেন তো ?

কী খবর ?

চুরি-ডাকাতি তো হামেশাই হচ্ছে। কিন্তু গত সপ্তাহে যা ঘটেছে তা একেবারে নভেলের মত। একটা উপন্যাস লিখে ফেলা যায় মশাই।

কী রকম ? শুনি না।—কৌতূহল দেখালেন মিস্টার মিত্র।

শশধরবাবু অ্যাটাচিটা আবার কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলতে লাগলেন, বংশীপুরের ভূতপূর্ব জমিদার অন্নদা চাটুজ্জে এই ট্রেনেই দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। পুরো কামরাটাই ভাড়া করেছিলেন তিনি। সঙ্গে তাঁর মেয়েও ছিল। হৈমবতী তার নাম। কলকাতার কোন্ এক সরকারী কলেজে মেয়েটি বি. এ. পড়ত। সামাজিক ব্যবস্থা সব বদলে গেছে মশাই। নইলে বংশীপুরের জমিদারদের মেয়ে কখনও বি. এ. পড়ত না। পড়লেও হস্টেলে সে থাকত না।—হৈম হস্টেলে থাকত। এই বলে দম নেওয়ার জন্যে শশধরবাবু থেমে গেলেন।

মিস্টার মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, হস্টেলে থাকলে, ক্ষতি কী ? জমিদারের মেয়ে হলে কি কলেজে পড়তে পারে না ?

কেন পারবে না ? আলবত পারবে।—অ্যাটাচির ওপর মৃদুভাবে একটা ঘুষি মেরে শশধর মুখার্জি পুনরায় বলতে লাগলেন, আমার বয়স যদিও ষাট, কিন্তু আমি নিজে মশাই খুব আধুনিক। কলকাতার চতুর্দিকে যত রকমের প্রগতি দেখে এলাম সবই আমার ভাল লাগল। তা হলে দেখুন।—শশধরবাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে পঞ্জিকার মত মোটা সাইজের একটা মাসিক কাগজ বার করে বললেন, সিনেমার কাগজ মশাই। মেয়ের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। আমাদের জায়গাটা খুব ছোট, মহকুমা-শহর! দেড় শো দু শো কাগজ সেখানেও মাসে মাসে পৌঁছয়। তাতে মশাই হাত দেওয়া যায় না। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। এই মাসের কাগজটা আমি পাই নি। তাই কলকাতা থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন, এই বয়সেও আমি প্রগতিশীল ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু আপনি তো হৈমবতীর কথা বলছিলেন—

অন্নদা চাটুজ্জে কী করে যেন খবর পেলেন, হৈম শুধু বি. এ. পড়ছিল না, প্রেমেও পড়েছিল। মাঠে-ময়দানে সিনেমা-হাউসে লুকিয়ে লুকিয়ে একটি ছেলের সঙ্গে দেখা করে। কী সাঙ্ঘাতিক !

সাঙ্ঘাতিক কেন ?

না না, আমি হলে সাঙ্ঘাতিক মনে করতুম না। অন্নদাবাবু খবর নিয়ে জানলেন, ছেলেটি কম মাইনের চাকরি করে। তা ছাড়া আরও একটা অসুবিধে ঘটে গেল। ছেলেটি ব্রাহ্মণ নয়।

তাতে কী ?—প্রশ্ন করলেন মিস্টার মিত্র।

না না, আমার কিছু নয়। নিজে আমি জাত মানি নে। কিন্তু অন্নদা চাটুজ্জে মানেন। আমি মশাই রিভলিউশনারি, কেউ সমাজের বিরুদ্ধে গল্প উপন্যাস এবং

কবিতা লিখলে আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ি। চাকরি-বাকরি কিছু করি নে বলে সময় নষ্ট করতে আমার ভালই লাগে। কিন্তু বংশীপুরের অন্নদাবাবু ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ। গত সপ্তাহে তিনি নিজেই কলকাতা এসেছিলেন। কলেজ এবং হস্টেল থেকে হৈমবতীর নাম কাটিয়ে দিলেন। সারাটা দিন মেয়েকে চোখে চোখে রাখলেন তিনি। নতুন আইন অনুসারে হৈম সাবালিকা। অন্নদাবাবু সন্দেহ করেছিলেন, হৈম পালিয়ে যেতে পারে। বংশীপুর থেকে তিনি একজন হিন্দুস্থানী দারওয়ান নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক সময় মেয়েদের যুক্তি দিয়ে কিছুই বোঝানো যায় না। এমন কি, পুব দিকে যে সূর্য ওঠে তাও তারা স্বীকার করে না। তখন তাদের ভয় দেখানো ছাড়া আর কী করা যায়? অন্নদা চাটুজ্জে রাত্রির ট্রেনেই উঠলেন। হিন্দুস্থানী দারওয়ানটা দরজার সামনে বিছানা পেতে শুয়ে রইল। সঙ্গে করে সে একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে এসেছিল। বিছানার পাশেই লাঠিটা রেখেছিল সে। অন্নদাবাবুর বালিশের তলায় পিস্তলও একটা ছিল। মোটের উপর তিনি সশস্ত্র হয়েই কলকাতা এসেছিলেন। তার পর মাঝরাত্রির দিকে ঘটনাটা ঘটল। মশাই, সিনেমার গল্পের মত আজগুবি মনে হবে। কিন্তু হৈম যা করল তা তো আজগুবি নয়, সত্যি সত্যিই সে ট্রেনের কামরা থেকে পালিয়ে গেল।

কী করে পালাল?—মিস্টার মিত্র ঝুঁকে বসলেন শশধরবাবুর দিকে।

বাথরুমের জানলা ভেঙে।

অ্যাঁ!

আজ্ঞে হ্যাঁ, মশাই। একটা কথাও আমি বানিয়ে বলছি না।—সিনেমার কাগজখানা পকেটে রেখে শশধরবাবুই বলতে লাগলেন, সমাজবিজ্ঞান পড়বার জন্যে আলিপুরের লাইব্রেরিতে যাওয়ার দরকার কী, সিনেমার কাগজখানা নিয়মিত পড়লেই সব জানা যায়। ভোরের দিকে যখন ঘুম ভাঙল অন্নদাবাবু দেখলেন, দরজার সঙ্গে বুক ঠেকিয়ে দারওয়ানটা তখনও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হয়ে আছে। হৈমবতীকে দেখতে পেলেন না তিনি। পরীক্ষা করে দেখলেন দুটো দরজাই ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে। রাত দশটার পরে দারওয়ানটাকে তিনি শোবার হুকুম দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু ঘুমবার হুকুম তাকে তিনি দেন নি। যাই হোক, অন্নদাবাবু উবু হয়ে বসে বেঞ্চির তলায় উঁকি দিয়ে দেখলেন। না, হৈম সেখানে নেই। রাগের মাথায় বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা টেনে বার করতে গিয়ে আরও বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন তিনি। পিস্তলের পাশে মনিব্যাগটাও ছিল। এখন সেটা সেখানে নেই। ট্রেনের টিকিটগুলো শুধু পড়ে ছিল। ব্যাঙ্ক-স্ট্রাইকের খবর তিনি জানতেন। সেইজন্যে অন্নদাবাবু সঙ্গে করে হাজার চারেক টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন দেশে। সব টাকাট[illegible] মনিব্যাগে ছিল। তার পর যখন স্নানঘরে গিয়ে [illegible] তখন তো সবই দেখতে পেলেন তিনি। জা[illegible]টা কাচখানাই ভাঙা।

কী অদ্ভুত মেয়ে!—ভস করে দীর্ঘনি[illegible] ফেললেন মিস্টার মিত্র: এত বেশী তেজ বাঙালী মে[illegible] মধ্যে বড় বেশী দেখা যায় না। বোধ হয় ছেলে[illegible]ঙ্গে হৈমবতীর বিয়ে হয়ে গেছে?

খবর পাই নি। তবে অন্নদাবাবু পুলিসে খবর দিয়েছেন।

কেন? আপনি তো বললেন মেয়েটি সাবালিকা?

চুরির দায়ে হৈমকে তিনি অভিযুক্ত করেছেন।

কাজটা অন্নদাবাবু ভাল করেন নি। আপনি হলে কী করতেন?

আমার কথা ছেড়ে দিন মশাই। সামন্তযুগের গোঁড়ামি আমার নেই। আপনাকে তো আগেই [illegible]লেছি, আধুনিক প্রগতির প্রতি আমার ষোল আনা শ্রদ্ধা আছে। শ্রদ্ধা না থাকলে মাসিকপত্রটা নিয়মিত পড়ি কেন?

বেশ, বেশ।—এই বলে মিস্টার মিত্র ঘড়িতে সময় দেখলেন: সর্বনাশ! রাত একটা বেজে গেছে যে! শুয়ে পড়া যাক। আলোটা নিবিয়ে দিই?

সহসা সজাগ হয়ে উঠলেন শশধর মুখার্জি। লোকটিকে এখনও তিনি চিনতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, গল্প করতে করতে রাতটা কেটে যাবে। অন্ধকার কামরায় তিনি রাত জাগতে পারবেন না। তাই তিনি বললেন, অন্ধকারে আমার মশাই ঘুম আসে না।

আমার ঠিক উলটো।—মিস্টার মিত্র জামাটা খুলে ফেললেন। শশধরবাবু মিস্টার মিত্রের চওড়া বুকের দিকে

চেয়ে ভয় পেলেন একটু। এত ভাল স্বাস্থ্য কোন শিক্ষিত বাঙালীকে তিনি বহন করতে দেখেন নি। গদির ওপর বসেই শশধরবাবু কায়দা করে কোঁচার প্রান্তটা পায়ের ফাঁক দিয়ে পেছন দিকে টেনে আনলেন। তার পর ধীরে ধীরে গুঁজে দিতে লাগলেন তিনি। রাত্রির ট্রেনে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। সতর্ক থাকা ভাল। অন্নদা চাটুজ্জের কথা সারাজীবনেও ভুলবেন না তিনি। ঘুমিয়ে পড়বার ভুল কি অন্নদাবাবু আর কোনদিন শুধরে নিতে পারবেন? শুধু হৈমবতীই গেল না, চার হাজার টাকাও গেল [illegible]

[illegible] মিত্র হঠাৎ উঠে পড়লেন। শশধরবাবু তাড়াতা[illegible] হাতের পাঞ্জা শক্ত করে ফেললেন। আক্রমণের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন তিনি। এবার বোধ হয় মিস্টার মিত্রের মুখোশটা খুলে পড়বে। জিজ্ঞাসা করলেন শশধরবাবু, কী ব্যাপার?

বাথরুমে যাচ্ছি।—এই বলে মৃদুভাবে হাসতে হাসতে মিস্টার মিত্র সত্যি সত্যি স্নানঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন শশধর মুখার্জি। অ্যাটাচি কেসের ওপর হাতের পাঞ্জাটা আপাততঃ ফেলে রাখতে ভয় করল না তাঁর। তিনি চেয়ে রইলেন স্নানঘরের দিকে। আলো দেখা যাচ্ছে। কামরার কোথাও আর এক বিন্দু অন্ধকার নেই।

একটু বাদেই মিস্টার মিত্র স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সুইচের দিকে হাতটা এগিয়ে ধরে বললেন, আলোটা তা হলে নিবিয়ে দেওয়া যাক। ভোর হতে আর মাত্র ঘণ্টা তিন বাকি।

মাত্র তিন ঘণ্টার জন্যে আলোটা আর নিবিয়ে দিয়ে কী হবে? অন্ধকারে আমার ঘুম আসে না। আপনি কতদূর যাবেন?

নিজের জায়গায় এসে বসে পড়লেন মিস্টার মিত্র। তার পর বললেন, পলাশডাঙায় নেমে যাব আমি।

পলাশডাঙা? সে তো মশাই আমাদের একটা ছোট্ট গঞ্জমা-শহর, সেখানে কেন? মানে, ব্যবসাবাণিজ্য বিশেষ কিছু হয় না ওখানে। সরকারী কাজে যাচ্ছেন বুঝি?

আজ্ঞে না। আমার নিজের একটু ব্যক্তিগত ব্যাপারে সেখানে যাচ্ছি।—এই বলে মিস্টার মিত্র শুয়ে পড়লেন গদির ওপর।

সব-কিছুই লক্ষ্য করছিলেন শশধর মুখার্জি। চোখের পাতা মুহূর্তের জন্যেও বন্ধ করলেন না। বসে বসে ভদ্রলোকটির সুগঠিত মাংসপেশী দেখতে লাগলেন। দেখতে ভাল লাগছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, কলকাতা কিংবা পলাশডাঙার আকাশেও এমন বিস্তৃতি তাঁর চোখে পড়ে নি। চওড়া বুকটির তলার খবর জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শশধরবাবু। অনেকক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মশাই কি বিবাহিত?

আজ্ঞে না।

বিয়ে করেন নি কেন? আজকালকার ছেলেরা সহজে বিয়ে করতে চায় না। সমাজের কথাটা কি ভেবে দেখেছেন? সবাই যদি বলে, হাজার টাকা মাইনে না হলে বিয়ে করব না, তা হলে মেয়েরা সব কী করবে? এ সম্বন্ধে আপনার ব্যক্তিগত মত কী মিস্টার মিত্র?

আমি বোধ হয় দু-পাঁচ দিনের মধ্যে বিয়ে করে ফেলব।

বাঃ, ভেরি গুড! টাকার সঙ্গে বিয়ের কী সম্পর্ক? ভালভাবে খেয়ে পরে থাকতে পারলেই হল। বিয়ের জন্যে প্রথম চাই স্বাস্থ্য—

মিস্টার মিত্র ফস করে উঠে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন দেখছেন?—নিঃশ্বাস টেনে বুকটা তিনি ফুলিয়ে দিলেন বেশ খানিকটা।

খুব ভাল।—শশধরবাবু পেছন দিকে একটু সরে বসলেন।

পাঞ্জা লড়বেন?

কী যে বলেন মশাই! ষাট পেরিয়ে গেছি যে।—গদির ওপর পা তুলে শক্ত হয়ে বসে রইলেন শশধরবাবু।

আকাশ সাদা হয়ে এসেছে। শশধরবাবু ঘড়িতে সময় দেখলেন। ভয় করবার আর কারণ নেই। আধ ঘণ্টার মধ্যে পলাশডাঙায় পৌঁছে যাবে ট্রেনটা। চোর-ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা পেলেন তিনি। শশধরবাবু বললেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুব খুশী হয়েছি। রাতটা বেশ ভালই কাটল। পলাশডাঙায় পৌঁছতে আর পনরো মিনিট বাকি।

মাত্র?

মাত্র।

তা হলে জামাটা পরে ফেলি।—মিস্টার মিত্র জামা গায়ে দিলেন। দিয়ে তিনিই জিজ্ঞাসা করলেন, খুব ভয় পেয়েছিলেন। না?

ভয়? ভয় পাব কেন? বাঘা যতীনের নাম শুনেছেন?

শুনেছি।

এক সময় আমি তাঁর বিপ্লবী দলের মেম্বার ছিলুম।

শশধরবাবুর কথা শুনে ভদ্রলোকটি হেসে উঠলেন। বললেন না কিছুই।

শশধরবাবু তাই জিজ্ঞাসা করলেন, হাসছেন যে?

আপনি ভেবেছিলেন আমি নিশ্চয়ই চোর-ডাকাত কেউ হব।

ছি ছি! তা কেন ভাবতে যাব? মশায়ের কী করা হয়?

ব্যাঙ্কে চাকরি করি।

দিশী ব্যাঙ্কে না কি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আমার হাজার দশেক নিয়ে ওরা দরজা বন্ধ করে দিল। গত রাত্রে আপনি আর কত টাকাই বা নিতে পারতেন আমার?

আমি বিলিতী ব্যাঙ্কে চাকরি করি।

তাই না কি? তা হলে তো গ্রেড খুব বেশী?

আজ্ঞে হ্যাঁ। এখনই চার শো পঁচিশ করে পাচ্ছি।

ভেরি গুড। এবার পলাশডাঙা স্টেশন।—শশধরবাবু দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। গাড়ির গতি ক্রমশই কমে আসছিল। মিস্টার মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার অ্যাটাচিতে কী আছে?

টাকা—প্রায় হাজার পাঁচেক হবে। ব্যাঙ্ক-স্ট্রাইক শুরু হল। পরশু দিন আমার মেয়ের বিয়ে। কোথায় উঠবেন? পলাশডাঙায় দিন দুই থাকবেন তো?

বোধ হয় থাকব। আপনার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?—মিস্টার মিত্রের গলার স্বর যেন ভাঙা-ভাঙা।

শশধরবাবু নামটা বললেন তাঁর। কী মনে করে পরিচয়টা বড় করবার জন্যেই বোধ হয় তিনি বলতে লাগলেন, আমার মেয়ে চিত্রাও কলকাতায় বি. এ. পড়ত মশাই। হস্টেলে থাকত। কলেজের এক বন্ধুর সঙ্গে চলে যেত বালিগঞ্জে। সেখানে ওর বন্ধুর কোন্ এক দাদার সঙ্গে পরিচয় হয়। দাদাটি তার বোনের থ্রু দিয়ে মশাই চিত্রার কাছে চিঠিপত্র পাঠাত। গরমের বন্ধের সময় মেয়ে এল পলাশডাঙায়। দু-একখানা চিঠি চিত্রার মায়ের হাতে পড়ে। আমি মশাই জমিদার নই, পিস্তল কিংবা দারওয়ান আমার নেই। গরমের বন্ধের পরে মেয়েকে আর কলকাতা ফিরে যেতে দিই নি। পলাশ-ডাঙারই একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে ওর আমি পাকা করে ফেলেছি। এই যে এসে গেছি। নমস্কার।

নমস্কার।—হাত তুলে নমস্কার করলেন মিস্টার মিত্রও। প্ল্যাটফর্মে নেমে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, বালিগঞ্জের ছেলেটির সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন না কেন?

সে কী করে হয়? চিত্রার মায়ের কাছে শুনলাম ছেলেটি ব্রাহ্মণ নয়।

কিন্তু আপনি তো প্রগতিশীল বৃদ্ধ? আধুনিকতা আপনি পছন্দ করেন।

সে তো মশাই সিনেমার কাগজে যখন ছেলেছোকরাদের লেখা গল্প পড়ি তখন। অন্নদা চাটুজ্জের গল্পটা এই সংখ্যায় আছে। নমস্কার।—এই বলে শশধরবাবু হনহন করে হেঁটে চলে গেলেন বাইরে বেরুবার ফটকের দিকে।

মিস্টার মিত্রও গেলেন। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি তিনি হাঁটতে পারলেন না। পলাশডাঙার কোন্ ঠিকানায় যে গিয়ে তিনি উঠবেন তা তাঁর জানা নেই।

দু দিন পরে পলাশডাঙা মহকুমা-শহরটিতে হৈ-হল্লা পড়ে গেল। শশধরবাবুর মেয়ে চিত্রা মুখার্জিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বিগত দু-তিন পুরুষের মধ্যে কেউ কখনও এ অঞ্চলে এমন ঘটনা ঘটতে দেখে নি। সিনেমার কাগজে লেখা গল্প যে সত্যি সত্যি ঘটতে পারে তেমন বিশ্বাস কি শশধরবাবুরও ছিল? শশধরবাবুর কেন, এ শহরের কারুরই ছিল না। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী সবার মুখেই ছি-ছি আওয়াজ উঠেছে। খবরটা রটেছে সকালবেলাতেই। কেউ কোন কাজ করতে পারছে না। উকিল-মোক্তারদের দপ্তর ফাঁকা, ইস্কুলের দরজা বন্ধ। ছেলেমেয়েরা হৈ-হল্লার আওয়াজ

…নে বই বন্ধ করে উঠে পড়েছে। কেউ আজ ইস্কুলে …বে না। সবার মুখেই ধর্মঘটের সুর। এযাবৎকাল …জনৈতিক কারণে ছেলেরা ধর্মঘট করে এসেছে। …াজকের কারণ সামাজিক। অফিস-আদালতের কী …বস্থা হবে এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মুন্সেফ দুজন …ড়ি হাতে নিয়ে শশধরবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হয়ে …গছেন। এস. ডি. ও. সাহেব পাজামা ফেলে ট্রাউজার …রেছেন। তিনিও যাবেন। পুলিস-সাহেব খাকী হাফ-…্যান্টটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী এসে তাড়াতাড়ি …দরা… নতুন একটা ইস্ত্রি-করা হাফপ্যান্ট বার করে দিলেন। …স্ত্রীর ব্যস্ততা পুলিস-সাহেবের চেয়ে বেশী। …ানার বড় দারোগা 'ডায়ারি' খাতাটা খুলে বসে রয়েছেন। …পেক্ষা করছেন শশধরবাবুর জন্যে। তিনি এসে এজাহার …া দিলে বড় দারোগা তদন্তের কাজ শুরু করতে পারছেন …া। এর মধ্যেই তিনি সাদা-কাপড়-পরা একজন গুপ্তচরকে …লাশডাঙা রেল-স্টেশনে মোতায়েন করে দিয়েছেন। …চত্রাকে খুঁজে বার করতে আর ক মিনিটই বা লাগবে! …াহা, মেয়েটা শুধু কচি নয়, দেখতেও সুন্দরী। বড় …ারোগা টাকের ওপর হাত বুলতে বুলতে ক্রমশই ক্ষিপ্ত …য়ে উঠেছিলেন। কার সঙ্গে পালাল চিত্রা মুখার্জি? …লোকটা নিশ্চয়ই গুণ্ডা। পলাশডাঙায় গুণ্ডা কেউ নেই। …বোধ হয় কলকাতা থেকে এসেছে। তাঁর হাত চুলকোচ্ছে। গুণ্ডাদের কী করে শাস্তি দিতে হয় তা তিনি জানেন। …লবণ-সত্যাগ্রহের সময় তিনি তো সমুদ্রের ধারেই ছিলেন। …শাস্তি দেওয়ার একাধিক কৌশল তিনি সেই সময়েই …শিখে রেখেছেন। রাষ্ট্র-বিদ্রোহী আর সমাজ-বিদ্রোহীর …মধ্যে তফাত কী?—প্রশ্নটা জেগে উঠল তাঁর মনে।

বেলা আটটা না বাজতেই শশধর মুখার্জির বাড়িতে ভিড় জমে গেল। বাগানওয়ালা বাড়ি। ফটকের সামনে …হবতখানা তৈরী হয়েছে। কিন্তু বাজিয়েরা সব বসে …সে সময় নষ্ট করছে। সানাইটা পড়ে রয়েছে কাড়া-…াকাড়ার পাশে। বাজিয়েরা জানে শশধরবাবুর মেয়ে …ভোররাত্রেই পালিয়ে গেছে।

চাতালের ওপর বসে ছিলেন শশধরবাবু। বরপক্ষের …ুরব্বী একজন সেই সকাল থেকে এসে বসে রয়েছেন। …তিনি শুধু বলছেন, থানায় গিয়ে ডায়ারি করিয়ে আসুন।

অন্দরমহলের সুর ভিন্ন রকমের। চিত্রার মা শশধর-বাবুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, বরপক্ষের সত্যেনবাবু এসেছেন কেন? পণের দু হাজার টাকা কি দিয়ে দিলে নাকি?

না। পকেটে রেখেছি। ভোরবেলাতেই দেওয়ার কথা ছিল। সত্যেনবাবু বলছেন থানায় গিয়ে ডায়ারি করাতে।

না। থানা-পুলিসের দরকার নেই। মেয়ে আমাদের। আমরা যা ভাল বুঝব তাই করব। ওঁরা তো এসেছেন মজা দেখতে। এইজন্যে তুমিও খানিকটা দায়ী।

আমি!—বিস্ময় বোধ করলেন শশধরবাবু।

হ্যাঁ, তুমি। গাদা-গাদা সিনেমার কাগজ কিনে আনবে—নাও, এবার ঠেলা সামলাও। পুলিস-সাহেবকে বলে দাও, আমরা ডায়ারি করাব না।

গুণ্ডার হাতে মেয়েকে ছেড়ে দেবে?

মেয়ে যদি ইচ্ছে করে যায় তা হলে গুণ্ডার দোষ কী? তা ছাড়া চিত্রা তো আর নাবালিকা নয়। গায়ের জোরে কোনও কিছু করতে যেয়ো না।

তার পর দু হাজার টাকা পকেটে নিয়ে শশধরবাবু এসে বসে রয়েছেন চাতালের ওপর। বসে বসে ভিড় দেখছেন তিনি।

আটটার পরে মিস্টার এস. কে. মিত্র ডাক-বাংলো থেকে বেরিয়ে পড়লেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেই বেরুলেন। সামনেই একটা সাইকেল-রিকৃশা পেয়ে গেলেন। তাতেই উঠে বসলেন তিনি। দরদস্তুর কিছু করলেন না। পূর্ব-বঙ্গের রিফিউজীরাই পলাশডাঙায় রিকৃশা চালায়। ছ আনা কি আট আনা পয়সা বেশী দিলে তাঁর কিছু ক্ষতি হবে না।

রিকৃশায় উঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, শশধর মুখার্জির বাড়ি চেন?

চিনি। মুখ ঘুরিয়ে সওয়ারীকে একবার দেখে নিল সে। তার পর হাসতে হাসতে রিকৃশাওয়ালা বলল, ভোররাত্রি থেকে শশধরবাবুর মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আজ তার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল।

আজই তার বিয়ে হবে।—বললেন মিস্টার মিত্র।

কার সঙ্গে বাবু?

যাকে সে ভালবাসে।

সে তো শুনেছি বালিগঞ্জের এক গুণ্ডা!

মিনিট পনরো পরে মিস্টার মিত্র এসে পৌঁছলেন শশধরবাবুর বাড়ি। ফটকের সামনে থেকেই তাঁকে ভিড় ঠেলে ঠেলে এগুতে হল। বাগানের মধ্যে দু-চারজন পুলিসের লোকও দেখতে পেলেন তিনি। ভয় পাওয়ার লোক তিনি নন। এগতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত শশধরবাবুই তাঁকে দেখতে পেলেন আগে। উঠে এসে তিনি বললেন, এই যে মিস্টার মিত্র, আসুন, আসুন। পরিচয় করিয়ে দিই।—জনতার দিকে চেয়ে শশধরবাবু বলত লাগলেন, ইনি হচ্ছেন আমাদের পলাশডাঙার এস. ডি. ও., ইনি পুলিস-সাহেব, রাজেনবাবু এখানকার বড় উকিল, ইস্কুলের হেড মাস্টার পশুপতি জানা।

বাধা দিয়ে মিস্টার মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী?

আমার মেয়ে চিত্রা, তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মশাই—

একটু দাঁড়ান।—মিস্টার মিত্র জনতার দিকে দৃষ্টি ফেললেন একবার। তার পর বলতে লাগলেন, চিত্রা তো কিছু অন্যায় কাজ করে নি। শহরের গোটা শিক্ষিত অংশটা এসে আপনার পাশে দাঁড়িয়েছে। চিত্রার পাশে কেউ নেই। চিত্রা যদি একজন কায়স্থ-ছেলেকে বিয়ে করেই থাকে তাতে বে-আইনী কাজ কিছু হয় নি। ভারতবর্ষের আইন সম্বন্ধে আপনাদের জ্ঞান নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ নয়।

পুলিস-সাহেব এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কী বলতে চান?

আমি বলতে চাই—। মিস্টার এস. কে. মিত্র দেখলেন, দরজার ওপাশে একজন ভদ্রমহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। ভিড় ঠেলে তিনি চাতালের ওপর উঠে গেলেন। দরজার এপাশ থেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি চিত্রার মা?

হ্যাঁ।

পায়ের ধুলো নিয়ে মিস্টার মিত্র বললেন, আমার নাম সঞ্জীবকুমার মিত্র। চিত্রাকে আমি ভালবাসি। শশধরবাবুর দিকে ঘুরে তিনিই আবার বললেন, ইচ্ছে করলে আমি চিত্রাকে নিয়ে রাত্রির গাড়িতে কলকাতা ফিরে যেতে পারতুম। কিন্তু আপনি তো সে সব পছন্দ করেন না। হৈমবতীর গল্পটা আমার মনে আছে।

শশধরবাবু একটা কথাও আর বলতে পারলেন না। মাথা নীচু করে বসে রইলেন। এমন সময় বড় দারোগা ছুটতে ছুটতে এসে পুলিস সাহেব এবং এস.ডি.ও.কে স্যালুট করলেন। তারপর গলার স্বরে আ[illegible]বাষ্প মিশিয়ে ঘোষণা করলেন তিনি, সার্, পে[illegible] চিত্রা ডাক-বাংলোতে ছিল।

এখন কোথায়?—জিজ্ঞাসা করলেন চিত্রার মা। তিনি এবার বাইরে বেরিয়ে এসেছেন।

বড় দারোগা বললেন, ডাক-বাংলোর সামনে ত্রিশ জন সেপাই মোতায়েন করে রেখে এসেছি। বলেন তো এখানে নিয়ে আসি।

দরকার নেই।—শশধরবাবু উঠলেন: সঞ্জীব নিজে গিয়েই তাকে এখানে নিয়ে আসুক। হৈম পালিয়েছে পালাক। কিন্তু চিত্রা এখান থেকে সঞ্জীবের হাত ধরে মাথা উঁচু করে ফিরে যাক বালিগঞ্জে।

মুহূর্তের মধ্যে বাগানের ভিড়টা গলে যেতে লাগল। এস.ডি ও., পুলিস-সাহেব এবং মুন্সেফবাবুরা চলে গেলেন সবার আগে। সঞ্জীব মিত্রও চলে যাচ্ছিলেন। শশধরবাবু আবার তাঁকে ডাকলেন, শোন সঞ্জীব—

বলুন।

ট্রেনের কামরায় তুমি কি বিশ্বাস কর নি যে, আমি ছিলুম বাঘা যতীনের শিষ্য?

না। আমার ভুল হয়েছিল।

সবাই চলে যাওয়ার পরে শশধরবাবু একা একা হেঁটে চলে এলেন ফটক পর্যন্ত। বাজিয়েদের একটা কথাও বলতে হল না। তিনি শুনলেন, সানাইটা বাজতে আরম্ভ করেছে।

নহবতখানায় বিপ্লব-শেষের প্রশান্তি।

মহালগ্ন

মানবেন্দ্র পাল

মনের মত প্রাইভেট টিউটর মেলে না, বিশেষ করে এই মোতিগঞ্জের মত জায়গায়। যা দু-একজন আছেন তাঁরা এত বেশী ছাত্র নিয়ে ব্যস্ত যে, নতুন কারও ভার নিতে চান না। জোর করে অনুরোধ করতে গেলে এমন টাকা চেয়ে বসেন যে, সঙ্গতি থাকলেও তা দিতে গায়ে লাগে।

আরও কয়েকজন শিক্ষক আছেন ইছামতীর ওপারে বনগাঁয়ে। তাঁদের নাগাল পাওয়া দুঃসাধ্য। এমনি বি. এ., বি. এস-সি. পাস ছেলে কিছু আছে; কিন্তু ছাত্রদের বা অভিভাবকদিগের সেদিকে তেমন ঝোঁক নেই। তাঁদের লক্ষ্য স্কুল-মাস্টারদের প্রতি। আশা, স্কুল মাস্টারদের কাছে ছেলেকে পড়তে দিলে কিছু সুবিধে হতে পারে। ছেলেরাও বন্ধুদের কাছে গর্ব করে বলতে পারে, আমি অমুক মাস্টারের কাছে পড়ি।

কিন্তু নিকুঞ্জর ভাগ্যে তেমন কোনও মাস্টার জুটল না। এ নিয়ে স্ত্রী হেমা স্বামীকে অনেকবার বলেছে, কিন্তু কোনও উপায় হয় নি। স্ত্রীর কথায় নিকুঞ্জ বার দুয়েক অকারণে দাড়ি চুলকে চিন্তা করেছে, এবং একটু পরেই স্ত্রী কক্ষান্তরে চলে গেলে নিজেও কোন রকমে গায়ে একটা গেঞ্জি চড়িয়ে কাঁধের ওপর পাঞ্জাবি ফেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

এ ফাঁকিতে তখনকার মত নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। ছেলেগুলো সকাল-সন্ধ্যে সমবেতকণ্ঠে তারস্বরে পড়া মুখস্থ করে, তারপর আহারের সময় হলে মাদুরের ওপর বই খাতা ফেলে রেখেই ছুটে গিয়ে আসন আশ্রয় করে। খাওয়াদাওয়ার পর যদিও কিছুক্ষণ পড়ার চেষ্টা চলে, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভরা-পেটের পর একটি সুখনিদ্রা বার বার হাই তুলে নিজের আসন্ন আবির্ভাবের জন্যে তাগিদ দিতে থাকে। এবং কারও নির্দেশের অপেক্ষা না রেখেই একে একে ছেলেমেয়েরা যে যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে।

এ দৃশ্য রোজই যেমন হেমার চোখে পড়ে তেমনি নিকুঞ্জরও দৃষ্টি এড়ায় না। দোকান বন্ধ করে নটা নাগাদ বাড়ি ফেরে সে। ততক্ষণে ছেলেমেয়েরা ঘুমে অচেতন।

এই নিয়ে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা হয়।

নিকুঞ্জ বলে, আমি কী করব? মাস্টার যদি না পাওয়া যায় তা হলে উপায় কী? আমার পেটে তো বিদ্যে নেই যে ক্লাস এইটের ছেলেকে পড়াব! তা ছাড়া দোকান—

হেমা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, তুমি ওই দোকান নিয়েই থাক। কেন, দোকান থেকে একটু আগে বেরিয়ে ওপারে গিয়ে খোঁজ করতে পার না?

অন্দর আর রান্নাঘর ছাড়া মেয়েদের বাইরের জগৎ সম্বন্ধে ধারণা যে কত কম, তার আর-একবার প্রমাণ পেয়ে নিকুঞ্জ মনে মনে খুশী হল। হেসে বলল, গিন্নী, আমি যদি এক দণ্ড বাইরে যাই তা হলে সেই ফাঁকে অমনি কিছু বসান দিয়ে দেবে।

কে বসান দেবে?

চোর-ছ্যাঁচোড়ের কি অভাব আছে? সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছে। নিজের কর্মচারীদেরও সব সময়ে বিশ্বাস করা যায় না।

হেমা অবাক হয়ে বলল, কেন?

নিকুঞ্জ মুখভঙ্গী করে বলল, সবাই সমান। সুবিধে বুঝলেই কোপ মারে।

হেমা অভিযোগের সুরে বলল, তা ওরা দিনরাত তোমার দোকানের জন্যে খাটবে আর মাইনের বেলায় তুমি কিপ্টিনি করবে তাতে কি ওরা খুশী হয়? ওদেরও তো বউ ছেলে নিয়ে সংসার। অভাব-অভিযোগ থাকবেই।

নিকুঞ্জ ক্রুদ্ধ হয়ে বলল, তা বলে নিজের মনিবের চুরি করবে!

হেমা ঈষৎ হেসে বলল, ওরা বোধ হয় চুরি করব বলে চুরি করে না, ওরা দু পয়সা বাগিয়ে আনন্দ পায়।

নিকুঞ্জ দ্বিগুণ ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বলল, আমি ওদের পুলিসে দেব।

হেমা তেমনি সহজভাবে বলল, তা তুমি যা খুশী কর, কিন্তু ছেলেগুলোর জন্যে যদি ভাল মাস্টারের ব্যবস্থা না হয় তা হলে যে ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফেল করবে। মুখ্যু ছেলের মা হয়ে শেষ বয়সে ওদের কাছে কি কৈফেৎ দেব বলতে পার?

নিকুঞ্জ স্ত্রীর বেদনায় সমব্যথা জানিয়ে মুখ গম্ভীর করে বলল, অত হতাশ হচ্ছ কেন বড় বউ? দেখছি, দেখছি। যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করছি।

এই বলে দোকানের চাবিটা ভাল করে চৌকির নীচে মাথার কাছে গুঁজে শুয়ে পড়ল।

ব্যবস্থা কিন্তু শেষ পর্যন্ত হেমাই করল।

হঠাৎ একদিন বলল, আচ্ছা, হরিদাসপুরে যশোরের কেষ্টবাবু রয়েছেন না?

কে কেষ্টবাবু?

কেষ্ট মুখুজ্জে। যশোরের লালদিঘি পাড়ে থাকতেন। সেই যে গো—

ও, তোমাকে যিনি ছোটবেলায় পড়িয়েছিলেন?

হেমা সাগ্রহে মাথা নেড়ে সায় দিল।

নিকুঞ্জ খুব খুশী হল না। বলল, তাঁকে নিয়ে কী করব?

হেমা বলল, তাঁকে একবার বলে দেখ না। তিনিও তো বি. এ.-পাস। তা ছাড়া অঙ্কে পণ্ডিত। ইদানীং দুঃখকষ্টের মধ্যে আছেন। পড়াবার কথা' তুললে এখুনি রাজী হবেন।

নিকুঞ্জ অভ্যাসমত অন্যমনস্কভাবে দাড়ি চুলকে বলল, কিন্তু তিনি যে বুড়োমানুষ—

হেমা আপত্তির সুরে বলল, বুড়ো হলেই বা। তুমি তো আর জামাই ঠিক করছ না। সেকেলে মানুষ। পড়াবেন ভাল। তা ছাড়া তুমি যত বুড়ো মনে করছ আসলে তত নন, অভাবে কষ্টে অমন হয়ে গেছেন।

নিকুঞ্জ আর কোন কথা বলল না। হেমা বুঝল ওইটেই সম্মতির লক্ষণ।

তখন স্বামীর কানের কাছে মুখ এনে আর একবার বলল, তা ছাড়া মাইনের জন্যে বিশেষ ভাবতে হবে না। ওঁর খাঁই বেশী নেই। এমনিতেই জান তো ওঁর ব্যাপার! কী ভাবে মেয়ের বাড়িতে দু মুঠো খেয়ে পড়ে আছেন! চা খাবার মত হাত-খরচার পয়সা পর্যন্ত নেই। ওঁকে আমরা যা দেব উনি তাতেই খুশী হবেন।

নিকুঞ্জ এবার যেন কিছুটা উৎসাহ পেল। বলল, আচ্ছা, আজ আমি নিজেই গিয়ে না হয় একবার কথা বলে আসি।—এই বলে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

হেমার কথাই ঠিক। কেষ্ট মুখুজ্জে আপত্তি নি। বরঞ্চ কৃতার্থ হলেন। তিনটি ছেলেমেয়েকে দু বেলা। প্রত্যেক দিন পড়াতে হবে। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা তার জন্যে পনরোটা টাকা পাবে। একসঙ্গে একান্ত নিজের জন্যে পনরোটা টাকা কেষ্ট মুখুজ্জের কপালে অনেক দিন জোটে নি। এই অপ্রত্যাশিত লাভে কেষ্ট মুখুজ্জে উৎফুল্ল হলেন। দাড়ি কামাবার জন্যে চারটে পয়সা মেয়ের কাছে হাত পেতে চাওয়ার যে কী গ্লানি তা তিনিই জানেন। তারপর অসুখ-বিসুখ আছে, টুকটাক নেশা আছে। জামাই খুবই ব্যস্ত—কখন যে বাড়ি আসে, কখন যে বাড়ি থেকে যায় টের পান না কেষ্টবাবু। টের না পাওয়াই ভাল। জামাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই যেন কেমন কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন। অথচ একদিন অনেক আশা এবং অনেক গাম্ভীর্য নিয়েই এই কেষ্ট মুখুজ্জে এই ছেলের হাতে মেয়ে সমর্পণ করেছিলেন। সেদিন জামাই সম্ভ্রমে কেষ্ট মুখুজ্জের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারত না। অবশ্য তখন তো আর কেষ্ট মুখুজ্জের এ পরিণতি হয় নি। তখন তাঁর নিজের ব্যবসা, নিজের চাষবাস। ছেলেরা বড় হয়েছে। তারা লেখাপড়া শিখল না বটে, কিন্তু পেট-চালাবার মত বিদ্যেটা ঠেকে ঠেকে আয়ত্ত করে নিয়েছে। একটি মাত্র কন্যা এই নিলু, বড় আদরের। সেই মেয়েকে বেশ ধুমধামের সঙ্গেই বিয়ে দিলেন সৎপাত্রে। সৎপাত্র মানে একালের সৎপাত্র নয়। একালে যেমন সৎপাত্রের মান উঁচুদরের চাকরি, উঁচু-পদওয়ালা কর্মচারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের মাপকাঠিতে ওঠানামা করে, কেষ্ট মুখুজ্জের কালে সৎপাত্রের তেমন কোনও মাপকাঠি ছিল না। মানুষটি ভাল—এইটেই ছিল সবচেয়ে বড়

গুণ, বড় কথা। সেই ভাল মানুষের গুণ আছে দেখেই কেষ্ট মুখুজ্জে চক্ষু বুজে সীতানাথের হাতে মেয়ে তুলে দিয়েছিলেন। এবং পরবর্তী কালে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, কেষ্ট মুখুজ্জের এই দূরদর্শিতা নিষ্ফল হয় নি।

সীতানাথ সত্যিই ভাল মানুষ। ভবিষ্যতে অর্থকরী ব্যাপারে তেমন সুবিধে করতে পারল না বটে, কিন্তু ভালমানুষি কখনও তার স্বভাবের বিরুদ্ধতা করল না।

এর প্রমাণ পাওয়া গেল পরে।

বড় হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ছেলেরা লায়েক হয়ে উঠেই বুড়ো বাপকে কোণ-ঠাসা করে বসল। বাপের কিছু সঞ্চয় ছিল, সেইটুকু নিজেদের সুবিধার জন্য বাপের জীবদ্দশাতেই ভাগ-বাটরা করে একেবারে তাঁকে পরনির্ভর করে তুলল।

স্নেহান্ধ শান্তিপ্রিয় মূর্খ বাপ ছেলেদের মান রক্ষায় সকল কথাতেই সম্মতি দিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন দেখলেন তাঁর সারাজীবনের প্রাণপাত পরিশ্রমে উপার্জিত টাকা নিয়ে ছেলেরা ব্যবসার নামে চুরি-জোচ্চুরি আর জুয়োখেলা চালাচ্ছে তখন বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেলেন। এই সব মুহূর্তে বিভ্রান্ত বাপ ছেলেদের যাকে সামনে পেয়েছেন তাকেই গালাগাল দিয়েছেন, শাপশাপান্ত করেছেন। পুত্রেরা তার উত্তরে যে লগুড়াঘাত করে নি এইটেই তাঁর বিশেষ ভাগ্য। তারা শুধু তাঁর ভাঙা টিনের বাক্স আর ছেঁড়া কম্বল টেনে রাস্তায় বার করে দিল। ছোট ছেলে দয়া করে সেই সঙ্গে দিল পাঁচটা টাকা। অর্থাৎ যেখানে পার কেটে পড়।

এ ঘটনা ঘটেছিল যশোরে। অপমানবিদ্ধ পিতা তখন যশোর থেকে চলে এলেন বনগাঁয়ে। সেখান থেকে এই হরিদাসপুরে। সব শুনে মেয়ে চোখের জল মুছে বলল, ভেবো না, আমি তো মরি নি। তুমি এখানেই থাক। আমি যদি এক বেলা দু মুঠো খেতে পাই তা হলে তাই থেকে এক মুঠো তোমার আর এক মুঠো আমার।

বৃদ্ধ বললেন, তাই দিস মা। আর কটা দিনই বা বাঁচব!—এই বলে প্রৌঢ় পিতা সেদিন এক আশ্চর্য করুণ দৃষ্টিতে মেয়ের পানে চেয়েছিলেন। মেয়ে তার উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে বাপের হাত ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। নিজের ঘর বলতে ওই একখানিই। আর যা তা বাসের অযোগ্য। তবু বাপকে ফেলবে কী করে!

এই সেই কেষ্ট মুখুজ্জে।

কেষ্ট মুখুজ্জে চাকরিতে বহাল হলেন। লাঠি ঠকঠক করতে করতে প্রৌঢ় রোজ দু বেলা নিয়মিত আসেন। পড়ানোর মধ্যে তিলমাত্র ফাঁকি নেই। বরঞ্চ দারুণ উৎসাহ। কেবল একটা অসুবিধা রাত্তিরবেলায়। সন্ধ্যের পর ঘণ্টাখানেকের বেশী উনি আর থাকতে চান না। বলেন, ও-ধারটা বড় নির্জন অন্ধকার। তার ওপর দু পাশে ওই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া শিশুগাছ। বড় ভয় করে।

কিসের ভয়?

না, সব রকমের। সাপ থেকে আরম্ভ করে চোর ডাকাত ভূত প্রেত। বেশী ভয় চোরকে। ভূত প্রেত তবু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু এ অঞ্চলের চোর! সাংঘাতিক!

এই বলেই বৃদ্ধ কেষ্ট মুখুজ্জে হরিদাসপুরের কয়েকটা মারাত্মক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। কেমন করে পাশের বাড়ি রাত-দুপুরে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ডাকাত পড়েছিল। বাড়ির লোক চেঁচিয়েও কারও সাড়া পায় নি। এক রাত্রে তাঁর বাড়িতেও নাকি সিঁধ কাটার শব্দ শোনা গিয়েছিল, ইত্যাদি।

সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বলতে বলতে বৃদ্ধের গলা শুকিয়ে আসে।

সে রাত্রে নিকুঞ্জর বড় ছেলেকে আলো ধরে মাস্টার মশাইকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়ে আসতে হয়। পথে যেতে যেতে তিনি বার বার ছাত্রকে বলেন, শোবার আগে বাপু, ভাল করে চৌকির তলা দেখে নিয়ো রোজ। বলা যায় না।

ইছামতীর এপারে বনগাঁ আর ওপারে মোতিগঞ্জ। কিছুদিন আগেও এ-সব জায়গা ছিল একেবারে লোকালয়শূন্য। পার্টিশনের পরে উদ্বাস্তুরা এল দলে দলে। কেউ কেউ করল বাড়ি-বদল। বহু মুসলমান-পরিবার চলে গেল পাকিস্তানে—বেনাপোল, যশোর, খুলনায়। সে সব জায়গা থেকে এল হিন্দুরা দলে দলে।

দেখতে দেখতে বনগাঁর ভোল বদলে গেল—জনসংখ্যা

বাড়ল, দোকান-বাজার বসল জাঁকিয়ে, সিনেমা-হাউস উঠল মাথা তুলে।

এই যারা এল তাদের মধ্যে ভাল ও মন্দ সব রকমই আছে। কেউ পেল দোতলা বাড়ি, কেউ অধিকার করল পতিত জমি বা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। ভবঘুরের দল ঘুরতে লাগল। ছড়িয়ে পড়ল তারা মোতিগঞ্জে হরিদাসপুরে।

অভাবের তাড়নায় চুরি বাড়ল। প্রথম প্রথম ঘটি বাটি কাপড়। তারপর শুরু হল বড় বড় চুরি।

মোতিগঞ্জ থেকে মাত্র তিন-চার মাইলের ব্যবধানে বর্ডার। পাসপোর্ট-ভিসার প্রবর্তন হল। যত কড়াকড়ি তত ফস্কা গেরো। সাধারণ মানুষের সহজ জীবনযাত্রার মধ্যে যত চাপ পড়তে লাগল ততই বাড়তে লাগল বে-আইনী কারবার। মানুষ দুর্ধর্ষ হয়ে উঠল, বেপরোয়া হল। চলল স্মাগলিং। রাতের অন্ধকারে লরি-বোঝাই মাল পাচার হয় হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানে, পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্থানে। কর্তারা থাকেন নেপথ্যে। পেটের দায়ে অর্থের লোভে যারা রোজ এই সব কাজ করে তাদের জীবনধারা ক্রমশ কুটিল হয়ে উঠল। বিবেক মরে গেল, মনুষ্যত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। টাকা, টাকা—টাকা চাই। এই হল এই সব মানুষের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। যেমন করে হোক টাকা উপায় করতেই হবে।

টাকা আসতে লাগল, কিন্তু জীবনপণ করে যে টাকা উপায় করতে হয়, গোপনে চৌর্যবৃত্তি দ্বারা সে টাকায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ভরণপোষণে মন ওঠে না। উত্তেজনার বিনিময়ে যে টাকা রোজগার, উত্তেজনার জন্যে সে টাকা ব্যয় না করলে যেন টাকা উপায়ের সাধ মেটে না।

অল্পকালের মধ্যেই তাই দেখা গেল সারা মোতিগঞ্জ চোর-ডাকাতের দাপটে কম্পমান। আজ এর বাড়ি সিঁধ কাটছে, কাল ওর বাড়ি। রোয়াকের ওপর কাদের পায়ের শব্দ। চারিদিকে বন আর মাঠ। আত্মগোপনের অসুবিধা নেই, পাহারাওয়ালার নামগন্ধ নেই। বিপন্ন গৃহস্থের পক্ষে শুধু সাবধান হওয়া ছাড়া আর অন্য গতি কী?

ইদানীং একটা ঘনঘোর আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে মোতিগঞ্জে। সন্ধ্যের পর সদরে-নাচে খিল পড়ছে। প্রৌঢ় কেষ্ট মুখুজ্জের আর সন্ধ্যে পর্যন্তও তর সয় না। তিনি বেলাবেলি এসে সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই লাঠি ঠক ঠক করে হাঁটা দেন বাড়ির দিকে। তাতেও তাঁর ভয়, যদি মাঝপথে কেউ ছুরি নিয়ে দাঁড়ায়!

বাড়ি এসেই প্রৌঢ় সর্বাগ্রে নাচের দরজা বন্ধ আছে কি না নিজে গিয়ে পরীক্ষা করেন। আলো নিয়ে ঘর-উঠন কুয়োতলা অনুসন্ধান করেন। কী জানি বলা যায় না, হয়তো এরই মধ্যে কখন চোর এসে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

নিলু হয়তো তখন রান্নাঘরে বসে রান্না করছে। কেষ্ট মুখুজ্জে দরজার কাছে এসে নীচু গলায় বলেন, হ্যাঁ রে, সীতানাথ ফিরবে কখন?

নিলু সে কথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে ফুটন্ত তেলে পাঁচফোড়ন ছিটিয়ে দিয়ে বলে, তার কিছু ঠিক আছে?

চিন্তিতমুখে কেষ্ট মুখুজ্জে বলেন, একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বলিস। দিন-কাল ভাল নয়। যা নির্জন পথ! কে কোথায় ঘাপটি মেরে থাকবে!

নিলু তেমনি নির্লিপ্তভাবে বলে, গরিবের কি অত ভয় করলে চলে বাবা? পেটের ধান্দায় কত জায়গায় ঘুরতে হয়।

জীবনটা তো আগে।—এবার একটু অন্য সুরে কথা বলেন কেষ্টবাবু।

নিলু একটু হেসে বাপের দিকে তাকিয়ে বলে, আমাদের মেরে চোরের লাভ? কী আছে যে নেবে?

প্রৌঢ় বলেন, চোর অত হিসেব করে কাজ করে না। এই তো কালকের খবর শুনেছ। দত্তপাড়ায় কী সাংঘাতিক চুরিটা হয়ে গেল! গরিব বিধবা—সামান্য থালাঘটি যা ছিল সব নিয়ে গেছে। বুড়ীর মুখ-হাত-পা পর্যন্ত বেঁধে রেখে গিয়েছে। মরে যেতে পারত তো?

নিলু তার উত্তর দেয় না। আপন মনে তরকারি রাঁধে।

প্রৌঢ় আবার চটির শব্দ করতে করতে নিজের জায়গাটিতে চলে যায়। দারুণ গরম আজ। এতটুকু বাতাস নেই। হাঁপটা আজ যেন একটু বেড়েছে। মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়েন বৃদ্ধ। শুয়ে শুয়েই হাত বাড়িয়ে একবার অনুভব করেন লাঠিটা। না, হাতের কাছেই আছে।

চুরির সীমা ইদানীং অনেক দূর ছড়িয়েছে। আগে গেরস্থর বাড়িতেই চুরি হচ্ছিল, এখন দোকান আক্রমণ হচ্ছে। রাত্রিবেলা ভাল করে তালা বন্ধ করে দোকানদাররা যে যার বাড়ি চলে যায়। এক-আধটা তালা নয়, অন্ততঃ ডজনখানেক ভারী তালা ঝোলে দরজায়। সে তালা সহজে খোলা যাবে এ কল্পনাও কেউ করে নি। কিন্তু সে অসম্ভবও সম্ভব হল যেদিন একজন স্যাকরার দোকানে চুরি হয়ে গেল। আশ্চর্য কৌশলে তালাগুলো খোলা হয়েছে। ধীরেসুস্থে একটার পর একটা তালা খোলা। যেন দোকানের মালিক স্বয়ং দাঁড়িয়ে থেকে ফতুয়ার পকেট থেকে চাবির থোলো বের করে দিয়েছেন।

দু-দিন পরেই বড় একটা ওষুধের দোকানে চুরি হয়ে গেল। এ চুরির নমুনা দেখে লোকের অনুমান হল, আর যাই হোক, এ চুরি স্থানীয় চোরেদের কাজ নয়। নিশ্চয়ই এর পিছনে কোনও বড় দল আছে। তার পরেই হল একটা চালের গুদমে চুরি।

ভাবনায় চিন্তায় লোকের আর ঘুম নেই। এ কী সর্বনেশে ব্যাপার! নাইট-গার্ড তৈরি হল, জনসাধারণ লেখালেখি করায় কয়েক জন পুলিসের সংখ্যাও বাড়ল। তাতে এই হল, সাময়িকভাবে শুধু ওই অঞ্চলটুকুতেই চুরি বন্ধ রইল। তার পর যেই এদিকে একটু ঢিল পড়ল অমনি আবার চুরি।

নিকুঞ্জরও চোখে ঘুম নেই। তার খাওয়া-বিশ্রাম মাথায় উঠেছে। মোতিগঞ্জের মোড়ের ওপর তার মস্ত কাপড়ের দোকান। এক ডাকে সারা বনগাঁয়ের লোকে তার দোকানের নাম জানে। 'হেমাঙ্গিনী বস্ত্রালয়' থেকে কাপড় নেবার জন্যে হাটের দিনে ভিড় জমে যায়, দূরগ্রাম থেকে ছোট ছোট দোকানীরা আসে পাইকারী দরে কাপড় নিয়ে যেতে। সপ্তাহে দু-তিনবার কলকাতা থেকে বিরাট লরি-বোঝাই কাপড় আসে ইছামতীর পোল পেরিয়ে 'হেমাঙ্গিনী বস্ত্রালয়ে'র দরজায়।

নিকুঞ্জর প্রতি মুহূর্তে এখন ভয়, এবার বুঝি তার পালা এল!

স্বামীর অবস্থা দেখে হেমাও ভীত হল। একদিন স্বামীকে ঝাঁজের সুরে বলল, এ কী অবস্থা হয়েছে তোমার? পাগল হয়ে যাবে নাকি?

নিকুঞ্জ বলল, আমার দোকানে এখন প্রায় ষাট হাজার টাকার মাল রয়েছে। যে রকমের চোর এরা, রাতারাতি দিব্যি ফাঁক করে দিতে পারে।

কেন, পাহারাওলা?

নিকুঞ্জ হঠাৎ চমকে উঠে বলল, ঠিক বলেছ তো। পাহারা! পাহারার ব্যবস্থা করতে পারলে মন্দ হয় না।

হেমা ভ্রূকুটি করে তাকাল: ভারি বললে! আমি বললাম পাহারাওলার কথা আর তুমি বললে পাহারা!

নিকুঞ্জ সে কথায় কর্ণপাত না করে বলল, ঠিক বলেছ, দোকানে যদি শুতে পারা যায় তা হলে অন্ততঃ চোরে টের পাবে, ভেতরে লোক আছে—সে লোকের কাছে একটা বন্দুক-টন্দুক থাকাও কিছু অসম্ভব নয়।

সেদিনের মত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। নিকুঞ্জ তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। আজ রাত্তির থেকেই দোকানে লোক রাখার ব্যবস্থা করবে।

সেদিন তখন রাত অনেক।

নিকুঞ্জ বিছানার ওপর হঠাৎ উঠে বসল। মাথার কাছে ছিল হাতপাখা। সেটা নিয়ে বাতাস খেল কিছুক্ষণ। বড় গুমট রাত। মনে পড়ল কেষ্ট মুখুজ্জের কথা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। ঘরের কোণ থেকে হ্যারিকেনটা নিয়ে দম বাড়িয়ে চৌকির তলাগুলো দেখে নিল একবার। তার পর কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খেল।

সেই শব্দে হেমাঙ্গিনীর ঘুম ভেঙে গেল। সভয়ে বলল, কে?

আমি।

চমকে উঠে বসল হেমা: এ কী! এত রাত্তিরে কী করছ?

ততক্ষণে গেলাস রেখে নিকুঞ্জ ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। নিকুঞ্জ বলল, ভাবছি, একবার দোকানটা দেখে আসি। যদি চোর এসে থাকে!

হেমা বিছানা থেকে যেন ছিটকে উঠে এসে দাঁড়াল সামনে: তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এই রাত্রে যাবে দোকান দেখতে?

নিকুঞ্জ আমতা আমতা করে বলল, কিন্তু যদি চোর এসে থাকে? ষাট হাজার টাকার মাল—

হেমা বাধা দিয়ে বলল, অত সহজ নয়। দোকান থেকে কাপড় সরাবে! তা হলেই হয়েছে।

নিকুঞ্জ নিরুপায় কণ্ঠে বলল, দুটো দোকান তো ডুবল চোখের সামনে।

সে সব নিজেদের মধ্যে ব্যাপার।

দুটোর বেলাতেই?

অসম্ভব কী?

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। নিকুঞ্জ পায়চারি করে বেড়াচ্ছে।

হেমা আবার বলল, কী হল? শোবে না?

নিকুঞ্জ বলল, দোকানটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে। কালকেও তবু একজন লোক শোবার জন্যে ছিল। আর আজ—

হেমা বলল, সে লোক কী হল?

নিকুঞ্জ ভগ্নস্বরে বলল, সে আর শোবে না। গরমে

ওর নাকি বুকের ব্যাধি শুরু হয়ে গেছে একদিনে! তাও খবর পাঠিয়েছে সন্ধ্যেবেলা। রোগে নাকি শয্যাশায়ী!

হেমা বললে, আর কেউ শুতে চাইল না?

নিকুঞ্জ মাথা নেড়ে বলল, না, কেউ না। ওই কাপড়ের গরমে কে আর শুতে চায় বল?

কিছু টাকা ধরে দিলে না কেন?

তারও কসুর করি নি। আজকাল কর্মচারীদের তো আর অভাব কিছু নেই। তাদের কাছে টাকা বড় নয়, বড় আরাম। কেন বাপু, কাপড়ের গোডাউন এমন কী খারাপ জায়গা? কলকাতায় দেখ্‌গে যা, লোকে ফুটপাথে শুয়ে আছে।

হেমা অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না। চুপ করে রইল। তারপর এক সময়ে স্বামীর হাত ধরে মশারির ভিতর টেনে এনে জোর করে পাশে শুইয়ে দিয়ে বলল, আজ ঘুমোও তো। কাল আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

নিকুঞ্জ বিস্মিত হয়ে বলল, তুমি ব্যবস্থা করবে?

হ্যাঁ গো।—এই পর্যন্ত কথা কানে এল। বাকী স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। ততক্ষণে একখানি কাঁকন-পরা সুডোল হাত অভ্যস্ত নিবিড়ভাবে নিকুঞ্জর কণ্ঠ আলিঙ্গন করে ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত হেমাই লোক ঠিক করে দিল। মাস মাইনের ওপর আরও দশ টাকা উপরি। শুধু রাত কাটানো। তা ছাড়া হেমার অন্তঃকরণ বলে একটা কিছু নিশ্চিতই আছে। দশ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতির পরও অত্যন্ত সহজভাবে বলল, তা হলে বিকেলে ছেলেদের পড়িয়ে আর কষ্ট করে বাড়ি যেতে হবে না। আমাদের এখানেই খেয়ে নিয়ে দোকানে শুতে যাবেন।

প্রৌঢ়র কণ্ঠে ভাষা যোগাল না। শুধু দুই চোখ বেয়ে টপটপ করে দু ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এ অঞ্চলে সন্ধ্যের পর এমনিতেই লোকচলাচল কম। যদিও অল্প দূরে ইছামতীর ওপার তখন প্রাণচঞ্চল, তবু এপারের অবস্থা অন্য। মাঝে-মধ্যে শুধু মতিগঞ্জের মোড়ের ওপরে রিক্‌শা-স্ট্যাণ্ড থেকে রিক্‌শাওয়ালা ওপার-আগত ট্রেন-ফেরত দু-একজন যাত্রীকে দেখলে আশান্বিত হয়ে হেঁকে ওঠে, বর্ডার, বর্ডার—বর্ডার যাবেন?

দু-চারটে ছোটখাট দোকান সন্ধ্যের পরেই ঝাঁপ ফেলতে শুরু করে। তারও কিছু পরে কলকাতা-যশোর রোডের এই অংশটুকু তলিয়ে যায় শুদ্ধ অন্ধকারের তলায়। দু পাশের সার সার শিশুগাছগুলো সেই অন্ধকারের কূলে যেন এক-একটা নিশাচরের মূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের দিকে তাকালেও যেন বুক ছমছম করে ওঠে।

রাত তখন প্রায় নটা। জনশূন্য পথে জাগল পদশব্দ। এক ঝলক জোরালো আলো ছিটকে পড়ল পিচ-ঢাল রাস্তার ওপর।

এই দিক দিয়ে আসুন মাস্টার মশাই।

পিছনে ঠক ঠক লাঠির শব্দ। প্রৌঢ় মাস্টার মশাই চলেছেন দোকান পাহারা দিতে। পাহারা দেবার কথা একবার তাঁর মনেও আসছে না। শুধু চোখের সামনে ভাসছে একখানি দশ টাকার নোট। প্রথমবারে এই উপরি-টাকা পেয়ে নাতি-নাতনীগুলোর জন্যে কিছু কিনে দিতেই হবে। ওরা যে সেই প্রথম দিনটি থেকে দাদুর কাছে হাত পেতে আছে।

নিকুঞ্জ বারে বারে তাঁর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বলছে, কোনও ভয় নেই। চুপচাপ শুয়ে থাকবেন। যদি কোনও শব্দ পান ভেতর থেকেই সাড়া নেবেন। তা হলেই কাজ হবে।

প্রৌঢ় সে কথার উত্তর দিলেন না। তখন তাঁর চিন্তা অন্য। টিউশনির জন্য পনরো টাকা আর এই দশ টাকা। আচ্ছা, কিছু জমানোও যায় না এই থেকে?

পরক্ষণেই ভাবলেন, কী করে জমাবেন? ও পনরো টাকা তো মেয়ের হাতেই দিয়ে দেন। সম্বল এই দশটি টাকা। তাও একটা কাপড় না কিনলে নয়। মেয়ে-জামাইয়ের কাছে তো পরনের কাপড়ের জন্যে হাত-পাতা যায় না।

আসুন এই দিকে। কোথায় যাচ্ছেন?

লজ্জিত হয়ে কেষ্ট মুখুজ্জে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এ দোকান তাঁর খুবই চেনা। তবু চিন্তায় বিভোর হয়ে চলে যাচ্ছিলেন এগিয়ে।

ভাল করে টর্চের আলোটা দোকানের চারিদিকে ফেলে দেখে নিয়ে নিকুঞ্জ একটার পর একটা তালা খুলতে লাগল। তারপর দরজা টেনে ভেতরে ঢুকে ডাকল, আসুন মাস্টার মশাই।

কেষ্ট মুখুজ্জে ভিতরে ঢুকতেই কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ নাকে এল। অন্ধকার—শুধু অন্ধকার।

সেই অন্ধকারের ভিতর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে নিকুঞ্জ এগিয়ে চলল আরও ভিতরে। এ পথে কেষ্ট মুখুজ্জে কোনদিন আসেন নি। তাঁর আসা ওই দোকান পর্যন্ত। ভিতরের গোডাউনে প্রবেশের প্রয়োজন কোনও দিন হয় নি। এ যেন পাতালপুরীর নাগ-নাগিনীর রাজ্য।

প্রতি মুহূর্তে হোঁচট লাগছে কাপড়ের গাঁটে। সে সব গাঁট এখনও খোলা হয় নি। শুধু অন্ধকার নয়, বায়ুশূন্য ঘর। একটা জানলাও নেই। শুধু দেওয়াল পর্যন্ত উঁচু উঁচু র‍্যাক। তাতে থাকে থাকে কাপড় সাজানো। এতটুকু ছিদ্র পর্যন্ত নেই। এরই মধ্যে প্রৌঢ়ের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

নিকুঞ্জ বলল, তা হলে এইখানেই আপনি শুয়ে পড়ুন। আমি যাই।

খুব কাছে থেকেই নিকুঞ্জ কথা বলল। কিন্তু মনে হল, সে কণ্ঠস্বর যেন কতদূর থেকে আসছে।

প্রৌঢ় ভয়ে ভয়ে বললেন, আলো দেবে না?

নিকুঞ্জ বলল, টর্চ? আমার যে এই একটিই টর্চ। অন্ধকারে বাড়ি যেতে হবে, তারপর মাথার কাছে টর্চ না থাকলে ঘুম হয় না আমার।

প্রৌঢ় তবু একটু খুঁত খুঁত করে বলল, বড্ড অন্ধকার যে!

নিকুঞ্জ হেসে বলল, চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ুন, তা হলেই আর অন্ধকার চোখে ঠেকবে না। ভোরে এসে দরজা খুলে আমিই জাগিয়ে দেব আপনাকে।

কেষ্ট মুখুজ্জে চুপ করে রইলেন।

নিকুঞ্জ বলল, তা হলে আমি চললাম। আপনি একটু সজাগ থাকবেন।

প্রৌঢ় বললেন, কাল থেকে সঙ্গে একটা হ্যারিকেন নিয়ে আসব। কাছে রাখব।

নিকুঞ্জ লাফিয়ে উঠে বলল, ওরে সব্বনাশ! তারপর অগ্নিকাণ্ড হোক! জানেন যাট হাজার টাকার মাল আপনার জিম্মায় রেখে আমি যাচ্ছি!

এই বলে নিকুঞ্জ আর কালবিলম্ব না করে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে বেরিয়ে গেল।

দোকানের বাইরে এসে যেন নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচল। এইটুকু সময়ের মধ্যে তার কপাল ঘেমে উঠেছে, গেঞ্জি ভিজে গিয়েছে—বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে যেন এখনও কেমন টান ধরছে।

নিকুঞ্জ দরজাটা ভাল করে টেনে বন্ধ করে একটার পর একটা তালা লাগাল। সব তালা লাগানো হলে তালাগুলো ভাল করে টেনে টেনে পরীক্ষা করল। তারপর আর একবার টর্চের আলো চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলল। মন খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। চাবির থোলোটা ট্যাঁকে গুঁজে বাড়ি-মুখো রওনা দিল। আজ একটু ভাল করে ঘুমতে পারবে।

সেই স্তব্ধ রাত্রির বুকে নিকুঞ্জর চটির শব্দ অনেকক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল।

নিকুঞ্জর কথার খেলাপ হয় না।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানা ছেড়ে চলে এল দোকানে। পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। ভয়ে ভয়ে তালা পরীক্ষা করল। না, কেউ ভাঙে নি বা খোলবার চেষ্টা করে নি। তখন নিজেই তালা খুলল একটার পর একটা।

ঘরে ঢুকতেই তেমনি ভ্যাপসা গন্ধ—তেমনি অন্ধকার। এই ভোরেও টর্চের দরকার হয়। নিকুঞ্জ দ্রুতপায়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

মাস্টার মশাই!

নিকুঞ্জ ভেবেছিল, মাস্টার মশাইকে হেঁকে ডেকে তুলতে হবে। কিন্তু তা হল না। সবিস্ময়ে দেখল, মাস্টার মশাই মাদুরের ওপর বসে কেমন একরকম বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক দেখছেন।

মাস্টার মশাই!

অ্যাঁ!—কেষ্ট মুখুজ্জে যেন চমকে উঠলেন।

এ কী! অমন করে বসে আছেন? বাড়ি চলুন।

প্রৌঢ় মুখুজ্জে সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কেমন একরকম বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, ভোর হয়েছে?

সে কণ্ঠস্বর শুনে নিকুঞ্জ কেমন ভয় পেল। এ যেন তাদের মাস্টার মশাইয়ের গলা নয়। যেন কোন্ দূরপার থেকে অন্য কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তার সঙ্গে কথা বলছে।

নিকুঞ্জ আর একবার চেঁচিয়ে বলল, কী হল? উঠুন।

প্রৌঢ় তার জবাব দিতে পারল না। শুধু অবলম্বনের জন্যে তাঁর শীর্ণ দুর্বল কম্পিত হাতখানা নিকুঞ্জর দিকে বাড়িয়ে দিল।

কয়েকটা দিন কেটে গেল, প্রায় সপ্তাহ ঘুরল। প্রৌঢ় আর পারছেন না। প্রতি রাত্রে ওই বস্ত্রাগারের রুদ্ধ বাতাসে তাঁর শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়েছে। তবু এক-একটা রাত যায় আর আঙুলের কড়িতে হিসেব করেন, আজ ছদিন শেষ হল। মাস পুরতে আর চব্বিশ দিন। চব্বিশটা দিন পর দশটা টাকা পাবেন।

এমনি আর এক রাত্রি।

তেমনি ভাবেই চলেছে দুজনে। কারও মুখে কথা নেই। শুধু একজনের জুতোর শব্দ, আর একজনের জুতোর শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে লাঠির শব্দ—ঠক্—ঠক্—ঠক্।

অসহ্য গুমট আজ। বৈশাখ-শেষের অনাবৃষ্টি আকাশ সারাদিন যেন অগ্নিবৃষ্টি করেছে। পিচঢালা যশোর রোড যেন তেতে রয়েছে। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, কুটোটুকু পর্যন্ত উড়বে এমন বাতাস নেই। গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মত স্তব্ধ—কুটিল। এমন রাত্রেও আবার চাঁদ উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকার শিশুগাছের মাথার উপর দিয়ে উঠছে। সে চাঁদের আভায় সমস্ত পথ যেন ভয় পেয়ে মূর্ছা গিয়েছে।

অন্য দিনের মত এদিনও নিকুঞ্জ তেমনি করেই একটার পর একটা তালা খুলে টর্চের আলো ফেলে প্রৌঢ়কে নিয়ে গেল সেই অন্ধকার কারাগারে। তেমনি করেই ফিরে

এল নিজে। অতি সাবধানে বাইরে থেকে তালা লাগাল দরজায়। ভাল করে টেনে টেনে দেখল তালাগুলো। তারপর টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

কিন্তু—

কিন্তু আজকের রাত্রি প্রৌঢ়ের সহজে পোহাল না।

ঠং ঠং ঠং করে দূরে থানার পেটা-ঘড়িতে কতবার কত সুরে মাতালের প্রলাপের মত ঘণ্টা বেজে গেল। রাত কত কে জানে? প্রৌঢ়ের চোখে ঘুম নেই। কিসের যেন অস্বস্তি—বড্ড কষ্ট।

হ্যাঁ, হাঁপ ধরছে, বুকের ভেতরটা যেন কেমন করছে! নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কেউ কি তাঁর বুকের ওপর চেপে বসেছে?

না, কেউ না। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছে। এত ঘাম জীবনে বোধ হয় ঘামেন নি।

প্রৌঢ় একটু বিস্মিত হলেন। এ রকম হচ্ছে কেন আজ? কষ্ট অন্য দিনও হয়। কিন্তু এমন ধারা—

হঠাৎ মনে হল, তাঁর জিবটা যেন কী রকম আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে, শুকিয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, একটু জল—জল চাই। জল খেতে হবে। কিন্তু জল কোথায়? জলের ব্যবস্থা তো এখানে নেই!

সেই মুহূর্তে প্রৌঢ়ের সর্বাঙ্গ থর-থর করে কেঁপে উঠল। জল—জল না হলে যে প্রাণ যায়। সেই সঙ্গে একটু বাতাস। ওই কাপড়ের থানগুলো থেকে যেন ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে লিক লিক করে। সেই ধোঁয়া যেন সুতোর মত হয়ে তাঁর নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়ে ঢুকছে। ঢুকছে তো ঢুকছেই। আর নিঃশ্বাস নেবার উপায় নেই। সমস্ত বুকটা যেন ফুলে উঠছে—ভীষণ চাপ।

বৃদ্ধ আর ভাবতে পারলেন না। এক ফোঁটা জল—এতটুকু বাতাসের জন্যে পাগলের মত উঠতে গেলেন, কিন্তু মাথা ঘুরে সেই কাপড়ের ওপর পড়ে গেলেন।

পড়ে গেলেন। তারপর কত মুহূর্ত গিয়েছে কে জানে? বৃদ্ধ বুঝতে পারছেন, জীবনদীপ নিবে আসছে—আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে আসছে চেতনা, এ চেতনা আর ফিরবে না। এই অন্ধকার নীরন্ধ্র বস্ত্রাগারের মধ্যে আজ তাঁর মৃত্যু—অপমৃত্যু! বুকের ভিতর তখন ধড় ধড় করছে হৃৎপিণ্ড, ওটুকু থামতে বেশী দেরি হবে না। বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মনের সমস্ত শক্তি নিয়ে সেই নিশ্চিত মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগলেন। সেই সূক্ষ্ম চেতনার মধ্যে তখনও এতটুকু একটু উপলব্ধি ছিল তার আর্তস্বরের সঙ্গে; সে উপলব্ধি আর কিছুই নয় একটু বাতাস, এক ফোঁটা জল।

হঠাৎ এমনি সময়ে পিছনের দেওয়ালে যেন কিসের শব্দ হল। প্রথমে খুব আস্তে, তারপর সেই শব্দ আরও একটু জোরে হল। তারপর আরও একটু জোরে।

ও কিসের শব্দ!

চেতনা লুপ্ত হবার এই পূর্ব-মুহূর্তে প্রৌঢ়ের কানে সেই শব্দ ঘুরতে লাগল—খট, খট, খট।

কারা যেন এই পাষাণ-কারাগারের দেওয়াল ভেঙে ফেলছে—হাজার হাজার লোক।

হ্যাঁ, খুব দ্রুত ভাঙছে। ভাঙবেই তো। এই অন্ধকূপে যে একজন মানুষ মরছে তিল তিল করে। তারা যেন তাই ছুটে আসছে—বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে। যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে।

ওই আবার সেই শব্দ—খট খট খটাং খট। ভেঙে পড়ল বুঝি দেওয়ালের একটা দিক। কিন্তু আলো কই?

এ গভীর রাত্রে আর আলো কী করে দেখা যাবে?

কিন্তু না, ওরা সত্যিই এসে পড়েছে। ওই যে কারা ফিস ফিস করে কথা বলছে! ওই যে, ওই যে—আলো! দেশলাই জ্বালিয়েছে কে?

বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখের স্তিমিত তারায় বুঝি সেই আলোটুকু নেচে উঠল।

আলো! আলো! এই অন্ধকার কারাকক্ষে যে এ রাত্রে আবার আলো দেখতে পাবেন এই মৃত্যু-মাহেন্দ্রক্ষণে কিছুতেই প্রৌঢ় আশা করতে পারেন নি।

তবে কি সত্যিই কেউ এল মুক্তির আদেশ নিয়ে?

বৃদ্ধ শেষবারের মত দেহের সমস্ত শক্তি একত্র করে একবার উঠে বসবার চেষ্টা করে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, কে আছ, বাঁচাও।

হ্যাঁ, শুনতে পেয়েছে ওরা। ওটা কিসের আ[illegible]? অত জোরালো! কী যেন বলে—

ওই এগিয়ে আসছে আলোটা চারিদিকে ফেলতে ফেলতে। এক দুই তিন চার—আরও রয়েছে পেছনে। সবাই পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে তাঁরই দিকে!

আসুক, আসুক, মানুষের বিপদের চরম মুহূর্তে মানুষই এগিয়ে আসে। ওরাই আজ অন্ধকারের বুকে আলো দেখিয়েছে, এই দারুন শ্বাসকষ্টের মুহূর্তে বায়ুশূন্য কারাগারের দেয়াল ধূলিসাৎ করে অবাধ বাতাস সঞ্চার করেছে। ওরা আসছে তাঁকে বাঁচাতে।

অন্তিম মুহূর্তে বৃদ্ধের শান্ত মুখে একটা ফ্যাকাশে হাসি ফুটে উঠল, যেন গোধূলির মুখে দিনান্তের শেষ আলোর আলপনা।

গল্প

তক্ষশীলা

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

পাঞ্জাবের মানুষগুলো ঠিক বেলুচদের মত নয়। সীমান্তের মানুষদের সঙ্গেও তাদের প্রভেদ আছে অনেক। কিন্তু এক জায়গায় এদের সবার মিল ছিল। এদের একজনকে আর দশজনের ভিতর চিনে বার করতে আমার কষ্ট হত। সেই গৌর দীর্ঘাঙ্গ পুরুষগুলির হাবে-ভাবে আচারে-আচরণে কথায় ও ভঙ্গিতে আমি কোন প্রভেদ খুঁজে পেতুম না। রাওলপিণ্ডিতে এক গহর খান আমার পরিচর্যা করেছিল। আমি দেখলুম, সেই গহর খান যেন সহস্র রূপ ধরে রাওলপিণ্ডির পথে-ঘাটে বাজারে-হাটে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শৈশবে আমার ঠিক এমনি ভুল হত দার্জিলিঙে। সেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ আমাকে যত না মুগ্ধ করত, তার চেয়ে বেশী বিস্মিত করত রঙ-বেরঙের সাহেব-মেম। হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে যখন 'হ্যালো জিমি' 'হ্যালো জ্যাক' বলে ঝুঁকে করমর্দন করেছে দুজন সাহেব, আর পাশে দাঁড়িয়ে থিও হেসেছে ক্ল্যারার পানে চেয়ে, আমি আশ্চর্য হতুম তাদের মানুষ চেনবার ক্ষমতা দেখে। জিম কী করে জ্যাককে চেনে, আর থিও ক্ল্যারাকে! অনেক ভেবেও এর হদিস আমি পাই নি। দার্জিলিঙের চলমান জনতায় আমি সব সাহেবকে জিম ভাবতুম আর সব মেমকে থিও। যেমন তাদের সব আলসেসিয়ানকেই ভাবতুম একটা কুকুর।

অনেক দিন পরে আমার এই সব কথা মনে পড়ল আলিপুরের এক উকিল-বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে। এক জায়গায় কয়েকজন গহর খানকে ভিড় করতে দেখলুম। আর এক গহর খানকে দেখলুম আসামীর কাঠগড়ায়। এই লোকটা নাকি খুনের আসামী! কিন্তু কী নিরুদ্বেগ নির্বিকার চেহারা তার! নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্ত এজলাসকে যেন উপহাস করছে। আশ্চর্য মানুষ! বাইরের গহর খানরাও তার ভাব দেখে আশ্চর্য হচ্ছে।

আমার বন্ধু বিপক্ষের উকিল। সেও এই রহিম খানকে দেখে নাকি আশ্চর্য হচ্ছে। বলল: নিজের পক্ষ সমর্থনে লোকটা উকিল দেয় নি। তার স্বজাতির জনকয়েক বিনি পয়সায় উকিল ধরবার চেষ্টায় আছে, কিংবা কম পয়সায়। বুকের ছাতি দেখিয়ে আর হাতের লাঠি ঠুকে যারা মামলার নিষ্পত্তি করে, সরকারী আদালতে তাদের ভয়ের অন্ত নেই। এই সব কালোকোট-পরা বাঙালী বাবুরা নাকি সাংঘাতিক! একবার পাল্লায় পড়লে যে বুকের-রক্ত-জল-করা টাকা জলের মত বেরিয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবু তাদের ভিতর খানিকটা চাঞ্চল্য আছে। কিন্তু আসামী নিজে স্থির পাথরের মূর্তির মত। তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যে, ওই লোকগুলোর দুশ্চিন্তা দেখে মনে মনে নিশ্চয়ই সে হাসছে।

আশ্চর্যের এইখানেই শেষ নয়। অল্পক্ষণ পরেই আবিষ্কার করলুম যে বিস্ময়ের শুরু এইখানে। তাকে জেরা করতে গিয়ে আমার উকিল-বন্ধু থমকে থেমে গেলেন। লক্ষ্য করলুম, ভয়ে লোকটার মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেছে। হাত দুখানা ছিল কাঠগড়ার রেলিঙের ওপর, সে দুখানা থরথর করে কাঁপছে। আমি তার দৃষ্টিকে লক্ষ্য করে দেখলুম, দরজার উপর আর এক গহর খান হিংস্র দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু একটা চোখের দৃষ্টি, আর একটা চোখ কানা। মুখের চামড়ায় বার্ধক্যের ছাপ বড় তীব্র। এত বয়সেও হিংস্রতা একটুও কমে নি।

এই দৃষ্টি আমার চেনা মনে হল। মনে হল, অনেক দিন আগে হয়তো বা কয়েকটা যুগ আগে এই দৃষ্টি আমি দেখেছি। আর তারই সামনে আর একটা লোকের এমনি ভয়, এমনি কাতরতা। এরা কি আমার চেনা মানুষ!

বন্ধুর সঙ্গে কাজ মিটতে সময় লাগল না। কিন্তু রহিম খানের স্মৃতি মুছল না মন থেকে। সন্ধ্যেবেলায় বাড়ির বারান্দায় বসে আমি এই কথাই ভাবছিলুম, ভাবছিলুম আসামী রহিম খানের কথা। যে লোকটা ফাঁসিকাঠে ঝুলবে জেনেও ভয় পায় নি এতটুকু, সে একটা মানুষকে দেখে অত বিচলিত হল!

দক্ষিণ থেকে বাতাস বইছে অল্প অল্প। সেই বাতাসে মোটা চুরুটের ধোঁয়া কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমার ভাবনা অন্বেষণে বেরুল, অস্পষ্ট অতীত হাতড়ে হারানো গহর খানকে আবার উদ্ধার করবে।

সে আমার প্রথম যৌবনের গল্প। গন্ধকের পাহাড়ে বেলুচদের সঙ্গ আমার অসহ্য মনে হল। সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে রাওলপিণ্ডির ছাউনিতে এলুম। সেখানে পরিচয় হল নবীন অধ্যাপক সাহনির সঙ্গে। ভারত কোনদিন বিভক্ত হবে, সে কথা সেদিন কল্পনাও কেউ করে নি। আমরাও করি নি। সাহনি তবু বলল: এতদূর এসেছ, এ ধারটা দেখে যাও। আবার কবে আসবে তার তো ঠিক নেই।

কিন্তু সময় কই ?—আমি আপত্তি জানালুম।

সাহনি বলল: খাইবার পেশাবার যদি নাও দেখ, ট্যাক্সিলা না দেখে গেলে দুঃখ থেকে যাবে। এখান থেকে ঢিল ছুঁড়লে সেখানকার জাদুঘরের ছাদে পড়ে।

তক্ষশীলা! রাওলপিণ্ডি থেকে মাত্র কুড়ি মাইলের পথ। ট্রেনে চাপলে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে পৌঁছতে। সাহনির বোধ হয় নিজেরও কোন কাজ ছিল সেখানে। তাই আমাকে উৎসাহ দেবার জন্যে তক্ষশীলার পুরাতত্ত্ব শোনাল। বলল: ট্যাক্সিলা কি আজকের দেশ!

রামচন্দ্রের ভাই ভরতের বড় ছেলে তক্ষ এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ভরতের মামা যুধাজিৎ তখন কেকয়ের রাজা। গান্ধারদেশ আপন রাজ্যভুক্ত করবার জন্যে রামচন্দ্রকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভরত এই রাজ্য জয় করে নিজের দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন।

সাহনি থামল একটুখানি। তারপর হাসল। বলল: বিশ্বাস হল না এ সব কথা, এই তো?

আমি কোন জবাব দেবার আগে নিজেই বলল: তোমার বিশ্বাস হবে এমন গল্পও আছে আমার কাছে।

সাহনি ইতিহাসের অধ্যাপক। ইতিহাস ভালবাসে, ভালবাসে পুরাতত্ত্বের গল্প শোনাতে। আমার সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই বলল: আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সময় তক্ষশীলার রাজা তাঁকে সাহায্য করেন। কিন্তু পরে তাঁর সেনাপতি সেলুকস এই রাজ্য জয় করে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তকে উপহার দেন। তক্ষশীলায় প্রজা-বিদ্রোহ হয় প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে বিন্দুসারের সময়। জ্যেষ্ঠ পুত্র সুসীমার অক্ষমতা দেখে বিন্দুসার তাঁর মেজো ছেলে অশোককে এই প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন। অশোকের সিংহাসনপ্রাপ্তির পর তাঁর পুত্র কুণাল হলেন তক্ষশীলার শাসনকর্তা।—তারপর সাহনি একটা ঢোক গিললেন, বললেন: মৌর্যদের পর ব্যাকট্রিয়ার রাজা ইউক্রে-টাইড্‌স্ দখল করলেন এই প্রদেশ। স্ট্রাবোর কথা হয়তো আমরা বিশ্বাস করতুম না, কিন্তু তার আর উপায় নেই। এ দেশের মাটি খুঁড়ে এখনও তাঁর প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে। গ্রীকদের হাত থেকে তক্ষশীলা উদ্ধার করেন শকেরা। সুর্য বা আবার্সের পর কুশাণবংশীয় কনিষ্ক হলেন রাজা। তখন থেকে বৌদ্ধ-প্রভাব।

আমার আর্তনাদ করতে ইচ্ছা হল। হাতজোড় করে বললুম: দোহাই তোমার সাহনি, তোমার তথ্যকথা থেকে রেহাই দাও। তক্ষশীলা যে দ্রষ্টব্যস্থান বিনা তর্কে আমি মেনে নিচ্ছি। রাজীও হচ্ছি তোমার সঙ্গে যেতে।

সাহনি হেসে ফেলেছিল, বলল: ধন্যবাদ।

গাড়িতে উঠে ভেবেছিলুম, কী দেখবার আছে জিজ্ঞেস করব। কিন্তু সাহস হল না। আবার কোনো তত্ত্বের আলোচনা উঠে পড়লে মারা পড়ব। কিন্তু খানিকটা চুপচাপ কাটাবার পরেই সাহনি জিজ্ঞেস করল: মহেঞ্জোদারোর গল্প শুনবে?

রক্ষে কর।—আমি হাত জোড় করলুম।

তক্ষশীলার কথা?—সাহনি জানতে চাইল।

উত্তর দেবার প্রয়োজন হল না। তার মুখের দিকে চেয়েই বুঝতে পারলুম সে আমার সঙ্গে কৌতুক করছে।

রাওলপিণ্ডি ও ট্যাক্সিলার মাঝে মাত্র দুটি স্টেশন—গোল্‌রা জংশন আর সঙ্গজানি। আমরা একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে যাচ্ছিলুম। শেষের স্টেশন থেকে এক ছোকরা গহর খান উঠল। বয়স শুধু অল্প নয়, মুখে একটু কোমল ভাব। গাড়ির আরও কয়েকজন গহর খানের সঙ্গে বেশ একটু প্রভেদ দেখলুম।

সাহনি বলল, কী দেখছ?

ওই ছোকরাকে।—আমি উত্তর দিলুম।

সন্তর্পণে বেঞ্চিতে বসে লোকটি বাইরে তাকাল। দৃষ্টিতে যেন একটু অন্যমনস্কতা, একটু ভাবালুতা। বললুম: এও পাঠান নাকি?

সাহনি হেসে বলল: সীমান্তের পাঠান আর পাঞ্জাবী ছাড়াও এ দেশে আরও একটি জাত আছে। তাদের আমরা পুঠ্‌য়ারী বলি। পুঠ মানে বোঝ?

আমি যে জানি না তা সে জানে। তাই উত্তরটাও দিল নিজে। বলল: পাহাড়। দেখতেই তো পাচ্ছ কেমন পাহাড়ী দেশ, সেইজন্যেই আমরা এদের পুঠ্‌য়ারী বলি।

সত্যিই দেশটা উঁচু-নীচু পাহাড়ে ঘেরা। মাটির পোড়া রঙ। শীতে যেমন শীত, গ্রীষ্মে গরমও তেমনই। দিন ও রাতেও অনেক তাপের পার্থক্য। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে যে সব গাছ দেখতে পাচ্ছি, সাহনি তার নাম বলল, কীকর আর টালি। কীকরগাছের আসবাব নাকি ভাল হয়। চীরগাছও দেখছি মাঝে মাঝে। এই চীরের বন দেখেছি হিমালয়ে।

হঠাৎ যেন গানের শব্দ পেলুম। ফিরে দেখি, সেই পুঠ্‌য়ারী ছোকরা গুন গুন করে গান গাইছে। কান পেতে কথাগুলি শুনলুম:

> চড়ালো কুড়িয়ো ওয়াঙ্গা। গোল গোল ওয়াঙ্গা॥
> গোল গোল ভিড়িয়াঁতে। গোল গোল ওয়াঙ্গা॥

গানের কথার দিকে যে আমার মন গেছে, সাহনি তা বুঝতে পেরেছিল। বলল: মানে বুঝতে পারছ?

বললুম: কী করে বুঝব?

সাহনি হেসে বলল: ওয়াঙ্গা মানে চুড়ি, আর ভিড়িয়াঁ মানে হাতের কব্জি। এবার চেষ্টা কর তো মানে বোঝবার।

আমি কিছু বোঝবার আগেই বলল: গোল গোল হাতের কব্জিতে গোল গোল চুড়ি। চড়া লেও—মানে, পরে নাও। চুড়িওয়ালা বলছে।—বলে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

তক্ষশীলায় আর একবার এই গান শুনেছিলুম এই লোকটিরই মুখে। একটা কুয়ো থেকে খানিকটা দূরে এক খণ্ড পাথরের ওপর বসে আপন মনে গান গাইছিল। সাহনি আমার ভুল ধরিয়ে দিল, বলল: আপন মনে নয়। ওই দেখ।

চেয়ে দেখলুম, কুয়ো থেকে জল তুলছে একটা মেয়ে। সাহনির সঙ্গে আমিও যোগ করে দিলুম আমার নির্মল হাসি।

সাহনি বলল: এ দেশের কোন গল্প শুনবে?—হীর-রাঞ্ঝা কিংবা শশি-পুন্নুর গল্প—তোমাদের লায়লা-মজনুর মত?

অমন করে ভয় দেখিও না সাহনি। প্রেমের গল্পে আমি সত্যিই ভয় পাই।—আমি জবাব দিলুম।

সাহনি বলল : তবে পাঙ্গা সাহেবের গল্প শোন।

বললুম : সে আবার কী ?

পাঙ্গা সাহেবের নাম শোন নি ?—সাহনি আশ্চর্য হল। বলল : অমৃতসরের গ্রন্থ সাহেবের নাম শুনেছ নিশ্চয়ই ?

বললুম : শুনেছি কেন, দেখেওছি।

সাহনি বলল : এখানে তেমনি পাঙ্গা সাহেবের গুরুদ্বার। ট্যাক্সিলা থেকে মাইল দশেক দূরে। বাসে যাও, ট্রেনেও যেতে পার। বৈশাখে বিরাট মেলা বসে। লক্ষ লক্ষ শিখ আসে সেদিন।

অকপটে স্বীকার করলুম যে পাঙ্গা সাহেবের নাম আমি শুনি নি। সাহনি উৎসাহ পেল, বলল : তুমি কিছুই শুনতে চাও না, নইলে কত জিনিসই তোমাকে শোনাতে পারি।

বলেই পাঙ্গা সাহেবের গল্প শোনাল আমাকে। গল্প শুনতে শুনতেই আমরা তক্ষশীলার স্টেশনে পৌঁছে গেলুম। ছোট স্টেশন, তবু উপেক্ষা করবার নয়। কেন না জংশন স্টেশন। যেতে আসতে সমস্ত ট্রেন দাঁড়ায়, সেইটেই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

সাহনির প্রয়োজন ছিল মিস্টার ঘোষের সঙ্গে। প্রথমেই আমরা তাঁর কাছে গেলুম। প্রবাসী বাঙালী মিস্টার ঘোষ সজ্জন, সেখানকার মিউজিয়মে কাজ করেন। পরিচয় হলে আমি আশ্চর্য হলুম এই ভেবে যে, এত দূরেও বাঙালী এসেছেন জীবিকার জন্যে! মিস্টার ঘোষ বোধ হয় আমার মনের কথা ধরতে পেরেছিলেন। বললেন : বাঙালী দেখে আশ্চর্য হচ্ছেন তো! কিন্তু আমি এখানে প্রথম নই। যতদূর জানা গেছে, তক্ষশীলায় প্রথম বাঙালী ছিলেন জাতক-বিখ্যাত জীবক। জীবকের গল্প পড়েন নি 'মহাবগ গ' জাতকে ?

নিজের অজ্ঞানতা স্বীকার করায় মিস্টার ঘোষ বললেন : তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অজ্ঞাতকুলশীল জীবক সাত বৎসর চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

পুরাকালে তক্ষশীলায় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল জানি। খ্রীষ্টজন্মের সাত-আট শো বছর পূর্বে তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কথাও শুনেছি। সেদিন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল তক্ষশীলা। শুরু হয়েছিল প্রাচ্য আদর্শে। ধনীদরিদ্রনির্বিশেষে সবাই সমান কষ্ট স্বীকার করে গুরুগৃহে শিক্ষালাভ করবে। রাজার ছেলের সঙ্গে পাশাপাশি বসবে তার প্রজার ছেলে। কিন্তু তক্ষশীলার এই আদর্শ নষ্ট হল প্রতীচ্যের সংস্পর্শে এসে। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র বিনা পরিশ্রমে শিক্ষালাভ করেছিলেন এক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে। তিল-মুখি জাতকে সেই গল্প আছে। এত কথা আমার জানা ছিল না। বলছিলেন মিস্টার ঘোষ। হঠাৎ বোধ হয় বুঝতে পারলেন যে, এ গল্প আমার ভাল লাগছে না। সামলে নিয়ে বললেন : জীবকের পরীক্ষার গল্পটা পড়ে দেখবেন, আপনার ভাল লাগবে।

তবু আমি সে গল্প শুনতে চাইলুম না।

ঘুরে ঘুরে মিস্টার ঘোষ তাঁর জাদুঘর দেখালেন, দেখালেন সেই সব দুর্লভ মুদ্রা ও তাম্রলিপি। বললেন : তক্ষশীলার পালি নাম তথ্‌শীলা। গ্রীকেরা বলল, টাক্সিলা। ফা হিয়েন বলেছিলেন চ-শা-শি-লো। তার মানে ছিন্ন মস্তক। বুদ্ধদেব এখানে তাঁর মাথা কেটে সহস্রবার ভিক্ষা করেছিলেন বলে লোকের বিশ্বাস। হিউ এন সাঙ বললেন তা-কা-শি-লো। এ জায়গার বিশদ বর্ণনা লিখলেন তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে।

জাদুঘর দেখে বেরবার সময় মিস্টার ঘোষ আর একটা সংবাদ দিলেন। সেই সংবাদটি আমার ভাল লাগল। বললেন : তক্ষশীলায় আরও একটি দেখবার জিনিস আছে। সে ষাঁড়ের লড়াই। মধ্যযুগের ষাঁড়ের লড়ায়ের গল্প পড়েছেন বিদেশী ক্ল্যাসিকে, বিদেশী বায়স্কোপেও দেখেছেন কিছু কিছু। যদি সময় হাতে থাকে তো চক্ষু সার্থক করে যান আজ।

আমি বোধ হয় লাফিয়েই উঠেছিলুম। মিস্টার ঘোষ হেসে বললেন : একটু বসুন, সঙ্গে লোক দিয়ে দিচ্ছি। আটক নদীর পারে হয় ষাঁড়ের লড়াই।—তার পরেই বললেন : সাবধান, ওপর থেকেই দেখবেন, নীচে নামবেন না।

নদীর তীরে পৌঁছে উপরে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না। উৎসুক দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চাইতে লাগলুম।

পাশে থেকে একজন লোক বলল : বুন্।

আমাকেই যে বলল, তা বুঝতে পারলুম। কিন্তু অর্থবোধ হল না। সাহনি হেসে বলল : নীচে।

আরও খানিকটা এগিয়ে নদীর কিনারায় পৌঁছে আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এ যেন মস্ত একখানি বাড়ির ছাদে উঠেছি। আটক নদী বইছে অনেক নীচে দিয়ে। স্রোতের দু ধারে বিস্তীর্ণ বালুচর। ষাঁড়ের লড়াই হবে সেই বালির চরের ওপর। একজন সুদর্শন ছোকরাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। সাহনি বলল : সেই ছোকরা না ?

তাই কি! আমি আরও মনোযোগ দিলুম।

সেই 'গোল গোল ওয়াঙ্গা' !—বলল সাহনি। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যেন আরও তীক্ষ্ণ হয়েছে।

আমাকে জিজ্ঞেস করছ ?—আমি উত্তর দিলুম : তবেই বিপদে ফেললে। সবাইকে আমি যে একই রকম দেখি।

সাহনি এ কথার উত্তর দিল না। কিন্তু খানিকক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হয়ে বলল : সেই ছোকরাই।

কী করে বুঝলে ?—আমি জানতে চাইলুম।

সাহনি বলল : দেখতে পাচ্ছেন না, কেমন ভীরু হাব-ভাব। ও যে লড়াই করতে পারবে, বিশ্বাস হয় না।

আর একটা লোককে দেখতে পাচ্ছিলুম। লাঠি নিয়ে আস্ফালন করছে তার সামনে, বললুম : ও কী বলছে, বুঝতে পাচ্ছ ?

সাহনি বলল : বলবে আবার কী ! শাসাচ্ছে তাকে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তো ছোকরা ভয়ে কেমন কাঁপছে ?

শেষ পর্যন্ত ষাঁড়ের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল তাকে। বেশীক্ষণ নয় । প্রথম ধাক্কাতেই লোকটাকে শিঙের ওপর তুলে নদীর জলের কাছে ফেলে এল।

মরে গেল, মরে গেল।—বলে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন।

একজন বলল : মেরে ফেলল ছেলেটাকে।

নিজের ছেলে ?—আর একজন জানতে চাইল।

উত্তরও পেয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে : নিজেরই তো।

সাহনি ও আমি মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলুম।

বাপ ছেলেকে দেখতে গেল না। লাফিয়ে গিয়ে ষাঁড়টাকে চেপে ধরল। তার পরেই মেতে উঠল লড়াইয়ে। আমি ছেলেটাকে লক্ষ্য করছিলুম। জন কয়েক লোক তাকে চোখের আড়ালে বয়ে নিয়ে গেল।

তক্ষশীলা থেকে ফেরার পথে আমি কথা কইতে পাচ্ছিলুম না। বিষাদে সারা মন আমার আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। মানুষ এত নৃশংস হতে পারে! ছেলেকে এগিয়ে দেয় নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে !

কী ভাবছ ?—সাহনি জানতে চাইল।

আমি উত্তর দিলুম না। সাহনি ঠিকই সন্দেহ করেছিল, বলল : এরা বোধ হয় পুঠুয়ারী নয়। বড় শান্তিপ্রিয় জাত পুঠুয়ারী। বাণিজ্য ছাড়া আর কিছু তারা করতে চায় না।

তবে ?—আমি সন্দেহ প্রকাশ করলুম।

সাহনি বলল : ছেলেটাকে পুঠুয়ারী বলেই সন্দেহ হয়, কিন্তু বাপের রক্তে সীমান্তের গন্ধ আছে।

একটু থেমে বলল : আজ এই অঞ্চলে 'তক' নামে যে জাতি আছে, টড সাহেব তাকে তুরস্ক জাতির শাখা বলেছেন। আমাদের পুরাণ এই জাতিকে তক্ষকের উত্তর-পুরুষ বলেছেন। তারা ছিল নাগোপাসক। তাই তাদের নিধনের জন্যে জনমেজয়ের সর্পসত্র-যজ্ঞ। মহাভারতে আছে তক্ষশীলায় মহারাজ জনমেজয়ের সর্পসত্র অনুষ্ঠানের গল্প। কানিংহাম সাহেব এদের অনার্য বলে আখ্যা দিয়ে গেছেন। রাজা কনিষ্কের সময় বৌদ্ধ-প্রভাবে এদের নাগোপাসনা লুপ্ত হয়।

সাহনি বোধ হয় আরও কিছু বলত। কিন্তু আমার চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। সাহনির বক্তৃতার দিকে আমার কান ছিল না। আমি ভাবছিলুম গহর খানদের কথা। বাপ ও ছেলের কথা। কী নৃশংস দৃষ্টি! কী অমানুষিক আস্ফালন! ছেলেটা কি মরে গেল! কে জানে! এ নিয়ে সাহনির কোন কৌতূহল নেই। মানুষের চেয়ে কি ইতিহাস বড় ? জীবন্ত মানুষের চেয়ে মৃতের কঙ্কাল ? আশ্চর্য মানুষ এই ঐতিহাসিক আর প্রত্নতত্ত্ববিৎ!

সাহনি বলল : কী ভাবছ ?

সংক্ষেপে বললুম : তোমাদের কথা।

আজ অনেক দিন পর এই গল্প আমার মনে পড়ল। কিন্তু যাদের কথা ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল, তাদের কি আমি চিনতে পেরেছি! কেন জানি না, চিনতে পেরেছি বলেই মনে হল। তক্ষশীলার পিতাপুত্র যেন হারিয়ে যায় নি। তারাই এসেছে আজ আলিপুরের আদালতে। সেদিন আটক নদীর বালুতটে যে ভয় যে কাতরতা দেখেছি সেই ছোকরার দৃষ্টিতে, রহিম খানের দৃষ্টিতে আজ তাই যেন দেখতে পেলুম। মনে মনে স্থির করলুম, আমার উকিল-বন্ধুর শরণ নেব।

আশ্চর্য! আমার সন্দেহ সত্য বলেই প্রমাণ হল। রহিম খান পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। শুনেছিল, এখানকার লোক নাকি নৃশংস নয়। বাংলা দেশের মানুষ মানুষকে ভালবাসে।

ভুল কথা। কিন্তু তর্ক করলুম না এ নিয়ে। বন্ধুর হাত ধরে বললুম : এ মামলা তোমায় হারতে হবে ভাই।

সে কি!—বন্ধু আশ্চর্য হল : অত্যন্ত সহজ মামলা! পুলিসের সাক্ষী আছে, সাবুদ আছে। এ মামলা হেরে গেলে লোকে যে আমায় ছি-ছি করবে।

তা হোক।—আমি উত্তর দিলুম।

বন্ধু বলল : রহিম খানের বাপ আমার পায়ে ধরে পড়েছিল। ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্যে তার সর্বস্ব দিতে চেয়েছে। শুধু ছেলেটাকে নিয়ে ভিক্ষে করে দেশে ফিরবে।

কী জবাব দিলে ?—আমি জানতে চাইলুম।

বন্ধুর চোখও ছলছলে দেখলুম। বলল : বুড়োটার হিংস্র দৃষ্টি জলে ভিজে ঘোলাটে দেখাচ্ছিল। কানা চোখটা কাঁপছিল থরথর করে। দু পা জড়িয়ে বলল—তুমি বিশ্বাস কর উকিলবাবু। ও আমার ছেলে নয়, মেয়ে। অনেক চেষ্টা করেও ওকে ছেলে করতে পারি নি। মেয়ে কি খুন করতে পারে ?

সেদিন তক্ষশীলায় এই লোকটাকে রহিম খানের বাপ বলে বিশ্বাস করি নি। আজ করলুম। বিশ্বাস করলুম যে বুড়োটা ঠিক কথাই বলেছে। রহিম খান আর যাই পারুক, মানুষ খুন করতে কিছুতেই পারবে না।

মামলায় আমার বন্ধু হেরে গেলেন। সে কি আমার কথায়, না, বুড়োটার কান্নায়! হেরে গিয়েও তাঁকে হাসতে দেখলুম। আর আমার কানে বেজে উঠল সেই গান—

চড়ালো কুড়িয়ো ওয়াজা। গোল গোল ওয়াজা॥
গোল গোল ভিড়িয়াঁতে। গোল গোল ওয়াজা॥

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে

৩০শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

শনিবারের চিঠি

জ্যৈষ্ঠ
১৩৬৫

5202

সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদাকে দিয়াই শুরু করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন—"তোমরা হয়তো জান না, মধ্যে আমি কিছুদিন ভারতের পূর্বাঞ্চল—দূরপ্রাচ্যে তীর্থ করিতে গিয়াছিলাম। তোমাদের ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ ধরিয়া ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত সদিয়াকে ডাহিনে রাখিয়া একেবারে সত্যকার পাণ্ডববর্জিত শানরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেখান হইতে শ্যাম ব্রহ্ম কম্বোজ ঘুরিয়া আঙ্কোরভাট-বরবুদর দর্শনান্তে ফিরিয়া আসিয়াছি। এই সফরে মন প্রসন্নতর হইয়াছে, এমন অনেক নূতন সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি যাহা তোমরা জান না, বা অনুমান করিতেও পার না। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান ইস্তক সত্য-মিথ্যা জড়াইয়া নানা জল্পনা-কল্পনা সরকারী ও বেসরকারী গণৎকার এবং রাজনৈতিক খেলোয়াড়দের কৃপায় তোমরা গত তের বৎসর ধরিয়া শুনিয়াছ এবং এখনও শুনিতেছ। তিনি জীবিত না মৃত ইহা লইয়া গবেষণা ও প্রতিগবেষণার অন্ত নাই। সে প্রসঙ্গে আমি যাইব না। তাঁহার উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা বিশ্লেষণ করিয়া বহুজনে বহুভাবে তাঁহাকে মহৎ অথবা অসৎ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছে। বেসরকারী আত্মীয় বা ভক্তেরা এবং সরকারী প্রতিপক্ষেরা নানাস্থান হইতে সমিধ্ সংগ্রহ করিয়া এমন ধূম্রজালের সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার মধ্যে প্রবেশ করে কাহার সাধ্য। তাঁহার সম্বন্ধে তোমাদের পূর্বতন এবং পরিবর্তিত আধুনিকতম মনোভাবের কথা আমি জানি বলিয়াই এই বিচিত্র তথ্যটি দূর হইতে পরিবেশন করিতেছি। যদি এখনও আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস অটুট থাকে তাহা হইলে ইহা সাধারণ্যে প্রচার করিতে পার। সম্ভব হইলে পণ্ডিতজীকেও ইহার একটা ভাবানুবাদ পাঠাইতে পার—শীতল কুলু উপত্যকায়, তপ্তকটাহবৎ দিল্লীর আবহাওয়া হইতে দূরে অবস্থানের ফলে তাঁহার মাথা এখন ঠাণ্ডা আছে। তিনি সহজেই সুভাষকে প্রণিধান করিতে পারিবেন।

মিচিনার অনতিদূরে এক সেগুন-বনের মধ্যে জীর্ণবাস-পরিহিত এক বৃদ্ধ লামার সহিত মুখামুখি হইল। তিনি আমাকে কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিয়া সেলউইন উপত্যকার ব্যবহৃত অপভ্রংশ তিব্বতী ভাষায় প্রশ্ন করিলেন, তুমি বাঙালী? কি জবাব দেওয়া সঙ্গত ভাবিয়া একটু থতমত খাইয়া আমতা-আমতা করিতেছি, তিনি সহাস্যে বলিলেন, ভয় নাই। আমি কিছুদিন ধরিয়া একজন সমঝদার বাঙালীকে খুঁজিতেছি। আমি কয়েক মাস তোমাদের সুভাষচন্দ্রের সঙ্গ করিয়াছিলাম। তাঁহার কিছু কাগজপত্র আমার নিকট রহিয়া গিয়াছে। সেগুলি রক্ষার কঠিন দায়িত্ব ভারতবর্ষের পক্ষে আমি দীর্ঘকাল বহন করিয়া বেড়াইতেছি। বাঙালী খুঁজিতেছি এইজন্য যে এই কাগজপত্রগুলি বাংলা ভাষায় লেখা। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, অনেক বাঙালীর সহিত দেখা হওয়া সত্ত্বেও কাহাকেও এই দায়িত্ব সমর্পণের উপযুক্ত মনে করিতে পারি নাই। আজ তোমাকে দেখিয়া কেন জানি না মনে হইতেছে তুমি পারিবে।

ভারতবর্ষের হইয়া আমি দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি। সাধুর নিকট হইতে মুখে মুখে আরও অনেক কথা শুনিয়াছি। সময় হইলে পরে জানাইব। আপাততঃ সুভাষচন্দ্রের কাগজপত্র ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে যাহা আমার সর্বাধিক চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে হইল তাহা হইতেছে একটি রচনার খসড়া, টুকরা টুকরা ভাষায় লেখক তাঁহার মনের ভাব মাত্র পেন্সিল দিয়া কাগজের পৃষ্ঠায় ধরিয়া রাখিয়াছেন, রচনাটি পূর্ণাঙ্গ পরিণতি লাভ করে

নাই। শিরোনামা দেওয়া হইয়াছে "ভেলা"। আমি লেখকের যথাযথ মনের ভাব একটি কবিতায় রূপান্তরিত করিয়া তাহাই তোমাকে পাঠাইতেছি। তুমি ইহার সদ্ব্যবহার করিলে খুশী হইব। খসড়াটি যে ডাইরির পৃষ্ঠায় বিবৃত আছে তাহার মাথায় তারিখ ৯ই আগস্ট ১৯৪২। খসড়ার মধ্যেই প্রকাশ পাইয়াছে যে, লেখক গোড়ায় মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন কল্পনা করিয়াছেন কিন্তু ভেলা বাঁধিয়া যখন অর্ণবপোতের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তিনি অগাধ জলে নিরুদ্দেশযাত্রায় বাহির হইয়াছেন তখন তিনি একক এবং বিচ্ছিন্ন। অর্ণবপোতটি স্পষ্টতঃই সুরক্ষিত ব্রিটিশ-শাসন। লেখকের খসড়ার আমার কাব্যানুবাদ এই—

ভেলা

মনে নাহি পড়ে কবে ভাসিলাম সমুদ্র-কল্লোলে,
চারিদিকে গরজায় অন্তহীন জলধি বিশাল—
কোন দস্যু-নাবিকের ক্রূর হস্তে বন্দী ছিনু ব'লে
নির্ভয় অর্ণবপোতে চিত্ত মোর আছিল কাঙাল।

নিষ্ফল আক্রোশে শুধু মাথা খোঁড়ে ক্ষিপ্ত জলরাশি,
হাঙর-কুম্ভীর-সর্প লুব্ধ তবু ফেরে নিরুপায়—
শান্ত বায়ু ঝঞ্ঝারূপে মুহুর্মুহু চ'লে যায় শাসি'
বারিধি-শয়নে পুনঃ ব্যর্থ শ্রান্ত নিশ্চিন্তে ঘুমায়।

সুরক্ষিত সুবিপুল দম্ভদৃপ্ত সে তরণী 'পরে
নিদ্রাহারা চক্ষু মোর, বন্দীপ্রাণ নিদ্রা গেল ভুলি,
প্রতীক্ষা করিয়া ছিনু মেঘোদয় সুনীল অম্বরে,
গরজিবে কবে বায়ু উন্মাদ ঝটিকা-শ্বাস তুলি!

নিশ্ছিদ্র সে লৌহপোত কবে ভেঙে হবে খান্ খান্,
ভাসিব তৃণের মত পারহীন উত্তাল সাগরে—
জানি মৃত্যু সুনিশ্চয়, উল্লসিত তবু রবে প্রাণ
ভূমিকম্পে-ভগ্ন-কারা বন্দী যথা পুলকে শিহরে।

হায় ভ্রান্ত, মিথ্যা আশা; গগনে ঘনাল ঘনঘটা,
এল ঝড়, গরজিল তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সিন্ধুজল;
তবুও অটুট তরী, আবার হাসিল রবিছটা,
রহি রহি আশাভঙ্গে বন্দীচিত্ত ব্যথিত বিকল।

তবু না ছাড়িনু আশা, মুক্তিকামী পরান আমায়—
একান্তে গোপনে রহি ভগ্নকাষ্ঠে বাঁধিলাম ভেলা,
একদা ভাসিনু জলে শুভক্ষণে তাই করি সার
সলিল-মরুভূ-বুকে সঙ্গীহীন, আমিই একেলা।

উন্মত্ত প্রবাহে ভাসি, হেরি পোত ভেসে যায় দূরে,
সমুদ্রের সরীসৃপ প্রতীক্ষা করিছে আশেপাশে—
মুক্তির আনন্দ শুধু জেগে রয় সারা চিত্ত জুড়ে,
আশ্রয় করিয়া ভেলা ভেসে যাই অধীর উল্লাসে।

হয়তো মরিব হেথা হাঙর-কুম্ভীর-সর্পমুখে,
অকস্মাৎ ঘূর্ণাবর্তে হয়তো লভিব রসাতল—
হয়তো ভাসিয়া একা দিশাহীন সাগরের বুকে
লক্ষ্যে উত্তরিব এই ভেলা মাত্র করিয়া সম্বল॥

সুভাষচন্দ্রের ভেলা ভারতবর্ষকে লক্ষ্যে পৌঁছিতে কতখানি সাহায্য করিয়াছে সে ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই। কোনদিন হইবে কি না, সে তোমরাই বলিতে পার।"

* * * *

গোপালদা এই সঙ্গে আর একটি হেঁয়ালি-কবিতা পাঠাইয়াছেন, তাহার শুধু শিরোনামা আছে কিন্তু কোনও টীকা নাই। কোনও বুদ্ধিমান পাঠক যদি এই রহস্য ভেদ করিতে পারেন এই আশায় সেই ছড়া-কবিতাটিও মুদ্রিত করিলাম। কবিতার শিরোনামা—কাশ্মীর।

কাশ্মীর

গিলিয়া ফেলিতে চায় যথা রসগোল্লা,
মনে রেখো তারা হ'ল মল্ল বা মোল্লা।
চেখে চেখে খেতে চায়
সবই বাতাসাঁর প্রায়
জেনো তারা সমুদায় ক্ষীণপ্রাণ পণ্ডিত—
শাস্ত্রের টেনে জের
চারিদিকে দিয়ে বেড়
চলে তারা হৃদয়ের বিলকুল বিপরীত।
ভারী মোল্লার দল,
পণ্ডিত হীনবল,
হয় তারা নিষ্ফল জীবনের যুদ্ধে।

গোল্লা গেলায় মন
কর কর অর্জন
তবেই জিনিবে রণ ওহে তন্নবুদ্ধে।
আস্ত গিলিয়া খায়
চেয়ে চেয়ে দেখো তায়
আর কর, "হায় হায়", শেষে হও জীর্ণ ;
স্মরি বীর বৃকোদরে
যাহা পাস গ্রাস ক'রে
পণ্ডিতী ছেড়ে হ' রে মৃত্যুত্তীর্ণ॥

—

মনে আছে, কয়েক বৎসর পূর্বে কলিকাতার এক সম্রান্ত সামাজিক বিবাহ-ভোজে শ্রীমতী সত্যবতীতে রূপান্তরিত এক মৎস্যগন্ধা, সদ্যবিবাহিত স্বামী সহ উপস্থিত হওয়ামাত্র একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সস্ত্রীক সভামণ্ডপ ত্যাগ করেন। তাঁহার সামাজিক শুচিতাবোধে দুই একজন খুশী হইলেও অনেকের বিরক্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। অর্থাৎ ভাঙন তখনই ধরিয়াছিল। শুচিতা-কামীর দল তখনই সংখ্যালঘু। ফলে আজ মৎস্যগন্ধারাই সমাজে সমধিক সম্মানিত হইতেছেন। বুনো রামনাথ আজ বাঁচিয়া থাকিলে হাতে-মাত্র-লাল-সুতাবাঁধা তাঁহার মহিমান্বিতা সহধর্মিণীকে ফোটো-সম্বলিত আবেদনসহ কোনও চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানে ধর্ণা দিতে দেখিয়া পুলকিত হইতেন। বর্তমানে জগন্নাথের রথ এমনই উল্টাইয়াছে যে কলেজে-পড়া অর্থাৎ শিক্ষিতা মেয়ে গর্ভধারিণী জননীর চলনে অমুক দেবীর চলনের ধাঁচ দেখিয়া তাঁহাকে কম্পিমেন্ট দিতেছে এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। অর্থাৎ লাইনে চলা ট্রামেরা আজ ব্যাকডেটেড, যথেচ্ছগামী বাসেরাই প্রভূত সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে।

যেমন সমাজে তেমনি রাষ্ট্রে। অবশ্য সেখানে বরাবরই কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং কামন্দকীয় নীতিই প্রধান ছিল। তথাপি লিঙ্কন বার্ক রুজভেল্ট উইলসন নেভিনসন ম্যাকডোনাল্ড গান্ধীদের অভাব সেদিনও পর্যন্ত ঘটে নাই। বৈদেশিক রাষ্ট্রের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ ইঁহারা তো করিয়াছেনই স্ব রাষ্ট্রে দুর্নীতির প্রতিরোধ করিতেও প্রাণপাত করিয়াছেন। আজ ভুয়া সহাবস্থানের নামে ডেলিগেশন চালাচালি এবং মুখে এক মনে আর পলিসির কামুফ্লাজে সত্য চাপা পড়িতেছে। সবাই খরগোসের মত চক্ষু বুজিয়া শেয়ালের মত চিন্তা করিতেছে।

ব্যাপারটি যে কত উৎকট একটা উপমার দ্বারা বুঝাইতেছি। কোনও প্রতাপশালী ব্যক্তির গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। আমরা জানি সেই গৃহেরই এক কক্ষে অবাধে মানুষ খুন করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, কোনও কক্ষে মানুষকে অবিরাম ঠাণ্ডা শাস্তি দেওয়া হইতেছে, কোনও কক্ষে দুই-দশ জনকে গুম করিয়া রাখা হইয়াছে। তৎসত্বেও চোখঠারাঠারি পলিসির খেলে আমরা সেই বাড়িতেই দেখনহাসি হইয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেছি এবং দুই দিন চব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের আপ্যায়নে এমনই ধর্মবিস্মৃত হইতেছি যে, ফিরিয়া আসিয়া অতি উপাদেয় উদ্‌গার তুলিয়া পেটে হাত বুলাইতেছি। কক্ষান্তরের আর্তনাদ হয়তো নৃত্য-নাট্যাভিনয় ও পরমাসুন্দরী দোভাষীর সতর্ক সেবা ভেদ করিয়া কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু আখেরে লাভের কথা চিন্তা করিয়া আর্তনাদকেই উল্লাস ধরিয়া লইয়া মনকে চোখ ঠারিতেছি। কাজেই সংবাদপত্রের এক পৃষ্ঠায় যেদিন পৃথিবীর জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের শোচনীয় ও লজ্জাকর কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে, সেই দিনই অপর পৃষ্ঠায় হত্যা-অনুষ্ঠাতাদের আহা-মরি-এমন-দেখি-নাই প্রশস্তি প্রকাশ সম্ভব হইতেছে। খুনকে নিন্দা করিব অথচ খুনেদের সহিত খানাপিনা-মুলাকাৎ-দহরম-মহরম-মহব্বৎ করিব—পঞ্চশীল ও সহ-অবস্থানের দোহাই দিয়া সে দুর্নীতি অবাধে চলিতেছে। পলিটিক্সের গূঢ় প্রয়োজনে হয়তো এইরূপ আচরণ অনিবার্য কিন্তু যখন দেখিতেছি শিল্প-সংস্কৃতি-সাহিত্যের নামেও এই নৃশংস হত্যার অনুষ্ঠাতারা জয়যুক্ত হইতেছে, তখন বুঝিতেছি পৃথিবীর বড় দুর্দিন আসিয়াছে।

—

গত ৪ঠা আষাঢ় বৃহস্পতিবারের 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় স্তম্ভে "নৃশংস হত্যা" শিরোনামায় এই নিবন্ধটি বাহির হইয়াছে :

"নৃশংস হত্যা

কম্যুনিস্ট বিচার-ব্যবস্থার নিষ্ঠুর প্রহসন এখন আর কাহারও অজানা নাই। স্টালিনের উত্তরাধিকারী ও শিষ্যরাই সেই নৃশংস হত্যালীলার অগণিত গোপন কাহিনী

প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। আবার তাঁহারাই এখন নূতন রক্তাক্ত ইতিহাস রচনা সুরু করিয়াছেন স্টালিনী পদ্ধতিতে। যে অবস্থায়, যেভাবে হাঙ্গেরীর ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী ইমরে নেগী ও তাঁহার তিনজন সহচরকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়, মানবধর্মের এই চরম লাঞ্ছনা ও অপমানে অপরিসীম ক্ষোভ ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। আদালতে রীতিমত বিচারে অপরাধী প্রতিপন্ন হইলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচর তিনজনকে সভ্যজগতের রীতিসম্মত পদ্ধতিতে গ্রেপ্তার করা হয় নাই, বিচার করা হয় নাই। তাঁহাদিগকে সুপরিকল্পিত ভাবে হত্যা করা হইয়াছে; সুবিচার দূরের কথা, তাঁহাদের বিচারই হয় নাই। তথাকথিত "গণ-আদালতে" গোপনে তাঁহাদের বিচার হইয়াছে বলিয়া মস্কো হইতে যে খবর প্রচারিত হইয়াছে, তাহা অন্ধ কম্যুনিস্ট সমর্থকেরা ছাড়া কেহই বিশ্বাস করিবেন না। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা স্মরণ করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে, ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচর তিনজনকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জল্লাদের হাতে সমর্পণ করা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে হাঙ্গেরীতে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। হাঙ্গেরীকে সোভিয়েটের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছিল যেসব কম্যুনিস্ট নেতারা, সেই রাকোসি, জেরো প্রভৃতি অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীর জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সোভিয়েট সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালায়। এই সঙ্কটময় সময়ে ইমরে নেগী হাঙ্গেরীর প্রধান মন্ত্রিত্বপদ গ্রহণ করেন। নেগী নিজেও কম্যুনিস্ট, তবে প্রবল জনমতের চাপে পড়িয়া প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি হাঙ্গেরী হইতে সোভিয়েট সৈন্য অবিলম্বে সরাইবার দাবী করেন, কুখ্যাত অত্যাচারী গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং হাঙ্গেরীতে স্বাধীনভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য, ইহার কোনটিই মস্কোর বড়কর্তাদের পছন্দ হয় নাই। অতঃপর তাঁহাদের হুকুমে যেভাবে সোভিয়েট সেনাবাহিনী হাঙ্গেরীর গণ-বিদ্রোহ দমন করে, তাহার তুলনা কোনো সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসেও মেলে না। বিপদ বুঝিয়া প্রাণে বাঁচিবার জন্য ইমরে নেগী ও তাঁহার কয়েকজন সহচর রাজধানী বুদাপেস্তে যুগোশ্লাভ দূতাবাসে আশ্রয় নেন। ইতিমধ্যে হাঙ্গেরীতে জানোস কাদারের প্রধান মন্ত্রিত্বে নূতন করিয়া সোভিয়েটের তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী কাহিনী বিশ্বাসঘাতকতায়, অমানুষিকতায় চরম কলঙ্কলিপ্ত।

সোভিয়েটের তাঁবেদার নূতন হাঙ্গেরী সরকার যুগোশ্লাভ দূতাবাসের নিকট দাবী করে যে, সেখানে নিরাপদ আশ্রয়প্রাপ্ত ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচরগণকে হাঙ্গেরী সরকারের হাতে ফিরাইয়া দিতে হইবে। আন্তর্জাতিক বিধিবিধান অনুযায়ী এই দাবী অন্যায্য। তবে প্রবল চাপে পড়িয়া যুগোশ্লাভ দূতাবাস ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচরদের ফিরাইয়া দিতে রাজী হন একটি সর্তে। এই সর্ত অনুযায়ী হাঙ্গেরীর কম্যুনিস্ট সরকার দৃঢ় আশ্বাস দেয় যে, ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচরদের কোনরূপ অনিষ্ট করা হইবে না। কিন্তু নেগী ও তাঁহার সহচরগণ যুগোশ্লাভ দূতাবাস হইতে বাহির হইবামাত্র সোভিয়েট সৈন্যদল তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। এক্ষেত্রে কম্যুনিস্ট বিশ্বাস-ঘাতকতার সুরু হইতে এক মুহূর্ত বিলম্ব হয় নাই, দ্বিধা হয় নাই। যুগোশ্লাভ সরকার এই জঘন্য প্রতারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া প্রতিকার লাভে ব্যর্থ হন। তাঁবেদার হাঙ্গেরী সরকার ও তাহার মস্কোর মুরুব্বিগণ এখানেই ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচরগণের জীবন বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন বলা যায়। তারপরও কিন্তু মস্কো এবং বুদাপেস্ত হইতে অজস্র মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে, ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচরগণ স্বেচ্ছায় রুমানিয়ায় গিয়াছেন এবং সেখানে বেশ আনন্দেই আছেন। ঘৃণ্য কম্যুনিস্ট প্রতারণার আর একটি প্যাঁচ ইহা।

এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইমরে নেগী ও তাঁহার সহচরগণকে গত দেড় বৎসরকাল বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। কোথায়, কি অবস্থায় তাঁহাদের রাখা হইয়াছিল, তাহা জানা অসম্ভব। তবে মস্কো এবং তাহার তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলি রাজনৈতিক বন্দীদের উপরে যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়া থাকে, নেগী এবং তাঁহার সহচরদের বেলায় তাহার ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই হয় নাই। দেড় বৎসরকাল নেগী ও তাঁহার সহচরদের অজ্ঞাতবাসে রাখিবার পর মস্কো হইতে এখন খবর প্রচার করা হইয়াছে যে, ইঁহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে, ইঁহারা আর ইহলোকে নাই। প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতায় যার সুরু, বর্বরোচিত হত্যালীলায় তার সমাপ্তি। সমস্ত ঘটনাটি সুপরিচিত কম্যুনিস্ট কায়দায় সারা হইয়াছে। তবুও ম্যালেনকভ, বুলগানিন বাঁচিয়া আছেন কি মরিয়াছেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীক্রুশ্চেভ বড়ই গোসা হন। কম্যুনিস্ট রাজত্বে যখন "গণ-আদালতে" পর্দার আড়ালে বিচার, প্রাণদণ্ড এবং তার হাতে হাতে ফল পাইতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না, তখন অ-কম্যুনিস্টরা মাঝে মাঝে শ্রীক্রুশ্চেভকে অসুবিধাজনক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেই। উপরন্তু নেগী ও তাঁহার সহচরদের যেভাবে হত্যা করা হইয়াছে তাহাতে সারা পৃথিবীতে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট-গোষ্ঠীর রীতিনীতি, কার্যকলাপ সম্পর্কে নূতন করিয়া গভীর বিরাগ ও সন্দেহের সৃষ্টি হইবে।

নেগী ও তাঁহার সহচরদের নৃশংসভাবে হত্যা কেবল

শোকাবহ নয়, তার চেয়েও বড় কথা যে, এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে, স্টালিনী নিষ্ঠুরতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই, কম্যুনিস্ট আচরণে সততার প্রতিশ্রুতির মূল্য কানাকড়িও নয়। বিচারে দণ্ডাদেশের ছল করিয়া যাঁহাদের হত্যা করা হইল, তাঁহাদের একমাত্র "অপরাধ" তাঁহারা দেশপ্রেমিক; তাঁহারা হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট আধিপত্য ও অত্যাচারের অবসান চাহিয়াছিলেন। তা ছাড়া আরও কথা যে, তাঁহাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। হাঙ্গেরীর তাঁবেদার সরকার ও সোভিয়েট কর্তারা বার বার আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, নেগী ও তাঁহার সহচরগণ নিরাপদে নির্বিঘ্নে আছেন। দেড় বৎসর বন্দী করিয়া রাখার পর যে অজুহাতে এবং যেভাবে এই নিরপরাধ ব্যক্তিগণকে অসহায় অবস্থায় বধ করা হইল, তাহাতে কম্যুনিস্ট বিশ্বাসঘাতকতা ও পৈশাচিকতার স্বরূপ পুনরায় বিশ্ববাসীর সমক্ষে প্রকট হইল। নেগী ও তাঁহার সহচরগণের হত্যার জন্য কেবল হাঙ্গেরীর ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সরকার নয়, পৃথিবীর সকল দেশের কম্যুনিস্ট-পন্থিগণ ধিকৃত হইবে।"

—

ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় ইদানীং প্রকাশিত গবেষণা-মূলক পুস্তকের উৎকর্ষের উল্লেখ করিয়াছি। অত্যল্পকালের মধ্যে জগদীশ ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রনাথ রায়, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্রনাথ ও মধুসূদন, মঙ্গলকাব্য ও লোকসঙ্গীত, বাউল গান, বিদ্যাসাগর, কবিওয়ালা, সিপাহী বিদ্রোহের আমল, প্রমথ চৌধুরী ও সাধারণভাবে বাংলাসাহিত্য লইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বাংলা সাহিত্য ও ইতিহাসের গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রসারই সূচিত করিতেছে। এত দমও বাঙালী গবেষকদের আগে ছিল না। পাঠক সমাজও এইরূপ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার পক্ষপাতী পূর্বে ছিলেন না। তরুণ গবেষকদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা গবেষণার ক্ষেত্র হইতে অতি সরস আজগুবি কল্পনা ও নীরস স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সকে বিদায় দিয়া তথ্যের সঙ্গে রসতত্ত্বের সংযোগ ঘটাইতেছে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' এই দিক দিয়া সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র-গবেষণায় নূতন আলোকপাতের গৌরব লেখক অর্জন করিলেন শুধু নয়, অবহেলিত মধুসূদনকেও পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার রসসমৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক যুক্তি বিবিধ দৃষ্টান্ত সহযোগে সুখপাঠ্য সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ও বাংলা কাব্যের ক্রমপরিণতির ইতিহাস জানিতে হইলে এই গ্রন্থ অনিবার্যভাবেই ব্যবহার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের গবেষণার এখানেই শেষ হয় নাই। 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'কবিমানসী'তে তাহা স্পষ্ট ও বিশিষ্টতর রূপ লইতেছে। বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গী অর্থাৎ বাক্ ও অর্থ জগদীশ ভট্টাচার্যের লেখায় পার্বতী-পরমেশ্বরের মতই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। সাহিত্য-আলোচনাকে বাংলাদেশে যাঁহারা সাহিত্য করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যা বেশি নয়। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র ও মোহিতলালের পরেই জগদীশ ভট্টাচার্য এ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিলেন।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাউল' এবং নিরঞ্জন চক্রবর্তীর 'কবিওয়ালা', বিবিধ আলোচনার সঙ্গে প্রায় পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ দেওয়াতে অতিশয় মূল্যবান হইয়া উঠিয়াছে। উপেন্দ্রনাথ মূল অনুসন্ধানে একটু মাত্রাতিরিক্ত সময় ব্যয় করিলেও তাঁহার গ্রন্থখানি নানা তথ্যের আকর স্বরূপ গণ্য হইবে। নিরঞ্জন চক্রবর্তীও কবিওয়ালাদের সম্পর্কে সমসাময়িক পত্রিকা, বিশেষ করিয়া 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে যত দূর সম্ভব যাবতীয় তথ্যই সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্রের 'বাশুলী মঙ্গল বা বিশাললোচনীর গীত' সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দুসুন্দর সিংহ রায়ের সম্পাদনায় সম্প্রতি বাহির করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মুখবন্ধে আমরা যাহা লিখিয়াছি তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:

"ইংরেজী ষোড়শ শতকের শেষে রচিত কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল বাংলা সাহিত্যের একটি স্তম্ভ; প্রায় সমসাময়িক (কিছু পূর্বের) এই বাশুলীমঙ্গল অতঃপর অন্যতম স্তম্ভরূপে বিবেচিত হইবে এবং বাংলা দেশের তদানীন্তন সামাজিক ইতিহাস স্পষ্টতরভাবে রচিত হইতে পারিবে।"

আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে'র পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশ বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। পরিষৎ কর্তৃক নূতন প্রকাশিত উপরোক্ত

'বাশুলীমঙ্গল' এবং কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত কবিচন্দ্রের 'শিবায়ন' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী প্রভৃতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত নূতন কয়েকটি মঙ্গল-কাব্যের যথাযথ আলোচনা না থাকাতে ভট্টাচার্য মহাশয়ের এই গ্রন্থের পূর্বেকার সংস্করণ অসম্পূর্ণ ছিল। আমরা এতদিনে এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণাঙ্গ এই ইতিহাস পাইয়া লেখকের প্রতি অবিমিশ্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' একখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ। অথচ ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত ও নিঃশেষিত হইবার পর দীর্ঘ ৩২ বৎসর কাল ইহা অমুদ্রিত ছিল। ইহার প্রধান কারণ গ্রন্থকার ইহাতে কয়েকটি নূতন অধ্যায় সংযোজন করিতে চাহিয়াছিলেন। তন্মধ্যে "গীতার কালমাহাত্ম্য" অধ্যায় ছাড়া অন্য অধ্যায়গুলি তিনি লিখিয়া গিয়াছিলেন, "কালমাহাত্ম্য" অধ্যায়ের জন্য বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতে-ছিলেন, এমন সময় তাঁহার দেহান্তর ঘটে। সংগৃহীত তথ্যগুলি রহিয়া গিয়াছে কিন্তু সেগুলিকে সুষ্ঠু রূপ দিয়া গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করা সম্ভব হয় নাই। সুখের বিষয় হীরেন্দ্র-নাথ লিখিত নূতন অধ্যায়গুলি এই সংস্করণে সংযোজিত হওয়াতে পুস্তকের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই নূতন সংস্করণের জন্য আমরা মনস্বী হীরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র শ্রীকনকেন্দ্রনাথকে ধন্যবাদ দিতেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাঙলা বিভাগ" হইতে প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বর্ষা ১৩৬৪) কিছুকাল পূর্বে পাইয়াছিলাম। সম্প্রতি ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা (শীত ১৩৬৪) হাতে পাইয়া স্থিরনিশ্চয় হইলাম যে, বাংলা সাহিত্য-গবেষণার ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী কিছু করিবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এমন সুসম্পাদিত মূল্যবান প্রবন্ধ সম্বলিত সাহিত্য-পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ হইতে একটিও প্রকাশিত হয় না। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁহাদের বিন্দুমাত্র মমতা আছে তাঁহারা অচিরাৎ এই পত্রিকা সংগ্রহ করিবেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহের "বৌদ্ধগানের ভাষা" ও "কাহ্নপার কালনির্ণয়", কাজী দীন মুহম্মদের "পদ্মাবতী কাব্যে আলাওয়াল", আহমদ শরীফের "আলাউল-বিরচিত 'তোহ্‌ফা'" ও "বিদ্যাসুন্দরের কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান" এবং সম্পাদক মহাশয়ের "বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি" বিষয়ক প্রবন্ধ দুইটি—এই তালিকাই পত্রিকার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিবে। মুসলমান গবেষকদের সহিত যোগ দিয়াছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অজিতকুমার গুহ প্রভৃতি। ফলে পত্রিকাটি সার্থকনামা সাহিত্যপত্রিকা হইয়াছে।

নিখিলভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি 'ভাষা-ভারতী' পত্রিকা প্রকাশ করিয়া এতদিনে কাজের মত কাজ করিলেন। সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে আন্তরিক সাধুবাদ জানাইতেছি। তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত অধ্যবসায় যে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে সর্বভারতীয় গৌরব দিবে ইহা আমরা অনুমান করিয়াছিলাম। 'ভাষা-ভারতী'র প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ ১৩৬৫) ও রবীন্দ্রজয়ন্তী সংখ্যা ১৩৬৫ দেখিয়া বুঝিলাম আমাদের অনুমান বাস্তবে পরিণত হইয়াছে।

—

কম্যুনিজ্‌ম নামে যে থিওরি বা ধর্ম ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট নেতাদের মুখে মুখে অথবা তাঁহাদের পরিচালিত পত্রপত্রিকা মারফৎ প্রচারিত হয় তাহাতে আমাদের এই ধারণা জন্মে যে এই ধর্মে মতি হইলে মানুষের সকল বিলাস-স্পৃহা শুকাইয়া ঝরিয়া যায়, সে অপর সকল মানুষকেই সমান জ্ঞান করে, তাহার চরিত্রভ্রষ্টতা দূর হয়, ব্যক্তিগত খেয়াল পরিতৃপ্তির জন্য সে রাষ্ট্রের সমাজের বা নিজের বিত্ত বা অর্থের অপব্যয় করে না, সকলের কল্যাণের জন্য সে নিজস্ব বিত্তও রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়া দেয়। তখনই যথার্থ কম্যুনিজ্‌ম প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ হইতে পারে।

এই ধর্মের জন্ম যেখানেই হউক, বর্তমান শতাব্দীর গোড়া হইতে ইহা রাশিয়াতেই ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। এই ধর্মানুযায়ী সেখানে বিগত অর্ধশতাব্দী-কাল ব্যক্তি ও সমষ্টির শোধনকার্য চলিতেছে। সমষ্টির শোধনে হাঙ্গামা নাই। তাহার অবাঞ্ছিত অংশকে রাতারাতি নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার মত মনোবল এই ধর্মের পুরোহিতেরা অর্জন করিয়াছেন; একে-দুইয়ে-পাঁচে-দশে-শ'য়ে-হাজারে মাত্র নয়, বাট হাজারের রেকর্ডও স্থাপিত হইয়াছে।

বন্ধুর প্রতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহযাত্রী, লহ নমস্কার।
দুর্গম সংসার-পথে চলিতে চলিতে একদিন
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে ক্ষণিকের বিশ্রামশালায়
সহসা হইল দেখা। পরস্পর পরিচয়হীন
তবু মনে হ'ল চেনা, পান করি এক পেয়ালায়
রসের অমৃত-সুরা উভয়েই ধন্য মানিলাম।
জন্মান্তর-সৌহৃদ্যের হে বন্ধু, কে পারে দিতে দাম?
বাঁকে বাঁকে অপরূপ নিত্য নব বিচিত্র সংসার,
অনুক্ষণ চলে তাই ঘাটে ঘাটে ঘটে পরিচয়
স্রোতোমুখে যায় ভেসে, ভালবাসি, ভুলে যাই
হেথা তাই
পরম বিস্ময়।

বাণীহীন মসীপাত্রখানি—
ব্যাকুল আগ্রহভরে যেন মোর মুখপানে চায়,
মিনতি করিয়া কহে, "বন্ধু, কর লেখনী ধারণ।
সুবিপুল এই পৃথ্বী, নিরবধি কাল দ্রুত ধায়;
যাহা ভাল লাগে, বল, কেটে যাবে এই শুভখন।
অনন্ত কালের বুকে ক্ষণিকের ছন্দোময় ভাষা
প্লাবিত করিয়া দিক পথিকের পথের পিপাসা,
মোর বুক কর খালি, ঢালি তব হৃদয়ের বাণী।
লেখনী তুলিয়া লও, সাদারে করিয়া দাও কালো,
এ পান্থশালার স্মৃতি রাখ বন্ধু, বাণী মুখে
মোর বুকে
কালো হোক আলো।"

মানি সেই মূক আবেদন
তোমারে স্মরিয়া বন্ধু, খুলিয়াছি মনের ভাণ্ডার।
এ অনিত্য পৃথিবীতে—নিত্য যাহা রহে ধ্বনিময়
অতিক্রমি খণ্ডকাল তাই হয় চিরচমৎকার।
সংশয়ের উর্ধ্বে উঠি নিত্য হোক ক্ষণ-পরিচয়—
তুমি একা মোরে দিলে, আমি দিব সবার উদ্দেশে—
কে শুনিবে নাহি জানি, না জানি কে নেবে ভালবেসে।
তুমি উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য মোর এ বিশ্ব-ভুবন।
ছন্দে সুরে যদি কভু সার্থকতা লভে মোর বাণী
হারাইয়া যাই যদি তুমি আমি এই ভবে
ধন্য হবে
মসীপাত্রখানি॥

কিন্তু ব্যক্তির পার্জ বা শোধন অত সহজ নয়। ব্যক্তির মধ্যেই দেবতা ও শয়তান উভয়েরই একত্রে বাস, অনেক মানুষের গলা কাটা সহজ কিন্তু একজন মানুষের হৃদয়-শোধন সহজ নয়। বিগত ৫৩ বৎসরের ধর্মসাধনায় সেখানে ব্যক্তির কতখানি শোধন হইয়াছে তাহা বহিঃ-পৃথিবীর লোকের জানিবার কথা নয়, তাঁহারা দয়া করিয়া জানাইতেছেন বলিয়াই জানিতে পারিতেছি। কিছুকাল পূর্বে এই ধর্মের মুখপত্র 'প্রাভ্দা' জানাইয়াছিলেন যে সেখানকার মেয়েরা অত্যন্ত বিলাসী হইয়া পড়িতেছেন, চিত্তাকর্ষক করিয়া স্ব স্ব প্রদর্শনীয় অবয়ব প্রদর্শনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে বিপুল প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। 'প্রাভ্দা' উলঙ্গবাহার বস্ত্রের অত্যধিক ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন।

দুই মাস যাইতে না যাইতেই 'প্রাভ্দা' আবার উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন। গত ১৫ই জুনের সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'প্রাভ্দা' "রুশ জনগণের অত্যধিক সুরাপান দোষে"র নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, "মাত্লামির ফলে স্বজন-পোষণ, ঘুষ, অনিয়মানুবর্তিতা, গুণ্ডামী ও নোংরা কাজের জন্ম হইতেছে এবং সর্বোপরি উৎপাদন হ্রাস পাইতেছে।...ভোদ্কার দাম ইতিমধ্যেই শতকরা ত্রিশ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং ককেশাস হইতে আনীত কম জোরালো মদ জনপ্রিয় করার চেষ্টা করা হইতেছে।"

অর্থাৎ মানুষ এত চেষ্টাতেও কম্যুনিস্ট হইতে পারিতেছে না, মানুষই থাকিয়া যাইতেছে। এই অকস্মাৎ মদ্যপান বৃদ্ধির কারণ একটা থাকিতে পারে। গত ১০ই মার্চ বিশ্ববিখ্যাত ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ ডাক্তার গ্রীন আর্মিটেজ লস এঞ্জেলেস হইতে ঘোষণা করিয়াছিলেন,

"Almost all the geniuses of the world have been alcoholics, drug-addicts...Scientific progress towards the conquest of alcoholism and drug-addiction would undoubtedly decrease the number of geniuses in the future, or bring about their total disappearance."

এই সর্বনাশা ঘোষণার বঙ্গানুবাদ দিতে ভরসা পাইলাম না। রাশিয়ায় বর্তমান শতাব্দীতে স্পুটনিক ছাড়া অন্য প্রতিভার জন্ম হয় নাই। সাহিত্যে তো একেবারেই খরা চলিতেছে। শিল্পের ক্ষেত্রেও কেচালভ, আইজান-স্টাইন, পুডভকিনদের আর জন্ম হইতেছে না। মেচনিকফ, মেমিলভ ও প্যাভলভেরাও উনবিংশ শতাব্দীরই দৈত্য—ক্রুশভ-ভরোশিলভেরাও তাই। কাজেই সম্ভবতঃ রাশিয়ার মানুষেরা কম্যুনিস্টতন্ত্র এড়াইয়া ঠাসিয়া মদ খাইতেছেন। প্রতিভায় বড় অভাব, ধর্ম চুলায় যাক, প্রতিভা বা জিনিয়াস চাই!

প্রসঙ্গ কথা

জনপ্রিয়তা বনাম নিষ্ঠা

নারায়ণ চৌধুরী

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বাংলা দেশের অধিকাংশ লেখকই বর্তমানে জনপ্রিয়তার পথ অবলম্বন করে চলেছেন। জনপ্রিয়তার পথ অর্থাৎ যে-জাতীয় সাহিত্যচর্চার দ্বারা সস্তা হাততালি লাভ করা যায়, সস্তা বাহবা কুড়নো যায়, সেই পথ ও প্রক্রিয়াতেই যেন বেশীর ভাগ লেখক আসক্ত বলে মনে হয়। এঁরা আশু লাভের উপর নিবদ্ধদৃষ্টি এবং সেই লাভ কোনগতিকে হস্তগত হলেই পরিতৃপ্ত। যে সাধনার সুফলভাগী হতে হলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়, সযত্ন নিষ্ঠা ও অনলস উদ্যমের দ্বারা তিল তিল করে নিজেকে গড়ে তুলতে হয়, সেই কঠিন পথের পথিক হবার মত মনোবল ও ধৈর্য খুব কম লেখকেরই অধিগত। সহজিয়া সাধনাটাই যেন বর্তমান কালের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু লেখকদের পরিস্থিতির চাইতেও বিমর্ষকর পরিস্থিতি আছে, সেইটেই আমাদের ভাবিয়ে তুলছে বেশী। দেখা গেছে যে-সব লেখক সস্তার কারবারী, তাঁদের প্রতিই সামাজিক সমর্থন সমধিক প্রসারিত। আশু সাফল্যে শুধু যে স্বীয় বৈষয়িকতার বুনিয়াদটাকেই সুদৃঢ় করে তোলা যায় তা-ই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের বিচারহীন অনুরাগকেও নিজের অনুকূলে আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। এই খেলার মাঠ আর সিনেমা আর দৈনিক সংবাদপত্র-শাসিত বাংলা দেশে সাহিত্যও কালক্রমে ওই তিনের পর্যায়ভুক্ত হয়ে উঠেছে। ফলে যাঁরা ওই তিনের মনোভঙ্গী নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন তাঁদের উপরেই জনতার পক্ষপাত সবচেয়ে বেশী ন্যস্ত দেখা যায়। খেলার মাঠ আর সিনেমা আর দৈনিক সংবাদপত্র শুধু যে জনতার রুচির মুখ চেয়ে চলে তা-ই নয়, জনতার রুচিকে টেনে নামানোই তাঁদের প্রধান কাজ এবং ওইতেই তাঁদের অস্তিত্বের প্রধান সার্থকতা। সাহিত্য এখন ওই তিনের আশ্রিত অবজ্ঞেয় পথ ধরেছে। জনমনোরঞ্জনের অত্যুগ্র আগ্রহে সাহিত্যিকবৃন্দ সস্তা খেলো সাহিত্য সৃষ্টি করে তাঁদের মর্যাদাকে ওই তিনের আশ্রয়ী ব্যক্তিদের মর্যাদার সমতুল করে তুলছেন। এরকম পরিস্থিতি পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। এখন সে-সব লেখকেরই বাজার-দর বেশী, যাঁরা সিনেমা আর দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে কাঁধ-ঘেঁষাঘেঁষিতে অধিক রপ্ত। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রচারবল বেশী অর্থবল বেশী সজ্ঞশক্তি বেশী, সেইটিই কারণ যার জন্য নগদপ্রাপ্তিলোলুপ বৈষয়িকবুদ্ধিসার লেখকের দল আত্মসম্মান খুইয়ে প্রায়শঃ দৈনিক সংবাদ-পত্রের আশেপাশে ঘুরঘুর করেন। তার চেয়েও যেটা লজ্জার কথা, দৈনিকের কর্তৃত্বাভিমানী পরিচালক কিংবা দৈনিকের প্রভাবপুষ্ট সাপ্তাহিকের সম্পাদক জাতীয় অচেতন ব্যক্তিদের সাহিত্যের এক-একজন কেষ্টুবিষ্টু মনে করে এঁরা তাঁদের কাছে নিজেদের সাহিত্যিক বিবেক অক্লেশে সমর্পণ করে বসে থাকেন। যখন কোন লেখক স্বশ্রেণীর শক্তিমান্‌কে মর্যাদা না দিয়ে দৈনিকের বা সাপ্তাহিকের ব্যবসাদারকে বক্রগ্রীব আনুগত্য জানাতে তৎপর হয়, তখনই বুঝতে হবে সেই লেখকের মানসিক অধঃপতন ঘটেছে। তাঁর লেখায় শক্তির অভিব্যক্তির প্রমাণ আশা করাই ভুল। চরিত্রের দৃঢ়তা ব্যতিরেকে রচনার মধ্যে শক্তির স্ফুরণ হয় না। শিল্পীর আত্মমর্যাদাবোধ থেকেই শিল্পীর ব্যক্তিত্বের জাগরণ।

কিন্তু এ-সব কথা কে কাকে বোঝায়! সমগ্র দেশটাই যে চটুলভাবাপন্ন, বৈশ্যমনোবৃত্তিচালিত, নগদ কারবারের কারবারী হয়ে উঠেছে। লেখকদের হিতকথা শোনাতে গেলে শুধু যে তাঁরাই বেঁকে বসেন তা-ই নয়, তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের পার্শ্বচর অনুরাগী ভক্ত তরুণের দল এবং তাঁদের গ্রন্থাদির ব্যাপক (স্বভাবতঃই) প্রচারের ফলভোগী

প্রবীণ অথচ জড়বুদ্ধি প্রকাশকের দল তাঁদের পক্ষাবলম্বন করে নর্তন-কুর্দন শুরু করতে বাকী রাখেন। আরও যেটা আশ্চর্য, সাহিত্যের অতি শক্তিশালী বর্ষীয়ান প্রতিনিধিও দৈনিক পত্রিকার প্রচার-প্রত্যাশী হয়ে এইসব স্বল্পশক্তিবিশিষ্ট আদর্শবর্জিত ব্যক্তিত্বহীন লেখকদের প্রশ্রয়দানে দ্বিধা করেন না। এঁদের উৎসাহেই আরও প্রতিভাহীন তরুণেরা উৎসাহ পায় এবং তার ফলে সাহিত্যের আবহাওয়া ক্রমশঃ আবিলতর হয়ে উঠতে থাকে। যে-সকল সৃষ্টিধর্মী শিল্পী বলে পরিচিত লেখক দৈনিক পত্রিকাদির সঙ্গে অতিরিক্ত হরম-মহরম করেন, তাঁদের সমাজবোধ এবং যুদ্ধোত্তর সামাজিক পরিস্থিতির জ্ঞান যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত হয়েছে কিনা সন্দেহ। দেশের তরুণ সমাজের মন যে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হচ্ছে, এতে সংবাদপত্রের, বিশেষতঃ বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের, একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। পাঠকের মনে sensationalism-এর বোধকে উদ্রিক্ত করে তাঁদের স্থিরবুদ্ধিকে বিচলিত করতে, নানাবিধ রাহাজানি ধর্ষণ দৌরাত্ম্য ও দুর্বিপাকের সংবাদ পরিবেশন করে পাঠকের সহজাত আনন্দপূর্ণ চিত্তকে অপরাধবোধের দ্বারা মলিন করে তুলতে সংবাদপত্রের জুড়ি আর কিছু নেই। এমন কি নিছক thriller এবং crime fiction পাঠের ক্ষতিও এই ক্ষতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু এ-সব বিষয় অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে হলে তথাকথিত সৃষ্টিধর্মী গল্প-উপন্যাস রচনার শক্তির অতিরিক্ত অন্যবিধ শক্তির প্রয়োজন হয়। যে লেখক জীবনভোর শুধু গল্প আর উপন্যাসই রচনা করেছেন তিনি যতই অভিজ্ঞ আর প্রবীণ হোন, তাঁর কাছ থেকে তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা আশা করাই বাতুলতা। সে জিনিস বোঝবার জন্য আমরা অগ্রণী কথা-সাহিত্যিকের দ্বারস্থ কখনই হব না, আচার্য বিনোবার ন্যায় প্রজ্ঞাবান স্থিতধী সমাজজ্ঞানী মনীষীরাই শুধু এ বিষয়ে আমাদের যথার্থ সচেতন করে তুলতে পারেন। এই সেদিন বিনোবাজী সংবাদপত্র পাঠের কুফল সম্পর্কে যে কয়টি মূল্যবান কথা বলেছেন তা পাঠকেরা নিশ্চয় ভুলে যান নি। কিন্তু সমাজ এখন গড্ডলিকাস্রোতে গা ভাসিয়ে চলেছে, জ্ঞানী-গুণীদের কথা কে আর শোনে! ন্যূনতম সংগ্রাম, ন্যূনতম প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করে যাঁরা চলেন, এখন তাঁদেরই জয়জয়কার। সারবিহীন জনপ্রিয়তার ধ্যান-ধারণার দ্বারা আবিষ্ট বর্তমান বাঙালী সমাজের মানসিক পক্ষপাত এখন এঁদের দিকেই রয়েছে, সুতরাং এঁদের ঠেকায় কার সাধ্য! আমরা প্রবলরূপে বহমান স্রোতের বিরুদ্ধে লড়াই করছি বই তো নয়। 'জীবিত শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক'ই যখন সংবাদপত্রসেবী ঠুনকো লেখকদের পক্ষাবলম্বী, তখন এই শ্রেণীর অন্যান্য লেখকেরা যে সমস্যার ভাল-মন্দ কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারবেন না তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। সমাজের একটি ব্যাপক অংশের মানুষের মানসিকতা অপকৃষ্টতার পথ ধরে অগ্রসর হয়ে চলেছে। যুদ্ধোত্তরকালীন পরিস্থিতিতে পূর্বেকার অধিকাংশ সমুন্নত মূল্যবোধ অবলুপ্তপ্রায়। শ্রদ্ধাবোধ প্রায়াস্তহিত। সারা দেশজোড়া তামসিকতার তাণ্ডব চলেছে। এই মত্ততার নর্তনের ঝড়-ঝাপটা থেকে শুভবুদ্ধি ও স্থিরবুদ্ধির আলোকে বাঁচিয়ে রাখাই বুঝি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যে ভাবেই হোক সেই জ্ঞানালোক জাগ্রত রাখতে হবে। আপাততঃ দেশবাসীর সমক্ষে এইটেই সবচেয়ে বড় সমস্যা।

এ সমস্যার কী ভাবে সমাধান হতে পারে এখন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক। যাঁরা সস্তা জনপ্রিয়তার মুখ না চেয়ে, আশু ফললাভের অপেক্ষা না রেখে, সংবাদপত্রের পিঠচাপড়ানি অথবা পুরস্কারের প্রত্যাশাকে দু পায়ে দলিত করে শুদ্ধমাত্র ভিতরের তাগিদে দীর্ঘস্থায়ী সাধনার পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেন, তাঁদের কর্মপ্রয়াসকে সর্বপ্রকার সমর্থনের দ্বারা পরিপুষ্ট করে তুলতে হবে। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার আবহাওয়ার মধ্যেও এমন পরিবেশের সৃষ্টি করতে হবে যাতে করে এইসব আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মী অনুভব করতে পারেন তাঁদের কাজটাই প্রকৃতপক্ষে মূল্যবান কাজ আর তাঁদের কাজের দ্বারাই সমাজের সত্যিকারের অগ্রগতি বিহিত হওয়া সম্ভব। হোক এঁদের পক্ষাবলম্বীর সংখ্যা সীমাবদ্ধ কিন্তু যেহেতু ওই সমর্থকশ্রেণীর মধ্যেই বিচক্ষণতা ও বিচারবুদ্ধি অধিক পরিমাণে নিবদ্ধ, সেই কারণে ওঁদের সমর্থনেরই প্রকৃত দাম আছে। এই যে উত্তমাধমবিচারক্ষম নির্বাচনপন্থী সমর্থন, নিষ্ঠাবান সাহিত্যকর্মীর অনুকূলে তাকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। স্কুল-কলেজের ছোকরা পড়ুয়া, হাল-ফ্যাসানের সজ্জা-

বিলাসিনী তরুণী, কফি-হাউস ও রেস্তোরাঁগামী নবীন সাহিত্যামোদীর দল, সওদাগরী আপিসের কেরানীকুল আর দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রাসুখাতুরা অন্তঃপুরললনা—এঁরা হালকা সাহিত্যের আর রম্যরচনার আর শ্মশানমশান-কেন্দ্রিক তন্ত্রাচারী উপন্যাসের পোষকতা করতে থাকুন; সত্যিকার মননশীল ও সমাজকল্যাণকামী সাহিত্যকে উদার আহ্বান জানাবার জন্য একাধিক সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান থেকে, উন্নত ধরনের প্রকাশক-সংস্থা ও পাঠাগারসমূহ থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, শিক্ষক-সমিতি থেকে, সমাজের প্রবীণ মহল থেকে, এমন কি সরকারী আওতায় লালিত প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকেও সাহিত্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ বেরিয়ে আসুন, বেরিয়ে এসে পূর্বোল্লিখিত আদর্শনিষ্ঠ সাহিত্যকর্মিগণের সাধনাকে জয়যুক্ত করে তুলতে সহায়তা করুন। প্রচণ্ড বাধা-বিপত্তির মুখে শুদ্ধমাত্র নৈতিক সমর্থনেরও অনেকখানি মূল্য আছে; এই নৈতিক সমর্থন বর্তমান সাহিত্য-পরিস্থিতিতে নিষ্ঠার সপক্ষে একান্তভাবে প্রত্যাশিত। চটুলতার কারবারীরা দলে ভারী বলেই তাঁদের কাজকে সন্দেহের চক্ষে দেখবার অতিরিক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এ যুগে সঙ্ঘশক্তি প্রায়শঃ মূঢ়তার পাল্লাকেই আরও ভারী করে তোলে মাত্র। যেখানেই সঙ্ঘশক্তির আস্ফালন, সেখানেই ব্যক্তিত্বের বিসর্জন ও বিচারবুদ্ধির ভরাডুবি। বিশেষতঃ সাহিত্যে এই-জাতীয় সঙ্ঘশক্তির ভজনা থেকে নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যক্তিক স্তরে স্থির-সংহত আত্মসমাহিত বিচারবুদ্ধির প্রণোদনার দ্বারা ওই মূঢ় সঙ্ঘশক্তিকে প্রতিহত করতে হবে। অন্য কোন উচ্চ আদর্শের সূত্রে নয়, নিছক বৈষয়িক স্বার্থবুদ্ধির টানে একত্র-মিলিত সঙ্ঘবদ্ধতার 'গোষ্ঠীসুখ' ঘুচিয়ে দেওয়া দরকার।

কঠিনের সাধনা, বিরাটের সাধনা, দুরূহের সাধনা সমাজে তার যথাপ্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছে না বলেই আজকের সমাজের এত বিপত্তি। আমরা একটা ভ্রষ্ট যুগে বাস করছি। এই অধঃপতিত কালে দুশ্চর তপস্যাকে মর্যাদা দেওয়া তো পরের কথা, তার ধারণাও সমাজমন থেকে লোপ পেতে বসেছে। সেইটিই সবচেয়ে ভাবিয়ে তোলবার মত বিষয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—"যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপনার অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। চতুর্দিকব্যাপী উৎসাহহীন জীবনহীন জড়ত্বের মত এমন গুরুভার আর কিছু নাই; তাহার নিয়ত প্রবল ভারাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করিয়া উঠা যে কত নিরলস চেষ্টা ও বলের কর্ম তাহা এখনকার সাহিত্যব্যবসায়ীরাও কতকটা বুঝিতে পারেন, তখন (বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে) যে আরও কত কঠিন ছিল তাহা কষ্টে অনুমান করিতে হয়। সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্বলোকের দ্বারাই সম্ভব।" ('আধুনিক সাহিত্য')

এই সুন্দর অনুচ্ছেদটি আমাদের মনোগত ভাব ও অভিপ্রায় চমৎকার ভাবে প্রকাশ করছে বলে সাধারণতঃ উদ্ধৃতি-বিরোধী হওয়া সত্ত্বে কথঞ্চিৎ সবিস্তারেই বর্তমান উদ্ধৃতিটিকে লিপিবদ্ধ করা গেল। রবীন্দ্রনাথ কঠোর ব্রতনিষ্ঠ সাহিত্য-প্রয়াসের দুরূহতার যে উচ্চাদর্শ এখানে তুলে ধরেছেন, সেই 'অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্মে'র দৃষ্টান্ত বর্তমানে একান্ত বিরল হয়ে এসেছে। শিথিলতাই এখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রায়সর্বজনগ্রাহ্য রীতি। শৈথিল্যকে ধিক্কার দেবার কথা আমরা ভুলে গেছি; যদি বা কেউ ধিক্কার দেবার চেষ্টা করেন, তাঁর নিজেরই বরং ধিক্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। এ সমাজে অপ্রিয়সত্যভাষী অথচ সাহিত্য ও সমাজের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে বোধ হয় কেউ চায় না; পারস্পরিক তোষণ ও সর্বব্যাপী জন-মনোরঞ্জনী অভ্যাসের আবহের মধ্যে এমনতর ব্যক্তি সম্ভবতঃ বেসুরসৃষ্টিকারী অবাঞ্ছিত আগন্তুক রূপে পরিগণিত। তিনি এবং তিনি যাঁদের হয়ে কথা বলবার চেষ্টা করেন তাঁদের সকলকে কোণঠাসা করবার আয়োজনে কোন ত্রুটি নেই বর্তমানের অপকৃষ্ট সমাজে। এই আয়োজন কখনও সুপরিকল্পিত, কখনও অর্ধ-পরিকল্পিত, তবে প্রায়শঃই

সঙ্ঘবদ্ধ। মহৎ মূল্যবোধে আস্থাশীল সংখ্যালঘুর উপর হীনরুচি সংখ্যাগুরুর যৌথ অত্যাচারের কাল বলতে বিশেষ করে এ কালকেই বোঝায়। গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে এমন অভিশপ্ত ও আভিজাত্যের মর্যাদাবিবর্জিত যুগ আর কখনও আসে নি।

আমি আমার পুরস্কার-সম্পর্কিত নিবন্ধে ('শনিবারের চিঠি', চৈত্র ১৩৬৪) বলবার চেষ্টা করেছি, লেখকদের মধ্যে যাঁরা স্বধর্মনিষ্ঠ, স্বীয় ব্রতের দুরূহতা সম্পর্কে যাঁদের মনে কোনরূপ মোহ অবশিষ্ট নেই, তাঁরা বিচারবুদ্ধিহীন প্রশংসায় মোটেই উৎফুল্ল হন না। মূঢ় নিন্দা যেমন তাঁদের বিচলিত করে না তেমনই মূঢ় প্রশংসাও তাঁদের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় যদি-বা কিছু প্রভাব তাঁদের মনের উপরে পড়ে তা হল বিরক্তির, অসহিষ্ণুতার, ধৈর্যহীনতার। এই রকম প্রশংসার মুখচাপা দিতে পারলেই বরং তাঁদের মুখরক্ষা হয়। শুধু প্রশংসার বেলায় নয়, পুরস্কারের বেলায়ও এই একই নিয়ম মেনে তাঁরা চলেন। কেন না পুরস্কার, খতিয়ে দেখলে, প্রশংসারই রূপান্তরিত বেশ মাত্র। অবোধ প্রশংসা অবোধ পুরস্কারের আকার পরিগ্রহ করে; বিচারনীতিচালিত প্রশংসা উপযুক্ত ক্ষেত্রে অর্পিত পুরস্কারে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যে পুরস্কার যথেষ্ট গুণপনার মূল্যে অর্জিত হয় নি, যা নিছকই বন্ধুকৃত্যের বা অজ্ঞ বিবেচনাক্রিয়ার ফলশ্রুতি মাত্র, তেমন পুরস্কারে সত্যিকার সাহিত্যসাধকের মন ওঠে না। এতে বরং তিনি বিব্রত বোধ করেন। অবোধ প্রশংসা অথবা অন্ধ পুরস্কার কোনটাই এঁদের মনের সন্তুষ্টিবিধানে সমর্থ হয় না।

এইজন্যই যথার্থ সাহিত্যগুণী যাঁরা, সমাজে তাঁদের সমাদরের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। তাঁদের বুঝতে দেওয়া চাই তাঁদের কাজের যথেষ্ট সামাজিক গুরুত্ব আছে এবং নিছক বিশুদ্ধ সাহিত্যবিচারের মাপকাঠিতেও তাঁদের রচনা সর্বাধিক কৌলীন্যের অধিকারী। হালকা চটুল সারবিহীন গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনার অহেতুক প্রশংসা দাঁখের করাতের মত দু দিক থেকে সাহিত্যকে কাটে। এতে এক দিকে অনুচিত শিল্পাদর্শ সমাজে প্রশ্রয় পায়, অন্য দিকে ওই একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও ফলে শ্রদ্ধার্হ সাহিত্যরীতি অন্যায় ভাবে প্রতিহত হতে থাকে। এইভাবে ক্রমাগত হরণপূরণের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে জঞ্জালেরই পরিমাণ শুধু বাড়তে থাকে। মাথা-গুনতিতে ভারী জনতার সমর্থনের ঠেকো-দেওয়া অসার সাহিত্যের কলনাদী প্রশংসায় কান পাতা দায় হয়ে ওঠে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই সংখ্যাশক্তিনির্ভর গণতন্ত্রের যুগে সবাই গণতন্ত্রের আদর্শের অন্ধ পূজারী। কিন্তু এ কথা জনসাধারণকে কে বোঝাবে যে, রাষ্ট্র ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে গণতন্ত্র একটি উচ্চ-আদর্শ রূপে গণ্য হলেও সাহিত্য-বিচারে তার বিশেষ কোন মূল্য নেই? সেখানে শিল্প-কৌলীন্যেরই দাম, ও এই কৌলীন্যই গ্রাহ্য আদর্শ। জনতার রায় অনুযায়ী সাহিত্যকর্মের গুণাগুণ নির্দিষ্ট করতে গেলে হিতে বিপরীত ঘটবার সম্ভাবনা। ও-কাজটি বিচক্ষণদের হাতে ছেড়ে দেওয়াই নিরাপদ। দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা, বিচারশক্তির অনুশীলন, মনন ও অনুধ্যান ব্যতিরেকে সাহিত্যকর্মের বিচারক হওয়া যায় না, বস্তুতঃ কোন-কিছুরই বিচারক হওয়া সাজে না। এখন তো সে-সবের কোন বালাই নেই ; দৈনিক সংবাদপত্র কোন-কিছুর উপর একটা ছাপ অঙ্কিত করে দিলেই হল, অমনই তাই নিয়ে জনতার মধ্যে কোলাহল ও কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। অধিকাংশ মানুষই সাহিত্য-অচেতন তথা সাহিত্যবোধ-লেশহীন সংবাদপত্রের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করতে পারলে জীবনের চরম সার্থকতার সন্ধান পায়। পুরস্কার যে সূত্র থেকেই আসুক তাতে কিছু যায়-আসে না, সেটি পুরস্কার হলেই হল। তা হলেই আর পুরস্কার-প্রাপকের আত্ম-পরিতোষের সীমা-পরিসীমা থাকে না। দৈনিক সংবাদপত্রের মুখে ঝাল খাওয়ার ও তাঁদের রুচি অনুযায়ী ওঠ-বোস করবার অশ্রদ্ধেয় প্রবণতা ও অভ্যাস ভাল-মন্দের বিচারশূন্য অচেতন জনসাধারণকে সাংঘাতিকভাবে পেয়ে বসেছে বললেও চলে। ফলে জনসাধারণের বিচারবোধে বিশ্বাস রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠছে না।

জনসাধারণের স্বয়ংনির্ভর স্বতঃস্ফূর্ত ভালমন্দ-লাগার দাম নেই তা বলছি নে, তেমন মত পোষণ করলে সমষ্টিগত বুদ্ধির মৌলিক উপযোগিতাকেই অস্বীকার করা হয়। কিন্তু আধুনিক সংখ্যা-গণতন্ত্রের যুগে সেই ভালমন্দ-লাগা প্রায়শঃ সংবাদপত্রের হাতে-ধরা হয়ে আসে, তাইতেই হয়েছে যত মুশকিল। জনগণ স্বয়ং-চালিত বিচার দ্বারা সিদ্ধান্তে

উপনীত হলে তবু না-হয় একটা কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা সে দায় সংবাদপত্রের উপর চাপিয়ে নিজেরা হাত ধুয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। অথচ তাঁদের ধারণা নেই এই-সব সংবাদপত্র কায়েমী-স্বার্থের ও গোষ্ঠী-স্বার্থের এক-একটি ঘাঁটি বিশেষ। তাঁদের কোন বিচারই নিরপেক্ষতা-প্রসূত নয়, হওয়া বোধ হয় সম্ভবও নয়। একেই জনতার রায় সন্দেহস্থল, তার উপর জনমতের প্রতিনিধিত্বের ছদ্মাবরণে সেই রায় যদি বিশেষ গোষ্ঠীর কুক্ষিগত হয়ে পড়ে তা হলে কী ফল হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

. এই কারণেই বিচক্ষণ সাহিত্যরথীরা সাহিত্যবিচারে জনতার রায়ের উপর, অবোধ প্রশংসার উপর আদৌ কোন মূল্য আরোপ করেন না। তাঁরা সমাজ-জীবনে গণতন্ত্রের পরিপোষক হয়েও সাহিত্য-সংসারে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে আমল দেন না। যে বিচারক্রিয়ার মধ্যে বিচক্ষণতার প্রমাণ নেই, বিবেচনাশক্তির উৎকর্ষের অভিব্যক্তি নেই, তেমন বিচার উচ্চ প্রশংসার ভাষায় রচিত হলেও তাঁদের মনের উপর সামান্যই রেখাপাত করে। আঁদ্রে জিদ তাঁর শৈশব কৈশোর ও প্রথম যৌবনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *If It Die*……-এ লিখছেন—"I like to be liked on good grounds and if I feel the praise vouchsafed me is the result of a misunderstanding, it gives me pain. I can find no satisfaction in trumped-up favours. What pleasure can there be in compliments made to order or dictated by reasons of interest, social connections, or even friendship ? The mere idea that I am being praised out of gratitude or in order to gain my suffrage or disarm my criticism immediately deprives the praise of all value ; I want none of it. What I care for most of all is to know what my work is really worth and I have no use for laurels that have every prospect of soon fading." (Penguin Edition, pp. 206-7)

এর অর্থ, ন্যায়সঙ্গত কারণযুক্ত প্রশংসা আমার পছন্দ; যে প্রশংসা অজ্ঞানতাপ্রসূত তা আমাকে ব্যথা দেয়। অসার অনুগ্রহে আমি কোন সান্ত্বনাই পাই না। ফরমায়েশী প্রশংসা, স্বার্থবুদ্ধিপ্রণোদিত প্রশংসা, সামাজিক সম্পর্ক, এমন কি বন্ধুত্বের খাতিরে প্রশংসা—এ সবে কী আনন্দ থাকতে পারে? কৃতজ্ঞতার বশে অথবা সুবিধা আদায়ের লোভে অথবা প্রতিকূল সমালোচনার ভয়ে আমাকে কেউ প্রশংসা করছেন মনে হওয়া মাত্র সেই প্রশংসার কোন মূল্যই আর আমার চোখে থাকে না। এ-জাতীয় প্রশংসা আমার চাই না। আমি যা সবচেয়ে কামনা করি তা হচ্ছে আমার রচনা সত্যি সত্যি ভাল হয়েছে কি না তা জানা। তেমন প্রশংসায় কী হবে যা শীঘ্রই ফিকে হয়ে যাবার সম্ভাবনা?

জাত-লিখিয়ের এই-ই মনোভাব হওয়া উচিত। এই মনোভাবই তাঁকে মানায়। কিন্তু আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যের লেখকদের ধারাধরন উলটো। তাঁরা রচনার গুণাগুণনির্বিশেষে প্রশংসার কাঙাল হয়ে উঠেছেন। প্রশংসা যে সূত্র থেকে যে ভাবেই আসুক না কেন, স্বীকৃতির প্রকৃতি যাই হোক না কেন তাতেই তাঁরা তৃপ্ত; আত্মানুসন্ধানের দ্বারা প্রশংসার গুণাগুণ নির্ধারণের চেষ্টা তাঁরা করেন না। সকলেই সামাজিক প্রতিষ্ঠার মুখাপেক্ষী, সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা খুব কম জনাই আকাঙ্ক্ষা করেন। রচনার সাফল্যের উপর যে প্রতিষ্ঠার নির্ভর নয় তেমন প্রতিষ্ঠা একজন সত্যিকার সাহিত্যকর্মীর নিকট অবাঞ্ছিত মনে হওয়া উচিত। কিন্তু কার্যতঃ তার উলটো দৃষ্টান্তটাই বেশী চোখে পড়ে। এর থেকে বোঝায়, সাহিত্যের জন্যই সাহিত্যিক খ্যাতি আমরা খুব কম জনাই কামনা করি। সাহিত্যকে অবলম্বন করে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভই আমাদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সাহিত্যকে মনে-প্রাণে ভালবাসি না, আমাদের প্রকৃত ধ্যানের বস্তু হল অর্থ বিত্ত যশ; সে-সব সাহিত্য-নিরপেক্ষ ভাবে এলেও আমাদের আক্ষেপের কোন কারণ ঘটে না। এ যুগের ধন-কৌলীন্য ও বৈশ্যতন্ত্রের প্রভাবে আমরা এতটাই সাহিত্যাদর্শ থেকে দূরে সরে গেছি। আমরা যাঁরা লেখকশ্রেণীভুক্ত, সাহিত্য আমাদের চর্চার বিষয় হলেও তাতেই আমরা নিবিষ্ট নই, ওতেই আমাদের কর্মের সার্থকতা নিঃশেষিত ও পরিসমাপ্ত নয়; আসলে সাহিত্যকে

অবলম্বন করে সবাই আমরা সামাজিক প্রতিষ্ঠার আলেয়ার পিছনে ঘুরছি। অন্য দশটা অর্থকরী বৃত্তির মত আমাদের অধিকাংশেরই নিকট সাহিত্য একটা বাইরেকার অবলম্বন মাত্র; তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে আমরা প্রায় কেউই পারি নি। সাহিত্যসংশ্লিষ্ট হয়েও আমরা সাহিত্য-প্রাণ নই—এই হচ্ছে আজকের দিনের সাহিত্যিক-পরিস্থিতির ট্রাজিডি।

আমি সংবাদপত্র সিনেমা খেলার মাঠের প্রসঙ্গ দিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলাম, সেই প্রসঙ্গেই পুনরায় ফিরে আসি। আজকে বাংলা দেশে, যুদ্ধোত্তর যুগের আবহাওয়ায়, যে মনোভঙ্গী নিয়ে সাহিত্যের চর্চা হচ্ছে তার সঙ্গে খেলার মাঠ আর সিনেমা আর দৈনিক সংবাদপত্রের মনোভঙ্গীর বিশেষ কোন তফাত রইল না। খেলার মাঠের ও সিনেমার পেট্রনরা একজন খেলোয়াড়কে কিংবা ফিল্‌ম্‌-স্টারকে যে চোখে দেখে, সাহিত্যের পেট্রনরা একজন লেখককে প্রায় সেই স্তরে নামিয়ে এনেছে। সাহিত্যের ও সাহিত্যিকের এই ব্যাপক জনস্বীকৃতির মধ্যে যাঁরা সাহিত্য-প্রীতির পরিধিবিস্তারের প্রমাণ পেয়ে উল্লাসে আত্মহারা হচ্ছেন তাঁরা প্রকৃত পরিস্থিতি সম্যক্ উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। তাঁরা দেখেও দেখছেন না যে, এর দ্বারা সাহিত্যের নেতৃত্ব প্রবীণদের হস্তচ্যুত হয়ে বোধবুদ্ধিহীন নবীনের করতলগত হয়ে পড়ছে। সিনেমাগামী তরুণ, রকবিলাসী তরুণ, চায়ের দোকান-রেস্তোরাঁ-কফি-হাউসগামী তরুণ এরাই ক্রমশঃ সাহিত্যের ভোক্তা ও নিয়ন্তা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সাহিত্যের স্তর যত নেমে যাচ্ছে তত সাহিত্যের উপর ছোকরা পড়ুয়াদের অধিকার পাকা হচ্ছে। কিংবা কথাটাকে ঘুরিয়ে বলা যায়, সাহিত্যের উপর ছোকরা পড়ুয়াদের প্রভাব ক্রমবিস্তৃত হচ্ছে বলেই সাহিত্যের স্তর তদনুপাতে নেমে যাচ্ছে। জনপ্রিয়তার রূঢ় হস্তাবলেপে সাহিত্যের সূক্ষ্মতা ও সৌকুমার্য মুছে গিয়ে তার উপর মোটা আঙুলের ছাপটাই বড় হয়ে উঠছে। আদর্শবাদের মূল্য নেই, নিষ্ঠার মূল্য নেই, দুরূহ ব্রতসাধনার মূল্য নেই, সবাই আশু লভ্যের পিছনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে চলেছে, কেউ কারও পিছনে পড়ে না থাকে এই জ্বরতপ্ত তাড়নায়। ফলপ্রত্যাশাবিহীন কর্ম একটা কথার কথা, ওর প্রতি আমাদের কারও কোন আস্থা নেই; আমরা নগ্‌দার কারবারী, নগদ-বিদায় ছাড়া কিছুতে আমাদের মন ওঠে না। বাহ্যতঃ আমরা গীতার মাহাত্ম্য-কীর্তনে পঞ্চমুখ, কিন্তু গীতার মূল নীতিটিকে আমরা গীতার মধ্যেই কোণঠাসা করে রেখে দিয়েছি। যে মুষ্টিমেয়-সংখ্যক লেখক আশু সাফল্যের চাকচিক্যে না ভুলে দূরের লক্ষ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন তাঁদের কর্মকে সামাজিক স্বীকৃতির দ্বারা সংবর্ধিত করা তো দূরের কথা, তাঁদের একঘরে করে রাখতে পারলেই যেন আমাদের আশ মেটে। মহত্ত্বের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ ক্ষুদ্রের অসূয়ার অভিযান আর কখনও এমন মারাত্মক আকারে আত্মপ্রকাশ করে নি। বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিধি জুড়ে শক্তিমানের বিরুদ্ধে mediocrity-র সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছে। যাঁরা আদর্শনিষ্ঠ আত্মমর্যাদাপরায়ণ ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ও দুরূহব্রতে স্থিরলক্ষ্য, তাঁদের পাকেচক্রে টেনে নামাতে ও হেনস্থা করতে পারলে ক্ষুদ্রের উল্লাসের অন্ত থাকে না; এমনতর সঙ্কীর্ণচিত্ততা বাংলা সাহিত্যে এখন প্রায় সর্বব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথায় ক্ষুদ্ররা ক্ষুদ্রত্বের গ্লানিতে সংকুচিত হয়ে থাকবে তা নয়, মহৎ ব্রতধারীদের কার্যকে অসার্থক প্রতিপন্ন করবার জন্য ক্ষুদ্ররা ক্রমাগত জোট বেঁধেই চলেছে। এরা দলভারী করে সংখ্যাদুর্বল একক শক্তিমান্‌কে কাবু করতে চায়, পরিমাণের দ্বারা গুণকে কর্তন করতে সচেষ্ট। কিন্তু সাহিত্য সংখ্যাশক্তির দ্বারা চালিত হয় না, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই তার প্রধান নির্ভর ও আশ্রয়। তদুপরি সাহিত্যের চাকা প্রতিনিয়ত ঘূর্ণ্যমান। সঙ্ঘশক্তির সংহতির অভাবে, গোষ্ঠীবদ্ধতার অনুপস্থিতিতে আজ যাঁরা স্রোতের তলায় আপাত-নিমজ্জিত হয়ে আছেন, আর এক জোয়ারের টানে তাঁরাই আবার কোন্ না উপরে ভেসে উঠবেন! আজকের পরিস্থিতি নানা কারণে নৈরাশ্যকর হলেও সেই শুভ সম্ভাবনা যে একেবারেই দূরগত এমন মনে করবার হেতু নেই। স্রোতের বিরুদ্ধে আজ যা অসমান লড়াই বলে মনে হচ্ছে, কে জানে সেই প্রবল স্রোতটাই একদিন হেজে-মজে নীচে তলিয়ে যাবে না? তেমন সম্ভাব্যতার জন্যই আমরা দিন গুনছি।

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় ॥

আঠারো শো আটাত্তর খ্রীষ্টাব্দের বিশে সেপ্টেম্বর [১২৮৫ ৫ই আশ্বিন] বোম্বাই থেকে 'পুনা' স্টীমার যোগে রবীন্দ্রনাথ মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেত রওনা হলেন। কবিজীবনে দেশের মাটি ছেড়ে এই প্রথম বিদেশযাত্রা। বোম্বাই থেকে এডেন বন্দরে পৌঁছতে লাগল ছ দিন। এডেন থেকে সুয়েজে যেতে দিন পাঁচেক। রবীন্দ্রনাথেরা ছিলেন ওভারল্যাণ্ড বা ডাঙাপেরনো যাত্রী। তাই লোহিত সাগরের বন্দর সুয়েজে নেমে রেল-পথে যেতে হল মিশরের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের বন্দর আলেকজান্দ্রিয়ায়। সেখান থেকে চার পাঁচ দিন পরে 'মঙ্গোলিয়া' স্টীমারে ইতালির বন্দর ব্রিন্দিসি। তারপর আল্পস্ পর্বতমালা পেরিয়ে ফ্রান্স হয়ে ইংলণ্ড। প্রথম বার প্যারিসে রবীন্দ্রনাথ একদিনেরও বেশী থাকতে পারেন নি। লণ্ডনে পৌঁছেও মাত্র ঘণ্টাখানেক ছিলেন। মেজো বৌঠান তাঁর পুত্রকন্যা নিয়ে লণ্ডন থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে সাসেক্সের সমুদ্রতীরে ব্রাইটন শহরে বাস করছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ছোট ভাইকে নিয়ে প্রথমে সেখানে গিয়েই উঠলেন। কিছুদিন সেখানে কাটাবার পর রবীন্দ্রনাথকে ব্রাইটনের একটি পাবলিক স্কুলে ভরতি করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু মেজো বৌঠানের স্নেহবৃত্তে থেকে পড়াশোনা বিশেষ এগোচ্ছে না দেখে সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু তারকনাথ পালিত রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এলেন লণ্ডনে। রিজেণ্ট পার্কের সামনে একটি বাসায় তাঁকে একলা ছেড়ে দেওয়া হল। সেখানে কিছুদিন একজন শিক্ষক তাঁকে লাটিন ভাষা শেখাবার চেষ্টা করলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ বার্কার নামক একজন শিক্ষকের গৃহশিষ্য হলেন। বার্কার বাড়িতে ছাত্রদের পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত করে দিতেন। কিন্তু সেই প্রস্তুতি-পর্বও বেশীদিন চলতে পারল না। মেজো বৌঠান তখন ব্রাইটন ছেড়ে ডেভনশিয়রে টর্কিনগরে বাসা বদল করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়ল সেখানে। টর্কির পাহাড়ে, সমুদ্রে, ফুলবিছানো প্রান্তরে, পাইন বনের ছায়ায় দুটি লীলাচঞ্চল শিশু সুরেন্দ্রনাথ আর ইন্দিরা নিয়ে কবিকিশোরের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটছিল কিন্তু অভিভাবকগণ তাঁকে কাব্য করতে বিলেত পাঠা নি, পাঠিয়েছেন ব্যারিস্টার হতে। সুতরাং কর্তব্যে পেয়াদা তাঁকে সেই কাব্যিক পরিবেশ থেকে ডেকে নি এল আবার লণ্ডনে। এবারে ডাক্তার স্কট নামক একজন ভদ্র গৃহস্থের ঘরে জুটল তাঁর আশ্রয়। পালিতমশাই তাঁকে লণ্ডন য়ুনিভার্সিটি কলেজে ভরতি করিয়ে দিলেন প্রথমবার বিলাতপ্রবাসে তাই কবির দিনগুলি কাটল ব্রাইটন, লণ্ডন ও টর্কিতে। মাঝখানে শীতের কটি দিন কেটেছে কেণ্টের টনব্রিজ ওয়েল্স্ শহরে। 'ছেলেবেলা'য় কবি বলেছেন, তিনি লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়তে পেরেছিলেন মাত্র তিন মাস। সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন বিলেতে। তাঁর দেশে ফেরবার সময় হল। মহর্ষিদেব লিখে পাঠালেন, রবীন্দ্রনাথকেও তাঁদের সঙ্গে দেশে ফিরতে হবে। পিতৃদেবের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত নির্দেশ শিরোধার্য করে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এলেন ভারতের মাটিতে। ফিরে এলেন আঠারো শো আশি খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাতপ্রবাস মাত্র সতেরো মাস স্থায়ী হয়েছিল। বোম্বাই থেকে রওনা হলেন সতেরো বৎসর পাঁচ মাস বয়সে। আর কলকাতায় যখন ফিরলেন তখন তাঁর বয়স আঠারো বৎসর ন মাস।

বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে উদ্যোগ পর্বের প্রাথমিক স্তর উত্তীর্ণ না হবার পূর্বেই এই প্রত্যাবর্তন রবীন্দ্র-জীবনের একটি ব্যর্থ অধ্যায় বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে। কিন্তু কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে কবিমানসের বিবর্তন ও উন্মীলনের দিক দিয়ে এই সতেরো মাসের পর্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ একটি বিশেষ দেশের বিশেষ কালের কবি হয়েও পরবর্তী জীবনে বিশ্বমানবের বাণীদূত অর্থাৎ কবি-সার্বভৌম-রূপে দেখা দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মাটিতে মহাকাল তাঁর ঘর

বেঁধে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবসাধনতীর্থের পথে পথে মাধুকরীবৃত্ত কবি-পরিব্রাজকে রূপান্তরিত হলেন। এই অর্থেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। বহির্ভারতে বিশ্বকবির প্রথম নীড় রচিত হয়েছে ব্রাইটন-লণ্ডন-টর্কীতে। 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থে 'প্রবাসী' কবিতায় কবি বলেছেন—

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া।
পরবাসী আমি যে দুয়ারে চাই—
তারি মাঝে মোর আছে যেন ঠাঁই,
কোথা দিয়া সেথা প্রবেশিতে পাই সন্ধান লব বুঝিয়া।
ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়, তারে আমি ফিরি খুঁজিয়া॥

পৃথিবীর দেশে দেশে নিজের দেশকে খুঁজে পাওয়া, প্রবাসের ঘরে ঘরে পরমাত্মীয়ের সন্ধান করা—কবিচেতনার এই নব-অভ্যুদয়ের প্রত্যূষলগ্ন হল প্রথম বিলাতপ্রবাসের সতেরো মাস। একটি বিশেষ দেশের ভাবভূমি থেকে মহাপৃথিবীর মাটি ও আকাশে নবজন্মলাভের শুভক্ষণ ওই অচিরস্থায়ী পর্বেই দেখা দিয়েছে। সর্বমানবচিত্তের মহাদেশে বিশ্বকবির এই নবজন্মের সূতিকাগৃহ হল ব্রাইটন-লণ্ডন-টর্কী।

২

শ্বেতদ্বীপ ইংলণ্ডকে আমরা বলেছি উনবিংশ শতকীয় ভারতপুত্রের রূপকথার দেশ। সেখানে ছিল নবজন্মোত্তর য়ুরোপের জীবনস্বরূপিণী ঘুমন্ত রাজকন্যা। সাম্রাজ্যবাদী রাক্ষসের রূপোর কাঠির যাদুমন্ত্রে সে ছিল হৃতচেতনা। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে মানবপ্রেমের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সেই নিশ্চেতনা রাজকন্যার ঘুম ভাঙানোই ছিল ভারতপুত্রের স্বপ্নকৃত্য। রাক্ষসপুরীতে মানবকন্যার সেই উদ্ধারসাধনব্রতে চারিচক্ষুর মিলনে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের যে গ্রন্থিবন্ধন হল তারই যৌতুক হিসাবে সে পেল য়ুরোপের ভাবরাজ্যের অর্ধেক রাজত্ব। ভাবরাজ্যে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই মিলন, এই দেওয়া আর নেওয়ার প্রাথমিক ভূমিকা রচিত হয়েছিল ইংরেজি সাহিত্যের মাধ্যমে। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য-দেবতা ছিলেন শেক্‌সপীয়র, মিলটন ও বায়রন।'[১] কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, সেদিন ইংরেজি সাহিত্য থেকে আমরা যে পরিমাণে মাদক পেয়েছি সে পরিমাণে খাদ্য পাই নি। তারও কারণ বিশ্লেষণ করে কবি বলেছেন, 'সেদিনকার ইংরেজ লেখকদের লেখার ভিতরকার যে জিনিসটা আমাদের খুব নাড়া দিয়েছিল সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা। হৃদয়াবেগকে একটা আতিশয্যে নিয়ে গিয়ে তাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা, ইংরেজি সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। এ সাহিত্যে ভালোমন্দ সুন্দর-অসুন্দরের বিচারই মুখ্য ছিল না—মানুষ আপনার হৃদয়প্রকৃতিকে তার অন্তঃপুরের সমস্ত বাধা মুক্ত করে দিয়ে তারই উদ্দাম শক্তির যেন চরম মূর্তি দেখতে চেয়েছিল।' রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার ইংরেজি সাহিত্যকে এই ভাবেই বিশ্লেষণ করে বলেছেন, সেই সাহিত্যনিহিত হৃদয়াবেগের উদ্দামতা তাঁর বাল্যকালে চারদিক থেকেই আঘাত করেছে। সেই প্রথম জাগরণের দিন সংযমের দিন নয়, উত্তেজনারই দিন।[২]

কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের এই মাদকতার মধ্যেই প্রতীচ্যের জীবনসাধনার সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয় নি। ইংরেজ-চরিত্রেরও যে পরিচয় তার সাহিত্যে ধরা পড়েছে সেটিও পূর্ণসত্য নয়, অর্ধসত্য। ইংরেজের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনে হৃদয়াবেগের আতিশয্য একেবারেই চাপা থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সম্ভবত সেই কারণেই তার সাহিত্যে তার আধিপত্য এত বেশী। ইংরেজ-জীবনের এই সংযম ও শক্তিমত্তার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে তাকে তার প্রতিদিনের জীবনসাধনার মধ্যেই জানতে হবে। কাজেই ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মিলনের যে ভূমিকা রচিত হয়েছিল তাকে পূর্ণতায় পৌঁছে দেবার জন্যেই অত্যাবশ্যক ছিল ইংরেজের জন্মভূমিতে তার প্রতিদিনকার বাস্তব পরিবেশে তাকে সত্য করে জানা। রবীন্দ্রজীবনে সেই জানার প্রথম সুযোগ এল তাঁর আঠারো বৎসর বয়সের বিলাতপ্রবাসের সতেরো মাসে। ইংরেজ-জীবনের এমন অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য তিনি আর কখনও পান নি। তাই এই সুযোগকে প্রথম এবং শেষ সুযোগও বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে কবি নিজে বলেছেন, 'সেই প্রথম বয়সে যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেম, ঠিক মুসাফেরের মতো যাই নি। অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে বাহির থেকে চোখ বুলিয়ে যাওয়া বরাদ্দ ছিল না। ছিলেম অতিথির মতো, ঘরের মধ্যে প্রবেশ পেয়েছিলুম। সেবা পেয়েছি, স্নেহ পেয়েছি, কোথাও কোথাও ঠকেছি, দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু তারপরে আবার যখন সেখানে গিয়েছি, তখন সভায় থেকেছি, ঘরে নয়।'[৩]

৩

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম বিলাতপ্রবাসের কথা তিনি বলেছেন 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র', 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলা'য়। ইতস্তত: দুটি একটি চিঠিপত্র এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনাতেও কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বটি সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' প্রথমে 'য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র' এই নামে 'ভারতী' পত্রিকায় ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পৌষ ও ফাল্গুন মাসে এবং ১২৮৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। এই পত্রাবলী প্রথমে অন্তরঙ্গ ঘরোয়া ভাষায় আত্মীয়স্বজনগণকেই লেখা হয়েছিল, 'ভারতী'তে প্রকাশের পর অবশ্য কোনও কোনও

পত্রে পাঠকসমাজের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হয়েছে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সারদাপ্রসাদ ১২৮৮ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে—কবির বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের এক বৎসর আট মাস পরে। ১৩১১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীর হিতবাদী সংস্করণেও গ্রন্থখানি সমগ্রভাবেই রক্ষিত হয়েছিল; কিন্তু পরবর্তী কালে বয়ঃসন্ধির এই রচনার প্রতি কবির আর তেমন মমতা ছিল না। বহুকাল গ্রন্থাকারে অপ্রচলিত রাখার পর ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে গ্রন্থখানিকে কেটে ছেঁটে 'পাশ্চাত্য ভ্রমণের' অঙ্গীভূত করা হয়। কবির নির্মম হস্তের এই পরিমার্জনে গ্রন্থখানি ইতিহাসের পংক্তি থেকে সাহিত্যের পংক্তিতে উপনীত হয়েছে সন্দেহ নেই; কিন্তু তাতে তার আসল মূল্যই নষ্ট হয়েছে। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র যথার্থ মূল্য কবির প্রথম বিলাত-প্রবাসের সতেরো মাসের অধুনা-দুষ্প্রাপ্য ইতিহাসের উপকরণ হিসাবেই। ওতে এক দিকে যেমন কবির অন্তরতম আত্মকথা অকুণ্ঠ ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে অন্য দিকে তেমনই ইঙ্গবঙ্গ সমাজ, স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং 'পারিবারিক দাসত্ব' সম্পর্কে তাঁর নূতন নূতন চিন্তা বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। হতে পারে স্ত্রী-স্বাধীনতা এবং পারিবারিক দাসত্ব সম্পর্কে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদকীয় টিপ্পনীর প্রত্যুত্তরে কনিষ্ঠের ভাষা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সংযম ও শালীনতার সীমানা লঙ্ঘন করেছে; কিন্তু আঠারো বৎসর বয়সে অলোক-সামান্য প্রতিভার প্রথম আত্মপ্রকাশের মুহূর্তে ওই ভাষাই স্বাভাবিক ছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি অবশ্য সত্যদর্শনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে গ্রন্থখানির নিন্দা করেছেন। তাঁর সেদিনকার বক্তব্য হল: 'এই চিঠিগুলির অধিকাংশই বাল্যবয়সের বাহাদুরি। অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া, তর্ক করিয়া রচনার আতসবাজি করিবার এই প্রয়াস।'[৪] আঠারো বৎসরের সেই মনকে অন্য প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করে কবি আবার বলেছেন, 'বাল্যও নয় যৌবনও নয়, বয়সটা এমন একটা সন্ধিস্থলে যেখান থেকে সত্যের আলোক স্পষ্ট পাবার সুবিধা নেই। একটু একটু আভাস পাওয়া যায় এবং খানিকটা খানিকটা ছায়া। এই সময়ে সন্ধ্যাবেলাকার ছায়ার মতো কল্পনাটা অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অপরিস্ফুট হয়ে থাকে। সত্যকার পৃথিবী একটা আজগুবি পৃথিবী হয়ে ওঠে।'[৫] কিন্তু আঠারো বৎসর সম্পর্কে ত্রিশ বৎসরের এই আত্মবিশ্লেষণও সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'র যথার্থ মূল্য কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে। গ্রন্থখানিকে পরিমার্জিত করতে বসে কবির মনে হয়েছে: 'লেখার জঙ্গলগুলো সাফ করবামাত্র দেখা গেল, এর মধ্যে শ্রদ্ধা বস্তুটাই ছিল গোপনে, অশ্রদ্ধাটা উঠেছিল বাহিরে আগাছার মতো নিবিড় হয়ে। আসল জিনিসটাকে তারা আচ্ছন্ন করেছিল, কিন্তু নষ্ট করেনি।'[৬]

প্রকৃতপক্ষে 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'ই প্রথম আত্ম-সমীক্ষণের আলোকে কবিমানস আলোকিত হল। এই গ্রন্থেই প্রথম কবির চোখে ফুটে উঠল সেই বিশ্লেষণী দৃষ্টি যা একই সঙ্গে দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণের কাজ করে। বহির্লোকের মত অন্তর্লোক থেকেও খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে অনুরক্ত অথচ অনাসক্ত দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎকে কবি দেখতে পেলেন। দেখতে পেলেন আপন হৃদয়-অরণ্যের দ্রষ্টা ও ভোক্তা দুই পাখিকে। এই দেখার প্রথম আনন্দ 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

তাই আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর জীবনের কারিগর যখন বিদেশী মালমসলা দিয়ে তাঁকে নূতন করে গড়ে তুলেছিলেন তখন পূর্ব-পশ্চিমের রাসায়নিক মিশ্রণে যে যৌগিক সত্তার উদ্ভব হল তার বিচিত্র মৌলিক উপাদানগুলি তিনি অভ্রান্ত দৃষ্টিতেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তেমনই শ্বেতাঙ্গ-সমাজের ভাল মন্দ দুটো দিকই তাঁর চোখে সমান ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এক দিকে ব্রাইট ও গ্লাডস্টোনের মধ্যে তিনি দেখেছেন ইংরেজ-চরিত্রের রাষ্ট্রচেতনার ঐশ্বর্যকে আর অধ্যাপক হেনরি মরলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন তাঁর সারস্বত সাধনার মহিমাকে; অন্য দিকে তেমনই পার্লামেণ্টের অধিবেশনে অসহিষ্ণু সদস্যবৃন্দের অভদ্র আচরণের মধ্যে কিংবা সামাজিক নাচের সভায় বিলাসিনী নারীর কণ্ঠলগ্ন পুরুষের উচ্ছল উদ্দামতায় দেখতে পেয়েছেন ইংরেজ-চরিত্রের অন্ধকার দিকটিকেও। এক দিকে ভদ্র গৃহস্থ-ঘরে সেবাময়ী নারীর কল্যাণী শ্রেয়সী মূর্তিটিকে যেমন চিনতে পেরেছেন, অন্য দিকে তেমনই বিলাসিনীদের স্বরূপ বিশ্লেষণেও তাঁর দৃষ্টি কদাচিৎ বিভ্রান্ত হয়েছে। সেই দৃষ্টিতে বয়ঃসন্ধির বিহ্বলতা হয়তো খানিকটা ছিল, কিন্তু তাকেও ছাপিয়ে উঠেছিল আঠারো বছরের পক্ষে অপ্রত্যাশিত এক বিবিক্ত মনের অভ্রান্ত পরিচয়। বিলেতের শীতে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যহ ভোরবেলা বরফ-গলা জলে স্নান করতেন, কিন্তু কোনদিনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন নি। চিকিৎসাশাস্ত্রের সেই দুর্জ্ঞেয় রহস্য যাঁর আয়ত্তাধীন ছিল তাঁর মনের স্বাস্থ্য বিদেশের বিলাস-ভবনে ভেঙে পড়েছিল এমন আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক।

৪

য়ুরোপ-প্রবাসীর প্রথম পত্রে আছে বোম্বাই থেকে লণ্ডন পর্যন্ত যাত্রার অভিনব অভিজ্ঞতার কথা। সুয়েজ থেকে ট্রেনে করে যাওয়ার সময় মিশরের ধুলোয় তাঁর চুলের অবস্থা বর্ণনা করে কবি বলেছেন, 'চুলে হাত দিতে গিয়ে দেখি, চুলে এমন এক স্তর মাটি জমেছে যে, মাথায় অনায়াসে ধানচাষ করা যায়।' তেমনই প্যারিস শহরে টার্কিশ বাথে স্নান ও অঙ্গমর্দনের অভিজ্ঞতায় বলেছেন, 'টার্কিশ বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা।'

দ্বিতীয় পত্রে বিলেত সম্পর্কে কবির প্রাথমিক ধারণার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। লিখেছেন, বিলেতে এসে তিনি অনেক বিষয়ে নিরাশ হয়েছেন। তাঁর আশা ছিল দেখবেন, এই ক্ষুদ্র দ্বীপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত টেনিসনের বীণাধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেখানেই থাকেন না কেন, গ্ল্যাডস্টোনের বাগ্মিতা, ম্যাক্‌সমূলারের বেদ-ব্যাখ্যা, টিণ্ডালের বিজ্ঞানতত্ত্ব, কার্লাইলের গভীর চিন্তা, বেনের দর্শনশাস্ত্র শুনতে পাবেন। মনে করেছিলেন যেখানে যান না কেন, দেখবেন intellectual আমোদ নিয়েই আবালবৃদ্ধ-বনিতা উন্মত্ত; কিন্তু আসলে দেখলেন, ইংলণ্ডের মেয়েরা বেশভূষায় লিপ্ত, পুরুষেরা কাজকর্ম করছে, সংসার যেমন চলে থাকে তেমনই চলছে, কেবল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যা কিছু গোলমাল শোনা যায়। মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে, পুরুষদের মন ভোলানোই যেন তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তা ছাড়া ইংরেজদের অনুক্ষণ ব্যস্তভাব এবং জীবিকার জন্যে প্রাণপণ যোঝাযুঝিও তাঁর একেবারেই ভাল লাগে নি। তৃতীয় পত্রে ব্রাইটনে সামাজিক মেলামেশার কথাই বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। 'ফ্যান্সি-বল', 'নাচের নিমন্ত্রণ' ইত্যাদির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা। কবি বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার নাচের নেমন্তন্নগুলো বড় ভাল লাগে না।'...'আমি নূতন লোকের সঙ্গে বড় মিলেমিশে নিতে পারি নে, যে নাচে আমি একেবারে সুপণ্ডিত সে নাচও নতুন লোকের সঙ্গে নাচতে পারি নে।' অবশ্য যাদের সঙ্গে বিশেষ আলাপ আছে তাদের সঙ্গে নাচতে যে তাঁর মন্দ লাগে না, সে কথা বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। চতুর্থ পত্রে হাউস অব কমন্সের এক অধিবেশনে যোগদান করে সেখানকার অভিজ্ঞতা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। রাজনীতির দলাদলি এবং দলগত অন্ধ আনুগত্য তাঁকে বড়ই আঘাত দিয়েছিল।

পঞ্চম পত্র 'ভারতী'র ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। ওতেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজ সম্পর্কে তাঁর তীব্র মন্তব্যযুক্ত আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'কি কি মসলার সংযোগে বাঙালী বলে একটা পদার্থ ক্রমে বেঙ্‌লো অ্যাঙ্‌লিক্যান কিংবা ইঙ্গবঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়'—তার কথাই কবি সবিস্তারে বলেছিলেন। মধুচক্রে সেই লোষ্ট্র-নিক্ষেপের ফলে সেযুগে প্রচণ্ড গুঞ্জন উত্থিত হয়েছিল। কিন্তু ইঙ্গবঙ্গের আচার-আচরণ সম্পর্কে এই তিক্ত মন্তব্যের পশ্চাতে ছিল কবির স্বজাতি-প্রীতি। বাঙালীরা 'বিলাতের কামরূপে রূপান্তর গ্রহণ করে' যে সব অশোভন ও অন্যায় আচরণ করতেন তাতে শুধু তাঁদেরই যশোহানি হত না, তাঁরা তাঁদের স্বদেশ ও স্বজাতির ওপরও কলঙ্ক আনয়ন করতেন। তাই কবি লিখছেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছা, ভবিষ্যতে যে সকল বাঙালীরা বিলেতে আসবেন তাঁরা যেন আমার এই পত্রটি পাঠ করেন।'

ইঙ্গবঙ্গ-চরিত্রের স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনে রবীন্দ্রনাথ যে লিপি-কুশলতা এবং পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন তা নিন্দা নয়, উচ্চ প্রশংসাই দাবি করে। আলোচনাটি আরও উপাদেয় হয়ে উঠেছে এই কারণে যে, ইঙ্গবঙ্গীয় মেজাজ তাঁর নিজের মধ্যে সঞ্চারিত হলে তাঁর সম্ভাব্য রূপটি কি হবে, তাই দিয়েই তিনি পত্রখানির সূত্রপাত করেছেন। তিনি লিখছেন, 'এই বেড়াল বনে গেলেই বনবেড়াল হয়। তোমাদের সেই বন্ধু যে 'হংস মধ্যে বকো যথা' হয়ে তোমাদের মধ্যে থাকত, যার বুদ্ধির অভাব দেখে তোমরা অত্যন্ত ভাবিত ছিলে, ইস্কুলের মাস্টাররা যাকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোড়া করবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই যখন এ বন থেকে ফিরে যাবে তখন তার ফুলোনো লেজ, বাঁকানো ঘাড়, নখালো থাবা দেখে তোমরা আধখানা হয়ে, পিছু হটে হটে দেয়ালের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নেবে। এ বিলেত-রাজ্য থেকে ফিরে গেলে পর বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধ বেতালের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে একটি 'Oberon' ফিরবে, সে তোমাদের প্রতি লোকের চোখে এমন একটি মায়ারস নিংড়ে দেবে যে, আমাকে যদি গর্দভমুখসিত 'Bottom'-এর মতও দেখতে হয়, তবু তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে।'[৭]

এই মন্তব্যটি শুধু লিপিকৌশলেই অপূর্ব নয়, ওর মধ্যে অনাসক্ত আত্মসমালোচনার যে দৃষ্টিভঙ্গীটি ফুটে উঠেছে তাই ওর শ্রেষ্ঠ গুণ। বিলাতপ্রবাসে রবীন্দ্রনাথ সর্বদা নিজের সম্বন্ধে যে কতটা সচেতন ছিলেন মন্তব্যটি তারই অন্যতম সার্থক নিদর্শন। ইঙ্গবঙ্গ-চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্র-নাথের এই অপূর্ব রচনাটি পাঠ করে 'ভারতী'-সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ যে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিলেন তার প্রমাণ তিনি ইঙ্গবঙ্গ-চরিত্র ব্যাখ্যান করে শিখরিণী ছন্দে একটি কবিতাই লিখে ফেলেছিলেন। আশ্বিনের 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের সঙ্গে কবিতাটি জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। কনিষ্ঠের সুরে সুর মিলিয়ে বড়দা লিখছেন :

> বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য-গৌড়ে,
> অরণ্যে যে জন্যে গৃহগ-বিহগ-প্রাণ দৌড়ে।
> স্বদেশে কাঁদে সে, গুরুজন-বশে কিচ্ছু হয় না,
> বিনা হ্যাট্‌টা কোট্‌টা ধুতি-পিরহনে মান রয় না।
> পিতা মাতা ভ্রাতা নব-শিশু অনাথা ছুট্ কোরে,
> বিরাজে জাহাজে মসি-মলিন কোর্তা বুট্ পোরে,
> সিগারে উদ্‌গারে মুহু মুহু মহা ধূম লহরী,
> সুখ-স্বপ্নে আপ্নে বড় চতুর মানে হরি হরি।
> ফিমেলে ফীমেলে অনুনয় করে বাড়ি ফিরিতে,
> কি তাহে উৎসাহে মগন তিনি সাহেবগিরিতে।
> বিহারে নীহারে বিবিজন সনে স্কেটিঙ করি,
> বিষাদে প্রাসাদে দুখিজন রহে জীবন ধরি।

ফিরে এসে দেশে গল-কলর (collar) বেশে হটহটে,
গৃহে ঢোকে রোখে, উলগ-তনু দেখে বড় চটে,
মহা-আড়ী সাড়ী নিরখি, চুল দাড়ী সব ছিঁড়ে,
ডুটা-লাথে ভাতে ছরকট করে আসন পিঁড়ে।৮

৫

রবীন্দ্রনাথ অসংকোচে বিলেতের 'ফ্যাশনেবল' বা বিলাসিনী মেয়েদের সঙ্গে মিশেছেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে ইঙ্গবঙ্গীয় মনোভাব যে সংক্রামিত হয় নি তার কারণ তাঁর মেজদা ও মেজো বৌঠানের সান্নিধ্য ও অভিভাবকত্বে তাঁর বিলাতপ্রবাসের সংকটকাল উত্তীর্ণ হয়েছে। ব্রাইটনে পৌঁছেই তাঁর চোখে পড়েছিল, 'আমাদের গৃহিণী তাঁর দিশি বস্ত্র পরে ছেলেপিলে নিয়ে অন্নপূর্ণার মত বিরাজ করছেন।' এই অন্নপূর্ণার পাশেই শুভংকর শিবও বিরাজমান ছিলেন; যদিও তাঁর কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রাবলীতে বিশেষ উল্লেখ করেন নি, কিন্তু তিনি ও তাঁর বন্ধু তারকনাথ যে বিলেতের ভদ্রসমাজের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের উপযুক্ত সুযোগ রবীন্দ্রনাথের জন্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বিলাতের যেসব বিলাসিনী মেয়েদের 'ফড়িঙের মত ঘাসে ঘাসে লাফালাফি করে জীবনের বসন্তকাল কাটে' তাদের সঙ্গে মেলামেশার অবাধ অধিকার পেয়েও যে তিনি ভেসে যান নি তার আর একটি কারণ তাঁর অন্তর্মুখী আত্মলীনতা। আচার-ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সংযত ও অনুচ্ছ্বসিত। নিজের এই বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ করে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথনশাস্ত্রে তেমন বিচক্ষণ নই, এখানে যাকে উজ্জ্বল (bright) বলে তা নই, অনর্গল গল্প হাসি আসে না, ও আকারে ইঙ্গিতে কথার আভাসে আমি জানিয়ে দিতে পারি নে যে, আমার চকোরনেত্র তাঁর রূপের জ্যোৎস্না ও আমার কর্ণচাতক তাঁর বাক্যধারা পান করে স্বর্গ-সুখ ভোগ করছে। বরঞ্চ এক এক সময় তাঁরা আমার গম্ভীর মুখ ও সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা শুনে তার উল্টো স্থির করেন।'

তা ছাড়া ভদ্রপরিবারের সুরুচিসম্পন্ন ও সংযমসুন্দর পরিবেশে তিনি ইংরেজ-জীবনের স্নিগ্ধমধুর রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলেই নৃত্যকক্ষের প্রজাপতিপনায় কোনদিনই বিমূঢ় ও বিভ্রান্ত হন নি। নৃত্য ও সুরার মাদক-বিহ্বলতায় নয়, ইংলণ্ডের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নরনারীর অকুণ্ঠ মেলামেশার মধ্যে তিনি জীবনের এক মহত্তর রূপের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। সমাজে ও পরিবারে নারীর এই শৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীনসত্তার গুণগান তাঁর কণ্ঠে হয়তো একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এবং সেখানেই শুরু হয়েছিল 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় অগ্রজ ও অনুজের বাদ-প্রতিবাদ। ইংরেজের সামাজিক অনুষ্ঠানে মেয়ে-পুরুষে একত্র মিলে যে আমোদ-প্রমোদ করা হয় রবীন্দ্রনাথ তাকেই স্বাভাবিক বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত করে দিয়ে আমরা কতটা সুখ ও উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।' * * আমাদের আমোদ-প্রমোদের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি এ কথাও বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে, 'বিলেতের নিমন্ত্রণসভা গুণীদের উৎসাহ দেবার প্রধান স্থান।' সর্বশুদ্ধ জড়িয়ে সেখানকার মেশামিশির ভাব তরুণ কবির দৃষ্টিতে অতি সুন্দর বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। বক্রকটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, 'বাইনাচ দেখে, গান শুনে ও লুচি সন্দেশ হজম বা বদহজম করে যে ফল হয় তার চেয়ে এখানকার সমাজে মিশলে যে মনের কত উন্নতি হয় তা আমি এই ক্ষুদ্র চিঠির মধ্যে বর্ণনা করতে পারি নে।'

বিলিতী সমাজের তৎকালীন স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে অনুজের এ সব উক্তির প্রতিবাদে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের পাদটীকায় তাঁর টিপ্পনীও যুক্ত করে দিতে লাগলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল: 'স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে অতি সাবধানে কথাবার্তা কহা উচিত। ইংলণ্ডে গেলেই বঙ্গীয় ইউরোপ-যাত্রীদের চর্মচক্ষে কি যে এক বিস্ময়জনক ছবি পড়ে, তাহাতে করিয়া তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।'

বয়সে একুশ বৎসরের বড় জ্যেষ্ঠাগ্রজের সঙ্গে কনিষ্ঠের এই বাদপ্রতিবাদ আপাতদৃষ্টিতে অশোভন বলেই মনে হবে। মনে হবে, কনিষ্ঠের বক্রোক্তি-ভাষণ তাঁর অসংযত দুর্বিনীত এবং স্পর্ধিত মনোভাবেরই পরিচায়ক। এই বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয় গ্রন্থের ষষ্ঠ পত্র থেকে। ছিয়াশি বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'ভারতী'তে সেই পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছিল। পৌষের পর 'ভারতী'তে লেখা বন্ধ ছিল। মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন। ফাল্গুনে তিনি তাঁর কৈফিয়ত দিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের যুক্তিকে নূতন করে জোরালো ভাষায় আক্রমণ করলেন। চৈত্রে আবার লেখা বন্ধ রইল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বিতর্কের পালাবদল হল। স্ত্রী-স্বাধীনতার বদলে এল 'পারিবারিক দাসত্বে'র কথা। আমাদের পরিবারে গুরুভক্তি ও অন্ধবশ্যতার উপর তরুণ কবি কটাক্ষ করলেন। গুরুভক্তির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্ত করে পারিবারিক সম্পর্ককে তিনি প্রীতির স্বর্গে পরিণত করার দাবি উত্থাপন করলেন। তিনি লিখলেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের আবার একটা-আধটা গুরুলোক নয়, পদে পদে গুরুলোক। এইরকম ছেলেবেলা থেকে গুরুভারে অবসন্ন হয়ে একটি মুমূর্ষু জাতি তৈরি হচ্ছে।' তাঁর সনির্বন্ধ অনুনয় হল: 'একটা ঘোড়া বা একপাল গোরুকে যেখানে ইচ্ছে চালিয়ে বেড়াও তাতে হানি নেই, কেন না, তাতে বড় জোর তাদের শরীরের কষ্ট হবে, কিন্তু তাতে তাদের মনোবৃত্তির বিকাশ ও বিচারশক্তি পরিস্ফুটনের কোন ব্যাঘাত হবে না, কিন্তু কোন মানুষকে

সে রকম কোর না, বিশেষত তোমার নিজের ভাই, নিজের ছেলেকে।' তাঁর যুক্তির উপসংহারে কবি লিখলেন, 'আমাদের সমাজের আপাদমস্তক দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ। আমরা পারিবারিক দাসত্বকে দাসত্ব নাম দিই নে; কিন্তু নামের গিলটি করে আমরা বড় জোর দাসত্বের লোহার শৃঙ্খলকে সোনার আকার ধরাতে পারি, কিন্তু তার শৃঙ্খলত্ব ঘোচাতে পারি নে; তার যা কুফলতা তা থেকে যাবে।'

পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের এ লেখা কলকাতায় ফিরে এসেই তিনি লিখেছিলেন। অগ্রজ-অনুজের মধ্যে সহজাত সম্পর্কের কেন্দ্র যে সাময়িকভাবে বিচলিত হয়েছিল তারও প্রমাণ কিছু কিছু 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'আমাদের পরিবারে পরকে আপনার করে নিতে হয়, কেন না আপনার সকলে পর।' সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ মন্তব্যটিকে তারকাচিহ্নিত করে পাদটীকায় লিখলেন, 'বিলাত থেকে ফিরে এলে অধিকাংশেরই এইরূপ দশা ঘটে!' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে আঁকড়েই ধরে রইলেন। দেখা যাচ্ছে ১২৮৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার 'ভারতী'তে 'পারিবারিক দাসত্ব' বলে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।[৯] রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জীর অচলিত পর্যায়েও আজ পর্যন্ত কোথাও এর উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু প্রবন্ধটি যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। এই প্রবন্ধের শেষে 'ভারতী'-সম্পাদকও তাঁর মতামত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

আসলে অগ্রজ ও অনুজের এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে প্রাচীনপন্থা ও নবীনপন্থার সংঘাতই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এবং রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য যে, স্পষ্ট মতভেদ সত্ত্বেও 'ভারতী'-সম্পাদক তাঁর সমস্ত বক্তব্যকে 'ভারতী'তে প্রকাশের সুযোগ দিয়েছেন। পারিবারিক ক্ষেত্রে এই স্বাধীনতা পেয়েছিলেন বলেই পারিবারিক দাসত্বের বিরুদ্ধে অমন ভাবে মুক্তকণ্ঠ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনের একটি উত্তরহীন প্রশ্নের কথাও মনে পড়ে। পুত্রকে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে পাঠিয়ে মহর্ষিদেব কেন অসময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে ফিরে আসতে নির্দেশ দিয়েছিলেন? রবীন্দ্র-জীবনীকার লিখেছেন, 'ভারতী'র পত্রধারা তাঁহার এই আকস্মিক প্রত্যাবর্তন-আদেশের জন্য দায়ী কিনা তাহার সঠিক প্রমাণ দিতে পারিব না, তবে আমাদের সন্দেহ হয় তরুণ কবির প্রগল্ভতায় অভিভাবকগণ অসন্তুষ্ট হইয়াই তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার জন্য পত্র দেন।' আমরা মনে করি, মহাকালের সাক্ষ্য এই অনুমানের বিরুদ্ধেই দাঁড়াবে। কারণ, 'ভারতী'তে ১২৮৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে কার্তিক পর্যন্ত যে পত্রাবলী প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে 'প্রগল্ভতা'র পরিচয় অল্পই ছিল। অগ্রহায়ণেই প্রথম স্ত্রী-স্বাধীনতা নিয়ে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হল। পূর্বেই বলেছি, মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন। ফিরে আসার পূর্বে নয়, পরেই বিতর্ক জোরালো আকার ধারণ করে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি অভিভাবকগণের আপত্তিরই কারণ হত তা হলে তাঁরা দেশে ফিরে আসার পরও এ ভাবে 'ভারতী'তে তাঁর বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ দিতেন না। উপরন্তু, দেশে ফিরে আসার কুড়ি মাস পরে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী-পতি 'ভারতী'র পত্রাবলী কাটছাঁট না করেই, দ্বিজেন্দ্রনাথের মন্তব্য সহ, গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সমীচীন মনে করতেন না। আমাদের বিশ্বাস, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের পড়াশোনা তেমন এগোচ্ছিল না বলেই তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। 'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'এর মধ্যে ভাগ্যের খেলা এই দেখতে পাই যে, গেলুম রীতিমত নিয়মে কিছু বিদ্যা শিখে নিতে; কিছু কিছু চেষ্টা হোতে লাগল কিন্তু হয়ে উঠল না। * * ইস্কুল মহলের আশে পাশে ঘুরেছি, বাড়িতে মাস্টার পড়িয়েছেন, দিয়েছি ফাঁকি। যেটুকু আদায় করেছি সেটা মানুষের কাছাকাছি থাকার পাওনা। * * আমার বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁওয়া লেগে।'[১০]

৬

বিলাতপ্রবাসে তরুণ কবি এই মানুষের ছোঁওয়া পেয়েছেন নানা ভাবে নানা দিক থেকে। সেই ছোঁওয়া যে সর্বদাই প্রীতিপ্রদ ছিল তা নয়। 'জীবনস্মৃতি'তে ভারতবর্ষের একজন উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে একটি প্রহসন 'রুবি'র প্রবাস-বাসের সঙ্গে জড়িত হয়েছিল তার কথা তিনি বিস্তারিত করেই বলেছেন। 'ভারতী'র উপান্ত-পত্রে [আষাঢ় ১২৮৭] 'একটা গল্প বলি শোন' বলে তিনি ডিভনশিয়রের যে প্রেমোপাখ্যান কৌশলে অন্যের নামে চালিয়ে দিয়েছেন, আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে মনে হয়, তা তাঁর নিজেরই প্রবাস-জীবনের একটি কাহিনী।

কিন্তু বিলেতে মানুষের কাছাকাছি থাকার সবচেয়ে বড় পাওনা কবি পেয়েছিলেন লণ্ডনে ডাক্তার স্কটের পরিবারে। পত্রাবলীর শেষ পত্রে সেই কাহিনী লিপিবদ্ধ করেই তিনি তাঁর প্রবাস-কথার পূর্ণাহুতি করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থেও ডাক্তার স্কটের পরিবারে তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যের কথা যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম বিলাতপ্রবাসের শেষ কয়েক মাস তাঁর অতিবাহিত হয়েছে লণ্ডন-নিবাসী এই ভদ্র গৃহস্থের ঘরে একেবারে ঘরের লোকের মত। 'জীবন-স্মৃতি'র পাঠক সে ইতিহাসের অনেকখানিই পেয়েছেন। 'ভারতী'র পৃষ্ঠা থেকে সে ইতিহাসের পরিপূরক কাহিনী পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে।

এই পরিবারের বাসিন্দা ছিলেন ডাক্তার স্কট, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের চার মেয়ে, দুই ছেলে, তিন দাসী ও টোবি বলে একটি কুকুর। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সবশুদ্ধ জনসংখ্যা দাঁড়াল তের। এই পরিবারে রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক অভ্যর্থনাটি বড়ই অদ্ভুত হয়েছিল। 'ডাক্তার স্কটের মেজ মেয়ে পরে বলেছিলেন, প্রথম যখন তাঁরা শুনলেন যে, একজন ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তাঁদের মধ্যে বাস করতে আসছে, তাঁদের ভারি ভয় হয়েছিল।—'ব্যক্তিটা কি রকম হবে না জানি। তার সাক্ষাতে আবার কি রকম আদব কায়দা রেখে চলতে হবে? আমাদের কথা সে ভাল করে বুঝতে পারবে কি না, ও তার কথা আমরা ভাল করে বুঝতে পারব কি না'—এই রকম নানাবিধ ভাবনায় তাঁদের তো রাতে ঘুম হয় না। যেদিন আমার আসবার কথা সেইদিন মেজ ও ছোট মেয়ে তাঁদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক হপ্তা বাড়িতে আসেন নি। তারপর হয়তো তাঁরা শুনলেন যে, একটা পোষমানা জীব তাঁদের বাড়িতে এসেছে, সে ব্যক্তির চেহারা দেখে বোধ হয় না তার কখনও মানুষের মগজের লাড়ু, মানুষের ঠ্যাংয়ের শিককাবাব্ বা খোকাখুকী ভাজা খাওয়া অভ্যাস ছিল, মুখে ও সর্বাঙ্গে উল্কি নেই, ঠোঁট বিঁধিয়ে অলঙ্কার পরে নি, তখন তাঁরা বাড়িতে ফিরে এলেন। ওঁরা বলেন যে প্রথম প্রথম এসে যদিও আমার সঙ্গে কথাবার্তা কয়েছিলেন তবুও দু-দিন পর্যন্ত আমার মুখ দেখেন নি। হয়তো ভয় হয়েছিল যে, কী অপূর্ব ছাঁচে ঢালাই মুখই না জানি দেখবেন। তারপর যখন মুখ দেখলেন তখন? তখন কি? আমার তো বিশ্বাস, তখন তাঁর মাথা ঘুরে গিয়েছিল। তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না যে, এই মুখ দেখে কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির মাথা ঘুরতে পারে। কিন্তু সেটা তোমাদের ঘোরতর কুসংস্কার। ওই তো সুমুখের আয়নায় আমার মুখটা দেখতে পাচ্ছি। কেন, কি মন্দ। এ মুখ দেখে তোমাদের কারও মাথা ঘোরে নি সত্যি! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মাথা আছে?'

বলাই বাহুল্য, অল্পদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ এই পরিবারে একেবারে ঘরের লোকের মত হয়ে গেলেন। মিসেস স্কট তাঁকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করতেন। এই মধ্যবিত্ত পরিবারের কল্যাণময়ী এই গৃহলক্ষ্মীর মধ্যে কবি নারীত্বের যে মহিমা দেখেছিলেন, আমাদের দেশের সাধ্বীগৃহিণীর সঙ্গেই তিনি সশ্রদ্ধ ভাষায় তার তুলনা করেছেন।

এই পরিবারের দুটি ছোট শিশু এথেল ও টমের তিনি হলেন আংকল্ আর্থার। এমন কি পরিবারের বিশ্বস্ত কুকুরটির সঙ্গেও তাঁর গভীর ভাব হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'ছোট্ট কুকুরটি। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রোঁয়া। রোঁয়াতে চোক মুখ ঢাকা। * * সকালবেলায় ব্রেকফাস্টের সময় তার তিনটি বিস্কুট বরাদ্দ আছে। সে বিস্কুটগুলি নিয়ে সে খাবার ঘরে বসে থাকে, যতক্ষণ না আমি গিয়ে বিস্কুটগুলি নিয়ে তার সঙ্গে খানিকটা খেলা করি, একবার তার মুখের থেকে কেড়ে নিই, একবার গড়িয়ে দিই, ততক্ষণ তার খাওয়া হয় না। আমি খেলা না করলে সে কোনমতেই খেতে রাজি হয় না। আমাকে সে বড় ভালবাসে। আগে আগে যখন আমার উঠতে দেরি হত, সে তার বরাদ্দ বিস্কুট নিয়ে আমার শোবার ঘরের কাছে বসে ঘেউ ঘেউ করত। কিন্তু গোল করলে আমি বিরক্ত হতুম, সে এখন আর ঘেউ ঘেউ করে না। আস্তে আস্তে পা দিয়ে দরজা ঠেলে; যতক্ষণ না আমি দরজা খুলে দিই চুপ করে বাইরে বসে থাকে। দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোলেই সে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে লেজ নেড়ে সুপ্রভাত সম্ভাষণ করে; তার পরে একবার বিস্কুটের দিকে চায়, একবার আমার মুখের দিকে চায়।'

ডাক্তার স্কটের মেজো ও সেজো দুটি মেয়েই রবীন্দ্রনাথের অনুরক্ত হয়েছিল। তীর্থংকরে দিলীপকুমারকে পরবর্তী জীবনে কবি বলেছেন, দুটি মেয়েই যে তাঁকে ভালবাসত সেকথা আজ তাঁর কাছে একটুও ঝাপসা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিজের দিক দিয়ে সেজো মেয়েকেই তাঁর বেশী ভাল লাগত বলেই মনে হয়। বাড়ির মধ্যে সেজো মেয়েটিই ছিলেন গাইয়ে বাজিয়ে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস ক—বাজান। মিস ক—আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন। কিন্তু প্রায় সন্ধ্যাবেলায় আমাদের একটু আধটু পড়াশুনো হয়। আমরা পালা করে ছ-দিনে ছ-রকমের বই পড়ি। বই পড়তে পড়তে এক একদিন প্রায় সাড়ে-এগারোটা বারোটা হয়ে যায়। ছেলেরা এখন শুতে গেছে।' 'জীবনস্মৃতি'তে কবি লিখেছেন, ডাক্তার স্কটের একটি মেয়ে তাঁর কাছে বাংলা শিখবার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন। সম্ভবতঃ সেজো মেয়ের মধ্যেই কবি এই উৎসাহ সঞ্চারিত করেছিলেন। ১২৮৭ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে 'দুদিন' বলে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয় এই মেয়েটিই তার আলম্বন-স্বরূপিণী। 'সন্ধ্যাসংগীতে' এই কবিতাটি সংকলিত হয়েছে। 'ভারতী'র যে স্তবকটি 'সন্ধ্যাসংগীতে' বাদ দেওয়া হয়েছে সেই স্তবকটি হল—

একখানা ভাঙা লঘু মেঘের মতন
কত গিরি হতে গিরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
যেদিকে লইয়া যায় অদৃষ্ট-পবন।
আসিলাম একবার শুভদৈব বলে
ফুলে ফুলে ভরা এক হরিত অচলে।
রহিনু দুদিন—
সাঁঝের কিরণ পিয়া—নিঝরের জলে গিয়া
ইন্দ্রধনু নিরমিয়া খেলিলাম কত,

ডুবে গেনু জোছনায়, আঁধার পাথার গায়
বসালেম তারা শত শত।
ফুরালো দুদিন—
সহসা আরেক দিকে বহিল পবন
দুদিনের খেলাধূলা ফুরালো আমার
আবার আরেক দিকে চলিনু আবার'[১১]

এই কবিতায় কবি নিজের অনুরাগ প্রকাশ করে আবেগ-ভরে লিখেছেন—

সুকুমার কুসুমটি—জীবন আমার—
বুক চিরে হৃদয়ের হৃদয় মাঝার
শত বর্ষ রাখি যদি দিবস রজনী
মেটে মেটে না তবু তিয়াষ আমার ;—
শত ফুলদলে গড়া সেই মুখ তার,
স্বপনেতে প্রতি নিশি হৃদয়ে উদিবে আসি,
এলানো কুন্তলজাল, আকুল নয়নে।
সেই মুখ সঙ্গী মোর হইবে বিজনে।
* * *
ক্ষুদ্র এ দুদিন তার শত বাহু দিয়া
চিরটি জীবন মোর রহিবে বেষ্টিয়া।

৭

স্কট-দুহিতা মিস কে-র উদ্দেশে নিবেদিত এথেল ও টমের আংকল্ আর্থারের এই প্রণয়োচ্ছ্বাস কিশোর-মনের স্বপ্নকামনাকেই ভাষা দিয়েছে। 'দুদিনে'র কবি কল্পনা করেছেন, বর্ষে বর্ষে শত শত ঘটনা জীবনের উপর দিয়ে পার হয়ে যাবে। হয়তো একদিন সন্ধ্যায় কবি একটি নদীর ধারে বসে আছেন, এমন সময় হৃদয়খানি হুহু করে উঠবে, মানস-আকাশে মেঘাচ্ছন্ন স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেবে— একটি মুখের ছবি, একটি গানের ছত্র, দু-একটি সুর মনে পড়বে। তারপর বিস্মৃতির বাঁধ ভেঙে বিগত দিনের কথাগুলি বন্যার মতন মনকে প্লাবিত করে দেবে। 'দু দিনে'র 'দিক্‌শূন্য ভট্টাচার্য'[১২] বুঝতে পারেন নি যে, দু দিনকে চিরদিন ধরে রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়! যতই সে বলে 'যেতে নাহি দিব', ততই তাকে 'যেতে দিতে হয়',—কেন না 'বার বার কারো পানে ফিরে চাহিবার নাই যে সময়, নাই নাই।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই দু দিনের কিশোরী-সঙ্গিনীর কোন নামকরণ করেছিলেন কি না নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। কবিতার একটি পরিত্যক্ত স্তবকের একটি পংক্তিতে কবি বলেছিলেন, 'কোমলা যুঁথীর এক পাপড়ি খসিল।' কোমলা যুঁথীর খসে-পড়া পাপড়ির সুরভি কিন্তু কবিমানসকে আরও কিছুদিন আমোদিত করে রেখেছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি বলেছেন, 'বিদায়কালে মিসেস স্কট আমার দুই হাত ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "এমন করিয়াই যদি চলিয়া যাইবে তবে এত অল্পদিনের জন্য তুমি কেন এখানে আসিলে ?"—লণ্ডনে এই গৃহটি এখন আর নাই— এই ডাক্তার পরিবারের কেহবা পরলোকে কেহবা ইহলোকে কে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন তাহার কোনো সংবাদই জানি না কিন্তু সেই গৃহটি আমার মনের মধ্যে চির-প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে।'[১৩]

এই পরিবার সম্পর্কে এবং বিশেষ করে 'মিস কে—' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল বিলেত থেকে দেশে ফিরে আসার পরও তাঁর মনে উদগ্র হয়েছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার বিলেতে গিয়ে ১০ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে পৌঁছেই পরদিন সকালবেলা তিনি ছুটে গিয়েছিলেন স্কট-পরিবারের সন্ধানে। কবি লিখেছেন, 'প্রথমে লণ্ডনের মধ্যে আমার সর্বাপেক্ষা পরিচিত বাড়ির দ্বারে গিয়ে আঘাত করা গেল। যে দাসী এসে দরজা খুলে দিলে তাকে চিনি নে। তাকে জিজ্ঞাসা করলুম আমার বন্ধু বাড়িতে আছেন কি না। সে বললে তিনি এ বাড়িতে থাকেন না। জিজ্ঞাসা করলুম কোথায় থাকেন ? সে বললে, আমি জানি নে, আপনারা ঘরে গিয়ে বসুন, আমি জিজ্ঞাসা করে আসছি। পূর্বে যে ঘরে আমরা আহার করতুম সেই ঘরে গিয়ে দেখলেম সমস্ত বদল হয়ে গেছে—সেখানে টেবিলের উপর খবরের কাগজ এবং বই—সে ঘর এখন অতিথিদের প্রতীক্ষাশালা হয়েছে। খানিকক্ষণ বাদে দাসী একটি কার্ডে লেখা ঠিকানা এনে দিলে। আমার বন্ধু এখন লণ্ডনের বাইরে কোনো এক অপরিচিত স্থানে থাকেন। নিরাশ হৃদয়ে আমার সেই পরিচিত বাড়ি থেকে বেরোলুম।' ['য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি', ১১ সেপ্টেম্বর, ১৮৯০]। এ সম্পর্কে অন্যত্র কবি আরও অন্তরঙ্গ সুরে লিখছেন, 'একবার ইচ্ছে হল, অন্তঃপুরের সেই বাগানটা দেখে আসি ; আমার সেই গাছগুলো কত বড় হয়েছে। আর সেই ছাতের উপরকার দক্ষিণমুখো কুঠরি, আর সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘর!' কিন্তু 'সেই ঘর এবং সেই আর একটা ঘরে'র গৃহবাসিনীর সন্ধান কবি জীবনে আর কখনও পান নি।

হৃদয়াবেগের কথা বাদ দিয়েও কবিজীবনে মিস কে-র একটি বিশেষ আসন আছে। কবি বলেছেন তাঁর বিদেশের শিক্ষা প্রায় সমস্তটাই মানুষের ছোঁয়া লেগে। প্রথম বার বিলেতে গিয়ে কবি ব্যারিস্টার হতে পারেন নি বটে, কিন্তু এই যাত্রার সবচেয়ে বড় লাভ হল য়ুরোপীয় সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পরিচয়। এই সংগীত-শিক্ষায় মিস কে-র দান নগণ্য নয়। ইউরোপ-প্রবাসীর শেষ পত্র লেখা হয় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি। সেদিন তিনি লিখেছেন, 'আমি ইতিমধ্যে অনেক ইংরেজি গান শিখেছি। আমি গান করি। মিস ক—বাজান। মিস ক—আমাকে অনেকগুলি গান শিখিয়েছেন।' এই চিঠি লেখার পরেও কবি মাসাধিককাল স্কট-পরিবারে ছিলেন ; সুতরাং মিস ক-র কাছে কবির সংগীত-শিক্ষা এর পরেও আরও কিছুদূর

অগ্রসর হয়েছিল। রবীন্দ্র-সংগীতে য়ুরোপীয় সংগীতের প্রভাবের কথা যখনই আলোচিত হবে তখনই কবির কৈশোর-লগ্নের এই কিশোরী-শিক্ষয়িত্রীকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য।

হৃদয়াবেগের দিক দিয়ে অবশ্য কবির এই কৈশোর-অনুভূতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া সমীচীন হবে না। কিশোর-মনের স্বপ্নবিলাসের ঊর্ধ্বে তাদের স্থান নয়। দিকশূন্য ভট্টাচার্যের 'তুদিন' কবিতার জন্মকথা এ সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করবে। রবীন্দ্র-ভবনে রক্ষিত মালতী পুঁথিতে 'ফুরালো তুদিন' শীর্ষক একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি রয়েছে। 'তুদিন' কবিতাটি তারই সংস্কৃত রূপ। প্রথম পাঠটি ('ফুরালো তুদিন') বোম্বাইতে রচিত এবং তার মধ্যে বিচ্ছেদের কথাই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। কবিতাটি কোথাও প্রকাশিত হয় নি। পরে স্কট-কুমারীর স্মরণে কবি তারই রূপান্তর ঘটিয়ে 'ভারতী'তে প্রকাশ করেন।[১৪]

স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগবে, তা হলে 'তুদিন' কবিতার প্রেরণাদাত্রী কে? যে স্বপ্ন বোম্বাইয়ে শুরু হয়েছে সেই স্বপ্নই লণ্ডনে অন্য পাত্রীকে আশ্রয় করে সঞ্চারিত হতে দেখা গেল। একই কবিতার উৎস-সন্ধানে নায়িকা-বদলের এই রহস্যের সূত্রনির্দেশ বিশেষ কৌতুকাবহ। আসলে কল্পনা-প্রবণ কিশোর-মনের বিশেষ প্রবণতা থেকেই সুখ-দুঃখের ওই আত্যন্তিক উচ্ছ্বাস উৎসারিত হয়েছে। ১২৮৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যার 'ভারতী'তে 'প্রেমমরীচিকা' বলে একটি গান প্রকাশিত হয়। তাতে কবি বলছেন—

ও কথা বোলো না তারে কভু সে কপট নারে
আমার কপাল-দোষে চপল সেজন।
অধীর হৃদয় বুঝি শান্তি নাহি পায় খুঁজি,
সদাই মনের মতো করে অন্বেষণ।
ভালো সে বাসিত যবে করে নি ছলনা!
মনে মনে জানিত সে সত্য বুঝি ভালবাসে—
বুঝিতে পারে নি তাহা যৌবন-কল্পনা।

* * *

প্রেম-মরীচিকা হেরি ধায় সত্য মনে করি,
চিনিতে পারে নি সে যে আপনার মন।[১৫]

এই 'প্রেম-মরীচিকা' সম্পর্কে কবির আত্মমানসের অপূর্ব বিশ্লেষণ রয়েছে 'ভারতী' আশ্বিন, ১২৮৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'অকারণ কষ্ট' প্রবন্ধে। কিশোর রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি তাঁর তৎকালিক মনোভাবের অভ্রান্ত দিগ্‌দর্শনী হিসাবে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। 'সন্ধ্যাসংগীত' পর্বের তুঃখবাদ নিয়ে নানা দিক দিয়ে নানারকম বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। কবির প্রথম যৌবনের সেই তুঃখবাদের হেতু-নির্দেশে 'অকারণ কষ্ট' প্রবন্ধটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। কবিকণ্ঠেই তাঁর জীবনারম্ভের তুঃখবাদের নিদানকথা শোনা যাক—

'অকারণ কষ্ট নামে একটা রোগ আছে অনেকে হয়ত তাহা জানেন না। জন্মান্ধতার ন্যায় এই রোগ সারিবার নহে। * *

'অনেকে হয়ত জানেন না যে, তাঁহারা যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহার যথার্থ কোনো কারণ নাই। * * যাহাকে তাঁহারা কারণ মনে করেন তাহা মন ভুলাইবার ওজর মাত্র। তাঁহাদের মনের স্বাভাবিক অবস্থাই কষ্ট পাওয়া। ঘটনাগুলি তাহার উপলক্ষ মাত্র। ঘটনাগুলি তাঁহাদের তুঃখের কারণ নহে তুঃখের আশ্রয়। * * আসল কথা এই যে, তাঁহাদের তুঃখের নিজের একটা বাড়িঘর নাই, এই জন্য সে ঘর খুঁজিয়া বেড়ায়, একটা তুয়ার দেখিলে অমনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংকোচে নিজের ঘরকন্না ফাঁদিয়া বসে। * * যেমন তুঃখের সম্বন্ধে সুখের সম্বন্ধেও সেইরূপ। যখন একটা সুখের কারণ ঘটে, সেটাকে অত্যন্ত প্রকাণ্ড করিয়া দেখেন, ও একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠেন। * * তাঁহারা যে নিজে জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা করিয়া আপনাকে প্রবঞ্চনা করেন তাহা নহে। তাঁহাদের মন তাহার নিজের চক্ষে নিজে ধূলা দেয়, ইহাতে তাঁহাদের কোন হাত নাই, তাঁহারা জানিতেও পারেন না। তাঁহাদের সমস্ত জীবনটাই একটি মহাভুল। ভুল লইয়াই তাঁহারা কাঁদেন, ভুল লইয়াই তাঁহারা হাসেন, ভুলই তাঁহাদের মনের ক্রীড়া, ভুলই তাঁহাদের মনের আহার! 'সে ভুল প্রাণের ভুল, মর্মে বিজড়িত মূল।' ভুলের উপরেই তাঁহাদের জীবনের ভিত্তি স্থাপিত। [এর পর প্রবন্ধে 'প্রেম-মরীচিকা' গানটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধার করে কবি লিখছেন] অর্থাৎ যথার্থ ভালবাসা না হইতেই অকারণ-কষ্টগ্রস্তেরা কল্পনা করে যে, তাহারা ভালবাসিতেছে। * * এ জীবনে ইহারা এমন কাহাকেও ভালবাসিতে পারিবে না, যাহার ভালবাসায় ইহাদের অধিকার আছে। অর্থাৎ যাহাকে ভালবাসিলে ইহাদের সুখী হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাকে ইহারা ভালবাসিতে পারিবে না। ভালবাসিয়া সুখ না পাইলেই তবে ইহারা অপেক্ষাকৃত সুখে থাকিতে পারিবে।'[১৬]

অর্থাৎ সুখই হোক আর তুঃখই হোক, মিলনের আনন্দই হোক আর বিচ্ছেদের বেদনাই হোক, তাকে অকারণে বাড়িয়ে দেখাই অকারণ-কষ্টগ্রস্তদের স্বভাব। যথার্থ ভালবাসা না হতেই তারা কল্পনা করে যে তারা ভালবাসছে। এক কথায় সবই কৈশোরের স্বপ্নাবেশে রচিত, সবই আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস।

৮

'অকারণ কষ্ট' প্রবন্ধটি শুধু কবির আত্মবিশ্লেষণই নয়; নিগূঢ় অর্থে ওটি কবির কৈফিয়তও বটে। রবীন্দ্রনাথ প্রায় তু বৎসর আমেদাবাদ বোম্বাই ও বিলেতে কাটিয়ে এসেছেন, এই তু বৎসরের নিজের অনুভূতি ও আচরণ সম্পর্কে এই

কৈফিয়ত তাঁরই প্রাপ্য যাঁকে কবি তাঁর মানস-আকাশের ধ্রুবতারা বলে মনে করেছেন। 'অকারণ কষ্টে'র এক স্থানে কবি বলছেন—

'এরূপ লোকদের কি কেহই মমতা করিবে না? সন্ধ্যাবেলায় যখন একলাটি বসিয়া একটি তারার দিকে চাহিতে চাহিতে ইহাদের চক্ষে জল আসে, তখন কি কেহই ইহাদের দোসর হইবার নাই? কেহই কি এক মুহূর্তের জন্য পাশে বসিয়া বলিবে না "আহা কাঁদিও না।" যখন শুক্ল জ্যোৎস্নারাত্রে বসন্তসমীরে ইহাদের হৃদয় হাহা করিতে থাকে তখন জ্যোৎস্নাও হাসিবে, বসন্ত রাত্রিও হাসিবে, কিন্তু এমন কি একটি হৃদয় থাকিবে না যে কাঁদিবে?'

ভাববাচ্যে প্রকাশিত কাঙালের মত মমতালাভের এই করুণ আবেদনের লক্ষ্য কে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। প্রবাস-জীবনের দিনগুলিতে গদ্যে ও পদ্যে অন্তরঙ্গভাবে নিজের কথা বলার ভাষা কবি প্রথম খুঁজে পেয়েছিলেন। 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্রে'ই হোক আর একাধিক গান ও কবিতার মধ্য দিয়েই হোক, কবি অকপটে নিজের মনোভাব ও আচরণের কথা অসংকোচে ব্যক্ত করেছেন। ভালমন্দ-নির্বিশেষে নিজের মানসলোককে এভাবে সম্পূর্ণ অনাবৃত করার মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে আনন্দই থাক্, অন্তরঙ্গ আত্মজনের কাছে তার জন্যে কৈফিয়ত দিতেই হবে। 'য়ুরোপ-প্রবাসী'র উৎসর্গে কবি জ্যোতিদাদাকে সম্বোধন করে লিখেছেন, 'ইংলণ্ডে যাঁহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত, তাঁহারই হস্তে এই পুস্তকটি সমর্পণ করিলাম।' বলাই বাহুল্য, জ্যোতিদাদার হাত দিয়ে কবির এই অঞ্জলি গিয়ে পৌঁছেছে নোতুন বৌঠানেরই হাতে। তাঁকে প্রবাস-জীবনে শুধু যে 'সর্বাপেক্ষা অধিক মনে পড়িত' তাই নয়, তাঁর প্রতি অনুরক্তির একাগ্র ঐকান্তিকতার ফলেই প্রবাসের অসংখ্য মোহবন্ধনের জাল থেকে কবি সহজেই মুক্ত হয়ে আসতে পেরেছেন। 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানির সূত্রপাত হয় বিলেতে; দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১২৮৭ সালের কার্তিক থেকে এই নাট্যকাব্যখানি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হতে থাকে। কার্তিকের 'ভারতী'তে 'ভগ্নহৃদয়ে'র উৎসর্গ-সংগীতটি গ্রন্থের প্রারম্ভেই মুদ্রিত হয়েছিল। ছায়ানটে গ্রথিত এই গীতি-উপহারে কবি লিখেছেন—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।
এ সমুদ্রে আর কভু হব নাক পথহারা।
যেথা আমি যাই নাকো, তুমি প্রকাশিত থাকো
আকুল এ আঁখি পরে ঢাল গো আলোকধারা।
ও মুখখানি সদা মনে জাগিতেছে সঙ্গোপনে
আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা।
কখনো বিপথে যদি, ভ্রমিতে চায় এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা।
চরণে দিনু গো আনি এ ভগ্ন-হৃদয়খানি
চরণ রঞ্জিবে তব এ হৃদি-শোণিতধারা।"

মালতী-পুঁথির সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে এই কবিতাটিরও প্রথম খসড়া বোম্বাইয়েই রচিত হয়েছে। এ থেকে নিঃসংশয়েই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কবির মানস-আকাশের এই ধ্রুবতারার আলোতেই বিদেশ-প্রবাসে তাঁর মনের গতিপথ নির্ণীত হয়েছে। নোতুন বৌঠানের উদ্দেশে রচিত এই গানটি প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রহ্মসংগীতের পর্যায়ভুক্ত হয়েছিল। বলাই বাহুল্য, ব্রহ্মসংগীতে শেষ দুটি পংক্তি বাদ গিয়েছে এবং ষষ্ঠ পংক্তির 'আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা' স্থলে বসেছে 'তিলেক অন্তর-হলে না হেরি কূলকিনারা।' কবিকিশোরের 'আঁধার হৃদয় মাঝে দেবীর প্রতিমা পারা' যে নারীমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন তাঁর প্রতি তদ্গত চিত্তের হৃদয়ানুভূতির মধ্যে ব্রহ্মোপাসক তাঁর ভক্তি-নিবেদনের ভাষা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাতেই প্রমাণিত হয় যে, নোতুন বৌঠানের প্রতি কিশোর রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি ছিল ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি একান্তনির্ভর ভক্তের ঐকান্তিক পরানুরক্তির সঙ্গেই তা উপমেয়। সে গভীরতার সঙ্গে কিশোর-মনের কোন লীলাচপল লঘু-রোমান্সই তুলনার যোগ্য হতে পারে না।

'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' ব্রহ্মসংগীতে পরিণত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ 'ভগ্নহৃদয়' গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নূতন উপহার-কবিতা রচনা করেছিলেন। ভাষার দিক দিয়ে পৃথক হলেও একই অনুভূতির প্রকাশ সেখানে পাওয়া যাবে। কবি লিখেছেন—

১

হৃদয়ের বনে বনে সূর্যমুখী শত শত
ওই মুখপানে চেয়ে ফুটিয়া উঠেছে যত।
বেঁচে থাকে বেঁচে থাক্, শুকায় শুকায়ে যাক্,
ওই মুখ পানে তারা চাহিয়া থাকিতে চায়,
বেলা অবসান হবে, মুদিয়া আসিবে যবে
ওই মুখ চেয়ে যেন নীরবে ঝরিয়া যায়!

২

জীবন-সমুদ্রে তব জীবন-তটিনী মোর
মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়ে ভোর,
সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি,
অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া,
জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি ঢেউ
মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

৩

হয়ত জান না, দেবি, অদৃশ্য বাঁধন দিয়া
নিয়মিত পথে এক ফিরাইছ মোর হিয়া।

গেছি দূরে, গেছি কাছে, সেই আকর্ষণ আছে,
পথভ্রষ্ট হই নাক তাহারি অটল বলে,
নহিলে হৃদয় মম ছিন্ন ধূমকেতু সম
দিশাহারা হইত সে অনন্ত আকাশ তলে !

৪

আজ সাগরের তীরে দাঁড়ায়ে তোমার কাছে
পরপারে মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার দেশ আছে ;
দিবস ফুরাবে যবে সে দেশে যাইতে হবে,
এ পারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী,
ফুরাইবে গীত গান, অবসাদে ম্রিয়মান,
সুখ শান্তি অবসান কাঁদিব আঁধারে বসি !

৫

স্নেহের অরুণালোকে খুলিয়া হৃদয় প্রাণ,
এ পারে দাঁড়ায়ে, দেবি, গাহিনু যে শেষ গান,
তোমার মনের ছায় সে গান আশ্রয় চায়,
একটি নয়ন জল তাহারে করিও দান।
আজিকে বিদায় তবে, আবার কি দেখা হবে,
পাইয়া স্নেহের আলো হৃদয় গাহিবে গান ?

কবিতাটি 'শ্রীমতী হে'-কে উৎসর্গীকৃত। 'শ্রীমতী হে' যে কাদম্বরী দেবীরই সংকেতনামা, সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই কবিতায় জীবনসমুদ্রে জীবনতটিনী মিশিয়ে দেবার যে রূপকল্প কবি ব্যবহার করেছেন 'প্রভাত-সংগীতে'র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' তা নূতন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। সে আলোচনার স্থান এ নয়। কিন্তু এখানেও কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, তাঁর হৃদয়কমলাসনে অচলপ্রতিষ্ঠ সেই দেবীর অদৃশ্য বাঁধন, তাঁর সেই নিগূঢ় আকর্ষণের ফলেই কবি বিদেশের নানা প্রলোভনের মধ্যেও কখনও পথভ্রষ্ট হন নি।

[ক্রমশ]

॥ উল্লেখ-পঞ্জী ॥

১ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১১৪।
২ দ্রষ্টব্য, জীবনস্মৃতি, পৃ. ১১৪-১১৫।
৩ রবীন্দ্র-রচনাবলী—১, পৃ. ৫২৬-৫২৭।
৪ জীবনস্মৃতি, পৃ. ৯৮।
৫ তদেব, পৃ. ১১২।
৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী—১, পৃ. ৫২৬।
৭ ভারতী, ভাদ্র ১২৮৬, পৃ. ২১৭।
৮ তদেব, আশ্বিন ১২৮৬, পৃ. ২৬৪।
৯ তদেব, চৈত্র ১২৮৭, পৃ. ৫৫৩-৫৬৮।
১০ ছেলেবেলা, পৃ. ৯৩-৯৪।
১১ ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭, পৃ. ৫৯।
১২ 'দুদিন' কবিতা 'ভারতী'তে শ্রীদিক্শূন্য ভট্টাচার্য ছদ্মনামেই প্রকাশিত হয়েছিল।
১৩ জীবনস্মৃতি পৃ. ১০৪-১০৫।
১৪ দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-জীবনী ১, পাদটীকা পৃ, ৭৯।
১৫ রবিচ্ছায়া, ১৫ ; দ্রষ্টব্য গীতবিতান, পৃ. ৮৬৬।
১৬ ভারতী, আশ্বিন ১২৮৭, পৃ. ২৮৭-২৯১।
১৭ ভারতী, ১২৮৭, পৃ. ৩৩৭।

শিক্ষা-সংস্কারে বিদ্যাসাগর

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সংস্কৃত-শিক্ষা

সাধারণের ধারণা ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের ফলেই এ দেশে রেনেসাঁস বা নব-জাগরণ সম্ভব হইয়াছে। রেনেসাঁস কথাটির গূঢ়ার্থ আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। রেনেসাঁস-এর মৌলিক অর্থ পুনর্জন্ম। আমাদের ভিতরে সত্য শাশ্বত চিরন্তন যাহা ছিল, এবং যাহা একদিন চর্চার অভাবে বিলুপ্ত বা প্রায়-বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা পুনরুদ্ধার, পুনঃপ্রচার এবং তাহার দ্বারা সর্ববিধ জাতীয় শক্তির বিকাশ। শক্তির বিকাশ হইলেই তবে নূতন বহিরাগত বস্তুকেও ঝাড়পোঁচ করিয়া আমরা আত্মস্থ করিয়া লইতে পারি। আপাতদৃষ্টিতে হয়তো মনে হইবে, এ দেশে ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, ইহার ভিতরে যাথার্থ্য পুরাপুরি নাই। এ কথা সত্য বটে, পশ্চিমের সংস্রবে আসার সঙ্গেই গত শতাব্দীতে বঙ্গদেশে রেনেসাঁস সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু কোন বিশেষ শাসন-নীতি বা শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে ইহার উদ্ভব হইয়াছে বলা যায় না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচ্য-বিদ্যা চর্চার আয়োজন করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত-আরবী-ফারসীর সঙ্গে সঙ্গে দেশ-ভাষাসমূহের চর্চার শুরু হইল। নূতন পাঠশালা স্থাপন ও পুরাতন পাঠশালা সংস্কার, এবং সাধারণ-প্রাপ্য পাঠ্যপুস্তকাদি রচনার দ্বারা লোকশিক্ষার আয়োজন হইতে থাকে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর রীতিমত ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮২৪-২৫ সনে এখানকার শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করিয়া ডাঃ হোরেস হেমান উইলসন ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিবিধ বিদ্যা, মায় বিজ্ঞানের প্রাথমিক পাঠ, শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দেন। আদর্শ শিক্ষাব্রতী ডিরোজিওর সুশিক্ষায় যুবকচিত্ত এক দিকে যেমন নব নব বিদ্যা আহরণে উন্মুখ হইল, অন্য দিকে তেমনই সমাজের কল্যাণকর্মেও ইহা অগ্রসর হয়। কিন্তু যে নূতন বিদ্যা—জ্ঞানবিজ্ঞান এইরূপে যুবকগণ প্রাপ্ত হইতেছিলেন, তাহাকে স্বদেশের জল-মাটির সঙ্গে মিশ খাওয়াইয়া লইতে হইলে, তদ্দ্বারা স্বদেশ ও স্ব-সমাজের সম্যক্ হিতসাধন করিতে হইলে আরও কিছু চাই। ইহা কিরূপে সম্ভবে?

ভারতবর্ষের জ্ঞানভাণ্ডার যে অফুরন্ত—এ ব্যাপারটি পূর্বেকার পঞ্চাশ বৎসরে বিভিন্ন সূত্রে সমগ্র বিশ্বে জানাজানি হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটির কৃতিত্ব আমরা বার বার শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। গত শতাব্দীর প্রথম পাদে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও প্রাচ্যবিদ্যা প্রচারের আয়োজন হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের কৃতিত্বও আমাদের স্মরণীয়। রাজা রাধাকান্ত দেব এই সময়েই তাঁহার বিরাট সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থ—'শব্দকল্পদ্রুম' সংকলন ও প্রচার শুরু করিয়া দেন। কোলব্রুক, কেরী, উইলসন প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ ইউরোপীয়েরা এ দেশে বসিয়াই সংস্কৃতভাণ্ডার হইতে অপূর্ব রত্ন উদ্ধার করিতে থাকেন। এই দশকেই প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সমাজ সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য চর্চায় এমন প্রেরণা দান করে যে, পরবর্তী দশ-পনেরো বৎসরে বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থ—কাব্য, মহাকাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন, কোষগ্রন্থ প্রভৃতি মূলে ও অনুবাদে প্রকাশিত হইতে থাকে। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে সংস্কৃত গ্রন্থাদি সাধারণের নিকট সহজলভ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু সংস্কৃত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা কি? এ দেশে টোল-চতুষ্পাঠী ছিল, কিন্তু ইহাতে শুধু ব্রাহ্মণ-শ্রেণী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৈদ্যশ্রেণীর মাত্র প্রবেশাধিকার ছিল, জনসাধারণের ভিতরে সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। যে কেহ শিখিতেন, ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া। পণ্ডিতেরা অর্থের বিনিময়ে বিদেশী শ্বেতাঙ্গদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। দেশীয় ধনীসন্তানগণ, শূদ্র হইয়াও, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সংস্কৃত-বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। শোভা-

বাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তিনি 'শব্দকল্পদ্রুম' সংকলনে বহু খ্যাতনামা পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহু বৎসর টালমাটাল করিবার পর ১৮২৪ সনে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে, কিন্তু ইহার দ্বার সাধারণের নিকট উন্মুক্ত ছিল না, চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণ-শ্রেণীই ইহাতে পড়িতে পাইত। ধর্ম ও দর্শন ব্যতিরেকে কলেজের অন্যান্য বিভাগে বৈদ্যজাতীয়দের মাত্র প্রবেশাধিকার ছিল। হিন্দু কলেজে সংস্কৃত শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তবে ইহা ছিল নিতান্তই প্রাথমিক স্তরের। এখানে অবশ্য ব্রাহ্মণেতর ছাত্রগণের সংস্কৃত শিক্ষাদানে পণ্ডিত মহাশয়দের কোনরূপ আটকাইত না। ক্রমে অন্যান্য স্থলে, যেমন ঢাকা, কৃষ্ণনগর, হুগলী ও পাটনায় সরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সে সব স্থানে পণ্ডিতদের দ্বারা সংস্কৃত পড়াইবার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ইহা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। গভর্মেণ্টের প্রাচীনতম সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শ্রেণীবিভেদ অনুসৃত হওয়ায়, উচ্চতর সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনাদি অধ্যয়ন হইতে জনসাধারণ একেবারেই বঞ্চিত ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২৯ হইতে ১৮৪১ সন পর্যন্ত কিঞ্চিদধিক বারো বৎসর সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন কলেজে উক্ত ব্যবস্থা বলবৎ ছিল; ইহার দশ বৎসর পরে ১৮৫১ সনের প্রাক্কালে তিনি যখন কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন তখনও এই অবস্থা। ১৮২৪ হইতে ১৮৫০, দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসর কাল এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকায়, এবং স্বদেশীয় উচ্চতম বিদ্যা আহরণের সর্বজনগ্রাহ্য কোনরূপ নূতন প্রণালী অনুসৃত না হওয়ায়, নব্যশিক্ষিতদের যে উৎকট বিদেশী-প্রীতি দেখা দিয়াছিল তাহা সমাজের পক্ষে আদৌ কল্যাণকর হয় নাই। সত্য বটে, এই সময় মধ্যে রামমোহন-পন্থী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা নিজস্ব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি মূলে ও অনুবাদে প্রচার দ্বারা স্বদেশীয়দের জাতীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করাইতে কতকটা যত্নপর হইয়াছিল। ইহাতে কতকটা সুফলও পাওয়া যায়। কিন্তু তখন যেরূপ ব্যাপকভাবে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাসমূহ তথা নব্য ভাবধারা ইংরেজীর মাধ্যমে যুবচিত্তে ছড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা হয় তাহার তুলনায় ইহা ছিল নিতান্তই সামান্য। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা তথা ভাবধারা প্রচারিত হওয়ায় আমাদের যে উপকার হয় নাই এমন কথা বলিতেছি না, বরং এরূপ বলিলে সত্যের অপলাপ হইবারই সম্ভাবনা, তথাপি এ কথা বলিতে হইবেই যে, স্বদেশীয় উচ্চশিক্ষা ও ভাবাদর্শগুলি ওই সময়ে প্রচারিত হইতে পারিলে, উভয়ের সমন্বয়ে আমাদের দেশে অল্পকালের মধ্যেই রেনেসাঁস পূর্ণতালাভ করিতে পারিত। যে রেনেসাঁসের সূচনা শতাব্দীর প্রথম পাদে আমরা লক্ষ্য করি, তাহা পরিপূর্তি লাভ করিতে শতবর্ষ কাটিয়া গেল। এমনটি কখনই হইত না। যাহা হউক, বিলম্বিত হইলেও বিধাতা যেন ইহার জন্য সংস্কৃতবিদ্যায় সুপণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র উচ্চ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে আসন্ন বিপত্তির হস্ত হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আত্যন্তিকভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর এই মৌলিক প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যই বিদ্যাসাগরের জীবন যেন উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সংস্কৃত কলেজে বারো বৎসর পাঁচ মাস অধ্যয়নের পর তিনি ১৮৪১, ডিসেম্বর মাসে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিসহ ইহা পরিত্যাগ করিলেন। বিভিন্ন শ্রেণীতে তিনি অপূর্ব কৃতিত্ব দেখান; কলেজের অধ্যাপক ও কর্তৃপক্ষ উভয়েরই সমাদর লাভ করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিভাবান কৃতী ছাত্র, কোন অসুবিধা বা বাধা-বিপত্তিই তাঁহার অধ্যয়নে বাধ সাধিতে পারে নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল অধ্যয়নে তিনি অসুবিধাগুলি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করেন, এবং পরবর্তী কর্মপ্রয়াস হইতে প্রতীতি হয় যে তিনি ইহা বিদূরণে ওই সময় হইতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪১ সনের ২৯শে ডিসেম্বর হইতে ১৮৪৬ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা হেড পণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী এপ্রিল (১৮৪৬) হইতে ১৬ই জুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময়ে সেক্রেটারি ছিলেন রসময় দত্ত। তখন কলেজে অধ্যক্ষ-পদ সৃষ্ট হয়

নাই, সেক্রেটারিই অধ্যক্ষ বা সর্বময় কর্তা ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের পঠন-পাঠনের এবং পরিচালন-পদ্ধতির সংস্কারে সবিশেষ অভিলাষী ; কিন্তু ইহার আভাস-প্রাপ্তি মাত্রেই রসময় দত্ত তাঁহার উপর রুষ্ট হইয়া উঠিলেন। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র এই পদ ছাড়িয়া দেন। ইহার পর দেড় বৎসর কাল ঈশ্বরচন্দ্র কোন সরকারী কর্মে নিযুক্ত ছিলেন না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারি জি. টি. মার্শাল ঈশ্বরচন্দ্রের বিশেষ গুণমুগ্ধ ছিলেন। সংস্কৃত কলেজ ত্যাগের পর ঈশ্বরচন্দ্রকে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত করেন। এবারেও কলেজে কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে, ১৮৪৯ সনের ১লা মার্চ তিনি এই পদ প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরচন্দ্রের গুণপনার কথা কলেজের গণ্ডী ছাড়াইয়া অন্যত্রও ছড়াইয়া পড়ে। কৌন্সিল অব এডুকেশন বা শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারি ডাঃ এফ. জে. মৌএট এবং সভাপতি ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনও বিদ্যাসাগরকে বিলক্ষণ জানিতেন। সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যাধ্যাপকের পদ খালি হইলে মৌএট বিদ্যাসাগরকে এই পদ দিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের আমূল সংস্কার চান, শিক্ষাসমাজও সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। কাজেই পদ গ্রহণের প্রাক্কালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন প্রস্তাব করেন যে, সংস্কৃত কলেজের সংস্কার আশু প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে অধ্যক্ষের ক্ষমতা দিলে তবে তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে পারেন, তখন ডাঃ মৌএট তথা শিক্ষা-সমাজ এই প্রস্তাব মোটামুটি সমর্থনই করিলেন। তাঁহাদের নির্দেশ অনুযায়ী সংস্কৃত কলেজের অবস্থা ও পুনর্গঠন সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৫০, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিলেন। এই সময় কলেজের সেক্রেটারি রসময় দত্ত পদত্যাগ করেন। অ্যাসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদও রহিত করা হইল। এই দুইটি পদের মোট বেতন ছিল দেড় শত টাকা। শিক্ষা-সমাজ সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ১৮৫১, ২২শে জানুয়ারি উক্ত দেড় শত টাকা বেতনে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করিলেন। এই দিনটি শুধু সংস্কৃত কলেজ বা ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে নয়, সমগ্র জাতির 'রেনেসাঁস বা নবজাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই বিষয়টির আভাস আমরা ইতিপূর্বেই কতকটা পাইয়াছি। এখন কিঞ্চিৎ সবিস্তারে বলি।

সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন বিদ্যাসাগর-জীবনের অন্যতম প্রধান সৎকর্ম, এবং জাতীয় জীবনে ইহা প্রধানতম সৎকর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। পূর্বে বলিয়াছি, সংস্কৃত কলেজে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যশ্রেণীর অধ্যয়নের অধিকার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ পদপ্রাপ্তির কয়েক মাসের মধ্যেই, ১৮৫১ সনের জুলাই মাসে ইহার দ্বার কায়স্থ জাতির নিকট উন্মোচন করিয়া দিলেন। ১৮৫৪ সনে তিনি এখানে সম্ভ্রান্ত হিন্দুমাত্রেরই প্রবেশাধিকার দিলেন। সংস্কৃত অধ্যয়ন অনুশীলনে টোল-চতুষ্পাঠীতে ব্রাহ্মণ-বৈদ্যেতর জাতির অধ্যয়নের অধিকার ছিল না; ১৮৫৪ সনে সংস্কৃত কলেজে এই অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় সমগ্র হিন্দুজাতির নিকট স্বজাতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন-অনুশীলনের পথ সুগম হইল। মানুষের এই মৌলিক অধিকার স্বীকৃতির মধ্যে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের একটি সুস্পষ্ট ধাপ লক্ষ্য করি। স্বদেশীয় উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়ন-অনুশীলন সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্বীকৃত হওয়ায় অন্যত্রও ইহা স্বীকারের সুযোগ ঘটিল। ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে বহুতর আলাপ-আলোচনা এবং বাধা-বিপত্তির পর সংস্কৃত সাহিত্যকে গ্রীক, লাটিন, আরবী, ফারসীর মত শিক্ষণীয় ভাষা বলিয়া পরিগণিত করা হইল এবং এই উদ্দেশ্যে এনট্রান্স, এফ. এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকও নির্ধারিত হয়। প্রায় প্রত্যেক কলেজেই সংস্কৃত বিদ্যা শিখাইবার ব্যবস্থা হইল। জাতি-বর্ণ-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে সংস্কৃত অধ্যয়নের অধিকার লাভ করিল। সংস্কৃতচর্চা একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া ভারতীয় সমুদয় শ্রেণী, এমন কি বিধর্মী ও বিদেশীয়েরাও ইহার অধ্যয়নে রত হইতে সক্ষম হইল। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের মহিমা এতদিন পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে উইলসন, ব্রুনো, ম্যাক্সমুলর প্রমুখ প্রাচ্যবিদ্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। স্বদেশ তথা ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের মহিমা দেশীয় জনসাধারণ স্কুল-কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে অবগত হইতে লাগিলেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশীয় প্রাচীন বিদ্যার পুনঃপ্রচলন ব্যাপক আকারে সম্ভব হওয়ায় রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি বস্তুগত ও সত্যোপেত হইয়া

উঠিল। ইহার সূচনা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সংস্কৃত কলেজের উক্তরূপ মৌলিক অধিকারের মধ্যেই আমরা সবিশেষ লক্ষ্য করি।

এ কারণে ইহা দ্রুত সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। এই প্রসঙ্গেই সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন বৃত্তান্তের বিষয় উল্লেখ করিতে হয়। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনে ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে, এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়াই তবে তিনি এ কলেজে কর্ম গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন। শিক্ষা-সমাজ ঈশ্বরচন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার রিপোর্ট অনুযায়ী কলেজের সংস্কার ও পুনর্গঠন করিবার অধিকার তাঁহাকে দিলেন। তিনিও ১৮৫১-৫৩—এই দুই-তিন বৎসরের মধ্যে কতকগুলি মৌলিক সংস্কার সাধন করিলেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার অবকাশ বা প্রয়োজন এখন আর নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী নথিপত্র এবং কলেজের দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটিয়া এই বিষয়টি দুইখানি পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন—(১) 'বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ' এবং (২) 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড'। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকারা এই দুইখানি পুস্তকে এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পাইবেন। বিদ্যাসাগরের পূর্বে কলেজে নিয়ম-শৃঙ্খলার বালাই ছিল না। সেক্রেটারি রসময় দত্ত ছোট আদালতের জজিয়তি করিয়া দিনান্তে ঘণ্টা খানেকের জন্য এখানে আসিয়া বসিতেন। কলেজে আসা-যাওয়ার সময়, পঠন-পাঠনের শৃঙ্খলা, অধ্যাপক-ছাত্রের সম্পর্ক প্রভৃতি বড়ই শিথিল ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ হইয়াই কলেজের কার্যকে একটি সুষ্ঠু নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়ন করিলেন। তিথি-অনুসারে ছুটির পরিবর্তে, সরকারী নিয়মে রবিবার ও অন্যান্য ছুটি প্রবর্তিত হইল। কিন্তু এহ বাহ্য, পাঠ্যবিষয় নির্ধারণে তৎকৃত সংস্কার হইল সকলের চেয়ে মৌলিক। কর্তৃপক্ষের মর্জিমত মাঝে মাঝে ইংরেজীশ্রেণী প্রবর্তিত হইত, আবার ইহা উঠিয়া যাইত। ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যয়নকালে কলেজ হইতে ইংরেজীশ্রেণী একবার উঠিয়া যায়। ইংরেজী পঠন-পাঠন এ সময় মোটেই আশানুরূপ ছিল না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথমেই শ্রেণীর সংস্কার করিলেন। তিনি ইংরেজী সাহিত্য এবং ইংরেজী অঙ্কশাস্ত্র পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিলেন—সংস্কৃতের মাধ্যমে অঙ্কশাস্ত্র পাঠের ব্যবস্থা তুলিয়া দিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম অধ্যাপক হইলেন প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী এবং অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক হন শ্রীনাথ দাস। উভয়েই হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্র। প্রসন্নকুমার পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষরূপে এবং শ্রীনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবীরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষা আবশ্যিক করা হইল, কলেজের ছাত্রমাত্রকেই যথাসময়ে ইংরেজী পড়িতে হইত; পূর্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। কলেজ হইতে প্রেরিত জুনিয়র ও সিনিয়র স্কলারশিপ-পরীক্ষার্থী ছাত্রগণকে ইংরেজীতেও যথানির্দিষ্ট নম্বর রাখিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইত।

সংস্কৃত পঠন-পাঠনের মৌলিক সংস্কার সম্বন্ধে, বিশদরূপে না হইলেও কিছু এখানে বলা প্রয়োজন। সংস্কৃত কলেজের কৃতী ছাত্ররূপে ঈশ্বরচন্দ্র নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সামান্য সামান্য বিষয় শিখিয়া লইতে কত সময় অনর্থক ব্যয়িত হইত। তিনি সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন সম্বন্ধে সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পেশ করেন, (ডিসেম্বর ১৮৫০) এইপ্রকার অপচয়ের বিষয় তাহাতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেন। ব্যাকরণ শিক্ষার জন্য চার-পাঁচ বৎসর অনর্থক ব্যয়িত হয়, অন্যান্য শ্রেণীর পাঠ্যও নিয়ম-সম্মতভাবে করা হয় নাই, বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন—এইরূপ নানা মন্তব্য প্রকাশান্তর বেদান্ত ব্যতীত প্রত্যেকটি শ্রেণীকে ঢালিয়া সাজাইবার ব্যবস্থা সম্পর্কে মত দিলেন। শিক্ষা-সমাজের সম্মতি পাইয়া তিনি সংস্কারকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। পাঠ্য-তালিকার রদবদল করিয়াই ত হইলে চলিবে না, অল্পতর সময়ে বাঞ্ছিত শিক্ষালাভে ছাত্রগণ যাহাতে সমর্থ হয় সেজন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ ও গদ্যপদ্য হইতে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশেও অগ্রসর হইলেন। ক্রমান্বয়ে এই পুস্তকগুলি তৎকর্তৃক রচিত ও সংকলিত হইয়া প্রকাশিত হইল: (১) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (নবেম্বর ১৮৫১), (২) ঋজু পাঠ, ১ম ভাগ (নবেম্বর ১৮৫১), (৩) ঐ, ২য় ভাগ (মার্চ ১৮৫২), (৪) ঐ, ৩য় ভাগ (ডিসেম্বর ১৮৫২), (৫) ব্যাকরণ কৌমুদী, ১ম ভাগ (১৮৫৩), (৬) ঐ, ২য় ভাগ, (১৮৫৩), (৭) ঐ, ৩য় ভাগ (১৮৫৪), (৮) ঐ, ৪র্থ ভাগ (১৮৬২)। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, সংস্কৃত কলেজ বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক পুনর্গঠিত হইলে

দুই ভাগ সংস্কৃত ও এক ভাগ ইংরেজী পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ছাত্রদের অধ্যয়ন-সৌকর্যার্থ ঈশ্বরচন্দ্র কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যও সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিলেন—(১) রঘুবংশম্ (জুন ১৮৫৩), (২) কিরাতার্জুনীয়ম্ (১৮৫৩), (৩) সর্বদর্শনসারসংগ্রহঃ (১৮৫৩), (৪) শিশুপালবধঃ (১৮৫৭)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপক প্রচার এবং সংস্কৃতশিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র আরও কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন। এ সমুদয় এই : (১) কুমারসম্ভব (১৮৬১), (২) কাদম্বরী (১৮৬২), (৩) মেঘদূতম্ (১৮৬৯), (৪) উত্তরচরিতম্ (নবেম্বর ১৮৭০), (৫) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ (১৮৭১), (৬) হর্ষচরিতম্ (১৮৮৩)। এতগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা, সংকলন ও সম্পাদন করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত-বিদ্যাপ্রচারে যে কতখানি সহায়তা করিয়াছেন ভাবিলেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

ইংরেজী শিক্ষার সংস্কার সাধিত হইল ১৮৫৩ সনে। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার সাধন শুরু হয় দুই বৎসর পূর্ব হইতেই।—বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তক—ব্যাকরণ প্রভৃতি এমনভাবে নির্ধারিত হইল যে, তিন-চারি বৎসরের মধ্যে ছাত্রগণের পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্র সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন সম্ভব হইল। বাংলার মাধ্যমে সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠের ব্যবস্থা হওয়ায় অল্প সময়ের ভিতরে ইহা তাহারা আয়ত্ত করিতে লাগিল। টোল-চতুষ্পাঠীর এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনায় ঈশ্বরচন্দ্র প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার কারণও যথেষ্ট ছিল। একটি বদ্ধ জলাশয়ের মত টোল-চতুষ্পাঠীর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অমূল্য রত্নখনিকে এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা হইয়াছিল। মধ্যযুগে 'Schoolmen'-যুক্তিজালে সত্যকার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। 'স্কুলমেন'-এর কবল হইতে প্রাচীনকালের যথার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞান মুক্ত করিয়া দিলে তবে রেনেসাঁস সম্ভবপর হইয়াছিল। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নব নব বিদ্যা ও বিষয়ের আবিষ্কার হইয়া জগৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানে এতটা উন্নত হইয়াছে। প্রাচ্যের প্রাচীনতম ও প্রধানতম ভাষা সংস্কৃতের মধ্যে কতকালের বিদ্যাসমূহ বিধৃত ছিল। বিদ্যাসাগর স্বীয় প্রতিভাবলে সংস্কৃত-সাহিত্য শিক্ষার সহজ উপায় উদ্ভাবন দ্বারা ইহাকে সাধারণ-গ্রাহ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র টোল-চতুষ্পাঠীর উপর চটা ছিলেন। টোল-চতুষ্পাঠী ব্যতিরেকে বিভিন্ন স্কুল-কলেজেই যথার্থ শিক্ষাদান হইতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। টোল-চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের অনেক সময় ইউরোপের 'স্কুলমেন'-দের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ইহার মধ্যে কিন্তু সত্যতার একান্তই অভাব। এদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী জ্ঞানভাণ্ডারকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা অনেকেই জীবনভোর সাধনা দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগকে পরিপুষ্ট ও সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যুগে যুগে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব-বিপর্যয়ের মধ্যেও টোল-চতুষ্পাঠীগুলিতে পণ্ডিত-প্রধানেরা ধুনি জ্বালাইয়া রাখেন। প্রচুর গ্রন্থাদি বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু যাহা রক্ষা পাইয়াছে তাহা এই নিভৃত সাধনা-ক্ষেত্রের দরুন—এ কথা অবশ্যই বলিতে হইবে। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রকে সাধারণ-গ্রাহ্য করার পন্থা এ দেশে নিতান্তই আধুনিক। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইহা প্রচারের সুবিধা হয়, সাধারণের শিক্ষার পথে যে বিঘ্ন ছিল তাহা বিদূরিত হইল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনকার্য দ্বারা। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যের অনুশীলন শুধু এ দেশে নহে, জগতের বিভিন্ন দেশের বিদ্যা-ক্ষেত্রেও যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। বেথুন সোসাইটিতে প্রদত্ত "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য শাস্ত্র-বিষয়ক প্রস্তাব" শীর্ষক বক্তৃতার উপসংহারে ঈশ্বরচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন :

"সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। অনেকে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন একান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার ফলোপধায়কতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়া প্রস্তাব সমাপন করিব।

"সংস্কৃত ভাষানুশীলনের নানা ফল। ইউরোপে শব্দবিদ্যার যে ইয়ত্তা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্যান্য ভাষার মূলনির্ণয়, স্বরূপ-পরিজ্ঞান ও মর্মোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন ; এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাহাদিগের কে কোন্ শ্রেণীভুক্ত, কে কোন্ দেশের আদিম নিবাসী লোক, কে

কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়া কোন্ প্রদেশে বাস করিয়াছে ইত্যাদি নির্ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত ভাষার সহায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল; এই নিমিত্তই ডাক্তর মোক্ষমূলর সংস্কৃত ভাষাকে সকল ভাষার ভাষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

"দ্বিতীয়তঃ, সংস্কৃত ভাষানুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদায় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা একপ্রকার বিধিনির্বন্ধস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে ভূরি পরিমাণে সংস্কৃত কথা লইয়া ওই সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু, সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে তৎসম্পাদন কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক, ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না; এবং হিন্দী বাঙ্গালা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে, সর্ব্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ইয়ুরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎপ্রচলিত ভাষায় সঙ্কলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু, সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইঙ্গরেজী শিখিয়া আমরা যে ঐ মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।

"তৃতীয়তঃ, পূর্বকালীন লোকদিগের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম, উপাসনা ও বুদ্ধির গতি প্রভৃতি বিষয় সকল মনুষ্যমাত্রের অবশ্যজ্ঞেয়, ইহা বোধ হয়, সকলেই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। অন্যান্য দেশসংক্রান্ত এই সমস্ত বিষয় তত্তদ্দেশীয় পুরাবৃত্ত গ্রন্থ দ্বারা অবগত হওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায়, রাজতরঙ্গিণী ব্যতিরিক্ত, প্রকৃত পুরাবৃত্ত গ্রন্থ একখানিও নাই। রাজতরঙ্গিণীতেও এই বহুবিস্তৃত ভারতবর্ষের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ কাশ্মীরের পুরাবৃত্ত মাত্র সঙ্কলিত আছে। সেই সঙ্কলিত পুরাবৃত্তও সর্ব্বসাধারণলোকসংক্রান্ত নহে। কে কোন্ সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কে কত দিন রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন, কে কোন্ সময়ে সিংহাসনভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, কে কাহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় ক্ষমতাতে রাজ্যসম্পদ অধিকার করিয়াছিলেন; এইরূপ, কেবল রাজাদিগের বৃত্তান্তমাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং প্রকৃত পুরাবৃত্তের নিতান্ত অসদ্ভাবস্থলে বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন ব্যতিরেকে, পূর্বকালীন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদি পরিজ্ঞানের আর কোন পথ নাই।

"চতুর্থতঃ, যাবতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের অনুশীলনে যে আমোদ, যে উপকার ও যে উপদেশ লাভ হইয়া থাকে, সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র সেই আমোদ, সেই উপকার ও সেই উপদেশ প্রদানে অসমর্থ নহে।

"এই সমস্ত সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনসাপেক্ষ।

"এক্ষণে, এতদ্দেশে যাঁহারা লেখাপড়ার চর্চা করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এইরূপ মহোপকারিণী সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে একান্ত উপেক্ষা করেন, ইহা অল্প আক্ষেপের বিষয় নহে।"

ঈশ্বরচন্দ্র পর পর চারিটি দিক হইতে সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য-অনুশীলনের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন, কালে তাহার সার্থকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। জাতির রেনেসাঁস এইরূপ অনুশীলন-অনুধ্যান ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

বাংলা শিক্ষা

সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের প্রায় সমসময়েই ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা শিক্ষা সংস্কারেরও সুযোগ লাভ করিলেন। শিক্ষা-সমাজের প্রভাবশালী সদস্য ফ্রেডারিক হ্যালিডে তাঁহার সঙ্গে বাংলা শিক্ষার সংস্কার ও প্রসার বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত থাকিতেন। ১৮৫৩ সনের সনন্দে বঙ্গপ্রদেশকে লেফটেন্যাণ্ট গবর্নর বা ছোটলাটের অধীন করা হয়। ১৮৫৪ সনে হ্যালিডে এখানকার প্রথম ছোটলাট নিযুক্ত হইলেন। এই পদ লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত বাংলাশিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের পরামর্শ যাচ্ঞা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র সাগ্রহে এ আলোচনায় যোগ দেন।

এদেশীয়দের মধ্যে বাংলা শিক্ষার বহুল প্রচলন এবং দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি-মানসে তৃতীয় দশক পর্যন্ত যে-সব প্রচেষ্টা চলে তাহার কথা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। কতকটা অর্থনৈতিক এবং কতকটা রাজনৈতিক কারণে বাংলা শিক্ষার সংস্কার বা উন্নতির পথে বিঘ্ন জন্মিয়াছিল। ১৮৩৫ সনে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী ধার্য হওয়ায় এবং এই সময় হইতে ইংরেজী-জানা লোকেদের সরকারী ও সওদাগরী কর্মলাভে অধিকতর সুযোগ ঘটায় বাংলা শিক্ষার প্রতি কী সরকার কী দেশীয় লোকেরা বিশেষ মনোযোগী হন নাই। এইরূপ অবস্থার উদ্ভবে সমাজের নেতৃস্থানীয় মনীষীগণ ইহার প্রতিবেধকল্পে সচেষ্ট হন। হিন্দু কলেজের সঙ্গে হিন্দু কলেজ পাঠশালা (বা সংক্ষেপে 'বাংলা পাঠশালা') স্থাপন ঈদৃশ ভাবনার ফল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী সভার আনুকূল্যে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উভয় স্থলেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। শেষোক্ত পাঠশালায় সংস্কৃতও বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছাত্রগণ শিখিতে পাইত। বিবিধ বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনাও করা হইল। সরকারী ঔদাসীন্য ও বিরোধিতা এবং অন্যান্য কারণে এই প্রয়াস তখন সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে নাই। বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ সনে বঙ্গপ্রদেশে এক শত একটি আদর্শ দেশীয় পাঠশালা স্থাপনের আদেশ দেন। এই আদেশবলে ১৮৪৫ সনের ভিতরেই উক্তসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। ঈশ্বরচন্দ্র ওই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত। এই সকল বিদ্যালয়ের গুরু বা শিক্ষক নির্বাচনের ভার পড়ে উক্ত কলেজের সেক্রেটারি জি. টি. মার্শাল এবং বিদ্যাসাগরের উপর। ঈশ্বরচন্দ্র তদবধি বাংলা শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে কম-বেশী পরিচিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের কার্য ছাড়িয়া পুনরায় যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কার্যে নিযুক্ত হন, তখনও বিভিন্ন কলেজের সিনিয়র বিভাগের ছাত্রদের বাংলা-পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা ও উত্তরপত্র পরীক্ষার ভার তাঁহার উপর দেওয়া হইয়াছিল। আদর্শ দেশীয় পাঠশালা স্থাপন করিলে কী হয়, পাঠ্যপুস্তকের অভাবে এবং শিক্ষা-সমাজের সহযোগিতা না থাকায় এগুলির অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত সরকারী নির্দেশে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট হইতে শিক্ষা-সমাজ এগুলি পরিচালনার ও পর্যবেক্ষণের ভার গ্রহণে বাধ্য হন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সাধারণ ঔদাসীন্য বরাবরই বলবৎ ছিল। ফ্রেডারিক হ্যালিডে ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করিতেন, এবং একটু আগেই বলিয়াছি, ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায়ও লিপ্ত হইতেন। ঈশ্বরচন্দ্রও প্রশ্নপত্র-রচয়িতা এবং উত্তরপত্র-পরীক্ষক রূপে বাংলা শিক্ষার দুরবস্থা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। সার্ চার্লস উডের শিক্ষাবিষয়ক ডেস্‌প্যাচ (১৯শে জুলাই, ১৮৫৪) ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পূর্বেই নবনিযুক্ত ছোটলাট হ্যালিডে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা শিক্ষা তথা দেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতি ও সংস্কারবিষয়ক অভিমত পুরাপুরি সমর্থন করিয়া উচ্চতন কর্তৃপক্ষের কাছে নিজ মন্তব্য পেশ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা শিক্ষা-সংস্কারের কথা সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের সময় হইতেই ভাবিতেছিলেন। বস্তুতঃ, এই পুনর্গঠনকার্য সাধারণ লোকশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত—এ কথাও বলা যাইতে পারে। বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ব্যালান্টাইন ঈশ্বরচন্দ্রের অধ্যক্ষতাকালে সংস্কৃত কলেজের নবরূপায়ণ পরিদর্শনান্তর শিক্ষা-সমাজের নিকট এক রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট-বর্ণিত অধিকাংশ বিষয়ের সঙ্গেই বিদ্যাসাগর একমত হইতে পারেন নাই, কোন কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র মন্তব্যও করিয়াছিলেন। এই সকল মন্তব্য সম্বলিত একখানি পত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা শিক্ষা তথা সর্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারকল্পে কলেজের ছাত্রদের শিক্ষা-নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক—এ কথা তিনি জোরের সঙ্গে বিবৃত করেন। তিনি বলেন :

"জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার—ইহাই এখন আমাদের প্রয়োজন। আমাদের কতকগুলি বাংলা স্কুল স্থাপন করিতে হইবে। এই সব স্কুলের জন্য প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের কতকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে হইবে, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করিতে পারে, এমন এক দল লোক সৃষ্টি করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল। মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রাস-পূর্ণিমার উৎসব চলেছে নবদ্বীপে। কত যাত্রী এসেছে দেশ-দেশান্তর থেকে। রাস্তার দু ধারে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে দেখেছে দীর্ঘ শোভাযাত্রা, ভিড় করেছে মেলায়, মন্দিরে, স্নানের ঘাটে। পোড়ামাতলার মোড়ে বিস্তৃত শামিয়ানার নীচে সভার আয়োজন করেছেন উৎসবের উদ্যোক্তারা। কথকতা করবেন ব্রহ্মচারী সদানন্দ। তিলধারণের স্থান নেই কোনখানে। সব স্তরের সব বয়সের নরনারী। মিশ্র কোলাহলে ভরে উঠেছে সভাঙ্গন। মঞ্চের উপর শীর্ণকায় দীর্ঘাঙ্গ ব্রহ্মচারীর গৈরিক আভাস দেখা যেতেই সব স্তব্ধ হয়ে গেল। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঘিরে রয়েছেন তাঁর চারপাশ। ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করে স্মিত মুখে বিশিষ্ট দর্শকদের দিকে ফিরে জানতে চাইলেন কোন্ কাহিনী শুনতে চান তাঁরা। প্রভুর যা অভিরুচি।—বিনীত কণ্ঠে উত্তর দিলেন জনৈক প্রবীণ শিষ্য। কয়েক মুহূর্ত বিশাল জনতার দিকে তাকিয়ে রইল সদানন্দ। তার পর শুরু হল কচ ও দেবযানীর অমর উপাখ্যান। অশ্রান্ত গতিতে এগিয়ে চলল অধ্যায়ের পর অধ্যায়। মহাভারতের মৌলিক বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হল রবীন্দ্র-কাব্যের মাধুর্য ও কল্পনা, এবং তার মধ্যে জড়িয়ে রইল ব্রহ্মচারীর নিজস্ব ভাষা, ভঙ্গী আর কণ্ঠের লালিত্য।

দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ। দৈত্যগুরুর দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। যে সঞ্জীবনী বিদ্যা দেবতার অনায়ত্ত, দেবলোকের হিতার্থে তাই তাকে অর্জন করতে হবে। সেই দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছেন শুক্রাচার্যের কাছে। সমস্ত দৈত্যকুল তাঁর প্রতিকূল। দৈত্যগুরু তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, দেবতনয়কে শিষ্যরূপে গ্রহণ করতে তিনি অনিচ্ছুক এবং অসমর্থ। কিন্তু কচকে নিরস্ত করা গেল না। সমস্ত বিপদ-বাধা বরণ করে কঠোর তপস্যায় গুরুর অনুগ্রহ লাভের জন্যে আত্মনিয়োগ করলেন। শুক্রাচার্যের স্নেহধন্যা তরুণী কন্যা দেবযানী। শুধু কন্যা নয়, প্রিয়শিষ্যা এবং আচার্যের দুর্লভ বিদ্যার অধিকারিণী। এই দৃঢ়কাম তরুণ দেবপুত্রের অপূর্ব কান্তি, বিনয়-নম্র সুমিষ্ট আচরণ এবং অনমনীয় অধ্যবসায় তার নারীহৃদয়কে স্পর্শ করল। অবাঞ্ছিত বিদেশীর উপর পড়ল তার প্রসন্ন দৃষ্টির স্নিগ্ধ আলোক। কন্যার অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে কচকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন শুক্রাচার্য। শুরু হল বিদ্যার্থীর কঠোর জীবন। সহস্র বৎসরব্যাপী দুস্তর সাধনা। নিরলস কর্মে এবং সুদুর্লভ অবসরে দেবযানী রইল তার পাশে প্রীতিময়ী প্রবাসসঙ্গিনী। পাঠগৃহে, প্রাসাদের অলিন্দে, নির্জন বনচ্ছায়ায়, নিরালা নদীতীরে ছায়ার মত দিল তাকে সঙ্গ এবং সাহচর্য।

অকস্মাৎ একদিন রাত্রির অন্ধকারে নিভৃত শয্যায় কচের দৃষ্টি পড়ল তার গোপন অন্তরের পানে। কেউ জানে না, কখন্ কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে তারই উপরে অঙ্কিত হয়ে গেছে এক রূপময়ী দৈত্যবালার মোহিনী মূর্তি। নিমেষের তরে বিস্ময়ে পুলকে বেদনায় ভরে গেল তার তরুণ মন। পরমুহূর্তেই ফিরে এল সেই কঠোর প্রতিজ্ঞা—যে-ব্রত গ্রহণ করেছি, যে উদ্দেশ্য নিয়ে বরণ করেছি এই

শুক্রপুরীর লাঞ্ছনা, তার পরিপূর্ণ সাফল্যই আমার একমাত্র লক্ষ্য। তার পূর্বে নিজের সুখ দুঃখ শুভাশুভ কিছুই জানি না। কর্তব্যের কাছে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই।

এমনই করে কেটে গেল সহস্র বৎসর। গুরু প্রীত হলেন। দান করলেন বহু-বাঞ্ছিত সঞ্জীবনী বিদ্যা। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পর যাত্রার আয়োজন করলেন কচ। আচার্যকে প্রণাম করে বিদায় নিতে গেলেন দেবযানীর কাছে। কিন্তু সে বিদায় কি এতই সহজ? সেখানে যে রয়েছে সেই চিরন্তনী নারী, মাতৃরূপে প্রিয়ারূপে কন্যারূপে অনন্তকাল যে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে বহির্মুখী পুরুষের; স্নেহ দিয়ে প্রেম দিয়ে বাঁধতে চেয়েছে প্রিয়জনে, অশ্রু দিয়ে গাঁথা মায়াডোর জড়িয়ে দিয়েছে তার হাতে; কোমল বাহু প্রসারিত করে বলেছে, 'যেতে নাহি দিব'। কিন্তু নির্মম পুরুষ সে ব্যাকুল ডাক কোনদিন শোনে নি। যে শুনেছে, তাকেও ছিনিয়ে নিয়ে গেছে বৃহত্তর জীবনের প্রবল বাহু। পথপ্রান্তে ফেলে দিয়ে গেছে উপেক্ষিত স্নেহপাশ।

এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি হল। সেই বিদায়ের ক্ষণে দেবতার কাছে প্রেম নিবেদন করল দৈত্য-কন্যা দেবযানী। যথারীতি ব্যর্থ হল তার আবেদন। নারী সব সইতে পারে। সংসারে এমন কোনও দুঃখ নেই আঘাত নেই, যা সে যুগ যুগ ধরে বুক পেতে গ্রহণ করে নি। কিন্তু সে সইতে পারে না প্রেমের প্রত্যাখ্যান। সে আঘাত যখন আসে, কেউ ভেঙে পড়ে, কেউ জলে ওঠে নাগিনীর মত। দেবযানী জলে উঠল। হৃদয় ভরে অমৃতের ভাণ্ডার সঞ্চয় করে রেখেছিল যার জন্যে, তারই উপরে ঢেলে দিল অভিশাপের বিষ—যে বিদ্যার অভিমানে প্রেমকে অবহেলা করেছ, সে বিদ্যা তোমার ব্যর্থ হবে; সে শুধু ভার হয়ে থাকবে তোমার জীবনে।

সভাভঙ্গের পর জনতার ভিড় হালকা হয়ে গেছে। অনুরাগী বন্ধু এবং শিষ্যদের কাছে বিদায় নিয়ে গৃহে ফিরছিল সদানন্দ। একাই চলেছিল গলি-পথ দিয়ে। এগিয়ে দিতে চেয়েছিল কেউ কেউ। কাউকে সঙ্গে নেয় নি। কেমন একটা একা থাকবার তাগিদ অনুভব করছিল মনে মনে। আনমনে পথ চলতে চলতে ভাবছিল, এইমাত্র যে কাহিনী সে শুনিয়ে এল, তার একটা ক্ষীণ সুর কোথায় যেন জড়িয়ে আছে তার নিজের জীবনের মধ্যে। কোথায় যেন একটুখানি মিল। শুধু কচের কথাই সে বলে নি, বলে এসেছে নিজের কথা। আর তারই সঙ্গে।—রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সদানন্দ। ঠিক তার সামনে মুখোমুখী সে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি সত্য, না, শুধু চোখের বিভ্রম? এতদিন পরে আপনার অজ্ঞাতে স্মৃতির কোঠায় যার ছায়া পড়েছিল, সে কায়া হয়ে দেখা দিল কেমন করে! অথবা এ শুধু তার বিভ্রান্ত কল্পনা!

দু হাতে চোখ রগড়ে আর একবার তাকিয়ে দেখল ব্রহ্মচারী। না, ভ্রান্তি নয়; সত্যিই সে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের বাঁ দিকটা আঁচলে ঢাকা। ডানদিকের যেটুকু প্রকাশ, তার মধ্যে ভুল করবার অবকাশ নেই। কিন্তু এ কি সে, না, তার মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে আছে কোনও প্রেত? কোথায় গেল চোখের সেই বিদ্যুৎ-ঝলক, ওই কালো চোখের তারা থেকে যা ঠিকরে পড়ত একদিন! অপরাঙ্গে দৃষ্টি পড়তেই শিউরে উঠল সদানন্দ। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হল না, এই দেহই একদিন তরঙ্গ তুলেছিল তার রক্তধারায়।

কেমন আছ?—নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল চণ্ডী। সে বীণার ঝঙ্কার নয়, কেমন একটা ভাঙা ভাঙা ধার-ক্ষয়ে-যাওয়া সুর।

ভাল। তুমি?

আমি?—হাসির কুঞ্চনে আরও কুৎসিত দেখাল মুখখানা: যেমন দেখছ। বাসা কোথায়?

মাঝের পাড়ায়।

যাব একদিন।—বলেই এগিয়ে গেল রাস্তার ধার ঘেঁষে।

একবার ইচ্ছা হল ব্রহ্মচারীর, ডেকে ফিরিয়ে বলে, না, আমার বাড়িতে এস না তুমি। কোনও তরফেই তার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু বলা হল না।

তিন চার দিন পরে প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে বারান্দায় বেরোতেই একটা পরিচিত লোক উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। শরীর ও পোশাক দুইই অপরিচ্ছন্ন। কৃত্রিম হাসির ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল দুপাটি কদর্য দাঁত।

আপনার কাছে এলাম।

কে আপনি?

আমাকে আপনি ঠিক চিনবেন না। তবে আমার ইয়ে—মানে, ঘরের মানুষটি আপনার অনেকদিনের চেনা।

একটু থেমে ব্রহ্মচারীর সন্দেহ-কুঞ্চিত ভ্রূর দিকে চেয়ে যোগ করল: চণ্ডীর কথা বলছি।

চণ্ডী আপনার স্ত্রী?

না না!—জিব কেটে মাথা নাড়ল লোকটা: হাজার হলেও বামুনের মেয়ে। শুধু বামুন কেন, গুরু-বংশের মেয়ে! তবে হ্যাঁ, এক সঙ্গেই যখন আছি আজ কুড়ি বাইশ বছর, তখন বুঝতেই তো পারছেন; জ্ঞানী লোক আপনি।—বলে আবার হেসে উঠল সেই কুৎসিত হাসি।

আমার কাছে আপনার কী দরকার?—রূঢ় কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল সদানন্দ।

দরকার সামান্যই। মা মেয়ে দুজনকেই পুষতে হয়। যা দিনকাল। দেখুন না, কার বোঝা কে বয়!

আর কিছু বলবার আছে আপনার?

না, আর কিছু না। শুধু গোটা পঞ্চাশেক টাকা হলেই আপাতত:—

মাপ করবেন। আপনি এবার আসতে পারেন।

আসব বইকি। তবে টাকাটা দিয়ে দিলে পারতেন ঠাকুরমশাই। আপনার ভালর জন্যেই বলছি।

ব্রহ্মচারী ঘরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল। ফিরে দাঁড়িয়ে রুক্ষদৃষ্টি মেলে জানতে চাইল: তার মানে?

মানে, আপনার সঙ্গে ওর আসল সম্পর্কটা তা হলে গোপনই থেকে যেত।

কী বলতে চান আপনি?

আজ্ঞে, সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। এখানে অবিশ্যি এখনও কেউ জানে না। কিন্তু জানতে কতক্ষণ? ভেবে দেখুন, তারপরে—

জানেন, আপনাকে আমি পুলিসে দিতে পারি?

পুলিস!—বিকট শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা: তাতে আপনার বিশেষ সুবিধে হবে না, পণ্ডিতমশাই। তা ছাড়া করালী কুণ্ডু কারও চোখ রাঙানোকে পরোয়া করে না। যাক, এবার তা হলে আসি। পেন্নাম।

হন হন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল করালী। ব্রহ্মচারী ডেকে ফেরাল: শোন। চণ্ডী পাঠিয়েছে টাকার জন্যে?

না, তা ঠিক নয়।—আমতা আমতা করে বলল লোকটা, তবে টাকার দরকার তারই। অসুখে পড়ে আছে। কদিন কাজে বেরোতে পারে নি। আমিও বেকার বসে আছি। সেয়ানা মেয়েটাকে—

কথা শেষ করবার আগেই ঘরের মধ্যে চলে গেল ব্রহ্মচারী। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে পাঁচখানা নোট ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, আর কোনদিন এস না।

না না, আর আসতে হবে না।—নোটগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কোচার খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলল করালী, এতেই কাজ হবে।

কিন্তু পাঁচ-সাত দিন না যেতেই আবার এসে দাঁড়াল সেইখানটিতে। গড় গড় করে বলে গেল একঝুড়ি কথা, যার সারমর্ম—মা-মেয়ের কাপড় নেই, ঘরের বার হতে পারে না। গোটা দশেক—ইত্যাদি। দশটা টাকা দিয়ে বিদায় করল ব্রহ্মচারী। তার কদিন পরেই এল মোটা অঙ্কের তাগিদ। ছ মাস থেকে বাড়িভাড়া বাকী। চণ্ডীকে অপমান করে গেছে বাড়িওয়ালা। কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে বয়স্থা মেয়েটাকে জড়িয়ে। ভয়ানক কান্নাকাটি করছে ওরা। সন্ধ্যার মধ্যেই যেমন করে হোক বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।

সত্যিই তো, ওদেরই বা দোষ দিই কেমন করে।—হাত পা নেড়ে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলল করালী, আজই না হয় সব গেছে, আসলে তো অত বড় একজন নামকরা পণ্ডিতের মেয়ে! সেই কথা বিবেচনা করে আমিও মুখ ফিরিয়ে ফেলে আসতে পারলুম না। ওদের ওখানে গিয়েই জড়িয়ে পড়লাম। সেই যে চেপে ধরল, আর ছাড়বার নামটি নেই! কী করি, বলুন? ঘাড়ে যখন এসে চাপল, একটা মেয়েছেলেকে তো আর রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমারও তখন বিশেষ কোন ঝঞ্ঝাট নেই। বউ মারা যাবার পর আর সংসার করি নি। আপনার আশীর্বাদে অবস্থাও মন্দ ছিল না। তিনখানা বাড়ি ঢাকা শহরে। ভাড়া যা আসত—তিনটি তো মোটে প্রাণী—হেসে খেলে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হতেই সর্বনাশ ঘটল। তার পরেও অনেকদিন পড়ে ছিলাম। ওই মেয়েটা সেয়ানা হয়ে উঠতেই চলে আসতে বাধ্য হলাম। সে যাক গে। এবার কোনক্রমে দায় উদ্ধার করে দিন। আর আসব না আপনার কাছে।

ব্রহ্মচারী কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কানে গেল, বলছে করালী, দায়টা তো আসলে আপনারই—

কী বললে?—গর্জে উঠল সদানন্দ।

আজ্ঞে, মানে—

মনে করেছ, কতকগুলো মিথ্যা কুৎসার ভয় দেখিয়ে বরাবর এমনই টাকা আদায় করে যাবে, না?

আজ্ঞে না, ভয় দেখাব কেন? আমি বলছিলাম—

যাও!—মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে দরজার দিকে আঙুল তুলে ধরল সদানন্দ।

কী বলছেন?

বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে।

করালী উঠে দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু মেলে বলল, এইটেই কি আপনার শেষ কথা?

হ্যাঁ, শেষ কথা। আর কোনদিন যেন তোমাকে দেখতে না পাই।

আচ্ছা!—লম্বা চুলগুলোয় একটা উদ্ধত ঝাঁকানি দিয়ে বেরিয়ে গেল করালী।

দিন তিনেক পরেই এল আবার বাইরে যাবার নিমন্ত্রণ। বর্ধমান অঞ্চলে পর পর গোটাকয়েক ধর্মসভায় ভাগবৎ-পাঠ শেষ করে কথকতার বায়না নিয়ে যেতে হল মুর্শিদাবাদ। সেখান থেকে মালদা হয়ে নবদ্বীপ ফিরতে মাস পেরিয়ে গেল।

ফিরে আসবার কয়েকদিন পর। অন্ধকার রাত। দশটা বেজে গেছে। বিশ্রামের আয়োজন করছিল ব্রহ্মচারী। দরজার কড়া নড়ে উঠল। একটু বিরক্তির সঙ্গে খুলে দিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা উঁচু করে ধরতেই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল—তুমি!

খুব অবাক হয়ে গেছ, না?—দরজা পার হয়ে ভিতরের দিকে পা বাড়াল চণ্ডী।

তুমি বোধ হয় জান না, এ বাড়িতে আমি একা থাকি।

তার মানে, কেউ দেখে ফেললে দুর্নাম দেবে, এই তো?

মিথ্যা দুর্নামের ভয় আমি করি না।

একদিন কিন্তু করেছিলে। সে যাক। আজ নিশ্চিন্ত থাকতে পার। এ রূপ দেখে সে ভুল কেউ করবে না। বড় জোর ভাববে, ভিক্ষা চাইতে এসেছে কোন রাস্তার ভিখিরী। আর সত্যিই তাই। একটা ভিক্ষে চাইতেই এসেছি তোমার কাছে।—বলে বসে পড়তে যাচ্ছিল উঠানের এক পাশে।

ব্রহ্মচারী বাধা দিয়ে বলল, বারান্দায় উঠে বস। দাঁড়াও।—বলে ঘরের দিকে পা বাড়াল একটা কিছু এনে পেতে দেবার জন্যে।

থাক্, আর কিছু লাগবে না। এই মেঝেতেই বসছি। একটুখানি দাঁড়িয়ে থাকলেই পা ধরে যায়।—সলজ্জ মৃদু হাসির সঙ্গে বলল চণ্ডী।

ব্রহ্মচারীর একবার ইচ্ছা হল, জিজ্ঞাসা করে, শরীর এ রকম হল কী করে? কী অসুখ করেছিল? তখনই মনে হল করালীর মুখে সেদিন সামান্য যেটুকু জেনেছে তার পরে এ প্রশ্ন নিরর্থক। চণ্ডীই আবার কথা পাড়ল। যেন কতদূর থেকে ভেসে এল তার স্বর: তুমি তো চলে এলে। মাসখানেকের মধ্যে মাও সরে পড়ল। সেই যে বিছানা নিয়েছিল, আর উঠল না। আমার অবস্থা তখনও বাবার নজরে পড়ে নি। মা বলে যেতে পারে নি, হয়তো ইচ্ছা করেই বলে যায় নি। ওই লোকটা এসেছিল বাবাকে পৌঁছে দিতে। তারপর আর নড়তে চায় না। লোকের কাছে বলে বেড়ায়, গুরুকে এই অবস্থায় ফেলে যায় কেমন করে। কিন্তু তার আসল টানটা যে কোথায় আমি প্রথম দিনই টের পেয়েছিলাম। তারই সুযোগ নিলাম। দুর্গা বলে ঝুলে পড়লাম ওই করালীর কাঁধে। তখনও ও সব কিছু জানে না। যখন জানল, লাথি মেরে দূর করে দিতে পারত। কিন্তু দেয় নি। বরং অনেক কিছু করেছে আমার জন্যে—যা আপনার লোকেরা কেউ কোনদিন করত না।

জ্যাঠামশাই কোথায় আছেন?—চণ্ডী একটু থামতেই প্রশ্ন করল ব্রহ্মচারী।

কী করে জানব? বাড়ি ছাড়বার পর আর খবর পাই নি। এতদিন কি আর বেঁচে আছেন! থাকলেও কোথায় আছেন, কেমন আছেন, কোনদিনই জানতে পারব না।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে গলাটা একটু ধরে এল। একটুখানি ছেদ পড়ল কথার মাঝখানে। তারপর একটা

নিঃশ্বাস ফেলে আবার শুরু করল চণ্ডী : যাক, যা বলতে এসেছিলাম, শোন। বুঝতেই পারছ, তুমি হঠাৎ চলে আসবার পর আমাকে জড়িয়ে অনেক কথাই রটেছিল তোমার নামে। করালীর কানেও গিয়েছিল নিশ্চয়ই। নবদ্বীপে এসে আমার আগে ও-ই জানতে পারে, তুমি এখানে আছ। মাঝে মাঝে বলতেও শুনেছি তোমার কথা। কিন্তু ও যে এখানে আসা-যাওয়া করে, ঘুণাক্ষরেও জানতে পারি নি। হঠাৎ একদিন শুনলাম, আমার নাম করে টাকার জন্যে উৎপাত করছে তোমার ওপর। ছিঃ ছিঃ, কী লজ্জা বল তো ?

সদানন্দ প্রতিবাদ করল : না না, উৎপাত করবে কেন ? তা ছাড়া টাকা তো সে তোমার হয়ে চায় নি।

আমার হয়ে না চাক, টাকার দরকার যে আমার জন্যেই, সে কথা নিশ্চয়ই বলেছে। তা হলে আর বাকী রইল কী ?

যেখান থেকেই হোক, সে দরকারটা যদি আমি জেনে থাকি, সেটা কি তোমার এতই লজ্জার কথা ?

হয়তো একটু মৃদু অভিমান প্রচ্ছন্ন ছিল সদানন্দের এই প্রশ্নের অন্তরালে। চণ্ডীর কাছে কি তা ধরা পড়ে নি ? পড়লেও সে জানতে দিল না। স্থির সহজ সুরেই বলল, ঠিকই বলেছ। কারও কাছে হাত পাততে আজ আর আমার লজ্জা করা চলে না।

কারও কাছে ! আহত হল সদানন্দ। কিন্তু কী বলবার আছে ! যে দূরে ছিল, সে যদি দূরেই থাকতে চায়, একজনকে সবার থেকে আলাদা করে না দেখতে চায়, নালিশ জানাবে সে কার কাছে ! তবু চুপ করে থাকতে পারল না। একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলল, আমার কথাটা তুমি বোধ হয় বুঝতে পার নি।

বুঝে কী লাভ, বল ?—সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল চণ্ডী : টাকা তুমি দিতে পার, দেবার ইচ্ছাও হয়তো আছে, কিন্তু নেবারও তো একটা অধিকার চাই। তা যদি থাকত, করালীর আগে আমি নিজেই আসতাম তোমার কাছে। সে যাক গে। আমার আসল কথাটাই যে এখনও বলা হয় নি। তোমাকে কিন্তু শুনতেই হবে, নন্দদা। বল, শুনবে ?

আমি তো বুঝতে পারছি না, কী বলবে তুমি ! সাধ্যমত হলে নিশ্চয়ই শুনব।

চণ্ডী ক্ষণকাল নীরব থেকে বলল, তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।

চলে যেতে হবে ! কেন ?—অতিমাত্রায় বিস্মিত হল সদানন্দ।

কারণটা যদি না বলি ? না হয় মেনেই নিলে আমার একটা কথা।

ব্রহ্মচারী নিরুত্তর। মুখ ফুটে দূরে থাক্, মনে মনেও বলতে পারল না, বেশ, তাই নিলাম। মেনে নিলাম তোমার কথা। চণ্ডী কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, যদি জিজ্ঞেস কর, যা বলব, কোন প্রশ্ন না তুলে চোখ বুজে মেনে নেবার মত কী পরিচয় আমি তোমাকে দিয়েছি, আমার কোন উত্তর নেই। না যদি শোন তা হলেও আশ্চর্য হব না। শুধু ভেবে দেখতে বলব, বড় রকম কারণ না থাকলে এত রাত্রে এই অনুরোধ নিয়ে তোমার কাছে ছুটে আসতাম না।

সদানন্দ তখনও নির্বাক। কী সে বড় কারণ, এত কথার পর জানতে চাওয়াও যেমন সহজ নয়, না জেনে এই অদ্ভুত অনুরোধ রক্ষা করাও তেমনই কঠিন। চণ্ডী অনুনয়ের সুরে বলল, যত শীগগির পার তুমি কোথাও চলে যাও, নন্দদা। ভগবান তোমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, যেখানে যাবে, লোকে তোমাকে মাথায় তুলে নেবে। যশ বল, অর্থ বল, কোন দিকেই কোন ক্ষতি হবে না।

লাভ-ক্ষতিটাই একমাত্র জিনিস নয়।—শুষ্ক গম্ভীর সুরে বলল সদানন্দ, তার চেয়েও অনেক বড় জিনিস আছে মানুষের জীবনে। আমার যা কিছু, সব এইখানে। নবদ্বীপের কাছে আমি অনেক ভাবে ঋণী। হঠাৎ তাকে ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় !—ক্ষীণ নৈরাশ্যের সুরে যেন আবৃত্তি করে গেল চণ্ডী। নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তা হলে আর কী করতে পারি আমি ?

সদানন্দ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, কেন চলে যেতে বলছ, জানাতে বাধা আছে কি ? তোমার যদি কিছু সুবিধা হয়, তা হলে বরং—

চণ্ডীর মুখে ফুটে উঠল এক মর্মান্তিক হাসি। বাধা দিয়ে বলল, আমার সুবিধা ! আর একদিন যে কাউকে

কিছু না বলে গভীর রাত্রে চলে গিয়েছিলে, সেও কি আমার সুবিধার জন্যে ?

না, তার মধ্যে নিজের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বলতে পার, পালিয়ে গিয়েছিলাম। অপবাদ, তা যত বড় মিথ্যাই হোক, সাহস করে তার মুখোমুখী দাঁড়াতে পারি নি।

কিন্তু আজ আবার যদি আসে তার চেয়েও বড় কলঙ্কের অপবাদ, তার চেয়েও মিথ্যা—জঘন্য কুৎসিত !

ব্রহ্মচারী হাসল, নিরুদ্বেগ প্রশান্ত হাসি। অত্যন্ত সহজ সুরে বলল, তা হলেও আজ আর পালাবার প্রয়োজন নেই। মিথ্যার ভয় ঘুচে গেছে।

তুমি বুঝতে পারছ না, নন্দদা।—আর্তকণ্ঠে বলে উঠল চণ্ডী, ওই করালীকে তুমি চেন না! ও মানুষ নয়, সাপ; সাপের চেয়েও নিষ্ঠুর। কখন্ কোন্ পথে, কি ভাবে যে ছোবল মারবে, স্বপ্নেও ভাবতে পার না।

এই জন্যেই কি তুমি আমাকে চলে যেতে বলছ ?

একে তুমি তুচ্ছ করে দেখ না নন্দদা। তা ছাড়া—

তা ছাড়া, কী বল ?

কেবলই মনে হচ্ছে, আমিই বোধ হয় ওর অস্ত্র। আমাকে দিয়েই হয়তো শোধ তুলবে তোমার ওপর। অনেক ক্ষতি করেছি তোমার। এতদিন পরে আবার আমার হাত দিয়েই আসবে তোমার চরম ক্ষতি! না নন্দদা, তোমার পায়ে পড়ি। আমার এই শেষ কথাটা রাখ। নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যাও তুমি। দেরি করলে হয়তো সর্বনাশ হয়ে যাবে।

উঠনে নেমে এসে ব্রহ্মচারীর পা দুটো চেপে ধরল। বেদনার্ত চোখ তুলে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। আজ আর সরে গেল না সদানন্দ; পা দুটো ছাড়িয়ে নেবারও চেষ্টা করল না। কিছুক্ষণ নির্লিপ্ত দর্শকের মত দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলল, রাত অনেক হল। এবার তুমি বাড়ি যাও।

চণ্ডী আর কোনও কথা বলল না। পা ছেড়ে দিয়ে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে নির্জন অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সদানন্দের বিনিদ্র চোখের উপর জেগে রইল দুঃখে দৈন্যে লাঞ্ছনায় ভেঙে-পড়া একটি কুরূপা নারীমূর্তি, কানে আসতে লাগল তার উৎকণ্ঠায়-ভরা ব্যাকুল আবেদন। অন্তরের তলদেশ থেকে ভেসে এল একটি স্বর—একদিন যাকে সব দিতে পারতে, আজ তার এই সামান্য কথাটা রাখতে পারলে না। এ ভিক্ষা তো সে নিজের জন্যে চায় নি, চেয়েছে তোমারই জন্যে, তোমারই মঙ্গল কামনায়। সে স্বর ডুবিয়ে দিয়ে জেগে উঠল ক্ষুব্ধ উত্তর—কিন্তু কেমন করে ভুলি, এই নারীই একদিন চরম অভিশাপ নিয়ে এসেছিল আমার জীবনে! কে সে? তার সঙ্গে কী আমার সম্পর্ক যে, তারই কথায় ছেড়ে যেতে হবে বহু যত্নে বহু সাধনায় গড়ে তোলা এই যশ-খ্যাতি, এই বহু-বিস্তৃত সামাজিক প্রতিষ্ঠা? এ তো ঠুন্‌কো জিনিস নয় যে একটা মিথ্যা অপবাদের ঘায়ে ভেঙে পড়বে?

তবু ভেঙে পড়ল। কদিন পরেই এল সেই দুর্জয় আঘাত। এল ওই চণ্ডীর দিক থেকে তারই মেয়ের রূপ ধরে। করালী কুণ্ডুর নিপুণ হাতে সাজানো রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভূমিকা নিল ওই ময়না। অত্যন্ত অতর্কিতে তারই হাত থেকে ছুটে এল ব্রহ্মচারীর মৃত্যুবাণ। অমোঘ সে অস্ত্র, এবং তারই আঘাতে মরল ব্রহ্মচারী—কলঙ্কময় অপঘাত মৃত্যু। তার এত বড় প্রতিষ্ঠা এবং এতদিনের সুনাম তাকে বাঁচাতে পারল না। তার অত বড় গর্ব ও গৌরবের ধন যে নবদ্বীপ, সেও তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এল না।

* * *

চাকর এসে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই হঠাৎ খেয়াল হল, ব্রহ্মচারীর মৃদুকণ্ঠ কখন্ থেমে গেছে, এবং তার পরেও অনেকক্ষণ আমরা দুজনে অন্ধকারে মুখোমুখী বসে আছি, আলো জালবার কথাটাও মনে হয় নি। এবার নড়েচড়ে বসে ডাকলাম, ব্রহ্মচারী। ক্ষীণ অস্পষ্ট কণ্ঠে সাড়া দিয়ে সদানন্দ মুখ তুলে তাকাল। বললাম, সেই দিনটার কথা তোমার মনে আছে?

ব্রহ্মচারী জবাব দিল না; জিজ্ঞাসা করল না, কোন্ দিনের কথা জানতে চাইছি আমি। তার মুখের উপর ফুটে উঠল একটি পরিম্লান করুণ হাসি—যার অর্থ প্রশ্নটা কি নিরর্থক নয়? আমার কণ্ঠেও বোধ হয় শোনা গেল সেই দিনটিতে ফিরে যাবার সুর, জেলখানার আফিসে শেষবারের মত যেদিন ওর সঙ্গে আমার দেখা। বললাম,

একটা নির্দোষ মানুষ জেলে পচতে লাগল, এই ভেবে অনেকখানি ক্ষোভ ছিল আমার মনে। তারই খানিকটা প্রকাশ করতে গিয়েছিলাম। তুমি বাধা দিয়ে বলেছিলে, আমি তো নির্দোষ নই। শুনে বড় কষ্ট পেয়েছিলাম সেদিন।

জানি, সার্।—মাথা নত করে বলল ব্রহ্মচারী, তবু যা সত্য, না বলে আমার উপায় ছিল না।

অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে বললাম, কোন্‌টা সত্য? কী বলতে চাও তুমি? এ কাহিনী যদি মিথ্যা না হয়—

কাহিনী আমার মিথ্যা নয়। শেষটুকু শুধু বাকী আছে। তাই বলেই আজকের মত বিদায় নেব।

আমি অপেক্ষা করে রইলাম। ব্রহ্মচারী একটু কী চিন্তা করে ধীরে ধীরে শুরু করল: সাধারণভাবে বলতে গেলে নির্দোষ কথাটার অর্থ—যে দোষ করে নি। আইনের চোখেও তাই। অপরাধ মানে কোনও অপরাধ-মূলক কাজ। কিন্তু মনুষ্যত্বের দরবারে এইটাই কি দোষ-বিচারের মাপকাঠি? দোষ বলুন, অপরাধ বলুন, তার জন্ম আমার মনের মধ্যে। তাই যদি হয়, যে মুহূর্তে সে জন্মাল, তখন থেকেই কি আমি অপরাধী নই? অপরাধটা আমার কাজের মধ্যে দেখা দেয় নি বলেই সে নেই, দোষের কাজ করি নি বলেই আমি নির্দোষ, তা কেমন করে বলি?

বললাম, তত্ত্ব হিসাবে কথাটা মন্দ লাগছে না, যদিও বেশ জটিল। ওসব রেখে বরং আসল ব্যাপারটা খুলে বল।

তাই বলব। শুধু একটা দিনের কথা। আমার জীবনের সেই মহাপরীক্ষার দিন।

প্রাতঃস্নান আমার চিরদিনের অভ্যাস। সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি কাপড়-গামছা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছি, উঠনের কোণে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। কুয়োতলায় বাসন মাজছিল একটি মেয়ে। কখনও দেখি নি, তবু তার দেহের প্রতিটি রেখা যেন আমার চিরজীবনের চেনা। মুখ থেকে আপনা হতেই বেরিয়ে গেল—কে তুমি!

আমার নাম ময়না।

কার মেয়ে তুমি?

আমার মায়ের নাম চণ্ডী দেবী।

মায়ের সঙ্গে মেয়ের মিল খুব বেশী নয়। সে রঙ পায় নি, সে গড়ন সে রূপও পায় নি। তবু সব মিলিয়ে কী ছিল তার দেহে বলতে পারব না। হঠাৎ যেন বাইশ বছর আগে ফিরে গেলাম। বিদ্যুৎ-ঝলকের মত আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে জলে উঠল এমনই আর একটা মুহূর্ত—যেদিন প্রথম দেখেছিলাম ওর মাকে। সেদিনের কথা আপনাকে আগেই বলেছি। নারীদেহের যে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম সেই প্রথম দিন, যে প্রবৃত্তির তাড়না, তারই তাণ্ডবে মেতে উঠল আমার পঁয়তাল্লিশ বছরের শীতল রক্ত। তারই জ্বালা বোধ হয় ফুটে উঠেছিল আমার চোখের মধ্যে। সেদিকে একবার তাকিয়েই অস্ফুট চিৎকার করে সরে গিয়েছিল মেয়েটা। নিজেকে কোনও মতে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। দরজার ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল করালী। আমাকে দেখেই হেসে উঠল তার সেই কদর্য হাসি—কি গো ব্রহ্মচারী, নির্জন বাড়িতে কোন্ ধর্ম-চর্চা হচ্ছিল ওই মেয়েটাকে নিয়ে? চিৎকার করে বলতে গিয়েছিলাম, চুপ কর। পারি নি; জোর পাই নি মনের মধ্যে। হঠাৎ হাসি থামিয়ে আমার মুখের উপর তর্জনী তুলে গর্জে উঠেছিল লোকটা—বল, টাকা দেবে কি না? সমস্ত শক্তি দিয়ে বলেছিলাম, না। তারপর কোনও দিকে না চেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিলাম গঙ্গার ঘাটে।

ব্রহ্মচারীর উত্তেজিত কণ্ঠ আবার নীরব হল। কয়েক মিনিট বিরতির পর শুনতে পেলাম তার নিরুত্তাপ [illegible] স্বর: তার পরের ঘটনা তো আপনি জানেন। [illegible] থেকে উঠতেই আমাকে গ্রেপ্তার করলেন থানা-অফিসার। প্রতিবাদ করি নি। ওদের সেই ভয়ঙ্কর অভিযোগও অস্বীকার করতে পারি নি।

কিন্তু সে অভিযোগ তো সত্য নয়।

না, তা নয়। যে অপরাধে জড়িত হলাম, যে অপরাধ আমার সাব্যস্ত হল আদালতের বিচারে, তা আমি করি নি—

তবে?

তবু নিজের অন্তরের দিকে চেয়ে কেমন করে বলি আমি নির্দোষ!

সমাপ্ত

জীবন-শিল্পী টলস্টয়

অমলেন্দু চৌধুরী

শিল্পী-জীবনের সার্থকতা বিচার করতে গেলে দুই দিক থেকে তার পরিচয় মেলে: (১) শিল্পরীতি, (২) শিল্পরীতিকেও অতিক্রম করে যায় শিল্পীর জীবনদর্শন। জীবনদর্শন কথাটি নিয়ে নানান রকম আলোচনা করা যায়। এর সত্যিকারের সংজ্ঞা কী? জীবনকে নিয়ে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশেষরূপ আলোচনার নামই জীবনদর্শন। এর দ্বারা গভীর সত্যের সঙ্গে শিল্পী-বিশেষের মানসিক প্রবণতার সংমিশ্রণও বোঝায়। বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন জীবনের সত্য প্রধান তেমনই শিল্পীর দেখবার দৃষ্টি বোধজ্ঞানও বড়। টলস্টয়ের জীবনদর্শন আলোচনা করবার আগে এটুকু বলা দরকার যে তিনি শিল্পীর থেকেও ছিলেন বড় জীবনদরদী। জীবনরহস্যের গভীরে তাঁর মন এমন ভাবে অভিযান করেছে যে আর কোন শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনে এ রকম দেখতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ তাঁর চিন্তার জগৎ ভাল ও মন্দ, আদিমতা ও সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলির সঙ্গে জড়িয়ে এমন একটি ধর্মচেতনা পেয়েছিল যে প্রশ্ন-জর্জরিত ব্যক্তি-মানুষ তার কাছে একেবারে হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক জায়গায় জীবনের গভীরতা তাঁর শিল্পরীতিকেও অতিক্রম করেছে। এজন্য টলস্টয় রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী কি না তা নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু তাঁর যুগে তিনিই যে ছিলেন যুগমানব এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কারণ রুশসাহিত্যে শিল্পী-হিসাবে পুসকিন, গোগোল, দস্টায়েভস্কি ও টুরগেনিভের পরিচয়কে ম্লান করা যায় না। রাশিয়ার বাস্তবধর্মী সাহিত্যে এঁরা এক একজন কপাল। পরবর্তী যুগে গর্কীই ছিলেন এঁদের সার্থক উত্তর-সাধক।

টলস্টয়ের শিল্পরীতি ও জীবনদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে তাঁর জীবনী আলোচনা করা দরকার। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয় তাঁর পিতার জমিদারি তুলা (Tula) প্রদেশের ইয়াসনায়া পলিয়ানা (Yasnaya Polyana)-তে জন্মগ্রহণ করেন। টলস্টয়-পরিবার ছিল অভিজাত শ্রেণীভুক্ত। তাঁর বাপ-মায়ের প্রভাব তাঁর সাহিত্যে দেখা যায়—যেমন 'War and Peace'-এর Nicholas Rostov ও Princess Marya তাঁদেরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয়। ন বছর বয়সের মধ্যেই টলস্টয় বাপ মা দুজনকেই হারিয়েছেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে টলস্টয় কাজান বিশ্ববিদ্যালয় (Kazan University) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই স্নাতক উপাধির জন্য পড়াশুনা করতে থাকেন। কিন্তু পরীক্ষা না দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করেন। তারপর থেকে শুরু হয় তাঁর ব্যক্তি-জীবনের অনুশীলন। তিনি মস্কোতে অভিজাত তরুণদের মতই বিলাসী জীবন যাপন করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই জীবনের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা এল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সামরিক বাহিনীতে যোগদান করবার জন্য ককেসাসে যান। ১৮৫৬ থেকে ১৮৬১ সনের মধ্যে তিনি পিটারস্‌বার্গ, মস্কো ও বিদেশ ভ্রমণ করেন। ১৮৬১ সনের মধ্যে দু বার ইউরোপ সফরে যান। ইউরোপের বস্তুবাদী সভ্যতায় তাঁর মন বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ১৮৬২ সনে পুনরায় তিনি তাঁর পিতার জমিদারিতে ফিরে আসেন এবং সেখানে কৃষকদের জন্য একটি বিদ্যালয় খোলেন। ওই সনেই তিনি বিবাহ করেন। এর পর থেকে তাঁর সাহিত্য-জীবন পুরোপুরি ভাবে আরম্ভ হয়। অবশ্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে তাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যেত—যেমন Tsar Liberator II-এর Emancipation Act-এ তিনি একজন ব্যবস্থাপক রূপে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। টলস্টয়ের জীবনদর্শন ও শিল্পরীতি এই বিষয়গুলির ভিতর দিয়ে আলোচিত হবে: (১) তাঁর ব্যক্তিসত্তা, (২) তাঁর যুগের সমালোচনা, (৩) তাঁর শিল্পরীতি। শিল্পরীতি বিষয়টিতে তাঁর সাহিত্যিক মতবাদের একটা নাতিবিস্তৃত আলোচনা করা হবে তাঁর রচনাবলীকে কেন্দ্র করে।

টলস্টয়ের ব্যক্তিসত্তা—টলস্টয়ের শিক্ষা খ্রীষ্টীয় আবেষ্টনীর ভিতর দিয়েই সমাপ্ত হয়েছিল। তাঁর জীবনে ধর্ম ও নীতির প্রভাব যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তবুও শৈশবের পর

থেকেই তাঁর বিশ্বাসের ভিতে ফাটল ধরল। তিনি যদিও নাস্তিকছিলেন না, তবুও প্রচলিত ধ্যান-ধারণা তাঁর জীবনে প্রবল এক সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তাঁর ভিতরকার ব্যক্তি-মানুষটির দ্বন্দ্ব নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করল। প্রথমে তিনি বুদ্ধির দিক থেকে সম্পূর্ণতা লাভ করবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে অনুশীলন আরম্ভ করে তাঁর ইচ্ছাশক্তিকে শক্তিশালী করে এক ধরনের জীবন গড়ে তোলবার প্রয়াস করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ চিন্তাশক্তির সঙ্গে সুস্থ জীবনের মিলনে পরিপূর্ণতার সাধনা। নৈতিক শুচিতা তাঁর কাছে কম বড় ছিল না, যদিও এর পিছনে ভগবৎ-বিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ছিল না। অর্থ মান যশ ও প্রতিপত্তির জন্য যে জ্বালাময় প্রতিক্রিয়াগুলি সাধারণের জীবনে দেখতে পাওয়া যায়, টলস্টয়ের ভিতরেও তার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই সময় তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়েই লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর লেখার তখনকার উদ্দেশ্য ছিল—"out of vanity, love of gain and pride"। জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তখনও তিনি লিখতে আরম্ভ করেন নি। অবশ্য তাঁর ভিতর সাধারণ সাহিত্যিক-কবিদের মত দাম্ভিকতা ছিল। জীবন একটা পরিপূর্ণতার দিকে অভিযান। এই অভিযানে কবি ও শিল্পীরাই বেশী অংশ গ্রহণ করে থাকে। তাঁর ব্যক্তিসত্তা সেদিন এই প্রশ্নই করেছিল—"What do I know ; and what can I teach"। তার উত্তরও তিনি এইভাবেই পেয়েছিলেন যে, শিল্পী-সাহিত্যিক ও কবিরা অচেতনভাবে মানুষকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। এখানে শিল্পী-জীবনের অসাধারণত্ব তাঁর সত্তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। অবশ্য পরবর্তী জীবনে তাঁর এ ভ্রান্তি একেবারেই কেটে গিয়েছিল। তিনি একে পাগলামি বলে স্বীকার করেছেন। একটি লাইনে তাঁর এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—"We reproduced the scenes in a mad house"। এত বড় কঠোর সমালোচনা অন্য কোন শিল্পীর মুখ থেকে বার হয় নি। তাঁর ভিতরে ব্যক্তিসত্তা যখন প্রবলহয়ে উঠত, তখন তা তাঁর শিল্পরীতিকেও আচ্ছন্ন করে ফেলত। তবে সাধারণ বঞ্চিতশ্রেণীর দিকে তাঁর যথেষ্ট দৃষ্টি ছিল। তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের শুরু থেকে তাঁর মনে নানান রকম প্রশ্ন ঘুরে বেড়াত, যেমন জীবনের পরিপূর্ণতা কোথায়? আমরা কী রচনা করি? প্রায় ছ বছর তাঁর এই অশান্ত মনোভাব ছিল। তিনি ইউরোপ ঘুরে বেড়িয়ে সেখানকার বড় বড় মনীষীদের সঙ্গে আলোচনা করেন, কিন্তু সকলের ভিতর একটি ভ্রান্ত দাম্ভিকতা লক্ষ্য করেন। এটি তাঁর মনকে আহত করল। টলস্টয়ের মনে সার্থকতার এমন একটি উদার ও উন্নত মাপকাঠি ছিল যে ব্যক্তি-মানুষের পক্ষে তার মূল্য বার করা কঠিন। তাঁর মন এই দার্শনিকসুলভ জটিলতায় আচ্ছন্ন ছিল। কী? কেন?—ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁর মন থেকে কখনও দূর হত না। শিল্পীর মন convention-এ আচ্ছন্ন থাকাটা অগৌরবের কিছু নয়, কিন্তু সবচেয়ে বেদনাদায়ক হয়, যদি শিল্পীর জীবন-জিজ্ঞাসা বর্তমান নীতির ভিতর দিয়ে কোন উত্তরই খুঁজে না পায়। তাই টলস্টয় প্রগতির নামে শুধু ভ্রান্তিই দেখতে পেলেন। "How was I to live better"—কথাটি শুধুমাত্র উচ্ছ্বাস নয়। সমস্ত প্রশ্নকে চাপা দেবার জন্য তিনি দেশে ফিরে এলেন। কৃষকদের জন্য ছোট একটি বিদ্যালয় খুললেন। তারপর বিয়ে করে সংসারে মনোনিবেশ করলেন। যদিও সংসার, কাজ ও সাহিত্য-সেবায় তিনি নিজেকে বেঁধে ফেলতে চাইলেন, তবুও মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত মনে সেই প্রশ্ন উদয় হত। পরিবার অর্থ ও যশের ভিতরে একটা নিস্পৃহতা তাঁকে পীড়ন করত। যেমন—"Well, what if I should be more famous than Gogol, Pushkin, Shakespeare, Molière—than all the writers of the world—well, and what then?" এ প্রশ্ন শুধু মনোবিলাস বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর ভিতর যথেষ্ট সত্য ছিল। দিনের পর দিন তাঁর ভিতর এমন একটি নিস্পৃহতা গড়ে উঠতে লাগল যে, জীবন তাঁর কাছে অর্থহীন বলে মনে হত। তাঁর জীবনে কোন সমস্যার কারণ ছিল বলে মনে হয় না। অর্থ যশ ও পারিবারিক শান্তি তাঁর যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তবুও জীবনের সৃজনীশক্তি তাঁর ভিতর কমে আসতে লাগল। এমন কি তিনি আত্মহত্যার সঙ্কল্প পর্যন্ত করতে লাগলেন। জীবন কি শুধু একটি অর্থহীন পরিহাস?—এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজবার জন্য তিনি বিজ্ঞান থেকে দর্শনের বিভিন্ন বিভাগে অভিযান করতে আরম্ভ করলেন।

শেষ পর্যন্ত সমস্ত প্রশ্ন একটি প্রশ্নে রূপান্তরিত হল—"What is life?" কিন্তু যুক্তিবাদী জ্ঞানের ভিতর তিনি কোন উত্তরই খুঁজে পেলেন না। তাঁর মন তারপর বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকল। মানুষ কেন বাঁচে? তার উত্তর, সংস্কারের আওতায় ভগবানের নিয়মে। জীবনের কি কোন পরিণতি আছে? আছে, অনন্তের সঙ্গে মিলনে। তখন ধীরে ধীরে তাঁর মন সাধারণের সরলবিশ্বাসী জীবনের সঙ্গে মিলতে চেষ্টা করল। সাধারণ মানুষের জীবনে বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞতা মেশানো থাকে। তার বিশ্বাস প্রাণবন্ত, তাই তা কাজে শক্তি যোগায়। হয়তো তত্ত্বজ্ঞান তার নেই, কিন্তু তবুও জীবন তার কাছে অনেক সুন্দর। এই বিশ্বাসের সংস্পর্শে এসেই টলস্টয় শান্তি পেলেন। তিনি জীবনকে বহু লোকের সঙ্গে মিলিয়ে ভাবতে লাগলেন। যদিও মাঝে মাঝে যুক্তি তাঁর মনে সংশয়ের সৃষ্টি করত, কিন্তু সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে তিনি এই সত্য বুঝতে চেষ্টা করলেন যে—"This is He, He without whom there is no life"। To know God and to live are one. God is life"। ভগবানকে বিশ্বাস করায় কোন অসাধারণত্ব নেই, কিন্তু একে অস্বীকার করলে সমস্ত জীবনই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের জীবনে centralisation of mind-এর দরকার। এখানে positive কিছুকে কল্পনা করার নামই ভগবান। সরল সহজ মানুষের ভিতর এই বিশ্বাস জৈবিক সত্তার মত। টলস্টয়ের ব্যক্তিসত্তাকে সমগ্রভাবে 'My Confession'-এর আলোকে আলোচনা করা হল।

যুগের সমালোচনা—টলস্টয়ের যুগের প্রথম থেকেই রাশিয়ার রাজতন্ত্রের ভিতর ভাঙন ধরেছিল। শেরিফদের দুর্দশা ও জারদের স্বেচ্ছাচারিতা আর জমিদারদের অত্যাচার সমস্ত দেশের সৌভাগ্যকে ম্লান করে দিয়েছিল। স্মরণীয় ঘটনা বলতে Czar Liberator II-এর Emancipation Act ও আরও কয়েকটি সংস্কার। কিন্তু সারা দেশব্যাপী গোপন বিপ্লবের সূচনা আরম্ভ হয়েছিল—ইতিহাসে তা Nihilism নামে পরিচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকরাই নিহিলিস্টদের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসও ছিল অশান্ত। এক দিকে ক্রিমিয়ান ওয়ার ও আর এক দিকে ইটালীতে জাতীয় সংগ্রামের সূচনা। টলস্টয় যুগের সেই অশান্ত আত্মার সুরকে ধরতে পেরেছিলেন। রাজতন্ত্রের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ভিতরকার শক্তিকেও তিনি চিনতে পেরেছিলেন। তিনি প্রথম থেকেই নতুন সমাজতন্ত্রের একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। কার্ল মার্কসের থেকেও জোরালো ভাষায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও অধিকারকে আঘাত করেছিলেন তিনি। তার উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায়—"Today possessions are the root of all evil. They cause the suffering of those who possess and of those who do not possess. And the danger of collision is inavoidable between those who have too much and those who live in poverty"।

টলস্টয়ের নীতির সঙ্গে গান্ধীনীতির অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। টলস্টয় ছিলেন অহিংসায় বিশ্বাসী। তিনি নৈতিক বিপ্লব চেয়েছিলেন, যার ভিতর দিয়ে অসাম্য দূর হবে একটা অখণ্ড মানবতাবোধে। বিপ্লবের ভিত্তিস্থল হবে মানুষের বিবেক। মানুষের প্রয়োজন ও রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করে একটা সরল ও সহজ সমাজ গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখেছিলেন টলস্টয়। তিনি লেনিনের বিপরীতধর্মী ছিলেন। অবশ্য টলস্টয় মার্কস্ ও লেনিনপন্থীদের চেয়েও মানুষের অবস্থা আরও গভীর ভাবে ভেবেছিলেন। তাঁর ভিতর জাতীয়তার কোন ছায়া ছিল না, তিনি ছিলেন অখণ্ড মানবতার প্রতীক। মানুষের অবস্থাকে আরও গভীর-ভাবে দেখবার অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল। এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে তার পরিচয় মেলে—"Our courts, our police defend property. Our penal colonies and prisons, all the horrors of our so-called suppression of crime exist entirely to protect property"। এ কথাগুলি বিচার করলে দেখা যায় টলস্টয় ছিলেন সত্যিকারের সাম্যবাদী। মানবসমাজে এমন কল্যাণকামী মহামানবের আবির্ভাব খুবই বিরল। টলস্টয় শুধু এক দিকের সংস্কারই আনতে চান নি। তিনি মানবসমাজের বিভিন্ন বিভাগের আমূল পরিবর্তন চেয়ে-ছিলেন। ধর্মের গোঁড়ামি ও অত্যাচারের ভিতর থেকে

মানুষকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। টলস্টয় যে খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন তার রূপ পরিপূর্ণ মানবধর্ম। রাষ্ট্র ও সরকারকে তিনি সবচেয়ে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন। কারণ রাষ্ট্রের ক্ষমতার ভিতর ব্যক্তি-মানুষের অবক্ষয় তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। জাতিগত সমস্ত সংগ্রামের মূলে আছে রাষ্ট্র। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের পথে বাধা হল রাষ্ট্র। কারণ রাষ্ট্র ও সরকার সমাজের উপরতলাকার লোকদের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের পক্ষে নতুন করে মানবতার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। দেশের সঙ্গে দেশের মিলন ঘটানো সরকারের দ্বারা সম্ভব নয়। এদিক থেকে টলস্টয় ছিলেন সত্যিকারের একজন প্রগতিবাদী।

শিল্পরীতি—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে টলস্টয়ের যে মানসিক পরিবর্তন দেখা গেল, তা তাঁর শিল্পরীতিকেও আচ্ছন্ন করল। আগেকার লেখায় তিনি মানুষের অবচেতন মনের বিভিন্ন অবস্থার বিশ্লেষণ করেছেন, সেই কলা-কৌশল পরে একেবারেই পরিত্যাগ করেন। আগেকার রচনাগুলিতে এর প্রভাব খুব বেশী দেখা যায়। পরবর্তীকালে তিনি সেই রীতিকে বাহুল্য বলেছেন। 'What is Art?' নামক গ্রন্থে তার পরিচয় মেলে। আগে টলস্টয় রুশ বাস্তববাদী সাহিত্যের অনুসরণকারী ছিলেন। এই বাস্তববাদী কলাকৌশল গোগোলের দ্বারা প্রবর্তিত হয়। বাস্তববাদী শিল্পরীতির একটা প্রধান লক্ষণ এই যে, ব্যক্তিগত ও আঞ্চলিক প্রভাবকে স্পষ্ট করতে গিয়ে শিল্পী সর্বজনীন ও শাশ্বত আবেদনকে ক্ষুণ্ন করেন। অস্ট্রোভস্কির (Ostrovsky) পরিচালিত পন্থা অনুসারে এর ভিতর জাতিবিজ্ঞানবিষয়ক (ethnographical) বাস্তবতাই ফুটে ওঠে। এর ভিতর সামাজিক আবেদনের উপরই বেশী জোর দেওয়া হয়, অপর পক্ষে শাশ্বতকে একেবারে বর্জন করা হয়। টলস্টয় তাঁর প্রাথমিক রচনাগুলিতে এই রীতিকে আরও পরিপূর্ণতা দান করেছেন। আগেকার বাস্তববাদী শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর এই পার্থক্য ছিল যে, তাঁর রচনাগুলি মনোবিজ্ঞানপ্রসূত, জাতিবিজ্ঞানবিষয়ক নয়। অস্ট্রোভস্কি যে ধরনের দৃশ্যপট সৃষ্টি করেছেন, টলস্টয়ের দৃশ্যপট তা থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর আগেকার রচনাগুলিতে একটি বিশেষ ধরনের শিল্পরীতি ছিল। তিনি জটিল সাংস্কৃতিক বিষয়-বস্তুর উপর বেশী মূল্য আরোপ করতেন। রচনায় তিনি অভিজ্ঞতা ও ঘটনাকে এমন শিল্পকারুকার্যমণ্ডিত করতেন যে, ভিক্টর স্ক্লোভস্কি (Victor Shklovesky) তাঁকে বলেন, "Making it strange"। এর ফলে সমস্ত দৃশ্য অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে উঠত। টলস্টয়ের এই স্টাইল শেষ-জীবন পর্যন্ত ছিল। এই স্টাইলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, সমস্ত জটিল বিষয়কে খণ্ড খণ্ড করে ভাগ করে তাকে মৌলিক উপাদানে পরিবর্তিত করা। সেইজন্য টলস্টয়ের চরিত্রগুলি প্রচলিত নীতিকে অস্বীকার করে এমন একটি তথাকথিত সভ্যতাবর্জিত জগৎ সৃষ্টি করত যে তাকে বলা চলে আদমের নতুন পৃথিবী। অন্ধকারময় জগতে প্রথম যখন মানুষ দৃষ্টিশক্তি পায়, তখন যেমন সমস্ত জগৎ তার কাছে অভিজ্ঞতার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, টলস্টয়ের শিল্পীসত্তা ছিল সেই রকম। তাই তাঁর আবেদন ছিল সর্বজনীন ও শাশ্বত। তিনি জাতীয়তার অনেক উপরে।

টলস্টয়ের রচনায় আমরা যে সমস্ত অভিজ্ঞতা পাই, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর শিল্পী-জীবনের দরদ। এই দরদ অনেকটা অন্তর্চেতনার মত। সভ্যতা দেশগত-ভাবে পৃথক হয়, কিন্তু জীবন এক। এই মতবাদকে পূর্ণ রূপ দিতে গেলে শিল্পীর অন্তর্জীবনের উপর বেশী জোর দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে মানবপ্রকৃতির অবচেতন দিকগুলির উপর আলো ফেলতে হয়। তবে টলস্টয়ের আবেদন কখনও অতিপ্রাকৃতের কথা প্রমাণ করে না। সমস্ত দেশের পাঠকের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠে। এদিক থেকে তাঁর অভিযান সার্থক। বিশ্বসাহিত্যিকদের তিনি একজন আচার্যস্থানীয়।

শাশ্বত আদর্শের উপর বেশী জোর দিতে গিয়ে তাঁর শিল্পরীতি জাতীয়তার আদর্শ হারিয়ে ফেলেছে। তাই তাঁর ছোট গল্পগুলির ভিতর দিয়ে তৎকালীন রাশিয়ার তেমন কোন চিত্র আমরা পাই না। তাঁর রচনার প্রধান উদ্দেশ্য নৈতিক ও মনোবিজ্ঞানগত সমস্যার চিত্রণ। অবশ্য এর প্রধান তাৎপর্য জাতি-নিরপেক্ষভাবে পৃথিবীর যে কোন পাঠকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা। তাঁর পরবর্তী রচনায় এই রীতি পরিপূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সর্বজনীন ও শাশ্বত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি বিশ্বসাহিত্যে

অমর। টলস্টয়ের ভাষা পুথিগত ভাষা নয়, তিনি তাঁর শ্রেণীর কথ্যভাষা ব্যবহার করেছেন। এই ভাষা রাশিয়ার অভিজাতশ্রেণীর ভাষা। অবশ্য তাঁর সংলাপ চরম রূপ পায় তাঁর শেষ বয়সের নাটকগুলির ভিতর দিয়ে। যেমন উদাহরণ—'The Light Shines in the Darkness' এবং 'The Living Corpse'। টলস্টয়ের শিল্পরীতির প্রথম পরিচয় পাই তাঁর ডায়েরীর ভিতর। এই ডায়েরী তিনি ১৮৪৭ সন থেকে লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর শিল্পরীতির ভিতর অবচেতন সত্তারই জয়। এই দিক থেকে তাঁকে ফ্রয়েডের পূর্ববর্তী বলে ধরে নেওয়া যায়। অবশ্য বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর ভিতর এই পার্থক্য ছিল যে, শিল্পী অধিকতর মাত্রায় বাস্তব অনুশীলনের পক্ষপাতী ছিলেন। ঘটনা ও অভিজ্ঞতা তাঁর রচনায় বেশ বড় স্থান অধিকার করে আছে। ফ্রয়েড টলস্টয়ের অনুপাতে কল্পনাকে বেশী আশ্রয় করেছিলেন। 'Childhood'-এর ভিতর টলস্টয় সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতার তালিকাকে শিল্পসত্যে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর 'Childhood' থেকে 'War and Peace' পর্যন্ত সমস্ত রচনায় তিনি একই অভিযান করেছেন। 'A Raid' (১৮৫২), 'Sevastopol in December,' 'Sevastopol in May,' 'Sevastopol in August' (১৮৫৬) এবং 'A Wood Felling' (১৮৫৬) প্রভৃতি গল্পের ভিতর দিয়ে যুদ্ধের ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি ফুটে বেরিয়েছে। ককেসাস অঞ্চলের ঘটনাপ্রবাহ ও যুদ্ধের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু ছিল। তবুও এসব রচনা টলস্টয়ের শিল্পরীতির যাদু-স্পর্শে মায়াপুরীর মত রূপান্তরিত হয়েছে। 'The Memoirs of Billiard Marker', 'Two Hussars' (১৮৫৬), 'Albert Lucerne' (১৮৪৭), 'Polikushka' (১৮৬০) এবং 'Kholstomer', 'The Story of a Horse' (১৮৮৭) প্রভৃতি রচনার ভিতর এক ধরনের নীতিবাদ ফুটে উঠেছে। অবশ্য তাঁর শেষ বয়সের রচনাগুলির অনুপাতে এ একটু উগ্র বলে মনে হয়। এই গল্পগুলির নীতি ছিল, সভ্যতার কৃত্রিম আওতায় সুসভ্য মানুষের সঙ্গে সরল বলিষ্ঠ আদিম মানুষের তুলনামূলক আলোচনা করা। আদিম মানুষ সম্পর্কে টলস্টয়ের একটা vision ছিল। একে যদি original morality বলে অভিহিত করি, তবে টলস্টয় নতুন দিকেই অভিযান করেছেন। শিল্পীর দৃষ্টিতে নীতি বলতে সামাজিক নীতি বোঝায় না। তাঁর মননশীল দৃষ্টিভঙ্গী যদি মানবপ্রকৃতির বিভিন্ন রহস্য আবিষ্কার করতে গিয়ে প্রচলিত নীতির মাপকাঠিকে অস্বীকার করে, তবে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ গতানুগতিক চিন্তাধারা কখনও আর্টের প্রাণ হতে পারে না।

তাঁর আগেকার রচনাগুলির মধ্যে 'The Cossacks' নিয়ে এবার আলোচনা করব। তিনি ১৮৫২-৫৩ সন পর্যন্ত ককেসাসে ছিলেন, তখন থেকেই এই কাহিনী রচনা করা আরম্ভ করেন। এই কাহিনী রচনা করে তিনি তৃপ্তি পান নি। কারণ এর ভিতর অনেক অসম্পূর্ণতা ছিল। ১৮৬৩ সনে একে তিনি ছাপান। 'War and Peace'-এর আগেকার রচনাবলীর মধ্যে 'The Cossacks' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। শিক্ষিত তরুণ অভিজাত যুবক অলিনিনের (Olenin) কসাক দেশের টেরেক (Terek) গ্রামের কাহিনীই ছিল 'The Cossacks'। তার প্রধান উদ্দেশ্য সভ্যতার পালিশে মাজা-ঘষা একটি চরিত্রের সঙ্গে সরল আদিম মানুষের তুলনামূলক চিত্ররূপায়ণ। কসাক অধিবাসীদের টলস্টয়ের আদিম মানুষ বলে ধরে নেওয়া যায়। এদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রাই কাহিনীর বিষয়বস্তু। তবে রুশোর আদিম মানুষ থেকে টলস্টয়ের আদিম মানুষের মৌলিক পার্থক্য আছে। টলস্টয়ের আদিম মানুষ ভালর প্রতীক নয়। কাহিনীর অকপট সারল্য তাকে ভাল-মন্দের উপরে স্থান দিয়েছিল। কসাক অধিবাসীরা শিকার করে, চুরি করে, তবুও তাদের সরল ও সহজ জীবন সুসভ্য ও নীতিবাদী অলিনিনের জীবন থেকে অনেক সুন্দর। তরুণ কসাক লুকাস্কা (Lukashka), তরুণী কসাক ম্যারিয়ানকা (Marianka) এবং বিশেষ করে বৃদ্ধ শিকারী ইয়েরস্কা (Yeroshka) টলস্টয়ের চিরস্মরণীয় সৃষ্টি। এসব চরিত্র মানবপ্রকৃতির বাস্তব রূপায়ণের কথাই প্রমাণ করে।

বিবাহের পর টলস্টয় রুশ সমাজের অতীতের দিকে আকৃষ্ট হন। ডিসেমব্রিস্ট (Decembrist)-দের কেন্দ্র করে একটি উপন্যাস সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। খণ্ড খণ্ড করে এই উপন্যাসের কিছু কিছু তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, ডিসেমব্রিস্টদের জীবন রূপায়িত করতে হলে তাঁকে পূর্ববর্তী সমাজ-জীবনের সঙ্গে ভাল করে পরিচিত হতে হবে। তাই এ সীমাবদ্ধতাই তাঁকে 'War and Peace' রচনা করবার পথে এগিয়ে দেয়। সম্পূর্ণ উপন্যাস রচনা করতে তাঁর চার বছর লাগে এবং ১৮৬৯ সনে তিনি তা প্রকাশ করেন।

'War and Peace' আয়তনে ও সম্পূর্ণতায় অতীত টলস্টয়ের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রুশ বাস্তববাদী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ একটি অনবদ্য রচনা। সমগ্র ইউরোপের উনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসগুলির সঙ্গে তুলনা করলে এর চেয়ে ভাল উপন্যাস পাওয়া যাবে না। 'War and Peace'-এর শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা টলস্টয়ের আগের রচনাগুলির ধারাকে অনুসরণ করে চলেছে। তবে এখানে এসে তাঁর বর্ণনাশক্তি অনেক সম্পূর্ণতা পেয়েছে। সমস্ত উপন্যাসখানির ভিতর রোমাঞ্চ

ও এক ধরনের কাব্যিক অনুভূতি ছড়ানো আছে। তাকে 'Childhood'-এর পরিপূর্ণতা বললেও চলে। তা ছাড়া যুদ্ধের রোমাঞ্চকর বিভীষিকাময় বর্ণনা ও বাস্তবতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নায়কের অবচেতন মনের বীরত্বের গৌরব। সমাজ ও কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে পরিহাস টলস্টয়ের ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি অপ্রীতিকেই প্রমাণ করে। অবশ্য অন্য দিক থেকে অনেক পার্থক্য আছে এখানে। 'War and Peace'-এ টলস্টয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বপ্রথম তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে অতিক্রম করে সর্বসাধারণের দিকে প্রসারিত হবার সুযোগ পেয়েছে। এককথায় বলা চলে যে—"The philosophy of the novel is the glorifications of nature and life at the expense of the sophistications of reason and civilisation"। ন্যাটাশা চরিত্র আমাদের অতি পরিচিত প্রিয়জনের মতনই মনে হয়। চরিত্রচিত্রণে টলস্টয়ের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ডস্টোয়েভস্কি। অবশ্য 'War and Peace'-এ যুদ্ধের ধ্বংসকর চিত্র-গুলিকেও অতিক্রম করেছে স্নিগ্ধ-সৌন্দর্যের শাশ্বত আবেদন, যদিও সভ্যতা সম্বন্ধে একটি সিনিক মনের প্রতিবিম্বও আমরা পাই। টলস্টয় ইউরোপ-সভ্যতার গভীরে প্রবেশ করে তার অবক্ষয়ের রূপটি দেখতে পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

'War and Peace'-এর পর টলস্টয় 'Peter the Great'-এর আমলের ইতিহাস অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পিটারের রাজত্বকাল রাশিয়ার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পিটার সমস্ত রাশিয়াকে ইউরোপ-সভ্যতার কাঠামোয় রূপান্তরিত করেন। পিটারের রাজত্ব-কালে শিক্ষিত অভিজাতশ্রেণীর সঙ্গে সরল অশিক্ষিত-শ্রেণীর বিরাট ব্যবধান ছিল। টলস্টয় পিটারের রাশিয়াকে কখনও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি। সেই যুগের পটভূমিকায় তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজের যুগকে অবলম্বন করে 'আনা কারেনিনা' (Anna Karenina) নামক উপন্যাস রচনায় মনোনিবেশ করেন। এই উপন্যাস সম্পূর্ণ হয় ১৮৭৭ সনে।

'আনা কারেনিনা' 'War and Peace'-এর পরিণতি। শিল্পরীতির দিক থেকে দুটো বইতে সাদৃশ্য আছে। 'War and Peace'-এর নায়ক-নায়িকারা 'আনা কারেনিনার' নায়ক-নায়িকাদেরই প্রতিধ্বনি। অবশ্য 'আনা কারেনিনার' চরিত্রগুলির ভিতর বৈচিত্র্য বেশী পাওয়া যায়। তা ছাড়া রকমারি রসেরও সমাবেশ যথেষ্ট আছে। ভ্রন্‌স্কি (Vronsky) টলস্টয়ের একটি নতুন সৃষ্টি। আর একটা উল্লেখযোগ্য পার্থক্য এই যে, 'আনা কারেনিনার' ভিতর দর্শন সম্বন্ধে কোন পৃথক আলোচনা নেই। সমস্ত উপন্যাসের পটভূমিকায় এক ধরনের নৈতিক দর্শন ছড়িয়ে আছে। 'আনা কারেনিনার' ভিতর দুঃখবাদ আছে। যতই উপন্যাসের গভীরে প্রবেশ করা যায়, বিয়োগান্ত পরিচ্ছেদগুলো ঘনীভূত হয়। তবে দুই উপন্যাসের ভিতরেই একটা অনির্দিষ্ট পরিসমাপ্তি পাওয়া যায়। 'War and Peace'-এর ভিতরে আমরা অনন্ত জীবনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। 'আনা কারেনিনা'র ভিতরে সেই যাত্রার সুর যেন সুদূরে বিলীয়মান। 'আনা কারেনিনা'র পর টলস্টয় আবার পিটারের আমলের উপর রচনা আরম্ভ করেন। Decembristদের নিয়ে আবার অসমাপ্ত কাজ শুরু করেন। কিন্তু এ কাজে তিনি অগ্রসর হতে পারেন নি। তারপর তিনি 'A Confession' লেখায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর ভিতরকার সংশয়গ্রস্ত রূপটি এর ভিতর দিয়ে ফুটে বেরিয়েছে। এক দিকে শিল্পীজীবন অন্য দিকে শাশ্বত জীবন-জিজ্ঞাসা, তারই বেদনাতুর সৃষ্টি 'My Confession'।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই টলস্টয়ের সৃজনীশক্তির ভিতর একটা ছায়া পড়েছিল। তার পরেরকার রচনা-গুলির ভিতর তেমন জীবনীশক্তির প্রেরণা নেই। 'The Kingdom of God is Within You' (১৮৯৩) যুগকে নিয়ে এক ধরনের বিস্তারিত আলোচনা। 'What is Art'? শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীজাত আলোচনা। 'Resurrection' শেষ বয়সের একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস। এর ভিতর আগেকার টলস্টয়ের প্রতিধ্বনি পাওয়া গেলেও সে দুর্নিবার প্রাণশক্তির পরিচয় আর তেমন মেলে না। তবুও এর ভিতর মানব-জীবনের শাশ্বত জিজ্ঞাসা অগ্নিদ্যুতির মত জ্বলে উঠেছে। অশান্ত আত্মার স্বরূপ, নৈতিক জিজ্ঞাসা ও রক্তাক্ত চেতনার একটি সার্থক সৃষ্টি এই উপন্যাসখানি।

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

দরদীদের প্রতি

এ যুগের হাহাকার ধ্বনিত করিতে অন্য যুগে
কোথা তুমি কবি ?
কোথা সেই কথা-সাহিত্যিক
বহু-র বেদনা যার এক চিত্তে জাগাইবে ঝড়,
তারপর সেই ঝড় যার কলমের ডগা হতে
কালোতে রাখিয়া যাবে সাদা বক্ষে দুঃখের দলিল ?

যারা মরে অনাহারে পথে, ফুটপাথে,
স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, নদীতীরে কিংবা নর্দমায়,
ফুসফুসে নাহিক শক্তি হাহাকার করিবার মত,
ক্ষীণকণ্ঠ আর্তনাদ নাহি পৌঁছে নিজেরি শ্রবণে,
তাদের আশ্বাস দিয়া, ওগো কবি, বল কানে কানে
"তোমরা মরিছ বটে মরে যথা কুকুর বেড়াল
তার চেয়ে আরো দুঃখে, আরো কষ্টে, আরো বেকায়দায়,
তবু দুঃখ কোর নাকো, চক্ষু চির-মুদিবার আগে
শুনে যাও এ গ্যারান্টী মোর,
মোর কাব্যে তোমাদের করিব অমর—
আমি তোমাদেরই কবি।"

তাদের মুমূর্ষু কানে বল, ওগো কথা-সাহিত্যিক,
"তোমাদের যত ব্যথা, যত অশ্রু, যত দীর্ঘশ্বাস
কিছু ব্যর্থ হবে নাকো। তোমাদেরি করুণ কাহিনী
ভিত্তি করে ছোট গল্প, বড় উপন্যাস
লিখিব এমন যাতে 'এডিশন' হু-হু করে কাটে।
হয়তো সে গল্প আর উপন্যাস মোর
(তোমরাই হবে যার নায়ক নায়িকা আর ফাউ)
পাবে পুরস্কার আহা আকাদামি টাকাদামি হতে,
চিত্রায়িত হবে শেষে রূপালী পর্দায়,
শৌখিন ও পেশাদার মঞ্চে হইবে মঞ্চিত।
কে নাহি আকাঙ্ক্ষা করে হেন অমরতা ?
তোমরা না মর যদি এইভাবে কাতারে কাতারে
দরদী কাহিনীকার কী নিয়া রচিবে উপন্যাস ?
দরদী সাহিত্য তবে কী করিয়া পুষ্ট হবে বল ?"

পটল তোলার আগে জেনে শান্তি পেয়ে যাক এরা
তোমরা এদেরি কবি, ইহাদেরি কথা-সাহিত্যিক,
এরা তোমাদেরি কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে
চিরদিন রহিবে অমর।

ঠকবাজ

(মিশ্র রামপ্রসাদী কাফি)

(আমি) ঠকব বলেই কোমর বেঁধেছি,
(আমায়) আয় ঠকাবি কে !
আমি যে অহিংস খাঁটি
(আমায়) আয় মেরে যা হিংস চাঁটি
গুঁতোর চোটে দাবিয়ে দে রে
আমার দাবিকে।

(ও তুই) যতই মারিস কলসী-কানা
যতই বলিস গাধা।
(আমি) তাই বলে কি প্রেম দিব না,
ওরে আমার দাদা ?
চড় মারিলে এই গালেতে
অপর গালটি দিব পেতে,
(ও ভাই) আমার মতন আপন-ভোলা
কোথায় পাবি কে ?

পৃথিবীর প্রতি

পৃথিবী, বাটপাড় তুমি—এই সত্য যতবার ভুলি
ততবার করি আবিষ্কার।
বাহিরে বিছায়ে রাখ হাসির সবুজ আস্তরণ,
অগ্নি জ্বলে অন্তরে তোমার।
ঠাট্টা করে তাই বুঝি কভু কভু অট্টহাসি হাস,
গরমে হাঁসফাস করো, ঠাণ্ডা লেগে কখনো বা কাশ,
কখনো যে করো হেলা, কখনো আবার ভালবাস,
কভু হি হি, কভু হাহাকার—
বাহিরের যত ঠাণ্ডা সে কেবল প্রোপাগাণ্ডা,
অগ্নি জ্বলে অন্তরে তোমার।

হে পৃথিবী, সূর্য-শিশু, গ্রহে গ্রহে করিছে গ্রহণ
তোমার আত্মার আত্মীয়তা।
কালের তিমিরতলে জীবন-তিমির সন্তরণ—
কোথা শুরু ? অন্ত তার কোথা ?
বিমুগ্ধ মঙ্গল-বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র-শনি-সোম,
এলোমেলো পঞ্চভূত : ক্ষিতি-অপ্‌-তেজ-মরুৎ-ব্যোম,
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্র-বৈশ্য আর হাড়ি-মুচি-ডোম
এক চক্রে ঘুরিছে সর্বথা।

শর্মিষ্ঠা-সরম-ভীরু যে কচের তুমি দেবযানী
তারই তৃষ্ণা জাগে বারংবার ;
তাই তব বদনায় বাহিরে যতই ঢাল পানি,
অগ্নি জ্বলে অন্তরে তোমার।

ভীষ্ম-বিলাপ

পিতা করো নাই মোরে, পিতামহ করেছ, বিধাতা!
স্মরশয্যা লেখো নাই, শরশয্যা লিখেছ ললাটে।
বিচিত্র বিধানে তব বিচিত্রবীর্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা
বিস্ময়বিমূঢ় আমি ; অশ্রুজল ঝরিতেছে মাঠে।

ব্রহ্মারে ভুলিয়া হায় ব্রহ্মেতে করেছি বিচরণ,
এ দুঃখ কাহারে কহি? কোথা দ্রোণ, কোথা অশ্বত্থামা?
গা-ঢাকা দিল কি কৃষ্ণ লুকায়ে যুগল শ্রীচরণে?
কোথা গেলি দুর্যোধন, শকুনিরে যে ডাকিস মামা?

কোথা অম্বা, অম্বালিকা? সাবালিকা হয়েছিলে যবে,
বালিকা ভেবেছি তবু, তাই বুঝি শিখণ্ডীর শিখা
তুলিল পুচ্ছের মত দ্বন্দ্ব যেথা পাণ্ডবে কৌরবে?
করি যদি গীতা-ভাষ্য, সে ভাষ্যের কে করিবে টীকা?

দ্রৌপদীরে বাজী রেখে যুধিষ্ঠির খেলেছিল পাশা
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির! এক চোখে কাঁদি, অন্যে হাসি।
হেরে গেল যুধিষ্ঠির, হেরে গেল হতভাগা চাষা,
সৈরিন্ধ্রীরে রঙ্গে ফেলে। ভেবে চিত্ত আজিও উদাসী।

তাই ভাবি দুনিয়ায় বাছা শক্ত হবে ভণ্ড সাধু,
অতীতে দেখেছি যাহা ভবিষ্যৎও তাই যদি দেখে।
কেলেংকারি হয়ে যেত—ভাগ্যে ছিল শ্রীকৃষ্ণের যাদু!
দুঃশাসন-বক্ষ-রক্ত বিধাতা ভীমেরে দিল ডেকে।

জীবনে অনিচ্ছা দাও, হে বিধাতা, এ ইচ্ছামৃত্যুরে,
ভূমার ঘর্ঘর-চক্রে চূর্ণ করো ক্ষুদ্র সুখে দুখে।
পুরানো সুরের হাঁড়ি ভেঙে দাও নতুন বেসুরে,
ঠেসো না চ্যবনপ্রাশ অনিচ্ছুক চ্যবনের মুখে।

জনৈক গভীর বাটপাড়ের গান

(৺নিধুবাবুর টপ্পার ঢঙে গাওয়া নিষেধ)

(আহা মোর) ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যাস
কে তুই দাদা?
(ও তোর) মস্ত কোন্ ওস্তাদের কাছে হস্ত সাধা?
তেল মেখে তোর পিছল গায়ে
তাকাস নাকো ডাইনে বাঁয়ে,
(তোর) কাণ্ড যতই হোক না কালো, মনটা সাদা।

আহা তোর নাই রে আপন পর।
(কত তাই) আমার দ্রব্য আপন ভেবে
নিলি আপন ঘর।
আপন বোঝা আপন ভুলে
আমার ঘাড়ে দিলি তুলে,
আমার জুতো পায়ে দিয়ে ভাই
আমার গায়েই দিলি কাদা।

(ও তুই) আপন ফসল ফলিয়ে নিলি
আমার মাঠে।
(আজি মোর) শূন্য ক্ষেতে আঙুল চুষে
দিন যে কাটে।
আমার খেয়াতরী নিয়ে
ওপারে তুই উঠলি গিয়ে,
(ও তুই) হাসা-কাঁদার হাসা নিয়ে
আমায় দিয়ে গেলি কাঁদা।
(আহা) ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে যাস্
কে তুই দাদা?

শৈবাল ও দীঘি

শৈবাল দীঘিরে কহে উচ্চ করি শির
"মনে রেখ এক ফোঁটা দিলেম শিশির,
এর বেশী দিতে সাধ্য নাই—
এই মোর যথা আর সর্বস্ব যে ভাই।
জানি নাল্পে সুখমস্তি, ভূমাতেই সুখ,
শাস্ত্রে বলে, তাই শুনে ভরে ওঠে বুক
মহা দুঃখে ; ভূমা কোথা পাই?
সারা নিশি সাধনায় ক্ষুদ্র সিদ্ধি করিয়াছি জয়
এক ফোঁটা শিশির সঞ্চয়,
সে সঞ্চয় কেঁদে হেসে
তোমারেই দিয়েছি নিঃশেষে,
গ্রহণ করেছ তুমি হে বিরাট উদার গম্ভীর!
তুচ্ছতার সেই গর্বে উচ্চ মোর শির।"

ভাবনা

তামা-কে তামাক ভেবে যে ক্ষ্যাপা চড়ায় কলিকায়,
বার্তা আর বার্তাকুতে যে উন্মাদ ফেলেছে গুলিয়ে,
তারে নিয়ে কি করিব? বলে দাও, হে মোর বিধাতা!
দুর্ভিক্ষে দুর্ভক্ষ্য খেয়ে বারে বারে মরিছে যাহারা,
তাহারা মরিছে বলে হোম্‌রারা খাবে না পোলাও,
চোম্‌রারা সোমরস গ্রাসে গ্রাসে না করিবে পান,
হেন কথা ভাবে যারা সে হেন বাতুল লয়ে হায়
হে বিধাতা, কি করিব আমি?
বুদ্ধুদের বুদ্ধি দাও, হে বিধাতা, রক্ষা কর মোরে,
ঘুমাক নূতন বুদ্ধ নব বোধিদ্রুমে॥

(ওঁ শান্তি! শান্তি! শান্তি!)

ঘরে-বাইরে রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

আবার অন্তরঙ্গ বন্ধুযুগল সুনীল ও সন্তোষের দৈনিক হাজিরা ও খেলাধুলো যথানিয়মে চলতে থাকে, আবার অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়াও করি। আমাদের খেলার বল যদি রাজশেখর বসুর পাঁচিলের ও-ধারে পড়ে যেত, তা নিয়ে ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর মেয়ের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়, বলটা আর সে ফিরিয়ে দিতে চায় না। তাঁদের আর আমাদের বাড়ির মাঝখানে প্রাচীর মাত্র সাড়ে তিন ফুট উঁচু। গোলমাল শুনে রামেন্দ্রসুন্দর ওপর থেকে দেখেই মীমাংসা করে দেন।

আমি দেখেছি, রামেন্দ্রসুন্দর প্রায়ই রাজশেখর বসুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কত কী আলোচনা করতেন। ওসব আমার ভাল লাগবে কেন? বরং সে সময়টা বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে আলাপ জমিয়ে নেওয়াটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ। রাজশেখর বসুর তখন পূর্ণ যৌবন। কে জানত, সেই তিনিই উত্তরকালে "পরশুরামে"র সাহিত্যিক কুঠার চালিয়ে, অনবদ্য রস-মাধুর্যে আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্তলোক এমন অসংশয়ে জয় করে নেবেন!

ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু আমাদের কারও অসুখ-বিসুখ হলেই আসতেন, সে সময় তাঁর ফী মাত্র দু টাকা। তখনই শুনেছিলাম, তিনি নাকি হিপ্‌নটিক ট্রিট্‌মেণ্ট করেন। তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার যে শুধু ঝগড়াই হত তা নয়, ভাব হলে ও-বাড়িতে গিয়ে গাছে উঠে আমি আর সেই মেয়েটি দুজনেই পেয়ারা খেতাম। এটাও রামেন্দ্রসুন্দরের চোখ এড়াত না। ওপর থেকে দেখেই আমাদের তাড়া দিয়ে নামিয়ে দিতেন, কী জানি পড়ে গিয়ে কারও যদি হাত পা ভেঙে যায়!

একদিন আমাদের ক্রিকেটের বল গিয়ে রাজশেখর বসুর জানলার কাচে লাগতেই তা ঝন ঝন শব্দে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। এর আগেও কয়েকবার এ রকম হয়েছে, তাই নানা বাড়িতে ব্যাটবল খেলা একেবারেই বন্ধ করে দিলেন। আমরা কখনও টেবিলের ওপর ব্লো-ফুটবল খেলি, কখনও বা টেবিল-টেনিস—

এমনি করেই দিন যায়, মাস যায়।

রামেন্দ্রসুন্দর অসুস্থ হওয়ায় একদিন তাঁর কনিষ্ঠ দুর্গাদাস ত্রিবেদী আর নীলকমল ত্রিবেদী পদ্মমাকে নিয়ে এলেন। রামেন্দ্রসুন্দর মাথার যন্ত্রণায় ভুগছেন, তাই তিনি দীর্ঘদিনের ছুটি নিলেন। কলেজে যান না, তবে সাহিত্য-পরিষদে মাঝে মাঝে না গিয়ে পারেন না। ঠিক আগের মত যেতে পারেন না বলেই হয়তো মনের দুঃখ শরীরে আত্মপ্রকাশ করে।

ছুটি ফুরিয়ে গেল, আবার ছুটি নিলেন। তার পর যতদূর মনে আছে, সেটাও শেষ হলে তিনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখলেন—আমাকে এবার অবসর দেওয়া হোক, শরীর অপটু হয়ে পড়েছে, ভবিষ্যতে আর হয়তো পারব না।

সার্ সুরেন্দ্রনাথের উদারতা ভোলবার নয়, তদুত্তরে তিনি নিজে এসে বললেন, আপনি যেতে না পারলেও, আপনার নাম কলেজে যেমন আছে তেমনি থাক্, আপনার পে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে, বিশেষ জরুরি কাগজপত্র অমৃতবাবু বাড়িতে এসে সই করিয়ে নিয়ে যাবেন।

কলেজে শুনতাম, একটা চোখ কানা ছিল বলে অমৃতবাবুকে ফকড় ছেলেরা নেপথ্যে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য বলত।

রামেন্দ্রসুন্দর আপত্তি জানালেন, ন্যায়ের দিক দিয়ে এটা হয়তো ঠিক হবে না।

কলেজের অন্যান্য সতীর্থ অধ্যাপক সার্ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরাও জোর দিয়ে বললেন, আপনার শরীর অসুস্থ বলে যদি এখন এই অবস্থায় রিপন কলেজের গবর্নিং বডি আপনার আবেদন মঞ্জুর করেন তা হলে সেদিক দিয়েও কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ন্যায়বিচার হবে না।

অনেক আলোচনার পর বন্ধুবর্গের বিশেষ অনুরোধে রামেন্দ্রসুন্দর শেষটায় রাজী হলেন।

*　　*　　*

সে সময় নানা প্রায়ই গৌর নাপিত বা আমাদের দিয়ে মাথার চাঁদিতে পুরনো ঘি মালিশ করাতেন। আর একটা বড় গামলার সামনে মাথা ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে বেশ ভাল করে মুছে ফেলতেন। এবার মাস খানেকের মধ্যেই সুস্থ বোধ করাতে আবার কলেজ আর সাহিত্য-পরিষৎ সমান তালেই চলতে লাগল।

অসুখের মধ্যেও দেখেছি, তাঁর লেখাপড়ার একদিনের জন্যেও কামাই নেই। তিনি আপন মনে যখন কিছু লিখতেন বা পড়তেন, তাঁর কনিষ্ঠ দুর্গাদাস বা নীলকমল ত্রিবেদী ঘণ্টার পর ঘণ্টা অদূরে বসে থাকতেন। বিভোর হয়ে তিনি কাজ করে যেতেন, ভ্রাতাদের সঙ্গে কোন কথাই হত না, হয়তো তাঁদের উপস্থিতিই তাঁর খেয়ালে আসত না। এমনই ধ্যানমগ্ন ছিলেন এই ত্রিবেদী তাপস। একদিন দুর্গাদাস বললেন, বাবুদাদা, আমি ডি. এল. রায়ের পাশের বাড়িতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। আপনার অসুখের খবরটাও তাঁকে বলব।

বাস্, আমিও লাফিয়ে উঠে নানাকে ধরে বসলাম, আমিও সেই পথে একবার ডি. এল. রায়কে দেখে আসব।

তিনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন।

সেদিন ছিল রবিবার, লেখাপড়ার বালাই নেই, আমি মেজো নানার সহযাত্রী হলাম।

পথে যেতে যেতে দুর্গাদাস বললেন, ডি. এল. রায় যখন আমাদের কাঁদীতে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর সঙ্গে খুব খাতির ছিল। একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এখন আপনি কী নাটক লিখছেন?

তিনি হেসে বললেন, আপনাকেই লিখছি।

কথাটা বুঝলাম না, প্রশ্ন করলাম, আপনাকে লিখছি মানে?

দুর্গাদাস।

ওই নামে বুঝি তাঁর কোনও নাটক আছে?

হ্যাঁ।

ডি. এল. রায় তখন 'সুরধামে' উঠে এসেছেন। বাড়ির সামনেই বিস্তৃত সবুজ লন। তার মাঝে দেখলাম, আমারই বয়সী একটি সুন্দর ছেলে আর একটি ফুটফুটে মেয়ে—বেশ মিষ্টি। তারা সাজগোজ করে কোথায় বেরিয়ে যাচ্ছে।

দুর্গাদাস বললেন, এ দুটি ডি. এল. রায়ের ছেলে মেয়ে—মণ্টু আর মায়া।

যদিও সেদিন দিলীপকুমার ওরফে মণ্টুর সঙ্গে আলাপ হয় নি, কিন্তু প্রথম দর্শনেই তাকে ভালবেসে ফেললাম, উত্তরজীবনে অবশ্য সেটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে।

সামনের বারান্দা পার হয়ে দেখি, সম্মুখের হল-ঘরে প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড-টেবিল, ঢুকেই বাঁ দিকের প্রকোষ্ঠে তাকিয়া ঠেস দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বসে। ঘরে অনেক লোক জমজম করছে। দু-একজনকে চিনলাম। একজন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আর একজন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজপতি মশাই প্রায়ই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে যেতেন। তিনিও নানার মত তাকিয়ায় মাথা রেখে বেশ লম্বা-চওড়া জায়গা নিয়ে সটান শুয়ে পড়তেন, আর মাঝে মাঝে নানার কাছে কখনও দুশো-একশো, কখনও পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়ে যেতেন।

দুর্গাদাস ঘরে ঢুকেই বললেন, আপনার একজন বিশেষ ভক্তকে সঙ্গে এনেছি। "আমার দেশ" গানটি ভারি সুন্দর গায়।

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে ডেকে কত আদর করলেন, কাছে বসিয়ে "বঙ্গ আমার জননী আমার" গাইতে বললেন।

সামনেই তবলা, পাখোয়াজ আর একটি টেবিল-অর্গান

ছিল। তিনি তড়াক করে অর্গানের সামনে বসেই সুর দিলেন, আমার গানের সঙ্গে তিনিও কোরাসে গাইলেন। আমার কিশোরকণ্ঠে গানটা তখন মন্দ শোনায় নি। শেষ হতেই দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করার সময় বললাম, আমরা সকালে-বিকেলে প্রায়ই এই গানটা গেয়ে থাকি। আর খুব ভাল লাগে। তার সঙ্গে আরও নতুন দুটো লাইন সবাই মিলে ভেবে চিন্তে যোগ করে দিয়েছি, শুনবেন?

কী বল তো?

বললাম—

বোমার বিধান দিল বারীনদা
প্রফুল্ল চাকী ত্যজিল প্রাণ,
ক্ষুদিরাম বসু হাসিতে হাসিতে
ফাঁসিতে করিল জীবনদান।
তুই কি না মা গো তাদের জননী—

আর বলা হল না, সমাজপতি মশাই আর পাঁচকড়িবাবু দু ধার থেকে দুজন সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিতেই ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, উঃ, লাগে যে!

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে কাছে টেনে নিয়ে তাঁর লাল টুকটুকে হাতখানা আমার পিঠে বুলিয়ে দিলেন।

দুর্গাদাস ত্রিবেদীর বিশেষ একটা কাজ থাকায় তখুনি উঠতে হল।

আসবার সময় দ্বিজেন্দ্রলাল বার বার অনুরোধ করলেন, একে সপ্তাহে একদিন অন্ততঃ আমার কাছে নিয়ে আসবেন, ছেলেটিকে বড্ড ভাল লেগেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালকে দেখতে দেখতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম; মেজো নানা পাশের বাড়িতে গিয়ে ভদ্রলোকটির দেখা পেলেন না, একটা চিরকুট লিখে রেখে আমাকে নিয়ে পার্শিবাগানে ফিরে এলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর আমার দিকে চাইতেই বললাম, লেখবার কিছুই নেই তবে আজ প্রাণ খুলে "বঙ্গ আমার জননী আমার" গানটি তাঁর সামনেই গেয়ে এসেছি।

* * *

রামেন্দ্রসুন্দরের যখন মাথার যন্ত্রণা বেড়েছিল, আমার ঠাকুরদা গঙ্গার ধারে বেড়াবার জন্যে একটা গাড়ি পাঠালেন। এক জোড়া মস্ত বড় ওয়েলার ঘোড়া সমেত একটা সুবৃহৎ ল্যাণ্ডো গাড়ি—পেছনের সহিস আর কোচোয়ানের পরনে সাচ্চা জরির কাজ করা কী ঝকমকে সাজ-পোশাক!

রামেন্দ্রসুন্দরের সহজ সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে এ সব খাপ খায় কী করে? তাই তিনি বিষম বিপদে পড়ে গেলেন। শুধু আত্মীয় বলে নয়, আমার ঠাকুরদাকে নানা যথেষ্ট খাতির করতেন, বিশেষ করে তাঁর সঙ্গে সাহিত্য-পরিষদের আত্মিক যোগাযোগ ছিল বলেই আরও শ্রদ্ধা করতেন। পরমাত্মীয়ই হোন আর অনাত্মীয়ই হোন, রাজা-মহারাজাই হোন আর কোটিপতিই হোন না কেন, তিনি ফিরেও চাইতেন না, যদি না দেখতেন তার মধ্যে মানবতার বিকাশ। এই রকম স্বভাবের মানুষ ছিলেন তিনি।

রামেন্দ্রসুন্দর দেখে-শুনে সদীর্ঘনিঃশ্বাসে বললেন, রাজা বাহাদুর আমার জন্যে পাঠিয়েছেন। দু-চারবার চড়তে হবে বইকি। এতে মাঝে মাঝে খোকাকে নিয়ে সাহিত্য-পরিষৎ যাব। আমার ছ্যাকড়া গাড়িই ভাল, কী বল খোকা? তোমার কী ইচ্ছা? আমার দলে থাকবে, না, ওই গাড়িতে উঠবে?

প্রাণের আবেগে রামেন্দ্রসুন্দরের গা ছুঁয়ে বলে ফেললাম, জানই তো নানা, তোমারই কথায় নিজের হাতে কাপড় কাচি, জুতোয় কালি-বুরুশ করি, মাথায় আজ পর্যন্ত টেরি কাটা দূরে থাক্—কোনও গন্ধতেল মাখি না, জামায় আজ পর্যন্ত সেণ্ট পড়ে নি। সেই মানুষের ওই সব জুড়ী গাড়িতে চড়া পোষায় কি না, তুমিই বল না! নাঃ, ওসব হবে না, তোমার সঙ্গে আমিও ছ্যাকড়া গাড়িতেই যাব।

নানার চোখে বিদ্যুৎ দেখলাম, তিনি আমায় জড়িয়ে বললেন, ছিঃ, কারও গা ছুঁয়ে কোনও কথা কাউকে বলতে নেই, যা তোমার মনে আসে তাই সোজা কথায় বলবে, শপথ করলে মানুষের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়।

তারপর আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

আমিও ঘর ফাটিয়ে হেসে উত্তর দিলাম, কী ভাগ্যে আজ তোমার মুখে ভগবানের নাম শুনলাম!

রামেন্দ্রসুন্দর সহাস্যে বললেন, ভগবানের নাম বুঝি

মুখে বললেই করা হয়, কেমন ? মুখে নাম আর ভেতরে ভেতরে অন্য ফন্দি আঁটব, তাতে ভগবান কখনই সন্তুষ্ট হন না।

বয়সের তুলনায় আমি প্রবীণের মতই কথা বলতাম, এ অভ্যাসটা আমার হয়েছিল কেবল নানার মত জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণের সঙ্গে সর্বদাই থাকতাম বলে। রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আমার জিজ্ঞাসারও অন্ত ছিল না, তাঁরও আমাকে বুঝিয়ে দেবার ধৈর্যের সীমা ছিল না।

তা ছাড়া, সব জিনিস খুঁটিয়ে জেনে নেবার চেষ্টাও ছিল প্রচুর। তাই নানাকে আবার প্রশ্ন করি, তা হলে 'হরের্নামৈব কেবলম্' কথাটা কেন হয়েছে ? এই যে সব সাধু-সন্ন্যাসী আর যাঁরা ভগবানের নাম করেন, তাঁরা কি সবাই ভণ্ড বলতে চাও ?

বেশী তর্ক কোর না।—বলেই তিনি নীরব হয়ে গেলেন।

চুপ করে গেলে চলবে না, কথাটা ভাল করে আমায় বুঝিয়ে দাও।

রামেন্দ্রসুন্দর আমার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে কেউ চলে, আবার কেউ বা নিজের ছক নিজেই কেটে নেয়। যে দিক দিয়েই হোক, তাঁর পুজো হলেই হল। তবে দেখতে হবে, যে পথ দিয়ে চলেছি, সেটা ঠিক কি না ?

এবার আমি চুপ করে গেলাম। মনে পড়ে গেল একদিন সরস্বতী-পুজোয় নানা আমাকে ডেকে বলেছিলেন, আজ এক ঘণ্টা পড়ে তোমার ছুটি।

আমি আপত্তি জানিয়ে বলেছিলাম, আজ অনধ্যায়, লিখতে পড়তে নেই। সব ছেলেরাই সরস্বতী-পুজোয় মেতে উঠেছে, না খেয়ে সবাই আজ অঞ্জলি দেবে, আর তুমি কিনা পড়তে বলছ ?

ইন্দুপ্রভা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার গাল টিপে বললেন, তোর নানা তো তিন শো পঁয়ষট্টি দিনই সরস্বতী-পুজো করে, আর তোরা কেবল একদিন হুজুগে মেতে উঠিস। আসল পুজো তোরা করিস কই ?

ইন্দুপ্রভার কথা শেষ হলে, রামেন্দ্রসুন্দরও আর একটা লাইন জুড়ে দিলেন, আর তিন শো পঁয়ষট্টি দিনই যদি অনধ্যায় হয়, তা হলে তোমাদের খুব ভাল লাগবে, কী বল ?

একটু এগিয়ে এসেছি। আবার মূল কথায় ফিরে আসা যাক। সেদিন সাহিত্য-পরিষদের কী একটা জরুরী সভা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর সেদিন ল্যাণ্ডো গাড়িতে উঠলেন। এই গাড়িতে নানা মাঝে মাঝে চড়তেন বটে, তবে বেশীর ভাগ সময়ই ইন্দুপ্রভা দেবী আমার মাসতুতো ভাই-বোনদের নিয়ে কখনও গঙ্গাস্নান কখনও বা বিকেলে বেড়িয়ে আসতেন। আমিও কচিৎ কদাচিৎ ফুরসতমাফিক তাঁদের সঙ্গে যেতাম, খেলাধুলো তো আছে! সাধারণতঃ রামেন্দ্রসুন্দরের সেই চিরন্তন ছ্যাকড়া গাড়িতেই আমরা দুজনে উঠে মুখোমুখি বসি, তারপর মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত—আমাদেরও দৌড় সাহিত্য-পরিষৎ।

কোচম্যানের ঝন্‌মন্ ঝন্‌মন্ 'ফুটবেলে'র আওয়াজে রাস্তা কাঁপিয়ে ওই ল্যাণ্ডো গাড়ি ছুটে চলে পরিষদের দিকে, মাঝে মাঝে পশ্চাতে জোড়া সহিসের সচকিত হাঁকডাকে রাজপথ মুখরিত। রামেন্দ্রসুন্দরের কোনও ভাব-বৈলক্ষণ্যের চিহ্নমাত্র নেই, সঙ্গে আছেন রিপন কলেজের প্রফেসার বিপিনবিহারী গুপ্ত আর স্বনামধন্য অধ্যাপক ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ললিতবাবু প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আসতেন। খোলা ছাতে দুটি মাদুর বিছানো থাকত, দুজনেই খালি গায়ে শুয়ে পড়তেন। কত গল্প, কত গবেষণা যে চলত তার ইয়ত্তা নেই। মাস্টার মশাই চলে যাবার পর আমিও তাঁদের কাছে গিয়ে বসতাম। ললিত-বাবু দু-এক লাইন বাংলা বলে মুখে মুখেই তার ইংরেজী অনুবাদ শুনতে চাইতেন। আমার উত্তরে তিনি খুশীই হতেন।

পড়াশুনা শেষ করেও রেহাই নেই—আমি সরে পড়বার চেষ্টায় থাকি; কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের কড়া দৃষ্টি-পাহারায় সে সুযোগটুকুও মেলে না।

একদিন কথায় কথায় ললিতবাবু বললেন, তোমাদের লালগোলার লাইনেই আমার বাড়ি, তা জান ?

কই, না! কোথায় ?

নিষ্পত্র তরুবর।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে—এটি আবার কোন্ জায়গা? বলি, কই, কখনও শুনি নি তো!

ললিতবাবু আমাকে এই নামটির অন্তর্নিহিত রহস্যভেদ করতে বলেন।

আমি ভেবেও কিছু কূলকিনারা পাই না—তিনি হেসে সমস্যার সমাধান করে দিলেন, মুড়াগাছার ভাল নাম 'নিষ্পত্র তরুবর' নয় কি?

রামেন্দ্রসুন্দর আমার অহেতুক লজ্জাকে আড়াল করে উত্তর দিলেন, আমিই হয়তো পারতাম না, খোকার কাছে এটা আশা করাই ভুল।

যা হোক, সেদিন ললিতবাবু আর বিপিনবিহারী গুপ্তের সঙ্গে বহুবিধ আলাপনে মগ্ন রামেন্দ্রসুন্দরের হয়তো খেয়ালই নেই যে, এটা ল্যাণ্ডো গাড়ি। স্থান অকুলান হওয়ায় দুর্গাদাস ত্রিবেদী সাহিত্য-পরিষদের দিকে আগেই সাইকেলযোগে রওনা হয়েছেন। আমরা চলছি। হঠাৎ কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের কাছাকাছি, একটা লাঠি এসে পড়ল অশ্বপৃষ্ঠে। আমি গাড়ির দরজায় হাত রেখে বাহিরে চেয়ে দেখছিলাম, ঠিক আমার হাতের পাশেই একটা লোহার ডাণ্ডা এসে প্রচণ্ডভাবে পড়ল—যেন মোহমুদ্গর! ঘোড়ার পিঠে পুরু চামড়ার সাজ থাকায় আহত হয় নি বটে, তবে একটা বিকট হ্রেষারব করে দুই ঘোড়াই একবার লাফিয়ে উঠে আরও জোরে ছুটে চলল, আর আমিও প্রাণে বেঁচে গেলাম।

রামেন্দ্রসুন্দরের চিৎকার: কী হল? কী হল?

ললিতবাবু, বিপিনবাবু আঁতকে উঠেই পরস্পরকে জাপটে ধরলেন। আর এদিকে আমি নানার পরিধিকে বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করতে না পারলেও চেপে ধরলাম।

বকর-ঈদ্ উপলক্ষ্যে গো-হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সে সময় খুব দাঙ্গা মাথা-ফাটাফাটি চলছিল—তাই আমাদের মত নিরীহ যাত্রীদের উপরও এই নিষ্ঠুর আক্রমণ। সকলের পৈতৃক প্রাণ রক্ষা পেল বটে, কিন্তু উদ্বেগ গেল না। কী জানি, পথিমধ্যে আবার যদি কিছু নূতন বিভ্রাট হয়!

ভাগ্যে ল্যাণ্ডো গাড়িটা খোলা হয় নি—সেই ঢাকা গাড়ির মধ্যে তাড়াতাড়ি ললিতবাবু দু ধারের দুটো নীল পর্দা টেনে নামিয়ে দিলেন যেন আমরা পরদানশীন জেনানার দল চলেছি। রামেন্দ্রসুন্দরের ভীতিবিহ্বল চক্ষু দুটি এখনও আমার মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই আমাকে শিক্ষা দিতেন: ভয় করেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল, সাহসী হবে, ভয়কে জয় করতে শেখো, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এমন সুন্দর সুযোগ কি আর জীবনে পাব? নির্বিকার ধীরেন্দ্রনারায়ণ ভীতিবিহ্বল রামেন্দ্রসুন্দরকেই বরং সান্ত্বনা দিয়ে বলে, যা হবার হবে, অত ভয় কিসের? তুমিই যখন-তখন আমাকে সাহসী হতে বল, আর তুমি কিনা নিজেই—

আর বলতে হল না, একটা ছোটখাটো তাড়া খেলাম।

সাহিত্য-পরিষদে পৌঁছেই আমাদের চক্ষু কপালে উঠে গেল। দেখলাম, দুর্গাদাস ত্রিবেদীর কপাল ফেটে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটে বেরিয়ে আসছে। শুনলাম, তিনি সাইকেলে আসবার সময় তাঁকেও লাঠি মেরেছে। সেই অবস্থায় তিনি কপালে এক হাত চেপে সজোরে সাইকেল চালিয়ে এখানে এসেছেন। দুর্গাদাস ত্রিবেদী প্রত্যহ প্রাতে গুনে গুনে এক শো ডন-বৈঠক দিতেন, দেহে শক্তিও ছিল অসীম। তাই এই গুরুতর আঘাত সামলে তিনি এতটা পথ চলে আসতে সক্ষম হয়েছেন। দেখলাম, সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত, আর পরিষদের সামনে মার্বেল পাথরের মেঝে পর্যন্ত রক্তে লালে লাল।

ভ্রাতৃ-অন্ত প্রাণ রামেন্দ্রসুন্দরের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর, তিনি ছোট ভাইকে রক্তাপ্লুত দেখে রীতিমত কাঁপতে লাগলেন। দুর্গাদাস ত্রিবেদীই তখন অগ্রজকে বরং সান্ত্বনা দেন: ও কিচ্ছু না বাবুদা, এখুনি ব্যাণ্ডেজ করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে, কোনও ভয় নেই।

এই অবস্থায় ওই ধরনের কথা যে বলতে পারে, তাঁকে নিশ্চয়ই বাহাদুর বলতে হবে। সেটা শুনে আমার এত ভাল লাগল যে তখুনি তাঁকে প্রণাম করে বসলাম।

এমন সময়ে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তখুনি তাঁর গাড়িতে মেজো নানাকে ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আর নিজে কাছেই কোথায় গিয়ে লেফটেনাণ্ট গভর্নর বেকার সাহেবকে ফোন করে সব অবস্থা বললেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে গেলাম, শুনলাম ছোটলাট বলছেন—শুনে দুঃখিত

রামেন্দ্রসুন্দরের আটচল্লিশ ইঞ্চি ছাতি বুঝি বাহান্ন ইঞ্চি হয়ে গেল। ফেরবার পথেই তাঁর আনন্দের মাত্রাটা টের পেয়েছিলাম। আমার জন্যে একেবারে আধ সের গরম জিলিপি কিনে বসলেন—শুধু তাই নয়, পথেঘাটে খাওয়া রামেন্দ্রসুন্দর পছন্দ করতেন না—তবুও আমি যখন গাড়িতে বসেই দু-একখানা জিলিপি মুখে ফেলছি, সেদিন কিন্তু আপত্তির নামগন্ধ নেই—মাত্র একবার বললেন, দেখো, জামায় রস লাগে না যেন।

আর একটি স্মরণীয় দিনের কথা মনে আছে। গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় আমাকে প্রাইভেট পড়াতেন—ইনিও রিপন কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক ছিলেন। তখন রাত্রি আটটা, হঠাৎ রামেন্দ্রসুন্দর মাস্টার মশাইকে ডেকে পাঠালেন। যতই জরুরী কাজ থাক্ না কেন, আমাকে পড়াবার সময় কখনই কোনও শিক্ষককে তিনি ডেকে পাঠাতেন না, আজ চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম দেখে আমি ও মাস্টার মহাশয় দুজনেই প্রথমটা অবাক হয়ে গেলাম। গঙ্গাধরবাবু তাড়াতাড়ি উঠে পাশের ঘরে নানার কাছে গেলেন। আমিও তাঁর অনুবর্তী হলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর তাকিয়া বুকে দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে লিখছিলেন। গঙ্গাধরবাবু আসতে উঠে বসেই বললেন, রবিবাবুর পঞ্চাশৎ বর্ষ পরিপূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে তাঁকে টাউন হলে অভিনন্দিত করা হবে—সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ থেকে আমি তাঁর একটা অভিনন্দন লিখেছি, কেমন হয়েছে একবার শুনুন।

তিনি আবেগ দিয়ে সন্ত-রচিত অভিনন্দনের খসড়াটি একটানা আদ্যন্ত পড়ে গেলেন। সেটা পাঠ করেই গঙ্গাধর-বাবুর দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাইলেন।

কেমন লাগল? আপনার যদি কিছু বলবার থাকে বলুন।

মাস্টার মশাই স্বয়ং রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে তাঁর আবেগভরা রচনাটি শুনে এমন মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁকে কোন কথাই বলতে শুনলাম না। শুধু একটা অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এল: খুব সুন্দর।

সলজ্জ হাসিতে রামেন্দ্রসুন্দর বললেন, আমি কিন্তু একটা ভাবনায় পড়েছি—

তাঁর অসমাপ্ত কথা মুখেই থেকে গেল। রামেন্দ্রসুন্দরের পাঠের ভঙ্গি, ভাষার গাম্ভীর্যে আমার অন্তরেও কেমন যেন ছোঁওয়া লেগেছিল। আমিও চেঁচিয়ে উঠলাম, কী সুন্দর তুমি লেখ নানা! দাও, তোমার হাতে একটা চুমু খাই।

নানা একবার আমার দিকে চেয়ে তাঁর সেই ভাবনার কথাটি গঙ্গাধরবাবুকে বললেন: দেখুন, এখানে এক জায়গায় লিখেছি, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রে কালিদাসের পশ্চাতে বসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ—এটা ঠিক হবে কি না? প্রথম কথা, রবিবাবুকে কালিদাসের পশ্চাতে বসানো—কথাটিতে তাঁর কোনও অমর্যাদা হবে কি না! তা যদি হয়, তা হলে "সমপর্যায়ে আসীন হইয়াও" যদি লেখা যায়—সেটাও আবার উচিত হবে কি না!

ভাল করেই বুঝলাম, রামেন্দ্রসুন্দর রবিবাবুকে এত প্রগাঢ় ভক্তি করতেন যে তাঁকে পশ্চাতে না সম্মুখে, পাশে কিংবা সমপর্যায়ে বসাবেন, সেটাই তাঁর চিন্তার প্রধান কারণ। মনের বিচিত্র গতি! কখন সে যে কোন্ তারে ঘা দিয়ে বসে, বলা যায় না!

গঙ্গাধরবাবুর সঙ্গে আলোচনা চলতে থাকে—মাস্টার মশাই মাথা চুলকে বললেন, আর একটি কথাও হয়তো ভেবে দেখা উচিত—শুধু কবি কালিদাস নয়, বাল্মীকি ভবভূতি প্রভৃতি আরও তো অন্যান্য কবিরা জন্মগ্রহণ করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর গঙ্গাধরবাবুর কথা শুনে বললেন, তাও তো বটে, আবার ওই স্থানটা তিনি পড়তে শুরু করলেন।

"কিউ"-এর পরে "ইউ" যেমন থাকেই, আমিও তেমনি রামেন্দ্রসুন্দরের পাশে—

আর চুপ করে থাকতে পারলাম না—নানার কাছ ঘেঁষে ফস্ করে বলে বসলাম—হয়তো ভগবানই আমার মুখ দিয়ে কথাটি বের করে দিলেন।

কোথায় বসাবে, মাথায় না বুকে, আগে কিংবা পেছনে এ নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন? লিখে দাও না তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও তুমি তাহা কর্ণগত করিয়াছ।

হঠাৎ আমাকে বুকে জাপটে ধরেই রামেন্দ্রসুন্দর আমার পিঠে ব্যাণ্ড বাদ্য শুরু করে দিলেন। গুম গুম শব্দ একটানা চলতে থাকে। আজ রামেন্দ্রসুন্দরের আনন্দের

মাত্রাটা সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে, ওদিকে আমার মাস্টার মশাইয়ের এক জোড়া দীর্ঘ গোঁফের আড়ালে হাসি যেন আত্মপ্রকাশ করেও সম্পূর্ণ বেরিয়ে আসতে চায় না।

তিনি বললেন, এটা মন্দ হবে না।

রামেন্দ্রসুন্দর "কালিদাসের পশ্চাতে বসিয়াও" কথাটি তখুনি কেটে দিয়ে "তোমার অগ্রজাত কবিগণের পশ্চাতে আসিয়াও" কথাগুলি বসিয়ে দিলেন।

সেই দিনই আমি তাঁর কাছে জাতে উঠলাম কি না কে জানে! আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের পার্শিবাগানের বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন। পরদিন প্রাতে বেলা নটার সময় সারদাচরণ মিত্র তাঁদেরও সঙ্গে তুলে এনেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর গত রাত্রির সেই লেখার পাণ্ডুলিপি তাঁদের সবাইকে পড়ে শোনালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। পাঠান্তে আমার কথাটি যে তিনি বসিয়েছেন, সেটাও হয়তো তাঁদের বলেছিলেন। হঠাৎ আমার ডাক পড়ল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমার পিঠে একটা থাবা দিয়ে বললেন, কী হে ছোকরা, তুমি নাকি ত্রিবেদী মশাইয়ের লেখার উপরেও হাত চালিয়েছ?

লজ্জায় মিশে গেলাম। তাঁরা সব চলে যাবার পর নানাকে বললাম, একটা কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে, আর তুমি কিনা তাই ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছ! আচ্ছা লোক যা হোক!

আজ রামেন্দ্রসুন্দরের মেজাজ সুপ্রসন্ন, তিনি আমার [illegible] বললেন, এত বুড়োপনা শিখলে কোথায়?

আবার কোথায়? এই তোমার মত অকালবৃদ্ধের কাছে থেকেই আমার অকালপরিপক্বতা।

রামেন্দ্রসুন্দর হো-হো শব্দে হেসে উঠেই বললেন, রবিবাবুর এই জন্মোৎসবে তোমায় নিয়ে যাব।

সেটা না বললেও চলে, আর কী সব দেখলাম সেটাও আবার লিখে তোমায় দেখাতে হবে, এই তো? তার চেয়ে বললে না কেন, আমার যা মনে লাগে, তাই লিখে নিয়ে সেদিন আমিও পড়ব। তার আগে আমার হিজিবিজি লেখা দেখে-শুনে ঠিক করে দিও, কী বল?

রামেন্দ্রসুন্দর আমার মাথার একরাশ চুল ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! সেটা আরও কিছুদিন পরে। যাও, এখন পড়তে বোস গে। যা লিখতে বলেছি, লিখে নিয়ে এস।

সদ্য সন্তোষের কাছে শেখা একটি ছড়া নানাকে শুনিয়ে দিয়ে পাঠকক্ষে ঢুকে পড়লাম—

লেখাপড়া করে যেই
গাড়ি চাপা পড়ে সেই।

নানার নির্দেশে "বাঙালীর বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লিখে তাঁর ঘরে ঢুকতেই দেখি, একটি ছিপছিপে গড়নের অল্পবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি কথা বলছেন। ইনি প্রায়ই রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে আসতেন, নাম বিনয়কুমার সরকার—হাতে এক গাদা বই। তিনি এলেই নানা তাঁকে দেখিয়ে আমায় বলতেন—এঁকে দেখে রাখ। এই একজন—যিনি তেরো বছর বয়সে এনট্রান্সে ফার্স্ট হয়েছেন, পনেরো বছরে আই.এ., সতেরো বছরে বি. এ.তে ফার্স্ট। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষায় চমৎকার প্রবন্ধ লেখেন।

নানার হাতে লেখাটি দিতেই তিনি আমাকেই সেটা পড়তে বললেন। বাঙালীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে যা কিছু আমার জানা ছিল—বৌদ্ধযুগের অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে বাঙালী বীর বিজয়সিংহের সিংহলবিজয়, এ যুগের প্রথম বাঙালী যিনি বিলেতে গিয়ে ভারতের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন—সেই রাজা রামমোহন, প্রথম বাঙালী যিনি ভারতের জাতীয় মহাসভার প্রথম সভাপতি—সেই ডব্লু. সি. ব্যানার্জি, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এমন কি প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাউকেই বাদ দিই নি। মোহন-বাগানের জয়লাভের কথা টাটকা মনে ছিল, সাহেবদের খেলায় তাদেরই হারিয়ে দেওয়া কি কম কৃতিত্বের পরিচয়! বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে যারা প্রথম বোমা তৈরি করেছিল তারাও এই বাঙালী—দৃপ্তকণ্ঠে সমস্তটা পড়ে গেলাম।

এক ফাঁকে চেয়ে দেখি, রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে যেন একটা খুশির আলো ছলকে উঠছে। পড়া শেষ হতেই বিনয়কুমার সরকার তাঁর ঝোলার মধ্যে থেকে খানকয়েক চটি বই বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, বাঃ, বেশ লিখেছ, আমার এই বইগুলো পোড়, বুঝলে?

হর বাবুর বিপত্তি

যাই হোক, একে একে সবাইয়ের পরিচয় হোল ওঁর সাথে। ছোট জায়গা — সবাই এসেছে অল্প কয়েকদিনের জন্যে, পরিচয় না হয়ে উপায় কি? কিন্তু হৃদ্যতা বাড়লনা মোটেই। কারণ, পয়-সার ব্যাপারে ওঁর হাতটানের কথাটা ছড়িয়ে পড়ল মুখে মুখে। তিনি প্রায়ই পয়সাকড়ি না দিয়ে পিকনিক, পার্টিতে হামলা করতে লাগলেন।

সেদিন সান্ধ্য মজলিসে জল্পনা কল্পনা সুরু হোল কি করে ভদ্রলোককে জব্দ করা যায়। বিনয়ের রাগ সবচেয়ে বেশি। সেদিন বাজারে মুদীর দোকানে কি একটা কিনছিলেন হরবাবু। বিনয় বলেছিল—"ওটা না কিনে—", খেঁকিয়ে উঠে-ছিলেন হরবাবু—"আমার জন্যে আপনার এত চিন্তা কেন মশাই?" বিনয় সেটা ভুলতে পারেনি। ও বলল—"লোকটা একটা আস্ত ক্রিমিন্যাল। যত সস্তায় আজেবাজে জিনিষ কেনে ও তেমনি ফন্দী! একটা মোটা টাকার চোট বসিয়ে দেও. যায়না?" প্রায় রাত বারোটা পর্য্যন্ত জল্পনা কল্পনা চলল! তারপর হাসিমুখে সবাই উঠল।

হরবাবু চেঞ্জে আসায় সবাই বেশ একটা হাসির খোরাক পেল। ছুদিনের মধ্যেই তাঁকে চিনে ফেললো স্বাস্থ্যান্বেষীর দল। দিবারাত্রি গলায় একটা ঠাকুর্দার আমলের কম্ফটার, মাথায় একটা বাঁদর টুপী আর একটা তালি দেওয়া ওভারকোট যার আদি রং এবং বয়েস নিয়ে ছেলেছোকরাদের মধ্যে বাজী লড়ালড়ি সুরু হোল। আর কিপটের যাশু ভদ্রলোক। প্রায়ই তাঁকে বাজারে মাছওয়ালা, তরকারীওয়ালাদের সঙ্গে তারস্বরে ঝগড়া করতে দেখা যেতো। "মগের মুল্লুক পেয়েচো! ১২ আনা সের। তার থেকে আমার গলাটা কেটে নাওনা!" প্রায় আধঘণ্টা ঝগড়াঝাঁটি, দরাদরি করে তিনি হয়তো কিনতেন একছটাক মাছ। লোকে ভাবতো লোকটা খায় কি? তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার এইটুকু মাছে হবে কি?

তারপরদিন হরবাবুর বাড়ীর সামনে এলো এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী। হরবাবুকে বলল—"কিছু টাকা কামাবার ইচ্ছে আছে? যা দেবে তার ডবল পাবে—একশো দিলে ছ'শো, ছুশো দিলে চারশো।" লোভে জ্বলজ্বল করে উঠলো হরবাবুর চোখ ছুটি—"কিন্তু বাবা আমার সামনেই হবে তো?" "নিশ্চয়ই,

রাত তিনটের সময় টাকা নিয়ে বুড়ো বটতলায় এসো।” গেলেন হরবাবু একশো টাকা নিয়ে। সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ তুকতাক করলেন তারপর হরবাবুকে বললেন—“চোখ বোঁজ।” তারপর হরবাবুর হাতে গুঁজে দিলেন ছুটো একশো টাকার নোট। হরবাবু আহ্লাদে আটখানা। সন্ন্যাসী বললেন—“ইচ্ছে হলে আবার এসো।” হরবাবুর মাথায় তখন ভুত চেপে গেছে। পরদিন গেলেন তিনি ৫০০ টাকা নিয়ে। আবার সেই তুকতাক। আবার চোখ বোঁজা। আজ কিন্তু হরবাবু চোখ বুঁজে আছেন তো আছেনই। শেষে নিজে থেকেই চোখ খুললেন হরবাবু। সব ভোঁভা। সন্ন্যাসীর টিকিটিরও পাত্তা নেই। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন হরবাবু—তারপর ডুকরে কেঁদে উঠলেন। করকরে পাঁচশো টাকা! তারপর তিনচারদিন সেই চির পরিচিত কম্ফটার আর ওভার কোটটি রাস্তায় দেখা গেলনা। শোনা গেল হরবাবুর শরীর খারাপ। ছুটির শেষ দিন। কালই সব ফিরবে যে যার কর্ম্মস্থলে। একটা বিরাট পার্টির আয়োজন হয়েছে। সবাই দল বেঁধে গেল হরবাবুকে নিয়ে আসতে। কিছুতেই আসবেননা তারাও নাছোড়বান্দা। শেষে চাঁদা দিতে [illegible]না শুনে আসতে রাজী হলেন। পার্টির আরম্ভেই বিনয় উঠে দাঁড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে বলল—“আজকের এ পার্টিটি হরবাবুর সম্মানে—ওঁকে আমরা একটা প্রাইজ দেব।” তারপর হরবাবুর হাতে দিল একটা প্যাকেট। প্যাকেটটি খুলে হরবাবুর চক্ষুস্থির। ৩৯০ টাকার নোট, একটা দাড়ী, একটা পরচুলো সুন্দর করে সাজানো। আনন্দে হরবাবুর ছুচোখে জল এসে গেল। বিনয় বলল—“আপনার ১০ টাকা আমরা এই পার্টির জন্যে আজ খরচ করেছি। আর প্রথমবারে আপনাকে যে ১০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটা আমরা কেটে নিয়েছি।” “বেশ করেছো, বেশ করেছো।” হরবাবু আনন্দে আর কথা বলতে পারছেননা। বিনয় বলল—“হরবাবু, আপনার সঙ্গে এই আমাদের শেষ দেখা। আমি সবাইয়ের মুখপাত্র হয়ে আপনাকে ছু একটি কথা বলব। সবসময়ে খাবার দাবারে পয়সা বাঁচাবেননা। তাতে আপনার নিজেরই ক্ষতি হবে। আপনি বাজারের সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিষ সস্তায় কিনে ভাবেন খুব জিতে গেলেন। কিন্তু খুব ভুল ধারণা সেটা। আপনি বাজারের আজেবাজে খোলা বনস্পতি কিনবেননা। সেদিন বলতে গিয়ে তো আপনার কাছে ধমক খেয়েছিলাম।” এবার হরবাবু মুখ খুললেন—“আমি তো আজেবাজে বনস্পতি কিনিনা, আমি কিনি ‘ডালডা’। ‘ডালডায়’ ভিটামিন ‘এ’ আর ‘ডি’ আছে আর ‘ডালডা’ তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল।” বিনয় বলল—“হ্যাঁ, ‘ডালডা’ স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কিন্তু খোলা অবস্থায় ‘ডালডা’ কখনও কিনতে পাওয়া যায়না। ‘ডালডা’ পাওয়া যায় একমাত্র হলদে শীলকরা টিনে যার ওপর খেজুর গাছের ছবি আছে। ‘ডালডা’ সম্বন্ধে এই কথাটি জানা থাকলেই আপনাকে আর ঠকতে হবেনা।” সেদিনকার পার্টিতে হরবাবুর বেশ ভালমত শিক্ষা হয়েছিল বৈকী।

DL. 441B-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

এর পর যখনই বিনয়কুমার সরকার আমাদের বাড়িতে আসতেন, নানা তাঁর কথামত আমাকে ডেকে পাঠাতেন।

কিছুদিন পরেই টাউন হলে রবীন্দ্র-সম্বর্ধনা। সে কী উত্তেজনা, কী বিপুল উৎসাহ! জনগণের মুখে আনন্দের ঢেউ খেলে যায়, রামেন্দ্রসুন্দরের তো কথাই নেই।

টাউন হলে ন স্থানং তিলধারণং। গণ্যমান্য পণ্ডিতবর্গ এসে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যথাসময়ে এলেন। রামেন্দ্রসুন্দর আমাকে এগিয়ে দিতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছেই আমাকে বসালেন। সেই সভায় যোগদানকারী অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। যে কিশোর সেদিন তাঁর অদূরে বসে ছিল, সে আমি।

অনেকে লিখিত বক্তৃতা, কেউ বা কবিতা পাঠ করলেন। পরিষদের পক্ষ হতে সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর পুরাকালের তালপাতার পুঁথির মত দেখতে লাল অক্ষরে খোদাই করা হাতীর দাঁতের পুঁথি খুলে পড়তে শুরু করে দিলেন। তাঁর সমস্ত প্রাণ, জীবনের সমস্ত আবেগ আজ যেন তাঁর কণ্ঠে খেলা করে যায়।

তারপর উঠলেন নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কী চমৎকার বক্তৃতা দিলেন। ভাষাও যেমন সুন্দর, কণ্ঠেও ছিল এক মধুর সঙ্গীত। এত ভাল লাগছিল তাঁর ভাষণ যে, আমি তন্ময় হয়ে গেলাম।

রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাঁর দিকে চাইছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর যেন সমস্ত টাউন হলকে মাতিয়ে দিয়েছে। সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথ সুললিত ভাষায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব কণ্ঠে সমবেত নরনারীদের চিত্ত অভিষিক্ত করে দিলেন—কী সুন্দর ভাষার গাঁথনি দিয়ে মর্মস্পর্শী ভাবের সংমিশ্রণে শুরু হল তাঁর উচ্ছল ভাষণ! সুরের কাঁপনে যেন আজ সবাইকে মাতাল করে তুলেছে। সেদিনের কথা জীবনে ভোলবার নয়। যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই জানেন, কোন্ ঐন্দ্রজালিক শক্তি নেমে এসে সবাইকে যেন মুগ্ধ করে দিয়ে গেল, প্রাণে কে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে সবাইকে জাগিয়ে তুলল।

সমস্ত হল-ঘর গমগম করছে, অনুষ্ঠানের কার্যগুলি একে একে সুসম্পন্ন হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। রামেন্দ্রসুন্দর আজ অনেক পরিচিত জ্ঞানী গুণীকে একসঙ্গে পেয়েছেন। বেরিয়ে আসবার পথে এখানে সেখানে তাঁর স্টেশন, এঁর-ওঁর সঙ্গে কথা বলেন; দু পা এগিয়ে যান আবার থামেন। সভা ভঙ্গ হলেও জের কাটতে চায় না। এই ভাবে টাউন হল থেকে বেরিয়ে আসতে নানার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম।

আসবার পথে নানার কাছে এক কপি ছাপানো অভিনন্দন-পত্র চেয়ে নিয়ে নানার পঠনভঙ্গির হুবহু রেকর্ড বাজিয়ে দিলাম।

রামেন্দ্রসুন্দর উচ্ছল হাস্যে বললেন, বাঃ, তা হ— তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেই তো বেশ হত!

...লেন।

...ও তের্মা

নদীতে ভোর

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

সারারাত শিশিরের গান শুনে শুনে
যে নদীটি কিছু আগে ঘুম ভেঙে প্রথম তাকাল,
তার চোখে এ আকাশ, মাঠ-বন, প্রত্যূষের আলো,
দু পারের বালুচর, বনঝাঁউ, খেয়াঘাট, সব—
বিস্ময়ের ছায়া-ঘেরা যেন এক গানের উৎসব।

এ ধারে পশ্চিমকোণে রজনীর ভগ্নাংশ ভাসে
দিগন্তের চিত্রপটে জলে স্থলে ফসলে ও ঘাসে,
বহুদূরে দেখা যায় গ্রাম ঘর নারিকেলবন
অন্ধকার চোখে নিয়ে শেষরাতে ঘুমায় এখন।

অথচ এপারে বাজে সকালের প্রথম প্রকাশ—
সমস্ত আকাশ ঘিরে আলোকের জলের আভাস।

এক ধারে আলো আর এক ধারে শেষ অন্ধকার
পৃথিবীর এত রূপ ভরে গেছে দু চোখে আমার
নদীপথে যেতে যেতে! এ মুহূর্তে ভাল লাগে সব,
মাটি জলে বেঁচে আছি তাই যেন পরম গৌরব।

গেঁয়োখালি এসে গেল, বেলা বাড়ে এখন নদীতে,
মাঝি দুটি দাঁড় ফেলে, দূর পথ হবে পাড়ি দিতে।

শাহজীর দীঘি

সুভাষ সমাজদার

রামকৃষ্ণপুরের গেরুয়া-রাঙা ধুলোয় আচ্ছন্ন রাস্তার ধারে দিগ্‌ বিকীর্ণ একটা দীঘি, আজও জলের ঐশ্বর্যে টলমল করছে। গঙ্গারামপুর-রামকৃষ্ণপুরের মাটিতেই রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে আছে এই সুবিস্তীর্ণ দীঘির এক বেদনাভিষিক্ত কাহিনী। শত শত বছর আগের এক ঘটনার স্মৃতি এই অঞ্চলের কৃষকবধূর কণ্ঠে আজও কিছুক্ষণের জন্য মুখর হয়ে ওঠে। তাদের মৃদু করুণ গানের মূর্ছনায় মন ভেসে যায় বহু বছরের ওপারে যখন এই বরেন্দ্রভূমির স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের ওপরে সুলতান গিয়াসুদ্দিনের তলোয়ারের আঘাত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, যখন বৈদেশিক মশালের লেলিহান আগুন জ্বলে উঠেছিল পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে মহাস্থান, মহাস্থান থেকে তাম্রলিপ্তের সমুদ্রতট পর্যন্ত। গিয়াসুদ্দিনের মনে শুধু রাজ্যবিস্তারেরই লোলুপ উল্লাস ছিল না; বিচক্ষণ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নরপতি বলে ইতিহাস তাঁকে মর্যাদা দিয়েছিল। তিনি তলোয়ারের বিভীষিকার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ইসলাম ধর্মের প্রচারক বহু মুস্লিম পীর-সাধু। অতীতের কঙ্কালাস্তীর্ণ মহাশ্মশান এই ধলদীঘি গঙ্গারামপুরের মাটিতেই ঘনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন পীর-সাধুদের মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। দেবকোট

গঙ্গারামপুরের এক মাইল দক্ষিণে বর্তমান দমদমা

সুলতান গিয়াসুদ্দিন নিজের নামে মুদ্রা প্রচার

.ছলেন। পুনর্ভবা নদীর তীরে অধুনা বাস্তুত্যাগীদের কলরোলমুখর জনপদ দমদমাতেই ছিল সেই প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রথম টাকশাল। যে একলাক্ষী মসজিদের উচ্চ চূড়া থেকে পীর-ফকিরদের প্রভাতী আজানের ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ত, সেই মসজিদই বাংলার প্রথম মসজিদ। সুলতান গিয়াসুদ্দিনের সঙ্গে আরও অনেক পীর-মোল্লার মতই গাজী শাহ আতাউল্লা নামে একজন নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রচারক এসেছিল। শাহজীর দুরায়ত কপালে, উজ্জ্বল চোখের মণিতে জ্ঞানতপস্বীর এক দৃপ্ত জ্যোতি ঝকমক করত। বয়সে তরুণ এই গাজীর দৃঢ়নৈষ্টিক শান্ত শুদ্ধ জীবনধারার জন্যই জনসাধারণ, এমন কি সুলতান পর্যন্ত, তাঁর প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে থাকতেন। গিয়াসুদ্দিন তাঁকে বলেছিলেন, মানুষের মন জয় করতে না পারলে রাজ্যজয় নিরর্থক হয়ে যায়। শাহজী, আপনি ইসলামের মহৎ ও উদার বাণী বরেন্দ্রভূমিতে ছড়িয়ে দিন।

শেষ রাতের আকাশে যখন শেষ তারকা নিবে গিয়ে ভোরের আভাস রঙিন হয়ে ওঠে, তখন মসজিদের প্রাঙ্গণে দারিদ্র্যজীর্ণ, ব্রাত্য হিন্দু নরনারীরা দলে দলে এসে জমা হয়। মসজিদের উচ্চ শীর্ষ থেকে গানের মত মিষ্টি সুরে শাহজী তাদের বলেন, শোন ভাইসব, হজরত মহম্মদ আল্লাহ প্রেরিত রসুল। তিনিই বলেছেন—পরমেশ্বর বা আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য দেবতা নেই, থাকতে পারে না। তোমাদের ওই মূর্তিপুজো ইসলাম ধর্মে নিষেধ। ওতে আল্লাহ অর্থাৎ সেই এক ও অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান পুরুষের প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগ থাকে না। ব্রাহ্মণ পুরোহিত দীননাথ আচার্যের কন্যা চিত্রাণী দূরে তরল অন্ধকার-ঘেরা পুনর্ভবার তীরে জল আনতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কান পেতে শোনে শাহজীর মধুর কণ্ঠের সুললিত প্রাঞ্জল ভাষণ। তার মনে হয়, কমনীয়কান্তি তরুণ শাহজীর তপঃক্লিষ্ট শীর্ণ মূর্তির চারিদিকে ভোরের আলো একটা জ্যোতিঃশিখার মত ফুটে আছে। বিপুল খ্যাতির গৌরবে মহিমময় এই গাজী বয়সে এত নবীন! বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় তার কজ্জলিত আয়ত দুটো চোখের দৃষ্টি অগাধ হয়ে ওঠে।

বরেন্দ্রভূমির পল্লীতে জনপদে নগরের পথে পথে মাতলা একটা বাতাসের মত ঘুরে বিজিত বিপন্ন দরিদ্র হিন্দুদের ভীত আশঙ্কিত মনে নতুন একটা স্বপ্নের উল্লাসও জাগিয়ে দিল শাহ আতাউল্লা। ঘোষণা করল, সুলতান গিয়াসুদ্দিন প্রজাবৎসল নরপতি। তোমরা সবাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে অন্নবস্ত্রের অভাব তোমাদের থাকবে না। দারিদ্র্য-জীর্ণ অন্ত্যজ হিন্দুদের মনে উল্লাসের ঝিকিমিকি লাগল।

বাংলা দেশের প্রাচীনতম মৃত্তিকা এই বরেন্দ্রভূমির যে মাটি জৈন তীর্থঙ্কর ভদ্রবাহুর পদচ্ছায়ায়, সংস্থবির মণিভদ্রের উদার কণ্ঠে উচ্চারিত ত্রিপিটকের বাণীতে,

বেদের পবিত্র গম্ভীর মন্ত্রের ধ্বনিতে একদা মুখরিত হয়ে উঠেছিল, সেই দেশেরই দুঃখী ব্রাত্য হিন্দু মেয়েপুরুষরা কোরান স্পর্শ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। শাহ আতাউল্লার রক্তে রক্তে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। কিন্তু—

কিন্তু একদিন শাহজীর প্রবীণ সহকর্মী পীর শাহ বাহাউদ্দীন বিরক্তিতে জ্বলে পুড়ে বলল, শুনেছ আতাউল্লা, রামকৃষ্ণপুরের এক দরিদ্র পুরোহিত দীননাথ আচার্য আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছে। রোজ সন্ধ্যায় তার বাড়িতে সভা বসছে। তার শিষ্যরা নাকি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করছে! কী! এত মহৎ ও উদার ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার! শাহ আতাউল্লার প্রশস্ত চোখে আগুন ঝিকিয়ে উঠল।

সন্ধ্যাসূর্যের অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে রামকৃষ্ণপুরের নীল দিগন্তরেখা। দীননাথ আচার্যের দীন ও জীর্ণ কুটিরের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণেরা শঙ্কাব্যাকুল কণ্ঠস্বরে আলোচনা করে—ধর্ম বুঝি আর রক্ষা করা যায় না! বলে বাউলের ত্রিলোচন মুখুজ্জে। দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য বলে, ছোটজাতেরা না হয় খাওয়াপরার লোভে মুসলমান হচ্ছে। কিন্তু মল্লীনাহারের, বাউলের, রামকৃষ্ণপুরের আরও বিশটা গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়েতরা শাহজীর কথায় কিসের আশায় মুসলমান হয়ে যাচ্ছে?

দীননাথ, তুমি একটু উদ্যোগ করে রাশ টেনে না ধরলে আমাদের সবাইকেই মুসলমান হতে হবে।—বলল বটুক ভট্টাচার্য। স্তিমিত কণ্ঠস্বরে দীননাথ বলল, এই সত্তর বছর বয়সে ওসব হাঙ্গামায় আর জড়িয়ো না ভাই। আমার দেহে প্রাণ থাকতে মুসলমান ওরা আমাকে করতে পারবে না।—একটু থেমে বাইরে অন্ধকার প্রাঙ্গণের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ওই অনূঢ়া কন্যাটি সৎপাত্রে দিতে পারলেই আমি গঙ্গাতীরে যাত্রা করতাম।

ওদিকে দ্রুততম পদক্ষেপে শাহজী দীননাথের কুটিরের দিকে আসছে। তীব্র অস্বস্তিতে দাবদাহের মত জ্বলছে তার মন। দরিদ্র পুরোহিত দীননাথ আচার্যের এত বড় স্পর্ধা! ও কি জানে না, ইসলাম ধর্মের শান্ত সুললিত বাণীর শুভ্র আবরণের তলায় তীক্ষ্ণধার খড়্গের মত ভয়ঙ্কর রাজশক্তি লুকিয়ে আছে! দীননাথের কুটিরের পার্শ্বে তরুরাজির নীচে এসে দাঁড়াতেই গানের মত মধুর স্বরে কে যেন বলে উঠল, কে ওখানে? ধূপছায়া-সন্ধ্যার অন্ধকার যেন বিদ্যুতের উগ্র সাদা আলোয় ঝলসে উঠল। শাহজী অপলক নয়নে দেখলেন, বিজুরীরেখার মতই দেহ-বল্লরী, অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত এক নারীর চোখে প্রশ্ন ঘনিয়েছে। শাহজী বিনম্র কণ্ঠে বলল, আমার নাম শাহ আতাউল্লা। আমি আচার্যের দর্শনপ্রার্থী।

শাহ আতাউল্লা! চিত্রাণীর রক্তে রক্তে বিচিত্র একটা আনন্দের নূপুর বেজে উঠল। রক্তপ্রবালের মত অধরে ঝিকিমিকি হাসির দ্যুতি জাগিয়ে সে বলল, ওই বকুলগাছের নীচে বাঁধানো বেদীতে একটু বসুন ফকির সাহেব। বাবা ব্যস্ত আছেন।

যে নিষ্ঠাবান তরুণ পীর ফকিরের নাম অসংখ্য মানুষের চেতনায় জ্বলজ্বল করে, তার কত স্তব্ধ মধ্যরাতের নিভৃত চিন্তার ভেতরে প্রথম সূর্যের সোনার আলোয় আঁকা যার সশ্রদ্ধ ছবিটা এক হয়ে মিশে আছে, সেই শাহ আতাউল্লা এসেছে তার দুয়ারে! হাস্যচপলা চিত্রাণী সমস্ত অবয়বে একটা নৃত্যের ছন্দ খেলিয়ে হঠাৎ একটা গাভীকে টেনে শাহজীর সম্মুখে নিয়ে আসে। তরল পরিহাসের সুরে বলে, ফকির সাহেব, আপনারা তো গরু কাটেন, গোমাংস খান। আচ্ছা, আমার এই ধবলীকে কাটতে হাত উঠবে আপনার?

ধবলী! শাহজীর মনে হল, আশ্চর্য সার্থক নাম। আশ্বিনের আকাশের সাদা মেঘের মতই নরম মসৃণ ... ধবলীর। স্ফীত স্তনভাণ্ডটি অপরূপ লাবণ্য ও ... স্তনবৃন্তগুলোর মুখ থেকে বিন্দু বিন্দু দুধ ঝরছে। ... তার সুডৌল দুটো হাঁটুর ওপরে মাটির ভাঁড় রেখে চাঁপার কলির মত ললিত অঙ্গুলিবিন্যাসে দুধ দোহন করতে শুরু করল।

শাহজী বলল, গোমাংস হিন্দুদের যজ্ঞে উপচার হিসেবে ব্যবহৃত হত দেবী।

ছিঃ ছিঃ, কী বলেন ফকির সাহেব! গাভী ভগবতীতুল্য।

কার সঙ্গে কথা বলছিস রে চিত্রাণী?—অতিথিদের বিদায় জানাতে লাঠিতে ভর করে বাইরে এলেন আচার্য। বটুক-ত্রিলোচনের দলটা শাহজীকে দেখেই ভয়ে আশঙ্কায়

বিবর্ণ হয়ে গেল। সুলতান গিয়াসুদ্দিনের প্রিয়পাত্র, প্রভাবশালী শাহ আতাউল্লা এসেছে দীননাথের কুটিরে! এবার নিশ্চয়ই আচার্যের পালা! তারা নিঃশব্দে সন্ধ্যার অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। দীননাথ বললেন, আমাকে কি কারণে স্মরণ করেছেন ফকির সাহেব?

আপনি হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছেন?

না, মিথ্যা কথা। আমার এই জরাগ্রস্ত দেহ দেখেও কি বুঝতে পারছেন না যে আমি বাড়ির বাইরে যেতে অক্ষম।

দিনের পর দিন গ্রাম-গ্রামান্তরে ধর্মপ্রচারের শ্রমে ক্লান্ত শাহজীর চোখের তারায় বিরক্তির মেঘ ঘনিয়ে আসে। রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলে, তেত্রিশ কোটি দেবতার ষোড়শোপচারে পূজো, আচার-আচরণের অন্ধ গোঁড়ামিতে ভরা হিন্দুধর্মের ভেতরে কী আছে বলতে পারেন আচার্য?

নির্বিকার নিরাকার ব্রহ্মকে ধ্যান করা কঠিন, তাই আমাদের ধর্মে অসংখ্য প্রতীক রয়েছে।

প্রতীক দিয়ে দেবতাকে ভজনা করা আপনাদের দুর্বল মানসিকতার পরিচয় নয় কি?

না ফকির সাহেব। প্রতিটি প্রতীক বা মূর্তির আড়ালে জীবন ও জগতের এক-একটি বিচিত্র তত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে।

বাইরে আবছায়া অন্ধকারে নিজেকে মিশিয়ে একটা [illegible]ির মত দাঁড়িয়ে থাকে চিত্রাণী। শাহজীর মধুর [illegible] চেতনা যেন একটু একটু করে কেমন বিহ্বল [illegible] অনেক আলোচনার পর শাহজী দীননাথকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, আপনার ধর্ম নিয়ে আপনি যেমন খুশী থাকুন। কিন্তু আমার কাজে বাধা দেবেন না। অন্যথায় সুলতানের কোপদৃষ্টি থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারব না।

রাত্রির মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বাইরের প্রাঙ্গণে পা দিয়ে শাহজীর মনে হল, বিদ্যুল্লতার মত সেই হাস্যচপলা মেয়ে হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু—

কিন্তু শাহজী রাস্তার ওপর এসে দাঁড়াতেই চারিদিকের প্রগাঢ় নিস্তব্ধতার ভেতরে চিত্রাণীর কণ্ঠস্বর ঝরনার মত কলকল করে উঠল: আবার আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে ফকির সাহেব?

কেন বলুন তো দেবী? আচার্য আর তো আমাকে আসতে বলেন নি!

আচার্য না বললে বুঝি আসতে নেই?—চিত্রাণীর চোখের কৃষ্ণতারায় অনুযোগ ঘনিয়ে এল।

ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের শুভ্র নিষ্পাপ পুষ্পের মত এই কুমারী তারই জন্য প্রণয়রভসে এত উতলা হয়ে উঠেছে! নিয়মিত কোরান পাঠ আর নামাজ আজানের নির্ভুল চক্রে আবর্তিত ত্রিশ বছরের অন্ধকার অবয়বহীন জীবনটার সম্মুখে আকস্মিকভাবে যেন রামধনুর ঝিলিমিলি ফুটে উঠল। শাহজীর রক্তে রক্তে গুরু গুরু ঝড় ভেঙে পড়ল। মুহূর্তে পুষ্পলতিকার মত সুন্দরী সেই নারীকে বক্ষলগ্ন করার লোলুপ উল্লাসে তার দেহে যেন আগুন ধরে গেল। চিত্রাণীর ব্যাকুল কণ্ঠে অনুনয় ঝরে পড়ল: পুনর্ভবা নদীতে সকালে জল আনতে যাব। আপনি আসবেন ফকির সাহেব।

সর্বনাশা প্রেম, আত্মীয় পরিজন পিতামাতা মুহূর্তে নগণ্য হয়ে যায় তার কাছে। নিষ্ঠাবান পিতার দৃঢ় শাসন, তার সতর্ক দুটো চোখের দৃষ্টিকেও এড়িয়ে চিত্রাণীর মনের রঙিন বাসনাটা সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছিল।

পুনর্ভবার অপর তীরে অস্পষ্ট অরণ্যরেখার ওপরে ভোরের রেখা জাগে। প্রতিদিনই আমলকি-শিমুল তরুরাজির নীচে শান্ত নিভৃত নীলাভ ছায়ান্ধকার দুটি মুগ্ধ তরুণ-তরুণীর অস্ফুট কলগুঞ্জনে ছন্দোসুরভিত হয়ে ওঠে। সেদিন শাহজীর নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চিত্রাণী। প্রশান্ত গম্ভীর কণ্ঠে শাহজী বলল, একটা অসম্ভব স্বপ্ন দেখছ দেবী।

অসম্ভব কেন? তুমি তরুণ রূপবান বলে তোমাকে ভালবাসি নি শাহজী। ধর্মের প্রতি তোমার নিষ্ঠা, তোমার কথায় গভীর জ্ঞানের দীপ্তিই আমাকে উন্মনা করে তুলেছে।

আমার জন্য ধর্ম ত্যাগ করতে পারবে?

তোমার পাশে পাশে থেকে তোমার সাধনার পথে আরও এগিয়ে দেওয়াই হবে আমার সবচেয়ে বড় ধর্ম।

হঠাৎ নদীর ধারে সাঁইঘাসের কোণে চঞ্চলতা জাগল। একটা নিশাচর সরীসৃপের মত অদৃশ্য হয়ে গেল বটুক ভট্টাচার্য—আচার্যের প্রিয়পাত্র।

কিন্তু পিতার রুদ্র ক্রোধ, স্বজনদের তীব্র বাধা কবে কোথায় দুটি প্রণয়াকুল মানব-মানবীর চিরন্তন স্বপ্নকে বিচ্ছেদের রাজ্যে নির্বাসিত করে দিতে পেরেছে? রাত্রির মধ্যযামে সূচীভেদ্য অন্ধকারে চিত্রাণী তার অতি আদরের ধবলীকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল। প্রধান পীর ফকির শাহ আতাউল্লা ব্রাহ্মণকন্যাকে ধর্মান্তরিত করে তাকে সাদী করেছে। এই সংবাদে সুলতান গিয়াসুদ্দিন ও মুসলমান প্রজারা উচ্ছ্বসিত আনন্দে মুখর হয়ে উঠলেন। লজ্জায় ক্ষোভে অপমানে বিক্ষুব্ধ দীননাথের মর্মান্তিক খেদোক্তিতে কী গভীর ব্যথায় চমকে উঠেছিল রামকৃষ্ণপুরের বাতাস আর কেমন করে মৃত্যু এসে সেই হতভাগ্য বৃদ্ধের সব জ্বালা ভুলিয়ে দিয়েছিল সেই করুণ কাহিনী আলকাপ গানে, মেয়েদের ছড়ায় চোখকে অশ্রুসজল করে তোলে।

হয়তো পিতারই নিষ্ঠুর অভিশাপে সুখী হয় নি চিত্রাণী। শাহজীর আদরে ভালবাসায় উচ্ছ্বসিত আনন্দ-টলোমলো কয়েকটা বছর যেন সময়ের পাখায় ভর করে উড়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিস্ময়কর পরিবর্তন হয় শাহজীর। ব্যথিত হৃদয়ে চিত্রাণী লক্ষ্য করে, শাহজী আর ধর্মপ্রচারের জন্য গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যায় না। সেই একনিষ্ঠ সাধকের শুভ্রমূর্তির ওপরে যেন বিষয়-লোলুপ স্থূল সংসারী মানুষের ধূসর রঙ লেগেছে। সুলতানের শ্রদ্ধার উপহার দু শো বিঘা জমিতে ফসল ফলিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় তার মনোযোগ প্রবল হয়ে ওঠে। অযত্নে আর অবহেলায় তার কোরানের পাতায় পাতায় উইপোকা বাসা বাঁধে। প্রভাতী আজানের ধ্বনিও তার কণ্ঠে আজ ব্যাঙের মত শোনায়। চিত্রাণীর মনের নেপথ্যে বিন্দু বিন্দু বিতৃষ্ণা জমে ওঠে। তবে কি তারই জন্য শাহজী সাধনার প্রশান্ত উর্ধ্বলোকে না গিয়ে একটু একটু করে সংসারের পঙ্কে নেমে যাচ্ছে! নিদারুণ একটা যন্ত্রণা যেন শত মুখ দিয়ে তাকে বিদীর্ণ করে। শাহজীর সেই গভীর ধর্মবিশ্বাসের দীপ্তিতে উজ্জ্বল তপস্বীর মত প্রশান্ত রূপটিকেই যে সে ভালবেসেছিল! বিস্তীর্ণ দেশের দিকে দিকে জনগণের মনে তার যে বিপুল খ্যাতির মহিমা নক্ষত্রের আলোর মত জ্বলজ্বল করছিল, তাকেই সে—

চিত্রাণী, বড়মল্লিকপুরের উত্তরপাড়ের জমিটা আজ কিনলাম। কবালাটা তোমার নামেই করব। চিনিসক্কর ধানের জমি।—বিগলিত হয়ে উঠল শাহ আতাউল্লা। চিত্রাণীর দূরায়ত চোখের তারায় ঘৃণার আগুন জ্বলে উঠল। বলল, আমি জানতে চাই, তুমি আর কোরান পড় না কেন? কেন ধর্মপ্রচারে যাও না?

নিশ্চয় যাব চিত্রাণী। কাচলার জমিতে কৃষানরা বীজধান ফেলছে। সামনে না থাকলে ওরা ফাঁকি দেয়।

সেই দিনই অঘটনটা ঘটে গেল। বিকেলে শাহজীর রাখালটা মাঠ থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে বলল, ধবলী সোনাডাঙার জমির পাশে নালায় পড়ে গেছে। কেমন যেন করছে।

ধবলী যে গর্ভিণী। মুহূর্তে থর থর করে কেঁপে উঠল চিত্রাণী। উত্তেজনায় ভয়ে একটা বদ্ধ উন্মাদিনীর মত চিৎকার করে বলল, আমার ধবলীর কিছু হলে আমি পাগল হয়ে যাব। বাতাসে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে একটা উন্মত্ত ঝড়ের মত সে সোনাডাঙার মাঠের দিকে ছুটে চলল।

আমি যাচ্ছি চিত্রাণী। তুমি বাড়িতে থাক। শাহজীর ব্যাকুল বিব্রত কণ্ঠস্বর তালপুকুরের উঁচু পাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। প্রচ্ছন্ন একটা অপরাধবোধে তার বিবেক আর্তনাদ করে উঠল। সোনাডাঙার জমিতে তালপুকুর থেকে জল নিয়ে আসার জন্য সেই তো নালা কেটেছিল। চিত্রাণীর বড় আদরের, তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় পূর্ণগর্ভা ধবলীর অপঘাত মৃত্যু হল।

দিন কাটে। চিত্রাণীর জীবনের সব [illegible] লেন। [illegible] ও তেমনি যেন এক আকস্মিক আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেছে [illegible] সঙ্গে কথা বলে না। তার দিকে তাকায় না পর্যন্ত! চিত্রা[illegible] শবের মত বিচিত্র শীতল দৃষ্টি শাহজীর কেমন অমানুষিক মনে হয়, তার চোখে আশঙ্কার ছায়া নামে, তবে কি ধবলীর শোকে পাগল হয়ে গেছে চিত্রাণী!

না, উন্মাদ হয় নি চিত্রাণী। কিন্তু যে দুর্বার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে সে স্বজাতি পরিজন এমন কি স্বধর্ম পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছিল, সেই সর্বনাশা প্রেমের জন্যই তীব্র একটা গ্লানির অপচ্ছায়া তার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। প্রেম, প্রণয় ও অনুরাগের এই পৃথিবীটাকে তার অসহ বলে মনে হয়। তার কানে ভেসে আসে বহুদূরাগত দৈববাণীর মত আচার্যের কণ্ঠস্বর: গৃহস্থের কোন ভয়ঙ্কর

পাপের ফলেই গর্ভিণী গাভীর অপঘাত মৃত্যু হয়; প্রায়শ্চিত্ত না করলে গোরু—মা ভগবতীর আত্মার শান্তি হবে না। পাপ! হ্যাঁ, তারই পাপের জন্য ধবলী মরেছে। তীক্ষ্ণ একটা গ্লানিতে আত্মঘাতের প্রেরণায় ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় বুকের ভেতরটা। একদিন শাহজীকে বিস্মিত করে দিয়ে চিত্রাণী বলল, দেখ, ধবলীর জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি। তোমাকে বিয়ে করে মুসলমান হয়েছি। নারায়ণ-পূজা কি ব্রাহ্মণ-ভোজন তো করাতে পারব না—

কান্নার প্রতিভাসে তার মুখখানা থমথম করে উঠল। আবার ম্লানচোখে এক বিচিত্র উদাসীন দৃষ্টি ফুটিয়ে যেন স্বপ্নের ঘোরে বিড়বিড় করে বলল, জান, রাতে ঘুম হয় না। শুধু বাবার মুখ ধবলীর কালো চোখ দুটো সব মিলিয়ে আমাদের গৃহবিগ্রহ মহাদেবের উজ্জ্বল প্রদীপ্ত বিশাল মুখখানা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কী করলে তুমি শান্তি পাবে চিত্রাণী?

জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ধবলী যেখানে মরেছে, সেইখানে একটা দীঘি খুঁড়ে দাও।

দীঘি!—জমি-ক্ষেত-খামারিতে আসক্ত শাহজীর চোখে একটা রঙিন স্বপ্নের উল্লাস ছটফট করে উঠল। সোনাডাঙার পাথারের পাশে ধবলী যেখানে মরেছে সেইখানে দীঘি খুঁড়লে, সেই জল নালা কেটে দক্ষিণপাথার পার ভুঁতকুঁড়ির আমন ধানের জমিতে নিয়ে যাওয়া যাবে।

কী ভাবছ?—চিত্রাণীর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণধার বর্শার মত শাহজীর চিন্তার রেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিল। শাহজী বলল, হ্যাঁ, দীঘি খুঁড়ে দেব চিত্রাণী।

বরেন্দ্রভূমির গৈরিক মাটিতে বৈশাখের খরদীপ্ত দুপুরের রোদ দাউ দাউ করে জ্বলছে। যতদূর চোখ যায় দিগন্তলোক পর্যন্ত ধূ-ধূ একটা ধূমাচ্ছন্ন ধূসরতা। কঠিন মাটিতে শাবল-গাঁইতির ঘা পড়ে ঝনঝনিয়ে। অসংখ্য সাঁওতাল-ওঁরাও মজুরদের কালো শরীর থেকে অনেক রক্ত-জল-করা সাদা ঘাম শুষে নিয়ে দীঘি খোঁড়ার কাজ শেষ হল তিন মাস পরে। কিন্তু—

কিন্তু সেই বিশাল দীঘির নীলাভ ছায়াঘেরা অন্ধকার গর্ভে রূপালী জলের কোন ইশারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল না। চিত্রাণীর ব্যথাপাণ্ডুর চোখে চাপা কান্না থমকে থাকে। পাপ! পাপ! অমন শুদ্ধাচারী পুণ্যবান স্নেহবৎসল পিতার মনে নিদারুণ যাতনা দেওয়ার পাপ! এক রঙিন বিভ্রান্তিতে স্বজন স্বধর্ম পরিত্যাগের পাপেই এত গভীর দীঘির বুকও অভিশপ্ত শূন্যতায় খাঁ-খাঁ করছে। শাহজী বলল, তিন মাস ধরে কুলকামিনদের মজুরি দিতে দিতে তো ফতুর হয়ে গেলাম। আর খুঁড়ে কী হবে চিত্রাণী?

না, খুঁড়তেই হবে। অর্থসম্পদের ওপরে লোভ নিষ্ঠাবান মুস্লিমের কাছে পাপ। টাকা না জমিয়ে পরকালের চিন্তা কর।—আগুন ঝরে চিত্রাণীর চোখে।

ঝাঁ-ঝাঁ করে নিশিরাত। দীঘির গভীর তলদেশে ধাপে ধাপে নেমে যায় চিত্রাণী। মাথার ওপরে ঝকঝকে আকাশের অজস্র অগণন তারার আলোয় দীঘির ভেতরের ঘন থকথকে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। চিত্রাণীর কানের কাছে যেন অনেকদূর থেকে বেদনার মন্থর ডানায় ভর করে ভেসে আসে পিতার কণ্ঠস্বর: কুনাল জাতকে আছে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মনে দেবত্ব জাগিয়ে দেবে। জন্মের পর জন্মের বিবর্তনে তারা পরস্পরকে ঈশ্বরের দিকে পৌঁছতে সাহায্য করবে। কিন্তু শাহজীর মনে সে তো দেবত্ব জাগাতে পারে নি। তারই নিমিত্ত শাহজীর মনে বিষয়সম্পদের জন্য উগ্র লোভের আগুন জ্বলে উঠেছে। আজান-নামাজ আর কোরানের পবিত্র বাণী উচ্চারিত সেই পুণ্যের পরিবেশে ঘেরা একলাঙ্গী মসজিদের উচ্চচূড়া থেকে সে-ই ফকির শাহজীকে লোভের আর স্বার্থের এই সংকীর্ণ সংসারের পাঁকে নামিয়ে এনেছে!

না, আর সে ভাবতে পারে না। শ্মশানের মত নির্জন ভয়াবহ সেই দীঘির মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে তার পিতারই বিদেহী সত্তাটি যেন তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরল। উল্কা-ঝরা রাতের আকাশের দিকে হাত দুটো প্রসারিত করে কী যেন বিড় বিড় করে বলল চিত্রাণী, তারপরেই বদ্ধ উন্মাদের মত দীঘির গায়ে শক্ত লাল মাটিতে মাথা ঠুকে ঠুকে কপালটা রক্তাক্ত করে ফেলল। ঠিক সেই সময় দীঘির যে অংশটা খুঁড়ে খুঁড়ে গভীরতম করা হয়েছিল, সেইখানে সোঁ-সোঁ শব্দের রেশ বেজে উঠল। ধরণীর উদ্গত অশ্রুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে বিপুল বেগে জল উঠছে। উত্তেজিত বিক্ষুব্ধ চিত্রাণীর মনে বিচিত্র একটা অনুভূতি নিষ্ঠুর আনন্দের কলরোল তুলল। আসুক জল। তাকে

ভাসিয়ে নিয়ে যাক। তলিয়ে নিয়ে যাক। তার ইহজীবনের সমস্ত পাপের পুঞ্জীভূত ক্লেদ-পঙ্কিলতার জ্বালা সে জুড়বে এই দীঘিরই জলে। তারপর—

তারপর সর্বসাক্ষী আকাশে সূর্য উঠল। সোনার আলো বুকে নিয়ে ঝলমল করতে লাগল দিগ্‌বিকীর্ণ দীঘির কাজল-কালো জল। গ্রামের লোক সবিস্ময়ে দেখল, শাহজীর বিবির দেহ দীঘির জলে ভাসছে। আর শাহজীর কী হল ?

হ্যাঁ। কিংবদন্তী সে কথাও বলে। চিত্রাণীর মৃতদেহের দিকে কয়েকমুহূর্ত স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে টলতে টলতে বাড়িতে ফিরে এল শাহজী। মুহূর্তে ধানের গোলা, বাগান পুকুর জমি, বিশাল প্রাসাদের মত বাড়িতে থরে থরে সাজানো সব ঐশ্বর্যের বৈভব নিরর্থক শূন্যতায় পর্যবসিত হয়ে গেল। শাহজীর বাড়ির চারিদিকে ঘন হয়ে রাত্রি নামল। তাঁর মনে হল, সে যেন জগৎব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকারে বেহেস্তের সিংহদ্বারের সম্মুখে এক নিষ্করুণ মৃত্যু-অসহায়তার ভেতরে বসে আছে। ঘুম আসে না শাহজীর চোখে। দূরে শৃগালের ডাকে রাত্রির মধ্যযাম ঘোষিত হল। শাহজী স্পষ্ট দেখল, তার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে চিত্রাণী। পরনে একটা আটপৌরে শাড়ি। হাতে গলায় কোথাও কোন অলঙ্কার নেই। সম্পূর্ণ নিরাভরণ সেই সুডৌল তন্বী দেহ রিক্ততার সৌন্দর্যে যেন প্রদীপ্ত জ্যোতি বিকীর্ণ করছে। চিত্রাণী তার ঘনপক্ষ্ম চোখের তারায় ধিক্কারের আগুন জ্বালিয়ে বলল, বিষয়-সম্পদের পঙ্কিল পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এস। তোমার সেই পুরনো নিঃস্ব রিক্ত ধর্মপ্রচারকের জীবনের ভেতরে ফিরে যাও—

চিত্রাণী !—রাত্রির নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ করে চারিদিক কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল শাহজী। ঘুম ভেঙে সে দেখল, ঘুমন্ত অবস্থায় গড়িয়ে খাটের নীচে পড়ে গেছে। কোথায় চিত্রাণী ! বাইরে গভীর শোকের মত অবিরল ধারায় শ্রাবণের বৃষ্টি ঝরছে। শাহজীর মনে হল, বিক্ষুব্ধ অশান্ত এই রাত্রিটা যেন সহস্র তর্জনী তুলে শাসিয়ে বলছে—এই মুহূর্তে সব ঐশ্বর্য দীঘির জলে বিসর্জন দিয়ে গৃহত্যাগ না করলে, চারিদিকের এই দুর্যোগ-ভরা গর্জিত রাতের অন্ধকার থেকে এখুনি নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে তোমাকে গ্রাস করবে।

পরদিন রামকৃষ্ণপুরের লোক তীব্র বিস্ময়ের আঘাতে চমকে উঠল। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল দীঘির পাড়। যে সিন্দুকে শাহজী টাকাপয়সা, জমির দলিল-দস্তাবেজ রাখত, সেটা খোলা পড়ে আছে। বাড়ির প্রতিটি ঘর হাট করে খোলা। মূল্যবান আসবাব-সামগ্রীও অন্তর্হিত। হ্যাঁ, চিত্রাণীর মর্মদাহ সার্থকতার জয়মাল্য পেয়েছিল। শাহজী তার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি দীঘির জলে বিসর্জন দিয়ে উষাগড়ের কাছে আতাপুর গ্রামে চলে যায়। ভূগর্ভের অভ্যন্তরে এক মসজিদে নিরম্বু উপাসনায় রত হতেই আবার তার খ্যাতি দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ভোগবিরতা পুণ্যশ্রী তাপসিনীর মত যে কন্যা নিজে দুঃখ পেয়ে, মৃত্যু বরণ করে সাধনার পথে তাকে এগিয়ে দিয়ে আবার গৌরবের মুকুট পরিয়েছিল—তার স্মৃতি আজও বরেন্দ্রভূমির পল্লীতে জনপদে কৃষাণদের আলকাপে, বৈষ্ণব বাউলদের গানে জীবন্ত হয়ে আছে।

এই অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস, দীঘির জলের নীচে শাহজীর রাশি রাশি সোনার মোহর-ভরা কলসী পোঁতা আছে। কিন্তু সম্পদের লোভে উন্মত্ত তীব্র [illegible]লন মানুষও কেন যেন জলে নামতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে[illegible] হয়তো—

হয়তো সে শাহজীর দীঘির কাজল-কালো জলের অস্ফুট মর্মরে, হু-হু হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে সেই পুরোহিত-কন্যার ভুল ভালবাসার তীব্র অনুশোচনায় উতরোল কান্না শুনতে পায়। আর মুহূর্তের জন্য তার মনটা একটা নিবিড় বেদনার উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

আপনার ত্বকও

চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে

LTS. 569-X52 BG

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

নয়

সকালবেলা দল ছাড়ার সময় ওয়াং ডাক বোধ হয় ভাবতেই পারে নি যে আমাদের সঙ্গে আবার তার দেখা হবে এ যাত্রায়। ভেবেছিল সুমু আওমার আর তো পেছুটান রইল না, সে এগিয়েই যাবে, আর তার জন্যে ওয়াং ডাককেও এগিয়ে চলতে হবে। আমাদের তাঁবু ফেলবার খুটখাট শব্দে লোকটা তাঁবুর বাইরে এল। প্রথমটায় মনে হল, সে বোধ হয় তার নিজের চোখ দুটোকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। সেই হকচকিয়ে যাওয়া ভাবটা কেটে যেতেই ছুটে এসে ছেরিং পেনছোকে জড়িয়ে ধরল। এমন হৃদ্যতা তাদের আগে কখনও লক্ষ্য করি নি।

লামা বললেন: নতুন ভাব। কাল দুপুরে তাদের মনের মিল হয়েছে।

বললুম: কাল তো এদের দেখতেই পাই নি সারাদিন।

লামা বললেন: ওয়াং ডাকের তাঁবুতে সারাদিন গুজগুজ করেছে দুই মক্কেল। যতদিন আমি একা ছিলুম, ওয়াং ডাকের দুঃখ কেউ বোঝে নি। তুমি এসে এদের মনের মিল করালে।

বললুম: সে কি!

লামা বললেন: নিমার বড় স্বামী খাঁটি বস্তুবাদী লোক, ব্যবসা করতে বেরিয়ে নিছক প্রেম প্রীতি সহানুভূতির জন্যে বছরের মূল্যবান সময়টা তো নষ্ট করতে পারে না। তাই 'সবাই জাহান্নামে যাও' বলে গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে গিয়ে টাকা লুটছে। এটি তার সেজ ভাই। বড় ভাই যখন ভর্ৎসনা শুরু করে, এ তখন বউয়ের আঁচলের তলায় ঢুকে আশ্রয় খোঁজে। সেই বউ কিনা তাকে তার প্রাপ্য না দিয়ে একটা বিদেশীকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তারই চোখের সামনে! এইখানে তাদের মনের মিল।

এবারে একটু গম্ভীর হয়ে লামা বললেন: কাল [illegible]লেন। আমাদের শেষ হয়ে যাবার কথা ছিল। ওই [illegible]ও তেমনি লামা হঠাৎ এসে না পড়লে, আজ আবার আমাদের [illegible] করে গল্প করার সুযোগ হত না।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: বলেন কি!

লামা বললেন: সত্যিই বলছি। যেমন কর্মক্ষম তেমনি বুদ্ধিমতী এ দেশের মেয়ে। এরা সামান্য অন্যমনস্ক হলে সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এক মুহূর্তে। এদের তাই সাবধান না হয়ে উপায় নেই। শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে, শুধু নিজের চাকর নয়, সুমু আওমা আর ওয়াং ডাকের লোকদেরও সে হাত করে রেখেছে। কোন চক্রান্ত তার কাছে গোপন থাকবে না।

আমার আশ্চর্য হবার পালা শেষ হয় নি। লামা এতে

কৌতুক বোধ করে বললেন : কাল এরা দুজনে স্থির করেছিল, রাতে আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে একসঙ্গে আমাদের দুজনকে শেষ করবে। পায়ে কাঁটা নিয়ে পথ চলায় এদের বিশ্বাস নেই।

শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করলুম : তারপর ?

লামা উত্তর দিলেন হেসে। বললেন : নিমা বিকেল-বেলাতেই খবর পেয়ে গেল। নিজে ডেকে আনল তার স্বামীকে। ছোকরা লামাকে সে আগে থেকেই লক্ষ্য করছিল। তার স্বামীকে বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিল যে সুন্দু আঙমা যদি বিয়ে করে তো সে এই ছোকরা লামাকেই করবে। বুড়ো বয়সে আমাকে টানাটানি করলে আমি যে আত্মহত্যা করব স্থির করেছি, এ কথাও জানিয়ে দিলে। এর পরের ঘটনা তুমি জান। বিষধর সাপের মত ওয়াং ডাক তার তাঁবুর ভেতর গর্জেছে সারারাত। অতগুলো কুকুর ডিঙিয়ে সুন্দু আঙমার তাঁবুর ভেতর ঢোকবার সাহস তার হয় নি। আর এধারে নিমার উষ্ণ বাহুর ভেতর নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে রইল তার সেজ স্বামী।

বন্ধুর সঙ্গে তার প্রাণের আবেগ বিনিময় করে ওয়াং ডাক এল লামার কাছে। জিভ বার করে নীচু হয়ে সম্মান জানাল তার দেশীয় ভঙ্গীতে। আমারও দু হাত ধরে নিঃশব্দে তার সম্ভাষণ জানাল।

কেন জানি না, লোকটাকে আজ আমার ভাল লাগল। হিংসার কথা ভুলে গেলুম। ভুলে গেলুম তার ষড়যন্ত্রের কথা। মনে মনে তার যে রূপ এতদিন, সেই খুনে ডাকাতের রূপ যেন হঠাৎ বদলে গেল। মনে হল, সেই আদিম রিপু তাকে অমানুষ করেছে। লোকটা ভালবাসতে জানে, কিন্তু সেই ভালবাসা আজ প্রেমের সীমানা ছাড়িয়ে তাকে অন্ধ করেছে মোহে। অধিকারের লালসা তার স্থির বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেছে এমন উদগ্রভাবে যে আজ পাপকে পাপ বলে তার মনে হচ্ছে না। তা না হলে ধর্মগুরুর গায়ে হাত তোলার উন্মাদনা পেল কোথা থেকে! এমন শিক্ষা তো এরা কখনও পায় না, লামা-হত্যার নজীর আছে বলে তো আজও শুনি নি। সুখের দিনে যাকে চিনি নি, আজ দুঃখের ভেতর সে লোকটা যেন ধরা দিয়ে গেল। জগতের নিয়মই বুঝি এমনই।

সবাই বোধ হয় আমার মতই ভাবছিল। লামা বললেন : নিমা কী বলছে জান ?

নিজেই উত্তর দিলেন : বলছে, ওয়াং ডাক আমাদের পরিবারভুক্ত হয়ে গেল।

ওয়াং ডাকের চোখ দুটো ছলছল করছিল। বোধ হয় ভাবছে, ও-তাঁবুর ওই মেয়েটা কেন এই পরিবারের হল না।

এরই নাম দৈব। এমনই ছোট ছোট ভুল চাল দিয়ে ভগবান এই পৃথিবীর সমস্ত জীবকে হয়রাণ করে মারছেন। এতেই তাঁর আনন্দ। পৃথিবীটাকে আর একটু সূর্যের মুখে চেপে দিলেই তো একদিনে সব ঝঞ্ঝাট শেষ হয়ে যায়।

আমাদের তাঁবু তখন উঠে গেছে। পাশেরটাতে হাপরের শব্দ পাচ্ছি হুসহাস। ওয়াং ডাক এসে লামার পাশেই বসে পড়ল।

আমি এখানে স্বাধীনভাবে যা করতে পারি, তা চুপ করে থাকা। চুপ করে শুধু এদের দেখা, আর লামা যখন কিছু বলেন তখন তা শোনা। এর বেশী আমার কাছে কেউ আশা করে না। আমারও এর বেশী কিছু আশা করার দাবী নেই।

লামা বললেন : ধৈর্য ধর বন্ধু, বলার মত কথা হলেই তোমাকে আমি বলব।

আমাকে আশ্বাস দিয়ে লামা ওয়াং ডাকের গল্প শুনতে বসলেন। সে দীর্ঘ কাহিনী। আমি শুধু লামার মুখের ভাব লক্ষ্য করতে লাগলুম। কখনও রাগ কখনও দুঃখ কখনও ভয় কখনও ঘৃণা ফুটে উঠছে সে মুখে। আরও অনেক ভাব দেখলুম যার নাম নেই বড় বড়। মাঝে মাঝে আমি সুন্দু আঙমাদেরও দেখছিলুম। ছোকরা লামা তাদের তাঁবুর পেছনে পায়চারি করছিল অস্থিরভাবে। হঠাৎ থেমে পড়ে কী ভাবল খানিকক্ষণ ; তারপর আবার পায়চারি করতে লাগল জোরে জোরে।

তখনও পশ্চিমের আকাশ থেকে অন্ধকার নামে নি। শুধু ওই ধূসর পাহাড়টার ছায়া পড়ে মনে হচ্ছিল, বুঝি দিনের আলো আজকের মত নিবে গেছে। ওয়াং ডাক উঠে দাঁড়িয়েছিল, নিমাদের কী একটা বলে বিদায় নিল।

ভাবলুম, লামা এবারে ওয়াং ডাকের গল্প শোনাবেন। কিন্তু শোনালেন না। নিমাদের কী সব জিজ্ঞেস করতে

লাগলেন। জিজ্ঞাসাবাদ শেষ করে তিনি আমার দিকে ফিরলেন। আমি ওয়াং ডাকের পরিত্যক্ত জায়গাটিতে গিয়ে বসলুম। লামা কথা বলেন বড় আস্তে আস্তে, একান্ত কাছে না বসলে সব কথা শোনা যায় না।

লামা বললেন: লোকটা অশিক্ষিত। বললে, অক্ষর পরিচয় তার হয় নি। কিন্তু কথা বলছিল যে কোন শিক্ষিত দেশের মানুষের মত। বোধ হয় জান, এ দেশের গ্রামাঞ্চলে স্কুল কলেজ নেই। লেখাপড়া একটা মস্ত শৌখিনতা। কারও ছেলের যদি এ ঘোড়ারোগ হয়, তবে তাকে মঠে যেতে হবে লামাদের কাছে। আর লামা হয়ে লেখাপড়া করতে হবে। তারপর ফিরে এসে গৃহী হওয়া যায়, কিন্তু দীর্ঘদিন মঠে থাকবার পর গৃহে ফেরবার বাসনা এদের আর থাকে না। স্বভাবতঃই এরা অলস। ফিরে গেলেই পেটের ভাবনা ভাবতে হবে—এই দুশ্চিন্তা এদের আর ফিরে যাবার উৎসাহ দেয় না। গ্রামাঞ্চলে তাই শিক্ষিত লোক দেখবে না। যাদের দেখবে, তারা ওয়াং ডাকের মতই অশিক্ষিত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এক আদিম যুগের মানুষ। এ দেশের শাসনকর্তারা আইন করে বিদেশীকে আটকে রেখে বর্বরতাকেই ধরে রেখেছে দেশের ভেতর। সভ্যতার সূর্য আজ সারা বিশ্বে আলোকপাত করেছে, সে আলোক এসে এ দেশের রুদ্ধ দরজায় ঠেকে রইল, ভেতরে প্রবেশের রন্ধ্র খুঁজে পেল না।

ওয়াং ডাকের কথা লামাকে স্মরণ করিয়ে দিলুম।

লামা তাঁর গল্পে ফিরে এলেন। বললেন: লোকটাকে আজ আমার সভ্যদেশের মানুষ বলে ভুল হচ্ছিল। শিক্ষা আর সভ্যতা তো এক নয়। আমাদের দেশেও আছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ, যারা আজও কোন শিক্ষা পায় নি। কিন্তু আমরা তাদের অসভ্য বলি না। তাদের রীতিনীতি আচার ব্যবহার সভ্যদেশের মতই। জ্ঞানে নিঃস্ব হলেও মনুষ্যত্বে মহান তারা, বিলাসে অজ্ঞ হলেও উদারতায় উজ্জ্বল তারা। সাদা কাগজে কালো আঁচড় কেটে যে নীতি মানুষে তৈরি করেছে, সে রাজনীতি তারা শেখে নি। তারা জানে মানুষকে ভালবাসার রীতি। জন্মের সময় তাজা রক্তে বুকের পাতায় যে রীতি লিখে দিয়েছেন অদৃশ্য বিধাতা, প্রাণ দিয়ে এরা তার মর্যাদা রক্ষা করে।

লামার আজ অন্য রূপ দেখছি। ঠোঁটের কো থেকে সেই প্রসন্ন হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে গেছে। ব অস্থির দেখাচ্ছে তাঁকে। ভেতরে যে ঝড় বইছে, তাে ঠেকিয়ে রাখতে যেন পারছেন না। এবারে আর বা দিলুম না। চুপ করে তাঁকে বলবার অবকাশ দিলুম।

খানিকক্ষণ থেমে লামা বললেন: ওয়াং ডাক বলছি সুন্থু আওমা ছেলেবেলাতেই তার মাকে হারিয়েছে বড়লোক বাপের একমাত্র মেয়ে বলে বেশ আদ আবদারেই মানুষ হয়েছে এতকাল। মাথাটা বিগড়েছে খানিকটা। মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধে তার বাপেরই বে বেশী দায়িত্ব, কিন্তু তিনি ভাবছেন নিজের স্বার্থ আ পদমর্যাদার কথা। গ্রামের পিতৃমাতৃহীন বাউণ্ডুলে ছে ওয়াং ডাক। রোজগার যা কিছু, সে তার একার তার যদি চার-পাঁচটা রোজগেরে ভাই থাকত, তা হে তাঁর মেয়ে দিতে বোধ হয় আপত্তি হত না। মেয়ে বুঝিয়ে শুনিয়ে তিনি তার মত করে দিতে পারতেন এ কথা জেনে ঘৃণায় নাক সিঁটকেছে ওয়াং ডাক। আ আমাকে বললে, কী নোংরা মনোভাব দেখুন। চা পাঁচটা রোজগেরে স্বামীর বউ হয়ে সুন্থু আওমা সু থাকবে সত্যি, কিন্তু সে কি একটা জীবন হল? আ বললুম, সেই তো এ দেশের জীবন। নিমার উদাহ দিলুম আমি। কিন্তু ওয়াং ডাক তাতে ভুলল ন বললে, মরবার পর দেহটা টুকরো টুকরো করে একপাল শকুন দিয়ে খাওয়ানো যায়, কিন্তু জ...লন ভাগ করে পাঁচটা মানুষকে কখনও দেওয়া ...তেমনি কথা আলাদা। চারটে ভাই তারা, এক... চার ভাগ করে ভোগ করার প্রবৃত্তি তাদের থাকে, তা তাই করুক। কেউ বাধা দেবে না তাদের। তাই ব নিজে একটা লোক বলে একটা গোটা মেয়ে কে পাবে না?

লামা বললেন: আমি তার ধারণাকে ভুল বললুম বোঝালুম যে মেয়েটার মত এ নয়। সে সাধারণ মানুষে বদলে বিয়ে করতে চায় একজন লামাকে। আর তা স্নেহপ্রবণ বাপ মেয়ের স্বাধীন ইচ্ছার অন্তরায় হে চান না। ওয়াং ডাক এ কথা মানল না। বললে, আ ভুল করছি। সুন্থু আওমার মাথাটা হয়তো বিগ

াকতে পারে, কিন্তু তার বাপ এ ব্যাপারে সজ্ঞান। তিনি নিজের স্বার্থটাই দেখছেন। সুমু আঙমা যদি কোন ামাকে সত্যিই পাকড়াতে পারে, তা হলে সমাজে তাঁর ান উন্নীত হবে। আর সেই ভ্রষ্ট লামা কি মঠের কিছু নরত্ন আত্মসাৎ করে আনতে পারবে না? মেয়েমানুষে াসক্তি রয়েছে যে লামার তার পদস্খলন তো আমাদের ত রোজকার ব্যাপার নয়। দুনিয়ায় এমন কুকাজ নেই, া সে করতে পারবে না।

লামা আবার থামলেন, থেমে বললেন: এমন যুক্তির থা শুনেছ কখনও? নিজের জীবন দিয়েই তো এরা ীবনের পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছে—দুঃখের আগুনে লানো খাঁটি সোনার মত প্রেম দিয়ে। মিথ্যে আমরা ত্যের সন্ধানে মঠে মঠে পুথি হাতড়ে বেড়াই। আর কী াই আমরা? ভিক্ষার ঝুলি হাতে কাঙালের মত সারা িশ্ব ঘুরে নিজের ক্ষুদ্রতাকেই কি শুধু বড় করে দেখতে শিখি নি? নিজের জীবনটা ভরে না উঠলে পূর্ণতার সন্ধান ি পাব দুর্ভিক্ষের লঙ্গরখানায়?

আমি চমকে উঠলুম। এ কি কোনও বৌদ্ধ ভিক্ষুর িশ্বাসের কথা শুনছি?

হঠাৎ লামা তাঁর সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কান্নার মত কণ্ঠে বললেন: না না, এ আমি আমার কথা বলছি আমি বলছি এদের বিশ্বাসের কথা।

...ৎ খাপছাড়াভাবে বললেন: কী নিন্দুক এই ওয়াং ...! নিজের দেশের লামাদের সম্বন্ধে কী বলে ... বলল, এরা সকলেই কি ধর্মের টানে লামা ... না করে ভাল খেয়ে পরে থাকবে, সমাজে ্রতিপত্তি হবে, এই আশাতেই না লোকে মঠে যায়! ানিকটা স্বার্থত্যাগ করতে হয় বইকি! কিন্তু সেটা কি কলে পারে? মদে ও মেয়েমানুষে আসক্তি যায় নি, েমন লামা ঢের আছে এ দেশে। এরাই তো দেশের র্বনাশ করছে। দেশের সরল মেয়েপুরুষের বিশ্বাস াঙিয়ে খাচ্ছে এই প্রতারকের দল। এ কথা বলবার ময় লোকটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলল, এদের ংখ্যা একটা কমাতে পারলেও নাকি তার পাপ খানিকটা াঘব হবে।

লামাও খানিকটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। বললেন: আর কী বলল জান? বলল, মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে সে জন্মের মত। এতদিন যা শুনে বিশ্বাস করতে তার বেদনা বোধ হত, এবারে তা নিজের চোখে দেখে জীবনে ঘেন্না ধরেছে তার। শুনেছিল এ দেশের মেয়েরা ভাবে, লামার সঙ্গ লাভ করলে তার দেহ পবিত্র হবে, সন্তান জন্মালে শাক্যমুনির বংশধর আসবে কোলে। অনেক পুরুষও আছে, যাদের নিজেদেরও এই মত। অথবা কোন মতই নেই। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে এই চরিত্রহীনতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তারা।

লামা বললেন: আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, এ তার নিজের মত কিনা। লোকটা উত্তর দিল, এ তার একার মত নয়। দেশের অনেক যুবক আজ এই কথাই ভাবছে। ভাবছে, এই অনাচারের শেষ না হলে দেশ উচ্ছন্নে যাবে। সুমু আঙমাকে সে কেন বিয়ে করতে চায়, সে কথাও সে বলল। বলল, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে একটা গভীর অন্তরঙ্গ পবিত্র জীবন হতে পারে, দেশের লোককে তাই দেখাবার ইচ্ছে। দেশ বলতে সমস্ত ইয়াটুং সে বোঝায় না, শুধু তার আশপাশের প্রতিবেশীরা তাদের দেখে তার মতটাকে মেনে নিলেই সে সুখী হবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে লামা বললেন: যাবার সময় সে কী অনুরোধ করে গেছে জান? বলে গেছে, এ দেশে তার একটা দিনও আর থাকার ইচ্ছে নেই। আমি যদি আমার সঙ্গে আমার দেশে তাকে নিয়ে না যাই তো আমার সামনেই সে আত্মহত্যা করবে। আড়চোখে কাঁধের বন্দুকটাও দেখিয়ে গেছে আমাকে।

পাহাড়ের গা বেয়ে অন্ধকার তখন গড়িয়ে এসেছে, ক্রমেই গাঢ় হচ্ছে সেই অন্ধকার। নিমারা নিজেদের ভাষায় কথা বলছে অক্লান্তভাবে। মনে হল, এই অন্ধকারের ভেতর আমরা ওয়াং ডাকের কথাই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি। সে যে আমাদের অনেকদিনের চেনা মানুষ।

দশ

প্রদীপের আলোয় দেখলুম সুমু আঙমাকে। মিষ্টি আলো ছড়াচ্ছে মাখনের প্রদীপ থেকে। মাখনের মতই মিষ্টি দেখলুম তার মুখখানি। নিমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছিল, আমরাও তার গল্প শুনছি।

একদিন লামার কাছে শুনেছিলুম, এ দেশের সাধারণ স্ত্রী-পুরুষ যারা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যাদের অন্নের সংস্থান করতে হয়, তাদের দেহে লালিত্য নেই। শ্রীহীন কঠিন তাদের মুখাবয়ব। এ দেশে হেলেন বাঁধা পড়েছে ধনীর ঘরে, লক্ষ্মী-সরস্বতীরও বিবাদ নেই এতটুকু। সরস্বতী স্বেচ্ছায় ধরা দেন লক্ষ্মীর সংসারে। স্থস্থ আঙমার বাবা কি সত্যিই ডাম গিয়া শোর রাজা? স্থস্থ আঙমাকে দেখে আজ এই প্রশ্নই প্রথম মনে এল।

আরও ভাল করে দেখলুম স্থস্থ আঙমাকে। আমাদের দেশের কুমারী মেয়েদের মত মাথায় ঘোমটা নেই, নেই কোনও ওড়না বা টুপি। শুকনো রুক্ষ এক মাথা কোঁকড়ানো চুল অযত্নে অবহেলায় একেবারে জট পাকিয়ে আছে। তারই ভেতর হয়তো উকুন খেলে বেড়াচ্ছে পরম নিশ্চিন্তে।

বাতির ছায়া পড়েছিল স্থস্থ আঙমার মুখে। গলায় ও ঘাড়ে পুরু হয়ে আছে নোংরামির প্রলেপ। রঙে আর ময়লায় বীভৎস দেখাচ্ছে সুন্দর মুখখানা। দূর থেকেই এদের দেখতে ভাল লাগে—যেমন ভাল লাগে আমাদের দেশী মেমসাহেবদের। কাছে এলে সারা দেহ ঘিনঘিন করে ওঠে একজনের নোংরামি দেখে, আর একজনের প্রসাধনের ঘটায়। দুজনেই তার সহজ শ্রীকে হারিয়েছে। একজন ঢেকেছে নোংরামি দিয়ে, আর একজন নোংরা হয়েছে রঙ মেখে।

লামা বোধ হয় আমার এ ভাবটি লক্ষ্য করেছিলেন। স্থস্থ আঙমাকে কী একটা জিজ্ঞেস করে তার উত্তর শোনালেন আমাকে। বললেন: স্থস্থ আঙমা আমাদের পাগল ভাবছে। বলছে, মাথা খারাপ না হলে লোকে এমন অদ্ভুত কথাও জিজ্ঞেস করে? বিশ বছর ধরে যে সৌভাগ্যকে সে আঁকড়ে ধরে আছে, আমাদের মত পাগলের কথায় সে কি হঠাৎ তা ধুয়ে ফেলবে?

হাসতে হাসতে লামা বললেন: বুঝলে হিন্দু, ওই নোংরামির নীচে তার সৌভাগ্য বাঁধা পড়েছে, মুখে জল ঠেকালেই তা পালিয়ে যাবে! জীবনে একবারও দেহে জল ঠেকায় নি এমন লোকও আছে এ দেশে। এ তাদের গর্বের বিষয়। আর পাঁচজনে শ্রদ্ধার চোখে দেখে তাদের।

জিজ্ঞেস করলুম: এমনই নোংরামির ভেতর মে[illegible] সারাজীবনই কাটিয়ে দেবে? লামা বললেন: বি[illegible] আগে পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হবে না। পাত্রপক্ষ [illegible] মেয়ে দেখতে আসবে, তখন মুখশ্রীর চেয়ে সুলক্ষণা[illegible] বিচার করবে বেশী। একবারও মুখহাত ধোয় নি জা[illegible] অর্ধেক নম্বর তখুনি পেয়ে গেল। বাকী অর্ধেক নম্বর প[illegible] আর কী কী নোংরা অভ্যেস আছে তার পরিচয় পেলে।

হাসতে হাসতে বললেন: পোশাকটা মাখনে মা[illegible] ধুলোয় আর শিকনিতে চামড়ার মত চটচটে হয়ে থাক[illegible] সকলের সামনে হয়তো ছ্যাৎ করে নাকটাই ঝেড়ে [illegible] জামার আস্তিনে।

আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে আরও উৎসাহ পে[illegible] লামা। বললেন: স্থস্থ আঙমার হাত দুখানা কে[illegible] ফরসা ধবধব করছে দেখ।

বললুম: সত্যিই তো।

লামা বললেন: কেন করবে না? ওই হাতেই [illegible] ময়দা মাখছে, খাবার তৈরি করছে রোজ। কেমন মি[illegible] লাগবে বলতো ওই খাবার?

আমি বাধা দিয়ে বললুম: থাক্ থাক্, যথেষ্ট হয়েছে[illegible] এবারে অন্য গল্প বলুন।

আমি ভাবছিলুম আমার নিজের কথা। এখ[illegible] অনেকদিন থাকতে হবে এদের সঙ্গে। এ সব গল্প শোনা[illegible] পর খাবার আর মুখে রুচবে না।

লামা থামলেন না। বললেন: নিমা [illegible]লেন [illegible] একই রকম লাগছে কি দুজনকে? [illegible]ও তেমনি

আমিও দুজনের প্রভেদটা লক্ষ্য করলুম[illegible] মত কালো নয় নিমার মুখখানা, উজ্জ্বল তামাটে রঙ[illegible] খানিকটা জল আর খানিকটা রঙের ছাপ। মাথা[illegible] চুলগুলি রুক্ষ হলেও পরিপাটি করে বাঁধা। তার ওপ[illegible] নানা অলঙ্কার। সাদা আর লাল রঙের প্রবাল, শামু[illegible] আর কড়ির মালা। গলায় টাকার মালায় একখা[illegible] সোনার মোহরও দেখলুম প্রদীপের মিষ্টি আলোয় ঝিকমি[illegible] করছে। পথ চলবার সময় নিমাকে দেখেছি মাথায় টু[illegible] পরতে। লামা বলেছিলেন, এটা ওদের বিবাহিত জীবনে[illegible] চিহ্ন। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত এ দেশের অবিবাহি[illegible] স্ত্রী-পুরুষকে খালি মাথায় চলতে হয়।
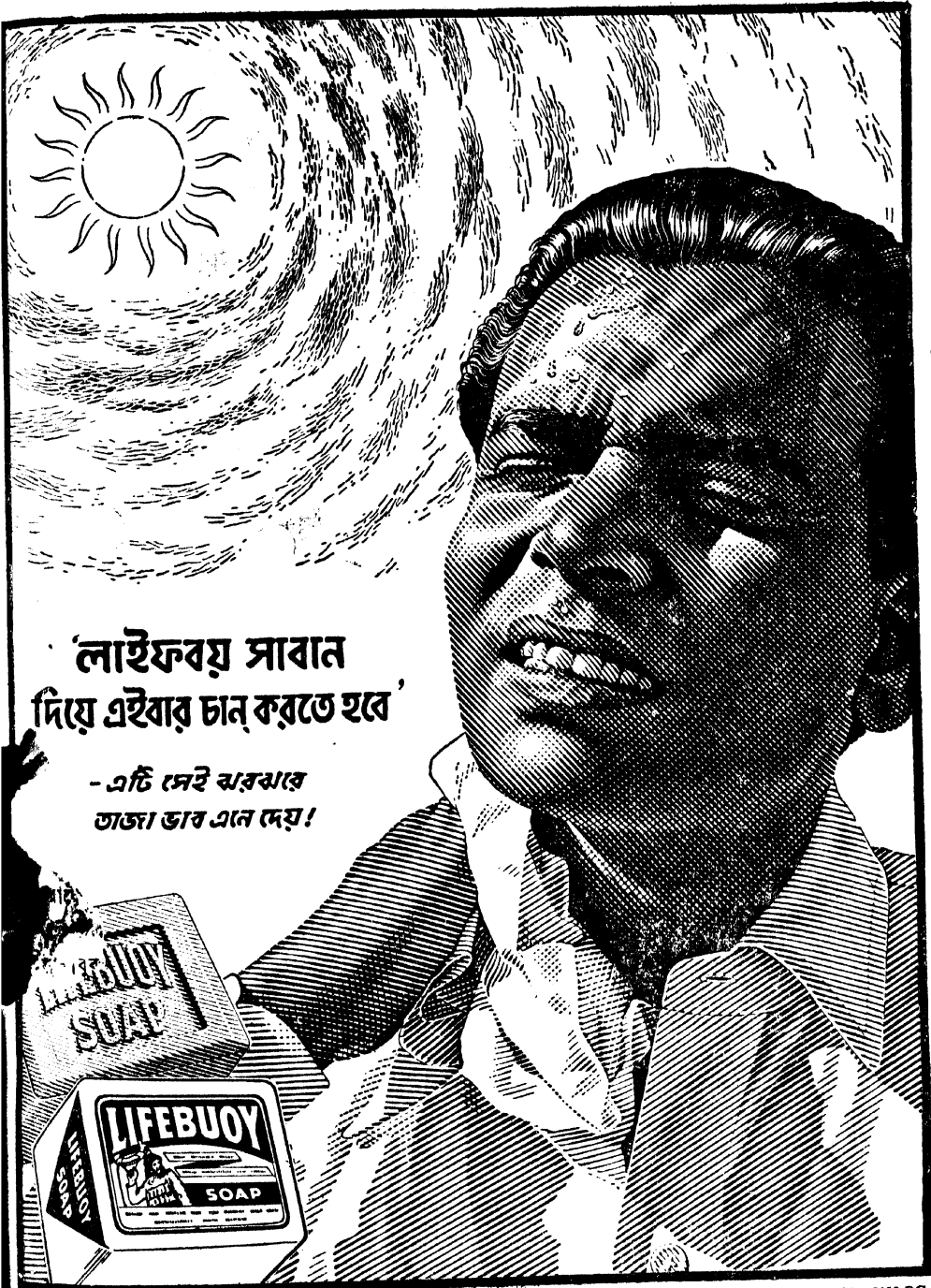
'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

লামা নিমাকে জিজ্ঞেস করে আরও খানিকটা সংবাদ আহরণ করলেন আমার জন্যে। বললেন : বিয়ের পিঁড়িতে বসবার আগে নিমা প্রথম তার চুল আঁচড়েছিল, আর খোঁপায় পরেছিল এই শামুক আর কড়ির মালা। নানা রঙের পাথর যে দেখছ, এগুলো ওর স্বামীদের দেওয়া। কখনও কোন স্বামীর সঙ্গে বিবাদ হলে তার দেওয়া পাথরটি মাথা থেকে নামিয়ে ফেললেই হল। তাতেই এদের বিবাহ বিচ্ছেদ। সমাজ কোন প্রশ্ন না করে এই ব্যবস্থাকে মেনে নেবে।

বললুম : ভারি মুশকিল তো এদের স্বামীদের। একতরফা বিচার।

লামা বললেন : হবে না-ই বা কেন ? পুরুষেরা তো অলস মদ্যপ ও স্ত্রী-আসক্ত। পিঠে গাদা বন্দুক বেঁধে ঘোড়ায় চেপে এরা পাখি থেকে মানুষ পর্যন্ত শিকার করতে পারে, কিন্তু বিদেশীর কাঁধে বন্দুক দেখলে লক্ষ্মী ছেলের মত নিজের তাঁবুতে এসে ঢোকে। এ দেশের মেয়েরাই তো সব। সংখ্যায় কম হতে পারে, শক্তিতে কম নয়। ক্ষেতে চাষের কাজ করতে দেখেছি এদের, দেখেছি সুতো কেটে কাপড় আর কার্পেট বুনতে। আবার আমাদের দেশের মেয়েদের মত রান্নাবান্না করে গাণ্ডেপিণ্ডে গেলাচ্ছে তাদের অপদার্থ স্বামীগুলোকে। পুরুষেরা কেবল বাণিজ্য করে, দেশের জিনিস বিদেশীদের হাতে তুলে দিয়ে বিদেশের জিনিস দেশে নিয়ে আসে। অভাববোধের এদের একেবারেই অভাব। খানিকটা অভাববোধ থাকলে এরা মানুষ হত তাড়াতাড়ি।

বললুম : অল্পে সন্তুষ্ট থাকাও তো একটা পরম গুণের কথা।

লামা বললেন : তা ঠিক। অভাববোধ বর্জন করে মানুষ অতিমানুষ হয়। কিন্তু সংসারে বাস করতে হলে ওই অভাববোধটাই মানুষকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ এনে দেয়। হঠাৎ যদি বিধাতার খেয়ালে দুনিয়ার অভাববোধটা মিটে যায়, মানুষ কি কাজ করবে ভাব ? অভাববোধ আছে বলে আজ আমি এই দুস্তর দেশের মঠে মঠে পুথি হাতড়ে বেড়াচ্ছি। অভাববোধ আছে বলে তুমি এসেছ সো মা ভাং আর থাং রিম পোচের সৌন্দর্য অন্বেষণে। অভাববোধ আছে বলেই এরা বাণিজ্য করতে বেরিয়েছে। এ কথা মানতেই হবে। যার যত অভাববোধ, পরিশ্রমের পরিমাণ তার তত বেশী। অভাব মিটে গেলেই জীবনের প্রয়োজন গেল ফুরিয়ে।

সুস্থু আঙমা অনর্গল কথা বলে চলেছে নিমার সঙ্গে। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতেও মাঝে মাঝে লামা সেদিকে কান পেতে দিচ্ছেন। নিমার স্বামীর এ সব ভাল লাগছে না। তার নেশার সময় হয়েছে। মাখনের প্রদীপ জেলে মদের জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে তার ভাল লাগে না।

একসময় লামা বললেন : একটা নতুন খবর পাওয়া গেল। সুস্থু আঙমা বলছে, সেই ছোকরা লামা তাকে বিয়ে করবে বলে সম্মত হয়েছে। হবে নাই বা কেন ? মঠের ভেতর ছাতু দই খেয়ে পোকাধরা শুকনো পুথির ভেতর কী সে পাবে ? তার চেয়ে দেড় শো ইয়াক আর সাড়ে তিন শো ভেড়া—সবার ওপর এই সুন্দর মেয়েটি। যতদিন বাঁচবে, আকণ্ঠ ডুবে থাকবে চাছাং পেম্পায়।

লামার চোখজোড়া বুঝি ঘৃণায় জ্বলে উঠল !

একসময় মুখে এক রকমের চুকচুক আওয়াজ করে সুস্থু আঙমা উঠে দাঁড়াল। ফিক করে হেসে তার কুচকুচে কালো দাঁতের হাসি দেখিয়ে বিদায় নিল। আমাদের দেশে অনেক সেকেলে মহিলার এমনই মিসি-ঘষা [illegible] দাঁত দেখেছি। তাতে নোংরামি নেই। সাদার ব[illegible] অমন কালো দেখতেও মন্দ লাগে না। কিন্তু এ দাঁ[illegible] তুলনা নেই। নিজের নিতান্ত কাছে এ [illegible] অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত উঠে আসবে। [illegible]লেন।

লামা বললেন : নিমার কাছে এতক্ষণ [illegible] তেমনি গুণব্যাখান করছিল। সাক্ষাৎ বুদ্ধের অবতার [illegible] পুণ্য করে এমন লামার সাক্ষাৎ পেয়েছে সে। আরও অনেক কথা বলবার শখ ছিল তার, কিন্তু তার বাপ ব্যস্ত হবে বলে ফিরে যাচ্ছে।

সত্যিই তার বাপ ব্যস্ত হয়েছিল। পরক্ষণেই এল মেয়ের খোঁজে। নিমা তাকেও আপ্যায়িত করে বসাল। এবারে তার স্বামীর বিরক্তি ধরা পড়ল তার ব্যবহারে। একটি সুন্দরী মেয়েকে বসিয়ে কথা বলছে বলুক, সে বরং সহ্য করা যায়। এ বুড়োটাকে কেন ? ওয়াং ডাকের সঙ্গে কাজ আছে বলে বেরিয়ে গেল। লামা হেসে এ কথা আমাকে বুঝিয়ে দিলেন।

সুস্থু আঙমার বাবা তার দুঃখের কাহিনী শোনাল আমাকে। আমিও সে গল্পের অনুবাদ শুনলুম। মা-মরা মেয়ে আদরে আহ্লাদে মানুষ হয়েছে এতদিন। তার ভাইদেরও সন্তান নেই। ভগবানের ইচ্ছেয় সম্পত্তির অভাব নেই তাদের। আর সুস্থু আঙমাকে বিয়ে করবার জন্যে ভাল ছেলেরও অভাব ছিল না দেশে। এই তো সেদিন যে ছোকরা মারা গেল, বেশ সমৃদ্ধ ঘর তাদের। অনেকগুলো ভাই, সুখেই থাকতে পেত। কিন্তু লামা বিয়ে করবে বলে জেদ ধরেছে মেয়ে। আর এই লামা খুঁজতেই এত দুঃখের পথে আসা।

ছোকরা লামার গল্পও শুনলুম আমরা। বড় সৎ লোক, নিরহঙ্কার, পরদুঃখকাতর। এ না হলে লামা! সুস্থু আঙমাকে দুঃখ দিতে না পেরে নিতান্ত দায়ে পড়েই তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন। তা না হলে বুদ্ধের সেবা ফেলে মানুষের সুখের জন্যে এমন কাজ তিনি করতেন না। তবে কিনা মানুষের সেবাই বুদ্ধের সেবা, মানুষকে উপেক্ষা করে তো বুদ্ধকে পাওয়া যায় না—এই তাঁর মত। এমন লামার সাক্ষাৎ পেয়ে তারা ধন্য হয়েছে।

উত্তেজিতভাবে ছেরিং পেনছো ফিরে এল। যা বলল [illegible]নে শুনলুম, ওয়াং ডাক তার তাঁবুতে নেই, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

লামা উত্তেজিত হলেন না। তাকে যা বললেন, [illegible]কেও সেই কথাই বললেন: তাতে ভাবনার কী [illegible] কোথাও হয়তো বেড়াতে গেছে, এখুনি ফিরে [illegible]

[illegible] পেনছো তাতে সন্তুষ্ট হল না। নিমাও কী একটা প্রশ্ন করল। লামা বললেন, মেয়েদের মন কেমন সন্দিগ্ধ দেখ। জিজ্ঞেস করছে, সেই ছোকরা লামা আছে তো [illegible] আঙমাদের তাঁবুতে?

ছেরিং পেনছোর এ খবরটুকু জানা ছিল না। বোধ [illegible] নেবার প্রয়োজন মনে করে নি। এবারে ছুটে গেল [illegible] খবর আনতে। আর পরক্ষণেই ফিরে এসে বলল, [illegible]কাথায় গিয়েছিল বেড়াতে, এইমাত্র ফিরেছে।

নিমা তাকে বসিয়ে দিয়ে নিজে গেল খবর আনতে। [illegible]মা বললেন: আর ভাবনা নেই। নিমা যখন গেছে, [illegible]বর একটা আনবেই।

সুস্থু আঙমার বাবা ওয়াং ডাকের গল্প বললেন। লামার মুখে সেটুকুও শুনলুম। লোকটা নাকি একটা গুণ্ডা, গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের। চাল চুলো নেই, খেতে পায় না দুবেলা। মদ জোটে তো মাংস নেই, মাখন জোটে তো চা নেই। নজর কিন্তু উঁচু। বামন হয়ে চাঁদে হাত। বলে, সুস্থু আঙমাকে বিয়ে করবে। এমন লোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে গ্রামের লোক যে ছি ছি করবে তাকে।

লামা জিজ্ঞেস করলেন: করে কী লোকটা?

উত্তরটাও আমাকে শোনালেন। কী আর করে! তিনকুলে তো কেউ নেই ওর। নিজেই একটু চাষবাস করে। জানোয়ার আছে গোটাকয়েক, আর ঘোড়ায় চেপে সুস্থু আঙমার পেছনে ঘোরে। তার জ্বালায় মেয়েটার শান্তি নেই এতটুকু। লামা বিয়ে করছে বলেই সে বাঁচল। নইলে সাধারণ লোক হলে হয়তো ওই গুণ্ডাটা তাকে খুনই করে ফেলত।

লামা বললেন: লামাকে খুন করতে পারবে না?

ছি ছি, কী যে বল! বলে কানে আঙুল দিল সুস্থু আঙমার বাপ। লামার গায়ে হাত তুলবে? যত অপদার্থই হোক, এমন কুকর্মে তার সাহস হবে না।

শুভক্ষণে নিমা ফিরে এসেছে। বর্ষার আকাশের মত গম্ভীর তার মুখ। কিছু বলবার আগেই সুস্থু আঙমার বাবা উঠে পড়ল। দেশীয় প্রথায় বিদায় জানিয়ে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে গেল।

নিমার স্বামী আগ্রহে তখন অধীর হয়ে উঠেছে।

নিমা যা সন্দেহ করছে, লামার মুখে তা শুনে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। ওয়াং ডাকের চাকরের কাছ থেকে নিমা খবর এনেছে যে সেই ছোকরা লামা এ কথা অস্বীকার করেছে। বলছে, ওয়াং ডাককে সে চেনেই না। সে একা গিয়েছিল ওই পাহাড়ের দিকে। সেখানে এক গুহায় তার পরিচিত লামা আছেন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করে এল।

ছেরিং পেনছো আবার ঝিমিয়ে পড়ল। তবে কোথায় গেল ওয়াং ডাক? এমনি একটা চিন্তা দেখলুম তার চোখে মুখে। নিমা তাকে কী একটা পরামর্শ দিল।

লামা বললেন: বুদ্ধ এ মেয়ের মঙ্গল করবেন। এমন দরদ না থাকলে এরা মায়ের জাত হয়!

বললুম : কী বললে সে ?

লামা বললেন : মশাল জ্বালিয়ে এরা এখন খুঁজতে বেরুবে। চাকরদের নিয়ে ছেরিং পেনছো যাবে ওই পাহাড় পর্যন্ত।

বললুম : আমরাও যাই চলুন।

না না : বলে বাধা দিলেন লামা। বললেন : তুমি বেরিও না। তোমার পায়ের যন্ত্রণা বাড়লে আমাদের পথ চলাই বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি বরং যাই।

আমি তাঁদের পৌঁছে দিতে তাঁবুর বাইরে গেলুম। উঃ, কী কনকনে ঠাণ্ডা! সমস্ত শরীর বুঝি হাওয়ায় জমে যাবে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আজ অমাবস্যা নয় তো ?

চাকরেরা মশাল জ্বালাল দুটো। নিমা আরও কিছু নির্দেশ দিল এদের। লামা বললেন : কান দুটো খোলা রেখে চলতে বলছে নিমা। পথের ধারে পাথরের আড়ালে কাতরানি শুনে যেন কেউ পালিয়ে না যায়।

গলাটা নামিয়ে বললেন : নিমা সন্দেহ করছে, এ ওই ছোকরা লামারই কীর্তি। লোকটা এদিকের আটঘাট সব জানে। সুযোগ বুঝে কোপ বসিয়েছে।

বললুম : এরা না ধর্মগুরু!

এ কথার জবাব পেলুম অনেক রাতে, ব্যর্থ হয়ে সবাই যখন ফিরে এলেন। লামা বললেন : ধর্মগুরু নয়, নাটের গুরু। কাল সকালে জানা যাবে কী চাল চেলেছেন ইনি।

তারপরেই নিজেকে সামলে নিলেন। গুণ গুণ করে গাইলেন গানের সেই কলি দুটি :

সাঙেলা ছির গিউ লাঙো।
টাশী ডিলে কুম সুম ছোগ ॥

হে বুদ্ধদেব, অপার তোমার মহিমা। আবার তুমি আমাদের ভেতর এস।

এগার

সুদু আঙমারা শেষ রাতেই তাঁবু তুলে রওনা হয়ে গেল। আমরা সবাই আজ জেগে ছিলুম। সকলের চোখেই কেমন বিসদৃশ ঠেকল তাদের এই ব্যস্ততা। মনে হল, কোন গর্হিত কাজ প্রকাশ হয়ে পড়বার আগেই পালিয়ে যাচ্ছে। কালও তারা এমনই শেষ রাতে রওনা হয়েছিল। কাক কোকিল জাগবার আগে কালও তা[র] দুই রি পথ যে অতিক্রম করে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই সূর্য উঠবার আগেই এই আড়াই ক্রোশ পথ এগিয়ে যাও[য়া] কম কথা নয়। অনেকেই যায়। কিন্তু আমরা আ[জ] তাদের অন্য চোখে দেখলুম। কালো মনের অন্বেষী চো[খে] সন্দেহের ঠুলি পরা।

সেই অন্ধকারে হাড়-কাঁপানো হিমেল হাওয়ার ধাক্কা খেয়েও আমরা তাদের যাত্রা দেখছিলুম। আমাদের যে যাওয়া হবে না, নিমা তা আমাদের রাতেই জানিয়ে দিয়েছিল। না হক আমাদের জ্ঞাতি কিংবা কুটুম্ব মানুষ তো! মৃত্যুর মুখে একটা মানুষকে ঠেলে দিয়ে যারা নিজের পথে নির্বিকার চলে যায়, তারা আর যাই হোক মানুষ নয়। সে অপবাদ নিমা কখনও নিতে পারবে না।

দু চোখে ঘুম তখনও জড়িয়ে আছে। ঘুমের আর দোষ কি! সে বেচারা সারাদিন জ্বালাতন করে না, রাতে বাতি নিবিয়ে যখন শুই, তখন তার দাবি আছে বইকি! সে দাবিকে রাতে উপেক্ষা করেছি। চোখের পাতা দুটো তাই ভারী হয়ে আছে।

কেন ঘুম এল না জানি না। সে ভয়। বুকের ভেতর শীতের মত গুড়গুড় করে উঠেছে একটা ভয়। দেশে [ফি]রে আর ফিরে যেতে পারব না! ওয়াং ডাকের মত দিয়েই যেতে হবে, নিয়ে যেতে কিছুই পারব না। কী বা নেবার আছে! কৈলাস আর মানস সরোবরের [স্মৃতি] তো! কিন্তু এইটুকুই যদি নেবার হয়, তা [হলে] ভয় কিসের ?

কিসের ভয়! যেন বিভীষিকা দেখছি কোনও নারী তার আলথাল্লা ছিঁড়ে শাড়ি পরেছে, আর মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলেছে আমার পিছু পিছু। আনন্দে অবশ হল না শরীর, ভয়ে অসাড় হল। চোখের সামনে ছোরা আর তলোয়ারের ফলা ঝলকে উঠল, গাদা বন্দুকের গর্জন শুনলুম কানে। দেখলুম, অঞ্জলি ভরে মানুষের রক্ত খাচ্ছে কতকগুলো মানুষের মত জানোয়ার, আর বিকট দাঁত বার করে হাসছে হা হা করে। দুরন্ত শীতে দেহের ওপর ঘাম জমে উঠল রাতের শিশিরের মত পেটের ভেতর থেকে একটা যন্ত্রণা ঠেলে উঠল শুকনো গলা পর্যন্ত। এ কী হল আমার!

কদিন ধরেই নিমার পরিবর্তনটা লক্ষ্য করছিলুম। বড়ই স্পষ্ট, লক্ষ্য না করে উপায় নেই। ঘষে ঘষে ঘাড়ের ময়লা তুলেছে যত, তার চেয়ে বেশী তুলেছে মুখের রঙ। তার হাসিটি এখন ভাল লাগে। দাঁতের সারি মুক্তোর মত ঝকঝক না করলেও তাতে আর ময়লা থিতিয়ে নেই আগের মত। পরিষ্কার হাত দু খানা, পরিষ্কার বাটিতে চা দিচ্ছে। কাল সকালবেলা লক্ষ্য করেছি, নিমার হাত থেকে চায়ের বাটি নেবার সময় বুড়ো লামার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠেছিল। বেশী ভাল লাগলে আমারও চোখ দুটো ছল ছল করে ওঠে।

লামা বলেছিলেন, পরিচ্ছন্ন জীবনের প্রতি সব মানুষেরই সমান লোভ। এরা সেই সংবাদটুকু জানে না বলেই নিজেদের নোংরামি এমন আঁকড়ে আছে।

কিন্তু এই ঘটনাকে এমনি সহজভাবে তো সবাই নেবে না। তারা তো কদর্থ করবে এর। আর যার স্বার্থে আঘাত লাগবে সে কী করবে, সেই দুশ্চিন্তাই আমার ঘুমটুকু কেড়ে নিল! ছেরিং পেনছোকে নিমা সত্যিই সামলেছে। সে লোকটা সরল স্বল্পবুদ্ধি, স্ত্রৈণও বটে। স্ত্রীর অনুগ্রহে যাকে বেঁচে থাকতে হবে, স্ত্রীর বিরাগের কাজ যে তাকে করতে নেই, এইটুকু বুঝেই সে নিশ্চিন্ত আছে। কিন্তু তার বড় ভাইকে আমি দেখেছি। পুরুষের মত আচার ব্যবহার সে লোকটার। স্ত্রীর অনাচার সে কিছুতেই সহ্য করবে না। স্ত্রী তার খোঁপা [illegible] প্রবাল খুলে ফেলার আগে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুণ্ডু এনে [illegible]পায়ে যে উপঢৌকন দেবে, তাতে আর সন্দেহ নেই। [illegible]র সেই রক্তমাখা কাটা মুণ্ডুটার সঙ্গে নিজের মিল দেখে ভয়ে শিউরে উঠলুম।

অন্ধকারেই সুসু আওমারা চলে গেল। সেই ছোকরা লামার তৎপরতা সকলের দৃষ্টিই আকর্ষণ করেছে। তাই নিয়ে এদের মধ্যে আলোচনা হল খানিকটা। কী কথা হল বুঝতে পারলুম না, কিন্তু কথাটা যে তারই সম্বন্ধে হচ্ছে তা ধরতে পারলুম।

এক সময়ে দু হাত বাড়িয়ে লামা আশীর্বাদ করলেন নিমাকে। কেন করলেন তা আমাকেও বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: একটা কথা সত্যিই বলেছে ওই ছোকরা লামা। মানুষকে ভালবাসলেই বুদ্ধকেও ভালবাসা হয়। সে ভালবাসা স্বার্থে নয়, প্রতিদানের আশায় নয়, দেহের লোভে নয়। সে ভালবাসা শুধু ভালবাসার জন্যেই। শুধু পরিজনের দুঃখেই অন্তর কাঁদবে না, কাঁদবে প্রতিবাসীর দুঃখে, কাঁদবে দেশবাসীর দুঃখে, কাঁদবে বিশ্ববাসীর দুঃখে। সেই তো সত্যিকার ভালবাসা। ওয়াং ডাক নিমার দেশবাসী, তুমি অন্য দেশের লোক। তোমাদের দুঃখে তার প্রাণ কেঁদেছে, এই তো মানুষের সত্যিকার পরিচয়!

বাকী রাতটুকু আমরা গল্প করেই কাটালুম।

পূর্বের নির্মেঘ আকাশে আলোর ছোঁয়া লাগল। সামনের পাহাড়টার গায়ে থিতনো অন্ধকার এল ফিকে হয়ে। ছেরিং পেনছোর ধৈর্য আর কিছুতেই মানছিল না। এবারে আগ্রহে লাফিয়ে উঠল। নিমা যা বললে, লামা তার অর্থ আমাকে শোনালেন। বললেন: পাহাড়ের পেছনটা দেখতে যেন আমাদের ভুল না হয়। নিরস্ত্র লোকের অস্ত্র হল তার দুটো হাত। সেই দুটো দিয়ে অতর্কিতে ধাক্কা দিলে বন্দুকধারী বীরও প্রথমটায় কাবু হয়। আর ওই পাহাড় থেকে পড়লে ওয়াং ডাকের একটা পাঁজরাও আস্ত থাকবে না।

কী আশ্চর্য! পাহাড়ের পিছনেই আমরা ওয়াং ডাককে খুঁজে পেলুম। চূড়ো থেকে হাত দশেক নীচে একটা বড় পাথরে আটকে আছে, আর যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওপর থেকেই তার কাতরানির শব্দ আমরা শুনতে পেয়েছিলুম। এই দশ হাত এমনি খাড়া যে নেমে তাকে তুলে আনবার উপায় নেই। ওই পাথরটা না থাকলে কোথায় যে পড়ত, তা ভাবতেই পায়ের গোছটা আলগা হয়ে গেল। মনে হল, নিজেই বুঝি পড়ে যাচ্ছি।

সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম ওয়াং ডাকের চাকরটাকে দেখে। লোকটা আগেই এখানে পৌছেছে, আর পাগলের মত চেষ্টা করছে ওই জায়গায় পৌছবার জন্যে। লামা তাকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন। তা না হলে আর একটা দুর্ঘটনা ঘটতে দেরি হত না।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে দক্ষিণ থেকে। হাত পা তখন অসাড় হয়ে আছে। অসহায়ভাবে আমরা যখন নিজেদের কর্তব্য ভাবছি, কর্তব্য স্থির করে দিল ওয়াং ডাকেরই চাকর। আনন্দে লামা তার পিঠ ঠুকে দিতেই লোকটা ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কলিকাতার বিদ্বজ্জন-সমাজে ইতিপূর্বেই পরিচিত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীন জীবনযাপনে রত হন। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীর তখন তিনি অন্যতর মালিক। বেতাল-পঞ্চবিংশতি তাঁহাকে ইতিমধ্যেই যশের অধিকারী করিয়াছে। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। সরকারী মহলে তাঁহার সুনাম যথেষ্ট। তখনকার উন্নতিমূলক প্রচেষ্টাসমূহ তিনি শুধু লক্ষ্য করেন নাই, কোন কোনটির সঙ্গে তিনি একান্তভাবে জড়িত হইয়াও পড়িয়াছেন। বেথুনের সঙ্গে প্রথমেই তিনি পরিচিত হন নাই। নিজ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার কালে ও পরে বেথুন যাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ লইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার এক প্রধান ব্যক্তি। মদনমোহন ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। বেথুন তাঁহার প্রমুখাৎ প্রথমে বিদ্যাসাগরের গুণপনার কথা শুনিয়া থাকিবেন। তাঁহার বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় (৭ই মে ১৮৪৯) ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ১৮৫০, ৫ই ডিসেম্বর নিজ প্রদত্ত সর্তে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক হইয়া যান। এই সময় শিক্ষা-সমাজের সেক্রেটারি ডাঃ এফ. জে. মৌএট এবং প্রেসিডেন্ট ড্রিঙ্ক-ওয়াটার বেথুন। মৌএটের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র পূর্বেই পরিচিত ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে পুনর্নিয়োগ ব্যাপারে বেথুন আগেই ঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ়চিত্ততার কথাও অবগত হইয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর উন্নতিশীল, দৃঢ়চেতা, উপরন্তু সমাজের কলুষ বিদূরণে তৎপর। শেষোক্ত বিষয়ে তাঁহার মৌলিক ভাবনা 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় (আগস্ট ১৮৫০) প্রকাশিত হইয়াছিল। এ হেন বিদ্যাসাগরকে বেথুন তাঁহার বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক পদে যে অবিলম্বে নিয়োগ করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? বস্তুতঃ ডিসেম্বর ১৮৫০ সনে ঈশ্বরচন্দ্র এই পদে নিয়োজিত হইলেন। এই সময় হইতেই স্ত্রীশিক্ষা-প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হইল।

স্ত্রীশিক্ষা তথা স্ত্রীজাতির উন্নতি-বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের এই ধরনের কার্য লক্ষণীয়: প্রথম, বেথুন স্কুল সংক্রান্ত, এবং দ্বিতীয়, পল্লীগ্রামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন। বেথুন স্কুল স্থাপনের দেড় বৎসর পরে বিদ্যাসাগর ইহার অবৈতনিক সম্পাদকের পদ পাইলেন। কলিকাতার মত শহরে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাদানরত বালিকা বিদ্যালয় এই প্রথম। গোড়ার দিকে ইহাকে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। বেথুনের অনুরোধে সপারিষদ বড়লাট ডালহৌসী ঘোষণা করিলেন যে, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত না হইলেও, কলিকাতায় ও মফস্বলের বালিকা বিদ্যালয়গুলির প্রতি সরকারের যথেষ্ট সমর্থন রহিয়াছে এবং হুজ্জৎকারীগণকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যথোচিত শাস্তিদানেও থাকিবেন না। বলা বাহুল্য, কলিকাতায় বেথুন সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বারাসাত বালিকা বিদ্যালয় পুনর্গঠিত হয় এবং দূরে ও নিকটে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে থাকে। 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' পুনর্মুদ্রিত করান বেথুন। তিনি ইহার এক খণ্ড রাজা রাধাকান্ত দেবকে প্রেরণ করিলে তিনি বেথুনের বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রচেষ্টায় আন্তরিক সমর্থন জানাইলেন। বিদ্যাসাগর অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হইবার পর, নিজ পরিচিত ও বন্ধুবান্ধবদের কন্যাদেরও এখানে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জানান। ইহাতে খুবই ফল হইল। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কন্যাগণ এখানে আসিয়া ভর্তি হইল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে এখানে ভর্তি করিয়া দেন। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা প্রতিষ্ঠাবধি এখানকার ছাত্রী হইয়াছিলেন। ১৮৫১ সনে বেথুন উত্তর কলিকাতার কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের পশ্চিম পার্শ্বে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রদত্ত এওয়াজি ভূমিখণ্ডের উপর বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ শুরু করিয়া দেন। কিন্তু এই সব উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্যে ১২ই আগস্ট ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন সাহেব মানবলীলা সংবরণ করেন। তিনি উইল দ্বারা কলিকাতাস্থ বহু সহস্র টাকা মূল্যের অস্থাবর সম্পত্তি বিদ্যালয়কে দান করিয়া যান। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারিরূপে বিদ্যাসাগর কলিকাতায় আগত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বিদ্যালয়

পরিদর্শনের জন্য লইয়া আসিতেন। ইঁহাদের মধ্যে গোয়ালিয়রের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী রাজা দিনকররাও ও কাশী-নরেশ দেবনারায়ণ সিংহও ছিলেন। দিনকররাওকে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, বেথুন লক্ষাধিক টাকা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। বেথুন ঈশ্বরচন্দ্রকে বলিতেন, তিনি এইরূপ ব্যয় করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। কেন না সতীদাহের সপক্ষে বিলাতের প্রিভি কৌন্সেলে এ দেশীয় রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের দ্বারা যে আপীল হইয়াছিল তাহাতে তিনি (বেথুন) অন্যতম কৌঁসুলী ছিলেন। ঐ সব ব্যক্তিপ্রধানেরা নিজ নিজ অঞ্চলে গিয়া বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হইয়াছিলেন।

বেথুনের মৃত্যুর পর, ডিরেক্টর-সভার অনুমতি লইয়া বড়লাট ডালহৌসী বেথুন-স্থাপিত বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিতে থাকেন। তিনি ১৮৫৬ সনের মার্চ মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে, এই বিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব সরকার গ্রহণ করেন। বিদ্যালয় পরিচালনার ভার দেওয়া হইল সরকার-নিয়োজিত একটি কমিটীর উপর। এই কমিটীর সভাপতি হন সিসিল বীডন এবং সম্পাদক হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কলিকাতার কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি কমিটীর সদস্যপদে বৃত হন। বিদ্যালয়টির পুনর্গঠন সম্পর্কে কমিটীর পক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদকরূপে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিলেন। বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনা সংক্রান্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করেন। এই বিজ্ঞপ্তিপত্রের প্রয়োজনীয় অংশ এখানে উদ্ধৃত হইল :

"উক্ত বিদ্যালয় এই কমিটির অধীন। বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত এক বিবি প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষাকার্যে তাঁহার সহকারিতা করিবার নিমিত্ত আর দুই বিবি ও একজন পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন।

"বালিকারা যখন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে, প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ সভাপতির স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে, নিযুক্ত পণ্ডিত ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না।

"ভদ্রজাতি ও ভদ্রবংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে, তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না। যাবৎ কমিটির অধ্যক্ষদের প্রতীতি না জন্মে অমুক বালিকা সদ্বংশজাতা এবং যাবৎ তাঁহারা নিযুক্ত করিবার অনুমতি না দেন, তাবৎ কোন বালিকাই ছাত্রীরূপে পরিগৃহীত হয় না।

"পুস্তক পাঠ, হাতের লেখা, পাটীগণিত, পদার্থজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীকর্ম, এই সকল বিষয়ে বালিকারা শিক্ষা পাইয়া থাকে। সকল বালিকাই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করে। আর যাহাদের কর্তৃপক্ষীয়েরা ইংরেজী শিখাইতে ইচ্ছা করেন তাহারাই ইংরেজী শিখে।

"বালিকাদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা ও বিনা মূল্যে পুস্তক দেওয়া হইয়া থাকে। আর যাহাদের দূরে বাড়ি, এবং স্বয়ং গাড়ি অথবা পালকী করিয়া আসিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার ও বিদ্যালয় হইতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত গাড়ি ও পালকী নিযুক্ত আছে।

"হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা হইলে, হিন্দুসমাজের ও এতদ্দেশের যে কত উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানালোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং শিশু সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, আর স্ত্রী ও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর কার্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্যের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

"অতএব আমরা এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি, এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত রহিয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার ফলভাগী হউন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন হিন্দুধর্মের অনুযায়ী ও হিন্দুসমাজের প্রকৃত মঙ্গল সাধন।"

বিজ্ঞাপনের তারিখ ২৪শে ডিসেম্বর ১৮৫৬। পরবর্তী ১৩ই জানুয়ারি ১৮৫৭ দিবসীয় 'সংবাদ প্রভাকর' হইতে লইয়াছি। বিজ্ঞাপনটি অন্যান্য সদস্যগণেরও স্বাক্ষর-সম্বলিত।

বেথুন বিদ্যালয়ের গাড়িতে লেখা থাকিত "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"। বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল।

বিদ্যাসাগর-প্রদত্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণগুলিতে এবং শিক্ষা-অধিকর্তার বাৎসরিক রিপোর্টে এই বিদ্যালয়টির শিক্ষোন্নতির বিষয় ব্যক্ত হইতে থাকে। বিদ্যালয় ক্রমে বেথুন স্কুল বা বেথুন বালিকা বিদ্যালয় নামে আখ্যাত হয়। শিক্ষা-অধিকর্তার বাৎসরিক রিপোর্টে ওই সময় বঙ্গপ্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার ক্রমিক প্রচলনের বিষয়ও অবগত হওয়া যায়। বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের সুপরিচালনাই যে মফস্বলের অধিবাসীবৃন্দকে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে বিশেষ অনুপ্রাণিত করিয়াছিল সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ষষ্ঠ দশকের শেষেই দেখিতে পাই, কয়েকজন মহিলা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রশংসা-ভাজন হইয়াছেন। একটি কারণে বেথুন স্কুলের পরিচালনায় কতকটা ব্যতিক্রম দেখা দিল। মিস মেরী কার্পেন্টার কলিকাতায় আসিয়া একটি শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় বা ফিমেল নর্মাল স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। এ বিষয়ে কয়েকজন স্বদেশীয় নেতাও তাঁহার সমর্থন করেন। সরকার মিস কার্পেন্টারের প্রস্তাব সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিতে থাকেন। ছোটলাট গ্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত চাহিলে তিনি কিন্তু এ প্রস্তাবের সাফল্য সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করেন। কারণ তাঁহার মতে, বাংলার সামাজিক অবস্থা এরূপ নয় যে, বয়স্কা মহিলারা এরূপ বিদ্যালয়ে শিক্ষণ-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে আসিবেন। তাঁহার মত কিন্তু সরকার তখন গ্রহণ করেন নাই। বেথুন স্কুলের সঙ্গে সরকারী ব্যয়ে নর্মাল স্কুল ১৮৬৯ সনের প্রথম দিকে স্থাপিত হইল। বেথুন স্কুল পরিচালনা লইয়া সরকারের সঙ্গে কমিটীর মতান্তর উপস্থিত হয়। সরকার নিজ মতে দৃঢ় থাকায় কমিটী পদত্যাগ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সম্পাদক পদ ত্যাগ করিলেও কর্তৃপক্ষ বেথুন বিদ্যালয় সম্পর্কে তাঁহার মতামত চাহিতেন, তিনিও সানন্দে স্বীয় সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করিতেন। নর্মাল স্কুল সম্বন্ধে কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথাই ফলিল। ১৮৭২ সনের ৩১শে জানুয়ারি এক আদেশ দ্বারা ছোটলাট সার্ জর্জ ক্যাম্বেল ইহার অকার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া স্কুলটি তুলিয়া দিলেন।

স্ত্রীশিক্ষা-প্রসারকল্পে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় কার্য পল্লী-অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বেথুন কলিকাতায় বিদ্যালয় স্থাপন করিবার পর ইহার আদর্শে নিকটে ও দূরে পল্লী অঞ্চলে কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াছি। ১৮৫৪ সনের এডুকেশন ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিও বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে তাঁহারা এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সহানুভূতির চক্ষে দেখেন এবং সম্ভব হইলে অর্থসাহায্যও করেন সে সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে নির্দেশও দেওয়া হয়। ছোটলাট হ্যালিডে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার এ বিষয়েও কথাবার্তা হইত। ঈশ্বরচন্দ্র এইসব কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার উপর নির্ভর করিয়া হুগলী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া জেলায় নভেম্বর ১৮৫৭ হইতে মে ১৮৫৮-র মধ্যে যথাক্রমে ২০, ১১, ৩ ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক খরচ ৮৪৫৲ টাকা ধার্য হইল। প্রতিষ্ঠার পরই তিনি কর্তৃপক্ষকে এ সম্বন্ধে জানান এবং মাসিক অর্থসাহায্য করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এখানে গোল বাধিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃপক্ষের সরাসরি লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকেই এই সকল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, কাজেই অর্থ মঞ্জুরীতে বিলম্ব হইতে লাগিল। শিক্ষকের বেতন বাকী পড়িল। ওদিকে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লেখালেখিও চলিতে লাগিল। সরকারের অজুহাত—পূর্বাহ্ণে অনুমতি লওয়া হয় নাই এবং সিপাহী বিদ্রোহ-জনিত অর্থাভাব। অবশেষে উচ্চতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে স্থির হইল, যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র মহৎ আদর্শ প্রণোদিত হইয়া ওই সকল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন সেহেতু, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সরকার অর্থসাহায্য প্রদান করিয়া ইহা বন্ধ করিয়া দিবেন। সরকার রাজকোষ হইতে শিক্ষকদের বেতন বাবদ পাওনা প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়া শিক্ষকদের বেতন চুকাইয়া দেন। সরকারী সাহায্য বন্ধ হইয়া গেলেও বিদ্যাসাগর চাঁদার খাতা খুলিয়া বিদ্যালয়গুলির ব্যয় নির্বাহার্থে যত্নপর হইয়াছিলেন। তাঁহার এই চাঁদা দাতাদের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী, ইংরেজ এবং দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ছিলেন।

ষষ্ঠ দশকের প্রথম হইতে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের দিকে নব্যশিক্ষিতদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে পড়ে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম যুবকদের লইয়া 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা'র

ব্যবস্থা করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়া হিতকরী সভা স্থাপিত হইল মুখ্যতঃ স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারকল্পে। এই সভা সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে নানা ভাবে সাহায্য করিত, কোথাও কোথাও সভা অগ্রণী হইয়া বালিকা বিদ্যালয় নিজেই প্রতিষ্ঠা করিত। উত্তরপাড়ায় এই হিতকরী সভার দ্বারা একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছিল। এখানকার জনহিতৈষী জমিদারদের স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টার উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে। ১৮৬৬ সনের নবেম্বর মাসে মিস্ মেরী কার্পেণ্টার কলিকাতায় আসেন ও রাজ-অতিথি হন। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার অনুসন্ধান ও উন্নতি সাধনের উপায়াদি নির্ধারণই ছিল তাঁহার ভারত আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি পল্লীর বিদ্যালয় দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে উত্তরপাড়াস্থ বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়। ছোটলাটের অনুরোধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রও মিস কার্পেণ্টারের সমভিব্যাহারী হইলেন। সঙ্গে গেলেন ডিরেক্টর বা শিক্ষা-অধিকর্তা এট্‌কিন্সন এবং ইন্‌স্পেক্টর উড্রো। স্কুল-পরিদর্শনান্তে ফিরিবার পথে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বগি উলটাইয়া যায় এবং তিনি বগি হইতে পড়িয়া গিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়েন। অন্যান্যদের গাড়ি খানিকটা সম্মুখে ছিল। গাড়ি উলটাইতে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই নিকটে আসেন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়কে প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন। মিস্ কার্পেণ্টার তদীয় "Six Months in India" পুস্তকে এই ব্যাপারটির বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন। এই পতনের ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয় যকৃতে ভীষণ আঘাত পান। ইহার ফলে তাঁহার যে ব্যাধি হয় তিনি তাহা হইতে কখনও নিষ্কৃতি পান নাই। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই রোগে ভুগিয়াছেন। পূর্ণ স্বাস্থ্যও তিনি আর ফিরিয়া পাইলেন না। নারীজাতির শিক্ষাবিস্তারে তিনি শুধু আর্থিক ক্ষতিই স্বীকার করেন নাই, নিজের জীবন পর্যন্ত এইরূপে বিপন্ন করিয়াছিলেন।

ইংরেজী শিক্ষা

এতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষার নানাক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রযত্নের বিষয় দেখিলাম। ইংরেজী শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারেও তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—সংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন উভয় মিলিয়া আমাদেয়ের স্বদেশীয় ভাষা-সাহিত্যের উন্নতি এবং উন্নত মনোবৃত্তি সমুদয়ের সম্যক্ বিকাশ সম্ভব করিয়া তুলিতে পারে। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন করিয়াছিলেন তিনি মুখ্যতঃ এই উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া। ঠিক ওই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৫৩ সনে তিনি নিজ গ্রাম বীরসিংহে একটি ইঙ্গ-সংস্কৃত অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। বিদ্যালয়ের ছাত্র-দিগকে ইংরেজী ও সংস্কৃত সমান সমান পড়িতে হইত। বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থাও অবশ্য ওইস্থলে ছিল। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহের কান্দী গ্রামে (মুর্শিদাবাদ) ওই উদ্দেশ্যে একটি উচ্চস্তরের ইঙ্গ-সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল ১৮৫৯ সনে। ইহার কিছু পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতানুসারী হইয়া পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ নিজ হরিনাভি গ্রামে একটি ইঙ্গ-সংস্কৃত বিদ্যালয় ১৮৬৬ সনে স্থাপন করেন। অবশ্য, ১৮৫৯ সন হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতায় যে বিদ্যালয়টির সংস্রবে আসেন এবং যাহার সঙ্গে ক্রমে আত্যন্তিক ভাবে যুক্ত হইয়া পড়েন তাহা ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজী। এরূপ একটি আদর্শ স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠানের তখন একান্ত প্রয়োজনও হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বাঙালীদের আগ্রহ বিবিধ কারণে ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হয়। সরকারী ব্যবস্থায় ইংরেজীর মাধ্যমে সরকার-পোষিত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষাদানের রীতি ধার্য হয় ১৮৩৫ সন হইতে। ইহার পূর্বে ও পরে বেসরকারী ভাবেও বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। খ্রীষ্টানী মিশনারীগণ বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হইয়া ইহাকে খ্রীষ্টানী শিক্ষার কেন্দ্র করিয়া তুলেন। এজন্য ইহার উপরে অনেকে বিরূপ হইয়া পড়ে। গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী এবং ভবানীপুরস্থ জগমোহন বসুর ইণ্ডিয়ান একাডেমী (যাহা পরে সাউথ সুবার্বান স্কুলে পরিণত হয়) গত শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেই ছাত্র-যুবকদের সুষ্ঠু ভাবেই ইংরেজী শিক্ষাদানে রত হয়। পটলডাঙার ডেভিড হেয়ারের স্কুলও এইরূপ একটি উচ্চ প্রতিষ্ঠান। তাঁহার মৃত্যুর (১ জুন ১৮৪২) পর শিক্ষা-সমাজ ইহার পরিচালনাভার পুরাপুরি গ্রহণ

করেন। ইহা কিছু কাল হিন্দু কলেজ, ব্রাঞ্চ স্কুল, কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া পরে ১৮৬৬ সন নাগাদ 'হেয়ার স্কুল' নাম ধারণ করে। এখানে প্রধানতঃ বেসরকারী প্রয়াসের কথাই বলিতেছি। মিশনারী বিদ্যালয়ের ধর্মবিরোধী কার্যের হাত হইতে রেহাই পাইবার নিমিত্ত চতুর্থ দশকের মাঝামাঝি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রযত্নে কলিকাতায় হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইহার ইংরেজী নাম হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্‌স্টিটিউসন। বিদ্যালয়টি সাড়ম্বরে আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় (১৮৪৮) গচ্ছিত তহবিল নষ্ট হইয়া যায় এবং ভীষণ দুর্দশায় পড়ে। তবে পরবর্তী দশ বৎসর কাল ইহা বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। আর একটি কারণে শিক্ষা-সমাজের জিদের বিরুদ্ধে হিন্দু প্রধানেরা সম্মিলিত হইয়া ১৮৫৩ সনের মে মাসে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ নামে একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। মতিলাল শীলের শীলস্ ফ্রি কলেজ এবং গুরুচরণ দত্তের ডেভিড হেয়ার একাডেমি দ্বারা ইহার ভিত্তি রচিত হয়। ক্যাপ্টেন ডেভিড লেষ্টার রিচার্ডসন এই কলেজের অধ্যক্ষ হন। পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে রামনারাণ) কলেজের সংস্কৃত ও বাংলার অধ্যাপক ছিলেন। এ বিদ্যালয়টিও স্থায়ী হইল না। ১৮৫৮ সনে শীলস্ ফ্রি কলেজ আলাদা হইয়া যাওয়ায়, ইহা আর অধিক দিন টিকে নাই। ইহার পর এ ধরনের বেসরকারী প্রচেষ্টার উপর লোকে যেন বীতরাগ হইয়া উঠে।

এই সময় ১৮৫৯ সনে কলিকাতার কয়েকজন সমাজ-হিতৈষী ব্যক্তি কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল স্থাপন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সরকারী কর্ম হইতে তখন মুক্ত হইয়াছেন। কর্তৃপক্ষ তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি ইহাতে সম্মত হন। ১৮৬৪ সনে বিদ্যালয়টির অধ্যক্ষ-সভা পুনর্গঠিত হয়। বিদ্যাসাগর সেক্রেটারি, রামগোপাল ঘোষ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর প্রভৃতিকে লইয়া একটি অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল। বিদ্যালয়ের নূতন নামকরণ হইল—হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন। বিদ্যালয়টি সুনিয়মে পরিচালিত হইয়া বেশ সুনাম অর্জন করিল। এখানকার ছাত্রগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইতে লাগিল। অধ্যক্ষগণের অধিকাংশের মৃত্যু হইলে, ক্রমে বিদ্যালয়টির পরিচালনাভার একক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত করিতে মানস করিলেন।

তখন সাধারণের মধ্যে একটি অপবাদের বড়ই প্রচার; বাঙালীরা কোন গঠনমূলক কার্য করিতে অক্ষম। বিদ্যাসাগর কার্যদ্বারা এই অপবাদ ঘুচাইলেন, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তে গত শতাব্দীর অষ্টম ও নবম দশকে কলিকাতায় এবং মফস্বলে বহু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম হইতেই বিদ্যালয়টিকে একটি কলেজে উন্নীত করিতে যত্ন লইতে লাগিলেন। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ বি. এ. পর্যন্ত পঠন-পাঠনের অনুমতি চাহিয়া তিনি তৎকালীন শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলেন। প্রথম শ্রেণীর কলেজ খুলিবার অনুমতি পাওয়া গেল না। ঈশ্বরচন্দ্র কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে অগত্যা দ্বিতীয় শ্রেণীর, অর্থাৎ এফ. এ. শ্রেণী পর্যন্ত খুলিলেন। ১৮৭২ সনের জানুয়ারি মাসে হিন্দু মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন মেট্রোপলিটান কলেজে পরিণত হইল। ১৮৭৪ সনে এখান হইতে পরীক্ষা দিয়া একজন ছাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. এ. পরীক্ষার্থীদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিল। দেশীয় পরিচালনার বিরুদ্ধেই শুধু নয়, আরও অপবাদ ছিল যে, এদেশীয় তথাকথিত শিক্ষকদের দ্বারা উচ্চশিক্ষা তথা কালেজীয় শিক্ষাদান সম্ভবপর নহে। ঈশ্বরচন্দ্র এ অপবাদের অমূলকতাও কাজে দেখাইয়া সকল সন্দেহ নিরসন করিলেন। তিনি নিজ কলেজে কোনও বিদেশীয় শিক্ষাব্রতীকে কখনও নিযুক্ত করেন নাই। প্রথম হইতেই তিনি সুশিক্ষিত বাঙালী অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া ছাত্রদের অল্প বেতনে পঠন-পাঠনের সুযোগ করিয়া দেন। মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে পরবর্তীকালের বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ, সাংবাদিক, ব্যবহারজীব, শিক্ষক, সাহিত্যিক প্রভৃতি কতই না লক্ষ্য করি। দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, বৈদ্যনাথ বসু, ক্ষুদিরাম বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (এন. ঘোষ), প্রথম রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—আর

কত নাম করিব? কলেজের শিক্ষাগুণে যুব-ছাত্রগণ জাতীয়তার প্রেরণা লাভ করেন, এবং কেহ কেহ জীবন পণ করিয়াও স্বদেশসেবায় অগ্রসর হন। সুবিখ্যাত উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীতে এ কথার পরিষ্কার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নিয়মশৃঙ্খলার একান্ত বশবর্তী ছিলেন। তিনি কলেজ পরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়ম করিয়া দেন। বিদ্যালয়ের দুইটি বিভাগ: কলেজ ও স্কুল। তিনি ছাত্রদিগের শারীরিক শাস্তিবিধান সম্পূর্ণ রহিত করিয়া দেন। কোন শিক্ষাব্রতী ইহার ব্যতিক্রম করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইত। অবাধ্য ছাত্রকেও বার বার সংশোধনের সুযোগদানের ব্যবস্থা ছিল। শেষ পর্যন্ত যদি দেখা যাইত, ছাত্রটি সংশোধনের অতীত তবে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ে হামেশা যাইতেন। তবে তাঁহার গতিবিধির সময় নির্দিষ্ট ছিল না। যে-কোন সময়েই বিদ্যালয়ে গিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষিত হইতেছে কি না সে বিষয় লক্ষ্য করিতেন। ক্রমে বিদ্যালয়ের চার-পাঁচটি শাখা কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে তথাকার অধিবাসীদের আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সমুদয় শাখা-বিদ্যালয়ও সুনিয়মে পরিচালিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি করিতে থাকে। বিদ্যাসাগরের জীবিতকালেই, ১৮৮৭ সনে মূল বিদ্যালয়টি শঙ্কর ঘোষ স্ট্রীটস্থ নিজ ভবনে উঠিয়া আসে। বিদ্যালয়ের সর্ববিধ উন্নতির দিকে ঈশ্বরচন্দ্রের আমৃত্যু আন্তরিক প্রয়াস ছিল। প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ জানিয়াও, ইহা দ্বারা যতটা সুফল আদায় করা যায় তদুদ্দেশ্যেই তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ স্বদেশবাসী গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃতিত্ব কম ছিল না। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির আদর্শে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা প্রথমে চিন্তা করেন শিক্ষা-সমাজের সম্পাদক ডাঃ এফ. জে. মৌএট। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই উদ্দেশ্যে রচিত প্রস্তাব শিক্ষা-সমাজে পেশ করিবার পূর্বে দুইজন বাঙালী মনীষীর সঙ্গে প্রারম্ভিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই দুইজনের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ। দ্বিতীয় জনের তিনি নাম করেন নাই। ১৮৪৪ সন নাগাদ মৌএট এই প্রস্তাব শিক্ষা-সমাজে উত্থাপিত করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবটি বিলাতে প্রেরণ করিলে ডিরেক্টর-সভা ইহাতে সম্মতি দেন নাই। দশ বৎসরের মধ্যেই কিন্তু সভার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। ১৮৫৪ সনে বিখ্যাত 'এডুকেশ্যন ডেসপ্যাচে' কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়। ১৮৫৫ সনে তাঁহারা একটি নির্দেশপত্রও পাঠাইলেন। এই উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার ১৮৫৬ সনে একটি সাব-কমিটী গঠন করেন। এই কমিটীর সদস্যগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সাব-কমিটীর রিপোর্ট দৃষ্টে ১৮৫৭, ২৪শে জানুয়ারি কলিকাতা ও বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত 'ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ হয়। মাদ্রাজের নিমিত্ত কিছু পরে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়-আইন হইয়াছিল, প্রথমোক্ত আইনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোর সদস্যবর্গের যে-সব নাম প্রদত্ত হয় তাহার মধ্যে ছয়জন ছিলেন বাঙালী; এই ছয়জনের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয়। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ ত্যাগের পরেও দীর্ঘকাল তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহার পাঠ্যবিষয়াদি নির্ধারণে তাঁহার সহযোগিতা লক্ষণীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের উপযোগী করিয়া তিনি সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদি সম্পাদিত করেন। উদাহরণস্বরূপ তৎকৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারি।

কৃষ্ণা

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী

তুমি অরূপের অনুজা তবুও রূপের অগ্রজা জানি,
আকুল চোখের অপার তৃষ্ণা মুছেছ সে একদিন,
তোমারে ঘিরিয়া সে কী আনন্দ সে কী উৎসব-বাণী
বেজেছিল ঘন বেদনা-বিষাদ চকিতে করিয়া লীন।

ভালো-অভালোর প্রশ্ন ওঠে নি সেদিন কাহারও মনে,
জন্মের সেই প্রথম লগ্ন পরম শুভক্ষণ,
নব রসাবেশ হৃদয়ে সবার—অভিনব তোমা গণে ;
আকাশে মাটিতে সে কী কানাকানি, আরতির আয়োজন !

নক্ষত্রের রূপালি আলোয় ভাঙনের বাঁশি বাজে,
গ্রহ-তারকারা নেহারে অবাক্ স্পৃহাহীন তব রূপ,
শান্তশ্রী মূর্তি ধরিয়া প্রেমিকা বধূর সাজে
ত্রিলোকে স্বচির নির্বাধগতি মন যবে নিশ্চুপ।

কৃষ্ণা, তোমার খ্যাতির ব্যাপ্তি সেদিন সীমানা পার,—
নবীন রূপের অপরূপতায় ছন্দিত ত্রিভুবন,
দেহমনে সে কী দুর্দমনীয় যৌবনসম্ভার—
লক্ষ লক্ষ কোটি বছরের প্রতীক্ষমাণা মন।

তারপরে হায়, কালের ধারায় খ্যাতিভ্রষ্টা আজি,
হৃদয়ে সবার পেল অধিকার আর এক নতুন শিশু,—
অনুদিন রাত গাহিছে সবাই তাহারি মহিমারাজি,
অখ্যাত তুমি, তবুও তোমায় আজও হেরি জিজীবিষু।

কুশ্রী কুরূপা প্রকাশ্যে আজ তোমারে সবাই বলে,
সঙ্গ তোমার ভিতরে বাহিরে কেউ না কামনা করে,
অনাদরা এবে—অবজ্ঞাভরে এড়িয়ে সবাই চলে,
নবজাতকের পরম সে রূপ চিত্ত সবার হরে।

হৃদয়ে গোপন তবুও অপার ভাগ্যজয়ের নেশা,
প্রতিনিয়তই নূতনের সাথে দ্বন্দ্বে আবির্ভূতা,
মরেছে অতীত—রয়েছে এখনও সুদিনের অন্বেষা—
স্বপ্ন-বাসরে চিতার শয্যা রচিছে কালের সুতা।

কৃষ্ণা, তবুও তোমার কখনো মৃত্যু হবে না জানি—
অজর, অমর, অক্ষয় আর রবে চির-অব্যয় ;
তোমারে ভাঙিতে অবশ নিথর ধ্বংস-দেবের পাণি—
জরা-জর্জরে তুমিই একাকী মৃত্যু করেছ জয়।

কন্যাকুমারীতে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

পীচঢালা পথখানি বেয়ে
ধীরে ধীরে হও অগ্রসর,
চোখ মেলে চেয়ে দেখ,
শীত-লাগা অজগর মত
প্রাচীন ভারতভূমি
সাগরের বুক চুমি
গভীর আবেশ ভরে
পড়ে আছে যেন তন্দ্রাহত।

মাতৃতীর্থে বস সন্তর্পণে,
সমুখেতে কী দেখিতে পাও ?
নিঃসীম আকাশতলে
স্থির, স্তব্ধ, অচঞ্চল,
উদার মহান্—
ভারতের সমাহিত আত্মাখানি যেন
তপোবন-ছায়াতলে বসি
গভীরে গাহিছে সামগান !

বাঁ দিকেতে শিলাস্তূপে তরঙ্গহিল্লোল,
রুদ্রের উদ্দাম নৃত্যে
সৃষ্টি বুঝি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
মহাকাল হয়েছে অধীর—,
ভয় নেই চেয়ে দেখ
তীরাস্তৃত শ্যামকুঞ্জ পানে
নটরাজ হয়ে আছে স্থির !

সূর্যাস্তের বার্তা বয়ে আনে
ডান দিকে আরব সাগর,
শিলীভূত প্রিয়াদেহ ঘিরে
কানে কানে করে কত প্রণয়গুঞ্জন—
প্রসারিত বেলাভূমি তার
অস্তসূর্য-রঙ মেখে
শুয়ে শুয়ে দেখে যেন সোনার স্বপন !

ভারতীয় মনঃশিল্প

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

মনোবিজ্ঞান ও মনঃশিল্প

পৃথিবীতে দুইখানি বৃহৎ গ্রন্থ আছে, ইহাদের যে কোন একখানি পাঠ করিলে আমরা যথার্থ জ্ঞানী বা পণ্ডিত হইতে পারি। এই দুইখানি গ্রন্থের একখানির নাম প্রকৃতি-গ্রন্থ আর একখানির নাম জীবন-গ্রন্থ। যাঁহারা প্রকৃতি-গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, রহস্যময়ী প্রকৃতি যাঁহাদের নিকট আপন রহস্যের আবরণ ধীরে ধীরে উন্মোচন করেন, আমরা তাঁহাদের বলি বৈজ্ঞানিক, আর যাঁহারা আপনার ও অপরের মনের অন্তহীন গভীরে ডুব দিয়া ডুবুরীর মত রহস্যের সন্ধান করেন, তাঁহাদের আমরা বলি মনোবিজ্ঞানী। এ যুগে মনোবিদ্যা শুধু পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীল নয়, মনোজগতেও আজ নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে। আজ আমরা বুঝিয়াছি, মনোবিজ্ঞান শুধু আমাদের মনের গহনেই আলোক-সম্পাত করে না, আমাদের ব্যাবহারিক জীবনেও ইহার উপযোগিতা অপরিসীম। আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরতর ও মহত্তর করিতে হইলে, কর্মক্ষেত্রে সিদ্ধি ও অভ্যুদয় লাভ করিতে হইলে মনস্তত্ত্ব-সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। মনোবিজ্ঞান ও মনঃশিল্পের পার্থক্যও আমাদের বুঝিতে হইবে। যে শাস্ত্র মনোজগতের ঘটনাপুঞ্জের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে এবং মানুষের অন্তর্জগতেও কার্যকারণশৃঙ্খল আবিষ্কার করে, তাহাকে বলি মনোবিজ্ঞান আর যে শাস্ত্র আমাদের মনকে একাগ্র করিবার ও জীবনকে উন্নত করিয়া গড়িয়া তুলিবার কৌশল শিক্ষা দেয়, উহাকে বলা হয় মনঃশিল্প। বাহিরের শিল্পে নৈপুণ্য লাভ করিতে যেমন সাধনার প্রয়োজন, মনঃশিল্পে দক্ষতা লাভ করিতে হইলেও তেমনই অনলস ও অক্লান্ত তপস্যার প্রয়োজন।

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ই বোধ হয় প্রথম 'মনঃশিল্প' কথাটির ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যোগ একরূপ মনঃশিল্প আর যোগের অন্যতম অঙ্গ প্রাণায়াম প্রাণশিল্প। এই কথা দুইটিই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া আমরা মনে করি। এই মনঃশিল্পকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই মানুষ সকল অবস্থায় মনকে প্রশান্ত রাখিতে পারে, কাম ক্রোধ লোভ দ্বেষ হিংসা প্রভৃতি মনের বিকারগুলিকে দূর করিতে পারে, অপরিমেয় অর্থলোভ, যশ বা উচ্চপদ লাভের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নিকট তখন আর স্পৃহনীয় বলিয়া বোধ হয় না, মনে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হওয়ায় সে স্থির অচঞ্চল জীবন যাপন করে এবং দীর্ঘ আয়ু লাভ করে। শুধু তাহাই নয়, নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের ফলে তাঁহার দেহ ও মনের রূপান্তর ঘটে, সে ইহলোকেই নবজন্ম লাভ করে।

ভাবনার ফল : দেহ ও মনের রূপান্তর

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন, 'যার মনে যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।' আমরা বিশ্বাস করি আর নাই করি, আমাদের অন্তরে যে চিন্তার প্রবাহ চলিতে থাকে উহাই আমাদের দেহের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধন করে, আর আমাদের মুখমণ্ডলে, বিশেষতঃ চক্ষুর্দ্বয়ে সেই চিন্তা প্রতিফলিত হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বলা হইয়াছে, শিখিধ্বজ রাজার বৃদ্ধা মহিষী চূড়ালা সর্বদা আত্মচিন্তার দ্বারা দেহের পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার দেহে যৌবনের লাবণ্য সঞ্চারিত হইয়াছিল। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, আমরা যখন ক্রোধ বা ভয়ের অধীন হই, তখন আমাদের দেহের মধ্যে 'এড্রিনালিন' নামে অন্তঃস্রাবী গ্রন্থিরস ক্ষরিত হয়, ইহার ফলেই আমরা সে সময়ে এমন কার্য সকল সম্পন্ন করিতে পারি যাহার কথা ভাবিয়া নিজেরাই বিস্মিত হই। যে ব্যক্তি পাঁচ সের বোঝা বহন করিতে কষ্ট বোধ করে, ঘরে আগুন লাগিলে সেও আধ মণ বোঝা লইয়া দৌড়াইতে পারে। একখানি প্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, একটি মহিলা ক্রুদ্ধ অবস্থায় সন্তানকে স্তন্য দান করিয়াছিলেন কিন্তু ক্রোধের ফলে তাহার রক্তের মধ্যে এমন একটি বিষাক্ত পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছিল যে সেই স্তন্যদুগ্ধ পান করিয়া সন্তান মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

আমরা যখন কাম ক্রোধ ভয় প্রভৃতির অধীন হই, তখন আমাদের দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে, আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াও দ্রুততর হয়। যোগীরা বলেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুতগতি আয়ুঃক্ষয়ের অন্যতম কারণ, এই জন্যই তাঁহারা প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা যে চিন্তার গতিকে উর্ধ্বগামিনী করিয়া দেহের রূপান্তর সাধন করিতে পারি, ইহা পরীক্ষিত সত্য। যোগিগণ আরও বলেন, আমরা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে যাহা ধ্যান করি, তাহারই স্বারূপ্য প্রাপ্ত হই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তাঁহারা তেলাপোকার কাঁচপোকায় রূপান্তরের কথা বলিয়াছেন। এরূপ পরিবর্তনের মূলে থাকে ভয়জনিত চিন্তা। আমরাও যদি দীর্ঘকাল কোন মহাপুরুষের মূর্তি চিন্তন ও চরিত্রের অনুধ্যান করি, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার স্বারূপ্য লাভ করিতে পারিব। এইরূপ ধ্যানকে বলা হয় অনুস্মৃতি। এইজন্যই, মহাযানী বৌদ্ধদের নিকট বুদ্ধানুস্মৃতি বা ভক্ত খ্রীষ্টানগণের নিকট খ্রীষ্টানুস্মৃতি শ্রেষ্ঠ সাধনা বলিয়া পরিগণিত। মহর্ষি পতঞ্জলি চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য যে সমস্ত উপায়ের নির্দেশ দিয়াছেন, তন্মধ্যে একটি এই—

'বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।'

যাহাদের চিত্ত বিষয়ে বীতরাগ হইয়াছে তাহাদের ধ্যান করিলেও অর্থাৎ তাহাদের চিত্তে নিজের চিত্তকে অর্পণ করিলেও মনের একাগ্রতা লাভ হয়। মহাপুরুষদের চরিত পাঠ ও চিন্তন করিলেও ধীরে ধীরে মন স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। তাঁহারা কি ভাবে প্রলোভনকে জয় করিয়াছিলেন, সে বিষয় চিন্তা করিলেও আমরা বীর্যবান হইতে পারি।

চিত্তকে একাগ্র করিতে হইলে আমাদের মনকে সর্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। চলিতে, কথা বলিতে, খাইতে, শুইতে, বসিতে সর্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে মন যেন ঘুমাইয়া বা ঝিমাইয়া না পড়ে। অবশ্য ইহা অভ্যাস-সাপেক্ষ। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন—

'যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥'

চঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়, সেই সেই বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবে এবং উহাকে আত্মার বশীভূত করিবে।

মহর্ষি পতঞ্জলির মতে ইহাকেই বলে প্রত্যাহার।

মনকে প্রশান্ত রাখিতে হইলে সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়ের চিন্তা বর্জন করিতে হইবে। গীতায় বলা হইয়াছে—বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে কামনার উদ্ভব হয়, কামনা প্রতিহত হইলেই ক্রোধের সঞ্চার হয়, ক্রোধ হইতে মোহের উৎপত্তি হয়, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ জন্মে, স্মৃতিভ্রংশের ফলে বুদ্ধিনাশ ঘটে এবং বুদ্ধিনাশ ঘটিলেই মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

আমরা যদি যোগস্থ বা যোগযুক্ত হইতে পারি অর্থাৎ অনন্তের সুরে আমাদের হৃদয়বীণাকে বাঁধিয়া লইতে পারি, তবেই আমাদের চিত্ত স্থির হইবে। মার্কিন মনীষী র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়াল্ডো ট্রাইন (Ralph Waldo Tryne) *In Tune with the Infinite* নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তাঁহার স্বভাবসুলভ সরস ভঙ্গীতে এই কথাটিই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমাদের দেশে 'যোগ' কথাটির এক অর্থ বিয়োগ (অর্থাৎ পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য উপলব্ধি করা, ম্যাক্স মূলার এই অর্থে বলিয়াছেন Yoga is not union but disunion) আর এক অর্থ সংযোগ। আমরা যদি সত্যই 'যোগযুক্ত' হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের হৃদয়তন্ত্রী কখনও বেসুরা বাজিবে না। অবশ্য শুধু দীর্ঘকাল অভ্যাসের ফলেই মানুষ এ অবস্থাটি লাভ করিতে পারে।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি

আমরা বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের অধীন বটে কিন্তু অন্তরে আমরা স্বাধীন। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই মনকে জয় করিবার কৌশল আয়ত্ত করা উচিত। প্রতিদিনই আমাদের জীবনে দুঃখের সহস্র কারণ উপস্থিত হইতেছে, সেই কারণগুলির উপর আমাদের অনেক সময় প্রভুত্ব থাকে না বলিয়া আমরা উহাদের বিদুরিত করিতে পারি না। আবার অনেক সময়ে মনঃ-কল্পিত দুঃখ আমাদের এমন ভাবে অভিভূত করে যে উহাদের হাত হইতে আমরা কিছুতেই পরিত্রাণ পাই না। আমাদের জীবন যে দুঃখময়, এ কথা অবশ্য আমাদের দেশের দার্শনিকেরা অস্বীকার করেন না, কিন্তু তাঁহারা এ কথাও বলেন যে সংসারে যেমন

পুঞ্জীভূত দুঃখ আছে, তেমনই দুঃখনিবৃত্তিরও উপায় আছে। দুঃখের চিরন্তন নিবৃত্তি অবশ্য দীর্ঘ সাধনসাপেক্ষ কিন্তু বিচার-বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিলে আমরা সময় সময় দুঃখকে অতিক্রম করিতে পারি।

আমাদের জীবনে যেমন কৌমার ও যৌবন উপস্থিত হয়, তেমনই প্রাকৃতিক নিয়মেই জরা ও বার্ধক্য উপস্থিত হইবেই। অবশ্য যাহাদের অকালমৃত্যু ঘটে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ, চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিলে আমাদের দেহের শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে, আমরা তখন অল্প পরিশ্রমেই ক্লান্ত বা অবসন্ন হইয়া পড়ি। আমাদের চক্ষুর দীপ্তি, খাদ্য-পরিপাকের শক্তি, মনের স্ফূর্তি ও উৎসাহ ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। যৌবনকালের মত দৈহিক বা মানসিক শ্রম করা আমাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হয় না। কিন্তু দেহ ও মনের এই পরিবর্তনকে আমরা সহজে স্বীকার করিতে পারি না, তাই বিগত সুখের দিনের কথা স্মরণ করিয়া আমরা বিলাপ করি। মনস্তত্ত্ববিদ্ ইয়ুং (Jung) বলেন, সাধারণতঃ চল্লিশ বৎসর পার হইলেও আমরা নিজের বয়সের কথাটা চিন্তা করি না; তাই বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা করিয়া বিলাপ করি, আর সর্বদা অদৃষ্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। ফলে, বৃদ্ধ বয়সে আমাদের জীবনে দুঃখের মাত্রা শুধু বাড়িতেই থাকে। তাই আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি'—জীবনমাত্রেই প্রকৃতির অনুসরণ করে, প্রকৃতির বিধান লঙ্ঘন করিবার শক্তি কাহারও নাই। দুই দিন আগেই হউক আর দুই দিন পরেই হউক, আমাদের দেহ জরা ও বার্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হইবেই। প্রকৃতির বিধান বা ভগবানের বিধান অবনত মস্তকে মানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য। আর বার্ধক্য জিনিসটাও তো নিরবচ্ছিন্ন অভিশাপ নহে। এই সময়ে আমরা ধ্যান-ধারণায় বা সদ্গ্রন্থ পাঠে অথবা ধর্মালোচনায় কিছুটা সময়ক্ষেপ করিতে পারি এবং আমাদের পরিণত জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যে লোকের কল্যাণ সাধন করিতে পারি। তাই কোন অবস্থাতেই যেন আমরা অন্তরে নিরাশা বা অবসাদকে স্থান না দিই। এ সংসার একটি সংগ্রাম-ক্ষেত্র, আমাদের চিরকাল যথাশক্তি সংগ্রাম করিতেই হইবে, কখনও ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে না। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—মামনুস্মর যুধ্য চ—আমাকে স্মরণ কর ও যুদ্ধ কর।

নিরাশঃ সুখী

আশার মত কুহকিনী বোধ হয় কোন দেশে কোন কালে জন্মায় নাই। সাইরেণের বংশীধ্বনির চেয়েও আশার বংশীধ্বনি অধিকতর চিত্তাকর্ষক। এই আশা আমাদিগকে মাঝে স্বর্গে উঠায় বটে, কিন্তু আবার এই আশাই আমাদিগকে দুঃখের সাগরে নিমগ্ন করে। সংসারে সুখী হইতে হইলে আশার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইলে চলিবে না। অবশ্য অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন, আশাকে বর্জন করিলে আমরা বাঁচিব কিরূপে? আমাদের কর্মের প্রেরণাই বা আসিবে কোথা হইতে? যোগশাস্ত্র আমাদিগকে নিরাশ হইয়া কর্ম করিতে অর্থাৎ কর্মের কৌশল আয়ত্ত করিতে শিক্ষা দেয়। আর একটি কথা। আমরা সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা বা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের নিকট অনেক কিছু আশা করি, কাহারও উপকার করিয়া প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করি, কেহ আমাদিগকে উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিলে অথবা আমাদের প্রতি কৃতঘ্নতা প্রকাশ করিলে ক্ষুব্ধ হই। আমরা নিশ্চয়ই অপরের প্রতি কর্তব্য পালন করিব কিন্তু কোন প্রতিদান চাহিব না। অপরের নিকট কিছু প্রত্যাশা করাই তো মনের পরবশ্যতা বা পরাধীনতা, আর সংসারে পরাধীনতাই দুঃখ। 'সর্বং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং সুখং।'

যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ

আমাদের শাস্ত্রে বলে—যে যাহা ভাবে, সে তাহাই হয়। যে নিজেকে বদ্ধ মনে করে, সে বদ্ধ হয় আর যে নিজেকে মুক্ত মনে করে, সে মুক্তই হইয়া যায়। মানুষের মনই বন্ধন ও মুক্তির কারণ (মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ)। ধম্মপদে বলা হইয়াছে—মন ধর্মসমূহের অর্থাৎ মানসিক বৃত্তিসমূহের পূর্বগামী, ধর্মসমূহ মনের উপর নির্ভর করে বলিয়া মনই শ্রেষ্ঠ, আর ধর্মসমূহের উৎপত্তি মনেই হইয়া থাকে (মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া)। দেহ গঠনেও মনের শক্তি অপরিসীম। রুগ্ন মানুষ যদি দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত চিন্তা করিতে পারে, আমার রোগ নাই—তাহা হইলে সে অনেক ক্ষেত্রে রোগমুক্ত হইতে পারে অথবা অনেক পরিমাণে তাহার ব্যাধির উপশম হইতে পারে। এইজন্য একজন পাশ্চাত্য মনীষী বলিয়াছেন, যখন

তোমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে 'কেমন আছ?' তখনই তুমি প্রসন্ন মনে উত্তর করিবে, 'ভাল আছি', 'বেশ আছি'। ইহাতে যে শুধু তোমার নিজেরই উপকার হইবে, তাহা নহে; অপরের মঙ্গল সাধিত হইবে। যাহারা তোমার সান্নিধ্যে আসিবে, তাহাদেরও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইবে কিন্তু যখনই তুমি অপরের কাছে তোমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে, সাংসারিক অশান্তি সম্পর্কে বা আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিযোগ করিবে, তখনই তুমি শুধু নিজের মনকেই ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবে তাহা নহে, অপরের মনকেও বিষাদগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। কারণ, আমাদের চিন্তা শুভই হউক আর অশুভই হউক, উহা সম-প্রকৃতিক লোকদের চিত্তে গিয়া আঘাত করিবেই।

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ

যাঁহারা মনকে স্থির করিতে চান, মনের শক্তি অর্জন করিতে চান, তাঁহাদের আহার সম্পর্কে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—'আহারশুদ্ধি হইতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়'। যাঁহারা হিতকর খাদ্য পরিমিত মাত্রায় ভোজন করেন (হিতমিতভুক্) এবং ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ না হইলে আহার করেন না, তাঁহারা অনেক ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা পান। যাঁহারা অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনা করেন, শারীরিক পরিশ্রম মোটেই করেন না এবং অত্যন্ত গুরুপাক দ্রব্য বেশী পরিমাণে আহার করেন, তাঁহারা নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—'বেশী খাবি ত' অল্প খা, অল্প খাবি ত' বেশী খা।' অর্থাৎ যদি বেশী দিন খাইতে চাও (বেশী দিন বাঁচিতে চাও) তাহা হইলে অল্প আহার কর, আর যদি অল্প দিন ভোজন করিতে চাও (অল্পায়ু হইতে চাও) তাহা হইলে বেশী পরিমাণে আহার কর। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—যাহারা বেশী আহার করে, তাহাদের চিত্ত স্থির হয় না (তাহারা যোগী হইতে পারে না); যাহারা অনাহারে থাকে, তাহারাও যোগী হইতে পারে না; যাহারা বেশী ঘুমায় তাহাদেরও যোগ হয় না, যাহারা বেশী জাগরণশীল, তাহাদেরও হয় না।

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ আহার সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন এবং বিভিন্ন খাদ্যের যে সকল গুণাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিলে একখানা বিশাল গ্রন্থ হইতে পারে। সকলেই জানেন, তাঁহারা খাদ্যকে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই, যিনি যে প্রকৃতির মানুষ, তাঁহার নিকট সেইরূপ আহার প্রিয়, আবার আমরা যেরূপ আহার্য গ্রহণ করি, আমাদের প্রকৃতিও সেইরূপ গঠিত হইয়া থাকে। তাঁহারা আরও বলেন, যাহারা আমাদের আহার্য রন্ধন বা পরিবেষণ করে, তাহাদের মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে থাকে। অবশ্য আমরা এ সকল কথা লইয়া কাহারও সহিত তর্ক করিতে চাহি না। বর্তমান জীবন-সংগ্রামের দিনে আহারের সকল বিধি পালন করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। তথাপি এ কথাও সত্য যে, বর্তমান কুশিক্ষার ফলে সংযমের আদর্শ হইতে আমরা পরিভ্রষ্ট হইয়াছি। আমরা যদি মনের প্রশান্তি রক্ষা করিতে চাই, মনঃশক্তি বর্ধিত করিতে চাই, ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে চাই, মনুষ্যত্বের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চাই, তাহা হইলে যেন কখনও লোভের বশীভূত হইয়া বা কাহারও অনুরোধের বশবর্তী হইয়া অতিভোজন বা অপথ্য সেবন না করি, যাহা কিছু স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল, তাহা যেন বিষের মত বর্জন করি। বাস্তবিক, 'জিতম্ সর্বম্ জিতে রসে',—যিনি রসনাকে জয় করেন, তিনি সকল ইন্দ্রিয়কেই জয় করেন। ভারতীয় ঋষির দৃষ্টিতে আহারের সঙ্গে মনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ—কেন না মন অন্নময়, আহারের সূক্ষ্ম অংশই মনরূপে পরিণত হয়। আর একটি কথা। চিত্তকে প্রশান্ত রাখিতে হইলে শুধু অতিভোজন বা অতিনিদ্রা নয়; বহুভাষিতা, বৃথা তর্ক, পরনিন্দা, পরচর্চা প্রভৃতিও পরিহার করিতে হইবে। কবির কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে—'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।'

উপসংহার

মন যখন যাহা চায়, তখন তাহাই করার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। যদি মনকে শাসন করিতে না পারি, তাহা হইলে পশুর সঙ্গে আমাদের পার্থক্য কোথায়? যদি দুষ্ট অশ্বকে নিয়ন্ত্রণ না করি, তাহা হইলে গন্তব্য স্থানে

পৌঁছাইব কেমন করিয়া? অবশ্য মানুষের মনের যেমন চেতন ও অবচেতন স্তর আছে, তেমনই অচেতন স্তরও আছে। আধুনিক মনোবিদ্যায় এই অচেতন স্তরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের মানসিক বিকারসমূহের মূল অনেক সময় এই অচেতন মনে প্রোথিত থাকে। আমাদের দেশের যোগিগণ এই অচেতন মনের অস্তিত্বের কথা জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন, অচেতন মনের সংস্কার-সমূহই বাসনার মূল, তাই তাঁহারা কঠোর সাধনার দ্বারা সংস্কারের বীজ দগ্ধ করিতেন। এইজন্যই যোগশাস্ত্র আটটি সাধনের নির্দেশ দিয়াছেন। এই সাধনার দ্বারা তাঁহারা চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ করিতেন, অর্থাৎ সমস্ত চিত্তবৃত্তি একটি লক্ষ্যের অভিমুখ করিতেন।

কিন্তু শুধু পারমার্থিক সিদ্ধি নয়, ব্যাবহারিক জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলেও চিত্তের একাগ্রতার প্রয়োজন। যাহার চিত্ত সতত চঞ্চল, অবস্থার বিপর্যয়ে যে মুহ্যমান হইয়া পড়ে, ব্যর্থতার সম্মুখীন হইলে যে রণে ভঙ্গ দেয়, সে কিরূপে অভ্যুদয় লাভ করিবে? জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে চাই প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস, চাই অনলস কর্ম-সাধনা। পর্বতপ্রমাণ বিঘ্ন আসে আসুক, আমি বিচলিত হইব কেন? আমি ক্ষুদ্র নই, বিরাট্; আমার মধ্যে মহাশক্তি বিরাজিত, সেই শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আমি পৃথিবীতে যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করিতে পারি;—প্রতিদিন এইরূপ ভাবনার দ্বারা আমাদের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হয়, আমরা 'অভীঃ' বা ভয়শূন্য হই। এইজন্য স্বামিজী তাঁহার শিষ্যকে বলিয়াছেন, 'আমি বীর্যবান, আমি প্রজ্ঞাবান, আমি মেধাবান, আমি শক্তিমান, বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি।' এ বিষয়ে মহাপুরুষদের দৃষ্টান্ত স্মরণ রাখিলেও বিশেষ উপকার হইয়া থাকে।

চিত্তকে স্থির করিবার আর একটি উপায় নিহিত রহিয়াছে গীতার সেই বচনের মধ্যে—'মামনুস্মর যুধ্য চ।' সংসার সংগ্রাম-ক্ষেত্র, সুতরাং বীরের মত সংগ্রাম আমাদিগকে করিতেই হইবে, কিন্তু এই কথাটি আমাদের সতত স্মরণ রাখিতে হইবে, স্বয়ং ভগবান আমাদের রথের সারথি, সুতরাং আমাদের ভয় নাই, পরিণামে বিজয় আমাদের সুনিশ্চিত। ভারতের ঋষিগণ কর্মের এই কৌশলটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

পতঞ্জলি প্রভৃতি মহর্ষিগণ যে অপূর্ব মনঃশিল্পের উদ্ভাবন করিয়াছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। তাঁহারা যে অমূল্য সম্পদ আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা উহার যোগ্য উত্তরাধিকারী হইতে পারি নাই। পাশ্চাত্ত্য দেশে মনোবিদ্যা দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আসন গ্রহণ করিয়াছে, ফলিত মনোবিজ্ঞান মানুষের মনের গভীরতম প্রদেশে আলোক-সম্পাত করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহও মনঃশিল্পের উদ্ভাবন করিয়াছে,—ভাবনা (auto-suggestion), সংবেশন (hypnotism), মনো-বিকলন (psycho-analysis) প্রভৃতির সাহায্যে আপনার বা অপরের মনের পরিবর্তন-সাধন এই মনঃশিল্পের অন্তর্গত। তথাপি, ভারতীয় যোগশাস্ত্রের সহিত তুলনা করিলে তাহাদের মনঃশিল্প এখনও শৈশবাবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু এই মনঃশিল্পের প্রয়োগের দ্বারা কিভাবে জীবনকে সুন্দরতর ও উজ্জ্বলতর করা যায় এবং ব্যাবহারিক জীবনে সিদ্ধিলাভ করা যায়, সে বিষয়ে বহু পাশ্চাত্ত্য মনীষী আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের ভারতবর্ষের ঋষিগণ দর্শনশাস্ত্রকে কখনও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই, তাই ভারতীয় দর্শন—বিশেষতঃ সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত শুধু পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়, সাধনার দ্বারা উপলব্ধির বস্তু। এই তিনটি দর্শনের মধ্যেই সূত্রাকারে ভারতীয় মনঃশিল্প নিহিত আছে। এই মনঃশিল্পের প্রয়োগের দ্বারা আমরা যে শুধু পারমার্থিক কল্যাণ লাভ করিতে পারি, তাহা নহে; আমাদের জীবনকে মহত্তর ও উন্নততর করিয়া তুলিতে পারি এবং সকল কর্মে সিদ্ধি ও বিজয় লাভ করিতে পারি।

অবন্ধন

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ওরা যে জানে না কেউ
আমারও ওড়ার পাখা আছে।
ঘরেতে বন্ধ থাকি,
আকাশ তবুও খুব কাছে,
মুখ এনে, বুক ভরে,
নিজের প্রাণের কথা বলে ;
ওরা যে জানে না তাই
ভাবে আমি বাঁধা শৃঙ্খলে।

ওরা যে জানে না কেউ
আমিও বলতে পারি কথা।
ওরা ভাবে মূক আমি
দেখে এই ঘন মৌনতা।
কবিতার চাঁদ ওঠে
মনেতে ছন্দ-কৌমুদী,
ভেবেই পাই না তাকে
লেখনীর কোন বাঁধে রুধি।

ওরা যে জানে না কেউ
আমারও একটি মন আছে।
সেইখানে ঢেউ ওঠে
ভাবনারা তারা হয়ে নাচে।
ওরা ভাবে নত চোখে
সারাদিন কাজ করে যাই,
প্রতিবাদ নেই তাই
ঘুচে গেছে মনেরও বালাই।

ওরা যে জানে না কেউ
আমারও দৃষ্টি আছে চোখে,
বেঁধেছে দেখার সীমা,
ভাবে আমি দেখি না আলোকে
এ হৃদয় চোখ হয়ে
অনুভবে দেখে সবকিছু,
ওরা যে জানে না তাই
বৃথাই ঘোমটা টানে নীচু।

'গোরা' উপন্যাসের আনন্দময়ী

শ্রীমণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

যে ভারত অসহিষ্ণু ধর্মমত লয়ে
করে নাই অভিযান,—সর্ব দুখ সয়ে
যে দিয়াছে আত্ম-পর সবারে আশ্রয়,
উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহে রহিয়া নির্ভয়,
তুমি মা তাহারই বাণী ;—তাই তো সেদিন
হিংসার তাণ্ডব মাঝে নাম-গোত্রহীন
যবন সন্তানে বুকে লইলে তুলিয়া,
সমাজশাসন বাধা সকলই ভুলিয়া।

তব তরে নহে ধর্ম নহে অনুষ্ঠান ;
যে ধর্ম শুচিতা লয়ে কণ্ঠাগত প্রাণ
তাহার উপরে রহি মহিমা তোমার
সবার উপরে মাতা করিলে বিস্তার।

ভারতের মূর্ত দেবী,—স্নেহ-অধিকারে
সবারে টানিলে কোলে চিনিলে সবারে।

বাংলা সাহিত্যে আজগুবী রচনা

কুমারেশ ঘোষ

[শ্রীমান কুমারেশ ঘোষ বাংলা সাহিত্যে আজগবী বা আজগুবীর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি গবেষক নন, প্রাচীনও নন, খাঁটি আহেলী হাতে-কলমে কাজের মানুষ: অধুনা ও আধুনিকের সঙ্গেই তাঁহার সম্যক্ পরিচয় ও খাতির। তবু তিনি পুরাতন ভিত্তির উপর এখনও আস্থাবান বলিয়া পুরাতনের খবর করিতে চাহিয়াছেন। গভীর গবেষণায় লিপ্ত না হইয়াও আমরা গোড়ার কথা কিঞ্চিৎ সংযোজন করিয়া দিতেছি। কোনও অধ্যবসায়ী গবেষক নিষ্ঠার সহিত এই বিষয়ে খনন ও অনুসন্ধান করিয়া থীসিস লিখিলে ভাল (অর্থাৎ ডি. লিট.; ডি. ফিল. নহে) ডক্টরেট ডিগ্রী পাইবেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য মূলতঃ ধর্মবিষয়ক; রাধাকৃষ্ণ-পদাবলী ও কীর্তন, মঙ্গল-কাব্যগুলি, রামায়ণ-মহাভারত-বিষ্ণুপুরাণ-ভাগবত প্রভৃতি পুরাণের ভাবানুবাদ, মায় জীবনী-কাব্যগুলিও দেবতাদের কীর্তিকলাপ ও লীলাবিলাসে ওতপ্রোত। বহুক্ষেত্রে মানুষকেই দেবতার পদে বসান হইয়াছে। সুতরাং অলৌকিক বা আজগুবী কাণ্ডের অভাব নাই। সিংহলের পথে ধনপতি সওদাগরের গজসংহারিণী ও উগারিণী কমলেকামিনী দর্শন ইহার সামান্য দৃষ্টান্ত। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর নৌকার কাঠের সেঁউতির সোনা হওন এবং রামপ্রসাদের "এবার কালী তোমায় খা"ওনও বাদ দিলাম। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের কথাসরিৎসাগর আরব্য-পারস্য-উপন্যাস পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ বেতালপঞ্চবিংশতি গোলেবকাওলি হাতেম-তাই চাহারদরবেশ ইত্যাদিকেও সামগ্রিক আজগুবীত্বের জন্য বাদ দিতেছি।

বাংলা সাহিত্যের শেষ পুরাতন ও প্রথম নূতন সাধক কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের রচনাতেই প্রথম লৌকিক আজগুবীত্বের নিদর্শন পাইতেছি। তাঁহার 'বোধেন্দু বিকাস' নাটকে যে গোপন আজগুবী কথাটি তিনি বলিতে গিয়াও বলেন নাই এবং যাহা সুরে গাহিয়া রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে "বড়দাদা" দ্বিজেন্দ্রনাথ হা-হা-হা অট্টহাসিতে মহর্ষির বৈঠকখানা-ভবন প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেন ('জীবন-স্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষ্য দ্রষ্টব্য) তাহা এই :—

"ও কথা, আর বোলো না, আর বোলো না,
বলছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা,
হাসবে লোকে। হাসবে লোকে॥
বল হে, জ্বোলবো কত, বোলবো কত,
বোলতে হোলো মনের দুখে। মনের দুখে।
এ বড় অনাসৃষ্টি, বিষম সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি
সাপের মুখে। সাপের মুখে॥"

সম্ভবতঃ এই কথাটাই আর একটু বিশদ করিয়া গুপ্তকবি এই 'বোধেন্দু বিকাসে'ই প্রকট করিয়াছেন এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় কথাটা বেমালুম মারিয়া দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। কথাটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছে এই :

"দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে, রাত পোয়ানো ভার।
হোলো পুন্নিমেতে অমাবস্যা, তের-পহর অন্ধকার॥
এসে বেন্দাবনে বোলে গেল বামী বষ্টমী।
একাদশীর দিনে হবে জন্ম-অষ্টমী॥
আর ভাদ্দর মাসের সাতুই পোষে
চড়ক পুজোর দিন এবার॥১
সেই ময়রা মাগী মরে গেল, মেরে বুকে শূল,
বামুনগুলো ওষুদ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কালো বিষ্টি-জলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হোলো ছারেখার॥২
ঐ সুজ্জিমামা পূব্ব দিগে অস্তে চোলে যায়,
উত্তুর দখিন কোণ থেকে আজ,
বাতাস লাগচে গায়।
সেই রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া
শিং উঠেছে দুটো তার॥৩
ঐ কলু রামী ধোপা শামী, হাসতেছে কেমন।
এক বাপের পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন।
কাল কামরূপেতে কাক মরেছে,
কাশীধামে হাহাকার॥৪"

আজগুবী প্রসঙ্গে প্রায় অষ্টাধিকশত বর্ষ আগের এই রচনাটিকে ইতিহাসের দিক দিয়া গোড়ার কথা বলা চলে। পরে পরে আরও অনেক কথা আছে। দীনবন্ধুর 'যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুবর্ণ-গোলক,' দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ,' দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত ও দুর্গাচরণ রায় লিখিত 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন,' স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দেবকৌতুক' প্রভৃতি

হইতে রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গ-কৌতুক' পর্যন্ত আজগুবী অনেক আছে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ইঁহারও পরে। শ্রীমান কুমারেশ ঘোষ ত্রৈলোক্যনাথ হইতেই শুরু করিয়াছেন।

যাহা ইতিহাসের আওতায় আসে না তাহা হইতেছে ছেলেভুলানো ছড়া, রূপকথা, ব্রতকথা আর পাঁচালী। এইগুলি আজগুবী সাহিত্যের নিঃসংশয়ে আদিকথা। লেখক এইগুলিকে মাত্র ছুঁইয়া গিয়াছেন। এগুলি বৃহত্তর ও পূর্ণতর আলোচনার দাবি রাখে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বাংলা দেশের সর্বাধিক আজগুবী কাহিনী—সপ্তদশ অশ্বারোহীসহ বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গবিজয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'মৃণালিনী'তে এই আজগুবীত্ব ক্ষালন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

গোড়ার কথা একটু বলিলাম। আগামীবারে এই নিবন্ধ শেষ হইলে আর একটু সংযোজনী দিবার চেষ্টা করিব।—সম্পাদক, শ. চি.]

প্রাক্‌সমকালীন

ননসেন্স রাইম্‌সের বাংলা নাম কি হবে? খামখেয়ালী ছড়া? খেয়াল-খুশীর ছড়া? পাগলামী কবিতা? অথবা আজগুবী ছড়া? এতগুলির মধ্যে আজগুবী ছড়া কথাটি মন্দ নয়। তবে এই প্রসঙ্গে ননসেন্স রাইম্‌স্ নিয়ে শুধু আলোচনা না করে ননসেন্স রাইটিংস অর্থাৎ আজগুবী গদ্য এবং পদ্য দুই নিয়ে আলোচনা করব যখন তখন আজগুবী ছড়া না বলে আজগুবী রচনা কথাটাই ব্যবহার করা সমীচীন হবে বলে মনে করি। তা ছাড়া রাইম্‌স্ বলতে ছোটদের জন্যে লেখা 'ছড়া' কথাটাই বোঝায়, কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় শুধু ছোটদের ছড়া নিয়ে নয়, বড়দের ওই ধরনের আজগুবী রচনাগুলিকেও নিয়ে।

বিদেশী সাহিত্যে এই ধরনের আজগুবী লেখার প্রচলন খুব বেশী এবং সে সব লেখা শুধু ছোটদের ছড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে আছে বড়দের পাঠ্যতালিকার মধ্যেও। সারভেন্টিস-এর 'ডন কুইক্সোট,' সুইফ্‌টের 'গ্যালিভার্স ট্রাভেলস্' ছোটরা পড়ে বটে, আসলে কিন্তু লেখা বড়দেরই জন্যে। রচনাগুলি খামখেয়ালের মুখোশের অন্তরালে তীব্র ব্যঙ্গের প্রকাশ। তবে লুই ক্যারলের 'এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' ছোটদের জন্যে লেখা আজগুবী রচনার এক অপূর্ব নিদর্শন। নির্মল হাস্যরসে সারা বইখানা টইটম্বুর।

কার্লো কলোদির 'পিনোসিও' এবং 'উইজার্ড অফ দি ওজ' ইত্যাদি বইও উচ্চশ্রেণীর আজগুবী রচনা। ভল্‌টেয়ারের 'ক্যাণ্ডিড' বইখানিও আজগুবী রচনার একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এ যুগে থারবারও খামখেয়ালী রচনায় সুপরিচিত, তবে তাঁর লেখাগুলি বেশীর ভাগই গদ্য এবং হাস্যরসে ভেজানো। ওগডান ন্যাসের খামখেয়ালী লেখাগুলি বেশীর ভাগই পদ্যে, তবে গদ্যের আকারে—এবং সেগুলি রচিত হয়েছে বড়দের জন্যে। মানুষ বৃদ্ধ হলে নাকি শিশুদের মতই হয়ে পড়ে, তাই বুঝি ন্যাসের লেখা পড়বার নেশা বড়দের মধ্যে, বৃদ্ধদের মধ্যেই বেশী।

অবশ্য আজকে আমার বক্তব্য বিদেশী আজগুবী রচনা নিয়ে নয়; বিশুদ্ধ স্বদেশী আজগুবী রচনার দিকেই আমার লক্ষ্য। তবে তার আগে এই জাতীয় লেখার বিষয়ে কিছু আলোচনা করা দরকার।

রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনার সঙ্গে খামখেয়ালী বা আজগুবী রচনার পার্থক্য চট করে চোখে পড়ে না বটে, তবে পার্থক্য চাট্টিখানি নয়; যদিও আপাতদৃষ্টিতে রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও আজগুবী রচনার ভাবভঙ্গী প্রায় যমজ ভাইবোনের মতই বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। তবু জানিয়ে রাখা ভাল, রঙ্গ-ব্যঙ্গ লেখার মাধ্যমে কোন লোককে বা কোন ঘটনাকে আক্রমণ করা হয়ে থাকে কিংবা তার উদ্দেশ্যে বা তাকে কেন্দ্র করে লেখা হয়ে থাকে সাধারণতঃ, কিন্তু আজগুবী লেখা আপন খেয়ালে বকে যায়; অথবা মনোগত ইচ্ছাটা অন্যের মনোরঞ্জন করা। রঙ্গ-ব্যঙ্গ রচনাকে যদি ফাজিল-ঝগড়াটে বলা যায়, তবে আজগুবী রচনা স্রেফ পাগল ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু কথা হচ্ছে সত্যিকারের পাগল যে, তার পক্ষে পাগলামী করাটা স্বাভাবিক; কিন্তু পাগল সাজা বড় শক্ত। কাজেই স্বাভাবিক লেখকের পক্ষে পাগলের মত যা-তা লেখা সত্যিই যা-তা ব্যাপার নয়। করুণ বা গম্ভীর রচনা লেখা যত সহজ, রঙ্গ বা ব্যঙ্গ রচনা লেখা তত সহজ নয়; আর আজগুবী লেখা যাকে বলে রীতিমত আয়াস-সাধ্য। তাই বাংলা সাহিত্যে কেন, যে কোন সাহিত্যে আজগুবী রচনা যেখানে সেখানে ছড়িয়ে থাকে না—সত্যি কথা বলতে কি, এ বস্তুটি দুর্লভ।

কারণ মানুষ চায় লাইন ধরে চলতে, বেলাইনে যেতে তার বড় ভয় এবং লজ্জা। ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া সহজ, কিন্তু ভিড় থেকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সমালোচনার ভার বহন করবার সাহস অতি অল্প লোকেরই থাকে। তা ছাড়া সংসারে অজ্ঞানের ভাব দেখানো জ্ঞানীর পক্ষেই সম্ভব। প্রকৃত সাধুই থাকেন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায়, পাছে লোকে তাঁকে বিরক্ত করে। সার্কাসে ক্লাউন প্রায় সব খেলাই জানে, তবু না জানার ভান করে লোক হাসায় এবং ওইখানেই তার কৃতিত্ব। যে কোন আর্টিস্টের পক্ষেই তুলি ধরে নিয়মমাফিক ছবির চোখ-কান-মুখ আঁকা সম্ভব, কিন্তু খামখেয়ালীর তুলিতে ছবির যেখানে সেখানে চোখ-মুখ বসিয়ে দেওয়া

কিংবা মুখের সীমারেখার বাইরে পটল-চেরা চোখের রেখা টেনে আর্টের সৃষ্টি করা রামা-শ্যামা আর্টিস্টের সাধ্য নয়, এ শিল্পকর্ম পিকাসো, যামিনী রায়েই সম্ভব। সহজ যে খুব সহজ নয়, সে কথা রবীন্দ্রনাথও বলেছেন তাঁর শেষ বয়সে লেখা খামখেয়ালী ছড়া 'খাপছাড়া'র ভূমিকায়: 'সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে! সহজ করে যায় না লেখা সহজে।'

আজগুবী ছড়া লেখা যেমন সহজ নয়, বয়স্কদের পক্ষে হজম করাও তেমনি শক্ত। সুকুমার রায় তাঁর 'আবোল-তাবোল' বইয়ের প্রথমেই তাই বলেছেন: 'যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।'

কারণ কবি জানতেন, কবিতার এই উদ্ভট পিল হজম করা অনেকের পক্ষেই শক্ত; কারণ, হাসা একটা আর্ট এবং হাসতে পারা জীবনের সৌভাগ্য। কিন্তু অনেকেই মনের দিক দিয়ে অসুস্থ। যেন—'রামগড়ুরের ছানা, হাসতে তাদের মানা, হাসির কথা শুনলে বলে, হাসব না-না, না-না।'

অথচ অতি সহজ ভাষায় সহজ সুরে লেখা কত আজগুবী ছড়া আর গল্প আমরা ছেলেবেলায় অতি সহজেই বিশ্বাস করেছি এবং বিশ্বাস করে যে ভীতি-বিস্ময়ভরা আনন্দ পেয়েছি তা বুঝি পরবর্তী জীবনে সারা বিশ্ব তোলপাড় করেও পাই না। ভূতের গল্প, রাক্ষসের গল্প, আর নানা রকমের অবিশ্বাস্য গল্প আর ছড়া আমাদের মনকে একদা অভিভূত করে রেখেছিল।

এক কথায় বলতে গেলে, শৈশবের অজ্ঞান অবস্থায় প্রথম জ্ঞানের আলোর আভাস যখন সবেমাত্র দেখতে পাই, সেই পরম লগ্নে মা-মাসী-পিসীর আদরের আতর মেশানো যে ছড়া আর সুরের আবেশে আমাদের মন-প্রাণ বিহ্বল হয়ে পড়ে তা অতি সহজ সরল খামখেয়ালী বা আজগুবী রচনা মাত্র। মা বলছেন—

দোল দোল দোল
কিসের এত গোল?
না, খোকা যাবে বিয়ে করতে
সঙ্গে ছ'শো ঢোল।

অথচ মা ভালই জানেন, খোকার বিয়েতে পালকি বা মোটর সাজানো হতে পারে, বাজনারও ব্যবস্থা হয়তো হবে। তা বলে বিয়েতে এক সঙ্গে ছ শো ঢোল বাজাতে যাওয়া স্রেফ পাগলামী। তবে বুঝি এই অদ্ভুত কল্পনার কাঠিতেই মায়ের হৃদয়ে বাজছে ছ শো ঢোলের বাজনার আনন্দ! তেমনই:

খোকা যাবে শ্বশুরবাড়ি
সঙ্গে যাবে কে?
ঘরে আছে হুলো বেড়াল
কোমর বেঁধেছে!

কেন, খোকার সঙ্গে বরযাত্রী যাবার মত কি কেউ নেই? থাকবে না কেন? এ শুধু খোকার সঙ্গে মায়ের দুষ্টুমি! দুষ্টু খোকাকে ক্ষেপাবার জন্যে মায়ের এই অদ্ভুত ব্যবস্থা। তা ছাড়া মা ভাল করেই জানেন ওইটুকু খোকার বিয়ের বয়স হয় নি এখনও। তবু যদি সে বিয়ে করতে যায় তবে এই অদ্ভুত বিয়ের সঙ্গী হবার মত আর কে আছে হুলো বেড়াল ছাড়া? যেমন বর তার তেমনই বরযাত্রী!

খোকার বিয়েতে নাচের ব্যবস্থাও হয়েছে। তবে নাচিয়েরা একটু ভিন্ন শ্রেণীর। আর মা তাঁর সোনামণির বে'-তে এত খুশী যে, অদ্ভুত কল্পনা করতেও বাধছে না তাঁর। তিনি বলছেন:

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
কদমতলায় কে?
হাতী নাচছে, ঘোড়া নাচছে,
সোনামণির বে'!

তবে খোকা যখন নাচে—মানে মা-ই যখন তাকে ধরে নাচান, তখন সে নাচন তাঁর কাছে বিশেষ দ্রষ্টব্য হবারই কথা। মা তাই অদ্ভুত ছড়া কাটেন:

আয় রে আয় টিয়ে
নায় ভরা দিয়ে
না' নিয়ে গেল বোয়াল মাছে
তাই না দেখে ভোঁদড় নাচে!
ওরে ভোঁদড় ফিরে চা'
খোকার নাচন দেখে যা!

খোকার নাচন দেখাবার জন্যে মা তাঁর হাতের কাছে

লোক না পেয়ে টিয়েকে ডাকছিলেন নৌকো চড়ে আসতে (কেন, সে কি উড়ে আসতে পারত না? কে জানে!), তা সে নৌকো তো গিলে ফেলল বোয়াল মাছে (তার আর খাবার জুটল না বুঝি!) আর তাই দেখে ভোঁদড়ের প্রাণেও বা এত পুলক জাগল কেন যে নাচতে শুরু করল! কিন্তু নাচটা মায়ের চোখে মোটেই ভাল লাগল না। বললেন ডেকে, ও কি ঘোড়ার ডিমের নাচ হচ্ছে। নাচ কাকে বলে—এই দেখ আমার খোকার নাচ! অবশ্য, ভোঁদড়ের নাচটা হয়তো সত্যিই ভাল হচ্ছিল না, তবে খোকার মায়ের চোখে খোকার নাচন ছাড়া উচ্চশ্রেণীর ভারতনাট্যম, কথাকলি, বা মণিপুরী কিছুই নাচের পর্যায়ে পড়ে না। এমনই স্নেহান্ধ মায়ের পাগলামী।

এগুলি ছাড়া বহু খামখেয়ালী ছড়া ছড়ানো রয়েছে বাংলার আকাশে-বাতাসে—যার এক বর্ণেরও মানে নেই, কিন্তু মান তাদের আজও কমে নি এক কণাও। আজকের যন্ত্রযুগের শিশুদের মন ভোলাবার জন্যেও সেই সব 'মানে'-না-মানা ছড়াগুলিকেই নানা রঙে বিচিত্রিত করে তাদের সামনে ধরা ছাড়া উপায় দেখি নে।

আদুড় বাদুড় চালতা বাদুড়
কলা বাদুড়ের বে'
টোপর মাথায় দে'।

কিংবা,

তাঁতীর বাড়ি ব্যাঙের বাসা
কোলা ব্যাঙের ছা'।
খায় দায় গান গায়
তাইরে নাইরে না।

অথবা,

খোকন, খোকন, করে মায়
খোকন গেছে কাদের নায়?
সাতটা কাকে দাঁড় বায়
খোকন রে তুই ঘরে আয়।

এবং

হাট্টিমা টিম টিম
তারা মাঠে পাড়ে ডিম
তাদের খাড়া দুটো শিং
তারা হাট্টিমা টিম টিম।

এই সব সরল সুন্দর ছন্দোময় খামখেয়ালী ছড়াগুলি রচয়িতা কে জানি নে, কিন্তু এ কালের কবিতাগুলির মা তো দুর্বোধ্য নয়। ওই সব ছড়াগুলিকে অ্যান্টিক কাগজে ছাপিয়ে ভাল মলাটে বাঁধাবার দরকার হয় নি, খবরে কাগজে রিভিয়্যুর দরকার হয় নি, দরকার হয় নি এগুলি কবিকুলকে সম্বর্ধনা জানাবার। মানুষের খামখেয়ালী মনের মাটিতেই এদের জন্ম; মনে করে রেখেছে মানু বংশ-পরম্পরায় এবং আজও মানুষের মনের মণি-কোঠা এরা সগৌরবে সসৌরভে ফুটন্ত।

আজও তাই আজগুবী ছড়া লেখার শেষ নেই কবির মন আজও থেকে থেকে হেঁকে বলে বোধ হয়:

আয় রে ভোলা খেয়াল-খেলা স্বপন-দোলা নাচিয়ে আয়,
আয় রে পাগল আবোল-তাবোল, মত্ত মাদল বাজিয়ে আ
আয় যেখানে খ্যাপার গানে নাইকো মানে, নাইকো সুর,
আয় রে যেথায় উধাও হাওয়ায় মন ভেসে যায় কোন্ সুদূ

* * *

আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল মাতবি মাতাল রঙ্গেতে
আয় রে তবে ভুলের ভবে অসম্ভবের ছন্দেতে॥

বাংলা সাহিত্যে আজও তাই আজগুবী ছড়া লেখার অভাব হয় নি। ছোটদের মন ভোলাবার জ উদ্ভট কল্পনার কলম চালানোর শক্ত কাজকে সহজ করেছে যাঁরা, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুকুমার রা যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতির নামই প্রথমে মনে আসে।

রবীন্দ্রনাথের ভাব-গম্ভীর লেখনী শেষ বয়সে সহ যে-ভাবে কচি-কাঁচার জন্যে তার ভোল পালটে 'খাপছা কবিতা লিখতে শুরু করল, তা ভাবলে অবাক হতে হ 'শিশু ভোলানাথ', 'শিশু' বা 'কথা ও কাহিনী' রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব কবিতাই ছোটদের জন্যেই লে কিন্তু তার কোনটিকেই আবোল-তাবোলের পর্যায়ে যে যায় না। অনেক কবিতাই শিশু-মনের রঙিন কল্পন প্রাণবন্ত, কিন্তু তা বলে প্রত্যেকটিই তালে ঠিক আ বেতালা নয়। কিন্তু 'খাপছাড়া'তে রবীন্দ্রনাথ চ লাগালেন সবাইকে; দেখালেন, তাঁর লেখনী শুধু ভ আর ছন্দ নিয়ে কারবার করে না, আজগুবী মাল-মসল তাঁর ঘরে মজুত আছে। পদ্যে 'খাপছাড়া' আর গ

সে' তার প্রমাণ। তাঁর লেখা ছোটদের পাঠ্যপুস্তক 'সহজ পাঠ'ও আজগুবীর ঝোঁক থেকে মুক্ত নয়। 'খাপছাড়া'র বহু কবিতা আমাদের মুখস্থ। যেমন:

ক্যাম্বুড়ির দিদিশাশুড়ির
পাঁচ বোন থাকে কালনায়,
শাড়িগুলো তারা উনুনে বিছায়
হাঁড়িগুলো রাখে আলনায়!

কিংবা,

ঘাসে আছে ভিটামিন, গরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।
অনুকূলবাবু বলে ঘাস খাওয়া ধরা চাই,
কিছুদিন জঠরেতে অভ্যেস করা চাই—
বৃথাই খরচ ক'রে চাষ করা শস্য।

অথবা,

বর এসেছে বীরের ছাঁদে
বিয়ের লগ্ন আটটা
পিতল আঁটা লাঠি কাঁধে
গালেতে গালপাট্টা।

এগুলি ছাড়াও বহু কবিতা আছে, যা সত্যিই অদ্ভুত রসে রসালো:

দুকানে ফুটিয়ে দিয়ে কাঁকড়ার দাঁড়া
বর বলে, 'কান দুটো ধীরে ধীরে নাড়া।'

অথবা,

শুনবো হাতির হাঁচি, এই বলে কেষ্টা
নেপালের বনে বনে ফেরে সারা দেশটা।

কিংবা,

স্ত্রীর বোন চায়ে তার ভুলে ঢেলেছিল কালি,
'শ্যালী' বলে ভৎর্সনা করেছিল বনমালী।

'সহজ পাঠে'র "একদিন রাতে আমি স্বপ্ন দেখিনু"—কবিতাটি আজগুবী বলেই ছেলেরা তাদের স্কুলের পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেরা পড়ে মুখস্থ করে:

একদিন রাতে আমি
স্বপ্ন দেখিনু
চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ,
বলে যেন বিনু।
চেয়ে দেখি ঠোকাঠুকি
বরগা কড়িতে
কলিকাতা চলিয়াছে
নড়িতে নড়িতে
* * *
হাওড়ার ব্রিজ চলে
মস্ত সে বিছে,
হ্যারিসন রোড চলে
তার পিছে পিছে

এবার গদ্যে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'সে' থেকেও দু একটি আজগুবী রচনার নমুনা দিই:

"দ্বৈপায়ন পণ্ডিতের দল ঘাসের থেকে সবুজ সার বের করে নিয়ে সূর্যের বেগ্‌নি-পেরোনো আলোয় শুকিয়ে মুঠো মুঠো নাকে ঠুসছেন। সকাল বেলায় ডান নাকে; মধ্যাহ্নে বাঁ নাকে; সায়াহ্নে দুই নাকে একসঙ্গে।"

আর এক জায়গায়:

"স্মৃতিরত্ন মশায় মোহনবাগানের গোল-কীপারি করে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে খিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ-চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অক্‌টার্লনি মনুমেন্ট। নীচে থেকে চাটতে চাটতে চুড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড় জিনিসটাকে এঁটো করে দিলেন! * * 'তোবা, তোবা' বলে তিনবার মনুমেণ্টের গায়ে থুথু ফেলে মিঞা সাহেব দৌড়ে গেল স্টেটস্‌ম্যান-আপিসে খবর দিতে।"

এই ধরনের বহু অদ্ভুত ও উদ্ভট কল্পনায় 'সে' বইখানি ভরপুর। কিন্তু চারু ভট্টাচার্য মহাশয়কে বইখানি উৎসর্গ করবার সময় কবি লিখছেন:

আমারো খেয়াল ছবি মনের গহন হতে
ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।...
যেথা আছে খ্যাতিহীন পাড়া
সেথায় সে মুক্তি পায় সমাজ-হারানো লক্ষ্মীছাড়া।...
ফসল কাটার পরে
শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে
আগাছার সাথে।
এমন কি আছে কেউ যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে
যার কোন দাম নেই,
নাম নেই

অধিকারী নাই যার কোনো
বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয়নি কখনো।

'খাপছাড়া'র উৎসর্গ-পত্রেও রাজশেখর বসু মহাশয়কে কবি লিখছেন শেষ দুটি লাইনে :

দেখাবো সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা।
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না॥

কচি-কাঁচাদের জন্যে লেখা কবির শেষ বয়েসের পাকা হাতের আজগুবী সৃষ্টিগুলিকে যদি তিনি নেহাত বিনয়-বশতঃই 'অনাসৃষ্টি' 'তুচ্ছ ফুল' বলেন, তবে আমাদের বলবার কিছু নেই, কিন্তু যদি তিনি তা সত্যিই বলে থাকেন, তবে এইখানে আমাদের আপত্তি জানিয়ে রাখলাম। বনশ্রী এইগুলির মর্যাদা না দিলেও, রসিক-সমাজে তাঁর এই 'অনাসৃষ্টি'গুলি অপাংক্তেয় তো নয়ই, বরং আপন মহিমায় মহিমান্বিত।

আজগুবী রচনায় বাংলা সাহিত্যে অবনীন্দ্রনাথের দানও কম নয়। ছেলেদের জন্যে মন-ভুলানো রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। কিবা গদ্যে, কিবা পদ্যে, তাঁর রসালো কলম সমান সচল। তাঁর বহু আজগুবী রচনার মধ্যে একটি :

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৯ এ ঐ ও ঔ
কেউকেটা নয় এরা কেউ
রাত যখন বারোটা প্রাণে হাওয়ায় দেয় ঝাপটা
জাগে ঘুম ভেঙে এরা কয়টা
বলে অ আ, রাত কয়টা
চারটা না পাঁচটা না ছয়টা।...
কুত্তাটা দাঁত ভাঙা লেজ আপসায় বলে 'ভৌ-ভৌ'
একলা মোরগ জাগে বলে ভোর হৌ হৌ ও ঔ ঔ!

অবনীন্দ্রনাথের এই ধরনের আরও অনেক আজগুবী রচনা আছে, যা আজগুবী সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

গগনেন্দ্রনাথ বেশীর ভাগ তুলির কারবারই করতেন। বাংলা দেশে ব্যঙ্গচিত্রের উন্নতিসাধন তাঁরই কীর্তি। কিন্তু আজগুবী রচনাতেও তিনি ছিলেন পাকা কারিগর। তাঁর লেখা 'ভোঁদড় বাহাদুর' এই ধারার রচনার একটি নাম-করা সাক্ষী।

তবে আজগুবী সাহিত্যে সুকুমার রায় যেন এক-মেবাদ্বিতীয়ম্! এক কথায় সুকুমার রায় মানেই যেন আজগুবী রচনা; আর আজগুবী রচনা মানেই বুঝি সুকুমার রায়। আজগুবী সাহিত্যে তাঁর 'আবোল-তাবোল' আর 'হযবরল' যেন দুটি মানিকজোড়। উদ্ভট কল্পনার অতি অদ্ভুত প্রকাশ। এই দুখানি আজগুবী বই ছাড়াও 'খাই-খাই' ও 'পাগলা দাশু' কম উপভোগ্য নয়। এই কয়খানি আজগুবী বই লিখে শিশু-মনের আজব-সিংহাসনে যেভাবে স্থায়ী আসন অধিকার করে আজও তিনি সসম্মানে আসীন, তা দেখে সত্যিই তাজ্জব বনে যেতে হয়। বড় বড় ভাবের খেলা ও ভাষার কারুকার্য দেখিয়ে গাদা গাদা মোটা বই লিখে অনেক লেখক যা করতে পারেন না, সুকুমার রায় অতি সরল সুন্দর ভাষায় অতি অবাস্তব কল্পনায় রাঙানো মাত্র কয়েকখানি পাতলা বই লিখে সেই অসাধ্য-সাধন করেছেন। এ বড় কম কথা নয়।

সুকুমার রায়ের তুলির টানগুলিও কম আজগুবী নয়; তাঁর কলমের আঁচড় থেকে কোনও অংশে কমতি যায় না। তাঁর তুলি আর কলমের এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে আমায় দেখ্। অবশ্য রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সে' এবং 'খাপছাড়া'তে ছবি এঁকেছেন, কিন্তু ছোটদের মন ভোলাবার দিক দিয়ে সুকুমার রায়ের ছবিগুলি নিঃসন্দেহে আরও আকর্ষণীয়।

সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোলে'র কবিতাগুলি আজও ছোটদের মুখে মুখে; ছোটদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় প্রায় সর্বত্র ওই কবিতাগুলিরই একচেটিয়া অধিকার। কালের কষ্টি-পাথরে যাচাই করে বোঝা গেল, এগুলি পাকা সোনা।

কেউ কি জান সদাই কেন বোম্বাগড়ের রাজা
ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা?
রাণীর মাথায় অষ্টপ্রহর কেন বালিশ বাঁধা?
পাঁউরুটিতে পেরেক ঠোকে কেন রাণীর দাদা?

বোম্বাগড়ের রাজার দেশের আরও সব মজার ব্যাপার শুনে তাজ্জব বনতে হয়। তা ছাড়া শিবঠাকুরের আপন দেশে যে 'একুশে আইন' আছে, তার মধ্যে পদ্য-লিখিয়েদের জন্যে অদ্ভুত শাস্তির ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই কোন কবির পক্ষেই সুখপ্রদ নয়! অবশ্য আজকালকার অনেক কবির দুর্বোধ্য কবিতার মানে বুঝতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে এই আজগুবী আইন চালু করা হয়েছে কিনা, কে জানে।

যে সব লোকে পদ্য লেখে
তাদের ধরে খাঁচায় রেখে
কানের কাছে নানান সুরে
নামতা শোনায় একশো উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা
হিসেব কষায় একুশ পাতা।

তা ছাড়া হেড আপিসের বড়বাবুর 'গোঁফ চুরি' এক আজব কবিতা।

ব্যস্ত সবাই এদিক ওদিক করছে ঘোরাঘুরি,
বাবু হাঁকেন, 'ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি'।

অবশ্য আজকালকার বড়বাবু, ছোটবাবু বা কোন বাবুদের আর গোঁফের বালাই নেই, তবে কিছুসংখ্যক পুরুষ-সিংহের কথা বাদ দিয়েই বলছি। কাজেই 'গোঁফ চুরি'রও ভয় নেই, আর এ ধরনের গোঁফের কবিতাও আর নতুন কেউ লিখবেন কিনা সন্দেহ।

"সৎপাত্র," "গানের গুঁতো," "ছায়াবাজি," "খুড়োর কল" প্রত্যেকটি শুধু আজগুবী কবিতা নয়, নির্মল হাস্যরসে ভরপুর।

"কুমড়োপটাশ" ছড়াটি আমার মনে হয় ক্লাসিক ছড়ার পর্যায়ে পড়ে :

(যদি) কুমড়োপটাশ ডাকে
সবাই যেন শামলা এঁটে গামলা চড়ে থাকে ;
ছেঁচকি শাকের ঘণ্ট বেঁটে মাথায় মলম মাখে ;
শক্ত ইঁটের তপ্ত ঝামা ঘষতে থাকে নাকে।

কবির তুলির কৃপায় এই অদ্ভুত জীবটির চেহারাটাও আমরা দেখতে পাই এবং বেশ বোঝা যায় ওই কিম্ভুতকিমাকার জীবটি যখন নাচে কাঁদে হাসে বা ছোটে, তখন আমাদের আত্মরক্ষার জন্যে অসম্ভব রকমের কিছু করা ছাড়া উপায় থাকে না।

'আবোল-তাবোল' বইখানি যখন আজগুবী কবিতারই সংকলন, তখন তার মাত্র কয়েকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করা মানে, অন্যগুলির প্রতি অবিচার করা হয় জানি। কিন্তু তাতে প্রবন্ধ অনেক বড় হয়ে যাবে। কাজেই সংক্ষেপে সারা ছাড়া উপায় নেই।

কবির আজগুবী গদ্য-রচনার বই 'হযবরল'র রুমাল-মার্কা বেড়াল, কাগেয়া পটির শ্রীকাক্কেশ্বর কুচকুচে, হিজি-বিজ-বিজ, শ্রীব্যাকরণ সিং প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের স্বনামধন্য পুরুষ। তাদের কথাবার্তা, আচার-ব্যবহার অভূতপূর্ব উদ্ভট। এদের মতে তিব্বত যাবার সোজা পথ 'কলকেতা, ডায়মণ্ডহারবার, রানাঘাট, তিব্বত ব্যস্। সিধে রাস্তা, সোয়াঘণ্টার পথ, গেলেই হল'।

আর কাক্কেশ্বর পেন্সিল মুখে বলে, "সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার আর হাতে রইল পেন্সিল" ; শুধু তাই নয়, এই চোদ্দ টাকা "ঠিক সময় বুঝে ধাঁ করে না লিখলে হয়ে যায় চোদ্দ টাকা, এক আনা, ন পাই।" কারণ কাক্কেশ্বরের মতে সময়ের ভয়ানক দাম। কাজেই চোদ্দ আজীবন চুপচাপ চোদ্দ হয়েই থাকে না, পা ফেলে এগিয়ে যায় সময়েরই মত।

হুঁকো হাতে বুড়োর কাণ্ডটাও অদ্ভুত। "তার হুঁকোটাকে দূরবীনের মত করে চোখের সামনে ধরে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর পকেট থেকে কয়েকখানা রঙীন কাচ বের করে তাই দিয়ে আমায় বারবার দেখতে লাগল। তারপর কোত্থেকে একটা পুরনো দরজীর ফিতে এনে সে আমায় মাপতে শুরু করল আর হাঁকতে লাগল, 'খাড়াই ছাব্বিশ ইঞ্চি, হাত ছাব্বিশ ইঞ্চি, আস্তিন ছাব্বিশ ইঞ্চি, ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলা ছাব্বিশ ইঞ্চি।' আমি ভয়ানক আপত্তি করে বললাম, 'এ হতেই পারে না। বুকের মাপও ছাব্বিশ ইঞ্চি, গলাও ছাব্বিশ ইঞ্চি? আমি কি শুওর?'

"বুড়ো বলল, 'বিশ্বাস না হয়, দেখ।'

"দেখলাম, ফিতের লেখা-টেখা সব উঠে গিয়েছে, খালি ২৬ লেখাটা একটু পড়া যাচ্ছে, তাই বুড়ো যা কিছু মাপে ছাব্বিশ হয়ে যায়।"

হিজি বিজ বিজও কম ফাজিল নয়। তুমি কে, তোমার নাম কি জিজ্ঞেস করতেই সে অনেক ভেবে বলল, "আমার নাম হিজি বিজ বিজ। আমার ভায়ের নাম হিজি বিজ বিজ, আমার বাবার নাম হিজি বিজ বিজ, আমার পিসের নাম হিজি বিজ বিজ।

"আমি বললাম, তার চেয়ে সোজা বললেই হয় তোমার গুষ্টিশুদ্ধ সবাই হিজি বিজ বিজ।

"সে আবার খানিক ভেবে বলল, তা তো নয়, আমার নাম তকাই। আমার মামার নাম তকাই, আমার খুড়র

নাম তকাই, আমার মেশোর নাম তকাই, আমার শ্বশুরের নাম তকাই—

"আমি ধমক দিয়ে বললাম, সত্যি বলছ? না বানিয়ে?

জন্তুটা কেমন থতমত খেয়ে বলল, না না, আমার শ্বশুরের নাম বিস্কুট।"

এই ধরনের মজার মজার গঞ্জিকা-গঞ্জন ঘটনার বৈচিত্র্যে সুকুমার রায়ের সব কখানি বই-ই বিচিত্র। একবার পড়তে শুরু করলে ছোটদের তো নেশা লাগেই, ছোটদের পূজ্যপাদ পিতারাও হাতের কাছে এই সব অবাস্তব বই পেলে অতি-বাস্তব উপন্যাসও হেলা-ফেলা করেন, অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যে।

ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'সন্দেশে'র প্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁর পার্থিব সম্পত্তি কাকে কি ভাবে দিয়েছিলেন জানি নে, তবে তাঁর আজগুবী-সম্পত্তির বেশ খানিকটা দিয়েছিলেন তিনি তাঁর সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায়কে। উপেন্দ্রকিশোরের 'টুনটুনির বই' আজগুবী সাহিত্যে এক রত্ন বিশেষ।

আজগুবী রচনার আর একজন যাদুকর দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি,' 'ঠাকুরদাদার ঝুলি,' 'দাদামশায়ের থলে' শিশু-সাহিত্যের এক অপূর্ব সৃষ্টি। বেশীর ভাগ গল্পই শিক্ষাপ্রদ, কিন্তু উদ্ভট কল্পনায় রাঙানো। এক কথায় উপদেশ আর আজব কাণ্ডের চমৎকার মিক্শ্চার। একেবারে খাঁটি রূপকথা। ঠাকুরদা বা ঠাকুরমার থলে-ঝুলি থেকে খুঁজে পেতে রূপকথাগুলিকে সংগ্রহ করে তিনি বইয়ের পাতায় ছড়িয়ে দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অশেষ উপকার করেছেন।

গল্পগুলিতে হিংসায় নিজের ক্ষতি, সাহসের অসীম জয়, ধৈর্যের অপার মহিমা ইত্যাদি শেখানো হয়েছে, কিন্তু পাছে ছোটরা ধরে ফেলে, তাদের 'ভুলিয়ে অঙ্ক শেখানো' হচ্ছে, তাই প্রত্যেকটি গল্পই প্রায় আজগুবী মোড়কে মোড়া। তাই দেখতে পাই, ওষুধ বাটার পর শিল-নোড়া ধোয়ার জল খেয়ে ন-রাণীর পেটে পেঁচা জন্মায়, ছোটরাণীর পেটে বাঁদর। নাম তাদের হয় বুদ্ধু-ভুতুম! তাই সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে রাজকন্যাকে ঘুম পাড়াতে বা জাগাতে হয়! রাক্ষস-খোক্কসের দেশে গিয়ে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবার জন্যে পিষে মারতে হয় কৌটায়-ভরা ভীমরুল-ভীমরুলীকে।

আজগুবী রচনা বেশীর ভাগই নির্জলা আনন্দ দানের উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয়ে থাকে; কিন্তু রূপকথার অদ্ভুত কল্পনার মারফত 'ভুলিয়ে অঙ্ক শেখানো'র একটি গোপন উদ্দেশ্য দেখা যায়। এই দিক দিয়ে দক্ষিণারঞ্জন সার্থক। তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলিও তাঁর অদ্ভুত গল্পগুলির মতই অসাধারণ।

ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বেশীর ভাগ কবিতাই গম্ভীর রসের। কিন্তু তিনিও আজগুবীর মায়াজাল থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। তাঁর লেখা 'অম্বল সম্বরা কাব্য' এক অপূর্ব ধ্বনিব্যঞ্জক আজগুবী কবিতা: 'অম্বলে সম্বরা যবে দিলা শম্ভুমালী, ওড় কুলোদ্ভব মহামতি, বঙ্গধামে নিম্বশিম্বি গ্রামে'—তখন কী কী ঘটল সেই অপূর্ব ঘটনাবলী এই কবিতার আজগুবী বিষয়বস্তু। দু একটি নমুনা দিলাম—'জগদম্বা হস্ত বিলম্বিত শুম্ভ-নিশুম্ভের কাটা মুণ্ডে শুষ্ক জিভে এল জল।... সন্ন্যাসী কম্বলাসনে চোখাইল মুখ! বোম্বাইয়ের আঁঠি ফেলি 'বিম্বোষ্ঠী দৌড়িলা'!

যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় তাঁর শিশুপাঠ্য বই 'হাসি-খুশী'তে বহু আজগুবী কবিতা ও কবিতার মাধ্যমে ছোটদের অক্ষর-পরিচয় শিখিয়েছেন। যেমন:

> য-ফলা উঁচিয়ে লাঠি হাঁকে মার-মার
> র-ফলা আসছে তেড়ে বাগিয়ে তলোয়ার
> ল-ফলা ডিগবাজী খায় মাটির 'পরে লুটি'
> ব-ফলা নাচতে এসে হেসেই কুটি-কুটি!

তা ছাড়া নতুন নতুন কথা শেখবার জন্যেও তিনি যে সব আজগুবী কবিতা লিখেছেন, তার মধ্যে 'খোকনমণির স্বপ্নে'র কবিতাটি অনেকেরই আজও মুখস্থ:

> ঘুমিয়েছিল খোকনমণি মায়ের কোল ঘেঁষে
> কী যেন এক স্বপ্ন দেখে উঠল ভারি হেসে।
> 'দোয়াত' আর 'কলমে' যেন চলছে হাতাহাতি,
> 'পেনসিল' সে তেড়ে এসে 'শ্লেট'কে মারে লাথি।
> বেতের 'চেয়ার' লাফিয়ে ওঠে 'টেবিল' খানার ঘাড়ে,
> 'লেখার খাতা' 'প্রথম ভাগে'র ঝুঁটি ধরে নাড়ে।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের বেশীর ভাগ কবিতাই

করুণ এবং গম্ভীর। স্বদেশী গানও তাঁর অনেক আছে এবং হাসির গানও। কিন্তু সেসব গান বা কবিতার চাইতে তাঁর আজগুবী গান "ঔদরিক" কম প্রসিদ্ধ নয়। তাঁর 'কল্যাণী'তে এটি সংকলিত আছে। এক কালে রেকর্ডে এবং অনেকের মুখেই এই অদ্ভুত গানটি শোনা গেছে, যদিও আজ অনেকের কাছেই এটি অজ্ঞাত। গানটার প্রায় সবটাই উল্লেখ করছি। এটি কীর্তনের সুরে গাওয়া হত :

যদি কুমড়োর মত চালে ধরে র'ত
পানতুয়া শত শত
আর সরষের মত হত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত।
যদি তালের মতন হত ছ্যানাবড়া
ধানের মত চসি
আর তরমুজ যদি রসগোল্লা হত
দেখে প্রাণ হত খুশি,
আমি পাহারা দিতাম,
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম।
যেমন সরোবর মাঝে, কমলের বনে
কত শত পদ্মপাতা
তেমনি ক্ষীর-সরসীতে শত শত লুচি
যদি রেখে দিত ধাতা,
আমি নেমে যে যেতাম
ক্ষীর-সরোবর ঘন-জলে আমি নেমে যে যেতাম
আমি গামছা পরে নেমে যে যেতাম
একটু চিনি যে নিতাম,
সেই চিনি ফেলে দিয়ে ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম।
যদি কুমড়োর মত হত লেডিকিনি
পটলের মত পুলি
আর পায়েসের গঙ্গা বয়ে যেত, পান
করতাম দু হাতে তুলি।
আমি ডুবে যে যেতাম
আর বেশী কি বলব, গিন্নীর কথা ভুলে আমি ডুবে যে যেতাম,
আর উঠতাম না হে।

তার পরেই কবি বলছেন :

সকলি তো হবে বিজ্ঞানের বলে
নাহি অসম্ভব কর্ম
শুধু এই খেদ কান্ত আগে মরে যাবে
আর, হবে না মানব জন্ম
আর খেতে পাবে না,
কান্ত আর খেতে পাবে না,
হয়তো শেয়াল বা কুকুর হবে, খেতে পাবে না,
সবাই খাবে গো, তাকিয়ে রইবে, খেতে পাবে না,
সবাই তাড়াহুড়ো করে খেদিয়ে দেবে গো,
খেতে পাবে না।

শেষকালটা বড়ই করুণ। শুনেছি, কবি রোগশয্যায় এই কবিতা লিখেছিলেন। এবং এই রোগশয্যাই তাঁর শেষশয্যা হয়। তবে আজগুবী সাহিত্যে তাঁর এই রচনা আজও অমর, অজেয়।

বাংলা ভাষায় আজগুবী সাহিত্যের ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। এক কথায় বলা যেতে পারে, এই সেদিনের বড়লোক। কাজেই আমরা খানিকটা পেছিয়ে গেলেই দেখব, আজগুবী সাহিত্যের ইতিহাসে হাজবগড়ের একমাত্র উল্লেখযোগ্য রাজা হচ্ছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়; তাঁর গদ্যে লেখা আজগুবী রচনাগুলি অতুলনীয়। বাংলার আজগুবী সাহিত্যে এঁর আগে কেউ এই ধরনের রচনায় ব্যাপকভাবে হাত দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। অবশ্য ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা পঞ্চানন্দ দু একটি ছুটকো-ছাটকা আজগুবী রচনা লিখেছিলেন, তবে সেগুলি তেমন সুপ্রচলিত নয়।

ত্রৈলোক্যনাথের 'ডমরু-চরিত' আজও রসিকজনের কাছে বড় উপাদেয় বস্তু। একটু উদাহরণ দিই :

"কাঠুরিয়া বাঘের লাঙ্গুলটি লইয়া গাছে এক পাক দিয়া দিল, তাহার পর লেজের আগাটি সে টানিয়া ধরিল। ...পলায়ন করিতে বাঘ চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। অসুরের মত বাঘ যেরূপ বলপ্রকাশ করিতেছিল, তাহাতে আমার মনে হইল, বাঃ লেজটি না ছিঁড়িয়া যায়। কিন্তু এক অসম্ভব কাণ্ড ঘটিল। প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হ্যাঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার মস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি মাংসের দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম নাই! পাকা আমের নীচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিলে যেমন হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে, বাঘের ছাল হইতে

শরীরটি সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল। মাংসের বাঘ রুদ্ধশ্বাসে বনে পলায়ন করিল।"

আর এক জায়গায়। ডমরুধর যখন শুনল, নদীতে এক কুমীর পূর্বদেশীয়া সালংকারা একটি স্ত্রীলোককে উদরস্থ করেছে, তখন গহনাগুলির লোভে সে নোঙরের বড়শীতে মোষের বাচ্চা বিঁধিয়ে কুমীরটিকে ধরল। কুমীরটি ইতিপূর্বে একটি সাঁওতালী বেগুনওয়ালীকেও উদরসাৎ করেছিল। ডমরু সেই কুমীরের পেট করাত দিয়ে চিরে কী দেখল, তা লেখকের রসাল ভাষাতেই বলি: "বলিব কি ভাই আর দুঃখের কথা। কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে, সেই সাঁওতাল মাগী, চারিদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, পূর্বদেশীয়া সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার অঙ্গে পরিয়াছে এবং তাহার বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়া, ঝুড়িটি উপুড় করিয়া তাহার উপর বসিয়া মাগী বেগুন বেচিতেছে।"

'মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প' গল্পে শিশুর কান্না চুপ করাবার জন্যে একটি ল্যাজ-খসা বেঁড়ে চন্দ্রবোড়া সাপ কাছে এসে বসল: "তাহার পর শিশুর মুখপানে চাহিয়া চক্ষু টিপিয়া কি ইশারা করিল। অবশেষে সাপ পেছন ফিরিয়া আপনার সেই বেঁড়ে লেজটি শিশুর হাতে পুরিয়া দিল। মায়ের স্তন মনে করিয়া শিশু সন্তোষের সহিত তাহা চুষিতে লাগিল।"

এই ধরনের বহু উদাহরণের উদ্ধৃতির লোভ বহু কষ্টেই সম্বরণ করতে হচ্ছে। তবে সেকালীন আজগুবী রচনার আর দু-একটি নমুনা ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা 'পঞ্চানন্দ' থেকে তুলে দিয়ে একালীন আজগুবী রচনার বিষয়ে আলোচনা শুরু করব। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যতঃ রাজনৈতিক ব্যঙ্গ-রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় তাঁর অতি-বাস্তব ব্যঙ্গরসধারার স্বাদ পাবার জন্যে সেকালীন বঙ্গবাসীরা উন্মুখ হয়ে থাকতেন। কিন্তু তাঁর কঠোর বাস্তব লেখনী যে উদ্ভট কল্পনার আকাশেও ডানা মেলে উড়তে পারে, তার দুটি প্রমাণ তাঁর 'নাটকি-ফাটকি-বিজ্ঞান' থেকে তুলে দিই। অবশ্য এগুলিরও অন্তরালে আছে ইন্দ্রনাথের সেই চিরাচরিত অভ্যাস ব্যঙ্গোক্তি।

কাঠ রাখিবার সহজ উপায়

বর্ষাকালে ভিজা কাঠে রাঁধিতে বড় কষ্ট হয়। অথচ গরীব দুঃখী লোকের এত পয়সা নাই যে, আগে হইতে কাঠ কিনিয়া শুকাইয়া রাখে। তাহাদের জন্য এই উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভিজা কাঠে স্পিরিট অব টারপেণ্টাইন অর্থাৎ তার্পিন তৈল ক্রমাগত সাত দিন সাত রাত মালিশ করিতে হইবে, তাহার পর মসটার্ড প্লাসটর অর্থাৎ রাই সরিষার রুটি করিয়া পুল্‌টিশের মত সেই কাঠের গায়ে বসাইয়া দিবে। যেন হাওয়া না লাগে। পরে ফারনহিটের ১৩২ ডিগ্রী গরম জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া সেই পুল্‌টিশ তুলিয়া দিবে। উত্তমরূপে পুল্‌টিশ উঠিয়া গেলে, ২৪ ঘণ্টা ফ্যানিংমেশিন অর্থাৎ পাখা-কলের হাওয়া দিবে। পরে খুব চিনচিনে রোদে কাঠখানিকে ঝনঝনে করিয়া শুকাইবে। উননে সেই কাঠ উতো দিয়া রাখিলে বেশ থাকিবে।

আর একটি—

রাজনৈতিক দুঃখ নিবারণের বৈজ্ঞানিক উপায়

ক্রুড ওপিয়ম অর্থাৎ কাঁচা আফিম সাড়ে চব্বিশ তোলা, জেলখানার খাঁটি সরিষার তৈল কিউ. এস. যতটুকু লাগে, দুই একত্র করিয়া আরবী গঁদের সাহায্যে গোলস পাকাও। পরে মনুমেণ্টের চোরকুটারীতে প্রবেশ করিয়া দ্বার রোধ পূর্বক যেমনে পার, ঐ বোলসকে উদর পর্যন্ত ঠেলিয়া দাও। তাহার পর ৭২ ঘণ্টা চক্ষু বুজিয়া একচিত্তে নিরাকার ভাবিতে থাকিবে। ফল অব্যর্থ। এত প্রক্রিয়া অবলম্বনের ধৈর্য যাহাদের নাই, তাহারা কণ্ঠনালীর উপর গলার চতুর্দিকে রজ্জু বেষ্টন পূর্বক সেই রজ্জুর অপর প্রান্ত সাত ফিট তিন ইঞ্চি উচ্চে কড়ি কাঠে দৃঢ় বন্ধন করিয়া শরীরের পূর্ণভার পরীক্ষা করিবে। অধোমুখ পদাঙ্গুষ্ঠের প্রান্ত হইতে বসুমতীর নিকটতম ব্যবধান ছয় ইঞ্চির ন্যূন না হয়। ৯ মিনিট ৪৩ সেকেণ্ড গতে সশরীরে পরীক্ষার ফল দেখিতে পাইবে।

[আগামীবারে সমাপ্য]

ঘরে-বাইরে

রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

বাড়ি ফিরে এসেই শুনলাম, মণীন্দ্রগোপাল, ওরফে ডুম্বা, একটা কুকাণ্ড করে ফেলেছে। সে কী একটা দোষ করায় নিবারণ পণ্ডিত তাকে ঠেসে কান মলে দিয়েছেন, তাই শীতকালে পণ্ডিত মশাইকে জব্দ করার জন্যে তাঁর একমাত্র কাঁথায় জল ঢেলে ভিজিয়ে দিয়েছে। গত রাত্রে পণ্ডিত মশাই শুতে পারেন নি, শীতের হাওয়া তাঁর হাড়ে নাকি ছুরি বসিয়ে দিয়েছে, একটা অর্ধমলিন চাদর গায়ে গোটা রাত ঠক ঠক করে কেঁপেছেন।

নানা উপরে চলে যেতেই, পণ্ডিত মশাইয়ের শাণিতকণ্ঠ শোনা গেল—তাঁর আওয়াজটা যেন সুরে বলছে না। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে ঢুকেই এই অঘটনের কথা শুনলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপারটা হয়েছে কাল, এসব কই নানার কানে তো এখনও ওঠে নি? চিল-চিৎকারে পণ্ডিত মশাই বললেন, আজ রবিবাবুর ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন, তাই বলা হয় নি, এবার বলব।

আজকাল নানার সমর্থন পেয়ে আমার সাহস কিছুটা বেড়ে গিয়েছিল। আমি পণ্ডিত মশাইয়ের পা ধরে ডুম্বার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললাম, নানাকে জানিয়ে দরকার নেই, তিনি শুনলে ওকে আর আস্ত রাখবেন না। আমিই এর বিহিত করে দিচ্ছি।

বজ্রগম্ভীরকণ্ঠে হাঁক দিলাম, এই ডুম্বা!

ক্ষীণকণ্ঠে জবাব এল: যাই ধীরেনদা।

সামনে যখন সে এল, দেখলাম তার চোখে মুখে অপরাধীর লেশমাত্র চিহ্ন নেই।

তুমি পণ্ডিত মশাইয়ের কাঁথায় জল ঢেলেছ কেন? উত্তর দাও।

ডুম্বা নির্বাক, অচল, অটল।

ইদানীং আমারও ভাষাটা কিঞ্চিৎ ভারী হয়ে উঠেছিল, বললাম, মানুষ হয়ে জন্মেছ, বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা সবই থাকা উচিত, তারপর কিনা পণ্ডিত মশাই—যিনি গুরু তাঁর কাঁথায় জল ঢেলে বীরত্ব দেখানো! পশুরা যখন যা খুশী তাই করে, তা হলে তোমাতে আর পশুতে তফাত কী? চুপ করে থাকলে চলবে না, তোমায় বলতে হবে কেন জল ঢেলেছ?

ডুম্বার চোখ দুটো বার কয়েক মিটিমিটি করেই স্থির হয়ে গেল। আমারও মেজাজ তখন সপ্তমে ছুটে গিয়ে ডুম্বার বগল ধরে হিঁচড়ে টেনে এনে পণ্ডিত মশাইয়ের সামনে দাঁড় করিয়ে আদেশ করলাম, পা ধরে ক্ষমা চাও।

তবুও ডুম্বার মাথা নীচু হতে চায় না। গালে ঠাস করে একটা ওজনসই চড় মেরে বললাম, এখুনি পা ধর্, না হলে তোরই একদিন কি আমারই একদিন! বিচার-পর্ব প্রত্যক্ষ করে পণ্ডিত মশাইয়ের ভাবান্তর ঘটে গেল, কণ্ঠস্বর দ্রবীভূত: আহা, বেচারীকে ছেড়ে দাও।

না পণ্ডিত মশাই, আপনার পা ধরে ক্ষমা না চাইলে ওকে আজ কিছুতেই ছাড়ব না।

আমার বিচারকের ভূমিকা এইখানেই শেষ। পশ্চাতে রামেন্দ্রসুন্দরের হুঙ্কার শোনা গেল—তিনি আমার চিৎকার শুনে কখন যে নেমে এসেছেন, জানতে পারি নি।

সব শুনেছি, ডুম্বা যা করেছে। সেটা আবার আমাকে

নালিশ করতে হবে কেন, পণ্ডিত মশাই? আপনি নিজেই দশ-বিশ ঘা পিঠে বসিয়ে দিলেন না কেন?

রামেন্দ্রসুন্দর জ্বলে উঠলেন, আর কোনও কথাটি না বলে তিনি পায়ের বিদ্যাসাগরী চটি খুলে দুম্বার দিকে তেড়ে আসতেই বাধা দিয়ে করযোড়ে নানাকে মিনতি করে বললাম, আমি বড় ভাই, আমিই শাসন করে দিচ্ছি, দয়া করে আজ তুমি ওকে কিছু বোল না।

কী জানি কেন, সেদিন আমার কথায় তিনি নিরস্ত হলেন। ওই ঘরের একটি মাত্র বেরিয়ে যাবার পথ আগলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

দুম্বার দিকে ফিরে একটা বিরাট ঘুঁষি পাকিয়ে বললাম, কিরে, বেহায়ার মত এখনও দাঁড়িয়ে? যা বললাম শুনবি কি না? নইলে—

দুম্বা ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠেই তখুনি পণ্ডিত মশাইয়ের পায়ে আছড়ে পড়ল আর কাটা কাটা সুরে হাঁপিয়ে বলতে থাকে, ক-ক্ষমা করুন, আ-আর কক্ষনো ক-করব না, প-পন ম-ম-মশাই—ই! এই না-নাক কা-কান ম-মলছি, ই-ই-উ-উ-উ।

ওদিকে পণ্ডিত মশাইও দুম্বার সঙ্গে তাল দিয়ে ফ্যাঁচ করে কেঁদে উঠলেন, তার সঙ্গে স্কন্ধবিলম্বিত গামছা দিয়ে ঘন ঘন নাসিকা মর্দন।

রামেন্দ্রসুন্দর আর দাঁড়ালেন না। আমার বিচার-মাহাত্ম্যে আসামী ও ফরিয়াদীর এই অপূর্ব মিলন সন্দর্শন করে হৃষ্টচিত্তে তিনি উপরে উঠে গেলেন।

পণ্ডিত মশাই তাড়াতাড়ি দুম্বাকে দু হাত দিয়ে উঠিয়ে নিলেন। তাঁর ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের এক কোণে সযত্ন-রক্ষিত বাবা বৈদ্যনাথের পেঁড়া বের করে দুম্বার হাতে দিয়ে বললেন, নে, এটা খেয়ে নে, আর কাঁদে না

আমি বললাম, বাঃ, বেশ তো মজার শাস্তি। এ রকম হলে সে তো রোজই এমনটা করবে, তার ওপর ও যা দারুন পেটুক!

ইতিমধ্যে দুম্বার চোখে মুখে রৌদ্রকিরণ দেখা দিয়েছে, সে তখন মিষ্টান্নের রসাস্বাদনে মত্ত।

গালভর্তি পেঁড়া মুখে নিয়েই তার অর্ধোচ্চারিত শব্দ শোনা গেল, আর কক্ষনো করব না ধীরেনদা, কক্ষনো না!

দেখলাম রামেন্দ্রসুন্দর ইন্দুপ্রভার দরবারে আরজি পেশ করে নিবারণ পণ্ডিতের জন্যে একটা লেপ পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পণ্ডিত মশাইয়ের মুখ হর্ষোৎফুল্ল। কৃষ্ণ যবনিকা সরে গিয়ে উজ্জ্বল দৃশ্যের অবতারণা। দু হাত বাড়িয়ে লেপটি বগলদাবা করেই গদগদ ভাষ: আমার ছেঁড়া কাঁথাটা ভিজিয়ে দিয়ে ভালই করেছিস দুম্বা, বড্ড শীত আজ, গায়ে দিয়ে বাঁচব। যা, এখন তোরা যা।

হাত বাড়িয়ে বললাম, যাচ্ছি, তবে আমার পাওনাটার কী হল?

পণ্ডিত মশাই যেন আঁতকে উঠলেন, গোল গোল ক্ষুদ্র চোখ দুটি বেরিয়ে আসে আর কি: তোর আবার পাওনা কিরে?

কেন, আমাকেও একটা পেঁড়া দিতে হয়।

ও, এই নে, যা এবার যা।

উপরে নানার কাছে এসেই দেখি, এক ভদ্রলোক এসেছেন। বেশ গৌরবর্ণ, কটা চোখ, এক জোড়া লালচে রঙয়ের গোঁফ, সামনে একটা নাতিবৃহৎ টিনের চোঙা। শুনলাম তিনি ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক। সামনের বস্তুটির নাম ইকমিক-কুকার, নানাকে দিতে এসেছেন।

তারাপ্রসন্ন ভাল করে বুঝে নিচ্ছেন, কী প্রক্রিয়ায় কী কী তৈরী করা যায়, মাংস নাকি ভাল রান্না হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। নানা কখনও ভোজন-বিলাসী ছিলেন না, নানীর কৃপায় খাবার সময় দুটি খেতে পেলেই তিনি নিশ্চিন্ত, তার বেশী কিছু আকাঙ্ক্ষাও ছিল না; আজ এটা খাব, কাল ওটা খাব, অমুক জিনিস রান্না হল না কেন? এ ধরনের কথা তাঁর মুখে কখনও শুনি নি। এ জন্যে নানী প্রায়ই আক্ষেপ করে রামেন্দ্রসুন্দরকে বলতেন, আমার বড় সাধ থেকে গেল যে ফরমাশ দিয়ে কখনও তুমি কিছু খেতে চাইলে না। নানী প্রায়ই নানার ধ্যানভঙ্গ করিয়ে খাবারের কথা জিজ্ঞেস করতেন, আর নানার উত্তর শুনতাম, যা খুশী কর, আমার কিছু বলার নেই।

যখন ভাবি, তখনই মনে হয়, কোন্ জগতের মানুষ ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর!

একদিন কথা প্রসঙ্গে ইন্দুপ্রভা ফস্ করে রামেন্দ্রসুন্দরকে বলে বসলেন, আচ্ছা, স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী শাড়ি গয়না কত কী পেয়ে থাকে, কিন্তু কই, আজ

পর্যন্ত একটা গয়নাও তুমি দিলে না। অথচ, মাস মাস একগাদা পুথি-পত্তর কিনতে তো পয়সার অভাব হয় না দেখি।

রামেন্দ্রসুন্দরের চমক ভাঙল, কেতাব বন্ধ করে গালে হাত দিয়ে ইন্দুপ্রভার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন; সমস্ত মুখখানা ঘিরে কী এক কুণ্ঠিত কাতরতা! যেন একরাশ চিন্তার জালে আটকা পড়ে তিনি হাবুডুবু খাচ্ছেন।

ইন্দুপ্রভা দেবী মুখ টিপে হাসলেন। রামেন্দ্রসুন্দরকে সমস্ত দুর্ভাবনার দায় থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন, না গো না, অত চিন্তার কোনও কারণ নেই, একটু ঠাট্টা করে দেখছিলাম, কী বল!

তা হলে একটা কাজ কর, আমার অলঙ্কার বিক্রী করে তোমার গয়না গড়িয়ে নাও।

ইন্দুপ্রভার ভ্রূকুঞ্চিত প্রশ্ন: কী রকম?

আমার এক আলমারি বই বেচে দিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

ও, রসিকতা হচ্ছে।

নানা ও নানী দুজনেই হেসে উঠলেন।

সেই একবার দু জনকে কোরাসে হাসতে দেখলাম।

দু-একদিন পরেই আর একটা মজার কাণ্ড ঘটে গেল। নিবারণ পণ্ডিত দুর্দান্ত শীতেও দিন-দুপুরে নগ্ন গাত্রে থাকতেন, কাঁধে তাঁর চিরন্তন নস্যি-মোছা অর্ধমলিন গামছাটি হামেশাই পড়ে থাকত। তিনি ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট মেজাজের লোক ছিলেন।

পণ্ডিত মশাই তক্তপোশে বসে আপন মনেই থেলো হুঁকোয় সুখটান দিচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর রসভঙ্গ করে একটা টেনিস বল জানলার গরাদের ফাঁক দিয়ে সোজা ঢুকে কলকে উড়িয়ে দিলে, ফলে জলন্ত টিকে তাঁর গায়ে পড়ায় তিনি লাফিয়ে উঠলেন, আর কিছুটা বিছানায় ছড়িয়ে পড়ল।

আর যাবে কোথায়!

পণ্ডিত মশাই একেবারে অগ্নিশর্মা, জবাকুসুমসঙ্কাশং আরক্ত লোচন, ফাটল ধরা বাঁশের বাঁশীর উঁচু পর্দায় তাঁর স্বর বেজে উঠল: কে করেছিস বল্? চাটিয়ে ঠিক করে দেব।

আমি সুনীল সন্তোষ দুষা ও ঘি বল নিয়ে এর ওর হাতে লোফালুফি করছিলাম। পাশেই তাঁর ঘর। সন্তোষের হাত ফসকে বলটা সজোরে এসে তাঁর সদ্য সাজা কলকের ওপর পড়েছিল। এটা নিশ্চয়ই কারও ইচ্ছাকৃত নয়। পণ্ডিত মশাই ভাবলেন, কেউ দুষ্টুমি করেই এমনটা করেছে। সন্তোষ এগিয়ে এসে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ক্ষমা চাইল, পণ্ডিত মশাই বেরিয়ে এসে তার কান ধরে দু তিনবার ঝাঁকুনি দিয়েই তাকে বের করে দিলেন: যা নির্বংশের ব্যাটা, অনড্বান কোথাকার!

পণ্ডিত মশাই চটিতং হলেই এই দুটি মোক্ষম গাল দিতেন। 'অনড্বান' কথাটি শব্দরূপে পড়েছি, কিন্তু 'নির্বংশের ব্যাটা' কী বস্তু? যার বংশ নেই তার আবার ব্যাটা কোত্থেকে এল? পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে একদিন মানে জানতে চাইলাম। তিনি আরও জ্বলে উঠলেন। অগত্যা নানার শরণাপন্ন হতেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পুত্র যদি উপযুক্ত না হয়, ছেলে থাকাও যা, নির্বংশ হওয়াও তাই।

সন্তোষ চোখ-মুখ লাল করে বেরিয়ে গেল। পণ্ডিত মশাই আবার আপন ঘরে ঢুকে চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া টিকের আগুন নিভিয়ে দিতে বসলেন।

দু চারদিন কেটে গিয়েছে, সন্তোষের কোনও সাড়াশব্দ নেই, হয়তো পণ্ডিত মশাই এসব ভুলেই গিয়েছেন। একদিন অদূরে বাথরুম থেকে এসেই দেখলেন, বড় বড় অক্ষরে চক-পেন্সিলে তাঁর দরজায় লেখা আছে—"ওরে পণ্ডিত, উলটো করে পড়ে দেখ তিব্বতের রাজধানী। তুমি তাই, তুমি তাই গো!" পাশেই আঁকা শিংওয়ালা গরুর মুখ।

সেকেলে পণ্ডিত মশাই, ভূগোলেই যত গোল ছিল। অর্থটা মালুম না হওয়ায় সোজা উঠে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে কথাটি উচ্চারণ করে তাৎপর্য জানতে চাইলেন।

আবার কী হল আপনার?

আমার দরজায় কে এই কথাটা লিখে রেখেছে একবার দেখবেন চলুন।

আমিও তাঁর কাছেই ছিলাম। পণ্ডিত মশাই, রামেন্দ্রসুন্দর আর আমি, চটির ফটফট শব্দে নীচে নেমে এলাম।

নানার চক্ষু স্থির! তাঁর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিও বুঝি এই

উদ্ভাবনী শক্তির কাছে হার মেনে যায়। কথাটির অর্থ হৃদয়ঙ্গম হতেই একটা অদম্য হাসির মুখে পাথর চাপা দিয়ে চিন্তিত স্বরে আমি প্রশ্ন করলাম, লেখাটি কার ?

তখুনি তুষা ও ঘিয়ের ডাক পড়ল।

নানা অঙ্গুলি নির্দেশে লেখাটি দেখিয়ে মাথা নাড়তে শুরু করলেন। এক লহমায় পণ্ডিতের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে এবার ভাব-বিশ্লেষণ শুরু করি : তিব্বতের রাজধানী লাসা—তার উলটো হচ্ছে—

পণ্ডিত মশাইয়ের আর্তস্বর শোনা গেল : অ্যাঁ, তবে কি শালা!

এতক্ষণে তাঁর যথার্থ অর্থটি উপলব্ধি হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের গম্ভীর বয়ান—বিস্ফারিত চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ; আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কে লিখেছে জান ?

আমি একবার তুষা ও ঘিয়ের দিকে তাকিয়ে অকপটে উত্তর দিলাম, আমি কিচ্ছু জানি না।

ঘি আর তুষা যেন আকাশ থেকে পড়ল। রামেন্দ্রসুন্দরের বিশ্বাস হল—আমরা কেউ এর মধ্যে জড়িত নেই। নিবারণ পণ্ডিতের তীব্র মিহি সুরের আওয়াজ শুব্ধ মধ্যাহ্নকে কেটে যেন দু টুকরো করে ফেলতে চায় : অ্যাঁ, এই ছ্যান কত্তে গেছি, এরই ফাঁকে কে এমন লিখলে ?

কোত্থেকে একটা ঝাড়ন নিয়ে এসে জলে ভিজিয়ে নানা নিজের হাতেই লেখাটা রগড়ে ভাল করে মুছে দিয়ে উপরে চলে গেলেন। পণ্ডিত মশাইয়ের মনের দাগ মুছল কিনা জানি না—কিন্তু আমার মনে একটা দাগ থেকে গেল, কে এমন সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিলে! যিনিই হোন তাঁর ফাইন আর্টসের কেরামতি আছে বলতে হবে। ইনভার্টেড কমার মধ্যে "তুমি তাই, তুমি তাই গো"—বড় অক্ষরে "গো" লিখে তার নীচে দাগ দেওয়া—তার উপরেও কিনা আবার ছবি এঁকে দেখানো হয়েছে! ওই বিশ্রী গাল দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি। আবার গরুও বলা হয়েছে! এই "গো"র শব্দরূপ পণ্ডিত মশাইকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতেই তিনি আরও খাপ্পা হয়ে তাঁর ছোট্ট ঘরে দ্রুত পাদচারণা শুরু করে দিলেন। অনতিকাল পরেই যৎকিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বপাক-শুদ্ধ-সিদ্ধ-পক্কের হাঁড়িটা থালায় উলটে যথাবিহিত আচমনের পর ভোজনে বসে গেলেন।

আমি ভাবতে লাগলাম—লেখাটি তবে কার ? হস্তাক্ষর অপরিচিত। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সন্তোষকে পণ্ডিত মশাই কান ধরে তাড়িয়ে দিয়েছেন বলেই সে এই কাণ্ডটা করেছে নাকি! তার হাতের লেখাও তো আমার অচেনা নয়। তবে কি সুনীল? না অসম্ভব—সে ও ধরনের ছেলেই নয়।

মহা দুর্ভাবনায় পড়ে গেলাম, লোকটাকে আমায় খুঁজে বের করতেই হবে। অনেক চিন্তা করেও কোনও হদিশ পেলাম না। অস্বস্তি বেড়েই গেল। সুনীল রোজ বিকেলে খেলতে আসে—সন্তোষকে পণ্ডিত মশাই তাড়িয়ে দেবার পর আর সে আমাদের বাড়িমুখো হয় না। আমার বাড়ির বাইরে যাবার অনুমতি না থাকলেও একদিন তাকে গিয়ে ধরে আনলাম। কথায় কথায় পণ্ডিত মশাইয়ের দরজায় ওই সব লেখার কথা বলতে সে ঠোঁট উলটে বলল, আমিই তো আমার এক বন্ধুকে দিয়ে ওই সব লিখিয়েছি, তার হাতের লেখা কেউ চিনবেও না—আর আমিও ধরা পড়ব না।

সন্তোষের ওই বেপরোয়া আচরণে আমি দুঃখ পেলাম। তাকে যতই বুঝিয়ে বলি, বাপ-মা, গুরুজন, শিক্ষককে অসম্মান করলে নিজেকেই অপমান করা হয়। ততই সে চটে ওঠে, কিছুতেই বাগ মানতে চায় না, বরং উলটো সে জোর গলায় বলল, বেশ করেছি, আরও করব।

বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হল, তা হলে তোর সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই, খেলাধুলো করা দূরে থাক্‌, আর কথাও কইব না।

সন্তোষ আরও চটে গেল। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলল, তা হলে আমার তো ভারী বয়েই গেল। যা, তোর বাড়িতে আর আমি কক্ষনো আসব না।

সন্তোষ চটেমটে হনহন করে বেরিয়ে গেল—তবু চেঁচিয়ে বললাম, তোর ভালর জন্যেই বলছিলাম, শুনিস ভালই, নইলে শেষে নিজেই পস্তাবি।

মুখ ঘুরিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে সে উত্তর দিল, আরে যা যা, তোর মত ঢের ঢের লেকচার আমার শোনা আছে। ইস্কুলের মাস্টারকেই থোড়াই কেয়ার করি, হুঁ!

কিছুক্ষণ দম নিয়ে আবার আমাকে শাসিয়ে গেল : দেখে নেব তোকে আর তোর ওই হাড়গিলে পণ্ডিতকে,

তবেই আমার নাম সন্তোষচন্দর—ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি ইত্যাদি ইত্যাদি।

পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে কচিৎ কখনও দুষ্টুমি করলেও তাঁকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসতাম। তিনি আমার বাবাকে শিশুকাল থেকে পড়িয়েছিলেন—হাতেখড়িও দিয়েছিলেন। আমারও হাতেখড়ি তাঁরই কাছে। এখন তিনি আমাকে বাংলা সংস্কৃত পড়ান। তাঁর সম্বন্ধে এই হীন উচ্চারণ শুনে সটান উপরে উঠে নানাকে সব কথা খুলে বলেই পরিচ্ছেদের শেষ টানলাম: আজ থেকে সন্তোষের সঙ্গে জীবনের মত বাক্যালাপ বন্ধ।

রামেন্দ্রসুন্দর বন্ধুবিচ্ছেদের কাহিনী শুনে ভ্রূভঙ্গী করে বললেন, যাক বাঁচা গেল। ওই সব ছেলেদের বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে দেবে না।

সেদিনই রামেন্দ্রসুন্দরের জ্যেষ্ঠা কন্যা চঞ্চলা মাসী কলকাতায় এসেছেন। ঘিয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে। ছ মাস পরে হবে, তাই কিছুদিন কলকাতায় থাকবেন। সঙ্গে এসেছেন তাঁর স্বামী—শ্রীসৌরীন্দ্রগোপাল রায়। রামেন্দ্রসুন্দর মাসীমাকে একটা সেলাইয়ের কল কিনে দিলেন আর একজন সেলাই শিক্ষার উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী রেখে দিলেন। অবশ্য তারাবাবুই তাঁকে সংগ্রহ করে এনেছেন। চঞ্চলা মাসী আহার ও নিদ্রার সময়টুকু বাদ দিয়ে ঘড় ঘড় করে সেলাই শিক্ষা করেন—খবরের কাগজ কাঁচি দিয়ে কেটে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হল, তারপর হাত পড়ল কাপড়ে। তিনি বুদ্ধিমতী, এক মাসের কাজ সাত দিনেই সড়গড় করে নিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের একটা জামার নমুনা দেখে ঠিক তার মাপে জামা তৈরি করলেন। নানার স্নানের পর তাঁকে পরিয়ে প্রণাম করে বললেন, গাছের প্রথম ফল যেমন দেবতার চরণে উৎসর্গ করে, আমার হাতের প্রথম কাজও আমার প্রত্যক্ষ দেবতার গায়ে পরিয়ে তৃপ্তি পেলাম। বাবা, আমার হাতের তৈরী জামা আপনার গায়ে সুন্দর ফিট করেছে—আমার সেলাই শেখা সার্থক।

নানার মুখে কোনও ভাবান্তর দেখলাম না, শুধু একবার এ হাত উঠিয়ে ও হাত ঘুরিয়ে করকরে জামাটা দু-একবার দেখে নিয়ে বললেন, তা ভালই হয়েছে বলতে হবে।

আমি পাশেই ছিলাম, নানার নতুন জামায় একটা টান দিয়ে বললাম, বাস্, এইটুকু? তুমি নিশ্চয় চঞ্চলা মাসীর সব কথা শোন নি! উত্তর পেলাম না। অস্বস্তি বোধ হওয়ায়, ধোপদুরস্ত জামাটা ছেড়ে খালি গায়ে নানা খাবার ঘরে ঢুকে পড়লেন।

চঞ্চলা মাসী অনেকটা নানার মত দেখতে—ধন্যা পিতৃমুখী কন্যা। আমার দুই মাসীমা, চঞ্চলা ও গিরিজা দেবী নানার খাবারের কাছে বসে রবীন্দ্রনাথের কাব্য আলোচনা করতেন। সকাল-সন্ধ্যায় অনেক লোকজনের সমাগম হত বলে নানীর মত তাঁরাও বাবার কাছে বসে দু দণ্ড কথা বলার সুযোগ পেতেন না। বাপের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরাও কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের কোটেশন দিতেন। রবিঠাকুরের যে কোন একটা বই তাঁদের হাতে থাকতই। চঞ্চলা মাসী বেশী কথা বলতেন—সর্বদাই হাসিখুশি মুখ। আর ঠিক উলটো ছিলেন—তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নী গিরিজা দেবী। স্বল্পভাষিণী, স্থির, ধীর, গম্ভীর। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নির্মল—সাতেও নেই পাঁচেও নেই, ধমক দিলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠে—তবু নালিশ করে না; আর ওদিকে চঞ্চলা মাসীর পুত্র দুম্বা তেমনই প্রাণচঞ্চল—চলনে বলনে চৌকস। এই দুইটি বিপরীতমুখী ভাবকে সামলান দায়। দুর্বল নির্মলের প্রতি সবল দুম্বার অহেতুক আক্রমণ হলেই তাকে উদ্ধার করতে আমাকে প্রায়ই হিমশিম খেতে হত—মাঝে মাঝে নানাও উত্ত্যক্ত হয়ে আমাকে আদেশ করতেন, দুজনেরই কান মলে দাও। দুম্বার কানে হাত পড়লেই আমার মোচড়টা বেশ বজ্রকঠিন হয়ে উঠত। কারণ সদ্য চুরি করে জিলিপি খাওয়াটা তখনও ভুলতে পারি নি।

নিরপরাধ নির্মলের কানটা একবার ছুঁয়েই ছেড়ে দিতাম, জানতাম সে বেচারা নির্দোষ; এই নিয়েই দুম্বা একদিন নানার কাছে নালিশ করে বসল।

রামেন্দ্রসুন্দর চোখ দুটি তুলে তুহিন-শীতল কণ্ঠে বললেন, আর একবার দুম্বার কান মলে দাও!

আমিও প্রস্তুত, তখুনি তার কর্ণদ্বয়ে আর একবার হাতের খেল দেখিয়ে দিলাম।

*　　*　　*

রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের বাড়ি আসতেন, আগেই সংবাদ পাঠিয়ে দিতেন। সেদিন বুঝি খবর না দিয়েই

হঠাৎ বিকেলে এসে পড়েছেন। সঙ্গে জনৈক ভদ্রলোক, কোথায় সভা-সমিতি ছিল, ফিরতি পথে রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গে দেখা করে গেলেন। আমরা তখন সবাই নগ্নপদে একটা ফুটবল নিয়ে নীচে ছোটাছুটি করছিলাম। রবীন্দ্রনাথকে দেখেই তারাপ্রসন্ন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে নানাকে খবর দিতে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাকে সামনে দেখেই হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। তিনি তখন সিঁড়িতে উঠতে আরম্ভ করেছেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম, তাঁর ধপধপে পাঞ্জাবির এখানে সেখানে দাগ লেগে গেল।

ওদিকে রামেন্দ্রসুন্দরও খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আসতেই আমার এইরূপ আচরণ দেখে হাঁ হাঁ করে চেঁচিয়ে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ বরং রামেন্দ্রসুন্দরকে বাধা দিয়ে বললেন, এতে আর কী হয়েছে? বালকের চঞ্চলতা আমার ভালই লাগে।

এদিকে রামেন্দ্রসুন্দরের নিজের অবস্থাও সঙ্গীন। রবীন্দ্রনাথের আসার সংবাদ পেয়েই তিনি নগ্নগাত্রে ছুটে এসেছেন সে বিষয়ে খেয়ালই নেই। অনুচর তারাপ্রসন্ন মনে করিয়ে দিতেই তিনি মহা অপ্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ রহস্য করেই বললেন, পোশাকী রামেন্দ্রসুন্দরকে আমরা দেখতে চাই না—আটপৌরে ত্রিবেদী মশাইকেই আমাদের ভাল লাগে।

ইতিমধ্যে নানা তারাপ্রসন্নের হাত থেকে জামাটি নিয়ে মাথা গলিয়ে দিয়েছেন, বোতাম লাগানোর সময় নেই।

একথা সেকথা চলতে থাকে, তারাপ্রসন্ন এসে নানার কানের কাছে মুখ নামিয়ে কী বললেন। রামেন্দ্রসুন্দর আধ আধ ভাষায় করযোড়ে রবীন্দ্রনাথকে কিছু জলযোগের বিনীত অনুরোধ জানালেন: সামান্য মিষ্টান্ন—যদি একটু—আমার স্ত্রী স্বহস্তে প্রস্তুত করেছেন।

আমি যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। তা বেশ, দিচ্ছেন দিন, রামেন্দ্র-শক্তির অনুরোধ—আমি তো অসম্মত হতে পারি না।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখে হাসি ধরে না। তারাপ্রসন্নের ঝটিতি অন্তঃপুরে গমন।

অন্দরে শরবত ও মিষ্টান্ন সাজানোই ছিল। তারাপ্রসন্ন দু হাতে দুখানি থালা নিয়ে আবির্ভূত হলেন, সঙ্গে ঘি—তার হাতে দু গেলাস শরবত। পশ্চাতে ভৃত্যের হাতে সরপোশ ঢাকা দু গেলাস জল। ঘি ফরাশের উপর গেলাস নামিয়ে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করল। তারাপ্রসন্ন রবীন্দ্রনাথ ও সঙ্গের ভদ্রলোকটির সামনে থালা ধরে দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ নস্যের টিপ নেওয়ার মত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর সহযোগে একটি মিষ্টান্নের অগ্রভাগ ছিন্ন করে আলগোছে মুখে ফেলে দিলেন, তারপরই এক ঢোক শরবত।

একে ভোজন না বলে দৃষ্টিভোগ বলাই উচিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যিনি এসেছিলেন তাঁর আহারে সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকলেও সামনের দৃষ্টান্ত দেখে তিনিও হাত গুটিয়ে তাড়াতাড়ি গেলাসের জলেই আচমন সেরে নিলেন।

ঘি যখন ফল-মিষ্টান্নের থালা নামিয়ে রেখে রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করে পাশে দাঁড়িয়ে গেল, নানা ঘিকে দেখিয়ে বললেন, এটি আমার বড় মেয়ে চঞ্চলার জ্যেষ্ঠা কন্যা। চঞ্চলা প্রায়ই আপনাকে পত্র লেখে। তার ভারী অহংকার যে তার সব চিঠির উত্তরই আপনি দেন। সেগুলি সে খুব যত্ন করে তার নিজস্ব বাক্সে তুলে রেখেছে, কাউকে দিয়ে ওর বিশ্বাস নেই।

স্মিতহাস্যে রবীন্দ্রনাথ ঘিয়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতেই সে একছুটে সোজা অন্দরে চলে গেল, মিনিট খানেক পরে ফিরে এসে, নানার কানে ফিস ফিস করে কী বলতেই, তাঁর মাথা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলে উঠল—যেন অক্ষমতা জানাতে চান।

নির্বাক চলচ্চিত্রের ন্যায় দুজনের এই ভাব-বিনিময় কবিবরকে ফাঁকি দিতে পারে নি। আয়ত নয়নের স্বপ্নভরা দৃষ্টি তুলে তিনি জানতে চাইলেন, আবার কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে?

চলতি কথায় আছে, খেতে পেলেই শুতে চায়। রামেন্দ্রসুন্দর সবিনয়ে নিবেদন করলেন: ওঁরা আপনার একটি গান শুনতে চান, তা কি হয় না?

রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দরের সঙ্গীতানুরাগের ইতিহাস পূর্বেই অবগত ছিলেন, কৌতুক করে রামেন্দ্রসুন্দরকেই প্রশ্ন করলেন, কেন হবে না? কী গাইব আপনি ফরমাশ করুন।

এবার কিন্তু নানা বিপাকে পড়ে গেলেন। কী বিভ্রাট! যিনি সঙ্গীতের কিছুই খবর রাখেন না, তাঁর উপরই কিনা এত বড় ভার দিলেন আর কেউ নয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ!

নানার মুখে আশঙ্কা ও আত্মপ্রসাদ যুগপৎ খেলা তে লাগল। এ বিপদে নানাকে ত্রাণ করতে আমি ছা আর কে আছে ?

ফস করে বলে বসলাম, সেই গানটা সেই "ঝলকিছে ইন্দুকিরণ পুলকিছে ফুলগন্ধ"—

রবীন্দ্রনাথের চোখে মুখে প্রসন্ন হাসি, প্রশ্ন করলেন, য়ে লাইনটা বুঝি ভুলে গিয়েছ ?

উঁহু, ভুলব কেন ? ওতে যে নানার নাম আছে— য় হৃদি রঞ্জন তুমি, নন্দন ফুলহার। আবার নানীর ও আছে, ঝলকিছে কত ইন্দুকিরণ !

কবিবর পুলকিত হাস্যে রামেন্দ্রসুন্দরকে বললেন, পনার নাতিটির মনে রাখবার পদ্ধতি সম্পূর্ণ অভিনব।

এত বড় একটা শুভসংবাদ—রবীন্দ্রনাথ গাইবেন তাঁর ড়িতে! নানা কি স্থির থাকতে পারেন ? ঘিকে বললেন, র মা আর মাসীকে ডেকে আন্।

ঘি রবীন্দ্রনাথের সামনেই বিপদটা আরও ঘনীভূত র তুলল : ইন্দুমাকেও ডেকে আনি ?

হ্যাঁ, তাঁকেও খবরটা দিও।

সে যুগে বাড়ির মেয়েরা কারও সামনে বের হতেন । তবে রবীন্দ্রনাথের কথা স্বতন্ত্র। তিনি আমাদের বারের কাছে মানুষ ছিলেন না, ছিলেন দেবতা।

চঞ্চলা ও গিরিজা মাসী দুজনেই এসে রবীন্দ্রনাথের দুই য় মাথা রেখে প্রণাম করতেই দুজনকে আদর করে য়ে তিনি বললেন, এ যে লক্ষ্মী সরস্বতী।

চঞ্চলা মাসী বললেন, বাবা আপনার কথা নিয়েই ন্ম, আমরাও পা ছুঁয়ে আজ ধন্য হলাম। মনে বড় ছিল, আজ তা পূর্ণ হল।

গিরিজা মাসী নীরব, তাঁরও চোখে মুখে ভাষাহীন ।

সেই গানটিই আরম্ভ হল। রবীন্দ্রনাথ ভাবে বিভোর গাইতে লাগলেন।

গান শেষ হতেই রবীন্দ্রনাথ বিদায় চাইলেন বটে, য়া হল না। হঠাৎ তাঁর চোখ দুটি এক জায়গায় কা পড়ে গেল। কার্পেটের উপর উল দিয়ে বোনা লেখা ভাল ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছিল— মার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণতলে।" রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সেখানেই নিবদ্ধ। রামেন্দ্রসুন্দরের দিকে এক পলক তাকিয়ে আবার সেই লেখাটির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই, নানা আমতা আমতা করে বললেন, যেন কতই অপরাধী : স্থান সঙ্কুলান না হওয়াতেই এই বিভ্রাট।

রামেন্দ্রসুন্দরের কৃপায় গানটি আমার জানাই ছিল, তাই মাঝপথেই নানার সঙ্কোচভরা টুকরো টুকরো কথাগুলির মুখে অনাঘাতে সম দিয়ে বসলাম : আচ্ছা, ভগবানের চরণে কি ধুলো আছে ? আর চরণ আছে কি না, দেখেছেন ? ছবিতে নয়, নিজের চোখে ?

একটা বালকের এই-প্রশ্নে তিনি কিছুক্ষণ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বললেন, ভাবই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল !

বিন্দুবিসর্গও বোধগম্য হল না, অবাক হয়ে চাইতেই তিনি বুঝিয়ে দিলেন, ভগবান তোমার বুকে, তাঁকে যখন বাইরে আনবে, তখনই তাঁর চরণ দেখতে পাবে, আর সে চরণ শুধু এই দু খানা পা নয়, তোমার সামনে যা কিছু দেখছ, সবই তাঁর চরণ, তাঁর বিচরণ।

এবার রবীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। আজ রামেন্দ্রসুন্দর একটি মহাভুল করেছেন। গোড়াতেই একটি নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলো নিতে ভুলে গিয়েছেন। ঘিয়ের প্রণাম দেখেই তাঁর টনক নড়ে উঠল, সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যাবার সময় ডবল প্রণাম করে তিনি জমা-খরচের হিসেব বজায় রাখলেন। প্রথম প্রণাম হল রবীন্দ্রনাথ যখন আসন ছেড়ে উঠলেন, তারপর আর একটি প্রণাম করলেন, রবীন্দ্রনাথ যখন গাড়িতে গিয়ে বসলেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে। রামেন্দ্রসুন্দরের তিরোধানের অনেক পরের ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ তখন দার্জিলিঙে, আমিও সেখানে বেড়াতে গিয়েছি। আমরা প্রায়ই বিকেলে তাঁর কাছে যেতাম। রবীন্দ্র-কাব্য ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হত। এক-দিন কথায় কথায় তাঁকেই জিজ্ঞেস করে বসি, অরূপ, তোমার বাণী—অরূপের কি বাণী আছে ?

রবীন্দ্রনাথের মুখে স্নিগ্ধ হাসি, তিনি বুঝিয়ে দেন, আছে বইকি ! কানে শোনা যায় না, মনের তারে ঘা দিয়ে যায়।

আমারও মনে পড়ে গেল, রামেন্দ্রসুন্দর শেষের দিকে প্রায়ই বলতেন—

যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে—

বহুদিন পরের কথা। ইংরেজী ১৯৩৪ সন। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সম্বর্ধনায় আমি স্টীমার-পার্টির আয়োজন করেছি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবি সেখানে আসবেন। রবীন্দ্রনাথকেও নিয়ে আসার কথা হল। কিন্তু তিনি কোথাও যেতে চান না, সেই কারণেই কেউ তাঁকে বলতে সাহস পায় না। তখন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ইহজগতে নেই। তিনি থাকলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আসা মোটেই অসম্ভব ছিল না। তা ছাড়া আমিও বাল্যকালে রামেন্দ্রসুন্দরের সাহচর্যে তাঁকে যতটুকু কাছে পেয়েছিলাম, এবং তিনিও আমাকে যতখানি স্নেহ করতেন, সেই দাবী, সেই জোরেই আমারও বিশ্বাস ছিল, আমি অনুরোধ করলে তিনি কখনই অসম্মত হবেন না। শরৎবাবু বললেন, রবীন্দ্রনাথ এলে তো ভালই হয়। তাঁর সঙ্গে বসে ফটো তোলার সৌভাগ্য আমার আজ পর্যন্ত হল না। তবে মনে হয়, তিনি আসবেন না। একবার চেষ্টা করে দেখুন—তিনি সম্মত হন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আসা হয়ে ওঠে না।

'না'কে 'হ্যাঁ' করা আর 'হ্যাঁ'কে 'না' করাই আমার জীবনের একটা খেলা। তাই কোনরকম দ্বিধা না করেই গেলাম তাঁর কাছে। দেখলাম, তাই তো, এ যে দেখছি কিছুতেই রাজী নন। তখন তাঁর সঙ্গে আমার বাল্যকালের স্মৃতি-কথা ঝালিয়ে নিলাম। যখনই রামেন্দ্রসুন্দরের কথা বলি—তাঁর চোখ দুটি জ্বলে ওঠে। এত করেও কিছু সুফলের আশা নেই দেখে বলে উঠলাম, তবে আপনার দরজায় সত্যাগ্রহ করব। এতক্ষণে তিনি হেসে সম্মতি দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে তাঁকে আনতে গিয়ে দেখি, তাঁর শরীর মোটেই ভাল নেই—ডাক্তার সামনে বসে। তবু, শুধু আমাকে বিমুখ করবেন না বলেই, উঠে এসে গাড়িতে বসলেন। স্টীমারে যখন তিনি এসে উপস্থিত হলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললাম, "সোনার তরী" আজ আমার কাছে সার্থক—আপনার স্পর্শে তরী আজ সোনার হয়ে গেল।

হাস্যোজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন—তুমি বেশ ক[illegible] বলেছ।

শরৎবাবু সামনে আসতেই তাঁকে বলি, এগিয়ে আ[illegible] এবার আপনার বহুকালের ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

গ্রুপ ফোটো তোলার জন্যে ফোটোগ্রাফারও প্রস্তু[illegible] 'ক্লিক্' করে একটা শব্দ হতেই, আমাদের মধ্যে পাশাপ[illegible] উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র আলোছায়ার খে[illegible] চিরকালের জন্যে বন্দী হয়ে রইলেন।

অনেকদিন আগের কথা। রামেন্দ্রসুন্দর তখন চাঁ[illegible] তলার বাড়িতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমবয়সী ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রন[illegible] ঠাকুর হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় এসে উপস্থিত। রামেন্দ্রসুন[illegible] তখন কী একটা সভায় গিয়েছেন—তাই দেখা হল ন[illegible] সে সময় পদ্মমাও দিন কয়েকের জন্যে কলকাতা[illegible] এসেছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ফিরে আসতেই পদ্মমা নানা[illegible] বললেন, ওরে রাম, আজ দুটি ছেলে তোকে ডাক[illegible] এসেছিল, যেন একজোড়া পূর্ণিমের চাঁদ—তারা ঢুকতে[illegible] ঘর যেন আলো হয়ে গেল।

রামেন্দ্রসুন্দর যা উত্তর দিয়েছিলেন, সেটা আ[illegible] মনের গভীরে সযত্নে তুলে রেখেছি।

তিনি মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলেছিলেন, শুধু ঘর ন[illegible] গোটা বাংলা দেশ এঁদের জন্যে আলো হয়ে আছে[illegible] একদিন সারা ভারতবর্ষ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

আবার চঞ্চলা মাসীর কথায় ফিরে আসি। তাঁ[illegible] প্রত্যাবর্তনের দিন আসন্ন—সঙ্গে ঘিকেও নিয়ে যাবেন[illegible] মাসখানেক পরেই তার বিয়ে। সন্তোষের সঙ্গে ছাড়াছা[illegible] আগেই হয়ে গিয়েছে। অনেকদিন আমি আর ঘি একস[illegible] খেলাধুলো করেছি, সেও চলে যাবে—মনটা কেমন [illegible] উঠল। দুম্বা ফোড়ন দিয়ে বলল, ঘি বাবুদিদিও [illegible] যাচ্ছে—আমাদের দলে ভাঙন শুরু হল, এবার কী [illegible] ধীরেনদা?

নানার ভাবভঙ্গী যেন আমাকে নেশার মত [illegible] বসেছে। মুখে দার্শনিকের গাম্ভীর্য—কণ্ঠস্বরে যথাস[illegible] রামেন্দ্রসুন্দরের ঔদার্য মিশিয়ে উত্তর দিলাম, কী [illegible] করা যেতে পারে? যাওয়া-আসা নিয়েই তো পৃথিবী[illegible] এই সুখ-দুঃখ নিয়েই তো আমাদের বেঁচে থা[illegible]

সে সময় রামেন্দ্রসুন্দর আমার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, আবার কোন থিয়েটারের পার্ট মুখস্থ হচ্ছে নাকি?

ডুম্বা আমার হয়ে বিশদ বিবরণ দিয়ে নানাকে বুঝিয়ে দিল—এমন সময় আবার ঝিয়ের আবির্ভাব।

ধার করা গাম্ভীর্য আর কতক্ষণ টিকবে—চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। সেই প্রথম রামেন্দ্রসুন্দর কাপড়ের খুঁট দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে বললেন, এতে কাঁদবার কী আছে? সব মেয়েরাই তো শ্বশুরবাড়ি যায়।

নানা তো এক কথায় মামলা ডিসমিস করে দিয়ে গেলেন—কিন্তু আমাদের তিনজনের ঘরোয়া বৈঠক যেন শেষ হতে চায় না।

ঝিয়ের হাত ধরে আমি কাঁদি, সেও কাঁদে, ডুম্বাও যোগ দেয়। আমাদের ব্যাপারটা এই দাঁড়িয়ে গেল, যেন বিবাহ নয়—এটা তার 'কন্‌ডোলেন্স মীটিং' বসেছে। মন সময় নানী আসতেই তিনজনের কান্না একসঙ্গেই মে গেল। মূল তাৎপর্য অবগত হয়ে নানী এক তাড়ায় ক্রন্দনের ত্রয়ী চুক্তিকে ভেঙে দিলেন। চঞ্চলা মাসীকে ডাক দিয়ে বললেন, ওরে দেখে যা, আম না হতেই আমায়ণ।

আমরা তিনজনেই হেসে উঠলাম। স্বামীর নাম কিনা! তাই ইন্দুপ্রভার মুখে রাম নাম নেবার উপায় নেই। বাধ্য হয়ে রামচন্দ্রকে আমচন্দ্র বলেই কাজ চালিয়ে দিতেন। রামেন্দ্রসুন্দর ও ইন্দুপ্রভা দেবী উভয়কে একসঙ্গে আম-দরবারে পেলেই, এই আম কথাটি নিয়ে কত যে ঠাট্টা করেছি তার ইয়ত্তা নেই।

চঞ্চলা মাসী তাঁর পিতৃদেবের কাছে কথা আদায় করে নিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রথম কাজ ঝিয়ের বিবাহে তিনি যেন উপস্থিত থাকেন, আর সেইজন্যেই গ্রীষ্মাবকাশের ছুটিতে বিয়ের দিন ঠিক করেছেন। চঞ্চলা মাসী যাবার সময় বার বার সেই কথাটি রামেন্দ্রসুন্দরকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। পিতৃদেবের পদধূলি নিয়ে গাড়িতে উঠেই নানীকে পুনরায় বললেন, মা, বাবাকে নিয়ে বিয়ের অন্ততঃ সাতদিন আগে আসা চাই, তুমি রোজ সে কথা একবার করে স্মরণ করিয়ে দিও।

রামেন্দ্রসুন্দর নির্বিকার।

মেসোমশাই গাড়িতে উঠলেন। ঝি প্রণম্যদের পায়ের ধুলো নিয়ে আমার কাছে আসতেই আমি ছুটে উপরে পালিয়ে গেলাম। পড়ার ঘরে খিল এঁটে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়লাম। মালপত্র বোঝাই ছ্যাকড়া গাড়ির কর্কশ ঘর্ঘর শব্দ দূর থেকেই কানে আসে, শ্রাবণের ধারা চোখে নেমে এল। রামেন্দ্রসুন্দর, ইন্দুপ্রভা দেবী আমার অবস্থা বুঝতে পেরেই সোজা উপরে এসে আমার রুদ্ধ দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত করতে থাকেন, তবুও সাড়াশব্দ নেই।

শেষটায় দরজা খুলতেই আমার সিক্ত চক্ষু দেখে নানা থমকে দাঁড়ালেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কথায় কথায় পুরুষমানুষের চোখে জল কেন?

কিন্তু নানীর অবস্থা কাহিল, চঞ্চলা মাসী এবার অনেক দিন তাঁর কাছে ছিলেন। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় কোন্ মায়ের মন না কেঁদে ওঠে? তার ওপর ঝিকে আশৈশব পালন করেছেন, তাই তাঁর চোখেও জল। আমায় বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিলেন: এ কদিন পরেই আবার ঝিকে দেখতে পাবি—কাঁদিস নে, এবার তোকে আর লালগোলায় পাঠাব না, ঝিয়ের বিয়েতে নিয়ে যাব।

আমাকে প্রবোধ দিলেন বটে, কিন্তু নানী নিজেই বেসামাল।

রামেন্দ্রসুন্দর ইন্দুপ্রভাকে সরিয়ে দিলেন।

তাঁরা চলে যেতেই আবার দরজায় খিল দিলাম।

গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেল, তিন সপ্তাহ পরেই আমরা সব বাড়িমুখো। সাজ সাজ রব পড়ে গেল—কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের কাকস্য পরিবেদনা। চিরদিন যেমন দেখেছি, আজও তেমনই। রওনা হবার পাঁচ মিনিট আগেও সেই আত্মসমাহিত ভাব। তারাপ্রসন্ন দস্তুরমত মুশকিলে পড়ে গেলেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে তিনি নানীর শরণাপন্ন হতেই তিনি ছুটে এসে নানাকে সজাগ করে দিলেন, কই এস, গাড়ি ফেল হয়ে যাবে যে!

রামেন্দ্রসুন্দর তখনও বইয়ের পাতায় চোখ লাগিয়ে আপন মনে কী বিড়বিড় করছেন, হঠাৎ বলে উঠলেন, এই যে যাচ্ছি।

তারাপ্রসন্ন নানার জামা হাতে দাঁড়িয়ে। সেদিকে দৃক্‌পাত না করেই চটি পায়ে নানা নীচে নামছিলেন,

নানী পেছন থেকে আর একবার বচন দিলেন : অমনই যাবে নাকি ? জামাটা গায়ে দিয়ে নাও, আচ্ছা বিপদেই পড়া গেল যা হোক।

নানা থতমত খেয়ে বললেন, কই ?

এই যে আমার হাতে।—তারাপ্রসন্ন জামাটা এগিয়ে দিতেই নানা লক্ষ্মী ছেলের মত সেটা নিয়েই মাথা গলিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, আমার লাঠিটা ?

নানী তাঁর যষ্ঠি নিয়েই অনুগমন করছিলেন, আমি একটু রসিকতা করার লোভ সংবরণ করতে পারি নি, বলে উঠলাম, এই যে তোমার পেছনেই লাঠি হাতে নানী, আবার কিছু বেচাল হলেই তোমার পিঠে বসিয়ে দেবেন। খুব সাবধান।

নানার একটা দমকা হাসি, ওদিকে নানীর একটা অম্লমধুর তাড়া।

গাড়িতে উঠবার আগেই রামেন্দ্রসুন্দর হঠাৎ থেমে গেলেন। জামার উপর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, অথচ বোতাম খুঁজে পাচ্ছেন না। তিনি যে উলটো করে জামা পরেছেন সেটা খেয়াল নেই।

নানী ব্যাপারটি বুঝতে পেরেই তাড়াতাড়ি জামাটি ছাড়িয়ে আবার সোজা করে পরিয়ে দিয়ে বললেন, কী আর বলব তোমাকে ? আমার কপাল!

রামেন্দ্রসুন্দর এবার একটা জুতসই জবাব দিয়ে বসলেন : সেটা অ্যাদ্দিনে বুঝলে, বড্ড দেরি হয়ে গেল যে!

এবার আমাকে শিক্ষকের আসন নিতে হল, নানাকে জড়িয়ে ধরে বলি, তোমার অত ভুলো মন কেন, বল তো ? কার সঙ্গে আপন মনে কথা কও, সব সময় কী যে ভাব, তোমার মনটা যে কোথায় পড়ে থাকে ?

আরও হয়তো বহুবিধ প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতাম, মাঝপথে নানী আমায় থামিয়ে, আবার আমার কাছেই জানতে চাইলেন, তুই যদি বলতে পারিস, তোর নানা দিনরাত কার কথা ভাবে, তা হলে বুঝব তোর কিছুটা বুদ্ধি হয়েছে।

সোৎসাহে উত্তর দিই, না বললে বুঝি বুদ্ধিমান বলবে না, এই তো ? আচ্ছা তবে শোন, বলব নানা ?

রামেন্দ্রসুন্দরের চোখেও কৌতূহল।

ছোটনানীর কথা।

নানীর উচ্চকিত স্বর : সে কি রে ? সে আবার কে ?

কেন, সাহিত্য-পরিষৎ।

নানীর হাসি যেন আর বাঁধ মানে না, তার সঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরেরও অবাধে যোগদান।

নানী আদর করে আমার মত বুড়ো ছেলেকেও কোলে নিয়ে বললেন, ওরে আমার পাগলা ছেলে, ঠিক বলেছি নানা ওটা আমার ঘোর সতীন!

রামেন্দ্রসুন্দর আমার দিকে চেয়ে জানতে চাইলেন, দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত বক্র : এটি তোমার নিজস্ব আবিষ্কার, না, অন্য কেউ মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে ?

সত্যি কথা বললেই আমার মৌলিকত্ব চলে যাবে, এটা জেনেও তাঁকে ঠিক কথাটিই বলি : তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, যেদিন সাহিত্য-পরিষদের নতুন গৃহ-প্রবেশ হয়েছিল, তার আগের দিন নগেন্দ্রনাথ বসু এই কথাটি আমায় বলেছিলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের মুখ দিয়ে ছোট্ট একটি কথা বেরিয়ে এল : হুঁ-উ-উ-উ! বটে!

[ক্রমশ]

মালতী-মাধব

সুনীল ভট্টাচার্য

[পূর্বানুবৃত্তি]

সন্ধ্যের পর আসর বসে। রসরাজ গোসাঁই আসেন, কিন্তু তাঁর শরীর তত ভাল নয়, খানকয়েক গান গেয়েই তিনি শ্রীধরঠাকুরকে বলেন, কই গো গোসাঁই, তোমার নাতনী কই, আমি যে তার গান শুনব বলেই এতদূরে এসেছি। মালতী লজ্জায় মরে, রসরাজ গোসাঁই কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। শেষটায় মালতী গান ধরে। অপূর্ব কণ্ঠস্বর। গান শেষ হলে রসরাজ গোসাঁই বলেন, উঁহু, শেষ করলে হবে না, আরও একটা গাও। আহা গোঁসাই, মার নাতনীর গলা বটে!

এই আসরেই শ্রীধরঠাকুরের অনুরোধে মাধবঠাকুর গয়েছিলেন—

রূপে লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

মাধবঠাকুরের গান শুনে সকলে মুগ্ধ হয়ে ধন্য ধন্য করে উঠেছিলেন। তা করবেনই বা না কেন, একে অতি মিষ্টি গলা, তার ওপর ইদানীং রীতিমত চর্চার ফলে মাধবঠাকুরের গলায় সূক্ষ্ম কাজগুলো খুলেছিল ভাল। কিন্তু বুঝলে কিনা গোসাঁই, আসলে মাধবঠাকুর তো আর সেদিন শুধুমাত্র গলা দিয়েই গান গান নি, তিনি যে সমস্ত অন্তর দিয়ে গান গেয়ে মালতীকে শুনিয়েছিলেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর…

মালতীর বিভোর অবস্থা, সম্বিৎ ফিরে এলে মালতী লজ্জিত হয়ে পড়ে।

উৎসবের বাকী দিন কটা লবঙ্গলতা মাধবঠাকুরকে আর ছাড়েন নি। বলেছিলেন, তুমি চলে গেলে শ্যামরাইয়ের উৎসব যে নিরানন্দ হয়ে যাবে বাবা। গোসাঁইজী অসুস্থ, এসেছেন এই ঢের। এখন তুমি চলে গেলে নাম-গান করবে কে বাবা—তোমার ওপরেই যে তিনি সব ভার দিয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত করেছেন। শ্রীধরঠাকুর ও আখড়ার অন্যান্য জনেরাও লবঙ্গলতার কথায় সায় দিয়েছিলেন। স্বয়ং রসরাজ গোসাঁই বলেছিলেন, সে কি, তুমি চলে গেলে কি হয়। আমি যে মালতী-মাধবের গান শুনব বলেই অসুস্থ শরীরেও রয়ে গেলাম।

আখড়া ছেড়ে চলে যাবার আগে এই রসরাজ গোসাঁই-ই আড়ালে লবঙ্গলতাকে ডেকে বলেছিলেন, মালতী-মাধব! আহা এ যেন এক আসরে দুটি ধ্বনির মিল গো লবঙ্গ, দাও না এদের জুটি বেঁধে। লবঙ্গলতা রসরাজ গোসাঁইয়ের কথা শুনে কেমন যেন হয়ে যান। তাই দেখে রসরাজ গোসাঁই একটু যেন অপ্রস্তত হয়েই বলেছিলেন, কিছু মনে করলে নাকি লবঙ্গ? লবঙ্গলতা তাই শুনে তাড়াতাড়ি বলেন, না না, একি বলছেন, আমার যে এতে অপরাধ হবে গোসাঁই। খানিক পরে লবঙ্গলতা যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই মৃদু চাপা স্বরে রসরাজ গোসাঁইকে বলেছিলেন, এ যে হবার নয় গোসাঁইজী, এ যে হবার নয়। রসরাজ গোসাঁই লবঙ্গলতার রকমসকম দেখে আর কিছু না বলে শুধুমাত্র বলেছিলেন, ও। মাধবঠাকুরও সেদিন সন্ধ্যেবেলা আখড়া ছেড়ে নবদ্বীপের পথে রওনা দিয়েছিলেন। আসবার আগে লবঙ্গলতা, শ্রীধরঠাকুর মাধবঠাকুরকে আবার আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিদায়মুহূর্তে মাধবঠাকুরের দৃষ্টি বার বার করে মালতীকে খুঁজেছিল। যেতেও যে পা চলে না, যদি দেখা মেলে—এমনই মনের ভাব। কিন্তু মালতী সেদিন ঘর থেকে আর বার হয় নি গো গোসাঁই, যদি ধরা পড়ে যায়—হৃদয়ের থরথর কম্পন যে মালতীর বুকে টলমল। এপারে বৃন্দাবন ওপারে গোকুল মাঝখানে কালো যমুনা, ওপারের দিকে চেয়ে একটু থেমে বলাইদাস হাসিমুখ ফিরিয়ে বললেন, ওই যে বলে না গোসাঁই—

প্রথমহি দরশনে প্রেম উপজিল
দুহুঁ মন এক হৈল রাতি,

প্রথম দর্শনেই মালতী-মাধব মরেছিল গোসাঁই।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বলাইদাস, রসরাজ গোসাঁইয়ের প্রস্তাবে লবঙ্গলতা অমন আপত্তি করেছিলেন কেন? বলাইদাস বলেছিলেন, আয়ান ঘোষ গো, আয়ান

ঘোষ। বৃন্দাবনের মতই আমাদের মালতী-মাধবের মাঝখানে একটি আয়ান ঘোষ ছিল গো গোসাঁই। আমি বলেছিলাম, তার মানে মালতী বিবাহিতা? বলাইদাস বলেছিলেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা বলাইদাস, মাধবঠাকুর কি এ সব কথা জানতেন না? বলাইদাস বলেছিলেন, আগে জানতেন না পরে জেনেছিলেন, কিন্তু তার আগেই যে মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে গোসাঁই। বলেছিলাম, এ অন্যায় বলাইদাস। বলাইদাস হেসে বলেছিলেন, অন্যায়! তা হবে গোসাঁই। কিন্তু প্রেমের রীতিনীতিই যে একটু আলাদা ধরনের। সে তোমার সংসারের রীতিনীতির সঙ্গে একেবারেই মেলে না। জানলে গোসাঁই, প্রেমমূর্তি ঘনশ্যামই আমার বাঁকা, তাই তো বাঁকা কানুর সঙ্গে পীরিতি করে শ্রীরাধিকাকে আমার কত বাঁকা পথের বিপদ গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে! তা কি আর বলে শেষ করা যায় গোসাঁই। সে জানে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, আমরা জানব কী করে?

এর উত্তরে কণ্ঠস্বরে একটু শ্লেষ মিশিয়েই বলে উঠেছিলাম, এই কি তবে তোমাদের পরকীয়া প্রেমের তত্ত্ব বলাইদাস? এ কথা শুনে বলাইদাস একটু যেন গম্ভীর হয়ে পড়েছিলেন। পরে আবার আগের মতই সহজ সুরে হেসে বলে উঠেছিলেন, আগে সবটা শোন, তারপর না হয় ন্যায়-অন্যায় বিচার কোর।

বলাইদাস বলে চললেন, গোসাঁই, মানুষ ভাবে এক, হয় আর। তা না হলে অত অল্প বয়সেই বা মালতী তার বাপকে হারাবে কেন? লবঙ্গলতার স্বামী গুপ্তিপাড়ার নবীন কীর্তনীয়া হলেও বিলক্ষণ পণ্ডিত, বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, পদাবলীকীর্তনে অদ্বিতীয়, কিন্তু স্বভাবটা তাঁর ছিল আলগা ধরনের। সংসারের অত-শত বুঝতেন না। কত বড় বড় জায়গা থেকে তাঁর ডাক আসত, কিন্তু বড় একটা কোথায়ও যেতেন না, সংসার প্রতিপালনের জন্য অল্পস্বল্প রোজকার করতে পারলেই সন্তুষ্ট। বাকী সময়টা ঘরে বসেই পুথিপত্র ঘেঁটে নূতন নূতন পালা-পদ লিখে সময় কাটাতেন। লবঙ্গলতা কিছু বললে বলতেন, ওগো, সম্পদের প্রতি অত লোভ কোর নাগো, লোভ কোর না। বেশী আড়ম্বরে শান্তি থাকে না লবঙ্গ, বাইরের ঐশ্বর্য এসে অন্তরের সহজ বস্তু, সহজ আনন্দকে বড় আড়াল করে রাখে লবঙ্গ। এই বেশ আছি—তুমি আমি আর আমাদের মেয়ে মালতী, এই নিয়ে ছোট্ট সংসার। খুব সচ্ছল না হলেও অসচ্ছলও নয়, এই বেশ আছি। কিন্তু কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল। মাত্র দু-দিনের রোগ-ভোগেই নবীন কীর্তনীয়া মারা গেলেন। সংসারে গচ্ছিত বলতে তেমন কিছুই ছিল না। লবঙ্গলতা শিশু মালতীকে নিয়ে একেবারে অগাধ জলে পড়লেন। এই অবস্থায় পড়ে লবঙ্গলতারও একটু বুদ্ধিভ্রম হয়েছিল, তা না হলে জেনে শুনে কেউ কি আর শ্রীকণ্ঠ ঘোষের গোঙা ছেলে রাইরমণের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেয়? লবঙ্গলতা হয়তো ভেবেছিলেন বয়সকালে তাঁর জামাইয়ের এই রোগটা সেরে যাবে। কিন্তু গোসাঁই, গোঙামি তো কমলই না উপরন্তু বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে লবঙ্গলতার জামাই রাইরমণের একটু-আধটু মাথার গোলযোগ দেখা দিল।

ছোট মালতী স্বামীর হাতে মারধোর খেয়ে মরে আর কি। শেষে মেয়ের প্রাণসংশয় বুঝে একদিন লবঙ্গলতা তাঁর মেয়ে আর স্বামীর পুথিপত্রগুলো নিয়ে রাতারাতি গুপ্তিপাড়া ছেড়ে পালালেন। এর পরে কেমন করে কখন্ তিনি কী ভাবে শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় এসে আশ্রয় পেলেন তা জানি না গোসাঁই। লবঙ্গলতা নিজের দুঃখ-কষ্টের কথা শ্রীধরঠাকুরকে খুলে বললেও মালতীর বিয়ের কথাটা কিন্তু লবঙ্গলতা ইচ্ছে করেই সেদিন চেপে গিয়েছিলেন। শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় মা-মেয়ের দিন যায়। জাতবোষ্টমের মেয়ে লবঙ্গলতা খুব সহজেই আখড়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। রাধারমণের নিত্য পূজায় লবঙ্গলতা মালা গেঁথে চন্দন ঘষে শ্রীধরঠাকুরকে এগিয়ে দেন, মাঝে মাঝে একটু-আধটু নাম-গানও করেন, এতেই শ্রীধরঠাকুর পরম প্রীত। লবঙ্গলতা যখন শ্যাম-রাইয়ের সামনে বসে গান গান, মেয়ে ছোট মালতী তখন মার পিছনে দাঁড়িয়ে অপটু গলায় তারই নকল করে। গলাটি ভারি মিষ্টি, এই মালতীকেই গান শেখাবার জন্যে শ্রীধরঠাকুর আবার নূতন করে তাঁর 'বঙ-বঙা-বঙে' তার চড়ান, খঞ্জনি বার করেন। এমনই করে সুখে দুঃখে লবঙ্গলতা আর মালতীর দিন যায়।

ক্রমে বয়ঃসন্ধি-কিশোরীর অঙ্গে এসে লাগে যৌবনের লাবণি। ফুল ফুটলে ভ্রমরের গুনগুনানি শুরু হয় গোসাঁই।

গোসাঁইপাড়ার অনেক তরুণ গোসাঁই মালতীকে পাবার জন্যে আনচান করে ওঠে। আখড়ার সামনে, পথে, পুষ্করিণীর ধারে, রাইকদমতলায় পদাবলীর কলি গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। শ্রীধরঠাকুরও লবঙ্গলতাকে বলেন, লবঙ্গ, এবারে আমার রাইয়ের জন্যে যে একটি ভাল শ্যামচাঁদের খোঁজ করতে হয় গো। এ কথা শুনে লবঙ্গলতা কেমন যেন হয়ে পড়েন। বলেন, আর কিছুদিন যাক না বাবা। আসলে লবঙ্গলতার ভয়টা ছিল শ্রীকণ্ঠ ঘোষের গোঙা ছেলেটাকে নিয়ে। সে যদি কখনও এসে পড়ে! জানলে গোসাঁই, লবঙ্গলতার এই ভয়টাই একদিন সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেবারে চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা, নাথদের গাজনতলায় মস্ত বড় মেলা। লবঙ্গলতা দুপুরের দিকে একা একাই মেলায় গিয়েছিলেন, দু একটা ঘরের থালাবাটি কিনে আনতে। ফিরে আসছেন, পথের মাঝখানে পাগল জামাইয়ের সঙ্গে তাঁর সামনাসামনি দেখা হয়ে গেল। পাগল একটা তরমুজের মালা কামড়াতে কামড়াতে আসছিল। ছেঁড়া শতচ্ছিন্ন বস্ত্র, কাঁধে একটা যত রাজ্যের আবর্জনা-নোংরা-ছেঁড়া-কাগজ-ন্যাকড়ায় বোঝাই পুঁটলি, চুলে জট, একমুখ দাড়িগোঁফ। লবঙ্গলতা ভয়ে ভয়েই পাগলটাকে পাশ কাটিয়ে চলে আসছেন। তখনও লবঙ্গলতা তার জামাইকে চিনতে পারেন নি। পাগলা কিন্তু এক নজরেই লবঙ্গলতাকে চিনতে পেরেছিল। পাগল জামাই লবঙ্গলতার পেছনে ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে হি হি করে হেসে বলে, কোথায় তুই পালিয়ে বেড়াবি, এই তো আমি তোকে খুঁজে পেয়েছি। তুই না মালতীর মা, আমার শাশুড়ি। লবঙ্গলতা চমকে ওঠেন: এ যে দেখছি শ্রীকণ্ঠ ঘোষের গোঙা ছেলেটা! তার জামাই! যার ভয়ে তিনি একদিন মেয়েকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন! কী সর্বনাশ! এদিকে পাগলটা তখন কি মনে করে হাসি থামিয়ে রুদ্রমূর্তি ধরে চোখ ঘুরিয়ে লবঙ্গলতাকে এই মারে কি সেই মারে। মুখে বুলি—দে, আমার বউকে এনে দে, দে বলছি। লবঙ্গলতা ভয়ে আঁতকে ওঠেন। চারধারে তাকান, যদি কেউ দেখে ফেলে। কিন্তু পাগলের কী যে খেয়াল, নিজেই লবঙ্গলতার পথ ছেড়ে দিয়ে বেদম হাসতে হাসতে বলতে আরম্ভ করেছে, ওহো, ভয় পেয়ে গেছে, যা যা পালিয়ে যা। লবঙ্গলতা তাড়াতাড়ি পাগলকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে আখড়ার দিকে এগিয়ে যান। পাগল ফিরেও তাকায় না, আপন মনে গান গাইতে গাইতে সমুখ পানে এগিয়ে চলেছে—

> তুই পালিয়ে বাঁচিস, বাঁচিস যদি
> তাই বাঁচ মা শঙ্করী।

এই পাগলটা আর একটা ভারি অদ্ভুত ধরনের গান গাইত—

> ভগবান তুই আমার রসের নাগর
> আমি তোর ফুল টোপা···

সে যাই হোক, এদিকে লবঙ্গলতা কোনরকমে মরিবাঁচি করে আখড়ায় ফিরে এসেই মেয়ে মালতীকে নিয়ে ঘরে দোর দিলেন। মার রকমসকম দেখে মালতী তো অবাক।

মালতী জিজ্ঞাসা করে, কী হল মা? লবঙ্গলতা উত্তর দেবেন কি, সম্বিৎহারা হয়ে ততক্ষণে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছেন। মাথায় জল বাতাস দেওয়ার ফলে লবঙ্গলতার মূর্ছা ভাঙে। শ্রীধরঠাকুর মহা উৎকণ্ঠার সঙ্গে লবঙ্গলতাকে জিজ্ঞাসা করেন, এমন হল কেন মা, এর আগে কি এমন কখনও হয়েছিল? মালতী, তুমি তোমার মাকে দেখ, আমি না হয় কবিরাজ মশাইকে ডেকেই আনি। লবঙ্গলতা উঠে বসেন, ম্লানকণ্ঠে শ্রীধরঠাকুরকে বারণ করে বললেন, না বাবা, আপনাকে আর এত রোদ্দুরে বাইরে যেতে হবে না। এমন কিছু হয় নি। রোদ্দুরে বোধ হয় মাথাটা একটু ঘুরে গিয়েছিল।

এর পরে বুঝলে গোসাঁই, লবঙ্গলতার মনের ভয় আর যায় না, সদাসর্বদাই আশঙ্কা—ওই বুঝি পাগলটার সঙ্গে ফের দেখা হয়ে যায়, ওই বুঝি সে এসে আখড়ায় ঢোকে। দিন কতক তো মালতীকে সদাসর্বদাই তিনি আড়াল করে রাখতে চাইতেন। মালতী অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। আখড়ার পাঁচজন ভাবত লবঙ্গলতার এই এক বাইতে ধরেছে। অন্যজনে তার আর কী বুঝবে? আসলে এতদিন যা লবঙ্গলতার মনে কখনও-সখনও উদয় হয়ে ভয় ধরাত আজ তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে লবঙ্গলতাকে আর কিছুতেই স্বস্তি দিচ্ছে না। পাগল জামাইয়ের কথা লবঙ্গ কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। অবশ্য পাগল তখন কোথায় তা কে জানে!

এমনই করে দিন যায়। লবঙ্গলতার মনের ভয় আর কাটে না। মাঝে মাঝে রাধারমণের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে লবঙ্গলতা আপন মনে কী সব বিড়বিড় করে বকেন, পরক্ষণেই আবার ঠাকুরকে শুনিয়ে বলেন, কী বলতে কী বলে ফেলেছি, আমার অপরাধ নিও না ঠাকুর। কে জানে, লবঙ্গলতা হয়তো ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে তার পাগল জামাইয়ের মৃত্যু কামনাই করেন। কিন্তু লবঙ্গলতারও মায়ের প্রাণ। মা হয়ে আর একজনের মৃত্যু কামনা করেন কী করে! তাই হয়তো আকুল হয়ে রাধারমণের কাছে আর্তি জানান। মালতী কাছে-পিঠে থাকলে হেসে ফেলে জিজ্ঞাসা করে, কী বিড়বিড় করে বকছ বল তো মা? লবঙ্গলতা চমকে উঠে পিছন ফিরে মেয়ের দিকে তাকান, পরে বলেন, ও কিছু নয় মা। শ্রীধরঠাকুরও লবঙ্গলতার মনের পরিবর্তন টের পেয়েছেন। মাঝে মাঝে তিনিও জিজ্ঞাসা করেন, হ্যাঁ মা লবঙ্গ, তোমার শরীর ভাল আছে তো? লবঙ্গলতা তাড়াতাড়ি হাতে যা হোক একটা কিছু কাজ টেনে নিয়ে বলেন, হ্যাঁ বাবা, শরীর আমার ভালই আছে। এমনই করে ভয়-ভাবনার মধ্য দিয়ে লবঙ্গলতার দিন যায়।

তবু এরই মধ্যে একসময় সময়ের প্রলেপ এসে লাগে। লবঙ্গলতা খানিকটা যেন সুস্থির হয়ে ওঠেন। সেবারে শ্রীধরঠাকুর, লবঙ্গলতা আর মালতীর সঙ্গে মাধবঠাকুরের রেলপথে দেখা হয়ে যায়। আগেই বলেছি গোসাঁই, প্রথম দর্শনেই মালতী-মাধব দুজনেই মজেছিল। রাসপূর্ণিমার দিন মাধবঠাকুর শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় এসেছিলেন। তারপর উৎসবের কটা দিন কাটিয়ে আবার নবদ্বীপে ফিরে গিয়েছিলেন। আসবার আগে শ্রীধরঠাকুর আর লবঙ্গলতা মাধবঠাকুরকে আবার আসবার জন্য বার বার করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মাধবঠাকুরও এই চান। মাধবঠাকুর শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় আসেন যান। মালতীরও অতি ব্যাকুল অবস্থা। ওই যে বলে না—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারও কথা।

শ্রীধরঠাকুর হেসে ঠাট্টা করে বলেন, রাই, কার কথা অমন করে ভাবা হচ্ছে গো? বলি, গোসাঁইপাড়ার কোন শ্যামচাঁদকে কি মনে ধরল?

মালতী ঈষৎ রাঙা হয়ে হেসে বলে, তোমার যত ইয়ে—আচ্ছা ঠাকুরদা, এ ছাড়া কি আর কিছু ভাবতে পার না?

শ্রীধরঠাকুর হেসে বলেন, রাই, [illegible]দের এই বোষ্টমদের যে তোমার ওই "ইয়ে-টিয়ে" নিয়েই যত সাধন-ভজন, আর কি ভাবতে পারি? ওই যে বলে না—"প্রাণনাথ কেমনে কহিব আমি, তোমা বিনিময়ে করে উচাটন কে জানে কেমন তুমি"।—মালতী পালিয়ে বাঁচে।

লবঙ্গলতা কাছাকাছি থাকলে শ্রীধরঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, বাবা, মালতী অমন করে পালিয়ে গেল কেন? শ্রীধরঠাকুর লবঙ্গলতাকে বলেন, রাইকে আমার একটু রাগিয়ে দিলাম। এর পরে শ্রীধরঠাকুর হয়তো বলেন, মা লবঙ্গ, এবার কিন্তু আমার রাইয়ের জন্যে একটি ভাল কানুর সন্ধান করতে হয়।

শ্রীধরঠাকুরের মুখে মালতীর বিয়ের কথা শুনে লবঙ্গলতা আবার যেন কী রকম হয়ে পড়েন। সেবার রসরাজ গোসাঁইও মালতীর বিবাহ-প্রসঙ্গ তুলতে লবঙ্গলতা এমনিই কেমন যেন হয়ে পড়েছিলেন। শ্রীধরঠাকুর হেসে বলেন, ভয় নেই গো, রাইকে আমার তেমন কোন বিদেশ-বিভূঁয়ে পাঠাব না। গোসাঁইপাড়ার শ্রীদাম গোসাঁইয়ের ছেলে সনাতন গোসাঁইকে তোমার কেমন লাগে? বল তো না হয় কথাবার্তা উত্থাপন করি। লবঙ্গলতা কী যেন ভেবে বলেন, আরও কিছুদিন যাক না বাবা, তারপরে না হয়।—লবঙ্গলতা এ ভাবেই বার বার কিন্তু মালতীর বিবাহ-প্রসঙ্গটাকে বরাবর এড়িয়ে যেতে চান।

এদিকে লবঙ্গলতাও মেয়ের মন জানতে পেরেছেন। মাধবঠাকুর এলে যেন মালতী কেমন হয়ে পড়ে। বলেন, মুখ ফুটে না বললেই কি আর মায়ের চোখে ধুলো দেওয়া যায়? লবঙ্গলতাও মাঝে মাঝে ভাবেন, যা থাকে কপালে, মেয়ের বিয়েটা দিয়েই ফেলি। শ্রীধরঠাকুরকে লবঙ্গলতা একসময় একটু দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই বলেন, মাধবের সঙ্গে না হয়—

শ্রীধরঠাকুর পরম পুলকিত হয়ে বললেন, তাই তো মা, এ কথা তো আমার একেবারেই মনে হয় নি। মাধব এলেই আমি কথাটা পাড়ছি। আহা, এ যদি হয় তবে এর চেয়ে আর সুখের কী হতে পারে। দেখ মা লবঙ্গ,

তোমারও আর মেয়েকে দূরে পাঠাবার ভয় রইবে না। মাধব এখানেই থাকবে। আহা, রূপ নয় তো যেন নদীয়ার গোরাচাঁদ। মাধবের সঙ্গে রাইয়ের আমার মানাবে ভাল।

মাধবঠাকুরের সম্মতি লাভে শ্রীধরঠাকুরের বিলম্ব হয় না। মাধবঠাকুর নূতন করে আর কী মত দেবেন। আগেই তো মালতী-মাধব পরস্পরকে হৃদয় সমর্পণ করেছে। এমন এক-একদিন হয়েছে গোসাঁই, যেদিন মাধবঠাকুর হয়তো দুপুরবেলায় দুরন্ত রোদ মাথায় করে শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছেন নয়ন-মনের তৃষ্ণা মেটাতে। মালতী ঘরের মধ্যে, মাধবঠাকুর এসেছেন জানতে পারে নি, শ্রীধরঠাকুর মালতীকে ডেকে দিয়ে বলেছেন, গো ও রাই, মাধব যে দ্বারে এসেছে। চল, তাকে ঘরে এনে বসাবে চল। মালতী এতে ফুঁসিয়ে ওঠে না, বরং মাথা নীচু করে ভারী মিষ্টি সলজ্জ হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে বলে, ঠাকুরদা, ওকে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়েই বসাও।

তাই শুনে শ্রীধরঠাকুর বলেন, তাই বুঝি? বলি ও বিনোদিনী, নদীয়ার গোরাচাঁদ কি এই রোদে তেতেপুড়ে, এই বুড়োর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, না, তার ঘরে বসতে এসেছে? ও রাই, আহা চল না, আমি না হয় আড়ালেই থাকব। আহা, রোদ্দুরে একেবারে রাঙা হয়ে এসেছে। মালতী উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি যাও ঠাকুরদা, আমি মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শ্রীধরঠাকুর মালতীর হাত ধরে বলেন, ছি দিদি, ও যে তোমার জন্যেই এসেছে, তুমিই ওকে বসতে বলবে চল।

এই পর্যন্ত বলে বলাইদাস একটুখানির জন্যে থামলেন। সেই অবসরে বললাম, বলাইদাস, এক জায়গায় একটু খটকা লাগছে। বলব? বলাইদাস বললেন, মনে যখন বিঁধেছে তখন বলেই ফেল। বললাম, আচ্ছা বলাইদাস, মালতীর যে ছেলেবেলায় বিয়ে হয়েছিল সে কথা কি মালতী একেবারে ভুলে গিয়েছিল?

বলাইদাস বললেন, ভুললেও ভুলতে পারে, তা নয়তো দুঃস্বপ্নের মত সেই শৈশবের স্মৃতি মনকে ঘিরে ছিল। হয়তো গোঙা পাগলাকে তার মনে পড়ত, মনে পড়ত সে তাকে গালমন্দ আর মারধোর করত, এর বেশী আর কী মনে পড়তে পারে বল? তবে বিধির নিবন্ধ ভুললেও কি ভোলা যায়? কপালে লেখা—মালতী-মাধব দুঃখ পাবেন; তা না হলে মাধবঠাকুরই বা কেন অমন করে লবঙ্গলতার পাগল জামাইকে অসুস্থ অবস্থায় গঙ্গাটিকরীর স্টেশনপথ থেকে শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় বয়ে আনবেন? দুপুরবেলা গঙ্গাটিকরীতে নেমে মাধবঠাকুর শ্রীধরঠাকুরের আখড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, পথে দেখেন একপাল ছেলে মিলে একটা পাগলকে ইট ছুঁড়ে, কঞ্চির ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে মারছে। পাগল শুয়েই মার খাচ্ছে। উঠে বসতে পর্যন্ত পারছে না। শরীরের দু-এক জায়গা ইট-কঞ্চির আঘাতে ছড়ে গিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

মাধবঠাকুর ছেলেদের বারণ করে পাগলটার দিকে এগিয়ে গেলেন। আহা, একটা ক্ষত দিয়ে যে বেশ রক্ত ঝরছে! মাধবঠাকুর এধার-ওধার থেকে কিছু ঘাস তুলে নিয়ে এসে হাতে রগড়ে ভাবছেন কী দিয়ে বাঁধবেন, শেষটায় নিজের গায়ের উড়ুনির একপাশটা থেকে একফালি কাপড় ছিঁড়ে পাগলের ক্ষত বেঁধে দিতে গিয়ে মাধবঠাকুর চমকে উঠলেন! পাগলের গা যে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! পাগল কাঁদছে, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। মাধবঠাকুর ভাবলেন পাগল বুঝি অতিরিক্ত নিপীড়নের জ্বালায় কাঁদছে। আহা কত অসহায়! বিধির বিধান গো গোসাঁই, একেই বলে বিধির বিধান। তা না হলে পাগলের চোখের জল মোছাতে গিয়েই যে মাধবঠাকুর সারা জীবন কেঁদে মরলেন। শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় পাগলটাকে বয়ে নিয়ে এসে মাধবঠাকুর শ্রীধর-ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুরদা, জ্বরে পথের ধারে বেঁহুশ হয়ে পড়েছিল, দুষ্টু ছেলেপুলেদের উপদ্রবে হয়তো মারাই পড়ত। তাই নিয়ে এলাম। শ্রীধরঠাকুর তাঁর দাওয়ায় তাড়াতাড়ি একটা কিছু পেতে দিয়ে বলেন, বেশ করেছ মাধব, বেশ করেছ। ওকে তুমি এখানে শুইয়ে দাও ভাই। শ্রীধরঠাকুর ওখান থেকেই লবঙ্গলতাকে ডেকে বলেন, মা লবঙ্গ, একটা কাঁথা দিয়ে যাও না মা, আহা জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে! লবঙ্গলতা ঘর থেকে কাঁথা নিয়ে আসেন। কিন্তু রোগীর গায়ে কাঁথা চাপা দিতে গিয়েই শিউরে ওঠেন—এ যে তাঁর পাগল জামাই! কাঁথাখানা পাগলের গায়ের উপর তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়েই লবঙ্গলতা ছুটে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢোকেন। তারপর তাড়াতাড়িতে

ঘরের দোর দিতে গিয়ে টলে পড়ে যান। বহুদিন বাদে লবঙ্গলতা আবার তাঁর পাগল জামাইকে দেখে মূর্ছিত হয়ে পড়েন। শ্রীধরঠাকুর হায় হায় করে ওঠেন। মাধবঠাকুর ছুটে গিয়ে লবঙ্গলতাকে তুলে ধরেন।

মালতী মার মাথা কোলে নিয়ে জল-বাতাস দিতে দিতে আকুল হয়ে ডেকে ওঠে, ঠাকুরদা—

শ্রীধরঠাকুর নিজেই দিশাহারা হয়ে পড়েন। তবু মালতীকে সান্ত্বনা দিয়ে বার বার করে বলে ওঠেন, ভয় নেই দিদি, ভয় নেই। মাধব ভাই, তুমি একটু দেখ, আমি কবিরাজ মশাইকে ডেকে আনি। কবিরাজ মশাই আসেন। একসময় লবঙ্গলতার মূর্ছা ভাঙে। মূর্ছা ভাঙতে লবঙ্গলতা কেমন যেন ফ্যাল-ফ্যাল করে মালতীর দিকে চেয়ে তাকে সজোরে বুকে টেনে নিয়ে হু-হু করে কেঁদে ওঠেন।

যাই হোক লবঙ্গলতার মূর্ছা ভাঙতে, ওষুধপত্র অনুপানের ব্যবস্থা হতে শ্রীধরঠাকুর কবিরাজ মশাইকে বলেন, কবিরাজ মশাই, আর একটি রোগীকে আপনার দেখতে হবে চলুন। সে রাত্রে লবঙ্গলতা নাকি মেয়েকে বুকে জড়িয়ে বার বার করে বলে উঠেছিলেন, চল্ মা চল্, কোথাও পালিয়ে যাই।—বুঝলে গোসাঁই, লবঙ্গলতার সব আশা ভরসা চুরমার হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন বাদে তাঁর পাগল জামাইকে পুনরায় দেখে লবঙ্গলতা একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। ভেঙে পড়বেনই বা না কেন। যার ভয়ে তিনি তাঁর কচি মেয়েকে নিয়ে দেশ ছেড়ে স্বামীর ভিটে ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন, সেই যে আবার লবঙ্গলতার ভাঙা সংসারে এসে একেবারে সব আশা সব আলোর শিখা নিবিয়ে দিল গো। এ কি কম মর্মান্তিক আঘাত গোসাঁই! সে যাই হোক, ওধারে শ্রীধরগোসাইকে শুতে পাঠিয়ে মাধবঠাকুর তখন পাগলটার শিয়রে বসে জলপটি দিচ্ছেন। যাকে একটু ঘুমতে দেখে মালতীও চুপচাপ মাধবঠাকুরের পাশে এসে বলে, তুমি একটু শোও গো, আমি দেখছি। মালতী মাধবঠাকুরের পাশে বসেই পাগলকে সেবা করতে শুরু করে। একেই বলে বিধির লিখন গো গোসাঁই, বিধির লিখন।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। বৃন্দাবনের ওপারে গোকুল আর দেখা যায় না। যমুনার জল স্বল্প জোছনায় চিক চিক করে বয়ে যাচ্ছে। বলাইদাস চুপ করে আছেন। ধীরে ধীরে বললাম, বলাইদাস, এর পর? বলাইদাস মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে এমন করে হাসলেন, মনটা কেমন করে উঠল। মাধবঠাকুরও এমনই করে সময় সময় ভারী ম্লান মধুর হাসতেন।

বলাইদাস বললেন, এর পরে আর কী গোসাঁই, সেই যে বলে না—চোখের জলের বৃত্তান্ত, এও তাই। মালতী-মাধবের দুঃখে যমুনা যে অথৈ হয়ে উঠল। দুই পারে দুইজন, তাদের চোখের জল যমুনাকে আরও গহীন করে তুলল গোসাঁই। এ যমুনা এ দিনের মত সেদিনও হাঁটু-জল ছিল গো, কিন্তু সেবারে বৃন্দাবনীর নয়নজলেও এই যমুনা এমনই অথৈ হয়ে উঠেছিল। মালতী জান[illegible] মাধব জানলেন, শ্রীধরঠাকুর জানলেন, আখড়ার আরও পাঁচজনে জানল, পাগলটাই মালতীর স্বামী। এমন দিন গেছে গোসাঁই, যেদিন হয়তো পাগলটাকে খেতে দিয়ে মালতী দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দুপুর রোদে মাধবঠাকুর শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছেন। দাওয়া[illegible] পৈঠা ধরে মালতী নির্বাক হয়ে চেয়ে দেখে মাধবঠাকুরকে, কত ক্লান্ত কত শ্রান্ত মলিনবদন মাধবঠাকুর! মালতী মাধবের সামনে এসে দাঁড়ায়, কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে দিয়ে বলে, এস। পাগল ঘাড় বেঁকিয়ে ভাত খেতে খেতে মাধবঠাকুরকে চেয়ে দেখে। পাগল কোন-কোনদিন এঁটো হাতেই ছুটে আসে। মাধবঠাকুরের [illegible] ধরে টানতে টানতে বলে, এস এস। ভাত যে ফুরিয়ে যাবে। আবার কোন-কোনদিন এঁটো হাতেই মাধবঠাকুরের গালে চড় কশিয়ে দিয়ে বলে, যা যা, বেরো বেরো। নীরবে মালতীর দু চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। মাধবকে স্নান করতে পাঠিয়ে মালতী আবার মাধবঠাকুরের জন্যে রাঁধতে বসে। আহা!—বলাইদাসের গলা ধরে আসে।

ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম, বলাইদাস, লবঙ্গলতা আর শ্রীধরঠাকুরের কী হল? তাঁরা কি আখড়ায় থাকতেন না?—বলাইদাস অন্ধকার ওপারের দিকে তাকিয়ে বললেন, লবঙ্গলতা আর সহ্য করতে পারেন নি। চোখের আড়ালে চলে যেতে চেয়েছিলেন। শ্রীধরঠাকুর লবঙ্গলতাকে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। মালতী একাই আখড়ায় রয়ে

গেল। আশ্চর্য মালতীর মন গোসাঁই। কবে সেই ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল একটা গোঙা ছেলের সঙ্গে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার আবার মাথায় দোষ দেখা দিতে মারধোর করত, তার ওপরেই এসে পড়ল অসীম মমতা স্নেহ দয়ামায়া কর্তব্য। তাই তো মালতী লবঙ্গলতা আর শ্রীধরঠাকুরের সঙ্গে কোথাও যেতে পারল না। জানলে গোসাঁই, মালতী সারা জীবনই শুধু দু চোখে কেঁদেছে— এক চোথ দিয়ে মাধবঠাকুরের জন্যে, অন্য চোখ দিয়ে নিজের ভাগ্য—ওই পাগল স্বামীটার জন্যে। আখড়া ছেড়ে যাবার আগে শ্রীধরঠাকুর মাধবঠাকুরের হাত ধরে বার বার করে বলেছিলেন, মাধব ভাই, তোমাকে আর কী বলব, শুধু খা, রাই আমার যেন একেবারে ভেসে না যায়। ...ঙ্গর যা মনের আর শরীরের অবস্থা, কিছুদিন না হয় ...থাও ঘুরেই আসি। মাস ছয়েক পরে শ্রীধরঠাকুর ... গঙ্গাটিকরীতে ফিরে এসেছিলেন। লবঙ্গলতা ...র ফিরে আসেন নি। বৃন্দাবনেই তিনি দেহ ...খছিলেন। শ্রীধরঠাকুর গঙ্গাটিকরীতে ফিরে এসে কিন্তু ...টেই শান্তি পান নি। তাঁর কত সাধের রাই, মালতী-...ধবের দুর্দশা দেখে তিনিই যে সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেতেন। মাধবঠাকুরকে তিনিই একরকম জোর করে ধরে রেখেছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, চোখের সামনে থাকলে যদি তাঁর রাইয়ের একটু দুঃখ ...। কিন্তু গোসাঁই, দুঃখই যাদের পেতে হবে, তাদের ...ক আর চাইলেই ঘোচানো যায়? বাঁশি যে শুনেছে সেই মরেছে। যমুনাপুলিনে যে যেতেই হবে, তা যত ছ্যাচকা-পোড়াই তার পিঠে জলুক না কেন। সাধে কি পাগল বাউলরা গায়—

> "দুঃখ দুঃখে জলুক রে আগুন,
> পরান ফাইট্যা আঁধার কাইট্যা
> বাইরো করে আগুন"

শাশুড়ী ননদ কুল সমাজ—কত বাধা-বন্ধন অন্ধকার পথ, শত ঝঞ্ঝার রাত, দুস্তর পারাবার, সেই তিমির-পাথার পেরিয়ে অভিসারে যেতে হবে। মাধবঠাকুর বলতেন, জগতের সবকিছুই প্রকৃতিস্বভাবা। নর ও নারী, ও জান তো শুধু বাইরেটা; আত্মা—স্ত্রী না পুরুষ? আসলে কি ভাই, নর ও নারী দ্বৈত লালায় দুই এক হয়ে ব্যাকুল বেগে ছোটে সেই এক পরম প্রীতমের উদ্দেশে। নর-নারীর প্রেমের লীলায় মুগ্ধ তিনি যে ফস্তু হয়ে অন্তরের আড়ালে ডাকছেন, এস, এস বঁধু। তাই তো বলি গোসাঁই, চোখের দেখাই বা কী আর অ-দেখাই বা কী, দুই মন যে এক হয়ে দুপার থেকে সাঁকো তৈরি করছে, সীমা পারাপার হতেই হবে। সে যাই হোক, এদিকে মালতী-মাধবের কাছে যে নিকটের দূর বড় কঠিন দূর হয়ে উঠল গোসাঁই। পাগলটা খায় দায়, ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বেশ আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন মারমূর্তি ধরে যে বলা যায় না। আখড়ার সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দেয়। বাধা দিতে গেলে যাকে সামনে পায় তাকেই বেদম প্রহার করে। মালতী রক্তগঙ্গা হয়েও পাগলকে বাধা দেয়, সকল কিছুর আড়ালে রেখে তাকে শান্ত করে। দূর থেকে শ্রীধরঠাকুর আর মাধবঠাকুর তাই দেখে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে যান। এর উপরে ওই যে বলে না গো জটিলা কুটিলার লাঞ্ছনা—মালতীর বরাতে তাও বড় কম জোটে না। মাধবকে নিয়ে মালতীর সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা বলে, আখড়াতেও ফুসফুসানি কম নয়, মালতী বড় জালায় মাধবের সামনে এসে জোড় হাত করে বলে, আর সহ্য হয় না। তুমি অন্য কোথাও চলে যেতে পার না? মাধব ম্লানমুখে বলেন, তুমি যদি এতে শান্তি পাও তাই যাব মালতী।

শ্রীধরঠাকুর তাই শুনে বলেন, রাই, ও চলে গেলেই কি তুমি শান্তি পাবে ভাই?—কিন্তু গোসাঁই, মালতীই যে আবার মাধবঠাকুরের পথরোধ করে দাঁড়ায়। কাঁধের ঝোলা হাতে নিয়ে মাধবঠাকুরের মুখের দিকে চেয়ে মালতী কী যেন বলতে চায়, বলা হয় না। ঠোঁট দুটি শুধু থরথর করে কেঁপে ওঠে। মাধবের আর যাওয়া হয় না। শ্রীধরঠাকুর মাধবঠাকুরের হাত ধরে বলেন, তুমি চলে গেলে যে রাই আমার আর বাঁচবে না মাধব। এক-একদিন আবার শ্রীধরঠাকুর মাধবঠাকুরকে ব্যাকুলভাবে বলে ওঠেন, মাধব ভাই, পার না, পার না ভাই ওকে কোথাও নিয়ে যেতে—এখান থেকে অনেক দূরে, অন্যখানে? না যেতে চায় জোর করে নিয়ে যাও না ভাই, পারবে না? কিন্তু গোসাঁই, দুঃখের রথে যাদের আসন পাতা তাদের তো ইহলৌকিক সুখভোগের কলুষ স্পর্শ করতে পারে

না। অন্তর যে জরজর, তনুর খেদ মনেই পড়ে না। সব কথা তোমায় গুছিয়ে বলতে পারব না গোসাঁই। মাধবঠাকুর মালতীতলায় বসে বলতেন, পাগল ভাই, বাইরেটাই শুধু দেখছ? ভিতরটা দেখতে পাও না? মালতীকে পাই নি, কিন্তু এ কথাটা কি ঠিক পাগল ভাই? তুমিই বল না। এই যে প্রতিদিন মালতীতলায় এসে বসি, প্রদীপ জ্বালি, মালতীই যে সব সময় আমায় ঘিরে রয়েছে। এক-একদিন এইখানেই ঘুমিয়ে পড়ি। সত্যি বলছি পাগল ভাই, মালতীই আমায় ডেকে দিয়ে বলে, ঘরে যাও, ঠাণ্ডা লাগবে। চেয়ে দেখি, আকাশ নীল, তারাগুলো জ্বলছে, বাতাস হিম হিম, মালতী-মাধব শাখায় ফুল ফুটেছে, ঘাসের ডগায় শিশির, হাওয়ায় মালতীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ভেসে আসে। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, মালতীর ডাকে ঘরে শুতে যাই।

বলাইদাস বললেন, এই মালতীতলার প্রসঙ্গটা বলেই মালতী-মাধবের কথা শেষ করি গোসাঁই। রাত তো অনেক হল। তুচ্ছ দুটো চারাগাছ পোঁতা নিয়েই মালতী-মাধবের ভুল-বোঝাবুঝি চরমে উঠল। দুঃখের সীমা সীমাহারা হল। ঝুলন-পূর্ণিমার দিন সেবারে শ্রীধরঠাকুরের আখড়ায় একটু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। শ্রীধরঠাকুরের মনে আনন্দ নেই। তার বড় আদরের রাইয়ের মনে যে সুখ নেই। তবু শ্রীগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা। বৈষ্ণব হয়ে এ উৎসব উদ্‌যাপন না করলে যে অপরাধ হবে। আর তা ছাড়া আখড়ার আরও পাঁচজন রয়েছে। তাদের ইচ্ছেয় তো আর শ্রীধরঠাকুর বাধা দিতে পারেন না। সে যাই হোক, ঝুলন-পূর্ণিমার দিন সকাল থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। দুপুরবেলা কোথা থেকে যেন দুটো মালতী-মাধবের চারা এনে মাধবঠাকুর আখড়ার বাগানে বসে পুঁতছেন।

শ্রীধরঠাকুর তাই দেখে বলেন, কী পুঁতছ মাধব ভাই?

মাধবঠাকুর বললেন, মালতী-মাধবের চারা ঠাকুরদা।

শ্রীধরঠাকুর তাই শুনে কেন জানি না বড় আহ্লাদের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, আহা, তাই দাও ভাই, তাই দাও। মালতীকে মাধবের অঙ্গে বেশ করে জড়িয়ে দাও। এর পর শ্রীধরঠাকুর মালতীর উদ্দেশে ডাক পেড়ে বলেছিলেন, ওগো ও রাই, দেখে যাও গো, একবারটি দেখে যাও। শ্রীধরঠাকুরের ডাকে মালতী ঘর থে বেরিয়ে দাওয়ার পৈঠা ধরে দাঁড়ায়। শ্রীধরঠাকুর বলে এস রাই, দেখে যাও মাধব ভাইয়ের কেমন কেরামতি মালতী ওখান থেকেই দেখে মাধবঠাকুর কিসের যেন চা পুঁতছেন।

শ্রীধরঠাকুর সর্বনাশ ডেকে আনলেন। উচ্চস্ব মালতীকে শুনিয়ে তিনি বলে উঠলেন, দাও ভাই, আচ্ছ করে জড়িয়ে দাও। আহা মালতী-মাধব দুই অ জড়াজড়ি। শ্রীধরঠাকুরের কথা শুনে মালতী পাথরের ম নিস্পন্দ হয়ে যায়। আখড়ার পাঁচজনে চোখ ঠারাঠা করে, হাসাহাসি করে। ছি ছি, কী লজ্জার কথা। মালত দ্রুতপদে মাধবঠাকুরের কাছে এসে চাপাকণ্ঠে ধিক্কার দি বলে, ছি ছি, তোমার মনেও এত পাপ! কথা করে পরক্ষণেই মালতী চারা দুটিকে উপড়ে ফেলে দু ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দেয়। মাধবঠাকুরের একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেছে। শ্রীধরঠাকুর চরম অপ্রস্তু

শেষ রাগিণীতে বাঁশী তান ধরল গো গোসাঁই। অ সেই সর্বনেশে বাঁশীর তানেই এক নিমিষে সব ওলট-পা হয়ে গেল। দুকূল ভেসে গেল বন্যায়। উথলে উঠ যমুনার জল। কূলে কূলে গেয়ে চলল—"সখি হে হম দুখক নাহি ওর। ঈ ভরা বাদর মাহ ভাদর—শূন্য মন্দি মোর।"

কিন্তু গোসাঁই, এই মালতীই আবার উপড়ে-ফেলে চারা দুটি নিজের হাতে পুঁতে দিয়েছিল। মাধ আসবেন। দেখবেন মালতী কেমন করে তার ভুলে প্রায়শ্চিত্ত করেছে। কিন্তু মাধবঠাকুর তখন কোথায় তিনি যে গঙ্গাটিকরী ছেড়ে রাঙামাটির পথ ধরে এগি চলেছেন নিরুদ্দেশের পথে। ঠিকঠিকানা নেই। মাধ ঠাকুরের মনে বড় বেদনা—মালতী শেষটা তাকে এমন ক ভুল বুঝল।

আবার এও আমি বলি গোসাঁই, এ তুচ্ছ কারণ অত তুচ্ছ নয়, এ যে আসলে সেই যমুনার তান। ঘ ছেড়ে যে যেতেই হবে। আগল যে ভাঙতেই হবে ব্যথার প্রদীপ জ্বলে উঠবে। তারপরে দুই রশ্মি ক যে এক হয়ে ছুটে চলবে—অসীম শূন্যে সেই এক পর প্রীতমের সন্ধানে। পাবে, তাকে সে খুঁজে পাবেই পাবে

তারপর ঘুরে চলবে অনন্তকাল ধরে রাধাশ্যাম চক্রে—যেমন ঘোরে গ্রহ-নক্ষত্র নীহারিকা সূর্যকে ঘিরে ঠিক তেমনিই।

অনেককাল পরে মাধবঠাকুর কত দেশ-বিদেশ ঘুরে, বড় জ্বালায় দূর থেকে একবার মালতীকে দেখে যাবার আশায় গঙ্গাটিকরীতে ফিরে এসেছিলেন।

আখড়া তখন ভেঙে পড়েছে। শ্রীধরঠাকুর কিন্তু তখনও বেঁচে ছিলেন। শ্রীধরঠাকুর মাধরঠাকুরকে বললেন, মাধব ভাই, এত বড় ভুল তুমি করলে কী করে। রাই যে আমার শেষ নিঃশ্বাসটি ফেলবার আগে পর্যন্ত তোমায় খুঁজেছে। মালতীর সমাধি ঠিক মালতী-মাধবতলায়। শ্রীধরঠাকুর মাধবঠাকুরের হাত ধরে ওখানটায় নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, মাধব ভাই, রাই যে আমার এখানটায় ঘুমিয়ে আছে।

মালতী-মাধব গাছটায় অজস্র ফুল ফুটেছে। শ্রীধর-ঠাকুর মাধবঠাকুরকে বললেন, মাধব ভাই, রাই আবার নিজের হাতেই উপড়ে-ফেলা চারা দুটি পুঁতে দিয়ে তোমার আশায় শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল। মরবার আগে রাই আমায় বলে গেল, ঠাকুরদা, ও যদি আসে এখানটায় প্রদীপ জ্বেলে দিতে বোল। আমি ওর হাতের আলো পাবার জন্যে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করে থাকব। মাধব ভাই দাও—দাও না ভাই একটা প্রদীপ জ্বেলে। মালতী যে বড় আশায় অপেক্ষা করে আছে।

মাধবঠাকুরকে একবার বলেছিলাম, মাধবঠাকুর, চল না গো, দুজনে কোথাও বেরিয়ে পড়ি। এর উত্তরে মাধবঠাকুর বলেছিলেন, পাগল ভাই, এখানটায় সন্ধ্যা-প্রদীপ না পড়লে যে আমার সব পথ আঁধারে ঢেকে যাবে ভাই। এখানে যখন প্রদীপ জ্বেলে বসে থাকি তখন ওরই শিখা যে আমার নয়নশিখা হয়ে আমায় তিমিরনাথের পথ দেখায়—আমি ঘুরে ফিরি দূর দূর গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকায়। আর কোথায় যাব বল।

এপারে বৃন্দাবন ওপারে গোকুল। মাঝখানে কালো যমুনা। মাধবঠাকুর ওপারের দিকে চেয়ে বসে আছেন। নিবিড় নীরবতায় যমুনার জল ছলছল সুরে কোন্ কান্নার সমুদ্রকে আলিঙ্গন করতে ধীরে বয়ে চলেছে। মাধবঠাকুর বলতেন, ও যে বড় চোখের জলের কাঙাল বাবাজী, দিতেই হবে এ জন্মে না হয় অন্য কোন জন্মে, ওকে দিতেই হবে অশ্রু-উপহার।

বলাইদাস তন্ময়তা ভেঙে শুরু করলেন, জান গোসাঁই, মালতী-মাধব সেই দলের মানুষ—যারা চিরকাল পেয়েও হারায়। হারিয়ে বড় বেদনায় বুকের বাঁধন-ছেঁড়া তারে তাকে আবার অরূপ করে ফিরে পায়। তুমি যদি ... বাধাটা কোথায়, মালতীর স্বামী যে বেঁচে রয়েছে। মিথ্যে গোসাঁই, সব মিথ্যে। আসলে এপারে বৃন্দাবন ওপ... গোকুল, যমুনাতীরের বাঁশী যে শুনেছে সেই ম... মালতী-মাধবের মাঝে পাগলের বাধাটা বাধা নয় গো... ও যে মুক্তি। ওই পাগলই যে সময়মত আপন ... মালতী-মাধবের গোড়ায় জল ঢেলেছে। পাছে ... মুড়িয়ে দেয় তাই বেড়া বেঁধে দিয়েছে। জ্বালিয়ে পুড়ি... থাক করে দেয়, তবু ওই-ই যে দূরকে আপন করে।

মাধবঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিসের জোরে নিজেকে এমন করে তিল তিল করে নিঃশেষ করলে ঠাকুর।

মাধবঠাকুর ভারী মুমূর্ষু মিষ্টি হাসি হেসে বলেছিলে... বাউল ভাই, তোমার মুখে এ কেমনধারা কথা। ... না গাও—

ধন্য আমি শূন্য কুম্ভ পূর্ণ কুম্ভ নই
তাই তো তোমার জলের খেলায়
বুকের তলে রই গো সখি বুকের তলে রই।

আঁধার যমুনা প্রবাহিত হয়ে চলেছে—বাতাস শনশন করে বইছে। আকাশে অগণ্য নক্ষত্ররাজি। নীচে অন্ধকার।

বলাইদাস বললেন, চল গোসাঁই। রাত অনেক হল।

নতুন যুগ ও নতুন চরিত্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

সামাজিক রূপান্তর নিয়ে আসে মানুষের চরিত্র-কাঠামোয় রূপান্তর। মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও সমাজের বিবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এলে মানবিক সম্পর্কগুলিতে পর্যন্ত পরিবর্তন আসে। তখন এই বহু-ব্যাপ্ত পরিবর্তনের ধাকায় ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। তখন সংকটোত্তীর্ণ হবার জন্য কঠিন প্রয়াসের প্রয়োজন হয়। রূপান্তরিত সমাজে নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নবার জন্য নতুন চরিত্র-কাঠামোই গড়ে তুলতে হয়, তা তে না পারা পর্যন্ত ব্যক্তির লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের সীমা থাকে না, ব্যক্তি তখন সমাজের সঙ্গে গভীর অনাত্মীয়তা অনুভব করে এবং তার পক্ষে সে অবস্থা অত্যন্ত যন্ত্রণাকর। তার জীবন তখন ব্যর্থতায় ভেঙে পড়তে চায় এবং এই অসহনীয় দুর্দশার চাপে ব্যক্তিকে নতুন চরিত্র-কাঠামো গড়ে নিতে হয়। এইভাবে যখন নবযুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সংকট-উত্তরণ করে যায় মানুষ, তখন তার কাছে নতুন আশার দিগন্ত খুলে যায়, উৎসাহ-উদ্যম অবারিত হতে পারে, এবং জীবন অর্থময় ও ব্যঞ্জনাময় বোধ হতে থাকে। নবযুগে এই নতুন বর্ণদ্যুতিময় জীবনলাভের শর্ত আছে একটি: আপন চরিত্র-কাঠামোর রূপান্তর সাধন করে নিতে হবে সর্বাগ্রে এবং তার জন্য দেয় মূল্য দিতে হবে।

উনিশ শতকে বাংলায় যে নবযুগ প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার অলক্ষ্য পদসঞ্চার কিন্তু আরও আগেই দেখা দিয়েছিল। বাঙালীর সমাজে মূল্যবোধ, বিশ্বাস, নানা অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ও মানবিক সম্পর্ক স্থিরস্থিত ছিল না। নতুন অবস্থা দেখা দিয়েছিল। এই নতুন অবস্থা বাঙালী সমাজে নতুন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। উনিশ শতকে ব্যাপক ভাবে সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করা হয়েছিল। যাঁরা তা করেছিলেন তাঁরা তাঁদের চরিত্র-কাঠামোয় রূপান্তর আনার প্রয়াস পেয়েছিলেন। ক্রমে সেই প্রয়াস ব্যাপকতর হয়ে উঠে বাঙালী সমাজের প্রাগ্রসর অংশে নতুন চরিত্র-কাঠামো সৃষ্টি করেছিল। তার ফলে যে সমাজ সংকটে সংকটে ভরে উঠেছিল, যে সমাজ মানুষের জীবনে তৃপ্তি দিতে পারছিল না সেই সমাজে নতুন শক্তির উদ্ভব হতে পারল, নতুন প্রত্যয় স্থায়ী হল এবং প্রকৃতই এক নবজাগরণ দেখা দিল।

নবজাগরণে যাঁরা নেতৃত্ব করেছিলেন তাঁদের নতুন চরিত্র-কাঠামো গড়ে তুলতে হয়েছিল, এবং যেহেতু জিনিসটি ছিল নতুন সেহেতু সমাজের পুরনো অভ্যাস ও সংস্কার তাঁদের প্রচণ্ড বাধা দিয়েছিল। অগ্রণীদের প্রত্যেককে সেদিন সংগ্রামের মুখোমুখী হতে হয়েছে, পরিবার আত্মীয়স্বজন সমাজ প্রভৃতির বিরোধ অতিক্রম করতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সংগ্রাম কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনেরই ব্যাপার নয়। নতুন যুগের উপযোগী হয়ে যাদেরই গড়ে উঠতে হয়েছে, তারা সাধারণ বা অসাধারণ যাই হোক তাদের কারও জীবনই মসৃণ হয় নি প্রথম পর্বে। নবজাগরণের প্রথম পর্বে, নবোদ্ভূত চরিত্র-কাঠামো যখন প্রাধান্য লাভ করে নি, তখন কম-বেশী সকলকেই শিবনাথ শাস্ত্রীর মত মূল্য দিতে হয়েছে।

॥ ২ ॥

নবজাগরণের যুগে যে নতুন চরিত্র-কাঠামোর আবির্ভাব ঘটল তার বৈশিষ্ট্য কী?

প্রধান বৈশিষ্ট্য নির্দেশের উৎসে। আগেকার সমাজের মানুষ ছিল ঐতিহ্য-চালিত। তার সকল ক্রিয়া-কর্ম, চিন্তা-ভাবনা, সামাজিক আচরণ অভ্যস্ত ধারায় পূর্বাগত সংস্কারের বাঁধা পথে চলত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ছিল জীবনের বাঁধা ছক, ছিল অপরিবর্তনীয় শাস্ত্র, যার নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হত। পিতার বৃত্তিই শুধু পুত্রে বর্তাত না, পিতার জীবনের একটি নকল মাত্র হত পুত্রের জীবন। কেন না ঐতিহ্যের দ্বারা যা সমর্থিত নয় তা করার উপায় ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

নবযুগে অবস্থাটা পালটে গেল। নতুন পরিবেশে

জীবনাচরণের পুরনো রীতি বাতিল হয়ে গেল; তখন ঐতিহ্য-চালিত মানুষ নতুন সমাজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে অতিশয় পীড়িত বোধ করতে লাগল। কেন না ঐতিহ্যের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে, ঐতিহ্যের সমর্থন পেয়ে খুব বেশী লাভ তখন হত না। জীবনের সকল আচরণের জন্য নির্দেশের প্রত্যাশা করতে হবে তখন অন্যত্র; ব্যক্তির নিজের অন্তরই সেই উৎস, সেখান থেকে সকল নির্দেশ আসবে। নতুন মূল্যবোধ ও বিশ্বাস এনে দিয়েছে জীবনের নতুন লক্ষ্য। সমাজের শক্তিসমূহ গড়ে তুলছে নতুন প্রতিষ্ঠান, কাজেই জীবনযাত্রার কলাকৌশলই হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ নতুন। এই কলাকৌশল আয়ত্ত করে স্ব-স্বার্থের অনুকূলে প্রয়োগ করতে হলে নতুন বিদ্যা, নতুন জীবন-চালনার নীতি গ্রহণ করা দরকার। এতাবৎকাল-প্রচলিত শিক্ষা সেদিক থেকে সহায়ক হতে পারে না। সেজন্য ব্যক্তিকে আত্মশিক্ষা, আত্মশক্তি, আত্মনির্দেশের উপর নির্ভর করতে হবে। অর্থাৎ তাদের হতে হবে অন্তর-চালিত। স্বভাবতঃই অনেকেই তা পেরে ওঠে না, এবং যারা সচেতন যে পেরে উঠছে না তাদের অক্ষমতাবোধ তাদের অন্তর-জীবনে এমন হতাশা ও পীড়নের সৃষ্টি করে যে তা তাদের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগের পরেও শিক্ষিত সচেতন মানুষ এই মর্মপীড়া ভোগ করেছে, আত্মহত্যা পর্যন্ত করেছে। এমন কি এই যন্ত্রণা সাহিত্যের বিষয় পর্যন্ত হয়ে উঠেছে। কবি হেমচন্দ্র ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে 'চিন্তাতরঙ্গিনী' নামে একখানি কাব্য প্রকাশ করেন। সেই কাব্যের প্রেরণা ছিল এই ঘটনা: 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অল্পকাল পরেই···ধর্মহীন, লক্ষ্যহীন শিক্ষায় শিক্ষিতের হৃদয়ে ঘোরতর অশান্তি আনিল। একই বৎসরের মধ্যে দুইজন সুশিক্ষিত যুবক এই অশান্তির আবেগে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন।' কথাটা ঠিক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত যুবক নবযুগের নতুন পরিবেশ সম্পর্কে, জীবনের নতুন লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন, কিন্তু তদুপযোগী চরিত্র-কাঠামো গড়ে তুলতে পারেন নি, কাজেই ব্যর্থতাবোধ তাঁদের মধ্যেই জেগেছিল সবচেয়ে বেশী।

॥ ৩ ॥

অন্তর-চালিত চরিত্রের অধিকারীরা সংবাদপত্র ও পুস্তকের জন্য তৃষ্ণা অনুভব করে। একদিকে তাদের জীবনের কেন্দ্রস্থলে তারা বসিয়ে রাখে এক তাড়কযন্ত্র—যা অবিরত তাদের সাফল্যলাভের দিকে তাড়না করে বেড়ায়। বস্তুতঃ তাদের কাছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনে সাফল্য অর্জন করা—যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি, বস্তুজগতের উপর অধিকার, এই অর্থে সাফল্য। এবং তা করতে হলে যে কোন অবস্থা—তা যতই আপাতপ্রতিকূল হোক না কেন—তাকে অনুকূল করে তুলতেই হবে। আত্মনির্ভর, অন্তরের নির্দেশে চালিত মানুষই তা পারে। এই নবযুগের নতুন চরিত্রের অধিকারী মানুষের কা 'অসম্ভব' বলে কোন কিছু থাকবে না—কেন না তা জীবনে বিফলতার চেয়ে বড় লজ্জার কিছু নেই।

এই মনোভাব বজায় রাখতে সবচেয়ে সাহায্য ক মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকা। মুদ্রণের দৌলতে লেখাপড় শিখলেই সমকালীন ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় রাখা সম্ভ হয়, দূর-দূরান্তে বসেও সমকালীন জীবনবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পাওয়া যায়। পুরনো এবং নবগঠিত চরিত্রের প্রাধান্যলাভের সংগ্রামে (charactero-logical struggle) নতুন চরিত্রের অধিকারী স্বভাবতঃই তার পারিপার্শ্ব থেকে সাহায্য পায় কম, বই ও সংবাদপত্রে মাধ্যমে নতুন উৎসাহ, নতুন চিন্তা, নতুন আশা সে করে। প্রয়োজন হলে নিজেও সে লিখতে পারে এবং সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠায় স্থান পাওয়া খুব কষ্টকরও নয়। অন্তর-চালিত চরিত্রের মানুষ সাধারণতঃ গোপন দিনলিপি রাখতে ভালবাসে—প্রতিদিন নিজের কাজ সাফল্যলাভের দিকে কতটুকু এগিয়ে নিয়ে গেল নিজেকে প্রতিদিন সে বিচার করা, সে হিসাব রাখা প্রয়োজন বলে মনে করে এ চরিত্রের মানুষ। সমাজের হিতাহিত বিষয়েও তাই তারা চিন্তিত হয়—নবযুগের শক্তিসমূহ কতটুকু বিকশিত হয়েছে সমাজে তা তারা দেখতে চায় এবং বিকাশের পথে সাহায্যও করতে চায়। কাজেই পুরনো যুগের সমর্থকদের কাছ থেকে বাধাও পেতে হয়। যে প্রতিদিন ডায়েরী লেখে তাকে প্রতিদিন অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়, তার জীবনের সংকল্প প্রতিদিন

আবার নতুন করে নিতে হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাজের মধ্যেও ব্যাপ্ত করে দেখে সে, কেন না নিজেকে বিস্তৃত করে ধরে সে সমাজের মধ্যে। তাই সামাজিক ভালমন্দের প্রশ্ন নিয়ে অতি-উত্তেজিতের মত তীক্ষ্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় সে—এবং নিজ নিজ মতের পক্ষে জনগণকেও টেনে আনার চেষ্টা পর্যন্ত করে। এর ফলে যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তা লেখক এবং পাঠকের মধ্যে একাত্মতার একটা অনুভূতি নিয়ে আসে, এবং ফলে মুদ্রিত পুস্তক বা পত্র-পত্রিকার একটা বাজার সহজেই গড়ে ওঠে। বাংলা দেশে 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং 'সমাচার চন্দ্রিকা' থেকে এই নতুন আলোচনার একটা ধারা শুরু হয়ে যায়, দিনে দিনে এই ধারা ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করে।

"In this way the press helped link the newly indivi- uated person to the newly forming society....science was viewed as a kind of inner-directed morality as against the superstition of the remaining, tradition-directed peasantry. These attitudes, expounded in newspaper nonfiction, were reinforced in newspaper and periodical 'edifying' fiction.

In these ways the local reader could escape into print from the criticisms of his neighbours and could test his inner-direction against the models given in the press. And by writing for the press himself, as he occasionally might do as local correspondent, he could bring his performance up for approval before an audience which believed in the magic attached to print itself—much like the Americans who, in the last century, contributed local poetry to their local press. By this public perfomance, eager for a face-to-face audience, he confirmed himself in his inner-directed course."*

॥ ৪ ॥

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ বাঙালী চিন্তানায়কদের সমর্থন পায় নি। হরিশ মুখোপাধ্যায়ের মত আর সকলেই সিপাহীদের অভিযোগ এবং উৎপীড়িতদের মর্মবেদনা অনুধাবন করেছিলেন, ইংরেজদের অন্যায় ব্যবহারের সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তবু ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহের সাফল্য তাঁরা কামনা করেন নি। এ কারণে তাঁদের উপর বর্তমান কালের অনেক বিচারকই সন্তুষ্ট হতে পারছেন না।

সমাজবিজ্ঞানীর মূল্যায়ন কিন্তু অন্যরূপ। তাঁদের মতে বাংলা দেশে ইংরেজ রাজত্বের আশ্রয়ে এক নতুন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। এই নতুন শ্রেণীই উনিশ শতকে বাঙালী সমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেছিল। ইংরেজকে তারা তাদের উন্নতির হেতু বলে মনে করত এবং তাদের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি ইংরেজ শাসনের বদলে সামন্ত শাসন এলে ব্যাহত হবে বলে বিশ্বাস করত। তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল আন্দোলন চালনা করেছে—যেমন নীলবিদ্রোহের বেলা। সমাজের প্রগতিশীল শক্তিগুলির বিকাশ তারা কামনা করেছে এবং ক্রমে ক্রমে এই সব প্রগতিশীল শক্তির সাহায্যে দেশের স্বাধীনতা আসুক এ আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করতে শুরু করে। স্বভাবতঃই প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সঙ্গে নিজেদেরও একত্রিত করে দেখত তারা। এবং দেশের শাসন-ব্যবস্থায় নিজেদের স্থান ক্রমশঃ বিস্তৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাকে তারা প্রগতিশীল আন্দোলন বলে মনে করত। অর্থাৎ, দেশের উজ্জ্বলতর ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের শ্রেণীর উজ্জ্বলতর ভাগ্যকে মিলিয়ে দেখতে শিখেছিল এই নতুন বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, নতুন শ্রেণীচেতনার বিকাশ ঘটছিল এই শতকে। তবে নতুন শ্রেণী সুনির্দিষ্টভাবে গড়ে উঠেছিল কিনা সন্দেহ আছে। শ্রেণী না গড়লেও শ্রেণীচেতনা গড়তে পারে, কেন না শ্রেণীচেতনা শ্রেণীর আগেই গড়ে ওঠে। নবযুগের নতুন মানুষের চরিত্র-কাঠামো এই নতুন চেতনাকেও অঙ্গীকার করেছিল। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ-প্রসঙ্গে সে জিনিসটি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। অন্তর-চালিত মানুষের সবচেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা জীবনে বাস্তব সাফল্য লাভ করা। এবং সেজন্যই তারা ঐতিহ্য-প্রদর্শিত ও সমর্থিত পথ ছেড়ে অন্তরের নির্দেশ অনুযায়ী চলে। নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী জগতে নিজের স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে চায় বলে এই নতুন চরিত্রের মানুষ জগতে আত্মীয়পক্ষের অন্বেষণ করে। এই আত্মীয়পক্ষ কোন অঞ্চলের সীমারেখা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী বাঙালীশ্রেণী ইংলণ্ডের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সঙ্গে যে আত্মীয়তা অনুভব করত, ভারতের সিপাহী ও সামন্তশ্রেণীর সঙ্গে সে

* David Riesman : The Lonely Crowd. p. 90.

আত্মীয়তা অনুভব করে নি। নবযুগের মানুষের চরিত্র-কাঠামোয় শ্রেণীচেতনার উপাদান একটি বড় এবং অভিনব উপাদান। সুনির্দিষ্ট শ্রেণী উনিশ শতকে গড়ে ওঠে নি কিন্তু চেতনা গড়ে উঠেছে। তার কারণ, এই নতুন চরিত্র-কাঠামো নতুন প্রকৃতির শ্রেণীচেতনার পোষকতা করে এবং এই চেতনা তার একটি মূল ভিত্তি। নবযুগের নতুন মানুষের মনস্তত্ত্বের একটি প্রধান উপাদানই হল তার শ্রেণীচেতনা। উনিশ শতকে বাঙালী বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তরা একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী গঠন করতে পারে নি—তৎসত্ত্বেও কী করে তাদের মনস্তত্ত্ব শ্রেণীচেতনার দ্বারা এতদূর প্রভাবিত হল যে তাদের চরিত্র-কাঠামোয় পর্যন্ত সে চেতনার অঙ্গীকার আছে এ প্রশ্ন কেউ করতে পারেন। শ্রেণী কী?

"Social classes in their essential nature can be characterized as psychologically or subjectively based groupings defined by the allegiance of their members."*

কাজেই groupings হবার পূর্বে মনস্তত্ত্বে বা আন্তর জীবনে একটা সুস্পষ্ট কিছু গড়ে ওঠা দরকার এবং তখনই allegiance-এর প্রশ্ন আসতে পারে। কী করে মনস্ত তেমন তেমন পরিবর্তন আসতে পারে, তেমন ভাঙাগ হতে পারে?

"A person's status and role with respect to t economic process of society imposes upon him certa attitudes, values and interests relating to his role a status in the political and economic sphere."†

এই attitudes, values এবং interests-এর বিষ যাদের মধ্যে মিল আছে তাদের মধ্যে একটি শ্রেণীচেত গড়ে ওঠে। তারপর সেই চেতনাই ধীরে ধীরে সুনির্দি রূপে একটি শ্রেণীও গড়ে তোলে।

উনিশ শতকে নতুন বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তদের মধ্যে এক শ্রেণীচেতনার বিকাশ হয়েছিল। এবং তাদের এ চেতনার দ্বারা পরিচালিত হওয়াও তাদের চরি কাঠামোরই একটি বৈশিষ্ট্য। অন্তর-চালিত চারিত্রে অধিকারী মানুষ শ্রেণীচেতনার দ্বারা পরিচালিত না হ পারে না (শ্রেণীস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হওয়া থে জিনিসটি পৃথক)। এই কারণেই ১৮৫৭ সনের বিদ্রো উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবী বাঙালী মধ্যবিত্তদের সমর্থন লা করতে পারে নি।

* Richard Centres: The Psychology of Social Classes, p. 210.

† Ibid, p. 29.

কবির জন্ম

প্রভাকর মাঝি

সংসার দিয়েছে তারে নিত্য অনটন,
সূচীমুখ অন্তর্দাহ। শত শতাব্দীর
অজগর অহরহ করিছে দংশন
অষ্ট অঙ্গে। তথাপি সে সংকল্পে সুস্থির।

মানুষ করেছে তুচ্ছ। ভেবেছে উন্মাদ।
সরীসৃপ-হাসি দিয়ে বিদ্রূপ জানায়
বারংবার। এল স্বার্থগন্ধী চাটুবাদ।
নির্লিপ্ত সে। সব নিন্দা, সব প্রশংসায়।

প্রিয়া দিতে গেল প্রেম। এড়ালো সে। নীর
নামে তার। তনয়ার শুভ্র হাসি ঠেকে
গাম্ভীর্যের গায়, ক্রমে হয়ে গেল স্থির।
শম্বুকের মত সে যে গুটালো নিজেকে।

কিছুই পেল না হায়, হতভাগ্য! তবু
রক্তে তার নৃত্য করে আদিম জোয়ার।
গর্বোদ্ধত শির সে তো নোয়ায় নি কভু,
অন্তরে লালন করে দৃপ্ত অঙ্গীকার।

বেপরোয়া, বেহিসেবী। আইনের ধার
ধারে না সে। চায় নীল নির্বাধ আকাশ।
ছেড়ে এই চারি দেয়ালের কারাগার
অন্য এক জগতের পেল সে আশ্বাস।

প্রত্যহের বাধা যত বেড়ে ওঠে, তত
প্রাণে তার কী উল্লাস! মন ওঠে দুলে।
স্বর্গের স্বাক্ষর নিয়ে তপস্যায় রত
এই বস্তু-পৃথিবীর সব ত্রুটি ভুলে।

নিঃসঙ্গ যাত্রার সঙ্গী কার হাতছানি,
সে যে শিল্পী, সে যে নব সৃষ্টির সন্ধানী।

মণিপদ্ম

সুবোধকুমার চক্রবর্তী

১২

পরদিন সকালে ছেরিং পেনছোকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না ওয়াং ডাকের ঘোড়াটা। ব্যাপারটা বুঝতে কারুরই বাকি ছিল না, তবু ওয়াং ডাকের চাকরের কাছ থেকে অনুমানটার সমর্থন নওয়া গেল। শেষ রাতেই সে বেরিয়ে গেছে। বলে গেছে, নরাধমের মুণ্ডুটা যদি নিতে পারে, তবেই আসবে ঘোড়া দিতে, তা না হলে পোড়ামুখ দেখাতে সে আর ফিরবে না। পথের ধারে ঘোড়াটা যেন খুঁজে নেয় তারা।

এই কথা শোনবার সময় নিমার দু চোখ জলে ভরে এসেছিল। বলেছিল: বড় সরল ছেলে, বড় ভাল। কিন্তু ক্ষেপে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হয় খুন হবে নিজে, নয় খুন করে ফিরবে।—বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। লামা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক খবর যোগাড় করলেন। নিমার পারিবারিক খবর। সমস্ত কথা খুলে বলতে এতটুকু দ্বিধা হল না তার। ওয়াং ডাক মাঝে মাঝেই কথা বলছিল, তার ভাষা বক্তব্য না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিলুম যে সে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে।

পরে আমাকে নিমার গল্প শুনিয়েছিলেন লামা। একুশ বছর বয়সে নিমার বিয়ে হয়েছিল। ভাল সম্বন্ধ এসেছিল গোটাকয়েক। তার ভেতর দুটোর কথা মনে আছে। এই গ্রামের দু তিনটি রোজগেরে যুবক একসঙ্গে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। আর একটি সম্বন্ধ ছিল এর চেয়েও ভাল। একটি বর্ধিষ্ণু ঘরের একমাত্র ছেলে, বেশ প্রতিপত্তিশালী। নিমার বাবা রাজী হলেন না। বলেছিলেন, দু তিনটি ঘরের বউ হয়ে যাওয়ার বিপদ আছে। স্বার্থে আঘাত লাগলেই বন্ধুদের বন্ধুতা ভেঙে যাবে। তারপর বিবাহ-বিচ্ছেদ। আর বড়লোকের ঘরে দিলেন না এই ভেবে যে তাতে মেয়ে নষ্ট হবে। নানারকম বন্ধুবান্ধব আসবে তার। তারপর স্বামীকে বশ করতে পারলেই আরও যে দুটো বিয়ে করে ফেলবে তাতে সন্দেহ নেই। এমন ঘটনা তো হামেশাই ঘটছে। এতে সমাজের বাধা যেমন নেই, নিন্দেও তেমনই কেউ করে না।

নিমার বাবা নিমার বর্তমান সম্বন্ধটাই পছন্দ করলেন। বড় ভাইয়ের বয়স তখন বছর পঁচিশেক। এক পরিবারের চার ভাই তারা। মেজো তার সমবয়সী, সেজ বছর আটেকের ছোট, আর ছোটর বয়স বছর দুই। সন্ত এদের মা মারা গেছে। তাদের বাপ নিজে বিয়ে না করে ছেলের বিয়ে দিচ্ছিলেন। দেশের প্রথামত এসব ক্ষেত্রে যে মেয়েই ঘরের বউ হয়ে

আসুক না, তার ওপর বাড়ির সব পুরুষেরই সমান অধিকার। বাপে বিয়ে করলেও ছেলেদের দাবি, আর ছেলেরা বিয়ে করলে বাপের। এখানেই নিমার বাবার একটু অপছন্দ ছিল, কিন্তু ভগবানের বিধান অন্য। বিয়ের ঠিক পরেই তার শ্বশুরের মৃত্যু হল। সুস্থ সবলদেহ লোকটা হঠাৎ কী করে মরল, এই নিয়ে বেশ একটু সোরগোল পড়েছিল। আজ স্বীকার করতে নিমার লজ্জা নেই, নিমা এতে সুখীই হয়েছিল। দুরন্ত একটা ভয় নিয়ে সে আসছিল সংসার করতে। পথেই যখন তার রাশভারী শ্বশুরেরর মৃত্যু হল, তার মনে হল, তার বুকের ওপর থেকে একখানা পাথর হঠাৎ নেমে গেল।

এই স্বামীদের সঙ্গে তার অদ্ভুত সম্বন্ধ। স্বামী-বলে তার উপর কর্তৃত্ব করে তার বড় স্বামী। টাকা পয়সার বেলায় কিন্তু নিমা তাকেও আমল দেয় না। রোজগারের শেষ নয়া পয়সাটি পর্যন্ত তার হাতে তুলে দিতে হবে। আর প্রত্যেকটি কাজ তার পরামর্শ নিয়ে করতে হবে। মেজোর সঙ্গে তার সম্বন্ধ বড় মধুর, ঠিক বন্ধুর মত। কর্তৃত্ব নিয়ে তাদের বিবাদ হল না কোনদিন। ছোট দুটি ছেলেকে সে নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছে। ছোটটা তো তাকে মা বলেই ডাকে। আর ডাকবে না-ই বা কেন। এ দেশে অনেক স্বামীই তো স্ত্রীকে মা বলে। এতে তাদের শ্রদ্ধা আর ভালবাসাই প্রকাশ পায়।

আজ আট বছর ধরে এই দুটো ছেলেকে মানুষ করছে সে। নিজের ছেলের অভাব সে কোনও দিন মনে করে নি। একুশ বছর বয়সে একটা দু বছরের ছেলে পেলে তাকে নিজের ছেলেই তো মনে হবে। সেটাকেও তার স্বামী কেড়ে নিয়ে গেছে। ছোটটা যেমন তাকে ভয় পায় না, তেমনই সেজটা যেন তার ভয়ে সারাদিন অস্থির হয়ে আছে। বড় হয়ে অবধি ভাবে, তাকে যে কোনও দোষের জন্যে তাড়িয়ে দেবে। বোঝে না, তার হৃদয় তারা কী ভাবে জয় করে আছে। তার মুখের কথা ঠেলে ফেলবার সাহস নেই বলে সকালে ঘুম থেকে ওঠবার আগেই পালিয়ে গেছে ছেলেটা। বুদ্ধ কি তাকে রক্ষা করবেন না?

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল নিমা, একরকমের বন্য কান্না। লামা দু হাত বাড়িয়ে তার মাথার ওপর রাখলেন। মাথা নীচু করে নিমা এই ছাওয়াং গ্রহণ করল। এঁর আশীর্বাদ ব্যর্থ হবে না, এমনই বিশ্বাস হয়েছে নিমার।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। কত বড় মূর্খের মত আমি নিমার সম্বন্ধে নানা কথা ভেবে ভয়ে ও ভাবনায় কণ্টকিত হয়ে উঠেছিলুম কাল রাতে। নিজের হৃদয়টাকে এমন সহজ ভাবে তুলে না ধরলে তার অন্তরের সংবাদ আমাদের অবিদিতই থেকে যেত।

ওয়াং ডাককে জিজ্ঞেস করা হল তার স্বাস্থ্যের কথা। হয়তো ভাল ছিল না, হয়তো বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল একান্তভাবে, কিন্তু শুয়ে থাকতে সে রাজী হল না। বলল: ইয়াকের পিঠে চড়ে সে অনায়াসে পথ চলতে পারবে। গ্যাকার্কোর মণ্ডি আর বেশী দূর নয়। কিছু কিছু গম আর বার্লির চাষ দেখেছে আশেপাশে, পাহাড়ের গুহায় লোকের বাসও দেখেছে কাল রাতে। কাজেই গ্যাকার্কো যে দূর নয়, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছে।

তার দুঃখের কথাও গোপন রাখল না। বলল: দেশ ছেড়ে অবধি ওই মায়াবিনী মেয়েটার জন্যেই তার সমস্ত পরিশ্রম নষ্ট হয়েছে। গ্যানিমার মণ্ডিতে তার কাজ হল না একেবারে। নানা অজুহাতে পথে ঘাটে সময় নষ্ট করে মণ্ডিতে মেয়েটা দু দিনও রইল না। ইয়াকের লেজের চামর বেচে কিছু প্রবাল কিনবে বলে এতদূর এসেছে। প্রবালের দাম করতে করতেই মেয়েটা রওনা হয়ে গেল। প্রবাল পড়ে রইল, এখনও সে চামর বয়ে চলেছে। একটু [illegible] নিয়ে বলল: ব্যবসার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে, মণ্ডি ভেঙে গেছে দেখলেও সে আর আশ্চর্য হবে না। এত কষ্ট করে এত পথশ্রম করে আসা, সবই একটা মেয়ের জন্যে নষ্ট হয়ে গেল।

বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওয়াং ডাক। তারপর লামাকে যা বলল, তার মানে শুনলুম এই রকম। বলল: সবই ভাগ্য। তা না হলে ছেরিং পেনছোর মত একটা অপদার্থের জন্যে নিমার মত মেয়ে কেঁদে ভাসায়, আর যার জন্যে সে তার জীবনটা দিল সেই কিনা তাকে লাথি মেরে যায়!

লামা দু হাত বাড়িয়ে তাকেও আশীর্বাদ করলেন।

আমাদের যাত্রার আয়োজন হল। সকালের সোনালী রোদ এসে সব কিছু ছুঁয়ে গেছে। পথের ওপর

আপনার ত্বকও
চিত্রতারকাদের ত্বকের মতই সুন্দর হয়ে উঠতে পারে
অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী সৌন্দর্য্যের জন্যে কি করেন শুনুন। "আমার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখবার জন্যে," তিনি বলেন "আমি প্রতিদিন লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করি।" স্নানে ও হাতমুখ ধুতে লাক্স টয়লেট সাবান ব্যবহার করা সত্যিই আনন্দদায়ক—লাক্স সাবানটি এত কোমল, এত সুগন্ধী। আপনিও আজ থেকেই লাক্স টয়লেট সাবানের সাহায্যে আপনার ত্বকের যত্ন নিতে আরম্ভ করুন না কেন?
বিশুদ্ধ, শুভ্র
লাক্স
টয়লেট সাবান
চিত্রতারকাদের সৌন্দর্য্য সাবান
LUX
TOILET SOAP
হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

শিশিরবিন্দু আর জমে নেই, বাতাসের ফলা ভোঁতা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সংকীর্ণ বন্ধুর পথ ক্রমেই ওপরে উঠে যাচ্ছে। ওই উঁচু পাহাড়টা বাঁ হাতে ফেলে আমাদের এগোতে হবে। এখন আমরা সোজা উত্তরে চলেছি। সূর্য উঠেছে ডান হাতে। স্থানে স্থানে চাষের লক্ষণ দেখছি, হরিৎ রঙের শীষ উঠেছে ক্ষেতে। দক্ষিণ থেকে বাতাস এসে উত্তরে নুইয়ে দিচ্ছে তাদের।

আজ বেশ ভাল লাগছে তাকাতে। অনেকদিনের রুক্ষতার পর এই শ্যামলিমাটুকু তৃপ্তি দিচ্ছে ক্লান্ত চোখ দুটোকে। উত্তাপে আর রুক্ষতায় বুঝি চোখের শিরায় আগুন লাগে! এতদিন কেন চোখ বুজে চলতুম আমরা? আজ সারাদিন আমরা তাকিয়েই থাকব।

পাহাড়টি বাঁয়ে রেখে এগিয়ে যাবার সময় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলুম। ঠিক এমনটি আগে কোথাও দেখি নি। মনে হল পাহাড় কুরে কুরে তার ভিতর মানুষ বাসা বেঁধেছে। দীর্ঘদিন ধরে এতটা পথ উত্তীর্ণ হয়ে এলুম, কত নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, কিন্তু ঠিক এমনটি দেখি নি।

লামা আমার কৌতূহল লক্ষ্য করছেন। বললেন: এ একটি গ্রাম। আমিও যখন এমনই একটি তিব্বতী গ্রাম প্রথম দেখেছিলুম তখন তোমারই মত দু চোখ মেলে চেয়েছিলুম অনেকক্ষণ। এমন অপূর্ব জিনিস মনে হয়েছিল পৃথিবীতে আর কোথায়ও নেই।

ইয়াকের পিঠে ওয়াং ডাকের সঙ্গে গল্প করতে করতে নিমা এগিয়ে গেল। আমি ও লামা পিছিয়ে পড়লুম। এমন একটা জিনিস ভাল করে না দেখে কি যেতে পারি?

লামা বললেন: এ দেশে কাঠখড় তো নেই। কাঠ বলতে নেপাল যেতে হবে, নয় তো ভারতের টেহ্‌রি গাড়োয়াল। সে কি সম্ভব এ দেশের গরিবদের পক্ষে? যা সম্ভব, তা হচ্ছে এই পাহাড় কেটে কেটে মৌচাকের মত গুহা তৈরি করা। পাহাড় খুঁড়লে বালি-মাটি পাওয়া যায়। তাই দিয়ে নিকিয়ে পালিশ করে এরা সুন্দর ঘর করে।

কতকগুলো ঘরের সামনে দরজা নেই, পর্দা ঝুলছে। তারই ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটাও দেখে নিলুম। তোফা থাকবার ব্যবস্থা। লামা বললেন: কুলি মজুর চাষী সন্ন্যাসী সবাই থাকে এমনই পাহাড়ের ঘরে।

আশ্চর্য হয়ে বললুম: সন্ন্যাসীও থাকেন? সন্ন্যাসী তো এ দেশের শাসক সম্প্রদায়!

লামা বললেন: দেশশুদ্ধ লোক যদি লামা হয়, তা হলে দেশটাকেই একটা বিরাট মঠ করতে হবে। তা না হলে অত লামার জায়গা হবে কোথায়?

সে কথা সত্য।

আবার পথ চলতে চলতে লামা বললেন: আমার খুব শখ, এমনই পথ অতিক্রম করবার সময় হঠাৎ যদি কোন সত্যিকার তপস্বীর সাক্ষাৎ পেয়ে যাই। শুনেছি এ দেশে মহাপুরুষের অভাব নেই। দুর্গম পাহাড়ের ওপর বরফের আসনে বসে সাধনা করছেন যোগসিদ্ধ পুরুষ। ত্রিকালজ্ঞ তাঁরা, বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়েছেন জ্ঞানের গভীরতায়। কী অপূর্ব বল!

লামার ছোট ছোট চোখ দুটো আনন্দে ও শ্রদ্ধায় জ্বলজ্বল করে উঠল।

খানিকক্ষণ থেমে বললেন: তোমাদের কথাও আমি শুনেছি। তোমাদের ভেতরেও আছেন এমন অগণিত সাধু-সন্ন্যাসী যাঁরা লোকচক্ষুর অন্তরালে তপস্যা করে চলেছেন অনাদিকাল থেকে। শুনেছি হরিদ্বার থেকে দুর্গম পাহাড়ের দিকে ধাপে ধাপে আছে সন্ন্যাসী। কেউ গঙ্গার ধারে ভস্ম মেখে ভণ্ডামি করছে, কেউ দূরান্তর থেকে এসে ওই ভণ্ডদের সঙ্গে হাত পেতে আহার নিয়ে যাচ্ছে সাধু সন্তদের ভোজনালয় থেকে। এদের চেয়ে উপরে থাকেন যাঁরা, তাঁদের আহার-নিদ্রার প্রয়োজন গেছে ফুরিয়ে। মানুষের শরীরে অতিমানুষ তাঁরা। মানুষ আর ভগবানের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করে আছেন লোকোত্তর সাধনায়।

মনের চোখ বুজে নিঃশব্দে প্রণাম করলুম সেই মহাপুরুষদের।

লামা একসময় হালকা কথার ভেতর এলেন। জিজ্ঞেস করলেন: মহাপুরুষ দেখেছ কখনও?

শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীকে দেখেছি। তাঁদের আমরা মহাপুরুষ বলি। তেমন মহাপুরুষ আরও কেউ কেউ আছেন। লামা নিশ্চয়ই এসব মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন না। ভাবতে লাগলুম ত্রৈলঙ্গস্বামী বা গন্ধবাবার মত মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি কিনা।

লামা তাড়া দিলেন, বললেন : এতটা পথ এলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। একজন মহাপুরুষেরও সাক্ষাৎ পেলে না, এমনই পাপী তুমি!

তাড়া খেয়ে হঠাৎ সেই গুহার লামার কথা মনে পড়ল। পথ হারাবার আগে তিনি আমাকে দেশে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করেই এই বিপর্যয় এনেছি ডেকে। প্রথমেই ডাকাতের হাতে পড়ে সর্বস্ব খোয়ালুম। তারপর পথ হারিয়ে আজকের এই অবস্থা। কিন্তু এইখানেই কি দুর্ভাগ্যের শেষ হয়ে গেল? এর পরে যদি সেই রকম দুর্ঘটনা ঘটে, যার স্বপ্ন দেখে ঘেমে উঠি রাতের অন্ধকারে! সে পুরুষ কি তাঁর মানসচক্ষে এমনই কিছু প্রত্যক্ষ রেছিলেন সেদিন? একরকমের অদ্ভুত ভয় আমার নালী ঠেলে উঠল।

লামা বললেন : কিছু বলবে মনে হচ্ছে!

গল্পটা তাঁকে বললুম।

অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না তিনি।

এবারে আমিও বললুম : কিছু বলবেন মনে হচ্ছে!

আমি ভুল করেছি, এ কথা লামা বললেন না, বললেন : সবই বুদ্ধের ইচ্ছা। তাঁর নির্দেশ এড়িয়ে যাবে এমন শক্তি তোমার কোথায়।

বলা বাড়ছে। উত্তাপও বাড়ছে। আর বাড়ছে সর বেগ। সেই বেগ দোলা দিচ্ছে বুকের রক্তে। ক্ষণ নিঃশব্দে চলার পর বললুম : আমার কি ফিরে যাবার পথ নেই?

লামা বললেন : পথ তোমার পেছনেই পড়ে আছে। সেই দুস্তর দুর্গম পথ। নিঃসম্বল তুমি, কার ভরসায় এতটা পথ তুমি পাড়ি দেবে?

বললুম : একখানা কম্বল আর কিছু অর্থ পেলেই ফিরে যেতে পারব। আমি কথা দিচ্ছি, দেশে ফিরেই আমি তা ফেরত পাঠিয়ে দেব।

লামা রসিয়ে রসিয়ে হাসলেন। আমিও আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। প্রাণের উচ্ছ্বাসে যা বলেছি, তা নিজের দেশেই সম্ভব। এ দেশে কে আসবে আমার ঋণ শোধ করতে, আর কোথায়ই বা এই দলটিকে খুঁজে পাব।

আমার অপ্রতিভ ভাব লক্ষ্য করে বললেন : ফিরে যাবার জন্যে অর্থ আর শীত-বস্ত্রের অভাব তোমার হবে না, আর এরা ফেরতও চাইবে না। কিংবা আমিই আমার ঝোলাঝুলি দিতে পারি তোমাকে। কিন্তু তোমার প্রশ্ন হল অন্য রকম। এই যে এতটা পথ এলে, পায়ের চিহ্ন কি রেখে আসতে পেরেছ পাথর আর বরফের ওপর? কী দেখে সেই পুরনো পথে ফিরবে? একটু থেমে বললেন : তার চেয়ে যে পথে চলেছ চল। আজ কিংবা কাল আমরা গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে পৌঁছে যাব। সেখানে অনেক ভারতীয় পাবে, যারা বাণিজ্য শেষ করে সোজা দেশে ফিরবে। তাদেরই কোন দলের সঙ্গে ভিড়ে যেয়ো। নিজের দেশের লোক, আনন্দ করে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

হাতে যেন স্বর্গ পেলুম। তারপরেই দুঃখে মনটা ম্লান হয়ে গেল। সেই পুরনো ভাবনা—এত কষ্ট স্বীকার করে এসে শেষে একটা মণ্ডি থেকে ফিরে যাব? কৈলাস আর মানসসরোবর দেখতে পাব না! ওয়াং ডাকের ইয়াকের পাশে পাশে পায়ে হেঁটে চলেছে নিমা, প্রাণের আনন্দে উচ্ছল জলতরঙ্গের মত। ওরাও দেখবে সো মাভাং আর থাং রিম পোছে।

প্রাণের মায়ার সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেধেছে সৌন্দর্যচেতনার। পুরুষ হয়ে প্রাণের ভয়ে উপেক্ষা করব এই রূপ-রস-গন্ধভরা সুন্দর পৃথিবীটাকে?

সামনে থেকে রিনঠিন শব্দ আসছে অবিশ্রাম। ওকি নিমার পায়ের মঞ্জীর, না, ইয়াকের গলার ঘণ্টা!

১৩

দুপুরেই নিমা যাত্রাভঙ্গ করতে চেয়েছিল। অসুস্থ লোকের একদিনে বেশী পথ চলা উচিত হবে না। কিন্তু ওয়াং ডাক রাজী হয় নি। বলেছিল, গড়িয়ে গড়িয়ে হলেও গ্যাকার্কোর মণ্ডিতে তাকে পৌঁছতেই হবে। চামরগুলো বেচতে না পারলে দেশে ফেরবার রেস্ত থাকবে না তার। নীল প্রবাল না পাক, কিছু লাল আর সাদা প্রবালই তাকে নিতে হবে। এবার আর মেয়েদের মায়ায় ভুলবে না। ইয়াকের পেটে ডোকচার খোঁচা মেরে এগিয়ে চলল অসুস্থ ওয়াং ডাক। আমরাও চললুম।

বেলা তখন পড়ে আসছে। দূরের দিগন্তে মনে হল

সাদা সাদা বকের ঝাঁক পাখা মেলে রোদ পোয়াচ্ছে। ওয়াং ডাকের আনন্দ আর ধরে না। বলল : ওই তো গ্যাকার্কোর মণ্ডি দেখা যাচ্ছে।

আর খানিকটা এগোবার পর ওই পাখামেলা বকগুলো স্পষ্ট হল। অসংখ্য তাঁবু পড়েছে একটা বিরাট ময়দানে। সন্ধ্যার আগে ওইখেনেই আমাদের পৌঁছতে হবে।

একসময়ে নিমা হঠাৎ হেসে উঠল। লামা বিভ্রান্ত হলেন। কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ হাসে কেন মেয়েটা! জিজ্ঞেস করে যা জানলেন, আমাকেও তা শোনালেন। নিমা বলল : গ্যানিমা থেকে জোরে একটা ঢিল ছুঁড়লে হয়তো গ্যাকার্কো এসে পড়বে। অথচ এই পথটুকু পার হতে আমরা বুড়িয়ে গেলুম।

গ্যানিমার মণ্ডি ছেড়ে খানিকটা পথ এগিয়ে তার স্বামীকে ফিরে যেতে হয়েছিল। কী একটা হিসেবের ভুল ধরা পড়তেই আবার তাকে পিছু হটতে হল। এরা ভেবেছিল রাতেই সে ফিরে আসবে, কিন্তু তা এল না। এল পরদিন দুপুরবেলায়। আর এসেই বলল, চল। কিন্তু চল বললেই কি চলা যায়! গোটাকয়েক ইয়াক তাদের হারিয়ে গেছে। ঠিক হারিয়ে যাওয়া নয়, চরতে গেছে। সারাদিন তারা চলে, সারারাত চরে খায়। সকালবেলা সূর্য ওঠার আগে তাদের ধরে বেঁধে এনে যাত্রা শুরু করতে হয়। এই এ দেশের রীতি। আজ সকালে তার দরকার হয় নি। কে জানত যে দুপুরে আবার তাদের যাত্রা করতে হবে! গণ্ডগোল বাধল সেই ইয়াক খুঁজতে বেরিয়ে। ইয়াকগুলোর সঙ্গে একটা অচেতন মানুষও পাওয়া গেল। তার পরের ঘটনা লামা আমাকে বলেছেন।

সাদা সাদা তাঁবুগুলো ক্রমেই এগিয়ে আসছে। লামা বললেন : ওর ভেতরে ঢুকে আর কী হবে! বাইরেই রাত কাটানো যাক।

নিমার ইচ্ছা ছিল ভেতরে ঢোকবার। তার সেজ স্বামীটা গোঁয়ারের মত বাড়ি ছেড়ে গেছে। তার জন্যেই ভাবনা বেশী। এত কাছে এসে তাকে খুঁজে বার করবার একটা চেষ্টা করবে না?

যন্ত্রণায় ও ক্লান্তিতে ওয়াং ডাক তখন ঝিমিয়ে এসেছিল। নিমার কথায় উৎসাহ দিতে পারল না লোকটা। কিন্তু নিমা তার যন্ত্রণা যেন হঠাৎ অনুভব করল তার দরদ দিয়ে। নিজের মত ফিরিয়ে চাকর সেইখানেই তাঁবু খাটাবার নির্দেশ দিল। লামাকে অনুরো করল তাকে সাহায্য করার জন্যে।

লামা বললেন : মেয়েটা একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে এমন বিচলিত হতে তাকে দেখি নি। সমস্ত ব্যাপা তাকে সাহায্য করতে পারি, এমন শক্তি নেই আমার।

জিজ্ঞেস করলুম : আমি পারি না কিছু করতে?

লামা হাসলেন : তোমাকে নিয়েই তার ভাবনা বেশী

এমন উত্তর পাব আশা করি নি। জিজ্ঞাসু চো তাঁর মুখের দিকে তাকালুম।

চিন্তিতভাবে লামা বললেন : সত্যিই তাই। এখা তার বড় স্বামী আছে। ছেরিং পেনছোকেও হয় খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু নিমা ভাবছে তার শারী পরিবর্তনের কথা। এ পরিবর্তন এমন আকস্মিক বিস্ময়কর যে তার স্বামী একে কী ভাবে নেবে, সে না পাচ্ছে না। তোমাকে এর উপলক্ষ্য মনে করে হয় সাংঘাতিক কিছু একটা করেও বসতে পারে।

বললুম : কিন্তু ভগবান জানেন—

বাধা দিয়ে লামা বললেন : সত্যি কথা। ভগবান জানেন, মানুষ তা জানে না। সেইখানেই হল বিপদ।

হঠাৎ একটা উপায় এল মাথায়। বললুম : ঠি হয়েছে, আজ রাতেই আমি একটা আশ্রয় খুঁজে নি

লামা ভাবলেন খানিকক্ষণ। তার পর প্রস্তাবটা করলেন নিমার কাছে। নিমা কী উত্তর দিল বুঝল কিন্তু তার চোখ দুটো কি হঠাৎ ছলছল করে উঠল? বললেন : নিমা বলছে, তা হয় না। তোমার পায়ের এখনও শুকোয় নি। স্বামীর বিরাগভাজন হবার ভ অতিথির অপমান সে করতে পারবে না।

কড়া আফিমের মত নেশার ঘোরে বুদ্ধি আমার আচ্ছ হয়ে এল। এ কথার জবাব দিতে পারলুম না। ম হল, মৌন থেকেই আমার জবাব দিতে পারলুম নিমাকে।

খটখট শব্দে তখন আমাদের তাঁবু খাটানো শুরু হয়েছে ওয়াং ডাক ইয়াকের পিঠ থেকে নেমেই শুয়ে পড়ল। ত বন্দুকের খোঁচা-লাগা ক্ষতটায় ব্যথা হচ্ছে। ঢিলেঢা আলখাল্লার নীচে রক্তক্ষরণ হয়েছে কিনা দেখা গেল না।

তাঁবু খাটানো হলে তাকে ধরাধরি করে ভেতরে নি

হতে হল। সমস্ত দেহ ঘিরে আমারও ক্লান্তি নেমেছে। আমিও তার পাশে বসে পড়লুম। নিমা গেল আমাদের খাবার ব্যবস্থা করতে।

লামা বললেন : তোমরা তা হলে অপেক্ষা কর, আমি নিমার স্বামীদের খোঁজ করে আসি।

একটু হতাশার স্বরে যোগ করলেন : দু-তিন শো তাঁবু পড়েছে, আর পাঁচ-সাত শো লোক ছুটোছুটি করছে এই অন্ধকারের ভেতর। খুঁজে পাব কি কাউকে ?

নিমার কণ্ঠস্বর শোনা গেল বাইরে। লামা চেঁচিয়ে তার উত্তর দিলেন। বললেন : নিমা বলছে স্তুজাটা খেয়ে যাবার জন্যে। অন্ধকার তো হয়েই গেছে, তাড়াতাড়ি গিয়ে আর লাভ কী !

লামার ফিরতে অনেক রাত হল। আমরা অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলুম। নিমার সঙ্গে ওয়াং ডাকের কথা চলছিল অল্প অল্প। আমি শ্রোতা নই, দর্শক। না পারি তাদের কথা বুঝতে, না পারি নিজের কথা বোঝাতে। তাই তাদের কথাবার্তা বলা দেখেই একরকম তৃপ্তি পাচ্ছিলুম। ওয়াং ডাক লোকটা যেন আমাদের পরিবার-ভুক্ত হয়ে গেছে। সে যে কথাবার্তা বলতে পারছে এত রাত পর্যন্ত, তাই দেখেই আনন্দ হচ্ছিল।

লামা নিমার স্বামীদের খুঁজে পান নি। তবে সুস্থ র বাপের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে। সে ভদ্রলোক হাত দিয়ে তাঁর তাঁবুর বাইরে বসেছিলেন। অন্ধকারে লামা ঠিক ঠাহর করতে পারেন নি, নিমার চাকরেরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ভদ্রলোকের সর্বস্ব গেছে। যা কিছু সঙ্গে এনেছিলেন—লাসার মত নক্শা করা গালিচা, ভেড়ার লোম আর চামড়ার জামা—তা বিক্রি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। কেনবার সবই ছিল বাকী। সেই ছোকরা লামা রাতারাতি সব চুরি করে পালিয়েছে। এমন কি সুস্থ আঙমার গয়না পর্যন্ত নিয়ে গেছে।

অন্ধকারে প্রদীপের স্বল্প আলোতেও দেখলুম, ওয়াং ডাকের দু চোখ কৌতুকে চকচক করছে। কৌতুকটুকু প্রকাশ করার ভাষা হয়তো খুঁজে পাচ্ছিল না।

জিজ্ঞেস করলুম : ভদ্রলোক আর কী বললেন ?

লামা বললেন : আজ সন্ধ্যেবেলাতেই এ সংবাদ তিনি আবিষ্কার করেছেন। সকালবেলা লামাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলেন, হয়তো কাছেই কোথাও গেছে। এ বেলা কী একটা কেনবার জন্যে টাকা বার করতে গিয়ে দেখেন যে সর্বস্ব গেছে। ভদ্রলোক কাঁদতে পারলেন না, পারলে মনটা অনেক হালকা হত। বললেন, এমন যে হবে, তার আভাস তিনি আগেই পেয়েছিলেন। মাত্র দু মাস এদিকে বেচাকেনা হয়। তার সবটুকু সময় কাটল রাস্তায় মেয়েটার খামখেয়ালিপনায়। গ্যানিমায় দুটো দিনও তিনি পান নি, মেয়েটা কিছুতেই রাজী হল না থাকতে। জলের দরে আদ্ধেক জিনিস বেচে দিতে হল। এখানেও বাজার প্রায় ভেঙে এসেছে। দামের চেষ্টা করলে জিনিস ফেরত নিয়ে যেতে হত। ভাবলেন, কেনার কাজ পরে করবেন, আগে জিনিসগুলো যাক। কী কুক্ষণে এমন মতি হয়েছিল !

জিজ্ঞেস করলুম : ভদ্রলোক কী করবেন এখন ?

বললেন : ফেরার ব্যবস্থা একরকম হয়ে যাবে, দরকার হলে দু-চারটে ব্রি বেচে দেবেন। দুধ দিচ্ছে এমন চমরী গাইয়ের দাম আছে এদিকে। আফসোস হচ্ছে এই ভেবে যে তাঁর সারা বছরের রোজগার মাটি হয়ে গেল।

একটু থেমে বললেন : ভদ্রলোক ভাবছেন, কাল ধারের চেষ্টা করবেন কিনা। তাঁর প্রতিপত্তি আছে, কিন্তু ভারতীয়েরা তাদের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছে বলছেন। অনেকে এমনই ধারে জিনিস নিয়ে গেছে, পরের বছর আর আসে নি এ মণ্ডিতে। গেছে পুরাঙে কিংবা মাব্‌চা খানবাবের মণ্ডিতে। এই প্রতারণা ভারতীয়দের ক্ষতি করেছে যত, তিব্বতীদের অসুবিধা হয়েছে তার চেয়ে বেশী। কারও কাছে ধার চাইতে এখন তাদের মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

আমি ভাবছিলুম সেই ছোকরা লামার কথা। জিজ্ঞেস করলুম : এসব অন্যায়ের কি কোন প্রতিকার নেই ?

লামা জিজ্ঞেস করলেন : এই প্রতারণার ?

বললুম : এই গুণ্ডাবৃত্তির। লামা সেজে এমন সাংঘাতিক অন্যায় করে যাবে, আর দেশের লোক তা মাথা পেতে মেনে নেবে ?

লামা বললেন : না মেনে উপায় নেই বলেই

দুষু আড্ডার যারা এমন মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। তা না হলে এমন শক্ত কর্মী পুরুষ আমি কম দেখেছি। কোন জন্যেই সে এমন অন্যায়কে মেনে নিতে পারত না।

লামা থামলেন না, বললেন : জান তো, এ দেশ লামা-শাসিত। লামার নামে নালিশ করবার আদালত নেই এ দেশে। তবে গভর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচারণ করে লামারাও নিষ্কৃতি পান না, সে গল্প শুনেছি। সেঙ চেন ডোর জেচানের মত পণ্ডিত ও উঁচুদরের লামাকেও প্রাণদণ্ড নিতে হয়েছিল তোমাদের শরৎ দাসকে তিব্বতী ভাষা শেখাবার জন্যে। এমন নিষ্ঠুরতার গল্প তিব্বতের ইতিহাসে আর নেই।

এ গল্প আমিও শুনেছি। ইংরেজের চর হয়ে রায়বাহাদুর শরৎচন্দ্র দাস তিব্বতে ঢুকেছিলেন চোরের মত। যে লোক তাঁকে নিজের বাড়িতে থাকতে দিয়েছিল, আর যে লোক তাঁকে ছাড়পত্র দিয়েছিল, তাদের দুজনকেও এই লামার সঙ্গে কারারুদ্ধ করা হয়। বিচারে এই লামার মৃত্যুদণ্ড হল। পাথর বেঁধে ব্রহ্মপুত্রের জলে ডুবিয়ে তাঁকে মারা হয়। লোকে বলে, এর ভেতর লামাদেরও চক্রান্ত ছিল।

বললুম : কে এই মৃত্যুদণ্ড দিল ?

লামা বললেন : তালে লামার গভর্মেণ্ট।

জিজ্ঞেস করলুম : বৌদ্ধধর্মের প্রধান গুরু হয়ে একজন ধর্মগুরুর মৃত্যুদণ্ডের বিধান দিলেন ? ধর্মে বাধল না এতটুকু ?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল লামার। বললেন : কৌতুক তো এইখানেই। ধর্মগুরু যদি রাজ্যশাসন করেন তো এক জায়গায় ভুল করতেই হবে। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির বিবাদ তো চিরকালের।

কৌতূহলী মন আমার। জিজ্ঞেস করলুম : তালে লামার গভর্মেণ্ট কি শুধু লামাদের নিয়েই ?

লামা বললেন : তা কেন হবে ? সমস্ত সভ্যদেশের পার্লামেণ্টের মত তাদেরও দুটো সভা আছে। টসে ডুগে এক শো পঁয়ষট্টি জন উঁচুদরের লামা, আর ঠিক অতগুলোই সাধারণ লোক ডুং খোরে। লামাদের নেতা চারজন। টুং ইক চেন মো। এঁদেরই একজন পার্টির লিডার। তেমনই সাধারণ লোকদেরও নেতা চারজন শাব পে, সিনিয়র ভদ্রলোক পার্টির লিডার। ক্যাবিনেট এ ছোট নয়। প্রধানমন্ত্রী চারজন, তিনজন অর্থমন্ত্রী, দুজ যুদ্ধমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্র, ধর্ম আর বিচার বিভাগের জন্যে এ জন করে মন্ত্রী। চারজন টুং ইক চেন মোও এ ক্যাবিনেটে আছেন।

চারজন প্রধান মন্ত্রী শুনে আমি আশ্চর্য হলুম প্রধান তো একজনই হবে। লামা বললেন : প্রধা একজনই। তিনজন তাঁর সহকারী। কিন্তু চারজনের নাম প্রধানমন্ত্রী।

মৃদু মৃদু হেসে লামা বললেন : এত সব থেকেও কো ক্ষমতা নেই দেশের লোকের। গভর্মেণ্ট তো রাজ্যশা করে না, করে গোটাচারেক মঠ। তার ভেতর প্র হল নেচুং। ভবিষ্যৎ-বাণী করবার জন্যে তাদের ল আছে। সেই লামাদের ওপর দেবতার ভর না ঝঁাকজমকওয়ালা পোশাক পরে একজন লামা বসেন দশজন পরিবৃত হয়ে। কাড়া-নাকাড়া আর করতা বাজে জোরে জোরে। তারপর দেবতার ভর হলেই সে লামা সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেন, সকল সমস্যার সমাধা করে দেন, সকল অপরাধের শাস্তির বিধান দেন। এম কি ক্যাবিনেটের সদস্যদেরও শাস্তির বিধান দেন এঁরা তালে লামা তাঁর ক্যাবিনেট পরিবৃত হয়ে এই বিধান নি আসেন।

এমন অদ্ভুত গল্প আমি শুনি নি।

লামা আমার কৌতূহল লক্ষ্য করে বললেন : এ এই বিচিত্র উপায়ে দেবতার নির্দেশ নেবার রীতি প্রচলি হয়েছে প্রায় পাঁচ শো বছর আগে টাশি লুন্‌পো মঠে লামা গেনডুন টুবের আমলে। আমার বিশ্বাস প্রাচী গ্রীস থেকে এই বিশ্বাস ছড়িয়েছে। এই লামা মরবা আগে তাঁর শিষ্যদের বলে গিয়েছিলেন, কোথায় তি পুনরায় জন্ম নেবেন। ঠিক সেইখানে খোঁজ নিয়ে জান গেল যে নির্ধারিত দিনে একটি বালক শিশু জন্মেছে আ প্রথম কথা বলতে শিখেই টাশি লুন্‌পো মঠে ফিরে যাবা ইচ্ছে জানিয়েছে। এই বালকই পেনছেন লামা গেনডু গিয়ামৎসো।

তালে লামা খোঁজবার রীতি আজও কতকটা এ রকম। লামার চারটি মঠের লামারা চারটি বালকের নাম

ঠিকানা দেন। দেবতা কোনও লামার ওপর ভর করে এই সংবাদ দেন। গভর্মেণ্ট তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন ও তাদের পাঁচ বছর বয়সে ব্যালট করে একজনকে তালে লামা করেন। বিদেশী লেখকদের মত, এতে নোংরামি ঢুকেছে। ছেলের বাপেরা তালে লামার বাপ হবার জন্যে অসৎ উপায়ের শরণ নিয়ে থাকেন।

বললুম: এ তো লামার কথা, কিন্তু লামাই তো সমস্ত তিব্বত নয়। তিব্বতের লোক তাদের অনুযোগ জানাবে কার কাছে?

লামা বললেন: এ তোমার কঠিন প্রশ্ন। পুরাঙে এক জুম্পানওয়ালার কথা শুনেছি, তাঁর নাম জুম্পান মুস। ানি রাজপুরুষ, প্রদেশপাল নামে তাঁর খ্যাতি। লাসায় নেছি, বিশিষ্ট কাজের জন্যে অনেক রাজপুরুষ জায়গীর হার পান। সে প্রদেশের প্রজাদের একচ্ছত্র মালিক তাঁরা। শুধু নিয়মিত কর আদায় করা নয়, প্রয়োজনমত প্রাণটাও তাঁরা নিতে পারেন। এই প্রদেশটা কোন্ জুম্পানওয়ালার, আমার তা জানা নেই। শুধু এইটুকু জানা আছে যে প্রতিবাদ জানাবার প্রয়োজন নেই ার দরবারে, তাঁর কাছে এ অন্যায়ের খবর পৌঁচেছে আমাদের আগেই। বুদ্ধ তাকে সুবুদ্ধি দেবেন।

বলে গভীর বিশ্বাসে বৃদ্ধ লামা মাথা নত করলেন।

১৪

কালবেলা আমরা নিমার স্বামীদের খুঁজতে বেরলুম। ার আলো তখন সবে ফুটে উঠছে পূর্বাকাশে। নিমা আমাদের জাগিয়ে দিয়েছিল। ঘুমের চোখে তার নিদ্রালস মুখখানি দেখেছিলুম, রাত জাগার ক্লান্তি জড়িয়ে ছিল তার দু চোখের পাতায়।

লামা বললেন: কাল রাতে তুমি ঘুমিয়ে পড়ার পর নিমা এসেছিল আমার কাছে। আমি যা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, সে তা জিজ্ঞেস করতে ভুলল না। জানতে এসেছিল সুহু আঙমার বাপ তার স্বামীদের কোন খোঁজ রাখেন কিনা। এরা তো এক জায়গার লোক নয়। কেউ কাউকে চিনত না। আমার জন্যেই যেটুকু পরিচয় সুহু আঙমার পেটের ব্যথার চিকিৎসা করি আমি, আর আশ্রয় পেয়েছি নিমার তাঁবুতে। তার সেজ স্বামীটা পালিয়ে নিমার আঁচলের তলায় ঘুরঘুর করত বলেই সুহু আঙমাকে চিনেছিল, আর চিনেছিল তার বাপকে। সুহু আঙমারাও চিনেছে তাকে। কাজেই নিমা যে ছেরিং পেনছোর কথাই জিজ্ঞেস করছে, তা বুঝতে পারলুম। আর সত্যিই, সে ছোকরার খবরও আমি পেয়েছিলুম। তোমার সঙ্গে রাজনীতির আলোচনা করতে গিয়েই তো ভুল হয়েছিল আমার। এইজন্যেই শাস্ত্রে বলে, রাজনীতি থেকে দূরে থাকবে।

বলে হাসতে লাগলেন লামা।

আমি উৎসুক হয়ে বললুম: কী খবর পেলেন তার?

লামা বললেন: নতুন কিছু নয়। আমরা জানি আর যা অনুমান করতে পারি, তাই। সেই ছোকরা লামার খোঁজে এসেছিল এদের তাঁবুতে। কিন্তু সে তো সকাল থেকেই ফেরার। সারাদিন তন্ন তন্ন করে খুঁজে বিকেলের দিকে এসে যখন শুনল যে, সুহু আঙমার বাপের সর্বস্ব চুরি করে লোকটা পালিয়েছে, সে আর কারও অপেক্ষা করল না। সন্ধ্যের আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে রেতাপুরীর দিকে। সে ভাবছে অত বড় শঠকে আশ্রয় দিতে পারে এমন মঠ শুধু রেতাপুরীতেই আছে।

জিজ্ঞেস করলুম: সুহু আঙমার বাবা তাদের তাঁবুর খবর দিতে পারলেন না?

লামা বললেন: কে কার কড়ি ধারে এখানে? আমরাই কি পেরেছিলুম কাল রাতে এদের খুঁজে বার করতে? চেষ্টার তো ত্রুটি করি নি। অজানা অচেনা লোকের তাঁবুর ভেতর মাথা গলাতে পারি না, তাতে মার খাবারও ভয়, আর সময়েরও অভাব। না হোক করেও শ-দুই তাঁবু পড়েছে এই মাঠে।

আমি চিন্তিত হলুম।

লামা বললেন: আশা করা যায়, দিনের বেলায় তারা তাঁবুর ভেতর বসে থাকবে না। তাদের চাকরেরা অন্ততঃ বাইরে থাকবে।

খানিকটা আশ্বস্ত হলুম এবারে।

তাঁবুগুলিকে আজ আর বকের পাখার মত দেখাচ্ছে না। খুঁটোর সঙ্গে শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা সাদা কাপড়ের দু চালা ঘরের মত। আরও এক রকমের ঘর দেখলুম, সেগুলোর আধখানা পাকা আর আধখানা নড়বড়ে।

পাথর আর মাটির দেওয়াল। মাঝখানে একটা বাঁশের উপর থেকে দুদিকে ত্রিপলের চাল নেমেছে। শুনতে পাওয়া গেল, ব্যবসা শেষ করে দেশে যাবার সময় এরা এর দরজা পর্যন্ত অস্থাবর সম্পত্তিগুলি পাকা গুদামজাত করে যায়।

বেশীক্ষণ খুঁজতে হল না। উত্তরে জায়গা না পেয়ে দক্ষিণে এরা ছাউনি ফেলেছিল। আমাদের তাঁবু থেকে দূরত্ব নিতান্তই উপেক্ষণীয়। চাকরেরা অলসভাবে চা খাচ্ছিল। এ দেশে চাকরেরা পয়সার জন্যে চাকরি করে না, করে পিতার প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্যে। এদের পিতা হয়তো কোন দুঃসময়ে দশ ইয়েন ধার নিয়েছিল। শোধ করবার সঙ্গতি এদের বড় একটা থাকে না। তাই ছেলে-মেয়ের বছর দশেক বয়স হতেই গতরে খাটবার জন্যে পাঠিয়ে দেয়। ধারের সর্ত অনুসারে দশ-পনের বছর চাকরি করবে। এও পুরুষানুক্রমের ব্যাপার। ইতিমধ্যে উত্তমর্ণ মরে গিয়ে থাকলে তার ছেলের চাকরি করে দিয়ে আসবে। তারপর দীর্ঘদিন চাকরির পর ফিরে গিয়ে স্বাধীনভাবে রুজি-রোজগারের ইচ্ছা বা সুযোগ খুব অল্প লোকেরই থাকে। তাই অনেকেই আর ফিরে যায় না। দুটো খেতে পরতে পারছে, এতেই সন্তুষ্ট থাকে।

লামা বললেন: এ দেশে তাই চাকর এত বেশী। অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে অনেকগুলো চাকর থাকবে, এটা খুব সাধারণ ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে।

চাকরদের কাছে নিমার স্বামীদের যা খবর পাওয়া গেল, তাকে সংবাদ না বলে দুঃসংবাদ বলা উচিত। ছোট ভাই রেতাপুরীর দিকে গেছে শুনে বড় ভাই সারারাত ছটফট করেছে। সেই ছোকরা লামার দুষ্কৃতির কথা আরও অনেকে শুনেছে। সম্পূর্ণ ঘটনা না জানলেও এটুকু জেনেছে যে সেই পলাতক লামার পেছনে গেছে তার ভাই। কিছু একটা দুর্ঘটনা বাধাবে, এই ভয়ে বড় ভাইও শেষ রাতে ঘোড়া ছুটিয়ে গেছে। জানা গেল, ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল। তারা অপেক্ষা করছিল নিমার জন্যে। চাকরদের উপর যে সব নির্দেশ দিয়ে গেছে, তাতে মনে হয় দু দিনেই এরা সব গুটিয়ে তুলতে পারবে। বিশেষ করে কর্ত্রী যখন এসেই গেছে।

নিমা সুখী হল না। কিন্তু কী একটা ভেবে আশ্বস্ত হল দেখলুম।

চাকররাও বড় নিশ্চিন্ত হয়েছে বোঝা গেল। কী করতে কী করে রাখত, তখন লাঞ্ছনার সীমা থাকত না তাদের। তৎপরভাবে নিমার হাতে সমস্ত কাজের ভার বুঝিয়ে দিয়ে বাটির চা শেষ করতে বসল।

নিমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করল। লামা বললেন: অনেক প্রয়োজনীয় কথা জেনে নিচ্ছে। যাবার সময় তার স্বামী কী বলে গেছে, এখানেই আবার ফিরবে, না, কৈলাসের পথে এগিয়ে যাবে; তারা তার জন্যে অপেক্ষা করবে, না, বাণিজ্য শেষ হলে ছাউনি তুলে রওনা হয়ে যাবে?

এসব কথার ঠিক উত্তর তারা দিতে পারল না। মালিকও তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, আর তারাও ও সব চিন্তা করতে পারে নি। নিমা বলল: ভাইদের ন্যায় যা ভালবাসেন। বাপ মারা যাবার পর নিজের ছেলের মত মানুষ করেছেন কিনা!

আমি ভেবেছিলুম, তার দশ বছরের স্বামীটিও বোধ হয় বড় ভাইয়ের সঙ্গেই গেছে। কিন্তু নিমা তা ভাবে নি। বলল: ছোট ভাইটা বোধ হয় এখন ঘুমচ্ছে, খুব ঘুম ছেলেটার!

বলে তাঁবুর ভিতরে চলে গেল। অল্পক্ষণেই মনে হল সমস্ত গ্যাকার্কোর মণ্ডি বুঝি আনন্দে হঠাৎ জেগে উঠেছে। তাঁবুর ভেতরে মাথা গলিয়ে দেখি, সেই ছেলেটা নিমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে লাফাচ্ছে আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। সে কী বন্য-উল্লাস! জগতের প্রথম শিশুও বোধ হয় তার মাকে এমনই করে অভিনন্দন জানাত, আদিম হলেও অসভ্য মনে হল না। উন্মত্ত হলেও আনন্দ পেলুম মনে মনে।

একটুখানি খোঁচা ছিল এই দৃশ্যের ভেতর। সেটা সভ্য মানুষের বিবেকের খোঁচা। আজকের এই বালকটি নিমাকে জননীর মত নিশ্চিন্ত অবলম্বন পেয়ে এত বড়টি হয়েছে। আর কয়েকটা বছর পরে সে তা বেমালুম ভুলে যাবে—যেমন ভুলতে চাইছে তার সেজ স্বামী। তখন সে স্বামীত্বের দাবী জানাবে আজকের এই স্নেহশীলা নারীর উপর। সন্তান গর্ভে ধারণ করে নারী জননী হয়, মা হয় না। মায়ের দায়িত্ব অনেক বড়। সন্তান পেটে না ধরেও

'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।
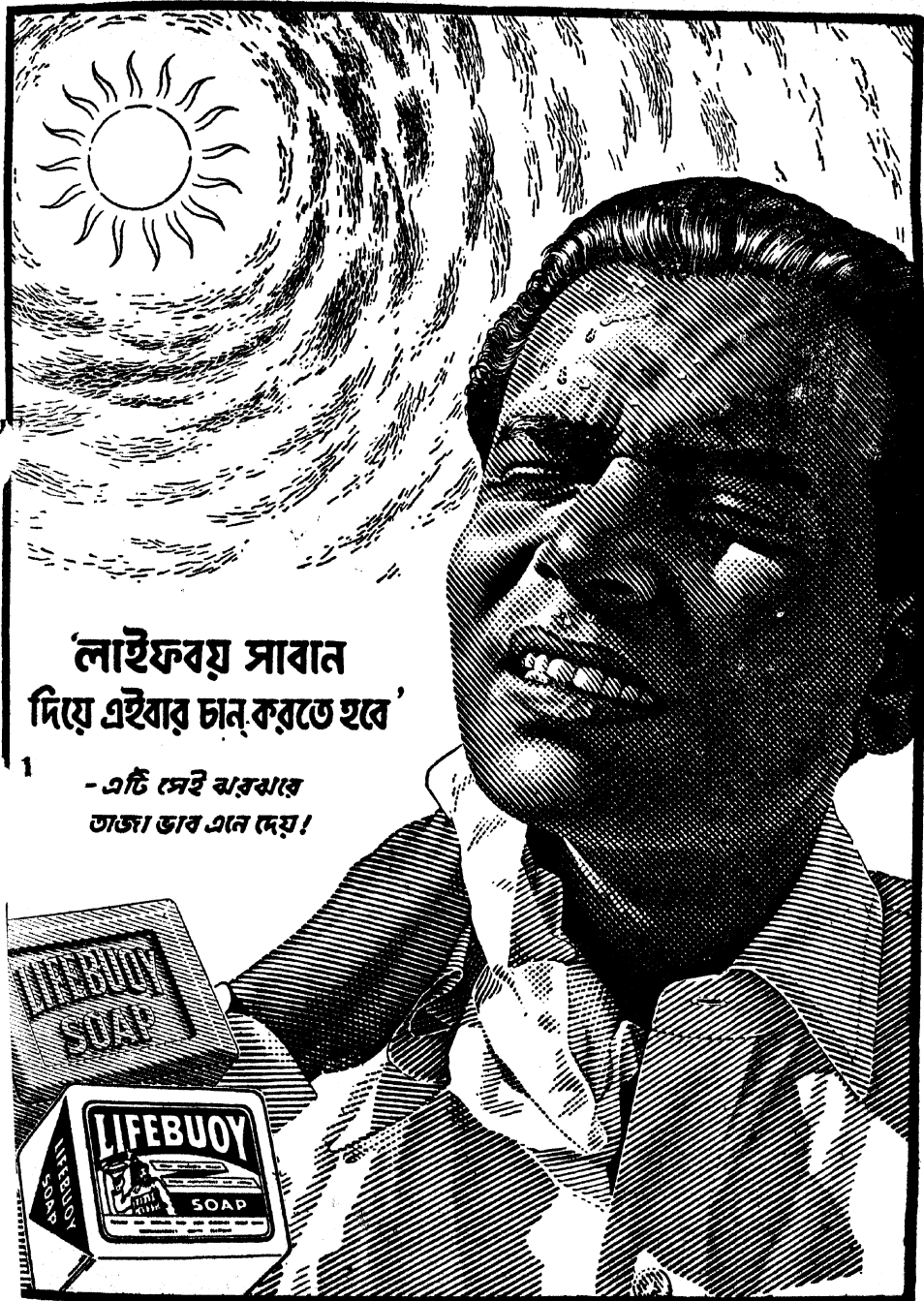
নারী মা হতে পারে। সমাজের নিয়মে নিমা এই বালকের স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে সে তার মা। বড় হয়ে এই বালক তার মায়ের অবমাননা করবে সুস্থ মনে। তার আগে কি নিমা মরতে পারবে না?

অনেকক্ষণ পরে তারা শান্ত হল। আমার মন কিন্তু শান্ত হল না। ইচ্ছে হল, আত্মহত্যার মন্ত্র দিয়ে যাই নিমার কানে কানে।

লামা বললেন: চল, নিমা তার ঘর-সংসার বুঝে নিক, আমরা একটু ঘুরে আসি।

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এখানে বসে থেকে করবই বা কী, তার চেয়ে ঘুরে-ফিরে দেখাই যাক বাজারটা। লামার পেছনে পেছনে বেরিয়ে এলুম।

খানিকটা পথ এগিয়ে লামা বললেন: সুন্নু আঙমার বাবাকে একবার দেখে আসি। সে ভদ্রলোক খুব মুষড়ে পড়েছেন।

জিজ্ঞেস করলুম: সুন্নু আঙমা কী বলে?

লামা বললেন: তার বাবা বলছিলেন, সুন্নু আঙমার স্বপ্ন এখনও ভাঙে নি। সে নাকি বলছে, সুস্থ মনে লামা এ কাজ করে নি। বাজারে কারা নাকি তাকে "ছাং" খাইয়ে দিয়েছিল। টলতে টলতে তাঁবুতে যখন ফিরে এল, তখন তার চোখ জবাফুলের মত। নেশা ভেঙে গেলে সে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসবে, সুন্নু আঙমার এই বিশ্বাস। তার বাপ বললেন, লোকটা চুরি করল কখন? রাতে যখন তারা ঘুমুচ্ছিল, না—

বললুম: 'না' কি?

লামা বললেন: সুন্নু আঙমার বাবা তাঁর সন্দেহের কথাটা ভাঙেন নি। মনে হল ওই মেয়েটাই হয়তো এ কাজে তাকে সাহায্য করেছে।

বললুম: সে কখনও হতে পারে?

লামা বললেন: কিছু বিচিত্র নয়। লোকটা যেমন ঘুঘু, হয়তো একটা মস্ত রকমের ধাপ্পা দিয়ে গেছে। বাপের ভয়ে সে কথা মেয়ে ভাঙতে সাহস পাচ্ছে না।

জিজ্ঞেস করলুম: কিছু কাজ আছে কি তাদের সঙ্গে?

লামা বললেন: বিদেশে বিপদে পড়েছেন ভদ্রলোক। অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে না পারি, সান্ত্বনা তো দিতে পারব। সেটুকুই বা কে দিচ্ছে? আর তা ছাড়া তিনি হয়তো কোন ভারতীয় বণিকের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন।

সে কথা সত্যি। দেশে ফিরতে হলে এখানেই তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমারও একটা দেশ আছে। নিতান্ত আপনার জন না থাকলেও আত্মীয় বন্ধু আছেন সেখানে। ফিরে না গেলে অশ্রুবিসর্জন করে নিদ্রাহীন রাত কাটাবেন না কেউ, কিন্তু চিন্তা করবেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনাও করবেন, হয়তো দুঃখও পাবেন অনেকে। তবু তাঁরা আত্মীয় বন্ধু, তবু তাঁরা নিজের দেশের লোক। সেই আমার স্বর্গ।

পরমুহূর্তেই ভাবলুম অন্য কথা। যদি একবার ... তুষারমণ্ডিত কৈলাস-শিখর দেখতে পেতুম, ... হেমাম্ভোজ প্রসবি সলিলং মানসস্য।

সুন্নু আঙমাদের তাঁবুতে পৌঁছে দেখলুম, তার ... তখন তাঁবুতে আছেন, আর একটা কোণে বসে একজন লামা আপন মনে কী-সব ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্র পাঠ করছেন। অন্য পাশ থেকে সুন্নু আঙমা তার কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে এ... সব পূজার্চনা লক্ষ্য করছে।

সুন্নু আঙমার বাবা উঠে দাঁড়িয়ে কোমর পর্যন্ত ন... হয়ে জিভ বার করে লামাকে অভিনন্দন জানালেন। আমরা মাটিতে বিছানো কম্বলের উপর বসলুম। ... কানের কাছে মুখ এনে সুন্নু আঙমার বা... যা বললেন ... কথা লামাও আমাকে শোনালেন তেমনই সাবধানে। ... ধন পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় এঁকে আনা হয়েছে। ক... ভাবে চুরি হয়েছে, এবং চোরাই মাল ফিরে পাওয়া ... কি না, এই লামা তা গুনে বলে দেবেন। এ তল্লাটে তাঁর হাতযশ আছে, এবং যে ভদ্রলোক এঁকে নিয়ে এসেছেন, তিনিও সুন্নু আঙমার বাবার পাশে বসে দীপ্ত দৃষ্টিতে গৌরব বিকীর্ণ করছেন।

পূজা-পাঠ শেষ হতেই চা এল। ভক্ত লামা দেবতাকে নিবেদন না করে কোন কিছু পানাহার করেন না। চায়ের বাটি হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে যে মন্ত্র পাঠ করলেন, তা বাংলায়ই মত। মন্ত্রটা মনে রয়ে গেল।

ওঁ গুরু বজ্রনৈবেদ্য অঃ হুং।

ওঁ সর্ববুদ্ধ বোধিসত্ত্ব বজ্রনৈবেদ্য অঃ হুং।

ওঁ দেব ডাকিনী শ্রীধর্মপাল সপরিবার বজ্রনৈবেদ্য অঃ হুং

আমাদের লামার মুখে মন্ত্র কখনও শুনি না। শুনি বুদ্ধের নামকীর্তন করতে, বুদ্ধের নাম করে সান্ত্বনা বিতরণ করতে। চায়ের বাটি হাতে নিয়ে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মন্ত্র পাঠ করে নতুন লামা চায়ে চুমুক দেবার পর আমাদের লামা পান শুরু করলেন।

সুহৃ আওমার বাবা একটু উসখুস করছিলেন। তাঁর পাশের ভদ্রলোক ইঙ্গিতে বোধ হয় তাঁকে একটু ধৈর্য ধরতে বললেন।

চায়ের বাটি নিঃশেষ করে লামা সকলের কৌতূহল নিরসন করলেন। যা বললেন, তার অর্থ শুনলুম আমাদের লামার মুখে। বললেন, কাল সকালের দিকে চুরি কয়েছে, য লোক কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল, সেই চুরি ে। সে লোক দক্ষিণে গেছে, আর এদিকে ফিরবে । কাজেই চোরাই মাল পাবার আর কোন আশা নেই।

মি সুহৃ আওমার দিকে চেয়েছিলুম। লক্ষ্য করলুম, একমুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল তার মুখ। শরীরের শিরা-শিরা দিয়ে তার রক্ত চলাচল যেন হঠাৎ থেমে গেল। তার দুঃখের উৎস আমার অজানা নেই। সেই ছোকরা লামা তাকে প্রতারণা করে গেল, শেষে এই কথাই কি করতে হবে?

সুহৃ আওমার বাবা যেন মুষড়ে পড়লেন। পাশের ন উপবিষ্ট তাঁর বন্ধুটি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন ন হল। নতুন লামা তখন তাঁর হাতের মণিচক্র ঘুরিয়ে প শুরু করেছেন। শুনেছি, ওই কৌটোর ভিতরে আছে একখানা তুলট কাগজ, তাতে লক্ষ বার লেখা আছে ওঁ মণিপদ্মে হুঁ মন্ত্র। মণিচক্র একবার ঘোরালে লক্ষ জপের ফল হয়, এই রকম এঁদের বিশ্বাস।

সঙ্গী ভদ্রলোক বোধ হয় কিছু খাদ্য আনবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যবের ছাতু আর ছাং এল চাকরদের হাতে। যব থেকে এক রকমের সুরা তৈরি করে এদিকের লোকেরা, অল্পেই নেশা হয় বলে এর আদর। নতুন লামা কী একটা মন্ত্র পাঠ করে এক নিঃশ্বাসে তাঁর বাটিটা নিঃশেষ করে আবার খানিকটা চেয়ে নিলেন ছাতু দিয়ে খাবার জন্যে।

আমাদের লামা তখন তাঁর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। অনেক কিছু তথ্য সংগ্রহ করে বললেন: মদ খাওয়া নিষিদ্ধ নয় লামাদের। বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নকে স্মরণ করে মদের বাটিতে বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আকণ্ঠ মদ খেতে পার। ওঁ অবোরা নে ইর য়ে হুম্ মন্ত্র সাত বার জপ করে পশুবলি করায় দোষ নেই। কিন্তু কী মন্ত্রে শুদ্ধ করে সেই বলির মাংস খেতে পার, তা এঁর জানা নেই বলছেন।

তাঁর বলার ধরনেই বুঝলুম যে আমাদের লামা মনে মনে অসন্তুষ্ট চটেছেন। দীর্ঘদিনের সাধনায় যে সংযম অভ্যাস করেছেন, আজ তার পরীক্ষা দেবার সময় দেখলুম বেশ অনায়াসে তাতে তিনি উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন: চল, এইবার আমরা উঠি। এই বেলায় ভারতীয়দের ধরতে না পেলে অসুবিধা হবে। দুপুরে তেমন উৎসাহ পাওয়া যায় না।

সুহৃ আওমার বাবার কাছে বিদায় নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। নতুন লামা বক্র দৃষ্টিতে আমাদের দেখতে লাগলেন।

খোলা আকাশের নীচে এসে মনভরা বিরক্তি প্রকাশ করতে তাঁর একটুও দেরি হল না। বললেন: এরা সবাই এক। এমন জানলে আসতুম না এখানে। নিতান্ত ওই নির্বোধ মেয়েটার জন্যেই ভাবনা। টাকাকড়ি সব গেছে, এবারে মেয়েটা না যায় ভদ্রলোকের।

তাঁর পায়ের নীচে দুপদাপ করে শব্দ উঠল। দেখতে পেলুম, বৃদ্ধ আজ জোরে জোরে পা ফেলছেন মাটিতে।

[ক্রমশ]

বর্তমান বিশ্ব-সমস্যায় বৌদ্ধ দর্শনের তাৎপর্য

রণজিৎকুমার সেন

আমাদের আধুনিক সমস্যাবলীর সমাধানের পক্ষে বুদ্ধদেবের জীবন ও বাণী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মনীষার অসাধারণ বিকাশের ফলে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি ও বাস্তবক্ষেত্রে যে প্রগতি দেখা দিয়েছে, তাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও আস্থার ভাব আমাদের মধ্যে ওঠে নি। আধুনিক কালের অন্যতম চিন্তানায়ক হ্যারল্ড লাস্কী প্রকৃতই বলেছেন: 'আমাদের বর্তমান অবস্থা যত্ন সহকারে চিন্তা করতে গেলে এ কথা কেউ প্রতিনিয়ত না ভেবে পারবে না যে, মানুষের মনকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে এমন কোনও ভাবধারার প্রয়োজন।' এ কথা বলতে গিয়ে তিনি কার্যতঃ ধরে নিয়েছেন যে, আমাদের মূল্যমানের যে পদ্ধতি তা ভেঙে গিয়েছে এবং আমরা একটা নৈরাশ্যের যুগে বাস করছি।

এই নৈরাশ্য বর্তমানে বহুবিধ রূপ নিয়ে দেখা দিচ্ছে। নানারূপ কুসংস্কার, প্রস্তুতের অল্পকাল পরেই ফেলে দেওয়া হয় এরূপ অস্থায়ী মূর্তির পূজো, পুরনো যাদুবিদ্যার স্থলে মনঃসমীক্ষণ বা আত্মপ্রশমনের ভাবধারা এবং তারই পাশে বর্তমান সমাজে শোষকের মুখাপেক্ষিতায় শোষিতের অবস্থানের মধ্যে মানবতার বিকাশ সম্ভব নয়, এই ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত লেনিনবাদ এবং কমিউনিস্ট মতবাদে সংগ্রামের অনিবার্যতা পৃথিবীর বুকে স্বর্গ-প্রতিষ্ঠার ধারণার উপরই প্রতিষ্ঠিত।

এ সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা ঠাণ্ডা লড়াই ও আণবিক শক্তির অভিব্যক্তির মধ্যেই আটকে আছি, পৃথিবীর বুকে স্বর্গের ভিত্তিস্থাপনের দিকে এগিয়ে যেতে পারছি না। মানুষের মন বিভ্রান্ত, মানুষের মন শান্তি ও নিশ্চয়তার সন্ধানে ব্যস্ত। এই অবস্থার মধ্যে বুদ্ধদেবের বাণী ব্যতীত এমন তত্ত্ব বা দর্শন খুব কমই আছে যা আমাদের মানসিক ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

বুদ্ধদেব যা প্রচার করেছিলেন, তাকে তিনি সবসময়ই বলতেন মধ্যবাদ বা মাধ্যমিক দর্শন। এই সূত্রের গ্রন্থ 'মঝ্ঝিমনিকায়'। বুদ্ধদেবের নিজের কথায় বলতে গেলে তিনি এই সত্যই প্রচার করেছিলেন যে 'চরম আনন্দ ও চরম নৈরাশ্য বর্জন করে চললেই আমরা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারি।'

তাঁর বাণী ছিল সহিষ্ণুতার বাণী, উদারতার বাণী একদিন তিনি অম্বাপালি নাম্নী এক বারবধূর আতিথেয়তা গ্রহণ করে বলে উঠেছিলেন: 'আমি বাহ্য বা গূঢ় বিষয়ে প্রভেদ করে সত্য প্রচার করি নি। সত্য সম্বন্ধে তথাগতের এমন কোনও বদ্ধমুষ্টি নেই যা কিছুটাও অন্ততঃ গোপন করে রাখে।' আবার তাঁর নির্বাণের পর স্মরণ করে রাখবার মত কোনও বাণী প্রার্থনা করা হলে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি একজন পথপ্রদর্শক মাত্র; সমাজ বা সঙ্ঘ তাঁর উপর নির্ভর না করে নিজেদের আত্ম-প্রত্যয়ের বা আত্ম-বিশ্লেষণের পথ খুঁজে নেবে। বুদ্ধদেবের বাণী মূলতঃ ব্যাবহারিক, তা প্রত্যক্ষ বিষয়ে বা[illegible] সম্পর্কিত। তিনি জ্ঞানীদের বলেছিলেন তাঁর '[illegible] এবং অস্থির ভাবধারা'—যাকে রক্ষা করা বা ধারণ ক[illegible] কঠিন, তাকে সহজ করে দিতে। সর্বোপরি তিনি তাঁ[illegible] কোন রকম পূজার্চনা করবারও বিরোধী ছিলেন[illegible] তিনি তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে যে সকল উ[illegible] দিয়েছিলেন, তার প্রধান হল—'তথাগতেরা শুধু প্রচার[illegible] মাত্র। সকল প্রচেষ্টা তোমাদের নিজেদেরই করতে হবে।'

আমাদের মত একটা অস্থির আধ্যাত্মিকতার যুগে[illegible] নিয়েও বুদ্ধদেব হিন্দু মতবাদের ধর্ম, কর্ম বা সংসার[illegible] সারবত্তা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করেন নি। [illegible] তত্ত্বের তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা উপলব্ধির পূর্বে [illegible] অনেক নিয়মানুবর্তিতা অভ্যাস করতে হয়েছিল, অনে[illegible] প্রলোভন জয় করতে হয়েছিল এবং বেঁচে থাকবার অনেক সমস্যার সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তিনি মূলতঃ যেমন মধ্যপন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তেমনি নির্দেশ দিয়েছিলেন বিশ্বমৈত্রীর এবং অবিচলিত নৈতিক জীবনের। জগতের আদি এবং অন্ত সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী এবং পরলোক সম্বন্ধে কোনও জল্পনার তিনি বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন—কোনও অলৌকিক বিষয়ের প্রতি আগ্রহের ফলে নৈতিক মূল্যের প্রতি মানুষ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এ কথা সত্য নয় যে তিনি ধর্ম-অভিজ্ঞতার সারবত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয় করে কিছু বলেন নি; অঙ্গুত্তর সুত্তের ভাষায় তিনি বলেন: 'ধর্মে অবস্থান এবং ব্রহ্মণে অবস্থান একই কথা।'

বিশেষ করে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর বুদ্ধদেব বিশেষ

গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কোনও ব্যক্তিগত দেবতার ধারণার তিনি বিরোধী ছিলেন। অনেক বিতার্কিক বুদ্ধদেবকে সঙ্কীর্ণমনা অজ্ঞেয়বাদী বলে অভিহিত করেছেন বটে, কিন্তু তিনি কোশাম্বী উপদেশমালায় এ বিষয়ে নিজেই আলোচনা করেছেন। তিনি একটি শিংশপা গাছের পাতা হাতে নিয়ে বলেন, তাঁর হাতে যা আছে, তা বনভূমির সমগ্র পাতার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। তিনি বলেন: 'তেমনি আমি যা জেনেছি, তার সমগ্র সত্য প্রকাশ করি নি। যা অগ্রগতির বা পবিত্রতার কিংবা সত্যের অনুকূলে নয়, তা আমি ইচ্ছে করেই প্রকাশ করি নি।' অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে বুদ্ধদেব অবাস্তব মতবাদী ছিলেন না, তিনি একটি পথনির্দেশ করতেই শ্রমস্বীকার করেছেন—একটা দার্শনিক ক্রমবিকাশের পথ, তা কোনও ...র সমষ্টিমাত্র নয়।

এক শিষ্য মালুঙ্কোপুত্রের মনে দেবতা, তাঁদের ও জা...তিক ব্যাপারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ...একটা দা...নিক সন্দেহ উপস্থিত হলে বুদ্ধদেব একটি ...ক উপদেশ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন: 'মনে ...াক একটা বিষাক্ত শরে বিদ্ধ হয়ে যন্ত্রণা ...ন কর, একজন চিকিৎসক তাকে চিকিৎসা ...লেন। চিকিৎসকের কাছ থেকে কে তীর ...ছিল, সে কোন্ বর্ণের বা পরিবারের লোক, সে লম্বা ...বেঁটে ইত্যাদি না শোনা পর্যন্ত কি সে তীরটি তুলতে ...না? তেমনি এ জীবনে তোমার যেটুকু জানবার তা হল দুঃখের অস্তিত্ব, তার মূল কারণ ও তা ত্রাণ পাবার উপায়।'

...নও সময়ই তিনি নৈতিক বিধিব্যবস্থার বিরোধী ...না। তবে তিনি সব মতবাদকেই বিচার বিশ্লেষণ করে ...র এবং পার্থক্যের উপাদানগুলিকে ভেঙে ফেলবার ...াতী ছিলেন। তাঁর প্রচারিত নির্বাণ বিলোপ নয়, তা আত্মার নির্লিপ্ত অবস্থা মাত্র। তিনি এই সত্যই প্রচার করেছিলেন যে, একমাত্র জীবে প্রেম ও দয়া দ্বারাই মানব-চরিত্রের দোষাবলী ও অসদিচ্ছাকে জয় করে মানুষ পূর্ণতার পথে চলতে পারে। বুদ্ধদেবের পূর্বে এবং পরেও হিন্দু দ্রষ্টাগণ বিশ্বপ্রেমের গুণাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন; শুক্ল যজুর্বেদ ঘোষণা করেন: 'মিত্রস্য অহং চক্ষুষা, সর্বানি ভূতানি সমীক্ষে,' অর্থাৎ 'আমি সর্বভূতকে মিত্রের চোখে দেখি।' কিন্তু প্রাচীন যুগপদ্ধতি নেহাত ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল এবং তাও 'চিত্তবৃত্তিনিরো', অর্থাৎ ব্যক্তি-বিশেষের মানসিক বৃত্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। অপরপক্ষে বৌদ্ধদর্শনের বোধিসত্ত্বেরা পূর্ণতার সন্ধান লাভ করে স্বেচ্ছায় পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন তাঁদের উদাহরণ ও উপদেশাবলী দ্বারা দুঃস্থ মানবের সহায়তার জন্য।

জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধেও বুদ্ধদেবের প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের মর্যাদা ও অখণ্ডতার তিনিই প্রাচীনতম অধিনায়ক। ধম্মপদের ব্রাহ্মণভাগ অধ্যায়ে আছে, 'শুধু জটাধারণ, পিতৃপরিচয় বা বর্ণের খাতিরেই কেউ ব্রাহ্মণ হয় না; যার মধ্যে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা বিদ্যমান, যিনি দেহ মন বা বাক্যের দ্বারা কাহাকেও আঘাত করেন না, তিনিই ব্রাহ্মণ।' সুখের বিষয় যে, সম্রাট অশোক বুদ্ধদেবের বাণীগুলি শিষ্যদের দ্বারা রূপান্তরিত বা বিকৃত হবার আগেই শিলালিপিতে গ্রথিত করে রাখেন। উদাহরণস্বরূপ একটি শিলালিপির কথা বলা যায়, যেখানে লেখা আছে: 'সমবায়স্তব সাধুঃ কিমিনি অন্যমনসো ধর্মঃ। শ্রুয়ুশ্চ শুশ্রূষরশ্চ।' অর্থাৎ 'সকল ধর্মের সমন্বয় পরিণামে শুভ। কেন? কারণ এগুলি পাশাপাশি থাকলে এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের দ্বারা উপকৃত হতে পারে।' সম্রাট অশোকের সর্বজনশ্রুত কলিঙ্গ-বিজয়ের পরিতাপ, হিংসাত্মক পদ্ধতিতে দেশ-বিজয়কে প্রকৃত প্রস্তাবে পরাজয় বলে তাঁর আত্মোপলব্ধি, সীমান্তবর্তী লোকদের প্রতি তাঁর ব্যবহার এবং মানবতামূলক কার্যকলাপ বুদ্ধদেবের বাণীর চরম ও পরম সার্থকতার নিদর্শন। সার্ এড্‌উইন আর্নল্ড বুদ্ধদেব সম্পর্কে প্রকৃতই তাই বলেছেন: 'এই ভারতীয় শিক্ষাগুরুর পরম পবিত্রতা বা কোমলতাকে নষ্ট করতে পারে, ইতিহাসে এমন কোনও ঘটনা বা কাহিনী পাওয়া যায় না। তিনি যথার্থ রাজকীয় গুণাবলীর সঙ্গে সাধকের মনীষার এবং শহীদের নিষ্ঠার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।'

প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় এই মহাগুরুর পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করে আমরা লাভবান হই। বার্থেলেমি সেণ্ট হিলেয়ারের মত একজন বিরূপ সমালোচকও তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন: 'তিনি যা প্রচার করেছেন, সে সকলের তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক। যেমন ছিল তাঁর বীরত্ব, তেমনি দৃঢ় ছিল তাঁর বিশ্বাস। তাঁর আত্মত্যাগ, তাঁর দান, তাঁর চরিত্রের মাধুর্য কোন সময়ই বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। অসীম উদারতার এবং সমষ্টির কল্যাণের হেতু ব্যষ্টির আত্মত্যাগের জন্য তৎপরতার ঋজু ও কার্যকরী উপদেশ তিনি দিয়ে গেছেন।'

এরূপ বাণীর মধ্যে এমন একটি বিশ্বজনীন ভাব ও স্থৈর্য নিহিত আছে যার সম্বন্ধে জনৈক চীনদেশীয় পণ্ডিত বলেছেন: 'একজন বৌদ্ধের সঙ্গে অপর কোনও ব্যক্তির তারতম্য এই যে, বৌদ্ধ জানে সে বৌদ্ধ, কিন্তু অপর ব্যক্তি জানে না যে সেও বৌদ্ধ।'*

---

* Dr. C. P. Ramswami Aiyar-এর 'The Significance of Buddha's Philosophy for the present-day problems' রচনার অনুসরণে।

আদর্শ গৃহিণী ; করুণা অলস, মুখরা, কলহপ্রিয়া ইত্যাদি। কিন্তু দুটি চরিত্রই লেখিকা সমান মমত্বের সঙ্গে এঁকেছেন। ভাল মন্দ সব কটি চরিত্রেরই মানবতার দিক বড় করে দেখানো হয়েছে। "করুণা শেষে সত্য খ্রীষ্টীয়ান হইল, কিন্তু সে ধর্মেতে কখন প্রফুল্লিতা হইতে পারিল না ; কেননা তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু অনেকবার মনে পড়িত··· একজন খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকের পক্ষে এমন বর্ণনাদানের মধ্যে শুধু সংস্কারমুক্ত মননেরই পরিচয় পাওয়া যায় না, যথার্থ শিল্পী মনেরও দেখা মেলে। ভাষার ডৌলটিও কত আধুনিক। পুরুষের সহিত আচরণে স্ত্রীলোকের "একপ্রকার লজ্জার আবশ্যক আছে, কিন্তু সেই লজ্জা ঘোমটা দ্বারা নয়, বরং মনের শুদ্ধতা দ্বারা প্রকাশ পায়।" এক কথায় চমৎকার!

মোট কথা, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এক শো বছরেরও পরে বইটির পুনঃপ্রকাশের ব্যবস্থা করে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের বিবর্তনের ক্রম নির্ণয়ে একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করলেন। একটি মূল্যবান বিস্মৃত গ্রন্থকে পাঠকসমাজের সামনে নতুন করে তুলে ধরে তিনি প্রায়-আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করলেন। আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাঁর এই কাজের জন্য তাঁকে সাধুবাদ জানাই।

নারায়ণ চৌধুরী

উপল-উপকূলে : নিমাইসাধন বসু। এ. কে. ঘোষ, ২০।৩, চারুচন্দ্র সিংহ লেন, হাওড়া। ২.২৫ ন. প.।

এটি ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক ডক্টর নিমাইসাধন বসুর বিলাত-প্রবাসের কাহিনী। কয়েকটি খণ্ড-চিত্রের মাধ্যমে তিনি এই কাহিনী পরিবেশন করেছেন। লেখক পড়াশুনোর জন্যে বছর দুই লণ্ডনে ছিলেন, তদবসরে লণ্ডনের জীবনযাত্রার কয়েকটি দিক্ তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই দিক্ কয়টির বিবরণ তিনি এখানে উপস্থাপিত করেছেন সহজ-সরল ভাষায়, মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে। আজকাল এদেশীয় অনেক ছাত্রই উচ্চশিক্ষার্থ ইংলণ্ড যাচ্ছেন ; কিন্তু যুদ্ধোত্তর ইংলণ্ডের প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা খুব কম সূত্রেই জানতে পারা যায়। লেখক সেই প্রয়োজনীয় কাজটি এই গ্রন্থে সাধন করেছেন। বিলেতে পেয়িং গেস্ট থাকবার রীতি, ছাত্রদের বসবাসের ব্যবস্থা, ইংলণ্ডে বড় দিন, বড় দিনে ডাকব্যবস্থা, ইংরেজদের বাক্যরীতি, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট, লস্ট প্রপার্টি অফিস, ছুটির দিনে সমুদ্রসৈকত, হাসপাতাল ইত্যাদি সমাজ-জীবনের কয়েকটি নির্বাচিত বিষয় সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে বইটিতে। লেখকের বলবার ধরন সংযত-সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। ইংলণ্ডীয় জীবনের ভাল দিক্‌টাকেই এখানে তিনি তুলে ধরেছেন, সেই জীবন-রীতির সমালোচনায় প্রবেশ করেন নি। অর্থাৎ লেখকের মেজাজটি প্রসন্ন-মধুর। কৌতুকপ্রিয়তার সংযোগে তা আরও স্নিগ্ধ হয়েছে। এ বই টুরিস্টের মনোভঙ্গীজাত নয়, একজন সাহিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন লিখিয়ের হাত দিয়ে লেখাগুলি বেরিয়েছে। তবে লেখার ধাঁচটি একটু সরল ; আমাদের মত পোড়-খাওয়া পাঠক রচনায় আরও একটু জটিলতার প্রত্যাশা করে। যাই হোক, এ বই সাধারণ সাহিত্যামোদী পাঠক সকলেরই খুব ভাল লাগবে এই নিশ্চয়তা দেওয়া যায়। ইংলণ্ডগমনেচ্ছু ছাত্রদের ভালও লাগবে, কাজেও লাগবে।

. চ.

ঝড় ও ঝুমঝুমি : শ্রীশান্তি পাল। রঞ্জ পাবলিশিং হাউস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। দেড় টাকা।

আকাশ-মাটির গান : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ১৫।১, তারাপদ চ্যাটার্জি লেন, পো: বোটানিকেল গার্ডেন হাওড়া থেকে প্রকাশিত। দু টাকা।

'ঝড় ও ঝুমঝুমি' সুপরিচিত কবি শ্রীশান্তি পাল মহাশয়ের নবতম কাব্যগ্রন্থ। দুই শ্রেণীর কবিতা গ্রন্থটিতে সংকলিত হয়েছে—দেশাত্মবোধক ও শিশু-মনোরঞ্জক কবিতা। গ্রন্থের আপাতবৈসাদৃশ্যপূর্ণ অথচ সুন্দর নামকরণের মধ্যেই এই সংমিশ্রণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বাংলা দেশে জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের অধ্যায়ে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীর চিত্তে যে প্রবল প্রতিরোধ ও জয়স্পৃহা জাগ্রত হয়েছিল, কয়েকটি সুনির্বাচিত কবিতায় কবি সেই মনোভাবকে এখানে সার্থক ভাষা দিয়েছেন। একাধিক দেশপ্রেমিক বীর নায়কের জাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্জনের পবিত্র স্মৃতিকেও এখানে উৎকীর্ণ করে রাখা হয়েছে কতিপয় সুগ্রথিত রচনার মধ্যে। স্মৃতিচারণমূলক কবিতা "ইতিহাস" কবির জলন্ত দেশপ্রেম ও অন্যায়-অসহিষ্ণুতার

[ঝ]ঙ্কার। কবিতাটির ছত্রে ছত্রে অত্যাচার অবিচার [আ]র দুর্বলের উপর প্রবলের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে কবি-[চি]ত্তের তীব্র রোষ প্রকটিত হয়েছে। দুই-চারিটি ছত্র [উ]দ্ধার করি :

আমি হেরিয়াছি—শিব-তাণ্ডব উনিশ-তিতাল্লিশে ;
ডমরু-শিঙার ভৈরব নাদে ছড়াল কণ্ঠ বিষে।
এক মণ ধানে দুই ভরি সোনা, তাও মেলা হল ভার,
কোটি ক্ষুধিতের উঠে হাহাকার, গগন অন্ধকার।
নগরে-গঞ্জে ক্ষুধিত প্রাণের প্রতিদিন অভিযান ;
শিশুরে বাঁচাতে কত কুলবধূ খোয়ায়েছে সম্মান।
অনশন এসে করেছিল ভিড় অর্ধাশনের দ্বারে ;
প্রাসাদ-শিখরে পলান্ন-ক্ষীর জমেছিল ভারে ভারে।
নিশীথে বাগানে মতি বাইজীর গান।
প্রভাত-সন্ধ্যা নিয়মে গঙ্গা-চান।

শিশু-কবিতায়ও কবির হাত অতি চমৎকার। শিশুদের প্রতি কবির অন্তরে যে একটি স্নিগ্ধ মমতা ও সরসতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে তার অভিব্যঞ্জনায় এই শ্রেণীর প্রতিটি কবিতা সার্থক শিল্পরূপ লাভ করেছে। গ্রন্থের প্রথম অংশের সাংগ্রামিকতার পটভূমিতে এই অংশের মাধুর্য আরও যেন বেশী পরিস্ফুট হয়েছে। [কবি] শিশু-কবিতায় অধিকতর নিষ্ঠা ও মনোযোগের সঙ্গে [আ]ত্মনিয়োগ করুন, এই ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের সাফল্য অবধারিত।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একাধিক কবিতা 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছে। সুনীলকুমারের কবিতা আমাদের ভাল লাগে। তাঁর প্রকাশভঙ্গী স্বচ্ছন্দ, পরিচ্ছন্ন, প্রাঞ্জল। অতি-আধুনিক কবিদের ধরনে তিনি তাঁর কবিতায় দুর্বোধ্যতার আঁকিবুঁকি কাটেন না, তাঁর ভাষা একালীন হেঁয়ালিমুক্ত। কবির প্রকাশের এই স্বচ্ছতার সঙ্গে এসে মিশেছে তাঁর হৃদয়ানুভূতির আন্তরিকতা, অথবা তাঁর হৃদয়ানুভূতি প্রগাঢ় বলেই তাঁর প্রকাশ এত জড়িমামুক্ত সহজ হতে পেরেছে। বেশ একটি প্রকৃতিপ্রেমিক গভীর ভাবুকের মন আছে এই কবির মধ্যে। তা বলে কবি বাস্তবচেতনাবিচ্যুত নন। একটি সহজাত রোমান্টিক মনের সঙ্গে সংসার-জীবনের বেদনার সংঘর্ষ উপস্থিত হলে সেই মনে যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয় তার ছাপ আছে সুনীলকুমারের কবিতার মধ্যে। দুই একটি রচনাংশ উদ্ধার করলেই কথাটা স্পষ্ট হবে—

শিশির-কণার মত এ-প্রাণের কামনারা ঝরে
ব্যথার প্রখর তাপে, স্বপ্ন-সাধ পুড়ে হয় নীল ;
হতাশার বালুচরে দেহ-মন মাথা খুঁড়ে মরে ;
ভাঙা দেউলের মত রিক্ত শূন্য আমার নিখিল।
('মধু-জাগর')

কিংবা,

এ কী দ্বন্দ্ব! কল্পনার সাথে এ কী বাস্তবের কঠিন
সংঘাত!
সকল সৌন্দর্য-তৃষা রিক্ততার মরুতাপে কেন দগ্ধ হয়?
হাজারো সমস্যা এসে মুছে দেয় স্বপ্ন-ভরা স্বয়ংবরা রাত—
নির্মম দস্যুর মত কেড়ে নেয় সময়ের সোনালি সঞ্চয়।
পাশে প্রিয়া শয্যা-লীন, কচি-কাঁচা মুখগুলি নিস্পন্দ-নির্বাক্,
এখন কঠোর কাজ। বসন্তের আমন্ত্রণ আজ তোলা থাক্।
('ব্যর্থ বসন্ত')

এরকম সুন্দর সুন্দর চরণ বইটির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, স্থানাভাবহেতু উদ্ধৃতি সংকলনে বিরত রইলাম।

বইটিতে অনেকগুলি ইংরেজী কবিতার অনুবাদ আছে। কবির অনুবাদের হাত সুদক্ষ। আজকাল আধুনিকতা-অভিমানী দুর্বোধ কবিদের হাতে পড়ে অনুবাদ-কবিতার যা হাল হয়েছে তাতে সুনীলকুমারকে অনুরোধ করি, তিনি এই ক্ষেত্রে অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হোন এবং পুরাতন কবিদের পরিবর্তে আধুনিক ইংরেজ কবিদের কবিতার তর্জমা করে নিপুণ অনুবাদের দৃষ্টান্ত সংস্থাপন করুন। মৌলিক এবং অনুবাদ-কাব্যের এই উভয় বিভাগেই কবির জয়যাত্রা অব্যাহত হোক। 'আকাশ-মাটির গানে'র কবির কাছ থেকে আমরা নিয়মিত আর সযত্ন কাব্যানুশীলনের সমৃদ্ধ ফলশ্রুতি সর্বদাই প্রত্যাশা করব।

ন. চ.

একটি সুরের কান্না : ভারতপুত্রম্। সাহিত্য, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। আড়াই টাকা।

সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যে গভীরতার দিক থেকে অগ্রগতি কিছু হোক-না-হোক, বিষয়বৈচিত্র্য যে বেড়েছে, এ কথা অনস্বীকার্য। জীবনের গভীর গহনে মন-মননের নিমজ্জন স্তব্ধ বলেই বোধ হয় জীবনাচরণের

দৃষ্টিগ্রাহ্য ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের বহির্মুখী ধারা বহুমুখে প্রবাহিত। অধুনাতন বাংলা সাহিত্যকর্মের গতি-প্রকৃতির দিকে একটু মনোযোগ দিয়ে তাকালে এ সত্য সকলের চোখেই ধরা পড়বে। সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে যে এক ধরনের ইতিহাসমনস্কতা দেখা দিয়েছে, তার মূলও মনে হয় এইখানেই। গত কয়েক বছর ধরেই ছোট-বড়-মাঝারি নানান আকারের ইতিহাস-আশ্রয়ী গল্প-উপন্যাস প্রকাশের দিকে একটা ঝোঁক পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। এতে এক দিক থেকে যেমন একটা লাভ আছে, অপর দিক থেকে তেমনই একটা ক্ষতিও আছে। লাভটা দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানায়; এবং ক্ষতিটা বর্তমানের জীবন্ত ও জলন্ত সমস্যাসমূহের হাত থেকে পলায়নে। গত কয়েক বছরে প্রকাশিত ইতিহাস-আশ্রয়ী কথাসাহিত্য দ্বারা এই লাভ এবং ক্ষতি কতটা পরিমাণে ঘটেছে, তার খতিয়ান হলে মন্দ হয় না।

'একটি সুরের কান্না' ইতিহাস-আশ্রয়ী কয়েকটি গল্পের সংকলন। যুগান্তর পত্রিকার রবিবারের সাময়িকীতে 'ইতিহাসের ছায়াপথে' পর্যায়ে গল্পগুলি আগেই প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে গল্প-সংখ্যা মোট পনেরো।

ইতিহাস বলতে আমরা সাধারণতঃ যে রাজারাজড়ার উত্থান-পতনের কাহিনী এবং শাসনকর্তৃত্বের হাতবদল বোঝাই, সেটা প্রকৃতপক্ষে কোন দেশের সত্যি এবং সম্পূর্ণ ইতিহাস নয়। কোন দেশের সম্পূর্ণ ইতিহাস তার সমগ্র প্রজাপুঞ্জের ইতিহাস—তাদের সুখ-দুঃখ-উত্থান-পতনের কাহিনী। তাই প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান শুধু শাসকের বংশমালার তালিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়;—দেশবাসী সাধারণের মধ্যে প্রচলিত অসংখ্য কাহিনী-কিংবদন্তী-প্রবাদের রাজ্যেও প্রসারিত। এই সব কাহিনী-কিংবদন্তী সবই যে প্রত্যক্ষভাবে সত্য, তা নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর মধ্য দিয়েই দেশের প্রকৃত ইতিহাস এবং দেশবাসীর মর্মের সত্য পরিচয় প্রকাশিত হয়। কাজেই ইতিহাসের রাজ্যে এদের মূল্য কম নয়। আর সেইজন্যেই 'একটি সুরের কান্না'য় যে-সব কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে, তাদেরও একটা নিজস্ব মূল্য আছে।

এটা হল তথ্যগত নগদ মূল্যের কথা। কিন্তু সাহিত্যের পক্ষে এটাই চরম মূল্য নয়, সাহিত্যের হাটে বিকোতে গেলে রসের মূল্যটাকেই যাচাই করে দেখতে হয় সব থেকে আগে। এই রসের মূল্যের বিচারেও বর্তমান গ্রন্থের কাহিনীগুলি একেবারে দেউলে নয়। রামী চণ্ডীদাসের অমর কাহিনীতে, বল্লাল সেনের প্রণয়-উপাখ্যানে, এবং ছবি খাঁর ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাসে (যার তুলনা একমাত্র গ্রীক ট্রাজিডিতে) যে একটা কাহিনীগত রস আছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। এ ছাড়া গল্পগুলির বিন্যাসের দিক থেকেও লেখকের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। রূপকথার ঢঙে মিষ্টি করে গল্প বলার একটা সহজ ক্ষমতা আছে লেখকের। সেদিক থেকে এ বই বাঙালী পাঠককে তৃপ্তি দেবে। অবশ্য, যাঁরা মিষ্টিমিষ্টি নরম-নরম গল্প পছন্দ করেন না, গল্পের মধ্যে নিছক-গল্প ছাড়া আরও কিছু খোঁজে তাঁদের কথা স্বতন্ত্র।

'একটি সুরের কান্না' ... আমার দু-একটা অনুযোগ আছে। প্রথমতঃ, লেখক যমক ও অনুপ্রাসের প্রতি এক... বেশী পক্ষপাত দেখাতে গিয়ে তাঁর গল্প বলার সহজ সুন্দর ভঙ্গিটিকে দু-এক জায়গায় ক্ষুণ্ণ করেছেন বলেই আমার মনে হয়েছে। দ্বিতীয় অনুযোগ লেখকের কাহিনী নির্বাচন সম্পর্কে। বাঙলার ইতিহাসের ছায়াপথে ত্যাগের-সাধনার মহত্ত্বের-বীরত্বের অনেক কাহিনীই তো রয়েছে। কিন্তু লেখক কেবল মধুর-কোমল প্রণয়-কাহিনীর উপরই পক্ষপাত দেখাচ্ছেন কেন? আমি ভরতপুত্রম্‌কে এ বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

দেবব্রত ভৌমিক

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

৩০শ বর্ষ
১১শ সংখ্যা

ভাদ্র
১৩৬৫

সংবাদ-সাহিত্য

গোপালদা লিখিয়াছেন,

"তোমাদের জহর পণ্ডিত এইবারে যে পথ ধরিয়াছেন, সেইটিই হইতেছে সনাতন পথ এবং এই পথেই পঞ্চসহোদর পাণ্ডব, এক সহধর্মিনী ও এক ছদ্মবেশী সারমেয় সহ স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সে অনেক দিনের কথা। তাহার আগেই ভারতবর্ষে কুরুক্ষেত্র যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। জহরলালকে যুধিষ্ঠির অপেক্ষা বুদ্ধিমান বলিতে হইবে, তিনি কুরুক্ষেত্রকে বাই-পাস করিয়া সোজা পথ ধরিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর মানসপুত্র তিনি, কাজেই তিনিও ধর্মপুত্র। একটু-আধটু অদলবদল হইলেও বলা যায়, ইতিহাস পুনরাবর্তিত হইতেছে।

অর্থাৎ, ইহার পরেই চ্যাংড়া পরীক্ষিতের হাতে শাসনভার আসিয়া পড়িলেই সর্পযজ্ঞ অবশ্যম্ভাবী। কংগ্রেস ভুজঙ্গম ভূমিকা গ্রহণ করিবে, না, অপর পক্ষ—তাহা এখনও ফলেন পরিচীয়তে। ইহার পরেই জন্মেজয়ের অভ্যুত্থান এবং নবমহাভারত রচিত হইবার কথা। এ পক্ষে ও পক্ষে যে পক্ষেই হউক, বেদব্যাস একটা জুটিয়া যাইবেই।

সমীচীনভাবেই প্রশ্ন করিতে পার, বাকি কয়জন কোথায়? এটা পাঙ্ক্-ককটেলের যুগ হইলেও সহধর্মিণী-পার্কিং-প্রথা প্রকাশ্যতঃ অনেকদিন বাতিল হইয়াছে, সুতরাং দ্রৌপদী-প্রসঙ্গ সৌজন্যের খাতিরেই বাদ দিতে হইবে। কুকুরটির ভার রুশ বৈজ্ঞানিকেরা স্পুটনিক-এর সাহায্যে লইয়াছেন। পাণ্ডবদের বাকি চারজন? ভীমসেন গোবিন্দবল্লভ দিল্লীতে আছেন, অর্জুন মোরারজী দেশাই ধনঞ্জয় হইবার জন্য বিশ্বসফরে বাহির হইয়াছেন, নকুল জয়প্রকাশনারায়ণ সবে বিদেশ হইতে ফিরিয়াছেন এবং সহদেব শ্রীমান রামমনোহর লোহিয়া সদ্যকারামুক্ত হইয়াছেন। বাকি থাকিলেন কুরুপক্ষে শকুনি এবং পাণ্ডবপক্ষে বিদুর। শকুনি মাদ্রাজে বসিয়া এখনও "কচে বারো" হাঁকিয়া পাশার দান ফেলিতেছেন এবং বিদুর পায়ে হাঁটিয়া ক্ষুদের যজ্ঞ করিয়া বেড়াইতেছেন। অতএব দেখিতেছ, হিসাব মিলিয়া গেল। তুমি আবার হিসাবে কাঁচা, বুঝিতেছি অঙ্কটা তোমার মাথায় ঢুকিবে না। আধুনিক সংখ্যা-চুঞ্চু শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মহাশয় তোমাদের কাছেই থাকেন, তাঁহার শরণাপন্ন হইতে পার। আপাততঃ পণ্ডিতজী অনুসৃত পর্বতমার্গের কথা বলিতেছিলাম। তাঁহার জবানিতেই বলি:

চলেছি মহাহিমালয়ের কোলে
দাবি-দাওয়ার কে রাখে আর খোঁজ,
ব'সে আছি ইয়াক-চতুর্দোলে
চোখে আমার রূপের রঙের ভোজ।
বরফ-দৈত্য দিচ্ছে উঁকি কভু
পেঁজা তুলোর মতন মেঘের ফাঁকে,
ঢাকছে "ফগে", মন মানে না তবু,
সুদূর শুধু হাতছানিতে ডাকে।
আড়াল করে হাল্কা বরফ-গুঁড়ো
পাঁচিল সমান কোথাও পাহাড় খাড়া,
আকাশ-গাঙে ভাসতি পাহাড়-চূড়ো
এগিয়ে যেতে দিচ্ছে খালি তাড়া।
খরস্রোতা তিস্তা রেখে বাঁয়ে
কালিমপঙ্ ও পেডঙ গেনু ছেড়ে,
প্রজাপতি-ফুলের রংলি গাঁয়ে
মুষলধারে বৃষ্টি এল তেড়ে।

সিকিম দেশের জেলেপ-লা যাই ফুঁড়ে
পার হয়ে যাই সরাই ইয়াতুং,
শুন্‌তে পেলাম সকল আকাশ জুড়ে
ধ্বনি "ওম্‌ মণিপদ্মে হুং।"

রংবাক মন্দিরে দীর্ঘকাল সাধনারত এই অধমের কথা কি পণ্ডিতজী শুনিবেন? শুনিলে তাঁহাকে আবার দিল্লীর শ্মশান-প্রান্তরে ফিরিতে হইবে। আমার বক্তব্য ছন্দে এই দাঁড়াইবে :

রংবাক মন্দিরেতে ব'সে আছি জুড়ি দুই কর,
গম্ভীর ওঙ্কার-ধ্বনি শুনিতেছি চিরিছে অম্বর।
হিমালয় নিত্যস্থির, বুদ্ধদেব স্থিরতর যেন,
রহস্যের হাসি তাঁর ওষ্ঠে হেরি, বুঝি স্ফিংস হেন
সবারে কহেন ডাকি—"এ রহস্য হইও না পার,
মানুষের জীবনের দুই প্রান্তে তিমির পাথার।"
হেরিতেছি দিকে দিকে উর্ধ্বলক্ষ্যে বীরদল ছোটে,
চঞ্চলের পদাঘাতে অচলের চূড়া কেঁপে ওঠে।
কামেত-ত্রিশূল-নন্দা-নাঙ্গা-কে.টু-অন্নপূর্ণা শিরে
মানুষের জয়গান ধ্বনিতেছে উদাত্ত গম্ভীরে।
মাকালু-চোমোলহরি, ধ্বনিতেছে কাঞ্চনজঙ্ঘায়,
চিরজয়ী এভারেস্ট তাহারও পতাকা ছিঁড়ে যায়।
সেই উর্ধ্বে মানুষের অবস্থান শুধু ক্ষণস্থায়ী—
ফিরে আসে সমতলে, ধরণীর পঙ্কে অবগাহি'
বিস্ময়ে তুষারমৌলি হিমাচল পানে ফিরে চায়।
পুনঃ নামে যবনিকা, রহস্য রহস্য থেকে যায়।

তবে দিল্লীর ওই ভয়াবহ কবরখানা হইতে স্খলিত হইয়া মাঝে মাঝে হিমালয়-স্নান, সর্বদা তারায়-বাঁধা পণ্ডিতজীর দিমাকের পক্ষে সত্যই কল্যাণকর। সমতল পৃথিবীতে বিপর্যয় ঘটাইয়া যাহারা আত্ম-উৎসারিত মহিমায় অভ্রভেদী হইয়া উঠে প্রকৃতিই তাহাদের মাথায় বরফের শাশ্বত টুপি চড়াইয়া দেন। স্বভাবের এই শিক্ষা পৃথিবীর অস্বাভাবিক বড়মানুষদের মাঝে মাঝে ঝালাইয়া লওয়া ভাল। অলমতি বিস্তরেণ।"

—

এই হইল শাশ্বত গোপালদা। তিনি যেন আর শাশ্বত নাই সে আশঙ্কাও ইতিপূর্বে "হিসাব-নিকাশ" কবিতাদৃষ্টে আমাদের মনে জাগিয়াছিল। বিশ হাজার ফুট উর্ধ্বে অবস্থিত বৌদ্ধ গুম্ফার মধুপ ও ঘৃত-বর্তিকার গন্ধময় স্বপ্নালু অন্ধকারে বসিয়াও এবারে সাময়িক এবং সমসাময়িক বিষয়েও যে তিনি চিন্তা করিতেছেন তাহা দেখিয়া তাজ্জব বনিয়া গিয়াছি। মনে হয়, পদ্মসম্ভব-মারপা-মিলারেপার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি তিনি হারাইয়াছেন। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে এই হিমালয়কে বন্দনা করিয়া গোপালদা লিখিয়াছিলেন—

"আমরা সহেছি অনেক অন্ধকার,
আমরা বহেছি অনেক ক্লেশের ভার,
লাখো অভিযানে লাঞ্ছিত বারবার—
তবু বেঁচে আছি হিমাচল পানে চাহি।
সেথা আমাদের শাশ্বত আশ্রয়,
গুহায় গুহায় ঋষিবাণী বাঙ্ময়,
দেবতা-আত্মা যুগে যুগে হেঁকে কয়,
'আছি যতদিন তোমাদের ভয় নাহি'॥"

বুঝিতেছি সেই হিমালয়ে অধুনা কিঞ্চিৎ দুর্গতি ঘটিয়াছে। কিছু কিছু আঁচও আমরা পাইতেছি। হিমালয়-আশ্রিত তিব্বতের মহামান্য দালাই লামার উপর যে দলাই-মলাই চলিয়াছে এবং মহামতি পাঞ্চেন লামার পঞ্চত্বপ্রাপ্তির যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছে তাহাতে মনে হইতেছে কালিদাস প্রোক্ত দেবতা-আত্মা চির-আশ্রিত হিমালয় ত্যাগ করিয়াছেন। তাই গোপালদার ক[illegible] হইতে হঠাৎ একেবারে একটা দ্বান্দ্বিক জড়বাদের [illegible] পাইয়া মনে হইতেছে যে, "পর্বত চাহিছে হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।" এই কবিতায় হিমালয় নাই, বুদ্ধ নাই, উচ্চতা নাই, শৈত্য নাই, আছে সমসাময়িক পলিটিক্স, অ্যাটম বোমা এবং গুচ্ছেক অনুপ্রাস। কবিতাটি রুদ্র হইলেও ইহাতে রুদ্রের দক্ষিণ মুখকে বাম-বাম ঠেকিতেছে। কবিতাটি এই :—

"অনুপ্রাস-অণুত্রাসে

মর্ত্য ভুবন গর্ত ভীষণ
মরুতে হেথায় পড়েছি ভুঁয়ে।
পড়েছি যখন মরেছি তখন
পুড়ে উড়ে যাব আরেক ফুঁয়ে॥
পরম তত্ত্ব—"চরম বিনাশ"
হল আয়ত্ত সত্য বলি।

নাসা আছে যার তাহার পিনাস*
হবে ; ফুলকলি দলিবে অলি ॥
চেখে দেখে দেখে লোকে ঠেকে শেখে
ছড়ো খেয়ে বুড়ো হয়েছি আমি।
ডবল যুদ্ধে বুদ্ধিটা পেকে
হয়েছে শুদ্ধ এবং দামী ॥
অভিজ্ঞ হয়ে বিজ্ঞতা লভি
ত্রাসে কথা কই অনুপ্রাসে।
মনের আকাশে ভাসে যত ছবি
নিবেদন সুধীজন সকাশে ॥

দাঁতের কৃপায় হাসি দেঁতো হাসি
আঁত আছে তাই আঁতাত করি।
লুকাইয়া বাঁশ বাজাই যে বাঁশী
"বাবা" ব'লে থাবা বাগিয়ে ধরি ॥
খুনিয়া হয়েছে সারাটা দুনিয়া
তাই বুনিয়াদি শিক্ষা চাই।
অহিংস বাণী চুনিয়া চুনিয়া
ত্রিংশ কোটির প্রাণ বাঁচাই ॥
ঝানুদের হাতে স্থাণু পরমাণু
মানুষ মারিতে হইল চালু।
ভানু-কৃশানুর কেঁপে ওঠে জানু
ভয়ে উভয়ের শুকায় তালু ॥
ইকে-হুকার লাগে ফিকে ফিকে
ক্রুশভের ক্রুশ মর্মে বেঁধে।
"রেড" (red) করে রেড্ (raid) ক্রমে চৌদিকে
ডলারের গলা শুকায় কেঁদে ॥
ফরমোজা দ্বীপে হবে বোঝাপড়া
সোজা কথা বলে রোজারা সবে।
লেবাননে রণ র'ন চাপা সরা
আগুন জ্বলিবে ফাগুনে কবে ॥
খাই নি যদিও নুন নুন-খাঁর
তবু তাঁর গুণ দ্বিগুণ গাই।
দিল্লীতে এসে হিল্লেতে তাঁর
আল্লা দিলেন সুমতি, তাই ॥

অচিন্ত্যনীয় চীনেরে চিনিতে
মৃন্ময়* হল চিন্ময়েরা।
রুশ-ফুসলানি-তুষ-অগ্নিতে
খাটি হয়ে রুশে চাঁটাবে এরা ॥
মোটের ওপর, ভোটের বিজয়
ভোট-ভিখারীর তাই তো ঘোঁট।
ইউএস্‌সেরে (U.S.S.R.) ইউকের (U.K.) ভয়
একা ইউএসের (U.S.A.) মলিন ঠোঁট ॥
টন টন দরে হতেছে ওজন
হাইড্রোজেন ও ওজোন (ozone) বোমা।
বিস্ফোরণের নাই কো ফোড়ন
আস্ফালনেই মরি যে ওমা ॥
তাই তো ব্রাদার, আণবিক যুগে
পড়েছি অনুপ্রাসের প্রেমে।
শেষে মরবই কেশে কেশে ভুগে
অনুকূল অণু† না এলে নেমে ॥"

এই কবিতা পাঠে মনে হইতেছে গোপালদা চাউ-চাউ ও বার্ডসনেস্টস্যুপের দিকে একটু বেশী ঝুঁকিয়াছেন। রসনার দিক দিয়া আমরাও তো বহু দিন হইতেই চীনের প্রেমে মরিয়া আছি। তাহাদের শাসনাধীনে মনোভাব কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা পরীক্ষাসাপেক্ষ।

—

অখণ্ড ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া যখন হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয় তখন আমাদের পাকিস্তান-বিরোধী বন্ধুরা নিতান্ত গায়ের ঝাল মিটাইবার জন্য কেহ বা বলিতেন ফাঁকিস্থান, কেহ বা বলিতেন কাঁচিস্থান। আমরা ঘোরতর আপত্তি জানাইয়া তাঁহাদের নিন্দা করিতাম। এখন পাকিস্তানী পুস্তক-প্রকাশকদের কাণ্ড দেখিয়া আমাদের কান মলিয়া 'তোবা' করিতে হইতেছে। ঘটনা সত্য হইলে ফাঁকিস্থান তো বটেই, কাঁচিবিশারদ গাঁটকাটাদের স্থানও বলা চলে। ১৮ই সেপ্টেম্বরের 'যুগান্তরে' প্রকাশ—

"লাহোর হইতে পাব্লিক বুক এজেন্সী নামে একটি প্রকাশক প্রতিষ্ঠান শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ ভারতীয় প্রকাশক কিম্বা লেখকের উত্তরাধিকারীদের অনুমতি ছাড়াই প্রকাশ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেছে।

* নাসার ক্ষতরোগ বিশেষ।

* মাটি। † অ্যাটম।

দেবদাস, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি বহুসমাদৃত গ্রন্থ, কলিকাতার একজন সুপরিচিত প্রকাশকের 'ষ্টুডেন্টস্ ফেভারিট ডিক্‌স্‌নারী', রাজশেখর বসুর চলন্তিকা প্রভৃতি পুস্তকেরও ইহারা প্রকাশক বলিয়া দাবী করিয়া পূর্ব-পাকিস্থানে হাজার হাজার কপি বিক্রয় করিতেছে। লেখক কিম্বা প্রকাশকের কপি-রাইট ইহারা স্বীকার করে না। পাকিস্থান পৃথক রাষ্ট্র, এই সুযোগেই তাহারা জালিয়াতি করিয়া ভারতীয় লেখকদের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া মুনাফা লুটিতেছে।"

নোট, মুদ্রা প্রভৃতি জাল করিয়া জালিয়াৎ সাময়িক ভাবে লাভবান হইলেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে ও লাঞ্ছিত হয়। কিন্তু জাল পুস্তকের সুবিধা এই যে তাহা চিরকালই, অবশ্য যথাযথ মুদ্রিত হইলে, মূল পুস্তকের সমান মর্যাদা প্রাপ্ত হয়। শুনিতেছি লাহোর হইতে প্রকাশিত বইগুলি মূল গ্রন্থের প্রত্যেকটি পাতা ব্লক করিয়া ছাপা। অর্থাৎ জাল হইলেও মাল অবিকৃত আছে। ব্লক করার সুবিধা এই যে, একই ব্লকে লক্ষাধিক কপি ছাপা হইতে পারিবে। অর্থাৎ স্বল্প আয়াসে ফাঁকি ও কাঁচিমারা কার্যটি বহরে প্রচণ্ড হইয়া উঠিবে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী পাকিস্তান সরকার যদি অবিলম্বে ইহার প্রতিকার না করেন তাহা হইলে ইউ. এন. ও.-র দরবারে মামলা রুজু করিতে হইবে। ইহার দায়িত্ব ভারত সরকারের। 'যুগান্তরে'র এই সংবাদেই প্রকাশ, স্বর্গীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'কেও কোনও পাকিস্তানী চিত্রপ্রতিষ্ঠান বিনা অনুমতিতে এবং বিনা মূল্যে চলচ্চিত্রায়িত করিয়াছেন। পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক কলঙ্কমুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর মৌলানা ভাসানীর দৃষ্টিও এদিকে আকর্ষণ করিতেছি। এইরূপ ক্রমাগত হইতে থাকিলে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বাংলা দেশের সকল সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের মায় পুস্তক-ব্যবসায়ীদের সকলের পাকিস্তানের সহিত ডেলিগেশন-যোগাযোগ-কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ করা কর্তব্য হইবে। খাল কাটিয়া নদীর জল চুরি অপেক্ষা জাল করিয়া বই চুরি অধিক মারাত্মক। ইংরেজীতে এই কাজকে বলা হয় piracy বা দস্যুতা। 'পাইরেট'দের মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল।

—

আমরা দীনবন্ধুর 'জামাই-বারিক' পড়া প্রবীণ লোক। সেই ব্যারাকে জামাইরা স্ত্রী-সহবাসের জন্য টিকিট বা পাস পাইতেন; এক রাত্রির পাস, এক দিনের পাস, এই রকমের নানা ব্যবস্থা ছিল। এই পাস পাইলে জামাতা-বাবাজীরা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাল স্ত্রীর সহিত "অতিবাহিত করিবার" অধিকার পাইতেন। কাজেই যখন গত ২২এ আগস্ট শুক্রবারের ভদ্র গৃহস্থ "সর্বাধিক প্রচারিত" বাংলা দৈনিকে এই বিজ্ঞাপনটি দেখিলাম:

"'সাহারা' [চলচ্চিত্র] সম্পর্কে এক অভিনব প্রতি-যোগিতায় যোগ দিন এবং মীনাকুমারীর সঙ্গে একটি তারিখ ঠিক করুন।...আপনার প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠতম বিবেচিত হলে আপনি বম্বেতে মীনাকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং এক-দিন তাঁর সঙ্গে অতিবাহিত করবার সুযোগ পাবেন। আপনার বম্বে গমন এবং অবস্থানের ব্যয় প্রযোজকগণ বহন করবেন।"

তখন আমাদের পুরাতন সংস্কারপ্রবণ মন বিচলিত হইল, এই 'কন্‌টেস্টে' যোগ দিবার জন্য নয়—দেশের যুবক-যুবতী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক দৈনিক সংবাদপত্রের অর্থগৃধ্নু রুচিবিকার দেখিয়া। এই সব পত্রিকার বর্তমান কর্ণধারগণের কোনও বংশধর যদি এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্মপ্রাণ পূর্বপুরুষেরা কি পরলোকে শিহরিয়া উঠিবেন না?

—

প্রজার সন্তান পালনের দায়িত্ব রাষ্ট্র সম্পূর্ণ গ্রহণ করিলে তাহাদের গৃহ এবং পারিবারিক বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া সম্পূর্ণ ভাঙিয়া পড়ে, এবং রাষ্ট্র যাহাদের "মানুষ" করে তাহারা নিকট অথবা দূর প্রতিবেশী রাষ্ট্রের আততায়ী সৈন্যরূপে যন্ত্রমাত্রে অথবা তাহাদের কামান-বন্দুকের খাদ্য (fodder) মাত্রে পরিণত হয়—ইহার দৃষ্টান্ত বর্তমান পৃথিবীতে বিরল নহে। স্বাভাবিক অভিভাবকদের অধিকার-বোধ স্নেহ-প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্র যন্ত্রমাত্র, তাহার ক্ষেত্রে সে বালাই নাই। যেমন সন্তান পালনে তেমনই কৃষিকর্মে; নিজস্ব জ্ঞানে চাষীর জমির ফসলের উপর মমত্ব না জন্মিলে উৎপাদন রুটিনমাত্রে পর্যবসিত হইয়া হ্রাস পায়। আমাদের দেশে ভূমি-ব্যবস্থা আইনের বলে পরিবর্তন করার ফলেই যে

"আধুনিক বাংলা গান"

শ্রীমর্ত্যবাসী

"এই ফুল, এই পাখী"-ভরা এই গান-ফাঁকি,
ঢাকাঢাকি কতদিন চলবে ?
হালে যে পাই না পানি দোহাই মা বীণাপাণি,
তোমার আকাশ-বাণী
মর্ত্যবাসীরে কত ছল্‌বে !
"আস্‌ছে না ঘুম" গেয়ে চটুল গায়িকাদল
মিহি সুরে কেঁদে কেঁদে দিতেছে যে রসাতল
আইবুড়ো ছোঁড়াদের, নোলায় ঝরিছে জল,
কত মেন্‌থল শিরে ডল্‌বে ?
বালুচরে প'ড়ে তারা ঢেউ-ভাঙা-তীর পারা
বল আর কত ঢলা ঢল্‌বে।
ঢাকাঢাকি কত ফাঁকি চলবে ?

"তুমি-আমি"দের গান শুনে প্রাণ আন্‌চান্‌
নিয়ে জান লবেজান হনু যে !
মরে হেজে গেছে ভেগে "তুমি"র পরশ মেগে
কত "আমি"—রেতে জেগে
চাপিয়া ধরেছে কত অনুজে।
"তুমি" কভু চাঁদ রূপে আকাশেতে ঝুলে রয়,
কখনো জোনাকি হ'য়ে নেবে জ্বলে বনময়,
রামধনু হয়ে করে "আমি"দের নয়ছয়
ময়ুরপঙ্খী "তুমি"-তনু যে !
শাখায় শাখায় বনে হনুরা কাঁদে সঘনে
কাঁদিতে দেখিয়া যত মনুজে।
নিয়ে জান, লবেজান হনু যে।

গানে জ্বালা ধরে প্রাণে চেয়ে বুড়ী স্ত্রীর পানে,
বিষদানে ভাবি মেরে ফেলব—
তাহারি সমাধি 'পরে অশ্রুর মর্মরে—
নয়াতাজ গড়ি', পরে
আধুনিক গান-গান খেল্‌ব।

নব মমতাজ এসে কুমারী-কালের প্রেমে
"তুমি-আমি" গান গাবে, ভাবে আমি যাব ঘেমে ;
"পায়রা ঝাঁকে"র গান হিক্কায় থেমে থেমে
গাইলেই দুই বাহু মেল্‌ব।
"তুমি নেই, আমি নেই" উঠলে সে ককিয়েই
"আছি আছি"—বলে তারে ঠেল্‌ব।
বিষ-দানে ভাবি মেরে ফেলব।

আলোছায়া ঝিকিমিকি তুষানল ধিকিধিকি
আধুনিকী, কতকাল টি'কবে ?
তুলে নাও বীণাখানি বল বল সুর-রাণী,
তোমার আকাশ-বাণী
জীমূতমন্দ্র কবে শিখ্‌বে ?
শনি-রবিবারে করে এলোমেলো পরিবেশ
সঙ্গীতে পরকীয়া-ইঙ্গিতে ভরে দেশ ;
সুরে সুরে উড়ে উড়ে মদন-ভস্মশেষ
কবে যে "তামাম সুদ" লিখবে !
"দুত্তোর" ব'লে কবে কুমার কুমারী সবে
পরস্পরেরে কবে, "ঠিক বে।"
আধুনিকী কতকাল টি'কবে ?

পরায়ে সুরের ছাল এ শুধু কথার জাল,
তাল তাল হতাশার কান্না—
বিষম দীর্ঘশ্বাস বেদনার হাঁসফাঁস
বিরহের এ বিলাস
যাই হোক, এ তো আর গান না।
কথার গোলক-ধাঁধা ভেঙে তুমি কর চুর,
কথায় এ মরা-কাঁদা গান থেকে কর দূর,
মানুষে-মহৎ-করা ভাবে দিয়ে তাল সুর
রোগীর পথ্য কর রান্না।
পায়ে পড়ি মা ভারতী, দূর কর এ প্রগতি,
ঢের হল, আধুনিক আর না।
তাল তাল হতাশার কান্না ॥

॥ নবম অধ্যায় ॥

চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগান-বাড়িতে কবি যে অনুক্ষণ বিচিত্র সৃষ্টির প্রেরণায় সমাচ্ছন্ন ছিলেন সেই দিনগুলিতে তাঁর রচনার অজস্রতা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। কবিতা ও গানে, উপন্যাস ও বিবিধ গদ্যরচনায় সেদিন তাঁর লেখনী অজস্রবর্ষী। তবু চন্দননগরের বিশেষ ফসল হল 'বিবিধ প্রসঙ্গ,' 'সন্ধ্যাসংগীত' এবং কবির প্রথম সম্পূর্ণ উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট'। কবি 'বিবিধ প্রসঙ্গ'কে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র দোসর বলেছেন, কিন্তু একটু অভিনিবেশ নিয়ে তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে, যে-হৃদয়াবেগ এই দুখানি গ্রন্থে মন্ময় গদ্য ও পদ্যে ভাষা পেয়েছে সেই হৃদয়াবেগই মুক্তি পেয়েছে বৌঠাকুরাণীর হাটে'র নায়ক-নায়িকাদের জীবনে। গ্রন্থাকারে 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হয় '৮৮ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে। শেষ কবিতাটি গ্রন্থের 'উপহার'। উপহারে কবি লিখেছেন :

ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেলা একদিন
মরমের কাছে এসেছিলে ;
স্নেহময়, ছায়াময়, সন্ধ্যাময় আঁখি মেলি
একবার বুঝি হেসেছিলে।
বুঝি গো সন্ধ্যার কাছে, শিখেছে সন্ধ্যার মায়া
ওই আঁখি দুটি,
চাহিলে হৃদয়পানে মরমেতে পড়ে ছায়া,
তারা উঠে ফুটি।
আগে কে জানিত বলো কত কি লুকানো ছিল
হৃদয় নিভৃতে ;
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া
পাইনু দেখিতে।

কবি যাঁকে লক্ষ্য করে এই 'উপহার'-কবিতা রচনা করেছেন তাঁর নাম তিনি স্পষ্টাক্ষরে উচ্চারণ করেন নি বটে, কিন্তু আমাদের মনে কোনোই সন্দেহ নেই যে কবিতাটি নোতুন বৌঠানকে নিয়েই লেখা। কবির নিজের কাছে এই কবিতাটির যে কী সুগভীর তাৎপর্য ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে 'সঞ্চয়িতা'য়। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যে কয়েকটি মাত্র চরণ তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যসঞ্চয়নের জন্য সংকলন করেছেন সেই চরণাষ্টক এই 'উপহার' থেকেই সংগৃহীত। কবিহৃদয়ের নিভৃতে যে অমৃত লুকান ছিল নোতুন বৌঠানের 'সন্ধ্যাময়' দুটি আঁখির দৃষ্টিতেই তা প্রথম ধরা পড়ল। তাই কবি বলেছেন, 'তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া পাইনু দেখিতে।' ওই দুটি চোখ এবং চোখের দৃষ্টি শুধু যে কবির হৃদয়াকাশে তারা হয়ে ফুটে উঠেছিল তাই নয়, পরিণত বয়সে কবি সানুরাগে স্বীকার করেছেন, ওই দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়েই তিনি জীবন এবং জগৎকে নতুন করে পেয়েছেন। 'বলাকা'র 'ছবি' কবিতায় কবি বলেছেন :

নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।

কিন্তু 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যুগে 'কবির নিখিল' আর 'কবির

হৃদয়ে'র মধ্যে এই 'অন্তরের মিল' গড়ে ওঠে নি। তাই সেদিন কবির মর্মলোক আর তাঁর বিশ্বলোকের মধ্যে শুধু দুস্তর ব্যবধানই ছিল না, প্রচণ্ড বিরোধও বর্তমান ছিল। কবি যখন তাঁর অন্তরের মধ্যে ডুব দিয়েছেন তখন তাঁর মনে হয়েছে তিনি হারিয়ে ফেলেছেন তাঁর বিশ্বকে। তরুণ কবির সেই অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চেতনার দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র সুর-বৈপরীত্যের মধ্যে। '৮৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'ভারতী'তে 'আমিহারা' কবিতায় কবি বলছেন :

হৃদয়ের অন্ধকার অরণ্য মাঝারে
আমি মোর হারালো কোথায় ?
ভ্রমিতেছি পথে পথে খুঁজিতেছি তারে
ডাকিতেছি, আয়, আয়, আয় ;
আর কি সে আসিবে না হায় !
আর কি রে পাব না কো তায় ?
হৃদয়ের অন্ধকার গভীর অরণ্যতলে
আমি মোর হারালো কোথায় ?

দিবস শুধায় মোরে—রজনী শুধায়,
নিতি তারা অশ্রুবারি ফেলে,
শুধায় আকুল হয়ে চন্দ্র সূর্য তারা
"কোথা তুমি কোথা তুমি গেলে ?"
আঁধার হৃদয় হতে উঠিছে উত্তর,
"মোরে কোথা ফেলেছি হারায়ে।"
হৃদয়ের হায় হায় হাহাকার ধ্বনি
ভ্রমিতেছে নিশীথের বায়ে !

এই হাহাকার-ধ্বনি, অর্থাৎ হৃদয়ের অন্ধকার অরণ্য-মাঝারে কবির 'আমি'-কে হারিয়ে-ফেলার চেতনা বিশদীভূত হয়েছে 'প্রভাতসংগীতে'র 'পুনর্মিলন' কবিতায়। 'পুনর্মিলন' '৮৯ বঙ্গাব্দে'র 'ভারতী'র শেষ কবিতা—চৈত্রমাসে প্রকাশিত। সেখানে কবি বলছেন, ছেলেবেলা প্রকৃতির সঙ্গে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ। রজনীপ্রভাতে প্রাচীরের পরপারে নবীন রবির আলো তাঁর কিই না ভাল লাগত !

সর্বাঙ্গে সুবর্ণ-সুধা অজস্র পড়িত ঝরে,
প্রভাত ফুলের মত ফুটায়ে তুলিত মোরে।

সূর্যের আলোয় নবস্ফুট পুষ্পের মত সারাদিন তাঁর কাটত প্রকৃতির বিচিত্র লীলার জগতে! ছেলেবেলার সে প্রকৃতি-প্রীতির কথা স্মরণ করে কবি বলছেন,

সেই—সেই ছেলেবেলা,
আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো, জননী গো, কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কী যে হল—কোথা যে গেলেম চলে।
হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিকো কিনারা,
তারি মাঝে হনু পথহারা।
সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।

প্রকৃতির আনন্দময় সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে হৃদয়ে বিশাল অরণ্যে কবি পথহারা হলেন। তারই হাহাকা এ সব কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র এ 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে 'প্রভাতসংগীতে' 'নিষ্ক্রমণ' ঘটে বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দলোকে। প্রকৃতির সঙ্গে এ 'পুনর্মিলনে'র আনন্দই উৎসারিত হয়েছে 'প্রভাতসংগীতে কাব্যকাকলিতে। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাহি পরিবেশের সঙ্গে কবির এই উপলব্ধির কোনও ঘ যোগ নেই। চন্দননগরের গঙ্গাতীরে অনন্ত আকাশে কোলে 'টলমল মেঘের মাঝারে' কবি তাঁর কাব্যক বাসরঘর রচনা করেছিলেন। সেই চন্দননগরেই 'সন্ধ্যা সংগীতে'র শেষ পর্যায়ের কবিতাগুলি লেখা। বাংলাদেশে আকাশভরা আলো আর স্নিগ্ধশ্যামল নদীতীরের কলধ্বনি দিনরাত্রিগুলি এমন আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয় হ কবিজীবনে এর পূর্বে আর কখনও আসে নি এ ক 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। অ কবি তখন একান্তভাবে হৃদয়রহস্যের আলো-আঁধা লীলাতেই নিমগ্ন হয়ে ছিলেন। সেই হৃদয়-রহস্যে কাব্যরূপ 'সন্ধ্যাসংগীত' ; তাই 'সন্ধ্যাসংগীত' মুখ্যত প্রে কাব্য। কিন্তু 'প্রভাতসংগীত' একান্তভাবেই প্রকৃতিগাথ কবিমানসে সেদিনকার প্রেমচেতনা ও প্রকৃতিচেতন বিপরীত লীলাই 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে' ভ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

রবীন্দ্র-কাব্যলোকে সন্ধ্যা ও প্রভাত—এই শব্দ দুটি শব্দমাত্রই নয়, তারা বিশেষ অনুভূতির প্রতীক। 'বিবিধ প্রসঙ্গে' 'প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন, "প্রভাতে আমি হারাইয়া যাই, সন্ধ্যাকালে আমি ব্যতীত বাকি আর সমস্তই হারাইয়া যায়। * * প্রাতঃকালে জগতের আমি, সন্ধ্যাকালে আমার জগৎ। প্রাতঃকালে আমি সৃষ্ট, সন্ধ্যাকালে আমি স্রষ্টা। * * এককথায় প্রভাতে আমি জগৎ-রচনার কর্মকারক ও সন্ধ্যাকালে আমি জগৎ-রচনার কর্তাকারক। প্রভাতে "আমি" নামক সর্বনাম শব্দটি প্রথম পুরুষ, সন্ধ্যাবেলায় সে উত্তম পুরুষ।"

এই বিশ্লেষণের আলোকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সন্ধ্যায় কবির 'আমিই' মুখ্য, আর প্রভাতে মুখ্য কবির 'জগৎ'। সন্ধ্যায় কবির 'আমি' তার অন্তর্লোকের প্রেমের মধ্যেই ডুবে থাকে, প্রভাতে তার কাছে আসে বহির্ভুবনের আহ্বান। কবির আমি-কে নিয়ে প্রেম ও প্রকৃতির এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে' মূর্ত হয়ে উঠেছে। পরবর্তী জীবনে যেদিন বিরহের মোহনমন্ত্রে কবি তাঁর মানসলক্ষ্মীকে বিশ্বলক্ষ্মীরূপে খুঁজে পেলেন, সেদিন প্রেয়সী নারী আর রূপসী প্রকৃতির মধ্যে সব ব্যবধানই ঘুচে গেল। 'চিত্রায়' এই প্রেয়সী-রূপসীর মিলন-তত্ত্ব কবির ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। কবি একবার বিশ্বলোকের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্ররূপিণী', আবার তাঁর অন্তর্লোকের দিকে তাকিয়ে বলছেন, 'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী, তুমি অন্তরবাসিনী।'

তরুণ কবিচিত্তে প্রেম ও প্রকৃতির এই বিপরীতমুখী আকর্ষণকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিশ্লেষণ না করলে শুধু যে একদেশদর্শিতারই পরিচয় দেওয়া হবে এমন নয়, কবিমানসের বিচারেও বিভ্রান্তি ঘটবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। শুধু সম্ভাবনা নয়, সত্যসত্যই এই বিভ্রান্তি ঘটেছে। এবং এর জন্যে মূলতঃ দায়ী মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত ঐতিহাসিক-ক্রম-ভাঙা কাব্যগ্রন্থের [১৩১০] ভাবগত পুনর্বিন্যাসের প্রয়াস। মোহিতচন্দ্র 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতাকে যথাক্রমে 'হৃদয়-অরণ্য' ও 'নিষ্ক্রমণ' শিরোনামায় বিন্যস্ত করেছেন। এই বিন্যাসের সঙ্গে যে ভাষ্য যুক্ত হয়ে গেছে সেটি হল এই যে, হৃদয়-অরণ্যে পথহারা বিষণ্ণ কবি প্রকৃতির আনন্দলোকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অভিলষিত মুক্তির সন্ধান পেলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেও এই নিষ্ক্রমণ-তত্ত্বের আলোকেই তাঁর সেদিনকার মনোভাবের ব্যাখ্যা করেছেন। 'রুগ্ন হৃদয়টার আঁধারে' অন্তরের সঙ্গে বাইরের সামঞ্জস্য ভেঙে যাওয়ার ফলে বহির্ভুবনে চিরদিনের যে সহজ অধিকারটি হারিয়েছিলেন, কবি বলছেন 'সন্ধ্যাসংগীতে' তারই বেদনা প্রকাশ পেয়েছিল। অবশেষে এক শুভপ্রভাতের দিব্য আবেশে কবি তাঁর ছেলেবেলার বিশ্বপ্রকৃতিকে আনন্দ-রূপে অমৃত-রূপে ফিরে পেলেন। কবি তখন সদর স্ট্রীটে জ্যোতিদাদার সঙ্গে বাস করেন। চন্দননগর থেকে ফিরে এসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কিছুদিনের জন্যে চৌরঙ্গি যাদুঘরের নিকট দশ নম্বর সদর স্ট্রীটে বাস করছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সঙ্গী। এই সদর স্ট্রীটেই একদিন ভোরবেলা 'সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ' কবিজীবনে নূতন তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভাসিত হল। 'জীবনস্মৃতি'তে তিনি বলেছেন, 'গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন; আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে-একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমিষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল।'[১] এই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'ই 'প্রভাতসংগীতে'র মর্মকবিতা। পর্বতকন্দরের পাষাণ কারাগারে বন্দী নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হল সূর্যের আলোয়, বিশ্বভুবনে বেরিয়ে পড়ার আহ্বান এল তার কাছে। তা মহাসমুদ্রে মিলিত হয়ে সার্থক পরিণতিলাভের আহ্বান। প্রভাত-সূর্যের আলোয় নবজাগ্রত কবি বুঝতে পারলেন, তাঁর হৃদয়ের অর্গলমুক্তি হয়েছে। 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।'

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি তাঁর সেদিনকার উপলব্ধিকে বলেছেন তাঁর 'জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা যাকে আধ্যাত্মিক নাম দেওয়া যেতে পারে।'[২] অবশ্য নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি' আর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ব্যাখ্যায় পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি বলেছেন, মানুষের মধ্যে আছে দুই আমি, একটি তার 'অহং', আরেকটি তার 'আত্মা'। ঘরের মধ্যে যে আকাশ আর অসীম বিশ্বে যে আকাশ তার মধ্যে যে ভেদ 'অহং' আর আত্মায়ও সেই ভেদ। কবি একদিন 'অহং'-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলেন, 'প্রভাতসংগী'তে এল 'আত্মার ডাক'। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি এই 'আত্মা'কেই বলেছেন মহামানব। 'প্রভাতসংগীতে' নির্ঝর যে মহাসাগরের গান শুনতে পেয়েছিল কবির শেষ ভাষ্যে সেটি এই মহামানবেরই গান। 'এই মহাসমুদ্রকে এখন নাম দিয়েছি মহামানব। সমস্ত মানুষের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নিয়ে তিনি সর্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সঙ্গে গিয়ে মেলবারই এই ডাক।'[৩] বলাই বাহুল্য, এই ব্যাখ্যায় হৃদয়ারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের অর্থান্তর ঘটেছে। এবং এখানে কবি কাব্যের পটভূমি থেকে সরে এসে দার্শনিকের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। এবং এই 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র উপরে 'আরোপিত' হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। মর্ত্য পৃথিবীর মানুষকে মুখ্যত তার অহং-কে নিয়েই ঘরসংসার চালাতে হয়। 'প্রভাতসংগীত' সম্পর্কে কবির আত্মবিশ্লেষণ পরবর্তী কালের একখানি চিঠিতে সার্থক রূপ পেয়েছে। সেই পত্রে কবি লিখেছেন, "'জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর', ও একটা বয়সের বিশেষ অবস্থা। যখন হৃদয়টা সর্বপ্রথম জাগ্রত হয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দেয় তখন মনে করে, সে যেন সমস্ত জগৎটা চায়—যেমন নবোদ্গতদন্ত শিশু মনে করেন, সমস্ত বিশ্বসংসার তিনি গালে পুরে দিতে পারেন। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারা যায়, মনটা যথার্থ কী চায় এবং কী চায় না। তখন সেই পরিব্যাপ্ত হৃদয়বাষ্প সংকীর্ণ সীমা অবলম্বন করে জ্বলতে এবং জ্বালাতে আরম্ভ করে। একেবারে সমস্ত জগৎটা দাবি করে বসলে কিছুই পাওয়া যায় না, অবশেষে একটা কোনোকিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়। 'প্রভাতসংগীত' আমার অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস, সেইজন্য ওটাতে আর-কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।"[৪]

এই বিশ্লেষণে কবি 'প্রভাতসংগীতে'র আনন্দোৎসবকে 'নবোদ্গতদন্ত শিশুর বিশ্বসংসার গালে পুরে দেবার' সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন তাঁর অন্তরপ্রকৃতির প্রথম বহির্মুখ উচ্ছ্বাস বলেই ওতে "আর কিছুমাত্র বাছবিচার নেই।" তিনি আরো বলেছেন যে, 'একটা কোনোকিছুর মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হতে পারলে তবেই অসীমের মধ্যে প্রবেশের সিংহদ্বারটি পাওয়া যায়।' অন্তর্লোকে, কবি যাকে বলেছেন 'সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত' তার মধ্যে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে নিবিষ্ট হয়েই তিনি একদিন অসীমের মধ্যে প্রকাশের সিংহদ্বারটি খুঁজে পেয়েছিলেন, সে সত্য কবিমানসের পরবর্তী বিশ্লেষণে ধরা পড়বে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র যুগে কবি সেই সত্যের সন্ধান পান নি। তখনো তাঁর মধ্যে প্রেমচেতনা ও প্রকৃতিচেতনার দ্বন্দ্ব বর্তমান। 'সন্ধ্যাসংগীতে' প্রেমাবিষ্ট কবি 'ভালোবাসার অমৃতকেই' অন্তর্লোকে সন্ধান করে ফিরেছেন, আর 'প্রভাতসংগীতে' প্রকৃতিসৌন্দর্যমুগ্ধ কবি তন্ময় হয়েছেন 'আলোকের প্রকাশে'র মধ্যে।

কবিমানসের এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে কবি নিজেও সচেতন ছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীকে লেখা এক পত্রে কবি লিখেছেন, 'আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারিনে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্ছে Shelleyর Skylark আরেকটা হচ্ছে Wordsworth-এর Skylark। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করচে, আরেকজন অনন্ত সুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার এবং আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে, সে অভাবদুঃখপীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে এই দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ—যে যেটা অধিক অনুভব করে। আমার বোধ হয় মেয়েরা আপনার পূর্ণতা

অধিক অনুভব করে (এই জন্যে তারা যাকে-তাকে ভালবেসে সন্তুষ্ট থাকতে পারে), পুরুষরা আপনার অপূর্ণতা অধিক অনুভব করে, এই জন্যে জ্ঞান বল, প্রেম বল, কিছুতেই তাদের আর অসন্তোষ ঘোচে না। কবিত্বের মধ্যে মানুষের এই উভয় অংশ পাশাপাশি সংলগ্ন হয়ে থাকলেই ভাল হয় কিন্তু তেমন সামঞ্জস্য দুর্লভ।'[৫] বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রজীবনে সেই 'দুর্লভ সামঞ্জস্য' সম্ভব হয়েছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ কবিসার্বভৌম। কিন্তু এই সামঞ্জস্যের মধ্যেও 'সুখদুঃখ-বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসার' শক্তিই প্রবল, না 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা'র শক্তিই প্রবল,—এই জিজ্ঞাসাই রবীন্দ্রমানস-তীর্থযাত্রীর সর্বশেষ জিজ্ঞাসা।

২

'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'প্রভাতসংগীতে'র ব্যাখ্যা হিসাবে 'হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণে'র রূপকটিকে দুটি কারণে সন্তোষজনক বলে মনে হয় না। প্রথমতঃ কবি যে প্রেমচেতনায় আবিষ্ট হয়েছিলেন তা থেকে তিনি প্রকৃতচেতনায় নিষ্ক্রান্ত হয়ে মুক্তির আনন্দ পেলেন, এই যুক্তি সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের রচনাবলীর দ্বারা সমর্থিত হবে না। 'শৈশবসংগীত' 'সন্ধ্যাসংগীত' 'ছবি ও গান' এবং 'কড়ি ও কোমলে' কবির প্রেমচেতনাই মুখ্য। এই দিক থেকে 'প্রভাতসংগীত' অনেকাংশে মূল ধারা থেকে স্বতন্ত্র এবং প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, নিষ্ক্রমণের দিব্যাবেশ কবিজীবনে যেমন আকস্মিক তেমনি তা অচিরস্থায়ী। 'জীবনস্মৃতি'তেই কবি সে কথা স্বীকার করেছেন। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে কবি বলেছেন তাঁর জীবনের সেই প্রথম 'আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা', দিব্যাবেশে সেই 'আত্মহারা আনন্দে'র অবস্থায় তিনি মাত্র চারদিন ছিলেন। কিন্তু তার পরেই তাঁর চোখ থেকে সেই দৃষ্টি হারিয়ে গেল। সদর স্ট্রীটের এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই জ্যোতিদাদারা স্থির করলেন দার্জিলিঙ যাবেন। কবি সেখানেও তাঁদের সঙ্গী হলেন। দার্জিলিঙে তাঁরা 'রোজভিলা' নামে একটি নিভৃত বাসায় আশ্রয় নিলেন। কবি আশা করেছিলেন, সদর স্ট্রীটে শহরের ভিড়ের মধ্যে যা দেখলেন হিমালয়ের উদার শৈলশিখরে তাই আরো ভাল করে গভীর করে দেখতে পাবেন। অন্ততঃ এই দৃষ্টিতে হিমালয় আপনাকে কেমন করে প্রকাশ করে তা জানা যাবে। কিন্তু, বিস্ময়ের সঙ্গে কবি বলছেন, 'সদর স্ট্রীটের সেই তুচ্ছ বাড়িটারই জিত হইল। হিমালয়ের উপরে চড়িয়া যখন তাকাইলাম তখন হঠাৎ দেখি, আর সেই দৃষ্টি নাই। বাহির হইতে আসল জিনিস কিছু পাইব এইটে মনে করাই বোধ করি আমার অপরাধ হইয়াছিল। নগাধিরাজ যত বড়োই অভ্রভেদী হোন না, তিনি কিছুই হাতে তুলিয়া দিতে পারেন না, অথচ যিনি দেনেওয়ালা তিনি গলির মধ্যেই এক মুহূর্তে বিশ্বসংসারকে দেখাইয়া দিতে পারেন। আমি দেবদারু-বনে ঘুরিলাম, ঝরণার ধারে বসিলাম, তাহার জলে স্নান করিলাম, কাঞ্চনশৃঙ্গার মেঘমুক্ত মহিমার দিকে তাকাইয়া রহিলাম—কিন্তু যেখানে পাওয়া সুসাধ্য মনে করিয়াছিলাম সেইখানেই কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। * * * প্রভাত-সংগীতের গান থামিয়া গেল শুধু তার দূর প্রতিধ্বনিস্বরূপ 'প্রতিধ্বনি' নামে একটি কবিতা দার্জিলিঙে লিখিয়াছিলাম।'[৬]

৩

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র নির্ঝর ও সমুদ্রের রূপকল্পটি স্বভাবতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কবি দুবার এই রূপকল্পটি ব্যবহার করেছেন। প্রথমবার 'ভগ্নহৃদয়ে'র উপহার-প্রসঙ্গে। দ্বিতীয়বার 'প্রভাতসংগীতে'। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'ভগ্নহৃদয়' কাব্যখানি কবি তাঁর নোতুন বৌঠানের নামেই উৎসর্গ করেছিলেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'উৎসর্গ' কবিতায় তিনি বলছেন :

> জীবন-সমুদ্রে তব জীবন-তটিনী মোর
> মিশায়েছি একেবারে আনন্দে হইয়া ভোর,
> সন্ধ্যার বাতাস লাগি ঊর্মি যত উঠে জাগি,
> অথবা তরঙ্গ উঠে ঝটিকায় আকুলিয়া
> জানে বা না জানে কেউ, জীবনের প্রতি ঢেউ
> মিশিবে—বিরাম পাবে—তোমার চরণে গিয়া।

এখানে সমুদ্রের সঙ্গে তটিনীর যে আনন্দ-মিলনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, হৃদয়ানুরাগের প্রেক্ষাপটেই তার কল্পনা। পক্ষান্তরে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' নির্ঝরিণী দূর হতে

মহাসাগরের যে ডাক শুনেছে নিসর্গানুরাগের পটভূমিতেই তার সার্থকতা। দুটির আবেদন দুই-'আমি'র কাছে। প্রকৃতিপ্রেমে যে-আমি আনন্দবিহ্বল সে-আমি থেকে 'ভগ্নহৃদয়ে'র মানবহৃদয়যুক্ত 'আমি' স্বতন্ত্র। কিন্তু দুজনের দুটি স্বতন্ত্র বাসনা একই রূপকল্পকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়েছে, এও কম বিস্ময়ের বিষয় নয়! হৃদয়-অরণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের ব্যাখ্যাটি মেনে নিলে 'ভগ্নহৃদয়ে'র উৎসর্গ কবিতাটি তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। অথচ কবি-জীবনের প্রৌঢ় অধ্যায়গুলিতে প্রমাণিত হয়েছে যে 'ভগ্নহৃদয়ে' উৎসর্গিত বাসনাই কবির মর্মলোকে অধিকতর সত্য হয়ে বিরাজমান ছিল।

নির্ঝরের রূপকল্প ব্যবহারপ্রসঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথাও মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে ভাষা দিতে গিয়ে নির্ঝরের রূপকটি বেছে নিয়েছিলেন। মহর্ষিদেবের জীবনেও নগাধিরাজের বিশাল অরণ্যে বিভ্রান্ত অবস্থায় একটি নির্ঝরই একটি অধ্যাত্ম-সংকেত রূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মহর্ষিদেবের জীবনে সেই ঘটনাটি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্মেরও বৎসর তিনেক পূর্বে, অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে। গৃহধর্মে বীতরাগ হয়ে তিনি তখন পর্বত-শিখরের নির্জনতায় ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ব্যাকুলতা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় অরণ্যালোকে একটি পার্বত্য নির্ঝরিণীর কাছে তিনি পেলেন সংসারে ফিরে যাবার জন্যে তাঁর অন্তর্যামীর আদেশ। সেই অভিজ্ঞতার কথা মহর্ষিদেব তাঁর আত্মজীবনীর উপান্ত পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। মহর্ষিদেব বলেছেন:

"আবার সেই শ্রাবণ-ভাদ্র মাসের মেঘ বিদ্যুতের আড়ম্বর প্রাদুর্ভূত হইল, এবং ঘন ঘন ধারা পর্বতকে সমাকুল করিল। * * এই সময়ে আমি কন্দরে কন্দরে নদী-প্রস্রবণের নব নব বিচিত্র শোভা দেখিয়া বেড়াইতাম। এই বর্ষাকালে এখানকার নদীর বেগে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রবাহিত হইয়া চলিয়া যায়। কেহই এ প্রমত্ত গতির বাধা দিতে পারে না। যে তাহাকে বাধা দিতে যায়, নদী তাহাকে বেগমুখে দূর করিয়া ফেলিয়া দেয়। •

একদিন আশ্বিন মাসে খদে নামিয়া একটা নদীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাহার স্রোতের অপ্রতিহত গতি ও উল্লাসময়ী ভঙ্গী দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। আহা! এখানে এই নদী কেমন নির্মল ও শুভ্র! ইহার জল কেমন স্বাভাবিক পবিত্র ও শীতল। এ কেন তবে আপনার এই পবিত্র ভাব পরিত্যাগ করিবার জন্য নীচে ধাবমান হইতেছে? এ নদী যতই নীচে যাইবে, ততই পৃথিবীর ক্লেদ ও আবর্জনা ইহাকে মলিন ও কলুষিত করিবে। তবে কেন এ সেই দিকেই প্রবল বেগে ছুটিতেছে? কেবল আপনার জন্য স্থির হইয়া থাকা তাহার কি ক্ষমতা? সেই সর্বনিয়ন্তার শাসনে পৃথিবীর কর্দমে মলিন হইয়াও ভূমিসকলকে উর্বরা ও শস্যশালিনী করিবার জন্য উদ্ধতভাব পরিত্যাগ করিয়া ইহাকে নিম্নগামিনী হইতেই হইবে।

এই প্রকার ভাবিতেছি, এই সময়ে হঠাৎ আমি আমার অন্তর্যামী পুরুষের গম্ভীর আদেশ-বাণী শুনিলাম, 'তুমি এ উদ্ধত ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই নদীর মত নিম্নগামিনী হও। তুমি এখানে যে সত্য লাভ করিলে, যে নির্ভর ও নিষ্ঠা লাভ করিলে, যাও, পৃথিবীতে গিয়া তাহা প্রচার কর।' "[৭]

মহর্ষিদেবের আত্মজীবনী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে 'প্রভাতসংগীতে'র অনেক পরে। কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের এই পথনির্দেশকারী দিব্য অভিজ্ঞতার কথা নিশ্চয়ই তাঁর আত্মপরিজনের কাছে গল্প করে থাকবেন। তাঁর মুখে এই অরণ্য-নির্ঝরের আধ্যাত্মিক সংকেতটির কথা শুনে তা কবিচিত্তে ওই রূপকল্পটি গড়ে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, এগার বৎসর বয়সে উপনয়নের পর রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন হিমালয়ের শৈলপ্রবাসে বক্রোটার শিখরচূড়ায় ঘনিষ্ঠ পিতৃসান্নিধ্য পেয়েছিলেন।

৪

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র সঙ্গে আর একটি কবিতা অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত হয়ে আছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' প্রকাশিত হয় '৮৯ বঙ্গাব্দের 'ভারতী'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। সেই সংখ্যারই 'ভারতী'র শেষ দুটি পৃষ্ঠায় আর একটি কবিতা প্রকাশিত হয়, তার নাম "অভিমানিনী নির্ঝরিণী"। কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু কবি অক্ষয় চৌধুরীর লেখা। 'প্রভাতসংগীতে'র প্রথম সংস্করণে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ "অভিমানিনী

নির্ঝরিণীকে”ও স্থান দিয়েছিলেন। এর কৈফিয়ত হিসাবে গ্রন্থকারের বিজ্ঞাপনে কবি বলেছিলেন, “‘অভিমানিনী নির্ঝরিণী’ নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে। ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ রচিত হইলে পর আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাহারই প্রসঙ্গক্রমে ‘অভিমানিনী নির্ঝরিণী’ রচনা করেন। উভয় কবিতাই ‘ভারতী’তে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম।” এই বিজ্ঞাপন থেকে এটুকু পাওয়া যাচ্ছে যে, ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ রচিত হবার পর ‘তারই প্রসঙ্গক্রমে’ ‘অভিমানিনী নির্ঝরিণী’ রচিত এবং ‘উভয়ের মধ্যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত’ হয়েছে। আজন্ম বন্ধনের কারণ হিসাবে ‘ভারতীতে একত্র প্রকাশে’র কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ওটুকু বাহ্য! ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে’র প্রসঙ্গক্রমেই ‘অভিমানিনী নির্ঝরিণী’র সৃষ্টি, এই জন্যেই উভয়ের আজন্ম বন্ধন। স্বভাবতঃই সহৃদয় রসিকের মনে এই প্রশ্ন জাগবে যে, এই নিগূঢ় প্রসঙ্গটা কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্বে কবিতাটি পড়া দরকার। কবিতাটি তাই এখানে উদ্ধারযোগ্য :

অভিমানিনী নির্ঝরিণী

মহান জলধিজলে, প্রাণ ঢেলে দিব ব’লে
সুদূর পর্বত হোতে আসিনু বহিয়া,
পুরাতে প্রেমের সাধ, না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা, কত বিঘ্ন—দাপটে ঠেলিয়া
এই ত সাগর জলে মিশিনু আসিয়া!—
কিন্তু—কিন্তু তবে কেন, আশাতে নিরাশা হেন,
কিছুই আশার মত হ’ল না ত হায়,—
যাহার আশ্রয় পেলে, থাকিব রে হেসে খেলে
কই রে?—সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
সুগম্ভীর গরজনে, বহে সে আপন মনে
বহে সে দিগন্ত ভেদি কে জানে কোথায়,
কই রে! সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
আপনে আপনা ভুলে, প্রমত্ত তরঙ্গ তুলে
বায়ু সনে কত খেলা আপনি খেলায়,
কখন প্রশান্ত মতি, কভু বা উৎসাহে অতি
আবেশে ঢলিয়া পড়ে বিবশা বেলায়;
কই রে!—সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
এক ধারে পড়ে থাকি, নিজ মান নিজে রাখি
তাহারি উল্লাসে যেন আমারো উল্লাস,
সরোষ নির্ঘোষে তার, আমারো দু পারাপার
ঢেকে ফেলি, ভেঙ্গে ফেলি তুলিয়ে উচ্ছ্বাস।
রাখিতে তাহার মন, প্রতিক্ষণে সযতন,
হাসে হাসি, কাঁদে কাঁদি—মন রেখে যাই,
মরমে মরম ঢাকি, তাহারি সম্মান রাখি,
নিজের নিজত্ব ভুলে তারেই ধেয়াই,
কিন্তু সে ত আমা পানে ফিরেও না চায়!
নিতান্ত যাহারি লাগি, হইলাম সর্বত্যাগী
সে ত রে আমার পানে ফিরেও না চায়,
ভীম দর্পে করে ত না ভ্রূক্ষেপ আমায়!
পর্বতে মায়ের কোলে ছিনু যবে শিশুকালে
কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,
হ’ল সার অশ্রু ঢালা, নিরাশ মরম জ্বালা,
দিবানিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ।
যখন ঝটিকা উঠে গ্রাম পল্লী যায় লুটে
ছিন্নভিন্ন মতিচ্ছন্ন কোরে ফেলে মোরে,
বিসর্জি অযুত ধারা মত্ত পাগলিনী পারা
ঝাঁপিয়া সাগরে পড়ি আশ্রয়ের তরে,
আশ্রয় কে দিবে আর? প্রেমোন্মত্ত পারাবার
দুরন্ত ঝটিকা সনে নিজে মেতে রয়,
নিজের গাম্ভীর্য ভুলি, সফেন তরঙ্গ তুলি
আলিঙ্গন আশে, পেতে দেয় রে হৃদয়!
চপলা কটাক্ষ-বাণে প্রতি কটাক্ষটি হানে,
ঝটিকা-উচ্ছ্বাস সনে মেশায় উচ্ছ্বাস!
আহ্লাদের গরজনে, কাঁপে দিগঙ্গনাগণে
ওঠে পড়ে ঘন ঘন মর্মভেদী শ্বাস।
আমি সে ঝঞ্ঝার তোড়ে, কোথা যে রয়েছি পোড়ে
কোথা যে প্রাণের প্রাণ মিশালো আমার,
সে দিকে কি ভ্রূক্ষেপও আছে গো তাঁহার?

তবে কি মায়ের কোলে উজানে যাইব চ’লে
সুখ-সাধ সুখ আশা করি বিসর্জন?
সহিতে পারি না আর প্রণয়েতে অত্যাচার
মরমে ঢাকে না আর জলন্ত যাতন।

কি হবে আমার আর নক্ষত্র-গ্রথিত হার,
চম্পক চামেলী বেলা অলকা ভূষণ।
আঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে তরল তরঙ্গ ভরে
নেচে নেচে বহে যেতে সাগর সঙ্গম!

* * *

সেদিন কোথায় আর, অন্ধকার অন্ধকার,
ঘেরিয়াছে চারিধার জমাট আঁধারে,
শৈশব স্বপনগুলি, সব যেন গেছি ভুলি,
ঢলিয়ে পড়েছি প্রেমে প্রেম-পারাবারে;
উজানে বহিতে তাই তিলমাত্র শক্তি নাই,
যাহাতে মিশেছি এসে মিশিব তাহায়!
সঁপিয়াছি প্রাণ মন, সঁপিয়াই প্রাণ মন
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায়!
দেখিব বিকায়ে হিয়ে পরাণ সর্বস্ব দিয়ে
গম্ভীর সাগরপ্রেম পাওয়া কি না যায়!
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায়!
না জুড়াক মন প্রাণ, নাহি পাই প্রতিদান,
জ্বলন্ত যাতনে হৃদি হোক দগ্ধ প্রায়,
তবুও উজানে ফিরে যেতে সাধ হয় কিরে!
প্রাণ মন বিসর্জিয়ে রহিব হেথায়,
যাহাতে মিশেছি প্রেমে মিশিব তাহায়!

বলাই বাহুল্য, নির্ঝরিণীর রূপকে একটি বিশেষ নারীচিত্তই এ কবিতার আলম্বন। কিন্তু কে এই অভিমানিনী নারী? আমরা পূর্বে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে'র নবম ও দশম সর্গের 'আসনদাত্রী দেবী' ও 'পতিব্রতা' থেকে উদ্ধৃতি আহরণ করে দেখেছি যে, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর জন্যে বিহারীলাল জ্যোতিরিন্দ্রনাথকেই ভৎর্সনা করেছেন। 'কে ছিঁড়েছে আশালতা? কি মানে মানিনী গো?' (১০।৭)—এই জিজ্ঞাসার পরে কবি লিখেছেন:

আজি মা কিসের তরে
হাসি নাই বিম্বাধরে,
মলিন বিষণ্ণমুখী, নেত্রে কেন অশ্রুজল?
ভাল মানুষের ভালে
সুখ নাই কোন কালে,
কঠোর নিয়তি, আরো কতই কাঁদাবি বল? ১০।৮

এস না ধরায়—আর এস না ধরায়।
পুরুষ কিম্ভুতমতি চেনে না তোমায়।
মন প্রাণ যৌবন—
কি দিয়া পাইবে মন।
পশুর মতন এরা নিতুই নতুন চায়।
এস না ধরায়!

এর পর সংশয় থাকে না যে, বিহারীলালের 'মানিনী পতিব্রতা' আর অক্ষয় চৌধুরীর 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' একটি আরেকটির প্রতিধ্বনিমাত্র। আলংকারিক পরিভাষায় মান 'সহেতু'ই হোক্ আর 'নির্হেতু'ই হোক্, 'অভিমানিনী নির্ঝরিণী' কবিতার সমাসোক্তি অলংকারে 'মানময়ী' কাদম্বরী দেবীর হৃদয়বেদনাই অভিব্যঞ্জিত হয়েছে।

৫

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সদর স্ট্রীটে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' রচনার অব্যবহিত পরেই কবি জ্যোতিদাদাদের সঙ্গে দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফেরার পর তাঁরা আর সদর স্ট্রীটের বাসায় ফিরে যান নি। তার বদলে চোদ্দ নম্বর সার্কুলার রোডের বাসাবাড়িতে এসে উঠলেন। সেখানে সাহিত্যচর্চার জন্যে 'সমালোচনী সভা' স্থাপিত হয়েছে। বাড়িতে পার্টি, গানের মজলিস প্রায়ই চলছে। সত্যেন্দ্রনাথও কিছুদিনের জন্যে ছুটি নিয়ে এসেছেন মহা আনন্দে দিনগুলি কাটতে লাগল। এরই মধ্যে বিদ্বজ্জন সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে 'কালমৃগয়া' অভিনীত হল। রবীন্দ্রনাথ অন্ধমুনি এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দশরথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন।

পরবর্তী গ্রীষ্মে 'সদর স্ট্রীটের দল' কিছু দিনের জন্যে কারোয়ারে সমুদ্রতীরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জজ। কারোয়ার বোম্বাই প্রেসিডেন্সির দক্ষিণাংশে স্থিত কর্নাটের প্রধান শহর। এলালতা ও চন্দনতরুর জন্মভূমি মলয়াচলের দেশ কারোয়ার। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি 'কারোয়ার' অধ্যায়ে লিখেছেন, এই ক্ষুদ্র শৈলমালাবেষ্টিত সমুদ্রের বন্দরটি এমন নিভৃত এমন প্রচ্ছন্ন যে, নগর সেখানে নাগরীমূর্তি প্রকাশ করতে পারেনি। অর্ধচন্দ্রাকারে বেলাভূমি অকূল নীলাম্বুরাশির অভিমুখে বাহু দুটি প্রসারিত করে দিয়েছে—সে যেন

[অ]নন্তকে আলিঙ্গন করে ধরবার একটি মূর্তিমতী ব্যাকুলতা। [প্র]শস্ত বালুতটের প্রান্তে বড় বড় ঝাউগাছের অরণ্য, এই [অ]রণ্যের এক সীমায় একটি ক্ষুদ্র নদী তার দুই গিরিবন্ধুর [উ]পলরেখার মাঝখান দিয়ে সমুদ্রে এসে মিশেছে। [']সোনার তরী'র বসুন্ধরা কবিতায় সমুদ্রের তটে ছোট ছোট [নী]লবর্ণ পর্বতসংকটে যে গ্রামখানির বর্ণনা আছে মনে হয় [তা]তে কারোয়ারের স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। শুক্লপক্ষের এক [গো]ধূলিতে ছোট্ট একটি নৌকো করে নদীর উজানে [শি]বাজীর একটি গিরিদুর্গে নৈশ অভিযানের কাহিনীটিও [ক]বি 'জীবনস্মৃতি'তে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। একটি [চা]ষীর কুটিরে বেড়া-দেওয়া পরিষ্কার নিকোনো আঙিনায় [আ]সন পেতে বসে অপূর্ব তৃপ্তির সঙ্গে যে আহার করেছিলেন [সে] কথাও ভোলেন নি। সেদিন জ্যোৎস্নানিশীথে [স্ব]প্নাচ্ছন্ন প্রত্যাবর্তন, এবং বাড়ি পৌছে ঘুমের চেয়েও [কো]ন্ গভীরতার মধ্যে যে তাঁর ঘুম ডুবে গিয়েছিল তার [চি]রকালের সাক্ষী হয়ে রয়েছে 'ছবি ও গানে'র 'পুর্ণিমায়' [ক]বিতাটি। কারোয়ারের স্মৃতি রবীন্দ্রমানসে স্মরণীয় হয়ে [থা]কবার কথা, কেন না নোতুন বৌঠানের সঙ্গে এই তাঁর [শে]ষ প্রবাস-ভ্রমণ। কারোয়ারের একটি বিস্ময়কর স্মারকচিহ্ন [কা]লের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। একটি কাচমণি [পা]থরকে হৃদয়ের আকার দিয়ে কবি তাতে কবিতার [দু]টি চরণ স্বহস্তে খোদাই করেছিলেন। পয়ারবন্ধে গ্রথিত [সে]ই ষোড়শাক্ষর পদযুগ্মক হল :

> পাষাণ হৃদয় কেটে
> খোদিনু নিজের হাতে
> আর কি মুছিবে লেখা
> অশ্রুবারিধারাপাতে।

[এ]ই পাষাণ-হৃদয়টি রবীন্দ্রনাথ অক্ষয় চৌধুরীকে উপহার [দে]ন।[৮] এ থেকে আবার প্রমাণ হবে যে, অক্ষয় চৌধুরী [র]বীন্দ্রনাথের হৃদয়রোগের শুধু সংবাদই রাখতেন না, [ম]গ্নপ্রাণ সহৃদয়ের মত তিনি তরুণ কবির নিভৃত চেতনার [অ]ন্তরঙ্গ শরিকও ছিলেন। এই পদযুগলের অর্থ আবিষ্কার [ক]রার চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। গুহ্য ব্যাপারে অন্তরঙ্গজনের [ম]ধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে যে সংকেত-ভাষণ চলে-এখানে তাই [ব্য]বহৃত হয়েছে। তবু 'সংন্ধ্যাসংগীতে'র 'পাষাণী' কবিতার [স]ঙ্গে এর আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য দেখে বিস্মিত হতে হয়। অনুরক্ত কবিপ্রেমিক তাঁর আরাধ্যা দেবীকে নিষ্করুণা পাষাণী, এই অভিযোগ দিয়ে সে কবিতায় বলেছিলেন :

> যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
> তুমি তো কেবল তার পাষাণ-প্রতিমাখানি !
> তোমার হৃদয় নাই, চোখে নাই অশ্রুধার,
> কেবল রয়েছে তব পাষাণ আকার তার।

তাই কবি তাঁকে অস্বীকার করার ছল করে আক্ষেপানুরাগের ভঙ্গিতে বলছেন—

> তুমি নও, সে জন তো নও,
> তবে তুমি কোথা হতে এলে ?
> এলে যদি এস তবে কাছে,
> এ হৃদয়ে যত অশ্রু আছে,
> একবার সব দিই ঢেলে,
> তোমার সে কঠিন পরান
> যদি তাহে এক তিল গলে,
> কোমল হইয়া আসে মন
> সিক্ত হয়ে অশ্রু জলে জলে !

এই পংক্তিনিচয়ের সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে, কবিকর্তিত পাষাণ-হৃদয়টির সঙ্গে এই 'পাষাণী'র একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পৃক্তি রয়েছে।

৬

কারোয়ার থেকে তাঁরা ফিরলেন জাহাজে করে। এবার সবাই উঠলেন চৌরঙ্গির নিকটবর্তী ২৩৭ লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি বাগান-বাড়িতে। সত্যেন্দ্রনাথ এই বাগান-বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। 'প্রভাতসংগীতে'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'ছবি ও গান'-এর প্রথম পর্যায় কারোয়ারে লেখা, আর শেষ পর্যায় লোয়ার সার্কুলার রোডের এই বাগান-বাড়িতে। এ সময়কার কবির মনোভাব পূর্বোক্ত প্রমথ চৌধুরীকে লেখা কবির পত্র-খানিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কি মাতাল হয়েই যে কবি 'ছবি ও গান' লিখেছিলেন তার বর্ণনা দিয়ে বলছেন, "আমি তখন দিনরাত পাগল হয়ে ছিলুম। আমার সমস্ত বাহ্যলক্ষণে এমন সকল মনোবিকার প্রকাশ পেত যে তখন যদি তোমরা আমাকে প্রথম দেখতে তো মনে করতে এ ব্যক্তি কবিত্বের ক্যাপামি করে বেড়াচ্ছে। আমার

সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। * * সত্যি কথা বলতে কি, সেই নবযৌবনের নেশা এখনও আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। ছবি ও গান পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে এমন আর কোনও পুরোনো লেখায় হয় না। তার থেকে বুঝতে পারি সে নেশা এখনও এক জায়গায় আছে—তবে কিনা, সে নেশা

Hath been cooled a long age
In the deep delved heart.

'ছবি ও গান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল '৯০ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে। তার মাস তিনেক পূর্বে [২৪শে অগ্রহায়ণ] কবির বিবাহ হয়। 'ছবি ও গানে'র পূর্বেকার 'ভগ্নহৃদয়', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র', 'সন্ধ্যাসংগীত' ও 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র মত এই গ্রন্থখানিও কাদম্বরী দেবীকেই উৎসর্গ করা। উৎসর্গে কবি লিখেছিলেন, 'গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিত, তাঁহারই চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।'

কাদম্বরী দেবীর জীবদ্দশায় 'ছবি ও গান'ই কবির শেষ উপহার। উৎসর্গের ভাষা থেকে আমরা জানতে পারছি, এই গ্রন্থের কাব্যপুষ্পগুলি তাঁরই নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে একটি একটি করে ফুটে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'সন্ধ্যাসংগীতে'র 'উপহার' কবিতাটিকে পুনরায় স্মরণ করতে হবে। মনে হয়, 'সন্ধ্যাসংগীত' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে কবি কিছুদিন তাঁর নোতুন বৌঠানের কাছ থেকে দূরে ছিলেন, তাই বিরহকাতর কবি বলেছেন,

বলো দেখি কত দিন আস নি এ শূন্য প্রাণে,
বলো দেখি কত দিন চাওনি হৃদয়পানে,
বলো দেখি কত দিন শোন নি এ মোর গান,
তবে সখী গান-গাওয়া হল বুঝি অবসান।

এই নিষ্ফল শূন্যতার আশু-অবসান কামনা করে 'উপহারে'র শেষ স্তবকে কবির মিনতি ছিল

সেই পুরাতন চোখে মাঝে মাঝে চেয়ো সখী
উজলিয়া স্মৃতির মন্দির,
এই পুরাতন প্রাণে মাঝে মাঝে এসো সখী
শূন্য আছে প্রাণের কুটির।
নহিলে আঁধার মেঘরাশি
হৃদয়ের আলোক নিবাবে,
একে একে ভুলে যাব সুর,
গান গাওয়া সাঙ্গ হয়ে যাবে।

'ছবি ও গান'-এর উৎসর্গ পড়ে বুঝতে পারা যায় কবির প্রার্থনা অপূর্ণ থাকে নি। তাঁরই নয়নকিরণে কবির হৃদয়কাননের কুসুমগুলি প্রতিদিন বিকশিত হয়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'উপহারে'র দুটি বাক্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। প্রথম বাক্যে দেখা যাচ্ছে, কবি এক বসন্তের ফুল নিয়ে আর বসন্তে মালা গেঁথেছেন। সেই মালা 'বঁধুর গলায়' পরিয়ে দেওয়ার সহজাত বাসনা সংবৃত হয়ে দ্বিতীয় বাক্যে ফুলগুলি 'দেবতা-চরণে' নিবেদিত হল। অর্থাৎ 'বৈষ্ণব কবিতা'য় কবি যে কথা বলেছিলেন—'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'—এই ছিল তাঁরও ব্যক্তিজীবনের নিয়তি। বস্তুতঃ চেতনার স্তরভেদে কবির কাছে তাঁর নোতুন বৌঠানের ছিল তিনটি সত্তা। অনুরক্ত ভক্তের কাছে তিনি ছিলেন দেবী, রসিক কবির প্রেমকল্পনায় তিনি রহঃসখী, আর তরুণ প্রেমিকের হৃদয়বাসনায় কৌতুকময়ী মানসসুন্দরী। অনুক্ষণ সান্নিধ্যের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন চির-অপ্রাপণীয়া, নিত্যনবীনা। অন্তহীন বিরহের আলম্বনস্বরূপিণী এই রহস্যময়ীর কথা স্মরণ করে পরিণত বয়সেও কবিকণ্ঠে তাই চির-অতৃপ্ত বাসনার 'আক্ষেপ' ধ্বনিত হয়ে উঠেছে: 'তবু ঘুচিল না, অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।'

৭

'ছবি ও গানের' 'উপহার' প্রসঙ্গে 'বৈষ্ণব কবিতা'র ভাবানুষঙ্গ মনে পড়ার আরও একটি নিগূঢ় হেতু রয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের প্রথম ও শেষ কবিতা দুটি ছিল ভানুসিংহ ঠাকুরের দুটি পদ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কবি তাঁর প্রত্যেক সংকলনের প্রথমে কিংবা শেষে, কখনো কখনো উভয় ক্ষেত্রেই, এমন কবিতা নির্বাচিত করেন যার মধ্যে গ্রন্থের মর্মকথা বিধৃত থাকে। 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে আরম্ভ করে, দু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, এই রীতি সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগবে, কবি কেন 'ছবি ও গানে'র প্রথমে ও শেষে ভানুসিংহের দুটি পদ নির্বাচিত করে-

ছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর, 'ছবি ও গান' থেকে কবিতা দুটি বর্জিত হয়েছে। এই বর্জনে 'ছবি ও গান' শুধু খণ্ডিতই হয় নি, তার মর্মকথাও অবলুপ্ত হয়েছে। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বে বলেছি, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিসীমায় যে হ্লাদিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, ভানুসিংহ ঠাকুরের ছদ্মবেশে তিনি সেই হ্লাদৈকময়ী লীলাসঙ্গিনীর মাধুর্যলীলাই আস্বাদন করেছেন বৈষ্ণবের নিত্যলীলার রূপককে আশ্রয় করে।' ছবি ও গানের আদি ও অন্তে আমরা কবির সেই মানসরাধাকেই দেখতে পাচ্ছি। সুনির্বাচিত পদ দুটিতে রাধার মিলন-বিরহ-লীলারই গীতালেখ্য। প্রথম কবিতাটি [আজু সখি, মুহু মুহু গাহে পিক কুহু কুহু] বসন্তের-মাদক-বিহ্বলতায় মিলন-বিলাসের ছবি :

আজু মধু চাঁদনী, প্রাণ-উনমাদনী,
শিথিল সব বাঁধনী, শিথিল ভই লাজ।
বচন মৃদু মরমর, কাঁপে রিঝ থরথর,
শিহরে তনু জরজর, কুসুমবন-মাঝ॥

শেষের কবিতাটি [মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম-সমান] রবীন্দ্র-কাব্যানুরাগীদের নিকট সুপরিচিত। কবিও তাঁর 'সঞ্চয়িতা'র সর্বপ্রথমে কবিতাটিকে স্থান দিয়ে কবিবিধাতার প্রথম সার্থক আদিসৃষ্টির [সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ] দুর্লভ মর্যাদা দিয়েছেন। এখানে রাধা বিরহিণী। দুর্বিষহ বিরহে তিনি মৃত্যুকেই 'নিরদয় মাধবে'র বদলে বরণ করবেন বলে সংকল্প করে বলছেন :

মরণ রে, শ্যাম তোহারই নাম।
চিরবিসরল যব নিরদয় মাধব
তুঁহু ন ভইবি মোয় বাম।
আকুল রাধা-রিঝ অতি জরজর,
ঝরই নয়ন-দউ অনুখন ঝরঝর,
তুঁহু মম মাধব, তুঁহু মম দোসর,
তুঁহু মম তাপ ঘুচাও।
মরণ তু আও রে আও॥

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে এই পদটি চন্দননগরে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে লেখা। এই পদে অভিব্যক্ত মৃত্যুবাসনা শুধু এই একটি কবিতারই বিচ্ছিন্ন উপলব্ধি নয়। এই সময়কার 'তারকার আত্মহত্যা', 'অনন্ত মরণ' প্রভৃতি আরও দু'একটি রচনায় মৃত্যুচেতনা কবিমানসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই চেতনার হেতু কি ও উৎস কোথায়, কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুপ্রসঙ্গে পরে তা আলোচিত হবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পদটিতে দেখা যাচ্ছে, মৃত্যু কামনা করছেন বলে ভানুসিংহ তাঁর রাধাকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন :

ভানুসিংহ কহে "ছিয়ে ছিয়ে রাধা,
চঞ্চল হৃদয় তোহারি,
মাধব পহু মম, পিয় স মরণসে
অব তুঁহু দেখ বিচারি॥"

কবিতাটি যেন দৈব-সংকেতের মত 'ছবি ও গানে'র অন্তিম সংগীত রূপে বিন্যস্ত হয়েছিল। কেন না 'ছবি ও গান' প্রকাশের মাস দুই পরেই কবির মানস-রাধা মৃত্যু বরণ করলেন। ভানুসিংহের কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করার মত চিত্তের অবস্থা তাঁর ছিল না। চিরবিস্মরণশীল নিষ্করুণ মাধবের চেয়ে তাপবিমোচন মরণের কোলই তাঁর কাছে অমৃতের নিলয় বলে মনে হয়েছে।

[ক্রমশ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ জীবনস্মৃতি, পৃ ১৩৬।
২ মানুষের ধর্ম, পৃ. ১০৫।
৩ তদেব, পৃ. ১০৬-১০৭।
৪ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৪১।
৫ চিঠিপত্র-৫, পৃ. ১৩৩-১৩৪।
৬ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১৩৮-১৩৯।
৭ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী [সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত], পৃ. ২৮১-২৮২।
৮ দ্রষ্টব্য : Calcutta Municipal Gazette, Tagore Memorial Special Supplement, Sept. 13, 1941, p. vi.

প্রসঙ্গ কথা

সমাজ-সমালোচনা

নারায়ণ চৌধুরী

আমাদের সাহিত্যে সমালোচনা বলতে আমরা প্রধানতঃ সাহিত্য-সমালোচনাকে বুঝে থাকি। একেই আমাদের ভাষায় সমালোচনার পরিমাণ ও মান নগণ্য; তার উপর যে সামান্য সমালোচনাও হয় তা-ও বিশুদ্ধ সাহিত্যালোচনার খাতে প্রবাহিত। আমাদের সাহিত্যে সমাজ-সমালোচনা নেই কেন। তা নিয়ে লেখকেরা মাথা ঘামান না কেন। এটি বাংলা সাহিত্যের একটি মূলগত ত্রুটি। এই বিচ্যুতির শোধন না হওয়া পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পক্ষে কোন ক্রমেই পূর্ণবয়স্ক সাহিত্যের গৌরব দাবি করা চলে না।

সমাজ-সমালোচনা বলতে কী বোঝায় সেটি একটু পরিষ্কার হওয়া মন্দ নয়। সমাজ-সমালোচনা কথাটির মধ্যেই অবশ্য ওই কথার অর্থ বেশ-কিছুটা নিহিত আছে, তা হলেও তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যেহেতু এই বস্তুটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব নিবিড় নয় সেইজন্যই এই ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণ আবশ্যক। সমাজ-সমালোচনা অর্থাৎ সমাজের নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্যায় অবিচার অসংগতির সমালোচনা। যে সমাজ-ব্যবস্থার আওতায় আমরা বাস করছি তার অন্তর্নিহিত অসাম্য ও বৈষম্য সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে, বর্তমান সমাজ অন্যায় অবিচার শোষণ ও অত্যাচারে পূর্ণ। বহুর বঞ্চনার ভিত্তির উপর কতিপয় সুবিধাভোগীর অপরিমিত ঐশ্বর্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাকার উত্তুঙ্গ করে বর্তমানের প্রমত্ত সমাজ অস্থির পদক্ষেপে অনিশ্চিত গতিতে সম্মুখে এগিয়ে চলবার চেষ্টা করছে। যে কোন মুহূর্তে এই নড়বড়ে ইমারত তাসের ঘরের মত হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। সমাজের এই অস্থির স্বরূপ সম্পর্কে সকলেই প্রায় একমত, অথচ এই ঐকমত্যের প্রতিফলন সাহিত্যে বড় একটা দেখা যায় না। কথা-সাহিত্যিক ও কবিরা তবু বরং অনেক সময় তাঁদের লেখায় সমাজের নানাবিধ বিচ্যুতির প্রতি পরোক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন, কিন্তু সমালোচকশ্রেণী এই বিষয়ে প্রায়-নীরব। তাঁরা তথা কথিত সাহিত্য-সমালোচনা নিয়ে মেতে আছেন, কিন্তু সমাজ-সমালোচনায় কারও বড় একটা উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের সাহিত্যের প্রকাশনা-জগতে মাসে মাসে প্রায় নিয়মিত ভাবেই সমালোচনার বই প্রকাশিত হচ্ছে। এই সকল গ্রন্থের শ্রেণীস্বরূপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, তাদের শতকরা নিরনব্বুইটি বই-ই সাহিত্যের কোন-না-কোন দিক বা বিভাগের আলোচনা। অথবা বিশেষ বিশেষ গ্রন্থকারের আলোচনা। সমাজ-সমালোচনামূলক রচনা-সংবলিত গ্রন্থ খুব কমই চোখে পড়ে। আদৌ চোখে পড়ে না বললেই বোধ করি পরিস্থিতির সত্যকার বর্ণনা করা হয়। সকল মানুষেরই বোধ হয় কোন-না-কোন বিষয়ে বর্ণান্ধতা-জাতীয় দুর্বলতা আছে। আমারও আছে। আধুনিক সমাজের পটভূমিতে, যখন পুরাতন অবস্থা-ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয়ে গেছে, এই বিশেষ সামাজিক কাঠামোয় কেউ যখন প্রাচীন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের নবরস ভাব বি[illegible] ইত্যাদি নিয়ে সবিস্তার ব্যাখ্যান ফেঁদে প্রমাণ-সাইজ বই লেখেন, আমার খুন চেপে যাবার মত অবস্থা হয়। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের মহিমা খর্ব করবার অভিপ্রায়ে এ কথা বলছি না, এ কথা বলছি এই যুগ এবং পুরাতন যুগের মধ্যে মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর যে বিরাট্ পার্থক্য বিদ্যমান তাকে পরিস্ফুট করবার জন্য। কী হবে এই কালেজীয় অধ্যাপক-সুলভ ধ্বনি রস ইত্যাদির ফেনায়িত বর্ণনায়, যদি না ওই-সব সূত্রের ফলিত প্রয়োগের বিস্তার সঙ্গে আলোচকের ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকে? সাহিত্য-সমালোচকেরা পুরাতন আলঙ্কারিকদের উদ্ধৃতি উৎকলন করে নবরসের ব্যাখ্যানে তৎপর, এদিকে আধুনিক সাহিত্যের কোনও গ্রন্থকারের রচনাবলীর ভিতর কোন্ কোন্ জায়গায় কোন্ কোন্ রসের প্রয়োগ হয়েছে সে সম্বন্ধে চেপে ধরলে আমি জোর করে বলতে পারি এই

জাতীয় অধিকাংশ সাহিত্য-সমালোচকই নিরুত্তর বনে যাবেন। এ রকম ফলিত জ্ঞানবর্জিত সাহিত্যাদর্শ বিশ্লেষণের সার্থকতাই বা কোথায়, প্রয়োজনটাই বা কী।

সমসাময়িক সমাজের এত-এত প্রতিকারহীন অন্যায় অবিচার অসাম্য লেখকদের মনোযোগ যাজ্ঞা করে বেড়াচ্ছে, সেদিকে কারও মন নেই ; সব আদাজল খেয়ে লেগেছেন প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের বর্ণন করতে, কিংবা শরৎ-সাহিত্যে নারী বা বঙ্কিম-সাহিত্যে হাস্যরস বা ওই-জাতীয় অন্য কোন বই লিখতে। কোন এক সাম্য-তন্ত্রী লেখক সম্প্রতি কালিদাসের কাব্যে কতপ্রকার ফুলের বর্ণনা আছে তাই নিয়ে পত্রান্তরে সবিস্তার গবেষণা করেছেন। তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর উপজীব্য বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রমাণ নেই, এদিকে কালিদাসের কাব্যে ফুলের শত কাহন বর্ণনা। কলাকৈবল্যবাদী অস্কার-ওয়াইল্ড একদা সেক্‌শপীয়রের নাটকে কত রকমের পোশাকের বর্ণনা আছে তার ফিরিস্তি দাখিল করে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এ-ও অনেকটা সেই জাতীয় ব্যাপার। এ মজ্জাগত বুর্জোয়া প্রবণতা তথা সমাজ-অচেতনতারই দ্যোতক। এ রকম বিষয় নিয়ে যাঁরা ভাবেন তাঁদের সামাজিক অসংগতি ও অন্যায় যে খুব বেশী পীড়া দেয় তা মনে হয় না। মুখে বামপন্থী রাজনৈতিক তন্ত্রে আস্থা ঘোষণা করলে কী হবে, আসলে মনটি যে পড়ে আছে তথাকথিত চাঁদের হাসিতে ফুলের মেলায় নদীর কলতানে আর পাখির গানে। এরকম মানুষকে যে অরূপ-লোকের ভাবে ভোলা সৌন্দর্যের তানে পরিপূরিত বাঁশীর মনমাতানো সুর হাতছানি দিয়ে ক্রমাগত ডেকেই চলেছে, সমাজের দিকে দু চোখ মেলে তিনি তাকিয়ে দেখবেন তার অবসর কই। মজ্জাগত বুর্জোয়া শ্রেণীচৈতন্যসম্পন্ন মানুষেরা যখন ফ্যাশানের বশবর্তী হয়ে সমাজতন্ত্রে বা সাম্যতন্ত্রে বিশ্বাস ঘোষণা করেন তখন এরকম বিসদৃশ অবস্থারই উদ্ভব হয়।

সমাজ-সমালোচনামূলক সাহিত্য বলতে আমি ঠিক কী বোঝাতে চাইছি তা দৃষ্টান্ত-প্রয়োগের দ্বারা এবার পরিস্ফুট করতে চেষ্টা করব। আমাদের দৈনিক ও অন্যান্য ধরনের সাময়িক পত্রিকাগুলিতে সমাজের কুসংস্কার মূঢ়তা ও অপরাপর গলদ সম্পর্কে আলোচনা না হয় এমন নয়। কোন কোন রাজনৈতিক লেখককেও এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে ও-জাতীয় বিষয় অবলম্বনে ছোট ছোট পুস্তিকাও (pamphlet) প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর সবই টুকরো-টুকরো রচনা। আর তা ছাড়া এসব রচনায় সাহিত্যের সৌন্দর্য প্রায়শঃ থাকে না। সুতরাং এগুলিকে সমাজ-সমালোচনা সাহিত্যের পরিধি-ভুক্ত করা চলে না। সাময়িক পত্রাদিতে অর্থাৎ সাহিত্যের মেখলায় হয়তো কিছু-কিছু সমাজ-সমালোচনা-মূলক রচনার দেখা মেলে, কিন্তু খাস সাহিত্যের এলাকার ভিতর সমাজ-সমালোচনার পরিপ্রকাশ কোথায়। আমরা যে সব বিশুদ্ধ সাহিত্যরস পান করে নেশায় বিভোর শিবনেত্র হয়ে আছি, সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলির দিকে চোখ মেলে তাকাবার আমাদের অবসর কই। কাব্যমীমাংসা ধ্বনিবাদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্যে নামরস, প্রত্যক্ষদর্শীর দৃষ্টিতে রূপ-সনাতন, মঙ্গলকাব্যে লৌকিক আচার, রবীন্দ্র-সাহিত্যে মৃত্যু ও উপনিষদের বাণী, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ক্রমপ্রবাহ বাংলা লিরিকের ধারা ইত্যাদি বিষয়ক রচনা লিখতে আমাদের কলম চুলবুলিয়ে ওঠে, এদিকে ইংরেজ শাসনের আওতায় গত দু শো বছরে আমাদের সমাজের কী কী পরিবর্তন হয়েছে, ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সূত্র ধরে আমাদের জাতীয় জীবনে কী কী অন্যায় ও বিজাতীয় অভ্যাসের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, ধনতান্ত্রিক সমাজের শোষণের প্রকৃত রূপ ও ধারা-ধরন কী, অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থার নিষ্পেষণে জাতীয় শক্তির কী পরিমাণ অপচয় ঘটছে এসব বিষয়ে পাঠকসাধারণকে সচেতন করবার মত লেখক আমাদের সমালোচক-শ্রেণীর মধ্যে মোটে দেখতেই পাওয়া যায় না। আমরা যদি এসব সম্বন্ধেই অবহিত হব তবে নবরসের ব্যাখ্যান করবে কে, বাউল গানে সহজিয়া তত্ত্ব বা তন্ত্র-সাহিত্যের ভূমিকা লিখবে কে ?

বলা হবে, এ সব সমাজবিজ্ঞানের এলাকার বিষয়, সমাজবিজ্ঞানী লেখকেরাই সে সবের আলোচনা করবেন। সাহিত্যের বিষয়ের সঙ্গে এসব প্রসঙ্গকে গুলিয়ে ফেলার যৌক্তিকতা বোঝা যায় না। আজ্ঞে না মহাশয়, লিখতে জানলে এসব বিষয়কেই উপযুক্ত সাহিত্যসম্মত রীতিতে প্রকাশ করা যায়। বিভিন্ন সাহিত্যের বড় বড় লেখকেরা

তা করেও গেছেন। ফরাসী সাহিত্যের ভলতেয়ারের কথা স্মরণ করুন। আঠার শতকের এই বিদ্যুজ্জিহ্ব প্রতিভাশালী সমাজ-সমালোচক লেখক ফরাসী রাজতন্ত্র যাজকতন্ত্র অভিজাততন্ত্র ও এই তিন তন্ত্রের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গোটা জীবন অক্লান্ত লেখনী পরিচালনা করে গেছেন। ফরাসী বিপ্লবের তিনিই হলেন অন্যতম প্রধান অগ্র-পুরোহিত। ভলতেয়ার রাজনৈতিক পুস্তিকালেখক (political pamphleteer) মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, অপিচ কবি ঐতিহাসিক গবেষক বিজ্ঞানী। সর্বপ্রকার স্বেচ্ছাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর ছিল আমৃত্যু আপোষহীন সংগ্রাম। অন্যায়-অসহিষ্ণুতা ছিল তাঁর মজ্জায় মজ্জায়। আর এই সাংগ্রামিকতা আর অসহিষ্ণুতাকেই তিনি দীর্ঘ জীবনের সাধনায় সার্থক সাহিত্যরূপ দিয়ে গেছেন। তিনিও তো সমালোচক ছিলেন, ক্রবাদুরদের প্রেমগীতি যা মধ্যযুগীয় ফরাসী কাব্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞোচিত আলোচনায় আত্মনিয়োগে তাঁর পক্ষে কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু তা না করে তিনি সমাজ-সমালোচনায় তাঁর লেখনীর শক্তিকে মুখ্যতঃ নিয়োগ করতে গেলেন কেন। তাঁর সময়ে ওইটেই সমধিক জরুরি ছিল বলে। আমাদের জরুরি-অজরুরি বোধ নেই। এই ডিফিল-ডিগ্রি-কণ্টকিত বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের তকমা-আঁটা অধ্যাপকশাসিত বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের এলাকায় তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্য-সমালোচনার বান ডেকেই চলেছে, সমালোচনার এই সমাজমূলহীন অসার ভাবোচ্ছ্বাস প্রতিরুদ্ধ হওয়ার কোনই সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। আমরা তো সমালোচনার জন্য সমালোচনা করি না, কোন গতিকে স্বীয় অস্তিত্ব সপ্রমাণ করবার জন্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। আমাদের মুখ্য লক্ষ্য তথাকথিত ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন এবং এই অভিপ্রায়ে যা-হোক তা-হোক একটা সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয় নির্বাচন করে তাতে লেগে পড়া। অন্তরের তাগিদের কোন কথা এর মধ্যে নেই, বস্তুতঃ অন্তরের তাগিদই এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে অবান্তর বিষয়। এই পথে চলে কিতাবী সমালোচক হয়তো হওয়া যায়, প্রকৃত সমালোচক হওয়া যায় না। যে কোন বিষয় অবলম্বনে—তা সে বিষয় সাহিত্যসংক্রান্তই হোক আর সাহিত্যেতর প্রসঙ্গাবলম্বীই হোক—গবেষণায় আত্মনিয়োগে মস্তিষ্কচর্চা হয়তো কিছু হয় এবং সেই চর্চার মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়; কিন্তু শুধু মস্তিষ্কচর্চার জন্যই আমরা মস্তিষ্ক চর্চা করি না, তার সামাজিক উপযোগিতারও সন্ধান করি। যে মস্তিষ্কজীবিতার দ্বারা শুধু মস্তিষ্কেরই অনুশীলন হয় এবং মস্তিষ্কের স্তরেই যা সীমাবদ্ধ থাকে, সমাজ-মনের উপর যার ছাপ পড়ে না, তেমন মস্তিষ্কজীবিতার সার্থকতা কিছু থাকলেও তাকে খুব উঁচুদরের সার্থকতা বলা যায় না। সমাজভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে সমালোচনায় অগ্রসর হতে আমাদের অনাগ্রহ অতি স্পষ্ট, বোধ হয় এটি আমাদের জাতিগত একটি বিচ্যুতি। নইলে বাংলা সাহিত্যের এত এত দিকে এত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, আজও এই দিকটির অপূর্ণতার শোধন হল না কেন। এটি যে আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান ত্রুটি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ভলতেয়ারের কথা হচ্ছিল। বাংলা সাহিত্যে ভলতেয়ারের মেজাজের লেখকের আবির্ভাব আজও হয় নি এটি আমার একটি স্থায়ী আক্ষেপ। যে দুই-একজন শক্তিমান লেখকের মধ্যে অনুরূপ প্রবণতার প্রমাণ পাই তাঁরাও শেষ পর্যন্ত তাঁদের সমালোচনার শক্তি সমাজের খাত থেকে প্রত্যাহার করে সাহিত্যের খাতে পরিচালিত করেছেন। এরকম মেজাজ বিশিষ্ট লেখকের ব্যক্তিত্বে একটি প্রধান লক্ষণই হল স্থিতাবস্থার (status quo) সঙ্গে অসহযোগ ও কায়েমী স্বার্থবানদের প্রভাব এড়িয়ে চলা। শাসক শক্তির সঙ্গেও এঁদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই দুই সর্ত পরিপূরণকারী সমালোচক আমাদের মধ্যে কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। ভলতেয়ার অবশ্য বছর দুই প্রুশিয়ার রাজা ফ্রেডারিকের দরবারে ছিলেন, কিন্তু রাজার পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর ভাগ্যে স্থায়ী হয় নি। ওঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আর পরস্পরবিরুদ্ধ শ্রেণীস্বার্থই শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য করে তুলল। ভলতেয়ার জেসুইট বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন, সেই জন্য ব্যক্তিজীবনে জেসুইটদের প্রতি তাঁর কিঞ্চিৎ মমত্ব ছিল; কিন্তু তাঁর আদর্শগত বিশ্বাস তার দ্বারা বিচলিত হয় নি। তিনি আমরণ রাজতন্ত্রের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন সংগ্রাম

পরিচালনা করেছিলেন। যাজক সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুষ্ঠিত অন্যায়-অত্যাচারের এত বড় সাহিত্যিক প্রতিরোধকারী বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে আর দ্বিতীয় দেখা দেয় নি।

কিন্তু এ সকল আদর্শ আমাদের সমালোচকদের সামনে তুলে ধরা বৃথা। আমাদের সমালোচকেরা যদি সাহিত্য-সেবাশ্রয়ী হয়ে সংগ্রামের পথেই যাবেন তবে ভাব ও বিভাবের বিশ্লেষণ কে করবেন, কাব্যালোক কে রচনা করবেন, শাক্ত পদাবলীর ইতিহাস কে বিবৃত করবেন। যত সব নিরামিষভোজী অধ্যাপক আর সৌন্দর্যবাদী ঘরানার ব্যাখ্যাকার মিলে আমাদের সমালোচনা-সাহিত্যকে খানা-ডোবায় পরিণত করে তুলেছেন ; এই সাহিত্য-পল্বলের ভিতর সমুদ্রের বজ্রনির্ঘোষ আশা করাই বাতুলতা। ভলতেয়ার তো কোন্ ছার, ইংরেজী সাহিত্যের এ্যাডিসন সুইফট ডিফো গোল্ডস্মিথ যে ধারার গদ্যরচনার দ্বারা ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন তার ছিটেফোঁটা সাদৃশ্যাত্মক রচনারও দেখা মিলবে না বাংলা সাহিত্যে। বাঙালী পাঠক বার্ণার্ড শ'র সাহিত্যের বিশেষ ভক্ত এইরূপ শুনে আসছি। ইংরেজী ভাষাভাষী দেশগুলির বাইরে ভারতবর্ষে শ'য়ের বইয়ের যেরকম কাটতি এরকম নাকি আর কোন দেশে নয়। বিশেষতঃ বাংলা দেশে শ'-প্রীতির তুলনা নেই। এ কথার কার্যকরী প্রমাণ পাই নে। বাংলা দেশের ইংরেজী-অভিজ্ঞ পাঠক মহলে শ'-সাহিত্যের যদি সমাদরই হবে তবে তাঁদের সেই চাহিদার তীব্রতা সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয় না কেন। সেখানে ভেষজাশ্রয়ী সমালোচনা-সাহিত্যের এত প্রাধান্য কেন। সমাজ-অচেতন সাহিত্যই বা সেখানে এত আদৃত হয় কেন। রম্য, বীভৎস ও যৌন সাহিত্য সেখানে আধিপত্য করে কোন্ যুক্তিবলে? অর্থনীতির একটা প্রধান সূত্র হল চাহিদার অনুরূপ যোগান। এ কথা সাহিত্যের বেলায়ও সমান খাটে। বাঙালী পাঠকের উপর 'শেভিয়ানিজমের' প্রভাব কিছু-মাত্রও যদি সত্য হত এবং তাঁর চাহিদা তদনুরূপ খাত বেয়ে চলত তা হলে সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে সমাজ-সমালোচনার কিছুটা অন্ততঃ অভিব্যক্তি আমরা লক্ষ্য করতুম। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নৈরাশ্যকর। শ'য়ের ভেকধারী একজন সুলেখক আমাদের মধ্যে আছেন বটে, কিন্তু তাঁর লিখনশক্তির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ নিবেদন করেই বলছি, শ'য়ের মনোভঙ্গী থেকে তিনি সহস্র যোজন দূরে আছেন। তাঁদের দু জনার মধ্যে মেরুর ব্যবধান বললেও অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্র-ঘরানায় পুষ্ট হয়ে কখনও যথার্থ সমাজ-সমালোচক হওয়া যায় না, সে কথা বলা দরকার।

বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সমাজ-সমালোচক লেখক হয়েছেন গুটি কয়। তাঁদের ভিতর বঙ্কিমচন্দ্র অগ্রগণ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'লোকরহস্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-সমালোচক মনের অসংশয় সাক্ষ্যে পূর্ণ। সে সাক্ষ্য অতীব শক্তিলক্ষণাক্রান্তও বটে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ অবধি সনাতন ভাবধারার সঙ্গে রফা করে চলেছিলেন, খাঁটি সমাজ-সমালোচক লেখকের মত বৈপ্লবিকতায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে ও পরে ও তাঁর সমসময়ে যে-সব লেখকের রচনার মধ্যে আমরা সমাজ-সমালোচনার নিদর্শন পাই তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মশক্তি' 'সমূহ' প্রভৃতি গ্রন্থরচনার পর্বে সমাজ-সমালোচনামূলক মনোবৃত্তি প্রকট হয়েছিল, কিন্তু তার পরেই সৌন্দর্যায়ন ও মরমীবাদের আধিক্যে সে প্রবৃত্তি কেমন যেন জুড়িয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দের রচনায় সমাজ-সমালোচনা অতি স্পষ্ট। তার পরের যুগের লেখকদের মধ্যে যাঁদের রচনায় এই প্রবৃত্তির কমবেশী প্রস্ফুরণ ঘটেছে তাঁদের ভিতর উল্লেখযোগ্য বিপিনচন্দ্র পাল, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, মোহিতলাল মজুমদার এবং শ্রীরাজশেখর বসু ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। সমসাময়িক সাহিত্যে এই ক্ষেত্রে আরও যে কজন রচনানিরত আছেন তাঁরা হলেন—প্রমথনাথ বিশী, 'বনফুল,' পরিমল গোস্বামী, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, অ. কৃ. ব., সম্ভবতঃ আরও কেউ কেউ।

তবু বলব, সাহিত্যে এই ধারার রচনার যেটুকু

অ-নাগরিকা

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত

সে আমারই ছিল পাশে পাশে।
একদিন এসেছিল সজল সন্ধ্যায়
যখন ব্যাকুল মন
পূরবীর সুরে সুরে
কারে যেন বারে বারে চায়;
ধানী-রঙা শাড়িখানি প'রে
বিদ্যুৎ-প্রদীপ হাতে নিয়ে
আঁকা-বাঁকা ভেজা-ভেজা
মেঠো-পথ বেয়ে,
বিনম্র গুণ্ঠনে ঢেকে
রমণীয় কমনীয় মুখ
নিগূঢ় আনন্দ-ভরে
মুগ্ধদৃষ্টি মধুভরা বুক;
চাঁপার আঙুল দিয়ে
শিশির-নিষিক্ত ঘাসে ঘাসে
আলপনা দিত এঁকে এঁকে
আশার স্বপন রেখে রেখে।
সে আমারই ছিল…
রঙ ছিল ফুল ছিল
মধু ছিল বনে উপবনে

আমারও যৌবন ছিল
সর্বদেহে মনে আর প্রাণে।
তার মুখে চেয়ে চেয়ে
দিন আর রাত্রিগুলি
ফুল হয়ে ফুটে ঝরে গেছে
আনন্দ-সৌরভটুকু
তবু তো দিয়েছে।
সেও ছিল একান্ত উন্মুখ
আত্মদানে সতত উৎসুক—
দুঃখ ছিল—তার মাঝে
তবু ছিল সুগভীর সুখ।
কাহারা ভোলাল তারে
ঝিলিমিলি আলো জ্বেলে
রঙিন মুখোসে,
সুগোপন বঞ্চনা-বুদ্ধিতে
বুকে বুকে লোভ কারা পোষে?
সে আজ হারায়ে গেছে
মুছে গেছে তার পদ-রেখা,
হৃদয় হয়েছে মোর তাই যাযাবর
তাই আমি ক্ষুধাতুর
তাই আমি ঘুরে মরি একা॥

অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্য। এখনও আমাদের সাহিত্যে যথার্থ সমাজ-সমালোচনামূলক সাহিত্যের বিকাশই হয় নি বলতে গেলে। ইউরোপীয় সাহিত্যের সমাজ-সমালোচনার ধারা-ধরন আমাদের আজও বিধিমতে রপ্ত হয় নি এ কথা অপ্রিয় হলেও সত্য। ও জিনিস আমাদের ধাতেই যেন নেই। যে অর্থে ভলতেয়ার সমাজ-সমালোচক, বার্নার্ড শ' সমাজ-সমালোচক সে অর্থে সমাজ-সমালোচক আমাদের মধ্যে এখনও আবির্ভূত হন নি। এই বৈষ্ণব-ভাবাকুলতা ও গদগদ ভাবের দেশে নিরবচ্ছিন্ন সমাজ-সমালোচকের কল্কে পাওয়া সহজ নয়। সমাজ-সমালোচকরূপে যদি কেউ লেখনী চালনা করতে চান, তা হলে লেখকেরাই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে জাতে পতিত করবেন, অন্য কোন প্রতিকূলতার প্রয়োজন হবে না—খবর-কাগজে আর সিনেমা-পত্রিকাশ্রয়ী লেখকদেরই এখন বাংলা সাহিত্যে আধিপত্য। পাঠকদের প্রতিক্রিয়ার কথা আর না-ই বা বললাম। অথচ সাহিত্যে এ-জাতীয় সমালোচনার খুবই প্রয়োজন আছে। আর কিছুর জন্য না হোক বাংলা সাহিত্যের মজ্জাগত রোমান্টিকতাকে সংকুচিত করবার জন্যই এ জিনিসের প্রয়োজন অবিসম্বাদী।

উপরে যে নাম-তালিকা সংকলন করা হল লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁদের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী লেখকের সংখ্যাই বেশী, পেশাদার সমালোচক খুব কম জনাই আছেন। আমাদের পেশাদার সমালোচকেরা এ সব ব্যাপারে আগ্রহী নন. তাঁরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে বর্ষা বা রবীন্দ্র-সাহিত্যে অধ্যাত্মবাদ জাতীয় রচনা বিস্তারে পটু। তাঁদের অধিকাংশই অধ্যাপনা কার্যে ব্রতী, তাঁদের মনোভাবও তদনুরূপ। তাঁদের সমালোচনা তাঁদের অধ্যাপনা বৃত্তিরই একটা রকমফের মাত্র। ক্লাসে ছাত্রদের কাছে যেসব জিনিস ওগরান সেগুলিকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে বাজারে সমালোচনা নামে প্রকাশ করেন। এঁরা সব জীবিত ও মৃত সৃষ্টিধর্মী লেখকদের বশম্বদ সেবক, নিজ যোগ্যতাবলে স্বভূমির উপর দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান আত্মপ্রত্যয়শীল লেখক নন। তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের ধ্বজাধারী সমালোচক এঁরা। কিতাবী রীতিনীতিতে এঁদের আস্থা, মৌলিকতার আদর্শে নয়। নিজের মাথা খাটিয়ে এক কলম লিখতে জানেন না, এদিকে আলঙ্কারিক কথিত নবরসের ব্যাখ্যান-বিশ্লেষণে পঞ্চমুখ। বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনার পরিমাণ কমে গিয়ে সমাজ-সমালোচনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সাহিত্যের হিত বই অহিত হত না।

সমাজহিতে বিদ্যাসাগর ঃ সমাজ-সংস্কার ও সমাজ-সেবা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বিদ্যাসাগর-জীবনের কয়েকটি বিশেষ দিকের কথা এ পর্যন্ত আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কর্মের দিক দিয়া বিদ্যাসাগর-জীবনকথা একখানি 'মহাভারত', আর ইহা 'অমৃত সমান'; যতই বলিবে ততই মনে হইবে, কত যেন অ-বলা রহিয়া গেল, আর যতটুকু শুনিলাম তাহা যেন কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। সমাজহিতে বিদ্যাসাগরের কার্য ও কৃতিত্ব জীবনব্যাপী। যেখানেই অসহনীয় কুসংস্কার সেখানেই বিদ্যাসাগর খড়্গহস্তে বীরের মত দণ্ডায়মান; আবার যেখানে কোন সৎকার্যের সন্ধান পাইয়াছেন সেখানেই তিনি বরাভয়দানে তৎপর। কোথাও দুঃখদৈন্য দুর্গতি দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, এবং সত্যসত্যই প্রাণপণে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতেন। কখনও কখনও উপকৃতের নিকট হইতে শ্রদ্ধার পরিবর্তে অবজ্ঞা, কৃতজ্ঞতার বদলে কৃতঘ্নতা তাঁহার লাভ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিকী সমাজকল্যাণ-প্রবৃত্তি স্বল্প সময়ের জন্যও ব্যাহত হয় নাই। অন্নহীনকে অন্ন দিয়া, রোগীকে যথাশক্তি শুশ্রূষা করিয়া, গরীব ছাত্রকে সাহায্য করিয়া, দুঃস্থকে সুস্থ করিয়া তবে তিনি মনে শান্তি পাইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিধবা-বিবাহ প্রচেষ্টাকে জীবনের 'সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম' বলিয়া অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার নিমিত্ত তিনি সর্বশক্তি বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমাজের বহুবিবাহ নিরোধ প্রয়াসেও তাঁহার ঐকান্তিকতা লক্ষ্য করি। এই সব বিষয় আমরা এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলা সামাজিক দুর্গতির হেতু। সে যুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলি সমাজের পরতে পরতে প্রবেশ না করিলেও এতজ্জনিত বিশৃঙ্খলা সমাজ-দেহকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতে প্রকৃত ক্ষমতাবান্ ছিল। দিল্লীর সিংহাসন লইয়া সাজাহানের চার পুত্রের মধ্যে বিবাদ—তাহার ফলে সমগ্র উত্তর-ভারত বিধ্বস্ত হইয়া যায়। আওরংজেবের শাসন কড়া হইলেও এই বিধ্বংসী কার্যাবলীর গতি রোধ করিতে পারে নাই। ভারতীয় সমাজে এমন কতকগুলি কুসংস্কার প্রবেশ করে যাহার ফলে অবলা নারী-সমাজই অধিকতর লাঞ্ছিত হইতে থাকে। ওই যুগে ইউরোপীয় সমাজেও কিন্তু নারীদের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ডাইনী সন্দেহে কত রমণীকে যে জীবন্ত দগ্ধ করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। রেনেসাঁসের প্রভাবে ওই দেশে মানব-চিন্তায় মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বহুযুগপুষ্ট কুসংস্কারগুলি শুকনো পাতার মত একে একে ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু ভারতবর্ষে রেনেসাঁস আসিতে ঢের সময় লাগিল। ইউরোপে রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে হইতে শেষে একটা স্থিতি অবস্থা আসিয়া দাঁড়ায়, ভারতবর্ষে এরূপটি হওয়া সম্ভব হয় নাই। কোম্পানির লোকজন পালের জাহাজ চালাইবার জন্য গঙ্গার জল যখন মাপিতেছিল তখন কে ভাবিয়াছিল তাহারাই একদিন দেশের হর্তাকর্তা হইয়া বসিবে। মোগলশক্তির অন্তঃসার-শূন্যতা ইউরোপীয়দের নিকট ক্রমশঃ প্রকট হইয়া পড়ে এবং শেষাগত ব্রিটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে শাসনদণ্ড চলিয়া যায়। পাশ্চাত্ত্য অভিনব ভাবধারায় এদেশবাসীরাও আপ্লুত হয়। স্বদেশীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি নিভৃতে টোল-চতুষ্পাঠী-মক্তব-মাদ্রাসায় কোন রকমে জীয়াইয়া রাখা হইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার সাধিত হইয়া স্বদেশীয় প্রাচীন ভাবধারার মধ্যে শাশ্বত গতিশীলতা ভারতীয়েরা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল। এই ব্যাপারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব কতখানি তাহার আভাস আমরা ইতিপূর্বেই বিশেষভাবে পাইয়াছি।

কিন্তু রেনেসাঁস কখনই সার্থক হইতে পারে না যদি না সমাজ-দেহের দুষ্ট ক্ষতগুলি, যাহা ইহাকে মৃত্যুর পথে টানিতেছিল, সম্পূর্ণ সারিয়া উঠে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোম্পানির স্থানীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এই ক্ষতের কোন কোনটির দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা আইনবলে কোন কোনটি রহিত করিয়াও দেন। সতীদাহ সমাজের

একটি কঠিন দুষ্ট ক্ষত। গত শতাব্দীর প্রথমেই ইহার বিরুদ্ধে ব্রিটিশের মনোভাব আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। সতীর ত্যাগের সপ্রশংস উল্লেখ কোন কোন ইংরেজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে তাহাদের বিরূপ বা বিরোধী মনোভাব দানা বাঁধিয়া উঠে। এই বিরূপ মনোভাব জোরালো সমর্থন পায় রাজা রামমোহন রায়ের 'সতী'-বিরোধী আন্দোলন হইতে। সতীদাহ প্রথা ১৮২৯ সনে বড়লাট বেন্টিঙ্ক রহিত করিয়া দেন, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। আইনের দ্বারা দুষ্ট ক্ষত বিদূরণে সময় সময় খুবই কাজ হয়, কিন্তু সমাজের ভিতর হইতে তাগিদ না আসিলে ইহার সম্যক্ আরোগ্যলাভের আশা থাকে না। তবে ইহা কিরূপে সম্ভব? পাদ্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি পারসিকিউটেড' শীর্ষক ইংরেজী পঞ্চাঙ্ক নাটকখানি পাঠে জানা যায়, সমাজে গুরু-পুরোহিতের হীনতা, শঠতা, উৎপীড়ন, নির্যাতন কিরূপে সাধারণ মানুষকে অবিরত বিভ্রান্তির পথে চালনা করিত। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সাম্য-মৈত্রীর বাণী সমাজমধ্যে রূপদান করিতে এই যুগের শিক্ষিত দল আগুয়ান হইলেন। সমাজের আরও বিস্তর ক্ষত তখনও বিদ্যমান। আর এই সব ক্ষতের জন্য সমাজদেহ ক্রমশঃ পঙ্গু ও অসাড় হইয়া পড়িতেছিল। যাঁহারা সমাজের শীর্ষস্থানে অবস্থিত তাঁহারাই এই ক্ষত সংশোধনে বা নিরাময় করিতে প্রধানতঃ বিরূপ ছিলেন, তাঁহারা প্রকাশ্যে ইহার বিরোধিতাই করিয়া আসেন। এই বিরোধিতার দরুন সমাজের তথাকথিত নিম্নস্তরের লোকেরাও কোনরূপ সংস্কারসাধনে সাহসী হয় নাই বা অগ্রণী হয় নাই।

বিধবা-বিবাহ দেশাচার-বিরুদ্ধ, অর্থাৎ তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকেরা ইহার বিরোধী। কিন্তু এই বিরোধিতা সত্ত্বেও নিম্নস্তরের হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ কোন-না-কোন প্রকারে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সমাজের উচ্চস্তরে ইহা চালু ছিল না—এইরূপই বলিতে হয়। গত শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নানা কারণে শোচনীয় হইয়া পড়ে। এতদিন চরখায় সুতা কাটিয়া সাধারণে জীবিকার অনেকটা সুরাহা করিয়া লইত। বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হওয়ায় উপরের এই প্রশস্ত পথটি রুদ্ধ হইয়া গেল। তৃতীয় দশকে শান্তিপুরনিবাসিনী চরখা-কাটুনীর দুঃখবিমিশ্রিত পত্র প্রকাশিত হওয়ায় সে সময়কার বিধবা নারীর সামাজিক দুর্গতির কথা বিশেষভাবে জানা যাইতেছে। বিধবাদের আর্থিক দুর্গতি পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বিপর্যয় আনিয়া দিতে থাকে। বিধবা বিশেষতঃ বালবিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া সমাজে কালিমাকলুষও প্রবেশ করে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী 'রথচাইল্ড' বলিয়া বিদেশী মহলে আখ্যাত মতিলাল শীল তৃতীয় দশকের শেষে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, যে যুবক প্রথম বিধবা-বিবাহ করিয়া সৎসাহস দেখাইবে তাহাকে তিনি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবেন। নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় নারী জাতির উন্নতির বিষয় চতুর্থ দশকেই চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহারা বিধবা-বিবাহ কিরূপে প্রচলিত হইতে পারে সে বিষয়ক আলোচনায়ও প্রবৃত্ত হন; কিন্তু কাজে তাঁহারা একরূপ কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সমাজের উপর তখন বিধর্মীরা এমন আঘাত করিতেছিল যে, রক্ষণশীল সমাজ-পরিবার পর-ধর্মাশ্রয়ী হিন্দুগণকে স্বধর্মে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম করিয়াছিলেন। হিন্দু-সমাজের আভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্যে তখন কেহই মন দিতে পারিলেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, স্বদেশীয় পরিবেশে মানুষ; কিন্তু তাঁহার মন ছিল উদার সংস্কারমুক্ত, যাহা কল্যাণকর তাহা গ্রহণে সর্বদা উৎসুক। ক্রমে তিনি কয়েকজন সদাশয় ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসি[বার] সুযোগ পান—এমন সুযোগ হয়তো অনেকের হয় না। মার্শাল, মৌএট, বেথুন—ভারতহিতৈষীত্রয়ের কল্যাণকর্মে তিনি সবিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন নিঃসন্দেহ। হীন অবস্থা হইতে নারীজাতির উদ্ধারমানসে, বেথুন সৎশিক্ষার জন্য বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের নাড়ীর যোগ স্বদেশীয় সমাজের সঙ্গে। কাজেই তিনিও যে এদিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি! নারীজাতির তৎকালীন দুরবস্থা দূরীকরণে কি কি উপায় অবলম্বন করা যায়, সে বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার এই ভাবনা কতকটা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তদীয় 'বাল্যবিবাহের দোষ' শীর্ষক রচনায়। এই লেখাটি 'সর্বশুভকরী পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যায় (আগস্ট ১৮৫০) প্রকাশিত হইয়াছিল। বাল্যবিবাহের সঙ্গে বহুবিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতির একটি মর্মন্তুদ সম্বন্ধ

রহিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রয়াস ক্রমে এই দুইটি বিষয়ের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। তবে মধ্যে দুই তিন বৎসর অন্য কাজে সবিশেষ ব্যাপৃত হইয়া পড়ায় তিনি এদিকে অবহিত হইতে পারেন নাই। মাতা ভগবতী দেবী ও পিতা ঠাকুরদাসের দুঃখ-কাতর উক্তিতে তিনি এই বিষয়ে পুনরায় মন দিলেন। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মণ, বিদ্যাসাগর পণ্ডিত; শাস্ত্রের কোন নির্দেশ বিধবা-বিবাহের সপক্ষে আছে কি না তদনুসন্ধানে তিনি স্বতঃই প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ইহার স্বপক্ষে যে-শাস্ত্রবাক্য পাইলেন, তাহার ভিত্তিতে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিলেন। পত্রিকা হিন্দুধর্ম সংস্কৃতি সংরক্ষণে তৎপর, কিন্তু ইহা সমাজের সংস্কার ও পরিশোধনেরও পক্ষপাতী। ঈশ্বরচন্দ্রের এই প্রবন্ধ অবিলম্বে প্রগতিশীল সুধীবর্গের নজরে পড়িল। বিদ্যাসাগর যাহা ধরেন তাহা ছাড়েন না; ভাল করিয়া প্রতীতি হইলে তিনি তাহা সাফল্যমণ্ডিত করিবেনই এরূপ জিদ তাঁহার বরাবর ছিল। সমাজের উন্নতিকামী নব্যশিক্ষিত ও প্রগতিপন্থী সুধীবর্গের সমর্থন তিনি লাভ করিলেন।

কলিকাতাস্থ কাশীপুরে তখন একটি সভা ছিল। ইহার সম্পাদক ছিলেন কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং অক্ষয়কুমার দত্ত; সভাপতি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সভাটির নাম সমাজ উন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি, সভার সভ্যদের মধ্যে সে যুগের বহু প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ইহার সদস্য। এই সমিতি সাগ্রহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। বিধবা-বিবাহ সমর্থনে সমিতি একখানি আবেদনপত্র প্রচার করেন। ওদিকে কলিকাতা যোড়াসাঁকোস্থ বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে বিধবা-বিবাহ সমর্থনে আর একখানি আবেদন-পত্র সরাসরি সরকারের নিকট প্রেরণ করা হইল। এইরূপ বহুজন-স্বাক্ষরিত আবেদন-পত্র সরকারে পৌছিলে কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে ইতিকর্তব্য নির্ধারণে আগ্রহান্বিত হন। বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক স্বাক্ষরিত একখানি আবেদন-পত্র সরকারের নিকট পৌছিল। বিদ্যাসাগর কিছুতেই হটিবার পাত্র নহেন, পূর্বেই বলিয়াছি। বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব তিনি প্রথমে পুস্তকাকারে প্রচার করিলেন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। প্রতিপক্ষীয়দের যুক্তির উত্তর দিয়া তিনি দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত করিলেন ওই বৎসর অক্টোবর মাসে। ইহা লইয়া বাঙালী-সমাজে এমন তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দুই খণ্ড পুস্তক পুনরায় বহু সহস্র করিয়া মুদ্রিত করা আবশ্যক হয়। এই সময়কার সংবাদপত্রেও কত লেখালেখি হইয়াছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' কবিতার মাধ্যমে জনচিত্তের আলোড়ন ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সে কি উত্তেজনা! এতদিন পরেও যখন এই সাহিত্য আমরা পাঠ করি, তখন ওই সময়কার সামাজিক উত্তেজনার স্পর্শ যেন আমরা পাই। বিরোধী আবেদনকারীদের যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া তৎকালীন সরকার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন বিধবা-বিবাহ আইন পাস করিয়াছিলেন। আইনটি সম্মতিসূচক, কিন্তু ইহা লইয়া কত আপত্তি! এই বিষয় লইয়া তখন বহু কবিতাও রচিত হয়। বিধবা-বিবাহের উপর এই কবিতাটি বহুল-প্রচারিত হইয়াছিল :

> বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
> সদরে করেছ রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে।
> কবে হবে এমন দিন, প্রচার হবে এ আইন,
> দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
> বিধবা রমণীর বিয়ে লেগে যাবে ধুম্,
> সধবাদের সঙ্গে যাব, বরণডালা মাথায় লয়ে।
> আর কেন ভাবিস লো সই, ঈশ্বর দিয়েছেন সই,
> এ বুঝি ঈশ্বরেচ্ছায় পতি প্রাপ্ত হই,
> রাধাকান্ত মনোভঙ্গে দিলেন নাকো সই,
> লোকমুখে শুনে আমরা আছি লো আজ ভয়ে।
> একাদশী উপোসের জ্বালা, কর্ণেতে লাগিল তালা,
> ঘুচে যাবে সব জ্বালা, জুড়াবে জীবন,
> দুজনাতে পালঙ্কেতে করিব শয়ন—
> বিনানিয়া বাঁধব খোঁপা—গুঁজে কাটি মাথায় দিয়ে।
> —ইত্যাদি।

—শম্ভুনাথ বিদ্যারত্ন প্রণীত "বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত" হইতে।

বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইলে, কবিতাকারে এইরূপ উক্তি করা হইল :

গ্রাণ্ট করি, গ্রাণ্টের সকল অভিলাষ।
কালোবিল, কালো বিল করিলেন পাস।
না হইতে শাস্ত্রমতে, বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন, আইনের আদেশ॥

* * *

করিছে আমার ধর্ম, আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পতিধর্মে, কেন দ্বেষ কর ?

* * *

সকলেই তুড়ি মারে, বুঝেনাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে লাথি খ্যালে, সাগরের ঢেউ॥
সাগর যদ্যপি করে, সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন॥

তুমুল বিরোধিতার মধ্যে আইন বিধিবদ্ধ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় আইন পাশ করাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি বিধবাদের বিবাহ দিতেও অগ্রণী হইলেন। তাঁহার চেষ্টা-উদ্যোগে প্রথম বিধবা-বিবাহ হইল আইন বিধিবদ্ধ হইবার ছয় মাসের মধ্যেই, ১৮৫৬ সনের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে। গোবরডাঙা খাটুরা গ্রামনিবাসী প্রসিদ্ধ লোক পণ্ডিত রামধন বিদ্যাবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, পলাসডাঙা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা কালীমতীকে বিবাহ করেন। ইহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় আরও কয়েকটি বিবাহ সংঘটনের ব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা বেশ কিছুদিন চলিয়াছিল। ইহাতে প্রচুর অর্থব্যয় হইত, এবং বিদ্যাসাগর প্রায় সমুদয় ব্যয়ভার নিজে বহন করিতেন। নারীজাতির দুঃখ-দুর্দশায় তাঁহার চিত্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শুধু বিধবা-বিবাহ কেন, যেখানে যেরূপ ব্যবস্থা করিলে তাহাদের দৈন্যদশা ঘুচিতে পারে তাহার ব্যবস্থা তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করিতে যত্নপর হইতেন। এইজন্য তাঁহাকে অনেক সময় অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়; কিন্তু ইহাকে তিনি কখনও ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেন না। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের অন্যতম জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি অসৎব্যবহার করিলেও, মদনমোহনের বিধবা কন্যা ও বৃদ্ধা মাতাকে সারাজীবন সাহায্য করিতে বিদ্যাসাগর বিরত হন নাই। এইখানেই ঈশ্বরচন্দ্র—ঈশ্বরচন্দ্র। বিদ্যাসাগর-ভবন—কলিকাতায় ও বীরসিংহে বিধবা নারীদের আশ্রয়স্থল হইল। লোকে অপবাদ রটাইত, বিদ্যাসাগর অপরের বিধবা-বিবাহ সংঘটন করাইলেও নিজের পরিবারে কখনও বিধবা-বিবাহ দিবেন না। অবশেষে পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সাবালক হইয়া যখন বিধবা-বিবাহ করেন তখন তাঁহার এই অপবাদ চিরতরে স্খালন হইল। আত্মীয়বর্গের সম্পর্ক-বর্জন-ভীতি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াই তিনি এই কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লিখিত তদীয় পত্র হইতে ইহা আমরা জানিতে পারিয়াছি। বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করিতে যাইয়া তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তিনি উহাকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সৎকর্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহার জন্য সর্বস্বপণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আর একটি প্রধান সংস্কার-প্রচেষ্টা—বহুবিবাহ নিবারণ। বাল্যবিবাহের দোষ বর্ণনে বহুবিবাহের দোষও তিনি আমাদের দেখাইয়াছেন। গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে বহুবিবাহের প্রতি শিক্ষিত সাধারণের দৃষ্টি সবিশেষ নিপতিত হয়। মফস্বলেও ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। বিক্রমপুর-নিবাসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাসবিহারী বহুপত্নীক ছিলেন। পালা ক[illegible] তিনি শ্বশুরগৃহে গমন করিতেন। সকল স্ত্রীর সঙ্গে সম্যক্ পরিচয়ও তাঁহার ছিল না। তিনি একদা এক শ্বশুরবাড়ির নিকটে গিয়া একটি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করেন, অমুকের বাড়ি কোনখানা? বালিকাটি উত্তর করিল, 'দাদু, ওই বাড়ি।' রাসবিহারী নির্দিষ্ট গৃহে গমন করিয়া জামাতা বলিয়া নিজের পরিচয় দিলেন। রাত্রে শয়নাগারে গিয়া দেখেন, যে বালিকাটি তাঁহাকে 'দাদু' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, সে-ই তাঁহার শয্যাসঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে! রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'বহুবিবাহ' দ্বারা তিনি যে পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, এই পাপ হইতে সমাজকে মুক্ত করিবেন। তিনি অতঃপর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত করেন। কলিকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিষয় লইয়া শাস্ত্রীয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধীয়

বিচার-পুস্তক প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিলেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ; দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয় প্রায় দেড় বৎসর পরে (১লা এপ্রিল ১৮৭৩)। এই বিচার-পুস্তকদ্বয় বিদ্যাসাগরের সম্যক্ শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচায়ক। এই বিষয় লইয়া বাদ-বিতণ্ডা-বিতর্ক উপস্থিত হইল। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি সংস্কৃতে ইহার প্রতিবাদ-পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। বিচারবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে প্রতিবাদকারীদের বিভিন্ন যুক্তির দফাওয়ারি উত্তর দিয়াই বিদ্যাসাগর ক্ষান্ত হন নাই, কয়েকটি বিদ্রূপাত্মক রচনা দ্বারা তাঁহাদের প্রতিবাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্যও ফাঁস করিয়া দিলেন। এই সকল রচনা ছিল বেনামী। এগুলি যথাক্রমে (১) "অতি অল্প হইল" (মে ১৮৭৩), "আবার অতি-অল্প হইল" (সেপ্টেম্বর ১৮৭৩)। তখন ইহা পাঠকবর্গের মনে বিশেষ হাস্যরসেরও উদ্রেক করে। বহুবিবাহ নিবারণকল্পে সরকারে আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু নানা কারণে ইহা আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আরও কয়েকটি রচনা পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর-জীবন সমাজদেহকে ক্ষতবিমুক্ত করিবার নিমিত্ত একেবারে উৎসর্গীকৃত ছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যাসাগরের হৃদয় মানুষের দুঃখ দেখিলে উদ্বেলিত হইয়া পড়িত। নারীজাতির দুঃখ-বিমোচন প্রয়াস সম্বন্ধে আমরা এখানে অতি-সংক্ষেপেই কিছু বলিতে পারিলাম।

কলিকাতাস্থ হিন্দু ফ্যামিলি অ্যান্যুয়িটি ফণ্ডের কথা বাঙালী সমাজে কে না জানেন ! নারীর আর্থিক দৈন্যদশা ঘুচাইতে পারিলে সমাজে তাঁহার মর্যাদা ঘটিবে, স্বামীর মৃত্যুর পর অপরের গলগ্রহ হইতেও তাঁহাকে আর হইবে না—এই উদ্দেশ্য লইয়াই ফণ্ডের প্রতিষ্ঠা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন এই ফণ্ডের সূচনা হইল। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অগ্রজ নবীনচন্দ্র সেন ইহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এই বিষয়ে যুক্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর যে বিষয়টি ভাল বুঝিতেন তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। সে যুগের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ অবিলম্বে আসিয়া এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে যুক্ত হন। বিদ্যাসাগর ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ইহার পর পরিচালকবর্গের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় তিনি ফণ্ডের সংস্রব ছাড়িয়া দেন। দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই ফণ্ড দীর্ঘ ছিয়াশী বৎসর যাবৎ বাংলার নারীসমাজের যে কতখানি হিতসাধন করিতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিদ্যাসাগরের পরিচালনা-নৈপুণ্যে ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

সমাজসেবায় বিদ্যাসাগরের ক্লান্তি ছিল না। দুর্গতের দুঃখ দূর না করিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার কলিকাতা ও বীরসিংহ বাসভবন অন্নসত্র হইয়া উঠিয়াছিল, বীরসিংহে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের আহারাদির ব্যবস্থার বিষয় শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রাঢ় অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইলে ঈশ্বরচন্দ্র স্থির থাকিতে পারেন নাই। বিভিন্ন স্থলে ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের মত করাইয়া এবং উপরিতন সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা রাজ-কোষ হইতে অর্থ বাহির করিয়া, দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছিলেন। দরিদ্র রোগীরা অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ চড়া দামে কিনিতে পারে না। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে হোমিওপ্যাথি শিখিয়া দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। কার্মাটারে অবস্থান কালে তিনি সাঁওতালদের মধ্যে বিনিপয়সায় ঔষধ বিতরণ করিতেন, দীর্ঘপথ হাঁটিয়া গিয়া রোগীদের চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কার্মাটারের একদিনের কাহিনী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশদ-ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ওইদিন দেখেন, সকাল হইতে সাঁওতালেরা ভুট্টা লইয়া আসিতেছে এবং বিদ্যাসাগর তাহা কিনিতেছেন। গৃহে ভুট্টার স্তূপ হইল কিন্তু পরে আবার সাঁওতালেরা—পুরুষ রমণী শিশু আসিতে লাগিল, বিদ্যাসাগর তাহাদের একটা একটা ভুট্টা দেন আর তাহারা আগুনে সেঁকিয়া তাহা খায়। এ দৃশ্য দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লোককে খাওয়াইয়াই সন্তুষ্ট। মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পূর্বে তাঁহার চন্দননগরের বাসাবাটিতে শাস্ত্রী মহাশয় গিয়াছিলেন—দেখিলেন, বিদ্যাসাগর এক ভদ্রলোককে আম কাটিয়া দিতেছেন আর তিনি তাহা খাইতেছেন। ভদ্রলোকটি

চলিয়া গেলে শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন—তিনি প্রথম রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর তাঁহাকে কলেজে অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।

দরিদ্র ছাত্রদের তিনি ছিলেন পরম বান্ধব। তাঁহার বীরসিংহের গৃহে বহু ছাত্র বাস করিয়া তথাকার বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। কলিকাতায়ও বহু ছাত্রকে তিনি পঠন-পাঠনের সুযোগ করিয়া দেন। আহারাদির ব্যবস্থা, বাসস্থান নির্ণয়, স্কুল বা কলেজে প্রবেশের সুবিধা প্রভৃতি তাঁহার কার্যের অঙ্গ। ওই সময়কার একজন ছাত্রের মুখে আমি তাঁহার সহায়তার কথা যেরূপ শুনিয়াছি এখানে সংক্ষেপে বলিতেছি। কলিকাতা হইতে দুই শত মাইল দূরে পূর্বাঞ্চলের পল্লীগ্রামের একটি বালক সবে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন, সংস্কৃত পড়ার খুব ইচ্ছা। সংস্কৃত কলেজই ইঁহার প্রশস্ত ক্ষেত্র, কিন্তু সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হইবার উপায় কি? তিনি গ্রামে বসিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা শুনিয়াছেন। বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন, এই ভরসায় নবাগত বালকটি বিদ্যাসাগর-ভবনের দিকে রওনা হইলেন। ফটক পার হইয়া ভিতরে ঢুকিবেন এমন সাহস তাঁহার হইল না; কিছুক্ষণ ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া আসিলেন। দ্বিতীয় দিনও ঐরূপ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তৃতীয় দিনে ফটকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে ভিতরে ঢুকিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?" তিনি পূর্বদিনই তাঁহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন। অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে তিনি বালকটিকে বলিলেন, "এ আর কি, কাল তুমি এসো।" নির্দিষ্ট সময়ে বালকটি বিদ্যাসাগর-ভবনে গেলে, বিদ্যাসাগর উড়ানি গায়ে চটি জুতা পায়ে বালকটিকে লইয়া চলিলেন। অলিগলির মধ্য দিয়া সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলেন। তিনি 'মহেশ' 'মহেশ' বলিয়া ডাকিতেই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ডাক শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নীচতলায় নামিয়া আসেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, এই বালকটি সুদূর পল্লীগ্রাম থেকে এসেছে, সংস্কৃত পড়ার খুব ইচ্ছা, একে ভর্তি করে নেও।" মহেশ আর কেহ নহেন, সং
কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়র
বালকটি অবেতনে চারি বৎসরকাল সংস্কৃত কলে
অধ্যয়ন করিয়া কৃতিত্বের সহিত বি. এ. পরীক্ষ
উত্তীর্ণ হইলেন। অবস্থাবৈগুণ্যে এম. এ. শ্রেণীতে ভ
হইয়াও আর পড়িতে পারিলেন না। তাঁহাকে অধ্যাপ
কর্ম গ্রহণ করিতে হইল। এ ব্যাপারেও তিনি বিদ্যাসা
মহাশয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প
বিখ্যাত সংস্কৃত অধ্যাপক রূপে পরিচিত হন; এখ
জীবিত, বয়স নব্বই বৎসরের উপর। ইঁহার ন
পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ। তিনি আমাকে আ
বলিয়াছেন, 'অধ্যাপনাকালে কলেজে যাইবার সময়
ফিরিবার কালে বিদ্যাসাগর-ভবনের পার্শ্ব দিয়া আসিত
এবং পাঁচিল স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতাম।' বিদ্যাসা
মহাশয়ের প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁহার কথা বলি
বলিতে তিনি গদগদ হইয়া উঠেন। তাঁহার মুখে আ
নিজে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই এখানে বলিলা
বিদ্যাসাগর ছিলেন ছাত্রবন্ধু। ছাত্রগণ তাঁহার পদপ্রা
বসিয়া বহু উপদেশ শুনিতেন। 'প্রবাসী'র প্রতিষ্ঠা
সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে বলিয়াছিলে
তিনিও ছাত্রাবস্থায় জনৈক সতীর্থের সঙ্গে গিয়া তাঁহ
নিকট হইতে উপদেশ শোনেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় জাতির ও সমাজের কল্যাণ
সকল বিষয়েই নিজ সাধ্যমত সাহায্য করিতে অগ্র
হইতেন। সুবিখ্যাত সিবিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত হিন্দুশা
গ্রন্থ প্রকাশে মনস্থ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপ
যাজ্ঞা করিলেন। তাঁহার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া বিদ্যাসা
মহাশয়ের কি আনন্দ! রমেশচন্দ্র যখন বলিলে
রক্ষণশীল পণ্ডিতেরা বেদ বা বেদাংশ প্রকাশে আপ
তুলিয়াছেন, তখন ঈশ্বরচন্দ্র ইহাতে ভ্রূক্ষেপ না কর
স্বীয় মতে দৃঢ় থাকিবার পরামর্শ দেন। রমেশচ
বলিয়াছেন, তাঁহার এতাদৃশ উপদেশে মনে যে
পাইয়াছিলেন তাহা দ্বারাই তিনি হিন্দুশাস্ত্র
প্রকাশে অতটা কৃতকার্য হন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ল
কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া সেখা
যাইবার সময় কার্মাটারে নামিয়া বিদ্যাসাগর-ভবনে আতি

গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'হর্ষচরিত' পড়াইবার বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া বিদ্যাসাগর তাঁহাকে এ বিষয়ে যে উপদেশ দেন তাহাতে তাঁহাকে এ বই পড়াইতে আর ঠেকিতে হয় নাই। ছাত্র, অধ্যাপক, সাহিত্যসেবী, সমাজকর্মী কেহই তাঁহার উপদেশ হইতে কখনও বঞ্চিত হইতেন না।

বিদ্যাসাগর-জীবনী গ্রন্থসমূহে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নানাভাবে বিধৃত হইয়াছে। তিনি ছিলেন যেমন কুসুমের ন্যায় কোমল তেমনই বজ্রের মত কঠোর। তাঁহার আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রখর; যেখানেই ইহা ব্যাহত হইতে পারে বুঝিয়াছেন সেইখানেই বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একদিন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেলে, টেবিলের উপর পা রাখিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তিনি আলাপে প্রবৃত্ত হন। পরে যখন কার সাহেব তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে যান তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ও টেবিলের উপর পা তুলিয়া আলাপে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কার সাহেব পণ্ডিতের নিকট সমুচিত শিক্ষা পাইয়া অতঃপর সাবধান হইয়া যান। ছোটলাট হ্যালিডের অনুরোধে বিদ্যাসাগর তিন দিন মাত্র পান্তলুন পরিয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন বলিলেন, "সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার এই শেষ-সাক্ষাৎকার।" হ্যালিডে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকৃতি জানিতেন। তিনি অমনই বলিলেন, "না, না, আপনাকে আর পান্তলুন পরিয়া আসিতে হইবে না। আপনার স্বদেশী পোশাক—ধুতি-চাদরেই আসিবেন।" জীবনে তিনি আর কখনও ধুতি-চাদর ছাড়েন নাই। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাসাগরের ধুতি-চাদরের মধ্যেই সাহেব ফুটিয়া বাহির হইত। অর্থাৎ, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতদের মতই তিনি ছিলেন সংস্কারমুক্ত। যাহা জাতির সমাজের বা দেশের পক্ষে ভাল বলিয়া বুঝিতেন তাহা তিনি আঁকড়াইয়া ধরিতেন, কার্যে রূপায়িত করিতে সর্বস্ব পণ করিতেও ছাড়িতেন না। বিদ্যাসাগরের মাতৃ-পিতৃভক্তি ছিল অনুপম, অনন্যসাধারণ। নির্দিষ্ট সময়ে বীরসিংহে পৌঁছিতে না পারিলে মাতা মনে কষ্ট পাইবেন, তাও কি সম্ভব? রাত্রি হইয়াছে। পারাপারের খেয়ার সন্ধান মিলিতেছে না। শ্রাবণের উন্মত্ত দামোদরে রাত্রির অন্ধকারে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং সাঁতার কাটিয়া ওপারে গিয়া উঠিলেন। মাতাপিতার আদেশকে তিনি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। বস্তুতঃ মাতাপিতা ব্যতীত ঈশ্বরের অন্য কোন অস্তিত্ব তিনি জানেন বলিয়া বোধ হইত না। কেহ কেহ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে 'এগ্‌নষ্টিক', নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী বলিয়াছেন। কিন্তু মাতাপিতার প্রতি যে মানুষটির এত ভক্তি তিনি কিরূপে নিরীশ্বরবাদী হইবেন? ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন কোঁৎ-পন্থীদের পরিভাষা অনুযায়ী "Humanity" বা মানব-দেবীর উপাসক। মানুষের সেবায় তাঁহার জীবন মন উৎসর্গীকৃত। এমন মানুষটি নাস্তিক হইতে পারেন? পত্রের শিরোনামায় "শ্রীহরিঃ শরণম্", "শ্রীশ্রীদুর্গা" উক্তি কি আস্তিক্যের পরিচয় দান করে না? বোধোদয়ের "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ"—এই একটি উক্তির মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের সংস্কারবিমুক্ত আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন মনের পরিচয় মিলে।

তাহা ছাড়া আমরা আরও দেখিতে পাই, হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগকালে তিনি ফণ্ডের অধ্যক্ষ-সভার নিকট ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬ সনে যে পত্র লিখেন তাহাতে তাঁহার আস্তিক্যবোধের* স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। তিনি অংশতঃ এই মর্মে লেখেন: "ফণ্ডের সহিত আর সংযুক্ত থাকিলে ভবিষ্যতে আমাকে দুর্নামের ভাগী হইতে হইবে এবং ঈশ্বরের কাছেও জবাবদিহি করিতে হইবে।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আস্তিক্যবোধের আর একটি প্রমাণ আছে। কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের পরিচালক তত্ত্ববোধিনী সভার তিনি একজন কর্তৃস্থানীয় ছিলেন। এই সভার শেষ বৎসরে তিনি ইহার সেক্রেটারী বা সম্পাদকের কার্য করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবিতকাল সত্তর বৎসর। উনবিংশ শতাব্দীর প্রধানতম অংশ এই কাল। এই শতাব্দী জগতের ইতিহাসেই একটি শুভ শতাব্দী। ষোড়শ শতাব্দীতে মানুষের মন নানা দিকে জ্ঞানলাভে অগ্রসর হয়। কিন্তু পরবর্তী দুই শতাব্দীর উত্থান-পতনের মধ্যে ইহার সম্যক্ বিকাশ ঘটে নাই। উনবিংশ শতাব্দীতে

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা), চতুর্থ সংস্করণ পৃ. ৯৯। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আস্তিক্যবোধ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাশঙ্কর সেন "উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য" ২য় সং, ৮০-৮৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

মানবীয় ভাবনা একটি পরিণতি লাভ করে এবং কর্মের মধ্য দিয়া মানুষের জীবনকে ইহা প্রভাবিত করিতে থাকে। স্বাধীন দেশে স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের সহজ অবকাশ আছে। কিন্তু পরাধীন ভারতবর্ষেও এই শতাব্দীতে কিরূপ মানবীয় ভাবনা কর্মে রূপায়িত হইতে বসিয়াছিল, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু সত্যই ইহা ঘটিয়াছিল এবং আমরা স্বাধীনতার বর্তমান পরিবেশে ওই সময়কার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া থ হইয়া যাই। রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং স্বামী বিবেকানন্দ একাধারে চিন্তাবীর এবং কর্মীশ্রেষ্ঠ; এমন সমন্বয় আর কোন শতাব্দীতে বড় একটা দেখি না। বহু মনীষী, ধর্মবীর, কর্মীশ্রেষ্ঠ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্ঞানে পুণ্যে জাতি প্রাণচঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু উক্ত ত্রয়ী যেন সবার উপরে শুকতারার মত থাকিয়া জাতিকে আত্মস্থ হইবার পথ দেখাইয়া চলিয়াছেন। প্রত্যহ ভোরে উঠিয়া শুকতারা দেখি আর ভাবি—দিনের সূচনা যেমন এই শুকতারায়, জাতির কল্যাণপথের সন্ধান দিলেনও তেমনই এই ত্রয়ী।

বিদ্যাসাগর-জীবন আলোচনা করিলে একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে আসে। মার্কিন মনীষী এমার্সন বলিয়াছেন—মহাপুরুষেরা ভাষার ক্রিয়াপদ। এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, ক্রিয়াপদ ছাড়া যেমন ভাষা হয় না, ক্রিয়া ছাড়া বাক্য চলে না, তেমনই মহাপুরুষ ছাড়া জাতি চলে না। সেণ্ট পল ত্যাগপূত খ্রীষ্টভক্তদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "Ye are the salt of the earth," অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর লবণ। লবণ ব্যতীত ব্যঞ্জনাদি আদৌ উপভোগ্য নয়, ত্যাগপূত মহাপুরুষেরা সমাজে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়াই তো ইহা বাসযোগ্য হয় বা ঊষর মরুভূমি উর্বর মরূদ্যানে পরিণত হইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনকর্ম আলোচনা কালে ওই দুইটি উক্তিরই সত্যতা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয়। ঈশ্বরচন্দ্র সমাজ-তরুকে ভীষণভাবে ধাক্কা দিয়া অসাড় ডালপালা পাতাকে ঝাড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তখনই যে তিনি পুরাপুরি সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু সেই যে সমাজ-শুদ্ধি শুরু হয় তাহা বহুকাল পর্যন্ত চলিয়া একটি শক্তিমান উন্নতমস্তক জাতিতে পরিণত হইয়াছে। বাংলার শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবিত হইয়া আবার ফুলেফলে সুশোভিত হইতে সমর্থ হইয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে ঈশ্বরচন্দ্রের কল্যাণ-হস্ত। উক্ত ত্রয়ীর মধ্যে আবার একটি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্য সবিশেষ পরিস্ফুট। তিনি সংস্কৃত শিক্ষাকে সহজসাধ্য ও সর্বজনগ্রাহ্য করিয়া দিয়া জাতির জাগরণের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনকে উদ্দেশ্য করিয়া সিস্টার নিবেদিতা বলিয়াছিলেন, "দীনেশ বাবু, আপনি জানেন না যে আপনি একজন খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক ('Patriot')।" আমরা নিবেদিতার কথায়ই বলি, "দয়া-সাগর বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন খাঁটি পেট্রিয়ট, স[illegible] স্বদেশপ্রেমিক।*

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বিদ্যাসাগর-বক্তৃতামালার (১৯৫৮) পঞ্চম ও শেষ বক্তৃতা।

কেন যে!

অসিতকুমার

বোকা যারা তারা মরবে এবং বুদ্ধিমানেরা বাঁচবে জানি!
তবু এর মাঝে চিৎকার করে কেন যে কাঁদছে মহাপ্রাণী।
নিয়মচক্র ঘুরছে ঘুরবে,
অন্ধ সূর্য উঠবে পূর্বে।
জলবে ফসল মানুষের দল
জন্মজরার টানবে ঘানি!
তবু এর মাঝে চিৎকার করে কেন যে কাঁদছে মহাপ্রাণী।

বুদ্ধিমানেরা কাগজে কাঁদবে বোকারা ফেলবে মাথার ঘাম
তবু এর মাঝে মাথা কুটে কুটে কেন যে মরছে আত্মারাম?
বেকার কথার কে করে কেয়ার?
ছাই ঝেড়ে খোঁজে আরাম চেয়ার,
শহরে শহরে টাকার বহরে
পাবলিসিটির বাজবে ড্রাম
উঠবে পড়বে হাজারো নাম,
তবু এর মাঝে চিৎকার করে
কেন যে মরছে আত্মারাম!

মনোবিকলন

কানু রায়

হ্যাঁ, চিঠিটা তার নামেই এসেছে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল অতীশ। এই তো স্পষ্ট অক্ষরে টাইপ করা। অতীশ মুখোপাধ্যায়। ঠিকানাটাও ভুল নয়, ৩২।৩ হরিমাধব সরকার লেন। সবই ঠিক আছে। এমন কি ডাকঘরের স্ট্যাম্পটাতেও সন্দেহ করবার কিছু নেই।

কিন্তু—

কেমন যেন খাপছাড়া ঠেকে তার কাছে। এলোমেলো চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে ভাবতে থাকে সে। কোন কুলকিনারা পায় না।

অবশেষে একটা সিগারেট ধরায়। এই অভ্যাসটা সে ছাত্রজীবনে রপ্ত করেছিল। কোনকিছু গভীর চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে, দুর্ঘটনা কিংবা বিষাদজনক কোন ঘটনায় আশ্চর্য মহৌষধ! ক্যালকুলাসের শক্ত অঙ্ক কষতে গিয়ে, পদার্থবিদ্যার কোন দুরূহ তত্ত্ব বুঝতে অথবা মানসিক অশান্তিতে যখন দিশেহারা হয়ে পড়েছে ঠিক তখনই—তখনই একটা সিগারেট ধরাতো সে। কিন্তু আজ কোন লাভ হল না। জলন্ত সিগারেট পুড়ে পুড়ে একসময় নিঃশেষ হয়ে যায় তবু অতীশ যে তিমিরে সেই তিমিরেই!

খামের ভেতর থেকে চিঠিটা সে আবার খুলল। ভাঁজ করা কাগজ। একটু পুরনো, বিবর্ণ। কিন্তু লেখাগুলি এখনও উজ্জ্বল, এখনও চকচকে। এনভেলাপে অতীশ মুখোপাধ্যায়ের নাম থাকলে কী হবে, ভেতরের চিঠিটা লেখা হয়েছে জয়ন্তদাকে।

জয়ন্ত!

কে এই জয়ন্ত? অতীশ কোনদিন তার নাম শোনে নি। তবু সে ভাবতে থাকে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, চেনা-পরিচিতের মধ্যে খুঁজতে থাকে তার মন। না, মনে পড়ছে না। গল্প উপন্যাসে এই নামের সঙ্গে হয়তো পরিচিতি কোনদিন ঘটেছে, তবু বাস্তবজগতে তার জানাশোনার বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে কারুরই এ নাম নয়। অথচ নিতান্ত সাধারণ একটা নাম। পিসেমশাইয়ের এক ভাইপো···কিন্তু তার নাম তো জয়জীবন, জয়ন্ত নয়। যাক গে অযথা ভেবে আর কী হবে। জয়ন্ত নামে সত্যি যদি কোন লোক থাকে, আর যদি তার অচেনাই রইল তাতেই বা কী এসে যায়? পৃথিবীতে কত লোককেই অতীশ চেনে না। তাই বলে অসুবিধা কিছু হয় নি তার।

জয়ন্ত অচেনা হোক, কিন্তু এই চিঠির সঙ্গে জড়িত থেকেই মুশকিল হয়েছে। মামুলী চিঠি। সাধারণ প্রেম-পত্র। জয়ন্তদার কথা ভেবে ভেবে কোন একটি মেয়ে আকুল হয়ে উঠেছে, তার সেই আশ্চর্য উজ্জ্বল দুটি চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে মনের কোণে অনুভবের কত আশ্চর্য ফুলই না ফুটে উঠেছে, ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলির কথা কল্পনায় বার বার ভালবাসার রঙ মিশিয়ে···ইত্যাদি ইত্যাদি। নীচে পত্রলেখিকার নাম—তনুকা। কোন গোলমাল নেই। হাতের লেখাটাও স্পষ্ট তনুকার। অতীশ এই লেখা চেনে। ভাল করেই চেনে। কেন না, তনুকার লেখার সঙ্গে আজ প্রায় তিন বছরের পরিচয়। সে তার স্ত্রী।

কবে লিখেছে এই চিঠি? অতীশ হিসেব করে দেখল প্রায় পাঁচ ছ বছর আগের তারিখ। হ্যাঁ, তনুকা তখন কুমারী। মাত্র তিন বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। অতীশ চিঠিটা মুড়ে এনভেলাপে রাখল, তারপর এনভেলাপটা পকেটে। পায়ে চটিজোড়াটা কোন রকমে গলিয়ে আস্তে আস্তে বাইরের দিকে এগোয় সে।

অনেক রাত্রিতে সে বাড়ি ফেরে।

তনুকা জেগেই ছিল। অতীশের সাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দেয়। কোনদিকে না তাকিয়েই অতীশ ঘরে ঢুকল।

তোমার এত দেরি হল যে?

অতীশ ঘুরে দাঁড়ায়: দেরি!

এত রাত হয়ে গেছে। সেই কখন্ থেকে তোমার জন্যে বসে আছি।

শুয়ে পড়লেই পারতে।—শান্তভাবে সে জবাব দেয়।

তারপর অতীশ শার্টটা খুলে গেঞ্জী গায়ে একটা চেয়ারের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। হাতপাখাটা নেড়ে বাতাস খায়। টেবিল-ক্লকটা টিকটিক শব্দ করছে। আর তার চোখে পড়ল, দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকির উপরে। হলদে ফ্যাকাসে চোখে তাকিয়ে আছে এই দিকে। অবক্ষয়ী সরীসৃপের শেষ বংশধর।

তনুকা বলে, খাবে এস।

আমি খেয়ে এসেছি।

খেয়ে এসেছ! কোথায় খেলে?

অতীশ চট করে একটা মিথ্যে কথা বলে, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে, নেমন্তন্ন ছিল।

তনুকা বিস্মিত হয়।

কই, এ কথা তো আগে আমায় জানাও নি ?

আশ্চর্য ! আগে কী আমিই জানতাম নাকি ! অতীশ একটু হাসতে চেষ্টা করে : রাস্তায় দেখা হল, জোর করে ধরে নিয়ে গেল।

ও।—তনুকার মুখ দিয়ে অস্ফুট একটা আওয়াজ বেরিয়ে আসে।

তোমার খাওয়া হয়ে গেছে ?

না।

না কেন ? এত রাত পর্যন্ত বসে বসে অপেক্ষা করবার কী আছে। তোমার খেয়ে নেওয়া উচিত ছিল। আমার জন্যে সারারাত বসে থাকবে নাকি ?

ঘুমোতে গিয়ে অতীশের শরীরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। বিবেকের দংশন নয়, প্রকৃত ক্ষুধার যন্ত্রণায়। বিকেল থেকে কিছুই খায় নি সে। চায়ের দোকানের এক কাপ চা ছাড়া। এতটা সময় সে শুধু একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে। কোন বন্ধুবান্ধব কারুর সঙ্গেই দেখা করে নি। কিন্তু কেন ? অভিমান ? সে অভিমান করবে কচি খুকীর মত ! তনুকাকে সে ভালবাসে, প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। কোন বিবাহিত পুরুষ তার স্ত্রীকে যতটা ভালবাসতে পারে তার চেয়েও অনেক গভীর অতীশের এই ভালবাসা। তাই—তাই কী এ অস্থিরতা, চঞ্চলতা। শুয়ে শুয়ে ছটফট করল সে। সামান্য একটা চিঠি ! হয়তো তনুকা এককালে জয়ন্ত নামে ওই ব্যক্তিকে ভালবেসে থাকতে পারে। দু একটা ওই ধরনের চিঠি লেখাও খুব আশ্চর্য নয়। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের জীবনে এ রকম তো কতই ঘটে। গল্প-উপন্যাসে কত কাহিনীই অতীশ পড়েছে। ওটাকে আঁকড়ে মনে এত কষ্ট পাওয়া কেন ? একটা মেয়ের সারাজীবন ভালবাসার পাত্র হয়ে সে শুধু একাই থাকবে এটা ভাবতে বেশ মজা লাগে। কিন্তু তাই কী কখনও সম্ভব ? সে নিজেও কী কোনদিন অন্য কোন মেয়েকে—

পরের সোমবারও চিঠি এল। তনুকাই এগিয়ে দিল : এই নাও তোমার চিঠি।

হ্যাঁ, আগের মতই এনভেলাপের উপরে নাম ঠিকানা টাইপ করা। হুবহু একরকম। অতীশ দেখেই চিনতে পারল। ধীরে সুস্থে পকেটে রাখল সে।

কার চিঠি ?—তনুকা জিজ্ঞেস করে।

অতীশ গম্ভীর মুখে ভারী গলায় উত্তর দিল, অফিসের। তনুকা কোন সন্দেহ করল না। তারপর সে রান্নাঘরে চলে গেলে অতীশ তার পড়ার ঘরে এসে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। পকেট থেকে এনভেলাপটা বার করে। ছিঁড়তে গিয়েও একটু দ্বিধা। যদি না হয়ে থাকে, যদি অন্য কারুর দরকারী চিঠি কিংবা—না, সন্দেহ তার ঠিকই। অনুমান নির্ভুল।

প্রায় একই ধরনের চিঠি। তেমনই পুরনো বিবর্ণ ভাঁজ করা কাগজ। অথচ উজ্জ্বল চকচকে। পরিষ্কার হস্তাক্ষর। জয়ন্তদাকেই লেখা হয়েছে। সেই মেয়েটি কত ভালবাসে তাকে তারই নিদর্শন। শয়নে স্বপনে জাগরণে শুধু তার কথাই নাকি মনে পড়ে। তার সমস্ত নিদ্রাঘন রাত্রিতে জয়ন্তর মিষ্টি মুখটাই বারবার—। পাঁচ ছ বছর আগের তারিখ। চিঠির নীচে পত্রলেখিকার নাম—তনুকা।

অতীশ একটু অবাক হয়েই গেল। কে এই চিঠিগুলি পাঠাচ্ছে ? জয়ন্ত ? মানুষ এমন নিষ্ঠুর হিংস্র খেলা খেলতে পারে ? তনুকা হয়তো এককালে জয়ন্তকে ভালবাসত, জয়ন্তও ভালবাসত তনুকাকে। কিন্তু দুজনে তারা মিলিত হতে পারল না বলে এ কী উদ্ভট প্রতিশোধ ! এক একটা চিঠির দুঃস্বপ্নের স্মৃতি ভুলতে অতীশকে কত কষ্টই না সহ্য করতে হয়। আর জয়ন্ত কি এমনই করে প্রতি সপ্তাহে একটার পর একটা চিঠি পাঠিয়েই চলবে নাকি ? অতীশ আর তনুকা মুখোপাধ্যায়ের জীবনের স্বপ্নে ভাঙন ধরেছে ক্রমশঃ। ফাটল দেখা দিয়েছে তিন বছরের বিবাহিত জীবনের বনিয়াদে। কিন্তু তনুকা এখনও জানে না। এখনও অতীশ গোপন করে রেখেছে এই ঘটনা।

জয়ন্তদা। জয়ন্ত !

লোকটাকে একবার হাতের সামনে পেলে হত। এক ঘুষিতে টের পাইয়ে দিত এই রকম উদ্ভট রসিকতার মানে কী। ভারী মজা পেয়েছে সে। একটা নিউরোটি খেলায় চরম আনন্দ পেয়েছে !

অথচ।—অতীশ ব্যাপারটাকে ভুলতে চেষ্টা করল। চেষ্টা করল মন থেকে মুছে ফেলতে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। তনুকাকে নিয়ে পরপর দুদিন সিনেমায় গেল, নিয়ে গেল সেরা বিলিতি হোটেলে ; আর বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করেও কিনে দিল দামী শাড়ি, যা তার ভাল লাগে, সে যা চায়। প্রসাধন সামগ্রী থেকে শুরু করে কোনকিছুই বাদ যায় না।

তনুকা এককালে কবিতা লিখত। তাই অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পরপর তিন সন্ধ্যা বসে শুনেছে কবিতাগুচ্ছ। অতীশের কাছে যা কোনদিন ভাল লাগত না। সহ্য করতে পারত না সে। তবু হাসিমুখে আলোচনা করেছে ছন্দের আর মিলের—আশ্বাস দিয়েছে তনুকার কাব্যগ্রন্থ ছাপিয়ে দেবার।

কিন্তু শনিবার থেকেই মনটা উড়ু উড়ু করতে থাকে। কেমন একটা অস্বস্তি। চলতে ফিরতে কাজকর্মের মাঝে বার বার হানা দিয়ে যায় সোমবারের কথা। কখন্ আসবে সোমবার। সেই চিঠি। পুরনো ভাঁজ করা বিবর্ণ কাগজ। জয়ন্তদা। কেমন একটা নেশার মত পেয়ে বসেছে তাকে।

অফিসের কাজে মন বসতে চায় না। তাড়াতাড়ি কোন রকমে কাজ সেরে বাড়িমুখো হয়।

ঠিক সময়েই এল চিঠিটা।

অতীশ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো সেই দিকে। কী ছিল তার দৃষ্টিতে—সন্দেহ? আতঙ্ক? বিদ্বেষ? অথবা অন্য কিছু? এনভেলাপের উপরে স্পষ্ট অক্ষরে টাইপ করা। তার নাম। অতীশ মুখোপাধ্যায়। ঠিকানাটাও ভুল নয়, ৩২।৩ হরিমাধব সরকার লেন।

না, কোন ভুলই নেই।

জয়ন্তদাও আছেন।

তেমনই পরিষ্কার হস্তাক্ষর। প্রতিটি অক্ষর পড়া যাচ্ছে নিখুঁত আর নির্ভুলভাবে। দীর্ঘ ক বছরের ব্যবধানেও আশ্চর্য উজ্জ্বল রয়েছে লেখাগুলো।

তনুকা পাশের বাড়ির ভাড়াটেদের সঙ্গে আলাপ করতে গেছে। কাজেই ইজি-চেয়ারটাতে অতীশ আরাম করে গা এলিয়ে দিল। চোখের সামনে মেলে ধরল চিঠিটা। বক্তব্যের রকমফের তেমন নেই। তবে চাওয়া-পাওয়ার আকুতি যেন এবারে আরও নিবিড়, আরও ঘন। আরও বেশী জান্তব। সমাপ্তিতে শুধু আর তনুকা নয়, চোখটা চুকে গেল অতীশের, পাশেই লেখা 'তোমার রাণী'।

চিঠিটা মুড়ে এনভেলাপে রাখল সে। তারপর এনভেলাপটা পকেটে। একটু পরেই এল তনুকা। অতীশ তখন মুখ নীচু করে বাঁ হাত দিয়ে কপালটা সজোরে চেপে ধরেছে।

কী হয়েছে তোমার! মাথা ধরেছে নাকি?—তনুকা জিজ্ঞেস করে।

ও কিছু নয়।—অতীশ সহজ হতে চেষ্টা করল। তার ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত রহস্যময় একটা হাসি খেলে গেল। আস্তে আস্তে সে বলে, এইমাত্র একটা দুঃসংবাদ পেলাম—

তনুকা কেঁপে উঠল: দুঃসংবাদ! কী হয়েছে?

অতীশ তেমনই ভাবে বলে, আমাদের নয়। আমার এক বন্ধুর।

তোমার বন্ধু? কে? কী হয়েছে তাঁর।

তুমি চিনবে না তাকে, অতীশ বলে, জয়ন্ত তার নাম।

জয়ন্ত!—অস্ফুটস্বরে তনুকা বলে।

হ্যাঁ। কিন্তু তুমি অমন করে আছ কেন? চেন নাকি তাকে?

না তা নয়। মানে।—কী একটা কথা বলতে গিয়েও তনুকা বলতে পারে না। থেমে যায় সে।

জয়ন্তকে তুমি বোধ হয় দেখ নি। সুবোধ বালকের মত অতীশ জানায়: আমাদের বিয়ের প্রায় মাসখানেক আগে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। এর মধ্যে তার কোন খবরই পাই নি।

নিরুদ্দেশ কেন?

কেন? তা হলে একটা গল্প বলতে হয়। আচ্ছা তবে শোন। জয়ন্ত ছেলেটা সত্যি ভাল ছেলে ছিল। আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সেই ছিল সবচেয়ে সম্ভাবনাময়।

অতীশ আবার একটা সিগারেট ধরায়। খানিকক্ষণ চুপচাপ। তনুকার দিকে একবার আড়চোখে তাকায় সে। লক্ষ্য করে প্রতিক্রিয়া। মুখের হাবভাব।

অন্য প্রসঙ্গ আনে সে, তোমার একটা কবিতা পড়ে শোনাবে? নতুন কী লিখলে?

এ রকম খাপছাড়া কথায় তনুকা অবাক হয়ে গেল। কিছু বুঝতে পারল না সে। বলে, কবিতা এখন থাক্। তার চেয়ে তোমার বন্ধুর কথা বল শুনি।

আমার বন্ধু!—মনে মনে হাসল অতীশ।

জয়ন্ত! সত্যি ওর জন্য কষ্ট হয়। তার জীবনে প্রেম এসেছিল একটা অভিশাপের মত। যা তার জীবনকে ছিন্নভিন্ন টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। একটি মেয়েকে ভালবাসত জয়ন্ত। মেয়েটার নাম ঠিক আমার মনে নেই। তবে জয়ন্ত তাকে ডাকত রাণী বলে।

এই পর্যন্ত বলে আবার থামল ৩২।৩ হরিমাধব সরকার লেনের অতীশ মুখোপাধ্যায়। তনুকা সোজা হয়ে বসেছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে শুনছে তার কথা। অতীশ আনন্দ পেল। নিষ্ঠুর হিংস্র একটা আনন্দ। আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে এক একটা কথা বলে সে।

দিন দিন ওদের ভালবাসা গভীর হয়ে ওঠে। সিগারেটটায় জোরে টান দিল সে: তারপর কোন কারণে ওদের দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মনের আদান-প্রদান ঠিকই চলে। মেয়েটা প্রায়ই জয়ন্তকে চিঠি লিখত। চিঠি মানে প্রেমের চিঠি। একটার পর একটা। অজস্র। অসংখ্য। তাদের ভালবাসা লোকচক্ষুর আড়ালে নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে। আশ্চর্য গীতিকবিতার মত এক একটা চিঠি নিয়ে আসে সব আশা-স্বপ্নের উজ্জ্বল আবেশ। দুটি প্রাণ দুটি উন্মুখ আত্মা এক হয়ে মিশে যেতে চায়।

তারপর?—তনুকা জিজ্ঞেস করে।

জোরে জোরে হেসে ওঠে অতীশ।

তারপর যা হয়ে থাকে। সেই মামুলী উপন্যাসের কাহিনী। অর্থাৎ কোন এক শুভলগ্নে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল অন্য এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। বাবা-মা দেখে শুনে পাত্র পছন্দ করেছিলেন। আশ্চর্য! মেয়েটি বিয়েতে কোন অমত করল না। অবশ্য করলেও বিশেষ কিছু এসে যেত না, কেন না তার বাবা ছিলেন ভয়ানক কড়া। আর এদিকে জয়ন্ত। সে যখন দেখল তার আশা-স্বপ্ন মরীচিকার মত মিলিয়ে গেল, তখন সে একটা সাংঘাতিক প্রতিশোধ নেবার মতলব করল।

প্রতিশোধ?

হ্যাঁ প্রতিশোধই বটে। সে আবিষ্কার করল একটা হিংস্র নিষ্ঠুর খেলা। বিকারগ্রস্তের চমৎকার মনোবিলাস।

চকচক করে উঠল অতীশ মুখোপাধ্যায়ের চোখ দুটি। সে উঠে দাঁড়ায়। তারপর কেমন ক্লান্ত বিবশ স্বরে বলে, আজ থাক্ তনুকা। এ গল্প ভাল লাগবে না তোমার।

তনুকা কিছু বলবার আগেই বলে ওঠে অতীশ, এ তুমি সহ্য করতে পারবে না। বড় নিষ্ঠুর গল্প। বড় নিষ্ঠুর।

ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল অতীশ। মহানগরীতে বিবর্ণ দিনের রোলার গড়িয়ে গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঘরের দেওয়ালে প্রোফাইল মুখের আবছা ছায়া ফেলে ফেলে হেঁটে চলে, চতুষ্কোণ গণ্ডীর এই ক্ষুদ্র পরিসরে—অতীশের অশান্ত আত্মা।

* * *

পরের দিন অতীশ অবন্তী সেনের সঙ্গে দেখা করতে গেল। অবন্তী তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়: অতীশদা? তুমি এতদিন পরে। এস এস।

অভ্যর্থনায় ব্যস্ত হয়ে উঠল সে।

তোমার সঙ্গে কয়েকটা দরকারী কথা আছে অবন্তী।

বাব্বা, ঘোড়ায় যেন জিন চাপিয়ে এসেছ। আজ প্রায় তিন বছর পরে এলে। একটু বস, বিশ্রাম কর।

বিশ্রামের প্রয়োজন হবে না, অতীশ বলে, আমি তো এখনও ক্লান্তি বোধ করি নি। আর তা ছাড়া—

একটা সোফার উপরে বসতে বসতে সে জিজ্ঞেস করে, শঙ্খনাথবাবু কোথায়? তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না যে?

উনি এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। আর মিনিট দশেক আগে এলেই দেখা হয়ে যেত।

যাক ভালই হয়েছে। আমি তোমার কাছেই এসেছিলাম।

আমার কাছে?

অবন্তী জেনেশুনেও অবাক হবার ভান করে।

শোন, কথাটা কিন্তু খুব গোপনীয়।

অবন্তী সেন খিলখিল করে হাসে, ঘাড়টা সামান্য একটু কাত করে বলে, স্বচ্ছন্দে বলতে পার। কেউ আসছে না আপাততঃ।

শোন অবন্তী, আমাকে দারুণ একটা অশান্তির হাত থেকে আজ শুধু তুমিই মুক্তি দিতে পার।

আমি মুক্তি দিতে পারি? ভারী আশ্চর্যের ব্যাপার তো! পরিষ্কার করে বল, আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না।

বলছি।

ভণিতা বাদ দিয়ে প্রথমেই সোজা কথা বলে অতীশ, তোমাকে আমি এককালে যে সব চিঠি লিখেছিলাম—

ও, সেই সব প্রেমপত্রের কথা বলছ!—মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসে অবন্তী সেন।

অতীশ একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

তোমার মনে পড়ছে না সেদিনের কথা?

বা রে! মনে পড়বে না কেন! ওঃ, কী সাংঘাতিক কবিই তুমি ছিলে অতীশদা। প্রতিটি চিঠিতে কবিত্বের বন্যা বইয়ে দিতে।

অতীশ লজ্জিত হয়ে মুখ নামায়। বলে, আমি সেগুলো ফিরিয়ে নিতে এসেছিলাম।

ফিরিয়ে নিতে! কেন?

তুমি বুঝবে না অবন্তী। চিঠিগুলো আমার কী সাংঘাতিক প্রয়োজন।

অতীশদা তুমি ভয় পাচ্ছ? যদি কেউ দেখে ফেলে?

না না, অতীশ বাধা দিয়ে বলে, ঠিক সেজন্য নয়। লোকের ভয়ে নয়। এ আমার নিজের প্রয়োজনেই।

নিজের প্রয়োজন! মানে?

একটা মজার খেলা খেলব।

তুমি বলছ কি অতীশদা? সত্যি করে বল না কী করবে চিঠিগুলো দিয়ে?

শুনবে? চিঠিগুলো একটা একটা করে পাঠাব তনুকা নামে একটা মেয়ের কাছে। প্রতি সপ্তাহে একটা করে।

তনুকা! কে সে?

তনুকা মুখোপাধ্যায়। আমার স্ত্রী।

তোমার স্ত্রী? দাঁড়াও, মাথা খারাপ করে দেবে দেখছি। সব ব্যাপারটা আমাকে একটু ভালভাবে ভাবতে দাও। অন্য মেয়েকে লেখা প্রেমপত্র নিজের স্ত্রীর কাছে পাঠানো! এ যে দেখছি রীতিমত গোলকধাঁধা। লোকে যা ভয় পায় এড়িয়ে চলে, তুমি নিজের ইচ্ছেয় তাই করতে যাচ্ছ!

তুমি বুঝতে পারবে না অবন্তী।

তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি অতীশদা?

না এখনও হই নি। তবে তোমার চিঠিগুলো না পেলে নিশ্চয়ই হতে হবে। দয়া করে আমাকে দাও।

কিন্তু ওগুলোকে আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

পুড়িয়ে ফেলেছ!

অতীশ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল: অবন্তী সেন তুমি সত্যি বলছ পুড়িয়ে ফেলেছ চিঠিগুলো?

হ্যাঁ। আমি সত্যি কথাই বলছি অতীশদা।

কিন্তু কেন? কেন?

কেন! না পুড়িয়ে যে আমার উপায় ছিল না। আমার ভয় ছিল, আজ তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার ভয় ছিল।

কিসের ভয়, শঙ্খনাথবাবু যদি জানতে পারেন?

অবন্তী জবাব দেয় না।

অতীশ একেবারে চুপসে গেল। অনেক আশা উৎসাহভরা তার পরিকল্পনাটির অপমৃত্যু সে এইমাত্র

দেখতে পেয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল সে। ঠোঁটের কোণে একটা তির্যক হাসি ফুটিয়ে আস্তে আস্তে অতীশ বলল, কিন্তু তবু যদি তোমার স্বামী জানতে পারেন ?

তার মানে ?—অবন্তী সোজা হয়ে বসে।

ধর, প্রতি সপ্তাহেই তাঁর নামে একটা করে এনভেলাপ আসতে লাগল। আর যদি তাতে অতীশদাকে লেখা অবন্তীর পুরনো প্রেমের চিঠি একটা একটা করে গুঁজে দেওয়া হয় ?

অতীশদা! তুমি এ কী বলছ ?

অতীশ আশ্চর্য নিশ্চল আর নির্বিকারভাবে হাসল: কিছুই বলতে চাই নি আমি। আমার কাছে লেখা তোমার চিঠির সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। আর আমি, দুঃখের বিষয় অবন্তী, আজও তা যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

ওগুলো দিয়ে আর কী করবে তুমি ?

এখনও বুঝতে পার নি! তোমার চিঠি তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব কিন্তু তোমার হাতে নয়। এনভেলাপের মধ্যে পুরে প্রতি সপ্তাহে একটা করে পাঠাব শঙ্খনাথ সেনের নামে। প্রয়োজনের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

বিচলিত হয়ে পড়ে অবন্তী: অতীশদা, এই কথা বলবে বলেই বুঝি আজ এতদিন পরে এসেছ ?

তুমি ভুল করছ অবন্তী। ঠিক আগের মুহূর্তেও আমি জানতাম না যে এই কথাগুলি আমাকে বলতে হবে। উচ্চারণ করতে হবে।

অতীশদা তুমি এত নিষ্ঠুর!

কিন্তু তা না হয়ে যে আমার উপায় নেই। আমাকে এই খেলাই খেলতে হবে।

মনে পড়ে তুমি আমাকে ভালবাসতে ?

পড়ে, আস্তে আস্তে চিবিয়ে বলে অতীশ, মনে পড়ে বইকি। অন্ততঃ আমার দিক থেকে কোন ফাঁক ছিল না। তবু যখন দেখলাম আমাদের জীবনছন্দ আলাদা হয়ে গেল, আমাদের চলার পথ বিচ্ছিন্ন—

হঠাৎ সে উত্তেজিত হয়ে বলে, কিন্তু আমার নিজের জীবন, সুখশান্তি তাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার কী অধিকার আছে অন্যের। অন্য মানুষের ?

আমি···আমি—

অবন্তী হঠাৎ কেঁদে ফেলল। দু হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এতক্ষণে অতীশ খুশী হয়ে উঠল। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আস্তে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। তবে মুখে ফুটে ওঠে অদ্ভুত ধরনের হাসি। অথবা, বলা যেতে পারে, হাসির নামে এক অপরূপ মুখ-বিকৃতি। না, খেলা এখনও শেষ হয় নি। আরও বাকি আছে। অনেক বাকি। তার নিষ্ঠুর নির্মম খেলার এই তো সবে শুরু। আরও বাকি আছে—করবী, অজন্তা, মিত্রা। পড়ার ঘরে গোপনে অতীশ যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছে তাদের প্রেমপত্রের গুচ্ছ। জীবনে অনেক মেয়ের সংস্পর্শেই এসেছিল সে। তাদের সবার জীবন বিষময় করে তুলবে। জীবনে জ্বালা ধরুক তাদের। জ্বলে পুড়ে মরুক তারা। অতীশ চরম প্রতিশোধের খেলা পেয়েছে।

আর জয়ন্তর ওপরে তার কোন রাগ কোন বিদ্বেষ নেই। বরং এই খেলাটি শিখিয়ে দেবার জন্য অতীশ তার প্রতি কৃতজ্ঞ। রীতিমত কৃতজ্ঞ। মনে মনে সেই অপরিচিত ব্যক্তির জন্য একটা প্রবল সহানুভূতিতে মন ভরে যায় অতীশের। পথ চলতে চলতে তনুকার কথা মনে পড়ে। মনের কোণে তার পদ্মকলির মত মুখটা সংগোপনে উঁকি দেয়। তনুকাকে সে বড় বেশী ভালবেসেছিল। সেইজন্যেই তো এমন উন্মাদ হতে পারল অতীশ। এমন একটা নিউরোটিক খেলায় মেতে উঠতে পারল!

অনেক—অনেক বেশী দাম দিয়ে তাকে এই খেলাটি শিখতে হয়েছে।

এই রহস্যের চাবিকাঠি পেতে গিয়ে অতীশকে তার পাঁজরার এক একখানি হাড় খুলে উপহার দিতে হয়েছে। এ কথা কেউ জানবে না। কেউ না।

অতীশ তাই এমন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল। প্রতিশোধের এমন চমৎকার অস্ত্রটি একেবারে হাতের কাছে কুড়িয়ে পেয়ে আর নিশ্চুপ থাকতে পারছে না সে।

অনেক রাত্রিতে চুপে চুপে বিছানা ছেড়ে উঠল অতীশ। তাকিয়ে দেখল তনুকা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থেকে পা টিপে টিপে সে নামল।

অন্ধকারে চোরের মত সন্তর্পণে আর ভয়ে তার পড়ার ঘরে এসে ঢুকল। এসে দরজা বন্ধ করল। আলো জ্বালাল। তারপর সে বার করে আনে গোপন প্রেমপত্রের সেই গুচ্ছগুলি—যে চিঠি তাকে লিখেছিল অবন্তী, করবী, অজন্তা কিংবা মিত্রা। অতীশ পরম পৈশাচিক দৃষ্টিতে বার বার তাকায় প্রতিশোধের হাতিয়ারগুলির প্রতি। কল্পনায় সে দেখতে পেল শঙ্খনাথ সেন, সুবিনয় মিত্র, হীরেন গাঙ্গুলী আর ভবনাথ দাশগুপ্তের মুখগুলি। ভোঁতা বিষণ্ণ একসার মুখ। বৃশ্চিক দংশনের কত জ্বালা একবার অন্ততঃ জানুক।

নিশ্চল একটা স্থবির পাথরের মত বসে রইল। অনেকক্ষণ। একা ধ্যানী গম্ভীর নিশ্চলতা প্রতীকীচিহ্নের মত। তারপর সে যা করছে, অতীশ নিজেই তা বুঝতে পারল না। হয়তো ভুল হল। জীবনের একমাত্র চরম অস্ত্রটিকে হাতের কাছে পেয়েও—

পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে অতীশ।

আগুন ধরায়। আর তারপরে আস্তে আস্তে সেই ক্ষুদ্র জ্বলন্ত আগুনের শিখা স্তূপীকৃত চিঠিগুচ্ছের কাছে এগিয়ে নিয়ে যায়। কাছে। আরও কাছে।

'কথা ও কাহিনী' প্রসঙ্গ এবং "অভিসার" কবিতা

কল্যাণী দত্ত

'কথা ও কাহিনী' প্রকাশিত হয়েছে ১৯০৮ সনে, ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে। তখন শিক্ষিত সমাজেও বুদ্ধের জীবন কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্য নিয়ে আলোচনার যথেষ্ট অভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে 'নরোত্তম' বলে 'মহামানব' বলে উল্লেখ করেছেন, বিশ্বাস করেছেন, যে 'তাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা পবিত্র হয়েছিল'। বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই অপরিসীম শ্রদ্ধা কোনদিন টলে নি, বরং জীবনের আদিতে যেমন ছিল উত্তরোত্তর আরও বেড়েছে। তাঁর অগণিত পাঠকবর্গ এই শ্রদ্ধার উত্তরাধিকার পেয়েছে। ছেলেবেলায় স্কুলে তারা 'কথা ও কাহিনী' পড়ে—তখন থেকেই সুদাস মালীর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা দেশের ছেলেমেয়েরা সেই নিরঞ্জন 'আনন্দ-মূরতি'কে প্রণাম করতে শেখে রবীন্দ্রনাথের প্রসাদে।

কবি তাঁর সমগ্র জীবন ধরে অসংখ্য গান ও কবিতায়, নাটকে ও প্রবন্ধে বৌদ্ধ-কাহিনী বিবৃত করেছেন, বৌদ্ধ যুগকে চিত্রিত করেছেন, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধযুগের বিপুল শিল্পসম্ভার এবং জীবনের অজস্র ঐশ্বর্যের দিকে তিনি বহু বার ইঙ্গিত করেছেন। এরই ফলে আমাদের চোখ যেভাবে খুলেছে, ইতিহাসের চর্চার ফলেও ঠিক তেমন হয় নি।

কিছুকাল হল বিশ্বভারতী কবির গদ্য পদ্য রচনা থেকে সঙ্কলন করে 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাদের অনেক দিনের অভাব মোচন করেছেন। বইটিতে সারনাথে প্রাপ্ত একটি বুদ্ধ মূর্তির ছবি আছে, তার নীচে "মূল্যপ্রাপ্তি" কবিতার "বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে" ইত্যাদি চিরস্মরণীয় চরণ দুটি দেওয়া থাকলে আমরা আরও খুশী হতুম। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা না বলে থাকতে পারছি না।

রবীন্দ্রনাথকৃত ধম্মপদের অনুবাদ (যা পরে আংশিক ভাবে আনন্দবাজার পূজা-বার্ষিকীতে এবং পরে বিস্তৃতভাবে বিশ্বভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়) এবং চারুবাবুর অনূদিত ধম্মপদের কবিকৃত সমালোচনা (প্রাচীন সাহিত্যের শেষ প্রবন্ধ) প্রভৃতি বিক্ষিপ্ত লেখাগুলো এক করে আরও একটি সঙ্কলন বের করা উচিত। শিল্পী অসিত হালদারের 'বাগ্‌ গুহা ও রামগড়' বইতে কবি যে মূল্যবান ভূমিকা লেখেন সেটি এই সঙ্কলন গ্রন্থে থাকলে পাঠকসাধারণের সুপ্রাপ্য হবে।

ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রবন্ধাবলী রবীন্দ্রনাথকে প্রথম জীবনে বৌদ্ধ-কাহিনীকে কাব্যে রূপায়িত করার প্রেরণা দেয়, এরই ফল 'কথা ও কাহিনী'। পরবর্তীকালে তাঁর 'চণ্ডালিকা' 'নটীর পূজা' 'অচলায়তন' কিংবা নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' অনেক বিস্ময়কর রচনা। কবি যেন যাদুকরের মত কী মায়ামন্ত্রে বৌদ্ধযুগের বাতাবরণ উপস্থিত করেছেন সহৃদয় সামাজিকের কাছে। 'নটীর পূজা'র অভিনয় দেখতে দেখতে দর্শকের তাই মনে পড়ে সে নিজেই ছিল নৃপতি বিম্বিসারের যুগের নাগরিক, "মহাযোগীর চরণ স্মরি মোহমোচন বাণী" সেও একদিন পড়েছে। এই রচনাগুলি এত স্বাভাবিক এবং সহজ যে পড়তে পড়তে পাঠকের কখনও মনে হয় না যে কবি বৌদ্ধ-ইতিহাস ও সাহিত্যে কী পণ্ডিত ছিলেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ তাঁর বাগীশ্বরী প্রবন্ধাবলীতে এক জায়গায় শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বা কবিকর্মকে বলেছেন 'নিমিত্তি'—যার নির্মাণের কৌশল চিরদিন চোখের আড়ালেই লুকনো থাকে। রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলিও এক একটি নিমিত্তি, তাই এদের নির্মাণের কৌশল আমাদের জানার আড়ালেই রয়ে গেল। কেবলমাত্র এদের উপাদানের দিকটাই আমরা চেষ্টা করলে জানতে পারি।

সুখের বিষয় বাঙালী সুধীসমাজের দৃষ্টি এদিকে পড়েছে। বিশ্বভারতী পত্রিকায় (একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) অধ্যাপক বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য "পরিশোধ কবিতা ও শ্যামা জাতক" এবং "যুগ ও জীবন" পত্রিকায় (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) অধ্যাপক বিনায়ক সান্ন্যাল "অচলায়তন" নাটক নিয়ে অতি সুন্দর এবং বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 'কথা ও কাহিনী'তে এই ধরনের কবিতা রয়েছে মোট আটটি—'অবদানশতক' থেকে তিনটি, 'মহাবস্তবদান' থেকে দুটি, 'দিব্যাবদান মালা,' 'কল্পদ্রুমাবদান' এবং 'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা' থেকে যথাক্রমে একটি করে কাহিনী নেওয়া হয়েছে। আমরা আজ অতি পরিচিত "অভিসার" কবিতাটির মূল নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাই—ভরসা করি প্রাচীন অবদান-কথা পাঠকের অরুচিকর হবে না।

'বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা'র লেখক ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র একাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রতিভাবান কবি ছিলেন। তাঁর গ্রন্থের দ্বিসপ্ততিতম পল্লব হল 'উপগুপ্তাবদান'। এতে মোট বাহাত্তরটি শ্লোক, তার মধ্যে প্রথম ত্রিশ-বত্রিশটি শ্লোকের মর্মার্থ নিয়ে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতা রচনা করেছেন। মূল কাহিনীটি এইরকম:

মথুরানগরে প্রসিদ্ধ গান্ধিকের (গন্ধবণিকের) সন্তান ছিলেন শ্রীমান উপগুপ্ত। সে দেশে তখন ভিক্ষু শাণবাসীর খুব প্রতিপত্তি। উপগুপ্তের পিতা পুত্রের জন্মের পূর্বেই সঙ্কল্প করেছিলেন যে পুত্র জন্মালে যথাকালে তাকে ভিক্ষু শাণবাসীর অনুচররূপে উৎসর্গ করে দেবেন। যাই হোক পিতার ইচ্ছামত উপগুপ্ত কিছুকাল পৈত্রিক কর্মে অর্থাৎ অগুরু-চন্দন কস্তুরী কর্পূর ইত্যাদি বিক্রয়ের কাজে লিপ্ত থাকেন।

উপগুপ্তের রূপগুণ, বিদ্যাবিনয়, নবযৌবন এবং আসন্ন ব্রতাচরণের আলোচনায় মুখর ছিলেন মথুরার জনসমাজ। নগরচত্বরে সর্বত্র তাঁর প্রশংসা শুনে শুনে নগরের প্রধান গণিকা বাসবদত্তা একদিন তাঁর কাছে দূতী পাঠায়। উপগুপ্তের গন্ধ বিক্রয়ের আপণে দূতী এসে কৌশলে বাসবদত্তার অভিপ্রায় নিবেদন করতেই স্মিতমুখে উপগুপ্ত তাকে বললেন, "অয়ং নাভিমতঃ কালস্তস্যাঃ সন্দর্শনে মম" অর্থাৎ 'এখনও আমার সময় হয় নি'।

উপগুপ্তকে না পেয়ে বাসবদত্তা প্রথমে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ এবং উৎকণ্ঠ হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করেছিল। যাই হোক কিছুকাল কেটে যাবার পর একদিন তার গৃহে উত্তরাপথ থেকে এক ধনী যুবক এসে উপস্থিত হল। এক রাত্রির অতিথি হওয়ার পরিবর্তে সে প্রচুর স্বর্ণ এবং উত্তম বস্ত্র ও বিলাসদ্রব্য দিতে প্রস্তুত। বাসবদত্তা তার চতুরা জননীর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখল যে একেই—

"অপ্রিয়েঽপি প্রিয়াস্বাদং করোতি প্রথমাদরঃ"

তা ছাড়া

"ন ধর্মায় ন কামায় বয়মর্থায় নির্মিতাঃ"।

সুতরাং নতুন বন্ধুত্ব এবং প্রচুর টাকার লোভে এতদিন যে যুবকের সঙ্গে সে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বাস করছিল, তাকে বিষাক্ত মদ্য পান করিয়ে হত্যা করে আবর্জনারাশির মধ্যে ফেলে দিল। নতুন অতিথির কাছে সে যে প্রচুর বিত্তলাভ করল তা ভোগ করবার আগেই কিন্তু বিঘ্ন উপস্থিত হল। নিহত বণিকপুত্রের বন্ধুরা রাজদ্বারে সংবাদ দিতেই গুপ্ত হত্যাকাণ্ডের কাহিনী সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে পড়ল।

তখন দেশের রাজা বিচারে অত্যন্ত নির্মমভাবে এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং নরহত্যার শাস্তি বিধান করলেন। বাসবদত্তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন করে তাকে নগরের বাইরে শ্মশানে ফেলে দেওয়া হল। তার একটি পুরনো দাসী তার মায়া ত্যাগ করতে না পেরে তার কাছে বসে শ্মশানের কুকুর শেয়াল খেদিয়ে রাখতে লাগল। সংবাদ পেয়ে এলেন সন্ন্যাসী উপগুপ্ত।

চন্দ্রের মত প্রিয়দর্শন উপগুপ্ত আসছেন শুনে বাসবদত্তা সেই অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্যে সহসা লজ্জিতা হয়ে পড়ল— 'পূর্বাভিলাষ শেষেণ সা লজ্জাকুটিলাভবৎ।' তার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হল, কেন না মানুষের অন্তরে গূঢ়প্রবিষ্ট অনুরাগ কোন অবস্থাতেই নষ্ট হয় না—"ন কস্যাংচিদ্ অবস্থায়াং রাগস্ত্যজতি দেহিনাম্।" দাসীর কাছে বস্ত্র-ভিক্ষা করে নটী তার ছিন্ন রক্তাক্ত শরীর আবৃত করল, চোখের জলে ভিজে যেতে লাগল তার বসন সঙ্গে সঙ্গে।

'বাষ্পাম্বুপ্লাব্যমানাংশুকাঞ্চলা' বাসবদত্তা তার প্রিয়তমকে বলছে :

তোমাকে পাবার জন্য অনেক প্রযত্ন করেছি, বহু প্রতীক্ষা করেছি, তখন তুমি সাড়া দাও নি। আমার সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য বিলাসবিভ্রমের দিন কেটে গেল, তুমি এলে না। এখন আমার দেহ ছিন্ন, রুধিরে লিপ্ত, ক্লেশের আর অবধি নেই। হে কমললোচন, তোমার দর্শনের, তোমার সেবার কোন্ ফল বা আমি এখন পাব।

* * *

প্রযত্নেনাপি মহতা নায়াতস্ত্বং ময়ার্থিতঃ।
অধুনা মন্দভাগ্যায়াস্তবসন্দর্শনেন কিম্॥

* * *

কৃত্তাঙ্গী রুধিরাদিগ্ধা চ্যুতাহং ক্লেশসাগরে।
কালঃ কমলপত্রাক্ষ কিময়ং দর্শনস্য মে॥

সন্ন্যাসী স্নেহে এবং অনুতাপে বিগলিত হয়ে ধীরে ধীরে তাকে বললেন, তুমি তো জান তোমার চন্দ্রকান্তি তোমার পদ্মনিন্দিত বদন কিংবা লাবণ্যময় দেহ এসব আমার প্রিয় বস্তু নয়। আমি এসেছি কামনার পরিণামবিরসা মূর্তি দেখতে —"কামানাং প্রকৃতিং বিচারবিরসাং দ্রষ্টুং সমভ্যাগতঃ।"

উপগুপ্তের নানা উপদেশ শুনতে শুনতে বাসবদত্তার মনে বৈরাগ্যের উদয় হল। মৃত্যুকালে সে পবিত্র ত্রিরত্নের শরণ নিল। তার পর নটীর দেহত্যাগের সংবাদ পেয়ে মথুরার নাগরিকেরা সমারোহে তার সৎকার করেছিল।

পাঠক দেখবেন, কাহিনীটি চমৎকার হলেও রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে এর বিশেষ মিল নেই (যেমন মিল নেই কবির পরিশোধ কবিতার সঙ্গে শ্যামা জাতকের)। রবীন্দ্রনাথের বাসবদত্তা দূতী পাঠায় নি, লজ্জায় বিনম্র হয়ে অভিসারিকার সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ জানাবার ভঙ্গীটি বড় সুন্দর, সঞ্চারিণী দীপশিখার মত তার চিত্রটি পাঠকের চিত্তে মুদ্রিত হয়ে থাকে। তাকে অর্থলুব্ধ এবং হত্যাকারী আমরা কোনক্রমেই ভাবতে পারি না। তার চরমদণ্ডের বীভৎসতার পরিবর্তে কবি কল্পনা করেছেন, 'নিদারুণ রোগে মারী গুটিকায় ছেয়ে গেছে তার অঙ্গ।' ক্ষেমেন্দ্রের কবিতায় বাসবদত্তার অন্তিম উক্তিগুলি মর্মান্তিক অথচ সুন্দর। "অভিসার" কবিতায় এ জিনিস নেই, তার কারণ "অভিসার" কেবল কাহিনী-কবিতা নয়, অভিসারিকার চরিত্রশুদ্ধি বর্ণনার চেয়ে সৌন্দর্যসৃষ্টিই এখানে কবির লক্ষ্য। সমস্ত রকম স্থূলতা থেকে মুক্ত এ কবিতা শুধু আভাসে আর ইঙ্গিতে গড়া, তার শেষ স্তবকে যেখানে :

কুজিছে কোকিল ঝরিছে মুকুল
যামিনী জ্যোছনামত্তা

সেখানে কোন ফলশ্রুতি নেই, কিন্তু কবি যেন পাঠকের হাত ধরে তাকে এক অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোকে উপনীত করে দিয়েছেন।

'অবদান কল্পলতা'র বাসবদত্তা চরিত্রের সঙ্গে 'মহাবস্তুবদানে'র* শ্যামা চরিত্রের তুলনা সহজেই মনে আসে। বাসবদত্তা যেমন অতিথি যুবকের জন্য শ্রেষ্ঠিপুত্রকে হত্যা করেছে, শ্যামাও তেমনই বজ্রসেনের জন্য এক বণিকপুত্রকে (যাকে রবীন্দ্রনাথ "পরিশোধ" কবিতায় উত্তীয় বলেছেন) হত্যা করে। এর সঙ্গেও শ্যামা প্রথামত চুক্তি করেই বাস করছিল। বণিকপুত্রকে হত্যা করার পর শ্যামা কিছুকাল বজ্রসেনের সঙ্গে বাস করতে থাকে। এই গুপ্ত হত্যা কাহিনী জানতে পেরে ভীত বজ্রসেন কৌশলে পালিয়ে যায়। ক্রমশঃ বণিকপুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন কিছুতেই গোপন রাখা সম্ভব হল না, তখন একটা মৃতদেহকে বণিকপুত্র সাজিয়ে নানা মিথ্যা কথা রটিয়ে, শ্যামা তার সখীদের নিয়ে দল বেঁধে শোক করতে থাকে। তার কান্নাকাটির বহরে সকলেই তার কথা বিশ্বাস করেন। হত্যার সন্দেহ পর্যন্ত কারও মনে না হওয়ার ফলে তাকে রাজদণ্ড এমন কি কোন ধিক্কারও ভোগ করতে হয় নি।

* এমিল সেনাট সম্পাদিত 'মহাবস্তুবদান' একে বহুদিন ধরেই দুষ্প্রাপ্য বই, তা ছাড়া মিশ্র ভাষায় লেখা। পাঠকের পক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকা থেকে পূর্বোক্ত আলোচনাটি দেখে নেওয়াই সুবিধাজনক। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর রবীন্দ্র-জীবনী ৪র্থ খণ্ডে অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই প্রবন্ধেরই উল্লেখ করেছেন। শ্যামা চরিত্রের রূপান্তর এবং পরিণতি ও শ্যামাজাতকের সম্পূর্ণ কাহিনী অধ্যাপক ভট্টাচার্য বর্ণনা করেছেন সুতরাং পুনরায় বলা নিষ্প্রয়োজন।

বাসবদত্তা এবং শ্যামা দু জনের একজন মথুরার অন্যজন বারাণসীর প্রধান গণিকা, সুতরাং অবশ্যই অসামান্য রূপসী এবং অশেষ কলাবতী। কিন্তু দীর্ঘকালের পরিচিত (শ্যামার চুক্তি ছিল বার বছরের, বাসবদত্তার চুক্তিকালের কথা ক্ষেমেন্দ্র বিশেষ করে বলেন নি) ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, তাকে হত্যা করতে কেউই তারা ইতস্ততঃ করে নি। বাসবদত্তা শোচনীয় ভাবে অর্থলোলুপ এবং শ্যামা অসাধারণ ছলনাপটু ও মিথ্যাবাদী। শ্যামার মিথ্যা ভাষণের ও ছলনাপটুতার বিশদ বিবরণ অধ্যাপক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে দেওয়া আছে। ধরা পড়ার পর বাসবদত্তা বীভৎস দণ্ড ভোগ করলেও অন্তিম সময়ে তার বাঞ্ছিতকে গুরু এবং উপদেষ্টা রূপে পেয়েছিল। নরহত্যার ফলে শ্যামাকে শারীরিক দণ্ড তো দূরের কথা সামান্য লাঞ্ছনাও ভোগ করতে হয় নি। নিহত বণিকপুত্রের পরিবারের বিধবা পুত্রবধূর মতই সে নিরাপদ আশ্রয় লাভ করেছিল। কিন্তু তার প্রেমাস্পদ বজ্রসেন ভয়ে এবং ঘৃণায় চিরজীবনের মত তাকে ত্যাগ করে দূর দেশে চলে যায়। সুতরাং শাস্তি কার বেশী হয়েছিল এ নিয়ে তর্ক উঠতে পারে।

কিন্তু দুজনকার নিন্দিত জীবনেই বিস্ময়কর এবং দৃঢ়মূল প্রেমের আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটেছিল! এই প্রেমের গৌরবেই তারা এক যুগে বোধিসত্ত্বের জাতকে অন্য যুগে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে স্থান পেয়েছে! এ যুগের 'মহাকরুণা বিহারী' মহাকবি তাদের কালিমাকে আড়ালে রেখে, এঁকেছেন শুধু "শুভ্র সুকোমল কমলউন্মীল অপরূপ পমুখ", সৃষ্টি করেছেন সৌন্দর্যের ইন্দ্রজাল।

১৭

সন্ধ্যে থেকেই লামাকে আর দেখতে পাই নি। আমাকে উমেদ সিংয়ের তাঁবুতে পৌছে দিয়ে কোথায় যে তিনি সরে পড়লেন, রাতে আমার পক্ষে খুঁজে বার করা আর সম্ভব হল না। নিমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, সে আমার কথা বুঝতে পারবে না।

আজ তাঁবুর ভিতর শুধু আমরা দুজন—নিমা আর আমি। ছোট ছেলেটা এক ধারে পড়ে অঘোরে ঘুমচ্ছে। শোবার কথা মনে হতেই বড় অস্বস্তি বোধ হল প্রাণে। তাঁবুটা তো কোন ধর্মশালার হলঘর নয় যে, একরাশ মেয়ে পুরুষ ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে শুয়ে ঘুমব। আজ প্রথম মনে হল যে, কত অপ্রশস্ত এই তাঁবুগুলো। কত নীচু তার ছাদ! দুটো মানুষ শুতে গেলেও গায়ে গা ঠেকে যায়, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস লাগে। মনে হল, এ অসম্ভব। এই মাখনের প্রদীপটুকু জ্বলছে বলেই এখনও আমরা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। এটুকু নিবিয়ে দিলেই হয়তো গভীর অন্ধকার তার দুখানা হাত বাড়িয়ে আমার গলা টিপে ধরবে।

আর একবার তাকালুম নিমার দিকে, খুব পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে তাকে। অদ্ভুত সুন্দর! প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে। আরও গভীর ভাবে তাকে দেখলুম, তবু তার মনের ভাব পড়তে পারলুম না তার ঠোঁটের টানে। দৃষ্টিতেও কোন অর্থ নেই যেন। মানুষ এমন উদাসীন হয় কী করে! মুখ যেখানে মূক, অন্তরটা বাচাল হোক না আচরণে!

মনে হল নিমা বুঝি সজীব নয়। কাঠ আর খড়ের উপর মাটি চড়িয়ে মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে তাকে। প্রাণ থাকলে তার চঞ্চলতা থাকত। এমন করে একটা পুরুষমানুষের সামনে নিঃশব্দে নিষ্ক্রিয় দাঁড়িয়ে তাকে বিভ্রান্ত করত না। রাগ হল তার উপর, আশ্রয় দিয়েছে বলে এমন অসহায় হতে তো আমি চাই নি। এ কোন্ ছলনা তার?

ইচ্ছে হল, কঠিন ভাষায় আমি এ অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়ে দিই। চিৎকার করে তাকে কিছু কটুকথা শোনাই। কিন্তু—

আবার দেখলুম নিমাকে। এতটুকু অসংযমের চিহ্ন নেই তার চোখে মুখে, তার দেহের ভঙ্গিমায়। পুতুলের মত দাঁড়িয়ে বুঝি আমার আজ্ঞার অপেক্ষা করছে। আরও অসহায় মনে হল নিজেকে। যা বলতে চাই তা যদি বলতে না পারি, তার চেয়ে দুঃখের বুঝি কিছু নেই। রাগ হল দুনিয়ার লোকের উপর। এতগুলো ভাষাকে প্রশ্রয় দিয়ে মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখছে মানুষের কাছ

থেকে। এ যেন হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করে ইংরেজের ভারতশাসনের চেষ্টা।

রাগ হল লামার উপর। সে লোকটাকে আজ এই মুহূর্তে সামনে পেলে তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলতুম। বুড়োটা কী শেষে সুহু আঙমার তাঁবুতেই গিয়ে ঢুকল!

নিমা তখনও তেমনই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এ মেয়েটাই বা কী রকম! হলই বা তিব্বতী, একটুখানি অনুভূতি থাকলে কার কী ক্ষতি হত? যত দায়, সবই কি আমারই?

মনে হল, এমন-ই চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বুঝি আমার দুর্বলতারই পরিচয় দিচ্ছি মেয়েটার কাছে। মনে হল, ভাবনার যদি কিছু থাকে তো ওই মৌন মেয়েটাই ভাবুক। আমি কেন পরের ভাবনা ভেবে নিজের মাথাটাকে ক্লান্ত করি।

হঠাৎ এক ঝলক আরাম পেলুম। সত্যিই তো, পরের ভাবনা আমি কেন ভেবে মরছি! লামা নেই, নিমা তো আছে। নিমা আর আমি। ছেলেটা ঘুমচ্ছে। তারপর আমরাও ঘুমব। তাঁবুর ভিতর যথেষ্ট জায়গা আছে।

দেওয়ালের কাপড়ের উপর প্রদীপের আলো পড়েছিল। সাদা কাপড়ের উপর কালো কালো দাগ পড়েছে। বোধ হয় বৃষ্টি আর ঝড় তার চিহ্ন রেখে গেছে। এদিকেও বৃষ্টি পড়ে, কিন্তু সে বৃষ্টি আমাদের দেশের মত নিশ্চয়ই নয়। সেদিন যে বৃষ্টি দেখলুম, সে তো বৃষ্টি নয়, শুধু বিদ্যুৎ আর শিলা! বড় তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ আর ঠাণ্ডা শিলা! আমাদের দেশে এখন বর্ষা নেমেছে। মেঘে মেঘে সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে যাবে, গুরু গুরু করে ডাকবে সেই মেঘ। তারই সঙ্গে অবিশ্রাম বর্ষণ। সেখানকার মেঘে কত জল ধরে! শুধু বিদ্যুতে আর শিলাতেই আমাদের দেশের বর্ষা শেষ হয়ে যায় না। চোখের সামনে দেখলুম, বাংলার আকাশ বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে।

নিমাকে ভারি ভাল লাগল।

সকালবেলা ওয়াং ডাকের তাঁবুর সামনে দেখলুম লামাকে। খানিকটা জল নিয়ে ঘষে ঘষে দাঁত মাজছেন। আমাকে দেখতে পেয়েই খুশী হলেন। প্রফুল্ল হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখখানা। বললেন: রাতে ঘুমিয়েছ তো ভাল?

সে কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। বললুম: কিন্তু আপনি হঠাৎ কেটে পড়লেন কেন বলুন তো?

লামা বললেন: কেটে পড়ি নি তো। ক্ষতগুলোর ব্যথায় ওয়াং ডাকের অনেক জর এসেছিল, তার উপর পাঁজরার ব্যথা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছিল লোকটা। সুহু আঙমাদের কাছ থেকে ফিরে এসে শুনি কাউকে সে তার রোগ দেখাবে না। তার চাকর একজন লামাকে ডেকে এনেছিল, যা তা বলে ওয়াং ডাক তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, বিনে চিকিৎসায় সে এইখানেই মরবে, তবু লামার দেওয়া প্রাণ সে কিছুতেই দেশে নিয়ে ফিরবে না। কাজেই বুঝতে পারছ, আমার আর ফেরা হল না।

জিজ্ঞেস করলুম: এখন কেমন আছে?

লামা বললেন: অনেকটা ভাল, রাতের মত আবোল-তাবোল আর বকছে না। তবে দু-একদিনে সেরে উঠবে বলে মনে হয় না।

সুহু আঙমাদের খবর জিজ্ঞেস করলুম।

লামা বললেন: তাদের কাছেই এখন যাচ্ছি। মেয়েটাও বিশেষ ভাল নেই। সারাদিন কান্নাকাটি করছে।

জলের পাত্রটা ওয়াং ডাকের চাকরের হাতে দিয়ে বললেন: তোমরা কবে ফিরছ? সময় পেলে দেখা কোর একবার।

এক বাটি স্তেজা গিলে আমিও বেরিয়ে পড়লুম। গ্যাকার্কোর হাট তখন ভাঙতে শুরু করেছে। মনে হল, আমাদের জীবনের হাটেও ভাঙন ধরেছে। সুখে হোক দুঃখে হোক, এতদিন আমরা এক পরিবারভুক্ত ছিলুম। ওয়াং ডাক যখন ছেরিং পেনছোর সঙ্গে তাদের হিংসার ছুরিতে শান দিয়েছে, তখনও তাদের পর মনে হয় নি। আজ নিমার দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি নি, বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল তাকে। অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ছেরিং পেনছো ছুটে গেছে কোন্ অজ্ঞাত পথে। তার জীবনটা খরচের পাতাতেই নিমা লিখে রেখেছে। ফিরে যদি আসে

সে হবে তার সৌভাগ্য। তার বড় স্বামী হয়তো আসবে। না ফিরলেও আশ্চর্য হবে না নিমা। সুস্থ আওমা তার লামাকে হারিয়েছে। ওয়াং ডাক তো আর তাকে চায় না। আঘাতে আঘাতে সে লোকটা নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। আমি ফিরে যাচ্ছি আমার নিজের দেশে। কাল সন্ধ্যাবেলায় দেখেছিলুম, এই ভাঙন লক্ষ্য করে লামাও বিচলিত হয়েছেন অন্তরে অন্তরে। তাঁর মুখেও আর সে প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

উমেদ সিংয়ের দোকানে যাবার পথে সুস্থ আওমার তাঁবুটায় একবার উঁকি দিয়ে গেলুম। তার বাপ বেরিয়ে গেছে, কিন্তু সে তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠে নি। আমাদের লামা তার পাশে বসে তার কপালে আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি নিঃশব্দে সরে গেলুম। পিছনে আমার উপস্থিতি কেউই হয়তো লক্ষ্য করলেন না।

উমেদ সিং বোধ হয় আমারই অপেক্ষায় বাইরে পায়চারি করছিলেন। আমাকে আসতে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন, বললেন: এতক্ষণ তোমারই অপেক্ষা করছিলুম।

আমি কিছু বলবার আগে নিজেই আবার বললেন: কাল অনেক রাত পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করেছি। ভেবেছিলুম, তুমি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

বললুম: আমিও তাই ঠিক করেছিলুম। কিন্তু সবই কেমন যেন গুলিয়ে গেল। রাতে আমাদের লামা ফিরলেন না। তিনি না থাকলে তো কোনও কথাই আমি বলতে পারি না।

উমেদ সিং মেনে নিয়ে বললেন: তা বটে।

তারপর উপদেশ দিলেন খানিকটা। বললেন: তিব্বতী মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেলা মেশা কোর না। আমার ঠাকুরদা বলতেন ওরা ডাইনি। ওদের সুনজরে পড়েছ কি প্রাণটা গেছে। নিজেরা যা ইচ্ছে ওরা করবে, কিন্তু বিদেশীর নজরে পড়েছে দেখলে আর একটা রাতও তাকে বাঁচতে দেবে না।

কথা বলতে বলতে উমেদ সিং ভিতরে এলেন। ছোট ঘরে একবার উঁকি দিয়ে অনুচ্চস্বরে একটু গরম জলের হুকুম করে গদিতে বসলেন। বললেন: সেবারের গল্পটা তা হলে বলি তোমাকে।

এখন থেকে এই বৃদ্ধের গল্পই আমাকে শুনতে হবে। ভাবলুম, আজই তার শুরু হোক। হেসে বললুম: ভারি মজার গল্প বুঝি?

বুড়ো বললেন: শুধু কি মজার! ভয়ে তোমার বুক শুকিয়ে যাবে।

আমি উদ্‌গ্রীব হলুম।

বুড়ো বললেন: সেদিন—মানে অনেকদিন আগের কথা। আমি তখন জোয়ান মানুষ। গঙ্গারাম আমার প্রাণের বন্ধু ছিল। লম্বায় চওড়ায় আমার প্রায় দেড়া; তেমনই গায়ের রঙ!

গলা নামিয়ে বললেন: দেশের মেয়েগুলো লোভীর মত তাকিয়ে থাকত বলে বিয়েই করত না ছোকরা। বলত, বিয়ে করলেই তো সব ফুরিয়ে গেল।

সেদিনের কথা মনে করে বুঝি বুড়োর চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলজ্বল করে উঠল।

বুড়ির গরম জল নিশ্চয় তৈরিই ছিল। দু হাতে দু গ্লাস চা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন: সেই গল্প শুরু হল তো! কত লোককে আর শোনাবে?

বুড়ির মুখে এ কথা বোধ হয় অনেকবার শুনেছেন উমেদ সিং। অপ্রতিভ বা বিরক্ত হলেন না এতটুকু, বললেন: কাল এই বাবুকে পৌঁছতে গিয়ে ঠিক আজি তপদেনের মত একটি মেয়ে দেখে এসেছি। ঠিক সেই মুখ, সেই দেহ। কালই ভেবে রেখেছিলুম, বাবু এলে তাকে এই গল্প শোনাব। আমার দিকে ফিরে বললেন: নাও নাও, তোমার গেলাস ওঠাও, চা জুড়িয়ে যাবে।

বলে চায়ের গ্লাস হাতে নিলেন। আমিও নিলুম।

দু চুমুক গরম জল গলায় যেতেই গল্প জমালেন। বললেন, কাল সত্যিই আমার মনে হয়েছিল, অনেকদিন পরে আবার আজি তপদেনকে দেখলুম। সেই মুখ সেই দেহ। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি ছিল অন্যরকম। খানিকক্ষণ তোমার চোখের ওপর চোখ চেয়ে থাকলেই নেশা ধরবে তোমার, রক্তে ঝিমুনি আসবে। বুঝতে পারবে তুমি কেমন ভেড়া বনে যাচ্ছ। কসম তোমার, সে মেয়েটা নিশ্চয়ই জাদু জানত।

আরও খানিকটা চা খেলেন উমেদ সিং। তারপর বললেন: অমন নচ্ছার মেয়ে আমি আজও দেখি নি। এমন পাপ নেই যা সে হাসতে হাসতে করতে পারত না।

তাকে সবাই নিনি কেন বলত জানি না, কুমারী তো ছিল না। তাকে নাহিলাই বলা উচিত। অনেকগুলো স্বামী ছিল তার। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের শক্ত সমর্থ যুবক। কিন্তু সব কটাকেই ভেড়া বানিয়ে রেখেছিল। চোখের সামনে অনাচার দেখেও মুখে প্রতিবাদ করতে পারত না।

সেবারে আমার বাপ ছিলেন এখানে। আমি ছাউনি ফেলেছিলুম গ্যানিমার মণ্ডিতে। গঙ্গারাম আমার পাশেই তার দোকান খুলল। সেই বছর আঙ্গি তপদেন এ বাজারে প্রথম এল। কিন্তু প্রথম এলে কী হবে? দেখতে না দেখতেই রাষ্ট্র হয়ে গেল যে সে এসেছে। একদিন আমরা দুই বন্ধুতে তাকে দেখতে গেলুম বিকেলবেলা। তার তাঁবুর সামনে পায়চারি করে করে সন্ধ্যে হয়ে এল, তবু সে একবারটি বেরোল না। হঠাৎ শুনলুম মেয়েটা ক্ষেপে উঠেছে। অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে একজন লামাকে তার তাঁবুর ভেতর থেকে বার করে দিল। আমরা লুকিয়ে তার সেই অগ্নিমূর্তি দেখলুম। কিন্তু সেও আমাদের দেখে ফেলল। একটা বাঁকা দৃষ্টি হেনে তাঁবুর ভেতরে ঢুকে গেল।

মাথা নীচু করে লামা বেরিয়ে গেলেন। সুশ্রী শক্ত চেহারা। বয়স হয়তো আমাদের চেয়ে কিছু বেশীই হবে। আমি গঙ্গারামকে বললুম: দেখা তো হল, চল এবারে ফিরে। গঙ্গারামেরও দেখা হয়েছিল, কিন্তু ফেরার কথায় তেমন উৎসাহ পেল না। তবু নিঃশব্দে আমার অনুসরণ করল। পথে শুধু একটি কথা বলেছিল গঙ্গারাম, তেজ আছে মেয়ের।

চা শেষ করে গেলাসটা নামিয়ে রাখলেন উমেদ সিং। বললেন: আমি আর ও রাস্তা মাড়াই নি। বোধ হয় ভয়ই পেয়েছিলুম খানিকটা। গঙ্গারাম আর গিয়েছিল কিনা জানি না, একদিন সেই মেয়েটা তার দোকানে এল পাথর কিনতে। শুনেছিলুম, গঙ্গারাম নাকি একটা পাথরেরও দাম নেয় নি তার কাছে। দাম তার কাছে কে নিত, তাই জানত না কেউ। একটা ঢোক গিলে বুড়ো বললেন: গ্যানিমার বাজার সেবার জমল না। তচনচ করে গেল মেয়েটা। বিনি পয়সায় সওদা নিয়ে সব পয়সা লুটে নিয়ে গেল।

তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আর হয়তো ভুলেই যেতুম সে ঘটনাটা, যদি না গঙ্গারামকে সঙ্গে নিয়ে যেত। ভগবান জানেন, কী হল ছোকরার। অমন দস্যুর মত তেজ—বাজার ভাঙবার আগেই দেখলুম—আফিঙখোরের মত ঝিমচ্ছে বসে বসে। শেষটায় একদিন দোকানপাট সব ফেলে রেখে মেয়েটার সঙ্গে কেটে পড়ল।

পরের বছর তাদের আর দেখি নি। পরের বছরও না। বছরের পর বছর সারা মণ্ডিটায় তাদের খোঁজ করতুম, তাদের কথা জিজ্ঞেস করতুম তিব্বতী খদ্দেরদের কাছে। কেউ বলত, মানস আর রাক্ষসতালের মাঝে তুতুর উত্তরে ছুতো ফুক গোমফা পর্যন্ত গঙ্গারামকে তারা দেখেছে। কেউ বলত, তার পরেও পূর্বের পাহাড়ের চূড়ো থেকে মানস-সরোবরকে শেষ প্রণাম জানাতে দেখেছে তাকে। এইখেনে তিব্বতীদের তীর্থ শেষ। এর পরে গঙ্গারামকে দেখেছে বলে কারও মনে পড়ে না।

উমেদ সিংয়ের চোখজোড়া হঠাৎ ছলছল করে উঠল। বললেন: হাতের কাছে হয়তো কোন চ্যাঙকু পায় নি। সেবারে তাই গঙ্গারামের বুকে গাদা বন্দুকটা ছুঁড়েই হাতের খিল ভেঙেছে আঙ্গি তপদেনের স্বামীরা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন: গঙ্গারামের বৃদ্ধ বাপ আসকোটে দোকান করতেন। আমি তার ফেলে যাওয়া জিনিসপত্র তার বাপের দোকানে পৌঁছে দিয়েই পালিয়ে এসেছিলুম। কোন গল্প শোনাবার আর দরকার হয় নি। সেই রাতেই বুড়ো মারা গেলেন।

বাণিজ্য করতে এসে আমরা এক একবার এক একজনকে রেখে ফিরে যাই। কাকে কোথায় রেখে এলুম, সে প্রশ্ন অপ্রয়োজনীয় বোধে কেউ বড় একটা জিজ্ঞেস করে না। গঙ্গারামের বাবাও করেন নি। করলে আমার মুশকিল হত। আঙ্গি তপদেনের গল্পটা আমি তাঁকে বলতে পারতুম না।

সকালের বাতাসে তখন উত্তাপের ছোঁয়া লেগেছে। উমেদ সিং একটা বিড়ি ধরালেন। সেটা শেষ করে বললেন: এবারের কেনাকাটা তো চুকেই গেছে। শুধু শুধু বসে থেকে আর লাভ কী।

আমি উত্তর দিলুম না।

বৃদ্ধ বললেন: চল, কালই আমরা পালিয়ে যাই।

মনে হল, পুরনো ভয়ে এই পালিয়ে যাওয়ার ভাবনা হয়েছে তাঁর। ভাবনারই কথা। আজি তপদেনেরা তো এককালের নয়, তারা সর্বকালের। এক গঙ্গারামকে হারিয়েছেন যৌবনে, সেই অভিজ্ঞতায় আর একজনকে বাঁচাতে চাইছেন আজ। কথা না বলে আমি তাঁর ব্যাবস্থার সমর্থন জানালুম।

১৮

বিকেলবেলায় আমি উমেদ সিংয়ের দোকানে বসে টাকা পয়সার হিসেব শিখছি। তিব্বতী আর নেপালী দু রকমের টাকাই এখানে চলে। তার হিসেব জানতে হয় প্রত্যেক বণিককে। নেপালী টাকা আমাদের সাড়ে সাত আনা আর তিব্বতী টাকা সাড়ে চার আনা। এর বেশী দিলেই ঠকবে, শেখাচ্ছিলেন উমেদ সিং।

হঠাৎ সুমু আঙমার বাবা ঢুকলেন হাঁপাতে হাঁপাতে। আমাকে দেখতে পেয়েই বসে পড়লেন। কিন্তু আমি তাঁর কথা বুঝি না। উমেদ সিং তাঁর ব্যস্ততার খবর শুনে আমাকে বললেন: এরই মেয়ের নাম কি সুমু আঙমা? বলছেন, তার মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অনেকক্ষণ থেকে। আর সেই বুড়ো লামাও নেই।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম: বলেন কী?

সুমু আঙমার বাপ গড়গড় করে অনেক কিছু শোনালেন, উমেদ সিং তার অর্থ বললেন আমাকে। বললেন: কাল থেকেই তিনি লামার মধ্যে একটা দুরভিসন্ধি লক্ষ্য করছিলেন। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যখনি তিনি তাঁবুতে ফিরেছেন তখনি দেখছেন লামা তাঁর মেয়ের সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা কইছেন। তবে এতটা যে করবেন, তা ভাবতে পারেন নি। গোড়াতে সুমু আঙমা তো তাঁকেই পছন্দ করেছিল, কিন্তু তখন তিনি তাকে আমল দেন নি। তাই মেয়ের সঙ্গে ওই লামাকে দেখে ভাবতেন, বুঝি তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ওই বুড়োর পেটে যে এত ছিল—

বলে ভদ্রলোক প্রায় কেঁদেই ফেললেন।

উমেদ সিং বললেন: খুব সাংঘাতিক এ দেশের লামা। কে যে সাধু আর কে ভণ্ড, চেহারা দেখে কে বুঝবে? সেবারের সেই লামার গল্পটা তোমাকে বলি।

আমি তখন সুমু আঙমার কথা ভাবছি। আমাদের বুড়ো লামা যে হঠাৎ এমন কেলেঙ্কারি করে বসবেন, এ কথা ভাবতে পাচ্ছি না। গতকাল থেকে আমিও তাকে বিচলিত দেখেছি। তবে সেই চিত্তচাঞ্চল্য যে হঠাৎ এমন ভয়ানক আকার ধারণ করবে, তা কে জানত। আমাদের পরিচয় নিতান্ত অল্প দিনের হলেও সারা দিনমানের সান্নিধ্যে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। মনে হয়েছিল, আমি একজন স্থিরমতি বুদ্ধিমান জ্ঞানীর সঙ্গে আছি—ভগবানে যাঁর গভীর বিশ্বাস আর মানুষের জন্যে যাঁর বুক-ভরা দরদ। পার্থিব কোন কিছুতে তাঁর লোভ দেখি নি। কাল অন্ধকার পথে ফেরবার সময় তাঁর লোভের সামান্য ইঙ্গিত দিয়েছেন। ছোট ছোট মঠের মধ্যে ধুলোর ভিতর যে রত্ন অযত্নে পড়ে আছে, তাঁর লোভ সেই রত্ন উদ্ধারের। উমেদ সিংয়ের গল্প শোনার আগ্রহ তাই হল না। জিজ্ঞেস করলুম: ওয়াং ডাক আর নিমার তাঁবুটা দেখেছেন কি ভাল করে?

উমেদ সিংয়ের মারফতে জবাব পেলুম। তাদের তাঁবু তিনি চেনেন না। লামার সঙ্গে মেয়েকে রেখে নিজের ধান্ধায় বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে কাউকে দেখছেন না। চাকরেরাও কোন হদিস দিতে পাচ্ছে না।

বললুম: তা হলে ওয়াং ডাকের তাঁবুটাই আগে দেখা যাক। কী জানি, অসুস্থ ওয়াং ডাককে দেখতেই যদি তারা গিয়ে থাকে।

এ কথার উত্তরও পেলুম উমেদ সিংয়ের কাছে। বললেন: এ ভদ্রলোক বলছেন, সুমু আঙমা কিছুতেই তার কাছে যাবে না। ছোট থেকে সে ওই লোকটাকে ঘৃণা করে। জাতেও তো নীচে তাদের।

আমার এ কথা বিশ্বাস হল না। মনে হল, বাপ হয়ে মেয়ের মনের কথাটি তিনি জানতে পারেন নি। জাতের গর্বে অন্ধ হয়ে আছেন।

উমেদ সিংও আমাদের সঙ্গে আসছিলেন, বললাম: আপনি আর এসে কী করবেন! তার চেয়ে বেলা থাকতে গোছগাছটা সেরে নিন। কাল সকালেই তো আমাদের বেরতে হবে।

নিবৃত্ত হয়ে বৃদ্ধ বললেন: রাত্রি একপ্রহর থাকতে আমি বেরতে পারব না। এই বুড়ো হাড় শীতে জমে বরফ

হয়ে যাবে। তার চেয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে সকালের রোদ প্রখর হবার আগেই বেরিয়ে পড়া যাবে।

বললাম: সে মন্দ না। বিকেলের দিকে শিলাবৃষ্টি হলে ঝব্বুর বুকের তলায় আশ্রয় নেব। কী বলেন?

হাসতে হাসতে উমেদ সিং তাঁর দোকানে ঢুকলেন।

বিচিত্র অভিজ্ঞতার বুঝি শেষ নেই। নিমাকে তার তাঁবুতে দেখলুম না, দেখলুম না তার বালক স্বামীটিকেও। আরও খানিকটা অগ্রসর হয়ে দেখলুম, তাঁবুসুদ্ধ ওয়াং ডাকও অদৃশ্য হয়েছে। সকালবেলায় শয্যাশায়ী দেখে গেলুম যে লোক, হঠাৎ সে এত শক্তি পেল কোথায়?

ফেরার পথে নিমার একটা চাকরকে দেখতে পেলুম। সেই লোকটা! জিভ বার করে দুটো মুঠো হাত কানের উপর চেপে ঝুপ করে বসে পড়ল। নমস্কারের এও এক রীতি। ইঙ্গিতে তাকে নিমার খবর জিজ্ঞেস করলুম। হাতের আঙুল দিয়ে মাঠের শেষে একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। দ্রুত পায়ে আমরা সেই দিকেই রওনা হলুম। হঠাৎ পিছনে গানের কলি শুনে দেখলুম, লোকটা দু হাত-পা তুলে মনের আনন্দে নৃত্য করছে।

মনের ভাব প্রকাশ করতে পারলে সুমু আঙমার বাপকে একটা আশ্বাস দিতুম। ওই পাগলটার আচরণে একটা আনন্দের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে নিমার সঙ্গে আরও অনেককে পাওয়া যাবে।

পাওয়াও গেল তাই। একটা তাঁবুর সামনে জনকয়েক পুরুষ আর মেয়ে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করছে। নিমা আর তার বালক স্বামীটিকে ছাড়া আর কাউকে আমি চিনি না। আমাদের লামাকে দেখলুম এই বৃত্তের মাঝখানে বসে দু চোখ বন্ধ করে এই নির্মল আনন্দ আকণ্ঠ উপভোগ করছেন।

সুমু আঙমাকে দেখতে না পেয়ে তার বাপ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমিও দাঁড়ালুম।

নিমাকে আজ আর চেনাই যাচ্ছে না। গাঢ় সবুজ রঙের নতুন আলখাল্লা পরেছে। বিকেলের রোদ পড়ে ফরশা মুখখানা ঝকঝক্ করছে আনন্দে। মনে হল না যে কদিন আগেই জঘন্য নোংরা দেখতুম এই মেয়েটাকে।

হঠাৎ চোখ খুলে লামা আমাদের দেখতে পেলেন, আর দেখতে পেয়েই ছেলেমেয়েদের নাচের ফাঁক দিয়ে ছুটে এলেন বাইরে। দু হাত দিয়ে দুজনের হাত ধরে ভেতরে টেনে নিয়ে গেলেন। যারা নাচছিল আর গাইছিল, তাদের বোধ হয় আরও জোরে গাইতে বললেন, বাজা বাজা, ডামনিয়ানটা আরও জোরে বাজা।

সুমু আঙমার বাবার সঙ্গে লামা অনেক কথা কইতে লাগলেন। এমন উচ্ছ্বসিত হতে তাঁকে দেখি নি। খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে থাকবার পর জিজ্ঞেস করলুম: আজ কিসের উৎসব এখানে?

লামা হাসতে লাগলেন, জবাব দিলেন না। শুধু উচ্চস্বরে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

নিমা যে কখন্ এই নাচের দল থেকে কেটে পড়েছিল জানি নে। চাকরের হাতে খাবার দিয়ে পরিবেষণ করতে এল। প্রথমেই দিল সিদ্ধ মাংস, তাতে তেল আর নুন আছে। তার সঙ্গে টস্থ—মাখন পনির আর চিনির একটা মিষ্টান্ন।

লামা বললেন: ভাত খাবে? তোমাদের দেশের ভাত?

বলতে বলতেই বড় থালায় এক এক থালা ভাত এল। তার উপর মাখন, চিনি আর কিশমিশ।

সুমু আঙমার বাবাও আশ্চর্য হয়েছেন আমারই মত। অনর্গল কী সব প্রশ্ন করতে লাগলেন। মনটা তার মেয়ের জন্যে আকুল হয়ে আছে, খাদ্যে তেমন মন লাগছে না মনে হল না।

খাওয়া শেষ হলে নিমা এসে কয়েকটি তিব্বতী টাকা সুমু আঙমার বাপের হাতে দিল। হাসতে হাসতে লামা তার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন তাঁকে। সুমু আঙমার বাপ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তার পরেই ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন।

এমন শক্ত কর্মঠ লোককে এমন শিশুর মত কাঁদতে কখনও দেখি নি। লামা আমাকে এই কান্নার অর্থ বুঝিয়ে দিলেন। বললেন: ওয়াং ডাকের সঙ্গে সুমু আঙমার বিয়ে দিয়ে দিলুম। ছোট্ট থেকে মেয়েটা ওয়াং ডাককেই ভালবাসে। কিন্তু সামাজিক নিয়মের জন্যে সে কথা কোনদিন প্রকাশ করতে পারে নি। কাল পর্যন্ত আমি জানতুম, ওরা এক জাতের। তাই সুমু আঙমার বাপের আচরণে আমার কেমন খটকা লাগত। কী পরিশ্রম

করেছি এই দুটো দিন। শেষ পর্যন্ত সুমু আঙমাই আমাকে সত্য কথাটা জানিয়ে দিল। বলল, ওরা টংডু, ওর সঙ্গে তো তার বিয়ে হতে পারে না। আমি এদের সামাজিক অহঙ্কারের কথা জানি না। দারিদ্র্যের চরমে নেমে গেলেও একজন টংবা বাপ কোন বর্ধিষ্ণু টংডু ছেলের হাতে তার মেয়ে দেবে না। অথচ ভেবে দেখবে না, কিসের এই জাতিভেদ? কোন এক অজ্ঞাত যুগে এই বর্ণবৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কী কারণে হয়েছিল তা আজ সবাই ভুলে গেছে। আজ এই জাতিভেদ শুধু দলাদলিই সৃষ্টি করছে, একটা বলিষ্ঠ জাতির সৃষ্টির সবচেয়ে বড় অন্তরায় এটি।

একটু থেমে বললেন: তুমি ভাবছ, সুমু আঙমার বাপ কাঁদছেন তার এই জাতের অহঙ্কার ভেঙে গেল বলে। কিন্তু তা নয়। তিনি কাঁদছেন মুরিন হাতে নিয়ে। বুকের দুধ দিয়ে মেয়েকে লালন করেছেন বলে মেয়ের মাকে কিছু টাকা ধরে দেওয়া হয় শোধের জন্যে। পাত্রপক্ষের দেওয়া এই টাকাকে মুরিন বলে। সুমু আঙমার মা আজ বেঁচে নেই। সেই কথা ভেবে লোকটা অমন কাঁদছে।

আশ্চর্য ক্ষমতা এই লামার। মনে হল, আমাদের অন্তরটা যেন দেখতে পাচ্ছেন অন্তর্যামীর মত।

লামা বললেন: নিমার সাহায্য না পেলে এসব কিছুই সম্ভব হত না। সে-ই সমস্ত ভার নিয়ে এই বিয়ে দিল। সকাল থেকে আজ সে এই সব ব্যবস্থাই করেছে।

জিজ্ঞেস করলুম: এই রঙ-বেরঙের পোশাক পরে এরা নাচছে, এদের তো দেখি নি আগে।

লামা হেসে বললেন: এরা ওয়াং ডাকের দেশের লোক। এরাও ব্যবসা করতে এসেছিল এখানে। ওয়াং ডাকের চাকর এদের নেমন্তন্ন করে এনেছে।

এক জায়গায় ভিখিরীরা বসেছিল গোল হয়ে। নিমা তাদেরও খেতে দিয়েছে। গোগ্রাসে তারা গিলে যাচ্ছে। জন দুই বহুরূপী নেচে নেচে গান গাইছে, আর শুকনো মাংস চিবোচ্ছে।

লামা বললেন: বর-কনে দেখবে না?

সত্যিই তো, এই সব হৈ-চৈয়ের ভিতর আসল কথাটাই ভুলে গিয়েছিলুম। যার জন্যে এত খাওয়াদাওয়া, এত হৈ-হুল্লোড়, তাদের কথাই যে মনে হয় নি এতক্ষণ।

সুমু আঙমার বাপও খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছিলেন। সবাই মিলে তাঁবুর ভেতর গেলুম।

ওয়াং ডাক শুয়েছিল। মাথার চুল আঁচড়ে লোকটা টুপি পরেছে আজ। চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে লামা বললেন: নিমাই আজ সব করেছে।

নতুন জামা-কাপড় পরে ওয়াং ডাকের পাশে বসে আছে সুমু আঙমা। আজ তার মাথার চুল পরিপাটি করে বাঁধা। তাতে পুঁতির আর পাথরের মালা। মাঝখানে একটি মস্ত প্রবাল ঝকমক করছে। মুখে আর সেই রঙের প্রলেপ দেখলুম না, সেই নোংরামি নেই।

আমার বিস্মিত দৃষ্টি দেখে লামা বললেন: আজ সকালবেলাতেই একখানা সাবান কিনেছিল নিমা। আমার কাছে তার ব্যবহার শিখে প্রথমে নিজে ঘষেছে, তার পর ধরেছিল এই মেয়েটাকে। এ মেয়েটা কিছুতেই রাজী হবে না, কেঁদেই আকুল। এ জানে, মুখের নোংরামি ঘষে তুললেই তার কপাল ভাঙবে। সুমু আঙমা তার বিয়ের পরে সাবান ঘষেছে।

বাপের মুখে মুখ লুকিয়ে সুমু আঙমা তখন গভীরভাবে কাঁদছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম: বিয়ের অনুষ্ঠান করলেন কারা?

লামা হেসে বললেন: অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছুই হয় নি। লাল টুপির লামাকে খরচ দেওয়া হয়েছিল। তিনি তাঁদের মঠে এই পরিবারের মঙ্গল প্রার্থনা করেছেন। এখানে এসেছিলেন একজন পন-পো পুরোহিত। তিনি লুই-গ্যালপোর পূজো করলেন। এই দেবতা প্রত্যেক পরিবারের সুখসমৃদ্ধি রক্ষা করেন, তাই সমস্ত অনুষ্ঠানে তাঁর পূজো সকলের আগে করতে হবে।

মেয়ের সঙ্গে কান্নাকাটির পর্ব শেষ করে সুমু আঙমার বাবা তখন ওয়াং ডাকের সঙ্গে কথা কইতে শুরু করেছেন। লামা বললেন: অদ্ভুত মন এই ছেলেটার। এই বিয়েতে কিছুতেই তাকে রাজী করাতে পারছিলুম না। জীবনে বিয়েই করবে না বলে জেদ ধরেছিল। সুমু আঙমার সব কথা তাকে খুলে বললুম। শুধুমাত্র সামাজিক বাধার জন্যে নিজের অন্তরের আবেদন কাউকে জানাতে পারে নি। ভেবেছিল, এ সত্য প্রকাশ হয়ে পড়লে সমাজে তার বাপ মুখ দেখাতে পারবে না। তাই সে সাধারণ লোক বিয়ে

করবে না বলে চেঁচামেচি করত। কোন লামার প্রতি কখনও তার আকর্ষণ ছিল না, ছিল তার মনোবিকারের পরিচয়। নিজের দয়িতকে কোনদিন পাবে না জেনে ধর্মের ভেতর খানিকটা সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করত। গোড়া থেকেই আমি তাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখেছি, সেই সন্দেহই আমার সত্য বলে ধরা পড়ল কাল সন্ধ্যায়।

তুমি শুনলে আশ্চর্য হবে, লামা বললেন: সুন্থু আঙমা নিজে যেচে সেই ছোকরা লামাকে তাদের সমস্ত অর্থ দিয়েছে। কেন দিয়েছে শুনলে আরও আশ্চর্য হবে। কোনও মঠে প্রচুর অর্থ দান করলে ওয়াং ডাক জাতে উঠবে, এই ভরসা দিয়েছিল সেই ছোকরা লামা। টাকা নিয়ে বলে গেছে রেতাপুরীর মঠাধ্যক্ষের কাছ থেকে সেই সনদ এনে দেবে। সুন্থু আঙমার কাছে লোকটা শুধু অর্থ ই পেয়েছে, আর কিছু পায় নি।

একটু থেমে বললেন: ওয়াং ডাক এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী হয় নি। তবু বলেছিল, তার যা কিছু আছে সব ওদের দিয়ে দিতে। ও সবে তার আর এতটুকু লোভ নেই। মনে হল ঘটকালিতে বুঝি হেরে গেলুম। এক সময় সুন্থু আঙমার বাপের কথা ওয়াং ডাক জিজ্ঞেস করল, বলল, তাঁর কী মত? বললুম, তাঁর এত ভাববার সময় কই? দেশে ফিরে যাবার রসদ তাঁর শেষ হয়ে গেছে, ধারের চেষ্টায় এর ওর কাছে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। ওয়াং ডাক বলল, আমি এখানে আছি, আমাকে তো বলতে পারতেন তাঁর বিপদের কথা। বললুম, সে কথা বলবার কি তাঁর মুখ আছে! আর একজন অনাত্মীয়ের কাছে সাহায্যই বা নেবেন কেন! এ কথার জবাব পেলুম আজ সকালে। ভোরবেলাতেই ওয়াং ডাক আমাকে ঠেলে তুলল। বলল, সুন্থু আঙমাকে সে বিয়ে করবে।

নির্মল আনন্দে লামার মুখখানা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন: তুমি ভাবছ, সুন্থু আঙমার জন্যেই ওয়াং ডাক তাকে বিয়ে করতে রাজী হল! এ তোমার ভুল। সুন্থু আঙমার বাপের জন্যে এ বিয়েতে সে রাজী হয়েছে। এই দুঃস্থ পরিবারকে অসহায় ফেলে যাবে, ওয়াং ডাক এমন অমানুষ নয়।

হেসে বললেন: এবারে সুন্থু আঙমার পরীক্ষা শুরু হল। একান্ত সেবা দিয়ে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ দিয়ে স্বামীর মন জয়ের অভিযান করতে হবে তাকে। আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজকের এই দিনটি আমার অক্ষয় হয়ে রইল। মানুষে মানুষে পার্থক্য থাক্—বুদ্ধের শিক্ষা এ নয়। মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতা দিয়ে সংকীর্ণতা দিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে এই সব গণ্ডির ভেতর গণ্ডি রচনা করেছে। সে ভুল বোঝবার, সে ভুল ভাঙবার দিন এসেছে আজ। যতই সামান্য হোক, আমার সাফল্যে আজ আমি আত্মপ্রসাদ পাচ্ছি। একটুখানি খোঁচা তবু রইল। এই যে যারা বাইরে অমন গাইছে আর ঘুরে ঘুরে নাচছে, তারা সবাই জাতে টংডু। টংবারা এগিয়ে এসে যোগ দিলে না। কিন্তু আমি জানি, একদিন তারাও যোগ দেবে। সেদিন আসতে আর বেশী দেরি নেই। বুদ্ধ আজও বেঁচে আছেন তো—আমার বিশ্বাস কখনও মি হবে না। বলেই সুর করে গাইলেন:

সাঙ্গে লা ছিব গিউ নাঙ্গো
টাশী ডিলে ফুন সুম ছোগ্।

[ক্রমশ]

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮৮৪—১৯১৫)

শ্রীঅমলেন্দু ঘোষ

'বাংলার পাগল কবি' কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী-লেখক ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় পুণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর-জীবনী রচয়িতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কনিষ্ঠ পুত্র প্রভাতপ্রকাশ ও কন্যা শেফালিকা। ইন্দুপ্রকাশের জন্ম—১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ২১এ আগস্ট; খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। সেনহাটি কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জন্মস্থান হিসেবে ধন্য হয়েছে।

ইংরেজী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে চব্বিশ বছর বয়সে সদর খুলনার ক্ষীরোদচন্দ্র দাসের কন্যা লাবণ্যলেখার সঙ্গে ইন্দুপ্রকাশ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এই বিবাহসূত্রে পারিবারিক গোলযোগ হওয়ায় ইন্দুপ্রকাশ সপরিবারে কলিকাতায় আসেন। ইন্দুপ্রকাশের স্ত্রী লাবণ্যলেখা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে বলেন[১]—

"কিন্তু আমাদের পারস্পরিক হৃদ্যতা কোনদিন ক্ষুণ্ণ হয় নি। প্রথম দিকে শ্বশুর মশায় (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) বিরূপ থাকলেও শেষজীবনে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করেছেন। পারিবারিক গোলযোগ মীমাংসা এবং অন্যান্য ব্যাপারে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ভূপেন বসু প্রভৃতি আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেন।"

ইন্দুপ্রকাশের স্ত্রী লাবণ্যলেখাও একজন উচ্চ-শিক্ষিতা-মহিলা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বি. এ. পাস করেন। এর পর ১৯২৩—২৭ পর্যন্ত ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে সহকারী বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কাজ করেন। পরে ১৯৩৫—৩৭-এর ভিতর দেড় বছর বিলেতে অবস্থান করেন এবং শিক্ষা কার্যে ডিপ্লোমা (Teaching Diploma) প্রাপ্ত হন। দেশে ফিরে ১৯৩৭—৩৯ পর্যন্ত বেকার ছিলেন। পরে, আবার ১৯৪০এর শেষ ভাগ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল পরিদর্শকের কাজ করেন। বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত এবং আলিপুর নিবাসী।

ইন্দুপ্রকাশের তিন সন্তান। ইন্দুপ্রকাশের জীবিত কালেই তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। মধ্যম কন্যা এলা চট্টোপাধ্যায় বালীগঞ্জ নিবাসী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী। দেবীপ্রসাদ একজন শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ইন্দুপ্রকাশের কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয় তাঁর মৃত্যুর পর। ইনি বর্তমানে মানসিক বিকারগ্রস্ত। তাই ইন্দুপ্রকাশের স্ত্রী দুঃখ করে বলেন, "এ রকম অভিশপ্ত পরিবার আমি আর দেখিনি।"

ইন্দুপ্রকাশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পর্যন্ত পড়েন এবং বাংলার জাতীয় শিক্ষাশালায় (Bengal National College) কিছুদিন (অনুমান ইংরেজী ১৮১১-১২) অধ্যাপনা করেন। কিন্তু তাঁর অদম্য উচ্চাকাঙ্খা আর জ্ঞানপিপাসা ছিল। তাই তিনি এ কাজে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। নিজের চেষ্টায় সামান্য অর্থ সঞ্চয় করে তিনি আমেরিকা (ইংরেজী ১৯২৩ জুলাই) যাত্রা করেন শিক্ষায় ও চরিত্রে দশজনের একজন হবার আকাঙ্খায়। আমেরিকার নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্দুপ্রকাশ বি. এ. পড়তেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করতেন।[২] এই ভাবে কঠোর পরিশ্রমের ফলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুন বি. এ. উপাধি পান এবং ওই বছরেই সেপ্টেম্বর মাসে এম. এ. উপাধি পান।—এই থেকেই ইন্দুপ্রকাশের একনিষ্ঠ পরিশ্রম ও স্বাভাবিক মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। এরপর তিনি আমেরিকার বিখ্যাত 'প্রিন্সটন' বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ উড্রো উইলসনের অধীনে উচ্চতর পি. এইচ. ডি. উপাধির জন্যে পড়ছিলেন। এমন সময় তাঁর দেশের কথা মনে পড়ে। পি. এইচ. ডি. পড়া আর

১ ইন্দুপ্রকাশের ভগিনীপতি শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠ মহাশয়ের সহযোগিতায় ২৯।৬।১৯৫৮ তারিখে শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে।

২ প্রবাসী, ১৩২১ পৌষ। The Modern Review, 1914-15.

হল না। ইচ্ছে রইল দেশে ফিরে ৪।৫ বছর চাকরী করে আবার আমেরিকায় গিয়ে ওই উপাধি নেবেন। ইন্দুপ্রকাশের স্ত্রীর কাছে জেনেছি পাটনা B. N. College-এর অধ্যাপকরূপে যোগদানের জন্যই তিনি দেশে ফিরছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত আশা আকাঙ্খা লুসিটেনিয়া জাহাজডুবির সঙ্গে সঙ্গেই জলবুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেল।

ইন্দুপ্রকাশের ফিরবার কথা ছিল 'ট্রান্সেলভিনিয়া' জাহাজে ১লা মে। পরে শোনা গেল 'লুসিটেনিয়া' ছাড়বে ১লা এবং 'ট্রান্সেলভিনিয়া' ৭ই। তাই 'বাড়ির দিকে মন ছুটিয়াছে বলিয়া' তিনি লুসিটেনিয়ার টিকিট কিনলেন তাড়াতাড়ি দেশে ফিরবেন এই আশায়। এই সময় ইন্দুপ্রকাশ লেখেন—

"দেশ ছাড়িয়াছিলাম শনিবারের বারবেলায়। প্রিন্সটন ছাড়িব (২৯এ এপ্রিল) বৃহস্পতিবারের বারবেলায়। 'নিউইয়র্ক' ছাড়িব শনিবার (১লা মে) বারবেলায়। ৭ই মে লণ্ডনে পৌছিব। 'লণ্ডনে' ৫।৭ দিন থাকিয়া, 'ব্রিস্টলে' রাজার (রাজা রামমোহন রায়) গোর, 'অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি' প্রভৃতি দেখিয়া, লণ্ডন হইতে ১৫ই মে 'নিভানা' নামক জাহাজ যোগে, ২১।২২এ জুন নাগাদ কলিকাতায় পৌছিব।[৩]

দেশে আর ফেরা হল না। সমস্ত সাধই অপূর্ণ রয়ে গেল! ট্রান্সেলভিনিয়া নির্বিঘ্নে ২৩এ মে ইংলণ্ডে পৌছয় কিন্তু লুসিটেনিয়া আর পৌছল না। ইংরেজী ১৯১৫।৭ই মে জার্মান টর্পেডোর চোরা ঘায়েই লুসিটেনিয়া জাহাজ জলমগ্ন হয়। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন ওই জাহাজের একমাত্র ভারতীয় যাত্রী।

এদিকে ইন্দুপ্রকাশের ভগ্নিপতি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অজ্ঞাত কারণে অন্তরীণ হন। কি ভাবে তিনি মুক্তি পেতে পারেন এই বিষয়ে পরামর্শ করতে ইন্দুপ্রকাশের পিতা চণ্ডীচরণ ভবানীপুরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে যান। ফিরবার পথে ট্রামে কাটা পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।[৪] সাহিত্যসেবী পিতা-পুত্রের এমন মর্মান্তিক মৃত্যু খুব কম শোনা গেছে।

নিশ্চয় করে বলতে পারি এই সাহিত্যসেবী পিতা-পুত্রের মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

২

পত্র : ইন্দুপ্রকাশের এমন কোন পত্র পাওয়া যায় নি যা থেকে ইন্দুপ্রকাশের সম্পর্কে আরও বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যেতে পারতো। একমাত্র ভারতবর্ষ পত্রিকায় ইন্দুপ্রকাশের লেখা একখানা পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানি তিনি লেখেন তাঁর পিতা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তার অংশবিশেষ ভারতবর্ষ পত্রিকা প্রকাশ করেন ইন্দুপ্রকাশের মৃত্যু সংবাদ উপলক্ষে। আমেরিকা থেকে ইন্দুপ্রকাশ তাঁর পিতাকে লিখছেন,—"যদি, তোমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ফিরিতে পারি ও ভগবান শক্তি দেন, তাহা হইলে তোমাদের সামান্য সেবা করিতে পারিলেও জীবনকে ধন্য বোধ করিব।"[৫]

কিন্তু ইন্দুপ্রকাশের সে আশা পূর্ণ হয় নি।

এ ছাড়া ইন্দুপ্রকাশ লিখিত "ধর্মাচার্যের সহিত দুইদিন" একটি প্রবন্ধে জানা যায় উক্ত ধর্মাচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রবীন্দ্রসমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তীর সঙ্গে ইন্দুপ্রকাশের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল।—"ইংলণ্ডে আসিবার পূর্বে আচার্য শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত কয়েকদিন কাটাইয়া আসিয়াছি। বোলপুর ব্রাহ্মবিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজিতকুমার চক্রবর্তী ও আমি, দুইজনে বাল্যকালে শাস্ত্রী মহাশয়ের বড় প্রিয়পাত্র ছিলাম। বস্তুতঃ আমাদের বাল্যকালের স্মৃতির মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের বিস্তৃত অধিকারের কথা কখনও ভুলিতে পারিব না।"[৬]

ইন্দুপ্রকাশ প্রসঙ্গে : ইন্দুপ্রকাশের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে এ দেশের কোন লেখক কিছু লিখেছেন বলে জানা যায় না। কিন্তু ইন্দুপ্রকাশের ভগিনী ও বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রনাথ শেঠের স্ত্রী শেফালিকা 'ভ্রাতৃ

৩ ভারতবর্ষ, ১৩২২ শ্রাবণ

৪ প্রবাসী, ১৩২৩ মাঘ
৫ ভারতবর্ষ, ১৩২২ শ্রাবণ।
৬ ভারত মহিলা, ১৩২০ ফাল্গুন

বিয়োগে সমুদ্রের প্রতি' নামে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি শেফালিকা শেঠের 'গুঞ্জন' (১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

ইন্দুপ্রকাশের ভগিনীও উচ্চশিক্ষার্থে আমেরিকায় যান এবং সেখানেই অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে শেফালিকা শেঠ লিখিত একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ আছে।

৩

সাহিত্য চর্চা: ইন্দুপ্রকাশ আমেরিকায় যাবার আগে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা লেখেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত তাঁর কিছু কিছু রচনা এখনও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত অবস্থায় আছে। এই সব রচনায় বিশেষতঃ সমালোচনামূলক প্রবন্ধে ইন্দুপ্রকাশের দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

রচনার তারিখ অনুযায়ী বলা যায় "গুলবাহার" নামক একখানি নাটক গ্রন্থাকারে ইন্দুপ্রকাশের প্রথম রচনা। এটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্যে রচিত হয়। পরে ১৩১৩ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়। প্রথম সংস্করণ দেখবার সুযোগ হয় নি। দ্বিতীয় সংস্করণটি কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে আছে। প্রকাশ কাল (কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের তালিকা অনুযায়ী) ইংরেজী ১৯১৩ (182. Nd. 913. 2)। এই দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদনে ইন্দুপ্রকাশ জানাচ্ছেন "দশ বৎসর পূর্বে এই ক্ষুদ্র নাটক বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের অভিনয়ের জন্য রচিত হইয়াছিল।" ফলে রচনাকাল হয় ইংরেজী ১৯০৩, বাংলা ১৩০৯।১০ সাল।

এ পর্যন্ত ইন্দুপ্রকাশ রচিত মোট ৮ খানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা' গ্রন্থখানি শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত মহাশয়ের সংগ্রহে আছে। গ্রন্থখানি দেখবার সুযোগ দেওয়ায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

পত্রিকা সম্পাদনা: পত্রিকা সম্পাদনায় ইন্দুপ্রকাশের কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা ১৩১৫ সালের ফাল্গুন মাসে 'মানসী' নামে একখানি মাসিকপত্রের আবির্ভাব হয়। প্রথম বছর (১৩১৫-১৬) পত্রিকা সম্পাদনায় ইন্দুপ্রকাশের সঙ্গে সহযোগিতা করেন—শিবরতন মিত্র, সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১৩১৬ থেকে ১৩২০ পর্যন্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী, ইন্দুপ্রকাশ ও সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পত্রিকা পরিচালনা করেন। এরপর জগদীন্দ্রনাথ রায়ের উপর ভার পড়ে ১৩২০-২২ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যেই ইন্দুপ্রকাশের মৃত্যু হয়। লেখক রসিকলাল রায়ের মৃত্যুসংবাদের মধ্যে ইন্দু-প্রকাশ সম্বন্ধে দায়সারা গোছের কয়েক লাইন দেখা যায়—

'মানসী' যখন ছোট ছিল, তখন হইতে তাহার প্রীতিবন্ধনে আঘাত পড়িয়া আসিতেছে। ইন্দুপ্রকাশের স্নেহঋণ সে কখনও পরিশোধ করিতে পারিবে না। ইন্দুপ্রকাশ মানসীর, মানসী ইন্দুপ্রকাশের, এই রকমই তো জানা ছিল। কত মান অভিমান, কত বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়া উভয়ের প্রীতি পরিপুষ্ট হইয়াছিল। সমস্ত সংসারভার বৃদ্ধ পিতা শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া ইন্দুপ্রকাশ লুসিটানিয়া জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইলেন। মানসীর সে বেদনা আজ নূতন করিয়া বাজিতেছে।"[৭]

'মানসী'র প্রতিটি সংখ্যা বাংলার চিন্তাশীল মনীষীর রচনায় সমৃদ্ধ। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে মানসী ও ইন্দুপ্রকাশের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দেবালয়ে বক্তৃতা: এ দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে 'দেবালয়' মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি। শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজস্ব বাড়ি এই কাজের জন্য ছেড়ে দেন। এখানে দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত বক্তৃতা হত। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ বাংলার মনীষীরা এখানে বক্তৃতা দিতেন। ইন্দুপ্রকাশও এই মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানে তিনি কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ১৩১৭ পৌষ, ইংরেজী ১০ই নভেম্বর ১৯১০ বক্তৃতা দেন "মহাপুরুষ" সম্বন্ধে। এ সম্পর্কে দেবালয় পত্রিকার মাসপঞ্জীতে উল্লেখ দেখা যায়—

---

৭ মানসী, ১২২৩ ভাদ্র

দেবালয়ের মাসপঞ্জী : (১৯১০ নভেম্বর)—"১০ই অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'মহাপুরুষ'[৮] সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে,—লক্ষ নরনারীর মধ্য হইতে, যিনিই এই বিশ্বে একটি নূতন বাণী প্রচার করিতে সক্ষম হন তিনিই মহাপুরুষ। এই মহাপুরুষদের আলোচনা অনুসরণ না করিয়া কেহই মহত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হন না। মহত্ত্ব লাভ করিতে হইলে মহাপুরুষের চরণে আগে প্রণত হইতে হইবে, তাহাদের বাণী অনুসরণ করিতে হইবে।"

আরও একটি বক্তৃতা দেন ১৩১৭ সালের ৬ পৌষ ইংরেজী ২১শে ডিসেম্বর ১৯১০।

দেবালয়ের মাসপঞ্জী : (ডিসেম্বর ১৯১০) "২১শে—ন্যাশন্যাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "রবীন্দ্রনাথের কাব্যে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির পরিচয়" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন।"

এই প্রবন্ধটি পরে "কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব" নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪

ইন্দুপ্রকাশ রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা ॥

১। গুলবাহার। দৃশ্যকাব্য পৃ. ।৵০+৩১। ১ম সংস্করণ ১৩ ৩ বঙ্গাব্দ; ২য় সংস্করণ ১৯১৩ ইংরেজী; ২। বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা। পৃ. ৵০+৬০; ১ম সং ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (৯ জন বঙ্গ-সাহিত্যসেবীর পরিচয়); ৩। সপ্তপর্ণী। গল্প। পৃ. ৫৫, ১ম সংস্করণ, আশ্বিন ১৩১৬। ৪। পদ্মিনী। ঐতিহাসিক উপাখ্যান। পৃ ।৴০+৮০ ১ম সং ১৩১৭ বঙ্গাব্দ; ৫। কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব। পৃ ২২; ১৩১৭।৬ পৌষ "দেবালয়ে" পঠিত প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ; প্রকাশকাল—বেঙ্গল লাইব্রেরীর তালিকায় ২০ জানুয়ারী ১৯১১। ৬। কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন চরিত। পৃ ॥৵০+ ১৪৪; ১ম সং ১৩১৮ বঙ্গাব্দ; ৭। জীবনের সুখ। অনুবাদ। পৃ ॥৵০+১২; ১ম সং ১৩১৯ বঙ্গাব্দ; ৮। কথা। গল্প (পাওয়া যায় নি, তবে "বঙ্গসাহিত্যের একপৃষ্ঠা" গ্রন্থের পিছনে প্রকাশের বিজ্ঞাপন এবং ৮টি ছোট গল্পের অন্তর্ভুক্তির কথা আছে)।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয় ॥ ইন্দুপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত জীবনের অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বিক্ষিপ্ত রয়েছে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর 'ভূমিকা' ও 'নিবেদন' অংশে। এতে জানা যাবে লেখক-জীবনে তিনি কোন্ শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। কার কাছে তিনি কি পরিমাণে কৃতজ্ঞ ইত্যাদি খবর জীবনচরিতের উপকরণ হিসাবে এবং এ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারকে জানবার পক্ষে এইগুলি নিশ্চয় উল্লেখযোগ্য। ১। গুলবাহার। দৃশ্যকাব্য ভূমিকা লিখেছেন শ্রীযদুনাথ সরকার।—"বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাসিম যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজদের সামনে হটিতে হটিতে ক্রমে মুঙ্গের পাটনা হইয়া, নিজ রাজ্যের সীমা ছাড়িয়া অযোধ্যার অধিকারে আশ্রয় লইলেন।[৯] * * * কিন্তু তাঁহার পলায়নের সময়ের একটি বড়ই সুন্দর ও করুণ গল্প অনেকদিন হইতে লোকমুখে মুঙ্গেরে চলিয়া আসিতেছে। ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই, কারণ মুঙ্গের ছাড়িবার সময় নবাবের যথেষ্ট ধন ও জন বল ছিল, তিনি যে তখন নিজ পুত্র কন্যাকে অসহায় ফেলিয়া পালাইবেন ইহা বিশ্বাসের অযোগ্য। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কাব্য ঐতিহাসিক সত্যের আবদ্ধ নহে। এই প্রচলিত গল্পে ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু ইহাতে কাব্যের উপকরণ যথেষ্ট আছে।

'গুলবাহারের' বিষয় মানব হৃদয়ের সনাতন প্রাথমিক বৃত্তিগুলি জাগাইয়া দেয়। অপত্যস্নেহ, ভ্রাতৃপ্রেম, অকাল মৃত্যুর শোক, মহতের পতন প্রভৃতি বিষয় সব দেশে ও সব যুগে মানব হৃদয়কে করুণ রসে সিঞ্চিত করে। স্থানকাল ভেদে ইহার পার্থক্য হয় না, সত্যমিথ্যা বিচার করিবার জন্য আমাদের আকাঙ্খা হয় না। এই রস 'গুলবাহারে' পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান তাই পদ্যটি এত মনোরম হইয়াছে। শ্রীমান ইন্দুপ্রকাশ এই ছোট ঘটনাটি সরল ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত আয়তনে বর্ণনা করিয়া বিষয়টিকে

৮ সুপ্রভাত, ১৩১৭ পৌষ সংখ্যায় মুদ্রিত

৯ বিস্তৃত বিবরণ।—গুলাম হুসেন রচিত—'সিয়ার-উল-মুতাখ্খরীন

রসভঙ্গ হইতে বাঁচাইয়াছেন। ভাষা ফেনাইয়া তোলা হয় নাই।"

গ্রন্থের 'নিবেদন' অংশ থেকে জানা যায় গ্রন্থখানি একাধিকস্থানে অভিনীত হয় এবং প্রথম সংস্করণের গ্রন্থগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় সামান্য পরিবর্তিত আকারে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের প্রথমে একটি কবিতা মীরকাসিমের পুত্র ও কন্যা গুল ও বাহার-এর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।—

দুটী শুভ্র শিশু তারা; দুটী যেন স্ফুট কোকনদ
অতীতের স্বপ্নালোকে পাই যেন তাদের আভাস,
দুর্ব্বল সমাধি তার কি বর্ণিবে গৌরব, সম্পদ ?—
নিশিদিন বিলাইছ কি সৌরভ স্মৃতির নিশ্বাস!
এখনো বাঁশরী বাজে, হা-হা করে বরষার রাতি
এখনো জাহ্নবী কাঁদে মর্মে মর্মে তাহাদের লাগি ?
এখনো সমাধি-তলে জ্বলে যেন প্রতীক্ষার বাতি,
সমাহিত প্রেম তবু, আছে আহা, আজো আছে জাগি
রজনী ঘনায়ে এলে শুনা যায় অসির ঝঞ্ঝনা,
মনে হয় কৃষ্ণরাত্রি রক্তস্রোতে লাল হয়ে ওঠে,
তারা দুটী, তবু আহা, দূর করে প্রেমের গঞ্জনা
অতুলন অনুরাগে! তারা আছে তাই বুঝি ফোটে
মৃত্তিকার তল হতে অনুপম গোলাপী আভায়
গোলাপ! উজ্জ্বল ধরা শুভ্র পূত রজনীগন্ধায়।

২। **বঙ্গসাহিত্যের এক পৃষ্ঠা**। বলদেব পালিত। বিহারীলাল চক্রবর্তী। দ্বারকানাথ গুপ্ত। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রমদাচরণ সেন। অধরলাল সেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। রাধানাথ রায় বাহাদুর। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ নয়জন সাহিত্যসেবীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

ভূমিকা। "ডাক্তার জনসনের লিখিত কবিদিগের জীবনচরিত (Lives of the Poets) পাঠ করিতে করিতে বর্তমান গ্রন্থরচনার সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হয়।" গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় বাংলার মহিলা কবি কামিনী রায়ের কবিতার নিম্নোক্ত কয় লাইন উদ্ধৃত আছে—

"কেবা কারে নিরখয়, কে কার সন্ধান লয়,
ক'জনার সাথে হয় ক'জনার পরিচয় ?
মুখ যার চিনে রাখি, চিনি না হৃদয় তার,
অকথিত হৃদ্‌ভাষা সাধ্য নাহি বুঝিবার।"

—ইন্দুপ্রকাশ এই গ্রন্থে উক্ত নয়জন সাহিত্যসেবীর "অকথিত হৃদ্‌ভাষা" বুঝিবার ও বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। সম্পূর্ণ কৃতকার্য না হলেও ইতিহাসের দিক থেকে বইখানির মূল্য যথেষ্ট।

৩। **সপ্তপর্ণী**। গল্প।

উৎসর্গ: পরম পূজনীয় শ্রীযুক্তচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃদেব শ্রীচরণকমলে।

বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত এবং নতুন কয়েকটি গল্পের সংকলন।

সূচী॥ স্বপ্ন-সঞ্চরণ, ভদ্রা, সহানুভূতি, রাখী বন্ধন, কাজে ও কথায়, আত্মদান, স্বদেশ: দান, আত্মদান, পণরক্ষা।

"নিবেদন। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় আমার এই গ্রন্থখানির নামকরণ করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য সর্বাগ্রে আমি তাঁহার নিকট আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।"

৪। **পদ্মিনী**। ঐতিহাসিক উপাখ্যান। উৎসর্গ: যদুনাথ কাঞ্জিলাল এম. এ. বি. এল.।

ভূমিকা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ইতিহাসের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া সরল ভাষায় পদ্মিনীর কাহিনীটি আমি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। * * ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দিনকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, কারণ তিনি স্ত্রীহরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। * * ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দিন সম্বন্ধে যেরূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়াছেন আমি তাহা অন্যায় বলিয়া মনে করি, এবং সেই জন্য এই গ্রন্থে যেখানে সুযোগ পাইয়াছি সেখানেই তাহার মহত্ত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি; ইতিহাসকে অতিক্রম না করিয়া আমি যতটুকু পারিয়াছি, আলাউদ্দিনের সম্মান রক্ষা করিয়াছি। * * এই কাহিনী রচনার নিমিত্ত আমি টডের (Col. James Todd) রাজস্থান, রঙ্গলালের (১৮২৬—৮৭ খ্রী.) পদ্মিনী উপাখ্যান ও অন্য কোন কোন গ্রন্থের সাহায্য লইয়াছি। টড্ ইতিহাস লিখিয়াছেন, রঙ্গলাল কাব্য লিখিয়াছেন। রঙ্গলাল যে যে স্থানে ইতিহাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, আমি সে

সকল স্থানে ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

৫। **কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব।** প্রবন্ধ। "দেবালয়ে" বক্তৃতার পুনর্মুদ্রণ। এই প্রবন্ধ রচনার কারণ সম্বন্ধে ইন্দুপ্রকাশ বলেন—

"সে আজ বেশী দিনের কথা নয়, সুবিখ্যাত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[১০] বাংলা সাহিত্যের সহিত যেটুকু সামান্য পরিচয় আছে তাহাতে আমার বিশ্বাস সেই প্রবন্ধটির মত বাংলা সাহিত্যে অতি অল্পই লিখিত হইয়াছে, এমন কি সুপুষ্ট ইংরাজি সাহিত্যের পক্ষেও সে প্রবন্ধটি গৌরবের বস্তু হইতে পারিত। প্রবন্ধটির নাম "ঋষিত্ব ও কবিত্ব"। শাস্ত্রী মহাশয় সেই প্রবন্ধে বড় সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে কবিত্বের সহিত ঋষিত্বের ঘনিষ্ট যোগ বর্তমান আছে। (পৃ ১-২) এই প্রবন্ধে শাস্ত্রী মহাশয় কালিদাস, ভবভূতি ও শেলীকে ঋষি ভাবাপন্ন বলিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমি দেখাইতে চাই যে রবীন্দ্রনাথও তাঁহাদের মত ঋষি-প্রকৃতি-সম্পন্ন কবি।"

ইন্দুপ্রকাশের মতে—"সাধারণ নগ্ন চক্ষুর কাছেও এই তিনখানি (নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি) কাব্যে কবি ভক্তরূপে দেখা দিয়াছেন। যাহা প্রচ্ছন্ন ছিল, যাহা শুধু সূক্ষ্মবুদ্ধির কাছে, তত্ত্বজ্ঞের কাছেই কেবল অভিব্যক্ত হইত তাহা আর লুক্কায়িত রহিল না।" (পৃ ২-৩)

এখন এই তিনখানি কাব্য সম্বন্ধে ইন্দুপ্রকাশের মত সংক্ষেপে উধৃত করে দেখাচ্ছি—

পৃষ্ঠা ৯-১০। "কবি 'নৈবেদ্যে' ভব-সংসারে কর্ম-পারাবারপারে, নিখিল-জগত-জনের মাঝারে দাঁড়াইতে চাহিয়াছেন।"

"নৈবেদ্যে যাহা উদ্বোধন, খেয়ায় তাহার আরম্ভ আর গীতাঞ্জলিতে তাহার আপেক্ষিক পরিণতি (Relative Prefection)।"

"নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি এই তিন খানি কাব্য একত্রে পাঠ করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই একটি স্পষ্ট ধারাবাহিকতা ও কবি-জীবনের আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ বেশ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিতে পারিবেন।"

৬। **কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত।** এই জীবনচরিতখানি বাংলা সাহিত্যে একখানি প্রথম শ্রেণীর চরিত-গ্রন্থ বলেই মনে করি। এই গ্রন্থরচনায় তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম ও পড়াশুনা করতে হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের পরামর্শমত তিনি পড়াশুনা করেন। তাঁর নিজের ভাষায়—"আমি পারস্য ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা এ দুয়ের কোনটিতেই অভিজ্ঞ নহি। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-চরিত রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া আমি মারখামের[১১] পারস্যের ইতিহাস পাঠ করি। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া পারস্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত, পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম. এ. মহাশয়ের পরামর্শানুসারে আমি পারসিক সাহিত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে বাধ্য হই। হাফিজ, সাদী, ওমর খৈয়াম প্রভৃতির প্রধান প্রধান কাব্যের ইংরেজী অনুবাদ ব্যতীত আমি এডওয়ার্ড জি. ব্রাউনের[১২] পারসিক সাহিত্যের ইতিহাস, রেভারেণ্ড জে. রেনল্ডসের[১৩] পারসিক কবিদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করি। * * * এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত আমি ১৩১৩ সাল হইতে আজ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে শ্রম করিয়াছি।"

বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই গ্রন্থের ভূমিকায় অক... স্বীকার করেছেন—"গ্রন্থকার নিজেও কবিত্বশক্তিসম্পন্ন, সুতরাং কবির চরিতাখ্যায়ক হইবার তাঁহার স্বতঃই অধিকার আছে। আশা করি এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্প সংখ্যক জীবনচরিত গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার পক্ষে সহায়তা করিবে।"

এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায়ই কবি ইন্দুপ্রকাশের ডুবুরী মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রসঙ্গে ইন্দুপ্রকাশ লিখেছেন (পৃ. ১-২)—"হাফিজ, ওমর খৈয়াম পারস্য দেশের পাগল কবি, কাউপার ইংলণ্ডের

১০। ভারতী, ১৩০৭ বৈশাখ।

(১১) Markham's History of Persia.

(১২) Browne's Literary History of Persia.

(১৩) Reynold's Biographical Notices of Persian Poets.

পাগল কবি। বাঙলার পাগল কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। পাগল জগতে অসাধ্য সাধন করিয়াছে।[১৪] পাগল ভক্তরূপে, বক্তারূপে, রাষ্ট্রীয় নেতারূপে, সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারকরূপে, নারীসুহৃদরূপে, সাহিত্যিক ও কবিরূপে, যোদ্ধা ও কর্মীরূপে, যুগে যুগে, দেশে দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধারণ মানুষ অসাধারণ হইলেই জগৎ তাহাকে পাগল বলে। এ জগতের ইতিহাস কেবল পাগলদিগের কাহিনী লইয়াই রচিত। যাহারা সুখ ছাড়িয়া দুঃখকে বরণ করিয়া লয়, তাহাদেরই পদরজে পৃথিবী পবিত্র হয়। সুখের কাঙাল 'সুখ' 'সুখ' করিয়া ভিক্ষাঝুলি পূর্ণ করিবার জন্য অহোরাত্র ক্রন্দন করিতেছে। কিন্তু সে হতভাগ্যদের কথা কেহ জিজ্ঞাসাও করে না। জগতের চক্ষে ও জগতের পক্ষে তাহারা মৃত। আত্মসুখ যাহাদের চির আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, মৃত্যু তাহাদের একমাত্র পুরস্কার। এ জগতে কত রাজা, ভোগী, বিষয়ী, বিলাসী অতীতের গর্ভে চির-সমাধি লাভ করিয়াছে, কিন্তু দুঃখের পশরা মাথায় বহিয়া কেহ মরণ লাভ করে নাই। যেন দুঃখই "অমৃতস্যৈষ সেতুঃ"।"

এই গ্রন্থ রচনার সঙ্কল্প প্রসঙ্গে ইন্দুপ্রকাশ বলেন (ভূমিকা) —"বহুদিন পূর্বে আমার ইচ্ছা ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীর নাম দিব, "বাঙলার হাফিজ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।" পরে দেখিলাম, তিনি সাদী ও অন্যান্য কবির যেরূপ প্রভাব লাভ করিয়া-ছিলেন, তাহাতে শুধু তাঁহাকে হাফিজ (পারসিক কবি) বলা চলে না। তিনি বহুর অনুপ্রাণনে অনুপ্রাণিত হইলেও তাহার নিজের একটি স্বতন্ত্র স্থান আছে, অন্য কাহারও নাম গৌরব তাঁহার অম্লান যশোরাশির মহিমা খর্ব করিবে; কাজেই পূর্বের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। মার্কিন ঋষি এমার্সনের (Ralph Waldo Emerson) উক্তিও মনে হইতেছিল, "He is great who is what he is from nature and who never reminds us of others."

৭। **জীবনের সুখ** : ছোট উপন্যাস। উৎসর্গ : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

জর্জ ইলিয়টের লিখিত "The Sad Fortunes of the Rev. Amos Barton"-এর অনুবাদ। ইউরোপের শিল্পী সার ফ্রেডারিক বার্টন ও মিলারের অঙ্কিত ছবিতে গ্রন্থখানি অলঙ্কৃত। জর্জ ইলিয়টের ছবিখানি ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত। ইতিপূর্বে কোনও গ্রন্থে বা সাময়িক পত্রিকায়, ভারতে বা ইংলণ্ডে এই ছবির প্রকাশ হয় নি। একমাত্র কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' পত্রিকায় ছবিখানির প্রকাশ হয় যখন এই 'জীবনের সুখ' উক্ত পত্রিকায় ধারাবাহিক[১৫] ভাবে প্রকাশ হতে থাকে। এদিক দিয়ে এই গ্রন্থখানি উল্লেখযোগ্য এবং পত্রিকাখানি ধন্য হয়েছে।

৫

ইন্দুপ্রকাশের কবিতা॥ ইন্দুপ্রকাশের কোন কবিতা-গ্রন্থ প্রকাশ হয় নি। কিন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংগ্রহ যোগ্য কিছু কবিতা রয়েছে। তাই ইন্দুপ্রকাশের কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে করছি। তাঁর বেশীর ভাগ কবিতা প্রবাসী তারপর মানসী, সুপ্রভাত, ভারত-মহিলা এবং ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত।

ইন্দুপ্রকাশ যে ভারতীয় সাধনার প্রতি আস্থাবান ছিলেন তা তাঁর কবিতা থেকে বেশ বোঝা যায়। 'কর্মযজ্ঞ' নামক কবিতায় কবি এই বিরাট বিশ্বের মহাযজ্ঞের কথা উপলব্ধি করেছেন—

কর্মের মহা　　যজ্ঞের তরে
বাজিছে বিপুল বাজনা
ডাকি নিদ্রিতে　　কহে আগ্রহে
উঠ উঠ আঁখি মেল না।
*　　*　　*
মিলন সূত্র　　সংসার মাঝে
ছিল অদৃশ্য　　অক্ষয় কাজে
আজি সে তন্তু বেষ্টন করি
কি মাল্য হতেছে রচনা,—

এবং সব শেষে কবি বলেছেন—

সকল যাত্রা　　তীর্থ-দুয়ারে
মাগিছে সিদ্ধি　　সিদ্ধি-দাতারে,
উঠিল শব্দ জীমূত-মন্দ্রে
"পূরিবে পূরিবে কামনা,"—

(১৪) নব্য রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি—প্রফুল্লচন্দ্র রায়, পৃ. ৫৩।

১৫। সুপ্রভাত, ১৩১৮ ফাল্গুন, চৈত্র। ১৩১৯ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ।

'তপস্যা' কবিতায় কবি বৈদিক যুগকে আন্তরিকভাবে কামনা করেছেন।—

"যুগযুগান্তের কথা সেত, একদিন আর একদিন
সামগান উঠেছিল হেথা, পূর্ণ করি এ ঘোর বিপিন;
* * *
আন তবে আন ঋষিবর—সেই মহাশুভ একদিন"

তপস্যারত তপস্বীকে উদ্দেশ করে কবি বলছেন—

"শুভলগ্ন আসিবে যখন, ত্যজি তব আসন মর্মর
হে তপস্বী দাঁড়াইবে উঠি—প্রসারিয়া উর্ধ্বে দুটী কর।
আজিকার সীমাবদ্ধ প্রেম—সেইদিন হবে সীমাহীন,
ব্যবধান জড় চেতনের দূর হবে সেই একদিন।"

'বিজয়াদশমী' কবিতায় আত্মীয়পরিজন-বিরহে কাতর প্রবাসী কবির মন অন্য এক বিজয়া দশমীর ব্যথায় ভারাক্রান্ত।—

"বিজয়া দশমী আজি; বিজন সন্ধ্যায়
ভাবি আমি অতীতের সুন্দর সীমায়
আর এক বিজয়া দশমী। * * *
সেই দিন, সেই স্নিগ্ধ নৈশাকাশ তলে
যাহারা বাঁধিয়াছিল তপ্ত বক্ষস্থলে
এ মোর পঙ্কিল হৃদি আলিঙ্গন ডোরে
কোথা তারা আজি? কোন্ দুরদৃষ্ট মোরে
আনিয়াছে এ প্রবাসে? দূরে যাই যত
ব্যবধান বাড়ে—আরও মৃণালের মত
দীর্ঘ হয় যোগসূত্র মম হৃদয়ের।"

'দোল পূর্ণিমা'য় কবি যেন কার আহ্বান অনুভব করেছেন—

"দোল্—সে কি সুমধুর দোল্
সে দোল্ হৃদয়ে এসে বলে "আজি খোল্ ওরে খোল্
নিরুদ্ধ দুয়ার তোর!" থেকে থেকে কে যেন রে বলে
"দোল্—দোল্!"

'আরতি-অন্তে' কবিতায় কবি 'বিশ্বরাজন্' 'চির আরাধ্যদেবতা'র কাছে আত্মসমর্পণ করে শান্তি পেতে চেয়েছেন—

"চির জীবনের সঞ্চিত আশা
চির জীবনের যত ভালবাসা
চির আরাধ্য দেবতার পায়
দিয়াছে সে সব তুলি,
সন্ধ্যা আরতি শেষ হয়ে গেছে
নিভে গেছে দীপাবলী।

বিশ্ব আঁধার মহা কোলাহল,
তবু সে যাত্রী নহে চঞ্চল,
কল্লোল মাঝে শুনিছে নিয়ত
গুঞ্জন করে অলি।"

'প্রেমের শাসন' কবিতায় প্রেমের শান্ত সমাহিত মূর্তি সুন্দর ফুটেছে। এই শান্ত সমাহিত ভাব ইন্দুপ্রকাশের কবিতা বৈশিষ্ট্য।—

"কিন্তু সেদিন,—সেদিন শুভদিন
সাঁঝের আঁধার জড় হয়ে আসে,
ভিড়ের মাঝে চেয়ে দেখি কখন
স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশে;
ধীরে যবে ধরিনু তাহার হাত
সিক্ত তার দেখিনু আঁখিপাত।"

নিম্নলিখিত কবিতাটি 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য ইন্দুপ্রকাশ লেখেন। এবং প্রকাশ হয় ভারতবর্ষ, ১৩২ শ্রাবণ সংখ্যায়, ইন্দুপ্রকাশের মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে।

স্বর্গ। ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সে দেশ জানো কি, জানো কি সে দেশ,
যেথায় জীবন উৎস
যেথাকার জল প্রাণ এনে দেয়—ধারার নাহিক অন্তরে!
নন্দন-শিশু দেবদূতসনে গানেতে মিশায় কণ্ঠ,
ধূপ-ধুনা জ্বলে, সঙ্গীত উঠে মথিয়া তাহার গন্ধ;
সে দেশ জানো কি, জানো কি সে দেশ,
ভাতি নাহি দেয় সূর্য্য-
নিত্য যেথায় দেব মহিমায় আলোক তাহার তুচ্ছ!
ক্ষেতগুলি যেথা হরিৎ বরণ, অমল ফুলের বর্ণ
গন্ধমাধুরী লুটিছে বাতাস, চঞ্চল ফুলপর্ণ!
বিষাদের শ্বাস পড়ে না যেথায়, অশ্রু ঝরে না নেত্রে,
হৃদয় যেথায় ভাঙেনা কখনো—দুঃসহ দুঃখবেত্রে;
দুঃখের স্বাদ পায় নাই কেহ, অজ্ঞাত তার নাম:
নিত্য যেথায় ধ্বনিয়া উঠিছে—আনন্দ ঋক্-সাম;
সুরের লহরী কাঁপিয়া উঠিছে, বাজিছে স্বর্গবীন;
বাজিছে যেথায় রম্যযন্ত্র, ধরার দৃষ্টি ক্ষীণ;
সুর-স্বরময় আলোক ধারায় যন্ত্রীরা করে স্নান—
যথায় হীরক, রজত শুভ্র, সব হয়ে যায় ম্লান!
ইন্দ্রধনু হ'তে ঝরি পড়ে কত মরকত মণিকান্তি,
সত্য নহেন বাক্যমাত্র, স্বপ্ন নহেন শান্তি;
বিশ্বরাজের আসন হেথায়, পুণ্যবানের দেশ,
মহিমার দেশ এই তো, এখানে শান্তির নিতি-উন্মেষ!
পৃথিবীর সব শেষ হ'য়ে গেলে, বাকি থাকে শেষ বর্গ;
প্রেমের আলোকে উজল এ দেশ-স্বর্গ!—এই তো স্বর্গ!

এই স্বর্গেই ইন্দুপ্রকাশের আত্মা তৃপ্তিলাভ করেছে।

ঘরে বাইরে

রামেন্দ্রসুন্দর

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

মহিমার্ণব তারাপ্রসন্ন ভোরে উঠেই বেশ ফুল্‌কো গরম গরম থালাভর্তি লুচি খেতেন। যদি সম্পূর্ণটা উদরস্থ না হত বাকীটা তিনি রামেন্দ্রসুন্দরের একটি ডেস্কের দেরাজের মধ্যে রেখে দিতেন। এটি নানা মাস দুই হল অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছেন। ফরাশে বসে লিখবেন বলে পায়াগুলি ছোট, মধ্যস্থলে কাগজপত্র রাখবার গহ্বর, আর ওপর-নীচে দু-ধারেই দুটি করে চারটি ড্রয়ার। যেদিন প্রথম ওই ডেস্ক তৈরি হয়ে আসে, তারাপ্রসন্ন তাঁর নিজস্ব জিনিস রাখবার জন্য একটি ছোট ড্রয়ার চেয়ে নিয়েছিলেন।

প্রাতঃকালীন আহারের অবশিষ্ট লুচি গুড় মিষ্টান্ন আলু পটলভাজা প্রভৃতি পেটপূজোর ব্যবস্থা একটা কাগজের মোড়কে জড়িয়ে তারাবাবু তার মধ্যে সযত্নে তুলে রাখতেন। শুধু তাই নয়, তাতে আবার চাবি বন্ধ করে দিতেন। লক্ষ্য করে দেখেছি, চাবিটা তাঁর কোটের পকেটেই থাকত।

তারাবাবু ট্রেজারী বিল্ডিংয়ে তখন কেরানীর কাজ করতেন। অফিস যাবার সময় টিফিনের জন্যে সেই কাগজের মোড়ক পকেটেই পুরে নিয়ে যেতেন, আবার কোনও কোনও সময়ে হয়তো সেটা নিয়ে যেতেন না—কাজেই দু-চারখানা করে বেশ জমে উঠেছিল। সেগুলোকে আর লুচি বলা যায় না—যেন জুতোর সুখতলা। তারাবাবুর কোনও আপত্তি নেই—হোক না দু-তিনদিনের বাসী, হোক না চামড়ার মত শক্ত আর চিমড়ে। দ্বিপ্রাহরিক জলযোগ তাতেই সুসম্পন্ন হত। বড় নোংরা থাকতেন তিনি—গায়ের দুর্গন্ধ আর দাঁতের খোশবায়ে পাশের লোকের তিষ্ঠানো দায়। তবু তো এখন গোঁফ কামিয়ে ফেলেছেন।

বাড়িতে কারও গোঁফ নেই, তারাবাবুরই বা থাকবে কেন? এই অজুহাতে একদিন শীতলচন্দ্র ও উমাপতি বাজপেয়ী সমবায়ে রীতিমত অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়ায়, তিনি অগত্যা গুম্ফ বর্জন করে দলে নাম লেখালেন—এইটুকুই যা মন্দের ভাল। এবার মোছের ফাঁকে ময়লা-জমানো মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার দুর্ভোগ তাঁদের আর পোয়াতে হবে না।

শুধু কি এই? আরও আছে।

আট-দশদিন পর হয়তো একদিন কাকস্নান করতেন। সেও একটা দেখবার মত। মাথায় সিকি ছটাক তেল দিয়েই তিনি চৌবাচ্চার ধারে চলে যেতেন। তারপর খুলতেন তাঁর পিরান, একটা নয় দু-দুটো—তার নীচে ফতুয়া, ভীষণ ময়লা; তারও নীচে যে বস্তুটি থাকত, তার নাম হয়তো একদিন ছিল গেঞ্জী, এখন সেটাকে আর চেনাই যায় না—এমনই তেল-চিটচিটে কালো। অনাবৃত হলেই দেখতাম, সেই লোমশ বক্ষের জঙ্গলে অনেক কিছু ময়লা জমে আছে। সময় অসময় জ্ঞান নেই—থাকার কথাও নয়—বিকৃত মুখে দদ্রু কণ্ডূয়ন লেগেই আছে, পারতপক্ষে ওঁর কাছে ঘেঁষতাম না।

মাথায় এক ঘটি জল ঢেলেই তিনি স্নানকার্য শেষ করে ফেলতেন। গা ভিজত না। তারপর আবার যথাক্রমে একটির পর একটি গায়ে চড়িয়ে নিতেন। পরনের কাপড় বদলাতে অবশ্য ভুল হত না।

এখানে তারাবাবুর আর এক কৃতিত্বের কথা না বলে উপায় নেই। তিনি অফিসে নাম রেখেছিলেন শুধু মাস গেলে মাইনে নেবার জন্যে। তাঁর নির্দিষ্ট চেয়ারে নিজের চাদরখানা ভাল করে বেঁধে উনি দেখিয়ে দিতেন তাঁর উপস্থিতির নমুনা। গায়ে-পড়ে নেওয়া বহুলোকের বহুবিধ উদ্ভট কার্যের সুরাহা করে দেবার জন্যে হাজিরা বইতে কোনও রকমে নাম সই করেই "ফিল্ডওয়ার্কে" বেরিয়ে পড়তেন। কেবল ঠিক রাখতেন অফিসের বড়বাবুর যথাসময়ে বাজার করে দেওয়া এবং তাঁর গিন্নী ও ছেলেমেয়েদের খুঁটিনাটি সুবিধে-অসুবিধের জন্যে সময়বিশেষে চিন্তিত ভাব দেখান—এ বিষয়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। হাজার হলেও বিবেকবুদ্ধি দিয়ে পালিশ-করা মানুষ তো! তবে এর জন্যে অন্যান্য কেরানীরা তাঁকে হিংসেও যে না করত তা নয়; কিন্তু বড়বাবু একটু "ইয়ে" করতেন কিনা—তাই মুখ ফুটে কারও কিছু বলার সাহস হত না। বছরের পর বছর তিনি বহাল-তবিয়তে খোশমেজাজে কেরানীগিরিটা বজায় রেখে চলতেন। এর ওপর নানীর এটা সেটা ফাই-ফরমাশ তো লেগেই আছে।

রামেন্দ্রসুন্দর জানতেন না যে, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য তাঁরই লেখার ডেস্কে এই কাণ্ড করে বসে আছেন। একদিন তিনি কী যেন একটা লিখছিলেন—যত সব পিঁপড়ের ব্যাটেলিয়ন ওই টানা থেকে বেরিয়ে তাঁর গায়ে উঠতে চায়, তাঁর খাতা-পত্তরের উপরেও আক্রমণ চালায়। তিনি শশব্যস্ত হয়ে যে দেরাজ হতে ফৌজের আক্রমণ, সেটা খুলতে গিয়ে দেখেন তালাবন্ধ। অগত্যা ভৃত্য গৌরকে ডেকে ওই পিপীলিকাশ্রেণীকে মুছে দিয়ে যেতে বললেন। তাঁর কথা অনুযায়ী সেও ধুয়ে মুছে দিয়ে গেল। তারপরই আবার আর এক দল লালফৌজের কুচকাওয়াজ। সার সার পিঁপড়ের দল এসে নানাকে জ্বালাতন করতে শুরু করে দিল। তিনি মাঝে মাঝে হাত ঝাড়েন গা ঝাড়েন, খাতার উপর থেকে ক্ষুদ্রকায় জীবদের সরিয়ে দেন, তবুও অভিযানের বিরাম নেই। এমন সময় আমার আবির্ভাব। নানার এই অবস্থা দেখে প্রথমটা একচোট খুব হেসে নিলাম। তারপর বলি, তা বুঝি জান না! ওটা যে তারাবাবুর ভাঁড়ার। তাঁর ভুক্তাবশিষ্ট যত সব বাসী পুরী-মেঠাই রাখবার সিন্দুক।

রামেন্দ্রসুন্দর অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন, তাঁর অসহায় মুখের ভাব দেখে মনে হল যেন তিনি ইতিপূর্বে আর কখনও এমন অবস্থার সম্মুখীন হন নি।

চাবি কোথায়?

ওই যে কোটের পকেটেই থাকে—এখন আছে কিনা জানি না।

তারাবাবু নানীর কী একটা ফরমায়েশী ওষুধ কিনতে সকালেই বেরিয়ে গিয়েছেন। কোট সামনেই টাঙানো।

নানা বললেন, দেখ তো চাবিটা আছে কি না!

আমি কারও পকেটে হাত দিই না। গৌরকে ডেকে দিচ্ছি।

সে আসতেই বললেন, ওই কোটের পকেটে যদি কোন চাবি থাকে, নিয়ে এসে এটাকে খুলে দেখ তো কী আছে?

গৌর সব পকেটে হাত চালিয়ে বুক-পকেটে হাত দিতেই বেরিয়ে এল একটা ময়লা সুতো-বাঁধা চাবি আর সর্বদক্রহুতাশনের কৌটো। ওই টানাটা খুলতেই রামেন্দ্রসুন্দরের চক্ষু স্থির। রাশি রাশি পিঁপড়ের দল লুচি-মেঠাইকে ছেয়ে ফেলেছে; কিমাশ্চর্যমতঃপরম্! তার পরেও কিনা একটা জ্যান্ত আরসোলা তার মধ্যে! ওরে ব্বাবা!

নানা তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুতপদে সরে দাঁড়া[illegible] গৌরকে ওই উড়ন্ত বাঘ ধরে নীচে ফেলে দিতে বললেন, আর ড্রয়ারটা ভাল করে ধুয়ে মুছে আনতে বলে দিলেন।

এমন সময়ে তারাপ্রসন্নের শুভাগমন। ঘরে ঢুকেই একটা পেটেণ্ট ওষুধ কিনতে কত যে পরিশ্রম করেছেন তারই কৈফিয়ত দিয়ে বললেন, ওঃ, জানেন বড়বাবু, কী হয়রানিটাই না হয়েছি এটি সংগ্রহ করতে। ইন্দুমা আজ দু-তিনদিন হল আনতে বলেছেন—চারদিক ঘুরে ঘুরেও পাই নি। আজ বহু কষ্টে একটা ছোট্ট দোকানে কী ভাগ্যে পেয়ে গেলাম।

আর আমারও কী ভাগ্য, তোমার মত এমন গুণধর ছাত্র পাওয়া!—রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা।

তারাপ্রসন্ন মনে করেছিলেন, কত না বাহবা পাবেন, তার বদলে এবম্বিধ উচ্চারণ শুনে প্রথমটা কেমন যেন বজ্রাহত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। এ ধরনের অভিনব সম্ভাষণ

কেন যে বড়বাবু করলেন, তাঁর মস্তিষ্কে আসে নি। নানা পুনরায় হাত দেখিয়ে বলেন, আমার ড্রয়ারে তোমার এত সব মূল্যবান আসবাবপত্তর না রাখলেই কি চলত না? তোমার কী আক্কেল বুঝি না!

এতক্ষণে বোধগম্য হল কিসের জন্যে গুরুজীর এমন গুরুতর উক্তি! পাশে চেয়ে দেখেন তাঁর পুরী-মণ্ডা রাখার গুপ্ত স্থানটি একেবারে চিচিংফাঁক। সেই শূন্য স্থান যেন দন্তহীন ফোকলা মুখে তাঁকেই বিদ্রূপ করে হাসতে চায়।

এর মধ্যেই গৌর দেরাজ ধুয়ে মুছে সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করে দিয়ে গেল। রামেন্দ্রসুন্দর চাবি লাগিয়ে ড্রয়ার বন্ধ করে সেটা নিজের হাতবাক্সে রেখে বললেন, খুব হয়েছে, এটা আমার কাছেই থাক্।

তারাপ্রসন্ন আমার দিকে চাইলেন—তার অর্থ তুমিই যত সব নষ্টের গোড়া। আচ্ছা, তোমায় দেখে নেব, যাবে কোথায়?

তিনি জানতেন তাঁর এই নিভৃত রহস্যের সন্ধান আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেদিনকার মত সব ধামা চাপা পড়ে গেলেও আমি যে একদিন তাঁর চাপে পড়ব, তা ভাবতে পারি নি।

আমার ব্রাহ্ম পরিবেশে মেলা-মেশাটা কেউ সুনজরে দেখত না, কিন্তু নানার অনুমতি ছিল বলে কারও বাধা দেবার সাহস হয় নি। ব্রাহ্মদের আলোকপ্রাপ্ত পরিবারে "সুনীতি" "সুরুচি" কথাগুলো প্রায়ই শোনা যেত। বলা বাহুল্য, আমিও তারাবাবু আর পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে সেগুলোর যথোচিত সদ্ব্যবহার করতাম—ফলে দুজনেই উত্ত্যক্ত হয়ে উঠলেন। পণ্ডিত নিরামিষ মানুষ, এই চটেন এই পটেন, কিন্তু তারাবাবু যেন খাপে-ঢাকা বাঁকা তলোয়ার—খোঁচা দিতে পারলে ছেড়ে কথা বলেন না।

একদিন কিরণ আসে নি, তার যমজ বোন দীপ্তি একাই এসেছে। অশ্রান্তধারায় বর্ষণ শুরু হল। সারা আকাশখানায় কে যেন বিদ্যুতের চাবুক চালিয়ে যায়—কড় কড় কড়াৎ। বেদনাহত পৃথিবী বুকফাটা আর্তনাদে মুহুর্মুহু কেঁদে ওঠে। সেদিন আর ব্যাডমিণ্টন খেলা হল না।

ঘরে বসেই দুজনে দশ-পঁচিশ খেলছি। খেলা যখন বেশ জমে উঠেছে কী একটা বিষয়ে অনৈক্য হওয়ায় আমি কড়িগুলো হাতের মুঠোয় শক্ত করে চেপে ধরতেই দীপ্তি দু হাত দিয়ে আমার কাছ থেকে সেগুলো ছিনিয়ে নেবার চেষ্টায় ঝটাপটি শুরু করে দিল।

না না, দাও ধীরেনদা, এমন করলে খেলা হবে না।

ঠিক এমনই সময়ে সেখানে তারাবাবু মাথা গলিয়েছেন। আমাদের দেখেই তাঁর মুখে-চোখে একটা ক্রুর হাসি ফুটে উঠল; চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, দাঁড়াও, বড়বাবুকে এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠেই প্রশ্ন করি, এতে আবার বলবার কী আছে?

সেটা বড়বাবুর কাছেই শুনো।

তিনি হন হন করে উপরে উঠে গেলেন।

দীপ্তি অবাক্। আমরা কেউ খুঁজে পেলাম না, কী আমাদের অপরাধ! কিন্তু তবু তার বিচার হল।

তারাবাবু নানার কানে কী বিষ ঢেলে দিয়েছিলেন জানি না, আমার জরুরী ডাক পড়ল।

তারাপ্রসন্নকে তম্বি করা হয়েছে? আর—হুঁঃ—

কী বলতে গিয়ে নানা থেমে গেলেন। তার পরেই বললেন, আজ থেকে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলো বন্ধ।

আমার উপর এই অহেতুক শাস্তির কথা দীপ্তিকে বলতেই তার চোখ ছলছল করে উঠল।

আমাদের বাড়িতে আর যাবে না তুমি? দিদিকে কী বলব তা হলে? মাথা নীচু করে বললাম, বোল, তাঁকে আমার চিরদিন মনে থাকবে। কিন্তু আমার আর যাবার উপায় নেই—নিজেই তো সব শুনে গেলে।

হরদম গাঁজার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত বলে জয়মঙ্গল সিংয়ের ছুটি হয়ে গিয়েছে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে রামপ্রসাদ—সে আবার তার চাইতেও এককাটি সরেস, খুব কড়া প্রহরী। নানার আদেশে তার এবং দামোদরের পাহারায় "গ্রীয়ার পার্কে" ফুটবল খেলতে যাই। গলিটা পার হয়েই সামনে খেলার মাঠ। দীপ্তিদের বাড়ির পাশ দিয়েই যেতে হয়, সে হাতছানি দিয়ে ডাকে, তার দিদিও রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখে কী যেন একটা করুণ আকুলতা। মাথা নেড়ে আমি হন হন করে এগিয়ে যাই। মনের মধ্যে কেমন একটা মোচড় দিয়ে উঠলেও

রামেন্দ্রসুন্দরের নিষ্ঠুর নির্দেশ কেমন অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছি ভেবে বুকটা গর্বে ফুলে ওঠে।

ফেরবার পথেও সেই আকুল আহ্বান: ধীরেনদা, এসোই না একটু, শুধু একবারটি দিদির সঙ্গে দেখা করে যাও।

ধরা গলায় বলি, না।

অভিমানে দীপ্তির ঠোঁট ফুলে ওঠে। কিরণও এক-একদিন হাত ধরে টানাটানি করে, তবু যাই না। কিন্তু কেন?

নানাকে জিজ্ঞেস করলাম, কিরণের বোনদের সঙ্গে আমাকে খেলতে বারণ করেছ কেন? কী করেছি আমি? তারা রোজ আমাকে তাদের বাড়িতে ডাকে, তোমার আদেশে আমি যাই না, তাই কিরণও আর আমাদের বাড়িতে খেলতে আসে না। পরিচিত কেউ ডাকলে, না যাওয়াটাই কি অসভ্যতা নয়?

আজকাল অনেক প্রশ্নই তোমার মনে আসে, সবগুলোর জবাব এখুনি পাবে না। তবে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়াটা এখন স্থগিত।

ফর্মান জারী করেই নানা পুথির পাতায় চোখ রাখলেন।

*   *   *

"মালাই-বর-অ-অ-অফ"—লম্বা টান দিয়ে বেশ গোল-গাল সুরে হাঁক দিয়ে যায় ফেরিওয়ালা।

সন্তোষের দীর্ঘ মূর্তি ঠিক সেই সময়ে আমাদের বাড়ির সামনে দেখা দিল। এসেই আমাকে সানুনয়ে অনুরোধ: যা করেছি ভাই—কিছু মনে করিস নি, আমায় ক্ষমা কর্।

আমার ক্ষমতার বাইরে। যদি নানা আর পণ্ডিত মশাই তোকে ক্ষমা করে, আমার কিছু বলার নেই।

বরফওয়ালা কাছে আসতেই সন্তোষ ডেকে বলল, তোর কাছেই তো আমি রোজ খাই না রে বন্ধু? একটু পরেই আবার আসিস তো এদিকে—কুলপি নেব।

বাঁধা খদ্দেরের সন্ধান পেয়ে ফিরিওয়ালা পুলকিত হল কিনা জানি না, কিন্তু সন্তোষের মুখে দেখলাম হাসি আর ধরে না।

তারপরই পাকা থিয়েটারী ভঙ্গীতে পণ্ডিত মশাইয়ের ঘরে ঢুকে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে সন্তোষ সন্তোষ-চিত্তে নানার কাছে উপরে উঠে গেল। তাঁর পা জড়িয়ে ধরে অনুনাসিক সুরে বলতে থাকে, পণ্ডিত মশাই আমাকে ক্ষমা করেছেন, আপনি অনুমতি না দিলে ধীরেন আমার সঙ্গে কথাও বলবে না, খেলতেও চাইবে না। দয়া করে এবার আমায় ক্ষমা করুন।

কিসের ক্ষমা—কী ব্যাপার? প্রথমটা নানা কিছু মনে আনতে পারলেন না। তা ছাড়া তিনি যে প্রকৃতির লোক—তাঁর খেয়াল থাকবার কথাও নয়।

আমি স্মরণ করিয়ে দিতেই তিনি বিরূপ হয়ে উঠলেন: না, সে হবে না, তুমি বড় দুষ্টু ছেলে।

কী সুনিপুণ অভিনেতা এই সন্তোষ। টপটপ করে তার চোখের জল নানার পায়ে গড়িয়ে পড়ে। সহজ সরল রামেন্দ্রসুন্দর ভাবলেন, কৃতকর্মের জন্যে সত্যি বুঝি ছেলেটি অনুতপ্ত হয়েছে। তামাকের নলে টান দিয়ে বললেন, মাস্টার-পণ্ডিতকে অসম্মান করাও যা, নিজের বাপকে অপমান করাও তাই। মাস্টারের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয় তোমরা শুনে রাখ।

কান্দী স্কুলে যখন পড়ি, আমাদের হেডমাস্টার ছিলেন হরিমোহন সিংহ। অনেক দিন পরে, তখন আমি রিপন কলেজে কাজ নিয়েছি। গরমের ছুটিতে বাড়ি এসে শুনলাম, তিনি বিশেষ অসুস্থ। আমি তখুনি বেরিয়ে পড়লাম তাঁকে দেখতে। বাড়ি কাছেই। গিয়ে দেখি তিনি ঘুমিয়ে আছেন। আমি তাঁর পদসেবা শুরু করেছি, এমন সময় চোখ মেলে আমাকে দেখেই যেন আঁতকে উঠলেন: কর কি, কর কি রাম? আমি যে কায়েত, তুমি যে ব্রাহ্মণ—পায়ে হাত দিতে নেই।

পূর্বস্মৃতির কথায় রামেন্দ্রসুন্দর তন্ময়, আমি তাঁকে সচকিত করে তুলি: তারপরে কী হল, তাই বল।

নানা বলে যান: আমি তাঁকে হাতযোড় করে বললাম, এখানে বামুন-কায়েতের কথা আসে না, আমি ও ধরনের যুক্তি মেনে চলতে পারব না মাস্টার মশাই। তা ছাড়া আপনি আমার গুরু, আমি ছাত্র। এইটেই সবচেয়ে বড় কথা।

নানার কাছেই শুনলাম, প্রিয় ছাত্রের মুখে এই কথা শুনে হরিমোহনবাবু কেঁদে উঠলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের মাথায় হাত দিয়ে তাঁর প্রাণভরা আশীর্বাদ ঢেলে দিলেন।

আমি স্থির হয়ে শুনছিলাম। সন্তোষের মনে কোনও আঁচড় কেটেছিল কিনা, কে জানে! নানা কিছুক্ষণ থেমেই সন্তোষকে বললেন, আচ্ছা যাও, বারান্তরে আর কোর না।

তখুনি রুমালে চোখ মুছতে মুছতে বাইরে এসেই সন্তোষের দন্তরুচিকৌমুদী বিকাশ। একটু আগেই তার চোখে যে বর্ষা নেমেছিল, তার কোনও নামগন্ধ নেই। সন্তোষের সঙ্গে আমিও নীচে নেমে এলাম। আবার সে পণ্ডিত মশায়ের ঘরে ঢুকল। দরজা ভেজানো ছিল, তিনি নেই।

পণ্ডিত মশাই দু বেলাই স্নান করতেন। রাত্রের রান্না সন্ধ্যার পূর্বেই সেরে ঢাকা দিয়ে রাখতেন। সন্তোষ ঘরে ঢুকেই আবার আধ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল, দেখলাম চোখে মুখে স্ফূর্তির জোয়ার। আমাকে ধাক্কা দিয়ে বলল, কই রে, পণ্ডিত তো নেই?

কেন, আবার কী দরকার?

তাঁকে বলতে চাই, তোর নানাও আমাকে খুশী মনে ক্ষমা করেছেন।

পণ্ডিত মশাইকে এখন পাবি না। তিনি গামছা পরে স্নানে গিয়েছেন।

যাক গে, আর দরকার নেই, আমার কার্য শেষ!

সন্তোষের কথার ধাঁচে এই মনে হল যে, নানার ক্ষমা করার কথাটা তাঁকে আর না বললেও চলে।

এদিকে স্নান সেরে এসেই পণ্ডিত মশাই তাঁর শতচ্ছিন্ন মটকার কাপড় পরিধান করে আহ্নিকে বসলেন।

ঠিক এমনই সময় কুলপিওয়ালা ফিরে এল। সন্ধ্যার অন্ধকার সবে ডানা মেলে পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছে।

সন্তোষের চোখে-মুখে কথা: ওরে, কখনও কুলপি বরফ খেয়েছিস?

না। খেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু নানার বিনা হুকুমে ছোঁবার উপায় নেই। রাস্তার জিনিস—তাই—

সন্তোষ আমার গায়ে ঠ্যালা দিয়ে ঠাট্টা করে: আহা, কী সুবোধ বালক রে! ইচ্ছে হয় তোর কথাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখি, আর তোকেও কাঁচের শো-কেসে সাজিয়ে রেখে দিই। ক্যান্ র‍্যা, রাস্তার জিলিপি কি তোর নানা কিনে দেয় না?

আচ্ছা, একটু দাঁড়া। একবার জিজ্ঞেস করে আসি।

তাই যা, একেবারে যেন কলির যুধিষ্ঠির!

তার টিপ্পনীতে কর্ণপাত না করে রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে গিয়ে সটান বললাম, নানা, মালাইবরফ খাব, পয়সা দাও।

নানা মাথা নেড়ে বলে যান, বাজে দুধ দিয়ে ও-সব তৈরী, খেয়ে কাজ নেই। আচ্ছা, তোমার যখন এতই ইচ্ছে, আজকের মত খাও, আর কক্ষনো খাবে না।

শুধু আমি নই, সন্তোষ আর দুম্বাকে নিয়ে আমরা তিনজন।

বেশ, এই নাও তিন টাকা।

সেটি পকেটজাত করে লাফিয়ে সন্তোষের কাছে ছুটে এসেই বগল বাজিয়ে বলি, হুকুম পেয়েছি, আজ প্রাণ ভরে মালাই খাওয়া যাক—কি বলিস?

সে আর বলতে! কালই অর্ডার দিয়ে রেখেছি। খেয়ে দেখিস, কেয়া মজাদার!

আমরা সবাই তোড়জোড় করে সিঁড়ির উপরেই এক একটা চীনেমাটির প্লেট নিয়ে বসে গেলাম।

এমন সময় দেখি মূর্তিমান তারাপ্রসন্ন। আমাদের সমস্ত কার্যকলাপেই এঁর উন্নাসিক ভাব। গেটে ঢুকেই আমায় দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, কি, বিহার শেষ করে আহার চলছে বুঝি। দাঁড়াও, প্রহারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। বড়বাবুকে লুকিয়ে কুলপি খাওয়াটা বাছাধনকে টের পাইয়ে দেব।

তার প্রয়োজন হবে না। নানার অনুমতি নিয়েই খাচ্ছি। অতএব তাঁকে জানানো মানেই ভস-স-স্মে ঘি ঢালা। তা হলেও একবার প্রচেষ্টা করে দেখুন না, কী হয়!

টাট্টু ঘোড়ার মত ঘাড় ঘুরিয়ে তারাবাবু তড়বড় করে উপরে উঠে গেলেন। কুলপিওয়ালা তার ময়লা কাপড়-বাঁধা হাঁড়িটা সযত্নে খুলে এক একটি টিনের চোঙা বের করে আমাদের থালায় কুলপি ঢেলে দেয়। দেখে মনে হল কত না যত্নে এক একটি সাত রাজার ধন মানিক বের করে আমাদের দিয়ে ধন্য করে চলেছে। সবারই পাতে সাদা মালাই, আর আমার বেলায় সবুজ রঙের কুলপি কেন! এর কারণ অনুসন্ধান করায় সন্তোষ বুঝিয়ে দিল—ও যে পেস্তা দেওয়া কড়া কুলপি, খেয়েই দেখ্ না কেমন লাগে!

সন্তোষের মুখে একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠেছিল কিনা সেটা তখন লক্ষ্য করবার অবসর ছিল না।

সে সময় দু আনা করে ছোট আর চার আনায় বড় কুলপি পাওয়া যেত। তিন টাকায় এক একজনের ভাগে বেশ বড় বড় কুলপি চারটে করে নেওয়া হল। মনের আনন্দে খেয়ে গেলাম। দু-এক ফোঁটা সিঁড়ির ওপর পড়তেই দুম্বা সেটা উঠিয়ে চেটে নেবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায়, আমি তাকে বাধা দিয়ে নিরস্ত করি। সন্তোষের পকেটে একটা আধুলি ছিল, সে আরও দুটো আমাকে খাইয়ে দিল। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে উদরসাৎ করে ফেলি।

কুলপিওয়ালা বিদেয় হতেই কিছুক্ষণ পরে আমার মাস্টারও এসে পড়লেন, আমিও তাঁর সঙ্গে পাঠকক্ষে প্রবেশ করলাম। সেদিন ম্যাথমেটিক্সের দিন, অঙ্ক কষা আরম্ভ হল। কিছুক্ষণ পরেই মাথা যেন ঝিমঝিম করতে শুরু করে। মনে হল, ম্যাথমেটিক্স তো নয়—যেন মাথামাটি। আমার ঝিমিয়ে পড়া ভাব দেখে মাস্টার মশাই আমাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, ঘুম পাচ্ছে নাকি ?

হেসে উঠলাম—সে হাসি আর থামতে চায় না। মনে হল কে যেন আমায় উপরে তুলে ধরে আবার ধপাস করে মাটিতে ফেলে দেয়। মাস্টার মশাই তাড়াতাড়ি উঠে রামেন্দ্রসুন্দরকে ডেকে আনতেই নানা অবাক্ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই তাঁর কণ্ঠে যেন বাজ পড়ার শব্দ হল : কী হয়েছে তোমার, ঠিক করে বল ?

মুখ থেকে কোনও কথা বেরোয় না, হেসেই চলেছি।

নানার গলা ফাটানো চিৎকার শুনে দুম্বা উপস্থিত। নানীও ছুটে হাজির হলেন, দরজার অন্তরালে দাঁড়িয়েই সচকিত প্রশ্ন করেন, কী হয়েছে ?

কে উত্তর দেবে কী হয়েছে ?

যাই হোক, নানা এর ওর তার কাছে জিজ্ঞেস করে শেষটা দুম্বাকে পাকড়াও করলেন। মাস্টার মশাই নানাকে বুঝিয়ে দিলেন, নিশ্চয়ই সিদ্ধির কুলপি খাওয়ার ফলে ওর এই অবস্থা !

রামেন্দ্রসুন্দর অবাক্। কুলপি বরফের মধ্যেও যে আবার সিদ্ধি মেশানো থাকে, সেটা তাঁর ধারণার বাইরে।

নানী তাড়াতাড়ি বড় পাথরের বাটিতে তেঁতুল গুলে আমায় খাইয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরেই হড়হড় করে বমি হয়ে গেল। মাথায় জল ঢেলে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন প্রত্যুষে রামেন্দ্রসুন্দর স্বয়ং এসে ঘুম থেকে উঠিয়ে আমায় বললেন, এদিকে শুনে যাও।

ঝটপট উঠে তাঁর সঙ্গে নানীর কাছে গেলাম।

কাল কী কুলপি খেয়েছিলে জান ?

না। কেন যে মাথা ঘুরে উঠল, তাও জানি না।

আমি সব খবর নিয়েছি, জেনেশুনে তুমি সিদ্ধির কুলপি খাও নি ? যাক, আজ থেকে সন্তোষের সঙ্গে আর কক্ষনো মিশবে না, কথাও বলবে না, বুঝলে ?

কাঁদো কাঁদো হয়ে উত্তর দিলাম, ও আমায় নেশা খাইয়েছে, ওর সঙ্গে আমি কথা বলা দূরে থাক্, ওর মুখও দেখব না।

দুম্বা খবর দিল, কাল এদিকে তোমার তো এই অবস্থা, ওদিকে পণ্ডিত মশাই খেতে বসে ঢাকনা খুলেই দেখেন, থালার ওপর কাঁচা মুরগীর মুণ্ডু।

অ্যাঁ, বলিস কি রে ?

তুমি পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করেই দেখ। কাল তিনি গোবর-জলে ঘর নিকিয়ে গোবর খেয়ে বিড়বিড় করে কী সব মন্তর আউড়ে প্রাচিত্তির করেছেন—শেষটায় গোরের ঘরে শুয়ে রাত কাটালেন। কলকাতায় এসে তাঁর নাকি জাত জন্ম সব গেল।

বিদ্যুতের মত মনের মধ্যে খেলে গেল, ও, সন্তোষ কাল এইজন্যেই বুঝি পণ্ডিত মশাইয়ের ঘরে ঢুকেছিল ! আচ্ছা ধুরন্ধর ছেলে যা হোক। সেই যে শাসিয়েছিল, তোকে আর তোর ওই হাড়গিলে পণ্ডিতকে দেখে নেব—এই বুঝি তার সেই প্রতিজ্ঞা পালন ! নানা যে সেদিন সন্তোষকে এতগুলো উপদেশ দিলেন—একটি কথাও কি তার কানে ঢোকে নি ? চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী !

একদিন উপর্যুপরি দুটো ঘটনা ঘটে গেল। সকালে সবেমাত্র মাস্টার মশাই আমাকে পড়িয়ে বিদেয় হয়েছেন, দেখি এক আতরওয়ালা এসে নিবারণ পণ্ডিতের কাছে অনর্গল কী সব বক্তৃতা চালিয়েছে। সামনে আমাকে দেখে, সেই আতর-বিক্রেতা পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি অপূর্ব হিন্দী-বাংলার জগা-খিচুড়ি ভাষায় আমার পরিচয় দিতে শুরু করেছেন।

কাছে আসতেই আতরওয়ালা দীর্ঘ সেলাম দিয়ে বলল, আপ মহারাজকুমার কি সাহেবজাদা হ্যায় ?

রুখে বললাম, কেয়া বোলা ? হারামজাদা ?

পণ্ডিত মশাই বুঝিয়ে দিলেন, সাহেবজাদা বলেছে, তার অর্থ—নবাবপুত্তুরকে ওরা ওই কথা বলেই ডাকে কিনা!

কই, আমি তো নবাবপুত্তুর নই।

ওদিকে আতরওয়ালা তুলোয় আতর মাখিয়ে একটা কাঠিতে বেশ ভাল করে জড়িয়ে আমার হাতে দিল। মুখে তার অনর্গল উর্দু কথার তোড়।

আমাকেও একটা উত্তর দিতে হবে তো! ভাষার ব্যুৎপত্তি নেই, কী করি ? হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলাম, দেরা গাজী খাঁ—দেরা ইস্মাইল খাঁ—

তারপরই সটান অগ্রসর—দশ-বিশ পা এগিয়ে আবার পেছন ফিরেই দেখি, আতরওয়ালার বিরামহীন বক্তৃতা এক নিমেষেই স্তব্ধ। বিস্ময়-বিস্ফারিত সুরমাটানা চোখ দুটি আমার প্রতি নিবদ্ধ। আর দাঁড়ালাম না, সোজা অন্দরে চলে গেলাম।

ঘুরে ফিরে নানার কাছে আসতেই দেখি, আতরওয়ালা রামেন্দ্রসুন্দরের দরবারে হাজির হয়ে আতরের অমোঘ উপকারিতার সম্বন্ধে অবিশ্রান্ত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়েছে।

রামেন্দ্রসুন্দরের কানে তার এই হিতোপদেশ ঢুকছিল কি না বোঝা গেল না। তবে একটি কথা বলতে শুনলাম, নেই মাংতা।

আমি তো জানি, রামেন্দ্রসুন্দর নিজে কখনও সেণ্ট বা আতর ব্যবহার করা দূরে থাক্, বাড়িতেও ওসবের প্রবেশাধিকার ছিল না। আতরওয়ালাকে সান্ত্বনা দিলাম : হিঁয়াপর আনাও যা সাহারা মরুভূমি মে যাকে চিল্লানা একই বাত—বুঝতে পাত্তা হ্যায় ?

রামেন্দ্রসুন্দর নাতির এবম্বিধ হিন্দী ভাষার দখল শুনে হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না। হো হো শব্দে হেসে উঠেই আমার হাতে আতরের তুলো জড়ানো কাঠি দেখতে পেয়ে বললেন, ওটা ফেরত দিয়ে দাও।

আদেশ অনুযায়ী সেটা তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করলাম।

সে বিদায় হতেই আর একজন নবাগতের প্রবেশ। মাথায় বৃহৎ পাগড়ি, চোখে ফাটা কাঁচের চশমা। এসেই হিন্দীভাঙা বাংলায় বললেন, আপনি খুব বিদ্ওয়ান বেক্তি আসেন,আপনার নাম শুনিয়েসি, একবের হাতঠো দেখবো। বগলদাবা ময়লা ন্যাকড়া-জড়ানো পুথি-পত্তর ফরাশে রেখেই নানার হস্তাকর্ষণের উদ্দেশ্যে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করলেন।

রামেন্দ্রসুন্দরের বাক্স খোলাই থাকত। তক্ষুনি একটি টাকা বের করে বললেন, মাফ করবেন, আমি ওসব বিশ্বাস করি না। টাকাটি নিয়ে অব্যাহতি দিন, আমার কথা বলবার সময় নেই।

তখনই সেটা পকেটস্থ করে জ্যোতিষী বললেন, আপনার ভালই হুবে—বলিয়ে দিয়ে যাসসি—শুনিয়ে রাখেন। তেবে আপনার সন্তান স্থানে রিষ্টি আসে।

ললাটে রক্তচন্দন-শোভিত গণৎকারকে বললাম, হাত না দেখেই ভবিষ্যদ্বাণী! ভালই হুবে তো বললেন, আবার ফাঁড়া আছে বলতেও কসুর করলেন না। এইটেই বা কোন্‌দেশী ভাল বুঝলাম না!

তাঁর গম্ভীর মুখমণ্ডল দেখে ভাবলাম, বুঝি মনে মনে তিনি ভৃগুসংহিতা মন্থন করে চলেছেন। ক্ষণকাল পরেই মাথা তুলিয়ে বললেন, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে ? যদি হামাকে দিয়ে কোনও ক্রিয়াকাণ্ড করাইতে পারেন, তা হলে হয়তো কিসুটা ভালে ফল হোইলেও হোইতে পারে।

প্রয়োজন নেই, আপনি এখন আসুন।

বাইরে আসতেই তাঁকে আবার পাকড়াও করলাম : এবার আমার সম্বন্ধে দু-চারটে বোল ছাড়ুন তো, ভবিষ্যৎ একেবারেই ফরসা, না, কিঞ্চিৎ ভরসা আছে ?

বিশেষ কিছু প্রাপ্তিযোগ হল না—তাই তাঁর মন-মেজাজ খারাপ। আমার প্রতি একটি অগ্নিময় দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করেই তিনি পথ দেখলেন। ফিরে এসেই দেখি, নানা বইয়ের পাতা মুড়ে খোলা জানলার ফাঁকে অনেকক্ষণ মেঘলা আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। জ্যোতিষীর কথা তাঁর মনে কোনও আলোড়ন তুলেছিল কি না কে জানে ?

তক্ষুনি অন্দরে গিয়ে নানীকে সব খুলে বলতেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে বাইরে ছুটে এলেন। তখন অবশ্য নানার কাছে কেউ ছিল না। আমিও পশ্চাতে। দেখলাম, নানা তখনও ঠিক ওই অবস্থায় গুম হয়ে বসে আছেন।

উদ্বেগব্যাকুল কণ্ঠে নানী জিজ্ঞেস করেন, কী সব শুনলাম, সত্যি ?

এরই মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে গেছ ? খোকার কাণ্ড

কোন শৈলাবাস থেকে

মিতা,

এত কাণ্ড, এত তোড়জোড়ের পর সত্যিই পৌঁছলাম। উনি যে শেষ পর্য্যন্ত ছুটি পেলেন এই আমার ভাগ্যি। ছুটির এই কটা দিন কি ভাবে কাটাবো তাই নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা করেছি কিন্তু এখানে মন বসছেনা। ১৫ বছর আগে এসেছিলাম তারপর এই, কিন্তু কত বদলে গেছে। আমরা যে নির্জন জায়গাগুলিতে বসে সূর্য্যোদয়, সূর্য্যাস্ত দেখতাম, সারাদিন কাটাতাম, সে সব জায়গাগুলি এখন লোকে লোকারণ্য। অনেক জায়গায় জঙ্গল কেটে ফোয়ারা তৈরী হয়েছে, বেঞ্চ বসানো হয়েছে কিন্তু আগের সে সরল সৌন্দর্য্য আর নেই। এখন রাস্তাঘাট, হোটেল, বাংলো সব লোকে লোকে ছয়লাপ। যাই হোক আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝতেই পারছ। বিনু হীরু ভাল। ওরা কবে মিতা মাসীর কাছে যাবে, ভালমন্দ খাবে তারই দিন গুনছে। কর্ত্তা এখানেও বইয়ে মুখ গুঁজে থাকার চেষ্টা করছেন। চিঠি লিখো।

কমু

কমু,

তোমার কোথায় ব্যাথা লাগছে বুঝতে পারছি। তুমিই সত্যিই রোম্যান্টিক। পরিবর্ত্তনকে মেনে নেওয়াই ভাল। ১৫ বছর আগে আমরা যা দেখেছিলাম আজ তা না থাকাই তো স্বাভাবিক। মানুষের জীবনে এই ১৫ বছরে কত পরিবর্ত্তন এসেছে ভাব তো! বর্ত্তমানের মধ্যেও আনন্দের খোরাক অনেক পাবে যদি মনটাকে খোলা রাখ। তারপর দেখবে ১৫ বছর পরে এই দিনটির কথা কত মনে হবে।

মিতা

মিতা,

তুমি একেবারে মাষ্টারনী। প্রানের দুঃখের কথা তোমায় বললাম কোথায় একটু আহা উহু করবে না সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ। কিন্তু একটা জৈবীক সমস্যার সমাধান করে দাও তো। তোমার মনে আছে এখানে হোটেলে খাবার দাবার কেমন ভাল ছিল। সেই আশাতেই তো আমি রান্নাবান্নার জিনিষ না নিয়ে এলাম—ভাবলাম একটা দিন সত্যিই ছুটি পাব। কিন্তু মাগো! কি অবস্থা হয়েছে। জিনিষপত্রের দাম আগুনের মত। হোটেলের খাবার দাবার যে কি ঘি দিয়ে রাঁধে জানিনা, কিন্তু একেবারে ভাল লাগেনা। খাঁটি ঘি পাওয়া দুস্কর আর পাওয়া গেলেও বড্ড দাম। কিন্তু রান্না আমাকে সুরু করতেই হবে—তানাহলে থাকতে হবে না খেয়ে।

কমু

কমু,

একটা কথা আছে ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। তোমারও সেই অবস্থা। আমি তোমার সঙ্গে একমত। ছুটিতে খাওয়া দাওয়াই যদি না

জমল তাহলে আর হোল কি ? তুমি এক কাজ কর। কিছু মাটির হাঁড়ীকুঁড়ি কিনে নাও আর একটা তোলা উনুন।—র' বাজারে খুব ভাল তরি-তরকারী আর মাছ মাংস পাওয়া যায়। রোজ সকালে বিনু আর হীরুকে নিয়ে নিজে চলে যেও বাজারে। বেশ বেড়ানো হবে, বাজারও হবে। আর রান্নাবান্নার জন্যে ভাল ঘি পাওয়া যাচ্ছেনা বলে মন খারাপ কোরনা। 'ডালডা' কিনো। শীলকরা টিনে 'ডালডা' বনস্পতি সবসময় তাজা পাওয়া যায়। 'ডালডায়' খাঁটি ঘি'র সমপরিমান ভিটামিন 'এ' যোগ করা হয়। এতে আরও যোগ করা হয় ভিটামিন 'ডি'। তাই 'ডালডা' স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও 'ডালডা'র দাম কত কম। তোমার রন্ধনপর্ব্বের ফলাফল জানার জন্যে উৎসুক রইলাম।

মিতা

মিতা,

তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ? হাঁড়ীকুঁড়ির ব্যাপার তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি ভেবেছ আমরা দিনের মধ্যে চারবার শুধু মিষ্টি খেয়ে থাকব ? 'ডালডায়' তো শুধু মিষ্টিই হয় কিন্তু অন্যান্য রান্না ?

কমু

কমু,

'ডালডায়' সব রান্নাই ভাল হয়। গত কয়েক বছর ধরে আমার বাড়ীর সব রান্নাই 'ডালডায়' হচ্ছে। আমাদের মত এরকম লক্ষ লক্ষ বাড়ী আছে যেখানে সব রান্না—শাক, ডাল, চচ্চড়ী, ঘণ্ট, মাছের ঝোল সবই 'ডালডায়' হয়। তেল, ঘি দিয়ে যে সব রান্না হয় তার সবই 'ডালডায়' করা চলে। 'ডালডায়' খাবার দাবার রান্না ভাল হয় কারণ 'ডালডা' খাবারের আসল স্বাদটি ফুটিয়ে তোলে। 'ডালডা' সাধারণ তেলের থেকে ভাল, কারণ এতে যোগ করা হয় ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি'। আমাদের বাড়ীর রান্নার ভুরি ভুরি প্রশংসা তো তুমি নিজের কানেই শুনছ। চেষ্টা করে দেখোনা।

মিতা

মিতা,

এতদিনে মনে হচ্ছে সত্যিই ছুটিতে এসেছি। বেশ কিছুদিন পরে আরাম করে খাওয়া দাওয়া করলাম। রান্নাটা আনন্দের হয়ে উঠেছে। 'ডালডা' সত্যিই সব রান্নার জন্যে ভাল। অনেক ধন্যবাদ।

কমু

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, বোম্বাই

DL. 447B-X52 BG

নন্দিনী

দেবাংশু মুখোপাধ্যায়

আমার মাসীমা আলোকপ্রাপ্তা মহিলা, কিন্তু তাঁর মেজাজের মত হস্তাক্ষরগুলিও ছিল নিত্য পরিবর্তনশীল। প্রায়ই ব্যাঙ্ক থেকে তাঁর চেক ফেরত আসত হাতের লেখার গোলমালে; আর আমাকে ছুটতে হত শ্যামবাজার থেকে সেই বালিগঞ্জে তারই জের মিটোতে। এবারেও জরুরী তলব এসেছে। এ আহ্বান অগ্রাহ্য করলে বিপদ আছে। কারণ, দু-এক দিনের মধ্যেই মার কাছে আসবে মাসীমার কয়েক পাতাজোড়া চিঠি। এবং তার অব্যবহিত ফলস্বরূপ মার কাছ থেকে আমাকে শুনতে হবে সামাজিক মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে একটি আবেগপূর্ণ বক্তৃতা—যার অবশ্যম্ভাবী উপসংহার হবে মার সাশ্রুনয়নে কাশীবাসের সংকল্প ঘোষণা। অতএব সেই দিনই আপিস-ফেরত মাসীমার বাড়ি যেতে হল। মাসীমা সেকালের বি. এ. পাস, ডিগ্রির গর্ব তাঁর বেশ কয়েক ডিগ্রি। চেক ফেরত দিয়ে ব্যাঙ্কের মুখ্যু অপদার্থ লোকগুলো যে তাঁকে অপমান করেছে তারই সরোষ অভিযোগ শুনতে হল কিছুক্ষণ। ব্যাঙ্ক বলেই বোধ হয় আলোচনার বিষয়টাকে সহজে ভিন্নমুখী করা গেল না। সেই সূত্রেই মিস্টার চৌধুরীর কথাটা এল। মাসীমার সামাজিক-চেতনা সচকিত হয়ে উঠল। ব্যগ্র হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে মিস্টার চৌধুরী, আমাদের চেনা কেউ ?

আমি বললাম, খুব সম্ভব নয়। তবে তাঁর মেয়ে মিস অনিন্দিতা চৌধুরীর নাম হয়তো শুনে থাকবে—পরে অনিন্দিতা রায় হয়েছিলেন। তোমাদের সময়ে অনিন্দিতার রূপের হিংসে করত না এমন মেয়ে একজনও ছিল কিনা সন্দেহ।

মনের মতন একটা আলোচনার বিষয় পেয়ে মাসীমা বেশ উৎসুক ভাবেই বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব শুনেছি। অনিন্দিতা রায়—যার স্বামী মোটর চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল।

আমি বললাম, চাপা পড়েছিলেন এবং মারাও গিয়েছিলেন সত্যি, তবে নিজেরই গাড়ির তলায় আর চালক ছিলেন তিনি নিজেই। পোস্ট-মর্টেমের পর তাঁর পেটের ভেতর খাবার কিছু পাওয়া যায় নি, পাওয়া গিয়েছিল গ্যালন খানেক মদ।

গল্প বলা এবং গল্প শোনা এ দুটো গুণের একত্র সমাবেশ একই বক্তির মধ্যে কদাচিৎ ঘটে থাকে—মাসীমা ছিলেন সেই ব্যতিক্রমেরই একজন। পিঠের পেছন দিকে একটা নরম বালিশ গুঁজে দিয়ে সোফার এক কোণে বেশ আরাম করে বসে নিয়ে মাসীমা বললেন, তারপর কী হল বল্। সিগারেট টিগারেট খাবি তো খেয়ে নে এই বেলা কথার মাঝখানে ফোঁস ফোঁস করে সিগারেট খাওয়া আমি দেখতে পারি না বাপু।

দুই

মিসেস অনিন্দিতা রায়ের বাবা রাজকুমার চৌধুরী ছিলেন সেকালের একজন নামকরা ব্যারিস্টার। তবে তাঁর নামটা হাইকোর্টের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে বাইরে আসতে পারে নি, তার কারণ তিনি জজিয়তি আর রাজনীতি দুটোকেই সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে এক মনে টাকাই রোজগার করে গিয়েছিলেন। ব্যবহারিক জীবনের বাইরে যাঁরা তাঁকে জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরা মিঃ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত শ্রীজ্ঞান আর সূক্ষ্ম রসবোধের অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন একজন সুন্দরী কলাবতী ফরাসী মহিলাকে। শুনেছি ভালবাসাটা ফরাসীদেশের কাছে নাকি একটা ফাইন-আর্ট আর বাঙালি তো জয়দেব চণ্ডীদাসের উত্তর-সাধক। এই থেকে চৌধুরীদের দাম্পত্য-জীবন কেমন ছিল অনুমান করে নিতে পার। একটু বেশী বয়সেই তাঁদের একটি মেয়ে হল, মেয়ে নয় তো যেন এক মুঠো জুঁই ফুল। বাপ-মায়ের সবটুকু ভাল নিয়েই এল সে মেয়ে। নবজাতাকে ঘিরে চৌধুরীদের নূতন জীবন শুরু হল। ভারতীয় আর ফরাসী কৃষ্টির সমুদ্রমন্থনের সুধাটুকু সিঞ্চন করে মেয়েকে তাঁরা মানুষ করে তুলতে লাগলেন।

নাম রাখলেন অনিন্দিতা। মেয়ে বড় হল। রূপে গুণে মিস চৌধুরী তখনকার অভিজাত সমাজে, চাঞ্চল্য বললে ভুল হবে, রীতিমত আলোড়ন জাগিয়েছিলেন। দিশি বিয়ের বয়স বিলিতিকেও পেরিয়ে যাবার উপক্রম। মা বাবা চিন্তিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু মেয়ের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নিজের চারিদিকে একটা প্রকট ঔদাসীন্যের গণ্ডি টেনে সে বাইরের সব কিছু উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষা করত; অসুন্দরের প্রতি ছিল তার ক্ষমাহীন অসহিষ্ণুতা। মিঃ চৌধুরী স্থির করলেন মেয়েকে বিলেত নিয়ে যাবেন, সেখানকার নূতন আবহাওয়ায় যদি তার মনের গতি ফেরে। কিন্তু তার আগেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল। ডাক্তার আর মিসেস চৌধুরী এক রকম জোর করেই তাঁকে অবসর নিতে বাধ্য করলেন। মক্কেলের সঙ্গে সঙ্গে মোটা অঙ্কের চেকগুলো আসাও বন্ধ হল। সঞ্চয় যা করেছিলেন তাতে তোমার আমার মত লোকের বড়মানুষি করেই চলে যেত, কিন্তু মিঃ চৌধুরীদের চলে না। তা ছাড়া বাড়িতে বসে থাকলে শরীর আরও খারাপ হয়। ব্যবসায়ে নামলেন মিঃ চৌধুরী। বেঙ্গল সিকিউরিটি ব্যাঙ্কের তখন শৈশবাবস্থা, তারই ডাইরেক্টর-বোর্ডের চেয়ারম্যান হলেন তিনি। বেশ কিছু টাকাও ঢাললেন। গোড়ার দিকে ব্যাঙ্ক খুব ফেঁপে উঠল, কাজের চাপ বাড়ল। মিঃ চৌধুরী আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। নূতন ম্যানেজার এল। ক্রমে তাঁরই হাতে সব কাজের ভার ছেড়ে দিয়ে সরে আসতে বাধ্য হলেন মিঃ চৌধুরী। নিজে না দেখলে যা হয়, অবশেষে ব্যাঙ্ক ফেল হল। অনেকেই সর্বস্বান্ত হল, কেবল ম্যানেজার ছাড়া। যথাসর্বস্ব দিয়েও নিষ্কৃতি পেলেন না মিঃ চৌধুরী, মাথার ওপর ঝুলতে লাগল বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে কারাদণ্ডের খড়্গ। রোগজীর্ণ শরীরে উদ্বেগে আর দুশ্চিন্তায় মিঃ চৌধুরী পাগলের মত হয়ে গেলেন। এই পরিণত বয়সে শেষে কিনা জেলে যেতে হবে! স্ত্রী, কন্যা এদের কী হবে! সমাজে তারা মুখ দেখাবে কেমন করে! ঠিক এই অবস্থায় উদয় হলেন কুখ্যাত মিঃ রায়। চেহারা আর চরিত্র তার যতটা কুৎসিত, ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সটা সেই অনুপাতেই বিপুল। জমিদারীর সঙ্গে লোহার কারবার, ভোগলিপ্সার সঙ্গে ব্যবসা-বুদ্ধি। লক্ষ্মীর ভোগ নিরামিষ হলেও তাঁর বাহনগুলি হলেন মাংসাশী। কাঞ্চনকৌলীন্য তখনও আভিজাত্যের মাপকাঠি হয়ে ওঠে নি, তাই আমল না পেয়ে সমাজের আশপাশেই ঘুরে বেড়াত মিঃ রায়। এখন ঝোপ বুঝে কোপ দিল। কারবারী লোক, বিশেষ ভণিতা না করেই নিজের বক্তব্য পেশ করল মিঃ রায়। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যা কিছু গণ্ডগোল সবই সে চুকিয়ে দেবে কলমের এক আঁচড়ে, বিনিময়ে চাই মিস চৌধুরীর পাণি-পীড়নের অধিকার। জীবনে সেই বোধ হয় প্রথম মিঃ চৌধুরীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। বেয়ারাকে ডেকে তিনি রায়কে বাইরের দরজা দেখিয়ে দিতে হুকুম দিলেন। সেই সময়ে মেয়ে এসে দাঁড়াল দুজনের মাঝখানে। বাপের মুখের ওপর অচঞ্চল দুটি চোখ রেখে স্পষ্ট গলায় মিস চৌধুরী বলল, তুমি কেন উত্তেজিত হচ্ছ বাবা, আমি মিঃ রায়কেই বিয়ে করব বলে মনস্থির করেছি। মিঃ চৌধুরী প্রতিবাদ করে বলেন, না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না। তার চেয়ে বরং আমি জেলেই যাব। মেয়ের উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান মিঃ চৌধুরী: তবুও আমার সংকল্প টলবে না বাবা, কেবল একটার জায়গায় দুটো অঘটন ঘটবে। মেয়েকে চেনেন মিঃ চৌধুরী, দু হাতে তাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে তিনি বললেন, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে এ তুই কী করলি মা? বাবার বুকে মুখ গুঁজে অনিন্দিতা বলে, ঠিকই করেছি বাবা।

মেয়ের বিয়ের কিছুদিন পরেই মিঃ চৌধুরী স্ত্রীকে নিয়ে এ দেশ ছেড়ে ফ্রান্সে চলে গেলেন। তার পরের তিনটে বছর মিসেস রায়ের জীবনে আক্রমণ আর প্রতিরোধের একটানা কাহিনী। মিঃ রায় পাকা ব্যবসাদার, টাকায় ষোল আনা কেমন করে আদায় করতে হয়, জানে। এতগুলো টাকা জলে ফেলে দেবার পাত্র সে নয়। তিন বছর ধরে অবিশ্রাম যুদ্ধ করে মিসেস রায়ের শক্তিও বোধ হয় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল। অবশেষে যে দেহটাকে রায় তার বিছানায় পেল সেটা আগেকার মিস চৌধুরীর প্রেতাত্মা। প্রকৃতি হল নির্বিচার নিয়মপালক—একটি মেয়ে হল মিসেস রায়ের। পূর্ণগর্ভার স্বাভাবিক প্রসববেদনার পর নয়, মাতাল স্বামীর বুটের ঘায়ে অকালে।

জ্ঞান ফিরে আসার পর যখন বিলিতি নার্স তোয়ালে-মোড়া শব্দায়মান একটা কদাকার মাংসপিণ্ডকে তাঁর পাশে শুইয়ে দিতে এল, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মিসেস রায় শুধু

বলেছিলেন take it away! কয়েকটা মুহূর্ত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকে নার্স সেই তোয়ালের পুলিন্দাটা সরিয়ে নিয়ে যায়। সে দৃষ্টির মর্ম বোঝেন মিসেস রায়। কিন্তু তাঁর মনের কথা কতটুকুই বা জানে ওই নার্স। এ সন্তান তাঁর বিবাহিত প্রেমের পরম পরিণতি তো নয়—একটা পশুর চরিতার্থ লালসার বিষ-ফল। শিশুর সর্বাঙ্গে স্বামীর কদর্যতাই শুধু নয়, তার শিরায় শিরায় যে তারই পাপের রক্ত। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকেন মিসেস রায়, সত্যিই কি নিষ্ঠুর তিনি? মায়ের স্নেহ তো স্বতঃস্ফূর্ত, সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই শতধারে এসে হৃদয়কে ভরিয়ে দেয়। কিন্তু কোথায় তাঁর সেই মাতৃস্নেহ! অন্তরের নিভৃততম কোণটিতেও খুঁজে দেখলেন তিনি—স্নেহ প্রেম মায়া মমতার লেশমাত্র কোথাও নেই। স্বামীর জঘন্য প্রবৃত্তি, বিবেকহীন নিষ্ঠুরতার তিক্ত অভিজ্ঞতায় তাঁর মন থেকে কোমলতার শেষ বিন্দুটিও নিঃশেষ হয়ে গিয়ে পড়ে আছে কেবল ঘৃণা আর ঘৃণা। বাবাকে তিনি চরম অবমাননা থেকে বাঁচাতে পেরেছেন দুঃখের দিনে এই ছিল তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা।

নার্সিং হোম থেকে মিসেস রায় এইটুকু নিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে এলেন যে, এখন অন্তত: কিছুদিন স্বামী তাঁর শোবার ঘরে হানা দেবে না—পশুদের প্রবৃত্তিতেও বাধে সেটা। সেখানকারই একজন কমবয়েসী বাঙালী নার্স মেয়ের নামকরণ করে দিল—মিনতি। আর একটা অপ্রীতিকর কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে মিসেস রায় তাকে মনে মনে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। দেহের আশ্রয়চ্যুত করার পর থেকে মেয়েকে আর স্পর্শ করেন নি মিসেস রায়। সে নির্বাসিত হল নার্স-আয়াদের এলাকায়। মিনতি নাম ছোট হয়ে দাঁড়াল মিনি। মেয়ে হওয়ার ব্যাপারটাতে তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া মিঃ রায় মাত্র একটি শব্দেই প্রকাশ করলেন, nuisance, উড়ো আপদ একটা। বাড়িতে আপাততঃ কোন আকর্ষণ নেই, কাজেই নতুন উত্তেজনার সন্ধানে মিঃ রায় এখন বেশীর ভাগ সময় বাইরে বাইরেই কাটাতে লাগলেন। মদের মাত্রাটাও বেড়ে গেল। এই সময়েই হঠাৎ একদিন মিঃ রায় তাঁর জীবনের প্রথম এবং শেষ মহৎ কর্মটি সম্পন্ন করলেন—মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তিনি।

তিন

অকালবৈধব্য যে মিসেস রায়কে কত বড় মুক্তি এনে দিল সে কথার উল্লেখ করলে তোমার নাকের ডগা কুঁচকে উঠবে তা জানি। কিন্তু একে মুক্তি না বলে বলা উচিত অব্যাহতি। ঘর-ভরা বিষ-বাষ্পের বেরিয়ে যাবার খোলা জানলা। মিঃ রায় মারা যাবার পর মিসেস রায়ের দৈহিক রূপান্তরটা সত্যই দর্শনীয়। আগেকার রূপ যেন ফিরে পেলেন তিনি। তবে এ রূপ আরও পরিণত, আরও গভীর। রৌদ্রের দাহ গিয়ে এসেছে জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধতা।

একটা ভদ্র রকমের সময় পেরিয়ে যাবার পরই মিসেস রায় সমাজের সঙ্গে ছিঁড়ে-যাওয়া যোগসূত্রটা আবার হাতে তুলে নিলেন। ড্রইংরুমে টেলিফোনের ঝন্‌ঝনানি, ড্রাইভের বুকে নিরুপদ্রবে থিতিয়ে-থাকা ধুলো মোটরের যাতায়াতে মুহুর্মুহু চঞ্চল। মেয়ে থাকে সেই বাড়িরই একান্তে নার্স-আয়াদের হেফাজতে। মায়ের সমালোচনার ছিটেফোঁটা সব সময়েই তার কানে যায়। শিশু-মন বোঝে না বিশেষ কিছুই, শুধু এইটুকু বোঝে যে সে কালো, দেখতে খারাপ, তাই তার সুন্দর মা তাকে কোলে নেয় না। তাদের শাসনে বারণে ছোট্ট মানুষটি এক একদিন বিদ্রোহ করে বসে—তোমরা ভাল নও, আমি সুন্দর মায়ের কাছে যাব। কান্না থামে না কিছুতেই।

নিষেধ থাকা সত্ত্বেও বিব্রত নার্স বাধ্য হয়ে নিয়ে যায় মিসেস রায়ের কামরায়। জলভরা চোখে হাসি ফুটিয়ে মিনি ছোট ছোট দুটি হাত বাড়িয়ে মায়ের কোলে যেতে চায়। কালো কুৎসিত মেয়েটাকে দেখে একটা উদগ্র ঘৃণায় মিসেস রায়ের সারা শরীরে যেন যন্ত্রণা হতে থাকে।

নার্সকে তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন। ভয় পেয়ে নার্সের বুকে মুখ লুকোয় মিনি—চাপা কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে তার ছোট বুকখানি। মায়ের বিরূপতা আবার দুদিনেই ভুলে যায় সে। কোন্ ফাঁকে চুপিচুপি পালিয়ে এসে মায়ের চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়ায়, হাসে মুখের দিকে চেয়ে—কুশ্রী মুখের মাড়ি বার করা হাসি। রাগে বিতৃষ্ণায় মিসেস রায়ের মাথায় আগুন জলে ওঠে। মেয়ের দুর্ভোগটা জোটে চাকরদের কপালে। প্রায় জোর করেই তারা মিনিকে সেখান থেকে টেনে নিয়ে যায়। দূর থেকে

মিসেস রায়ের কানে ভেসে আসে শিশুকণ্ঠের ভাষাহীন প্রতিবাদ।

মিসেস রায়ের জীবনে আক্রমণ আর প্রতিরোধের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। অনাদরে আর অবহেলায় যতই তিনি মেয়েকে দূরে সরিয়ে দিতে চান মেয়ে ততই চায় তাঁকে কাছে টানতে। স্বামীর সম্পর্কে আর যাই হোক মনের বালাই ছিল না কিন্তু এ মেয়ের লক্ষ্য হল তাঁর মনের এমনই একটি জায়গায় যেটার অস্তিত্ব আজ অবধি তাঁর নিজেরই জানা ছিল না।

মিনির চারদিকে এখন কড়া পাহারা, কাছে সে আসতে পায় না। কিন্তু তার কচি গলায় গাওয়া আবোল-তাবোল গানের সুর পার্টি-ক্লান্ত মিসেস রায়ের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটায় প্রায়ই। কখনও বা বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দেবার হুকুম করেন; কিন্তু বাইরে সে সুর থেমে গেলেও মনের ভিতরে থেকে যায়—কতদিনের চেনা সুর যেন।

কোনদিন হয়তো বাগানে বেড়াচ্ছেন। দোতলার জানলা থেকে মিষ্টি গলার ছোট্ট ডাক আসে—মাম্মী। একটা অজানা অনুভূতিতে মিসেস রায়ের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। অবাঞ্ছিত, কিন্তু বড় মধুর এ বেদনা। মেয়ের দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস হয় না তাঁর। পাছে এই নতুন-পাওয়া মাধুর্যটুকু হারিয়ে যায়।

এমনই করেই কথা গান হাসি কান্নার টুকরোগুলো মালায় গেঁথে মিনি যে তাঁকে তাঁর নিজের হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলাটাই ফিরিয়ে দিচ্ছে এটা ক্রমশঃ বুঝতে পারলেন মিসেস রায়।...যদি সুন্দর হত মিনি—তার দেহের প্রতিটি রেখা স্বামীকে যদি মনে না করিয়ে দিত! দুটি বিপরীত ভাবের অবিরত সংঘাতে সমস্ত অন্তরটা তাঁর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যেতে থাকে, কিন্তু এমন একজনও বন্ধু নেই যার কাছে মনের ভার খানিকটা হালকা করতে পারেন। বহুদিন পরে মিসেস রায়ের মনে পড়ল ডাক্তার রুদ্রের কথা। সে কি এখনও তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে?...

না না, নাক সিঁটকিয়ো না মাসীমা, তুমি যা ভাবছ সেটা ঘটবার সুযোগ হয় নি। আর হলেই বা ক্ষতিটা কী। মিসেস রায়েরা যে সমাজের মানুষ সেখানে বিধবা-বিবাহ দোষের নয়, হামেশাই হচ্ছে। ও চিন্তাটা মিসেস রায়ের মনে এসেছিল তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থার একটা অভিব্যক্তি হিসেবেই।

চার

এই ভাবেই আরও কটা বছর কেটে যায়। মিনি এখন ফ্রক ছেড়ে স্কার্ট পরে; দৈবাৎ এক-আধ দিন শাড়িও। নার্স গিয়ে এসেছে গভর্ণেস। মায়ের বিরূপ মনোভাব এখন সে স্পষ্টই বুঝতে পারে। মিসেস রায়কে আর চেষ্টা করে মেয়েকে দূরে রাখতে হয় না, সে আপনিই দূরে থাকে মায়ের সব সংস্পর্শ বাঁচিয়ে। স্কুলে মেয়েরা আড়ালে ঠাট্টা করে বলে, 'ব্ল্যাকি'। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে মিনি চুপ করেই শুনে যায়। কালো কুৎসিত বলে নিজের মায়ের কাছেই যার আদর নেই, তখন এদের আর দোষ কী! জীবনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সন্ধিক্ষণে তার নিত্য নূতন অনুভব, নব নব রূপের স্বপ্নাবেশ মলিন হয়ে যায় মায়ের উপর দুর্বার অভিমানের কালিমায়। পড়াশোনা, ছবি আঁকা, কখনও বা নিজের মনে গাওয়া—এই নিয়েই মিনি নিজের একটি আলাদা জগৎ রচনা করে নিয়েছে। আপনার খেয়াল-খুশীতে সেইখানেই তার দিন কাটে। মা আর মেয়ের দেখা হয় শুধু খাবার-টেবিলে। কথাবার্তা হয় সামান্যই। স্বল্পতম বর্ণের দু একটি শব্দে মায়ের কথার জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে মিনি উঠে আসে। মেয়ের এই উদাসীন উপেক্ষা মাঝে মাঝে অসহ্য লাগে মিসেস রায়ের; আহত অভিমান রাগ হয়ে ফুটে বেরয়। কথায় একটু শ্লেষ মিশিয়ে মেয়েকে তিনি বলেন, লেখাপড়ায় ভাল করাটাই শিক্ষার শেষ কথা নয় মিনি। সেই সঙ্গে ভদ্রতা, সামাজিকতাও শেখা দরকার। সে সব তো তোমার কিছুই হয় নি দেখছি। মায়ের এই অকারণ তিরস্কারে মিনি বিচলিত হয় না, আশ্চর্যই হয়। শান্ত গলায় সে জবাব দেয়, না জেনে কোন দোষ যদি করে ফেলে থাকি তুমি আমায় দেখিয়ে দিয়ো মা, আমি নিশ্চয় শুধরে নেব। স্পষ্টই হতাশ হন মিসেস রায়। আঘাতের বদলে যেখানে প্রত্যাঘাত নেই, সামান্য প্রতিবাদও নেই, সেখানে মানুষ কী করতে পারে। অনাদরে অবহেলায় মেয়ের যে মনটাকে তিনি পিষে মেরেছেন, আজ কেমন করে তাকে জাগাবেন, আকুল হয়ে সেইটেই ভাবতে থাকেন মিসেস রায়।

যুনিভার্সিটির প্রথম পরীক্ষার ফল আশাতীত রকম ভাল হল মিনির। স্কলারসিপ ছাড়াও বিশেষ পুরস্কার পেল দুটি বিভাগে। মিসেস রায় এ খবর পেলেন সংবাদপত্রের পাতায়; মিনি নিজে এসে দিয়ে গেল না। তাঁর সমস্ত আনন্দই যেন ম্লান হয়ে গেল একটা তীব্র আশাভঙ্গের বেদনায়। একবার ভাবলেন নিজেই যাবেন মেয়ের কাছে, কিন্তু মর্মান্তিক লজ্জার খাতিরে যেতে পারলেন না, অপরাধবোধের লজ্জা। মেয়ের শ্রীহীন বাইরেটা দেখেই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, একবার ভেবে দেখেন নি যে, স্বামীর দেহের এই বীজকণা প্রাণরস পেয়েছিল তাঁরই মাতৃকোষে। ইচ্ছা হল কোথাও গিয়ে লুকিয়ে রাখেন নিজেকে। কিন্তু যেতেও যে মন চায় না।

সেদিনও খাবার টেবিলে যথারীতি নিজের জায়গাটিতে এসে বসল মিনি—মুখে তার ভাবের কোন চিহ্ন নেই। মেয়েকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অনেক কিছু ভাল ভাল কথা ভেবে এসেছিলেন মিসেস রায়, কিন্তু তার মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে গেলেন। চুপ করে থাকাটাও অস্বস্তিকর, বেশ চেষ্টা করেই মিসেস রায় বললেন, তোমার পরীক্ষার ফল দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি মিনি, তুমি কী নেবে বল? একটু অবাক হয়েই যেন মায়ের মুখের দিকে একবার চেয়ে মিনি উত্তর দেয়, আমার তো এখন কিছু দরকার নেই মা, দরকার হলে তোমাকে জানাব।

ধৈর্যহারা হয়ে মিসেস রায় বলেন, না না, সে দরকারের কথা বলছি না আমি। সাধ করেও কি কিছু পেতে ইচ্ছে হয় না তোমার? তোমার বয়সের মেয়েরা তো শখ করে কত কী চায়।

মায়ের রাগটা গায়ে না মেখে মিনি সহজভাবেই জবাব দেয়, আমার যা আছে তাতেই বেশ চলে যায়। তার বেশী আর কিছুই চাই না আমি। মিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মেয়ের এই অনায়াস প্রত্যাখ্যানে একটা হিংস্র রাগে মিসেস রায়ের সংযমের সব বাধাই ভেসে গেল। তাঁর ইচ্ছা হল, কঠিন আঘাত দিয়ে মিনির এই নির্লিপ্ততাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে। প্রায় চিৎকার করেই তিনি বলে উঠলেন, কেন, আমার কাছ থেকে কিছু নিলে কি তোমার সম্মানের হানি হবে? আমাকে এভাবে অবজ্ঞা করবার সাহস তোমার কোথা থেকে আসে বল তো?

মিনি তেমনই শান্ত গলায় উত্তর দেয়, কেন তুমি রাগ করছ জানি না। আমার যা কিছু সবই তোমার দেওয়া। এ নিয়ে আগে তো সম্মানের কোন কথাই ওঠে নি। তোমাকে অবজ্ঞাই বা করলাম কী করে তাও ভেবে পাই না। মনে করে দেখ তো, আজ অবধি কাছে ডেকে আমাকে একটি কথাও বলেছ কি?

মিসেস রায়ের মনের আগুন এখনও নেভে নি। নিষ্ঠুর কঠিন গলায় তিনি বললেন, আমি না ডাকলে বুঝি তোমার যেতে নেই, এত অহংকার তোমার কিসের?

অহংকার? মিনির মুখে একটা করুণ বিষণ্ণতা ফুটে উঠল। রুদ্ধ অভিমানের উদ্গত অশ্রু গোপন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, অহংকার নয়। আমি জানি কুশ্রী কিছুই তুমি সহ্য করতে পার না। নিজের এই রূপ নিয়ে তাই তোমার কাছে দাঁড়াতে আমার লজ্জা করে। তুমি কি জান, স্কুলে সবাই আমায় বলত 'ব্ল্যাকি'? আজ আমি পরীক্ষায় ভাল ফল করেছি, তাই তুমি দয়া করে কিছু দিতে চাইছ···আদর করে মিনি বলে ডাকছ! কাল তোমার মন বদলে যাবে—তার চেয়ে যেমন 'ব্ল্যাকি' আছি তাই ভাল।

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে ছুটে চলে গেল মিনি। হঠাৎ যেন চেতনা ফিরে পেলেন মিসেস রায়। সর্বনাশা রাগে এ কী করলেন তিনি। ভালবেসে কাছে টানতে এসে নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে মেয়েকে আরও বুঝি দূরে ঠেলে দিলেন। কত বড় অভিমানে যে মিনি তাঁর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকত সেটা আজ দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে গেল। ক্ষোভে অনুতাপে অন্তরটা তাঁর পুড়ে যেতে থাকে। একটা দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে গেল মিনির ছোট ঘরটিতে। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কাঁদছে মিনি। ছুটে গিয়ে মেয়ের মাথাটি কোলে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন মিসেস রায়। বুকভরা যে ভালবাসা আজ পর্যন্ত তিনি কাকেও দিতে পারেন নি, তা-ই তাঁর দু চোখের পথ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল মিনির মাথায়।

প্রত্যয়

নিখিল সরকার

সমস্ত গ্রামটা যেন হুড়মুড় করে বানের জলের মত ভেঙে পড়েছে। আজব ব্যাপার। ছেলেবুড়ো সবাই ছুটছে। সবার মুখে হৈ হৈ চেঁচামেচি। এই সাত সকালেই যেন একটা মেলা বসে গেছে। কেউ কোনদিন ভাবে নি যে এমনটাও হবে এ গাঁয়ে। অথচ আজ তাই হতে চলেছে। প্রবীণদের মুখেও খুশি-বিস্ময়ের যুগপৎ সংমিশ্রণ। অধরপ্রান্তে ঈষৎ হাসির স্ফুরণ। ঘুমন্ত গ্রামটার বুক চিরে একটা তীব্র যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ ঠেলে উঠেছে। শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে-পড়া হিংস্র আরণ্যক শ্বাপদের মত ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সড়কটাকে ক্ষতবিক্ষত করে এগিয়ে চলেছে এক সারি যন্ত্র-দানব। একটা একটানা গোঙানি ভোরের বাতাসকে করে তুলেছে বিষাক্ত। ছন্দে চলা গ্রামটার ছন্দ আজ কেমন যেন গেছে থেমে। এক দঙ্গল কৃষ্ণবর্ণ ছেলেমেয়ে পিছন পিছন চলছে। তাদের চোখে-মুখে সাত রাজ্যের বিস্ময়। তাদের সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে, এত বড় বড় যন্তরগুলোকে কেমন করে অবলীলায় এক একটা মানুষ টেনে নিয়ে চলেছে। ড্রাইভারদের চোখে-মুখেও একটা তৃপ্তির গর্ববোধ ফুটে ওঠে। তারা যেন এদের সারল্যের মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাব দেখতে পেয়েছে।

যে যেমন এসেছিল, শব্দ শুনে সবাই সেভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে রইল। ঘুম থেকে উঠেই আজ যেন তারা এক অনাবিষ্কৃত আনন্দ-রহস্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়ে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

বলাইও এমনই একটা বিকট শব্দে চমকে উঠেছিল। হাঁটুর উপর পর্যন্ত কাপড়টার সীমান্তরেখা। মাথায় গামছাটা জড়ানো। কাঁধে একটা কোদাল ও ঝুড়ি। পায়ে ময়লা। শিশির-ভেজা দুর্বার উপর দিয়ে মনের আনন্দেই একটা গ্রাম্য গান গেয়ে পথ চলছিল। সবেমাত্র সূর্য উঠছে। রোদটা বেশ মিঠে লাগছিল তার কাছে। একটা স্নিগ্ধ হাওয়ার স্পর্শসুখ প্রাণভরে অনুভব করছিল। শরীরটা দুর্বল। বুকটা মাঝে মাঝে ধকধক করে ওঠে। অনেকদিন ধরে একটা কঠিন ব্যামোয় ভুগেছিল। এতদিন ঘর থেকে বেরুতে পারে নি। আজ এই প্রথম বেরিয়ে একটা প্রকাশহীন সুখ অনুভব করছিল। চণ্ডীতলাটাও কখন পিছনে পড়ে গেছে। এই সাত-সকালেই এক ভরপেট খেয়ে নিয়েছে। আবার তো ফিরবে সেই সন্ধ্যে সাতটা-আটটায়। আজ আবার ফিরতে একটু দেরি হতে পারে। আসবার সময় বউ বলে দিয়েছে, ফেরবার পথে একবার রামপীরের হাট হয়ে আসতে। কী একটা ব্রত করেছে। তার কঠিন অসুখের সময় বউ মানত করেছিল। কিন্তু চিন্তাটা ঝুপ করে কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সকালের হাওয়াটা অকস্মাৎ কেন যেন বিষাদময় ঠেকল তার কাছে। একটা একটানা বিকট শব্দ ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে দূর দিগন্তে। ভয়ে এই সকালেই পাখিদের কলকাকলি স্তব্ধ হয়ে গেছে। অকস্মাৎ এতক্ষণের মৃদু হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা গুমোট ভাব। শব্দটা ক্রমেই এগিয়ে আসছে। বাঁশঝাড়টা পেরুলেই ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের সড়ক। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই একটা ছেলে তার গা ঘেঁষে দৌড়ে চলে গেল। গাঁয়ে যেন একটা উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে।

পিছনে তাকিয়ে দেখল মোড়ল খুড়োও এদিকেই এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে জিজ্ঞেস করল, সব অমন করে দৌড়চ্ছে কেন খুড়ো? বলাইয়ের এ রকম একটা আচমকা প্রশ্নে গতি একটু মন্দীভূত করে মোড়ল। তারপর মৃদু হেসে বলে, জানিস না বুঝি, এ গাঁয়ে যে কারখানা বসবে রে। বড় বড় সব যন্তরপাতি আসবে। শহর হবে। কিচ্ছু খবর রাখিস না তুই। তারপর একটু চুপ করে থেকে অনুতাপের ভঙ্গিতে আবার বলে, ও, আমারই ভুল হয়ে গেছে। তুই আর খবর রাখবি কোত্থেকে। তুই যে ব্যামোয় ঘরে পড়ে ছিলি। বউটার তখন কী কান্না।—বলেই মোড়ল আবার পায়ের গতি বাড়ায়।

এমন শুনেও বলাইয়ের মুখ হাসিতে প্রসন্ন হয়ে উঠল

না, চরণের গতি ক্ষিপ্র হল না। মনে হল, তার পা যেন আগের থেকে আরও ভারী হয়ে গেছে। আর চলতে পারছে না। সত্যিই তো, সে কিছু খবর রাখে না। অনেক দিন অসুখে ভুগেছে। এর মধ্যে কত কী হয়ে গেছে। গাঁয়ের মানুষ কারখানার কথা, শহরের কথা বলতে শিখেছে। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে এ ক মাসের মধ্যে। সেই-ই শুধু এ সব থেকে দূরে সরে আছে।

ধীর পায়ে আবার বাঁশঝাড়ের সঙ্কীর্ণ পথটা দিয়ে সড়কের দিকে এগিয়ে চলে। গানের কলিটা এবার আর কিছুতেই আসছে না। মোড়লখুড়ো আজ তাকে এসব কী নতুন কথা শোনাল! এ গাঁয়েও কারখানা বসবে, শহর হবে শেষ পর্যন্ত! কারখানা-কেন্দ্রিক শহরের রূপ তো সে দেখেছে। কিছুতেই সে রূপ তার মন থেকে মুছে যাবে না। রহমতের কথা মনে পড়ে। রহমতের বিবির কথাও মন থেকে বাদ যায় না। বলাই একদা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিল শহরে। চেয়েছিল ওখানে গিয়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে, আর কোনদিন গ্রামে ফিরবে না। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রামের সহজ ধাতুতে গড়া মানুষটি এর সত্য রূপ দেখতে পেয়ে শঙ্কিত হয়েছিল। সেখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল রহমতের। এক সঙ্গে কাজ করে। অনেকদিন ধরে সে এখানে কাজ করছে। হপ্তাও পায় সে বলাইয়ের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু তবু বলাইয়ের অন্তর ওর দুঃখে অভিভূত হত। রহমতের বিবিকে দেখে বলাইয়ের মনে হত, একটা নির্মম অত্যাচারের যূপকাষ্ঠে যেন সে একটা বলি-অর্ঘ্য। হপ্তা পেয়েই রহমত চলে যেত ভাটিখানায়। সেখানে আরও অনেকে এসে জুটত। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে জায়গা একটা নরককুণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে যেত। আর তার অদূরেই আধো-অন্ধকারে সেই ছোট্ট খুপরিগুলির মোহময় আকর্ষণ। কত কথার ঠমক। হাসি-মসকরার নিরাবরণ মদির প্রকাশ। সারা সপ্তাহের রক্ত-জল-করা উপার্জন সুরা ও পণ্যা নারীর পিছনে অচিরেই উবে যেত। রাতের বাতাসে বিষাক্ত নিঃশ্বাস। অনেকদিন রহমতকে এখানে আসতে বারণ করেছে সে। সকাল হলেই রহমত আবার অন্য মানুষ। আবার তার সেই সাংসারিক দুঃখকষ্টের দিনানুদৈনিক বর্ণনা—বিবির কথা, ছেলেপুলের কথা। বিবি কবে থেকে একটা ভাল পাতাবাহার শা[ড়ি] কিনে দিতে বলেছে। কিন্তু প্রতিবারই সে আশ্[বাস] দিয়েছে, হপ্তা পেয়েই এবার বিবির জন্যে এক[টা] শাড়ি কিনে আনবে। কিন্তু শনিবারের রাতটার টান [বড়] কঠিন। কিছুতেই এর হাত থেকে নিস্তার নেই। অ[থচ] সে-ই মোহময় রাতে সে যখন নেশায় বিভোর তখন হয়[তো] ওর বিবি দোরগোড়ায় বাতি রেখে অপেক্ষা করছে—ক[খন] আসবে মানুষটা। নতুন শাড়ি আনবার কথা দিয়ে গেছে[,] আজ কসম খেয়েছে, ভাটিখানার দিকে আর যাবে না। বি[বি] এক সময়ে হতাশ হতে হয়। তারপর সে বিছানায় শু[য়ে] দুর্ভাবনায় ছটফট করে। আবার উপোস—মারধো[র]। এ সব খবর বলাই জেনেছে। বুঝতে পেরেছে এমনই ক[ত] রহমতের মত অনেকেই শনিবারের রাতের হাতছা[নি] অগ্রাহ্য করতে না পেরে দিনের পর দিন নিজেদের মনুষ্য[ত্ব] ক্ষয় করে চলেছে।

বলাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল এ সব কা[ণ্ড] কারখানা দেখে। রহমত তাকে দলে টানবার জন্য চে[ষ্টা] ফেলত, সে বরাবর ওই সর্বনাশা আকর্ষণের মে[াহ] এড়িয়ে চলেছে।

শেষ পর্যন্ত সত্যিই বলাই আবার ফিরে এল নিজে[র] জন্মভিটেতে। অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছে [সে।] সেই গ্রামেই এখন কারখানা হবে, বড় বড় বা[ড়ি] ইমারত উঠবে। কেমন হোঁচট খায় বলাই।

আনমনা ভাবে সেও কখন সড়কের এক পাশে এ[সে] দাঁড়ায়। সামনের দিকে তাকায়। অনেক মানু[ষের] ভীড় পথের পাশে। বলাইয়ের ব্যথাহত দৃষ্টি একব[ার] সবার উপর দিয়ে ঘুরে এল। সবার চোখে-মুখেই এ[ক] বিস্ময়-কৌতূহল-মেশা প্রসন্নতার দীপ্তি ছড়িয়ে আ[ছে।] সামনেই শব্দটা এগিয়ে আসছে। বিরাট বিরাট যন্ত্রগু[লো] হুঙ্কার দিতে দিতে, ধূলি উড়িয়ে নিজেদের বিক্রম সগ[র্বে] জাহির করে দিয়ে চলে গেল। মনে হল কাঁধে ঝুল[ানো] কোদাল-ঝুড়ির মালিককে চোখ রাঙিয়ে শাসিয়ে দি[য়ে] গেল।

দেখতে দেখতে যন্ত্রগুলো অনেক দূরে চলে গে[ল।] জনতার ভীড়ও কমে আসছে। সবার মুখে মুখে অত্যুজ্জ[্বল] ভবিষ্যতের সোনালী জীবনের কলগুঞ্জন। সমস্ত গ্রামটা

চিত্রতারকাদের লাবণ্যের মতই

আপনার লাবণ্য সুন্দর হয়ে উঠুক

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেড, কর্তৃক প্রস্তুত।

LTS. 581-X52 BG

যেন আজ আবার নতুন মহুয়ার রসে বুঁদ হয়ে গেছে। বলাইয়ের বড় দুঃখ হয়, রাগ হয়। চোখে একটা অজানা চিন্তার ছাপ পড়ে। যন্ত্রের ক্রমবিলীয়মান শব্দ দূর থেকে মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। সে শব্দ তাকে আর তার সঙ্গীদের আজ নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করে গেল। শরীরের কোষে কোষে কেমন একটা দংশন-জ্বালা। কিসের একটা চাপা বাষ্প যেন পুঞ্জীভূত হয়ে চলেছে মনের গভীর গহনে।

আজ প্রথম কাজে চলেছিল বলাই। অনেক ধার-দেনা হয়েছে এর মধ্যে। শোধ করতে হবে। পরান মণ্ডলের একটা অনেক দিনের পতিত জমি আছে। সেটা পরিষ্কার করতে হবে। ওখানে একটা মন্দির হবে। লক্ষ্মীর কৃপায় গঞ্জে এবার ফসল বিক্রি করে অনেক মুনাফা হয়েছে তার। কিন্তু তবু কাজে যাবার কথা ভুলে গেল বলাই। নিজের অজান্তেই বাড়ির পথে পা বাড়াল। ভুলে গেল আজ প্রথম কাজে যাচ্ছে। বায়নাও নিয়েছে। ভুলে গেল ফেরার পথে রামপীরের হাটে যেতে বলে দিয়েছে বউ। একটা নতুন চিন্তা এসে অন্য সব চিন্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। যত ভাবছে ততই দেহে উত্তেজনার সঞ্চার হচ্ছে। পা দ্রুত ছুটছে। আশেপাশে একবারও চেয়ে দেখল না। এ সব কী হল আজ! বড় বড় যন্ত্রপাতি কেন আজ এ গাঁয়ে! কারখানা বসবে? শহর হবে? শহরের জীবনধারার চেহারা তো তার অজানা নয়। ভবিষ্যতের শঙ্কা এসে বাজছে তার বুকে। দ্রুত পতন-স্পন্দন শুনতে পাচ্ছে। কোথায় যেন ধ্বস নেমেছে জীবনে। কিন্তু কেমন করে আজ একে রোধ করবে? ভেবে কোন কিনারা পায় না। কাউকে কিছু বলতেও সাহস হয় না। বাড়ি এসে কোদাল-ঝুড়িগুলো এক পাশে ফেলে রেখে সেখানেই বসে পড়ে। ঘর থেকে বউ বেরিয়ে আসে। চোখে-মুখে একরাশ ঢল-নামা বন্য বিস্ময়। মানুষটা গেল আর চলে এল! অসুখটা আবার ফিরে এল নাকি! তাড়াতাড়ি কাছে এসে গায়ে হাত দেয়। মন থেকে আশঙ্কার মেঘ কেটে যায়। হৃদ্‌স্পন্দন স্বাভাবিক হয়। যা ভেবেছিল তা নয়। মুহূর্তে কী একটা কথা ভেবে নিয়ে মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে, কি হল, এই গেলে আর এই এলে। বাইরে মন সরছে না বুঝি?

বলাই আজ যেন কিছুতেই এই সহজ রসিকতাটুকুর মর্ম বুঝে উঠতে পারছে না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বউয়ের মুখের দিকে।

কিছু না বলে বলাই এবার সোজা উঠে দাঁড়ায়। বউয়ের দিকে একাগ্রভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, শুনেছিস বউ, এ গাঁয়ে কারখানা বসবে রে, শহর হবে।

বউ এবার বাঁধ-ভাঙা জলধারার মতন খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, এই কথা! আমি ভাবলাম না জানি কী। তা ভালই তো গো। বলি নাই তোমায়, তখন তোমার ভীষণ অসুখ, শহর থেকে অনেক লোক এল, সড়ক দিয়ে সোজা তারা চলে গেল পুবের মহালটার দিকে। তারপর কত কি ফিসফিসানি—কানাকানি। এবার বুঝতে পারছি, এখানে শহর হবে। খুব মজা হবে তা হলে। আমার বড় মনে লয় শহর দেখতে। তারপর এক সময়ে বলাইয়ের চিন্তাকুল মেঘ-মলিন মুখটার দিকে তাকিয়ে বউয়ের হাসি মিলিয়ে যায়।

দুপুরে ঘুমোবার চেষ্টা করে বলাই। চোখ বুজে কিছুক্ষণ মড়ার মতন পড়ে থাকে ময়লা বিছানাটায়। কিছুতেই ঘুম আসে না। কেবলই ছটফট করে। রোদের ঝাঁজ থাকতে থাকতেই উঠে পড়ে বলাই। তারপর ঘুমন্ত বউকে না ডেকেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে মোড়লখুড়োর বাড়ির উদ্দেশ্যে। তার কাছ থেকে আ[illegible] অনেক কথা সবিস্তারে শোনা যাবে।

গিয়ে দেখে, মোড়লখুড়োর ওখানে লোকের জমায়েত। ভেবেছিল ধীরে-সুস্থে দুটো কথা কয়ে শান্তি পাবে। কিন্তু তা আর হল কই। এখানেও সেই এক কথা। মাঝে মাঝে হাসির দমক। এ আলোচনা-সভায় কেউ বাদ পড়ে নি। প্রবীণারাও রুদ্ধবাক্ হয়ে কথা গিলছে। মনে হচ্ছে আগামী দিনের সুখের একটা স্বর্ণতালকে সবাই মিলে লুব্ধভাবে লেহন করছে। বলাইকে দেখে মোড়লখুড়ো হেসে অভ্যর্থনা জানায়—আয় বলাই। কোন কথা না বলে বলাই ওদের মধ্যে গিয়ে বসে। একজন আনন্দের আতিশয্যে বলাইয়ের কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলে ওঠে, আর ভয় কি, এখানে বিরাট কারখানা হবে, অনেক লোক খাটবে—অনেক পয়সা কামাই করা যাবে। বলাই শুধু একটা নিঃশ্বাস

ছাড়ে। মনে পড়ে যায় রহমতকে। রহমতও তো একদিন ভেবেছিল অনেক টাকা রোজগার করবে। কিন্তু—। একজন বলে, এরই মধ্যে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। যন্ত্রগুলোর জানোয়ারের মত কী শক্তি ভাই। আর একজন মৃদু হেসে মন্তব্য করে, হ্যাঁ, কারখানা হলে ভালই হবে। ক্ষেতের কাজে আর পয়সা নেই। তবু দুটো পয়সার মুখ দেখা যাবে। বলাই শুধু চমকে একবার বক্তার মুখের দিকে তাকায়।

বলাইয়ের ভাল লাগে না। কিছু না বলে সেখান থেকে উঠে পড়ে। কত কি এলোমেলো ভাবনা মাথার মধ্যে এসে ভীড় করে। এ সব কী আবোল-তাবোল ভাবছে সে। সবাই যেখানে ভবিষ্যতের স্বপ্নরঙিন কল্পনায় মশগুল, সেই-ই শুধু সেখান থেকে ছিটকে পড়েছে। সত্যিই কি সে আজ দলছাড়া? ভাবতে ভাবতে কখন সড়ক থেকে নেমে ক্ষেতের আল ধরে হাঁটতে শুরু করেছে, টেরও পায় নি। কী একটা শক্ত গোছের পায়ে ঠেকতে এবার দাঁড়িয়ে পড়ল, তাকিয়ে দেখল—শ্মশান। ভাঙা কলসীর একটা কানা পায়ে আটকে গেছে। একটা নিঃশ্বাস পড়ে। এই নির্জনতার মধ্যে নিজের হৃদয়-নিঙড়ানো প্রশ্বাসের শব্দটাও কানে এল। সাতপুরুষের চিতাস্থান। একবার আকাশের দিকে তাকাল। অগণ্য তারার ঝিলিমিলি সেখানে। উপরের দিকে তাকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করল। তারপর আবার হাঁটতে থাকে। অনেকক্ষণ পর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কখন দু ক্রোশ পথ হেঁটে এসেছে। এই সেই পুবের মহাল। কয়েক পুরুষ ধরে এটা পতিত পড়ে আছে। অনেকদিন আগে এখানে কারা যেন বাস করত। কান পাতলে এখনও কত মানুষের দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়। সেদিন এ জায়গাটা লোকে গমগম করত। একটা দমকা বাতাসের স্পর্শ লাগে। পাতাগুলো মর্মরিত হয়ে ওঠে। একবার সামনের দিকে তাকায়। অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় দূরে একটা তাঁবু। সেখান থেকে টুকরো টুকরো কথা কানে ভেসে আসে। আরও দূরে মাঠের উপর যন্ত্রদানবগুলো নিশ্চল হয়ে রাতের অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে।

একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মহালটার দিকে তাকায়। আশ্চর্য, এরই মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। বড় বড় কয়েকটা গাছ প্রচণ্ড শক্তিশালী যন্ত্রের আক্রমণে এরই মধ্যে ধরাশায়ী হয়েছে। মাটির বড় বড় কয়েকটা স্তূপকে এর মধ্যেই পিষে চটকে একাকার করে ফেলা হয়েছে। জায়গাটায় একটা বর্বর অত্যাচারের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু এখন সব শান্ত। ভাবতে ভাবতে একটা বড় অশ্বত্থগাছের নীচে এসে দাঁড়ায়। পাতাগুলো শব্দ করে নড়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ নিশ্চল পাথরের মত দাঁড়িয়েছিল। এক সময়ে দেখল দূরের তাঁবুর প্রদীপশিখাটাও যেন ঘন আঁধিয়ারের নীচে আত্মগোপন করেছে। কথার টুকরোও আর ভেসে আসছে না। সব নিথর-নিস্তব্ধ। রাত বোধ হয় অনেক হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে একসময়ে ক্লান্ত পায়ে বাড়ির পথ ধরে। আচমকা বউয়ের কথা মনে পড়ে যায়। আজ যেন কিসের ব্রত। রামপীরের হাটে যাবার কথা ছিল তার। এবার মনটা খচখচ করতে থাকে। হয়তো এখনও বসে আছে ওর জন্যে। এবার চলার গতি বাড়ে। ছ দিন কাজে যায় নি বলাই। এর মধ্যে অনেক কিছু সে জানতে পেরেছে। সব জেনেশুনে আরও যেন বিপদ হল। এখন বুঝতে পারছে কিসের জন্য এত তোড়জোড়। কারখানা হবে। বিরাট কারখানা। দেশবিদেশের বড় বড় কারিগর আসবে, অনেক কলকব্জা যন্ত্রপাতি আসবে। পীচের রাস্তা হবে। ইলেকট্রিকের বাতি বসবে। মাতাল রামেশ্বরের মুখ হাস্যোজ্জ্বল। সে বলাইকে কানে কানে বলেছে, এখানে তা হলে একটা তাড়িখানাও হবে। গ্রামের সবাই ক্ষুধাতুর দৃষ্টি নিয়ে আগামী দিনের সুখ-সম্পদ যেন লেহন করে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠল। সুখ নেই শুধু বলাইয়ের মনে। রাজ্যছাড়া যত সব আজগুবী ভাবনা তার মাথার মধ্যে গিজগিজ করে। তার দুঃখ, একদিন এখানে গ্রাম ছিল কেউ জানবে না সে কথা। গাঁয়ের চেহারাটাই যাবে পালটে। এর চেয়ে দুঃখ আর কী আছে!

সব শুনে বলাই আগের চেয়ে আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। কাজে না গিয়ে সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কী এক দুর্বার আকর্ষণে চলে যায় সেই পুবের মহালটায়। ওখানে নাকি সবাই নতুন দিনের পদধ্বনি শুনতে

পায়। কিন্তু বলাই নিস্পৃহ। কিছুই তার কানে যায় না। সে শুধু শোনে ভাঙনের বুকফাটা হাহাকার। মাটির তলায় কোথায় যেন অবিরাম ছন্দে ক্ষয় হয়ে চলেছে। বুকের ভেতরটায় কোন এক দুষ্ট জীবাণু যেন কুরে কুরে খাচ্ছে। কোন পাহাড়ে যেন অরণ্য-আদিম ঢল নেমেছে। তার উদ্দাম স্রোতোমুখে সব ভেসে চলেছে। একটা অসহায়ের দীর্ঘশ্বাস সমস্ত প্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। এর মধ্যেই সমস্ত অসমান জায়গাটা এক জাদুবলে সমান হয়ে গেছে। বড় বড় যন্ত্রগুলো মাটি কেটে চলেছে একটানা শব্দে। কেবলই গোঙাচ্ছে।

ছ দিন পর কাজে যাচ্ছিল বলাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে কিছুতেই সে আজ মহালমুখী হবে না। পরান মণ্ডল তাগাদা দিতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু কিছুদূর গিয়ে কী মনে করে আবার মহালের পথ ধরল। কিছুক্ষণ পরে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছল তখন মাঠে কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কাঁধে কোদাল আর ঝুড়ি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত ভাবে সব নিরীক্ষণ করছিল। তারপর দৃষ্টিটা হঠাৎ কেন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। মুখ থেকে একটা অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হল। চোখের সামনে দেখল অতদিনের সেই অতীতস্মৃতিবহ প্রাচীন গাছটাকে কয়েকটা আঘাতেই কেমন অনায়াসে ধরাশায়ী করা হল। বলাইয়ের হৃদ্‌পিণ্ডটায় কে যেন সজোরে একটা আঘাত করল। সমগ্র অতীতটাই যেন আর্তনাদ করতে করতে শেষবারের মত বলাইয়ের দিকে চেয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। নিশ্চল হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে রইল সে। মাথাটা ঘুরে উঠল। রক্তস্রোত চঞ্চল হল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে আবার সে স্থির হল। কিন্তু মনের ভিতর যেন একটা বড় কাঁটা বিঁধেই রইল। সারাদিন সে বসে রইল। কারখানার নেপালী দরওয়ানের সঙ্গে গল্প করল। তারপর সন্ধ্যের দিকে যখন যন্ত্রগুলোর কাজ বন্ধ হল তখন দৌড়ে কাছে গিয়ে বোবা বিস্ময়ে হাত দিয়ে খুঁজে দেখল শক্তির আধারটা কোথায়। তারপর এক বিজাতীয় ক্রোধে তার সারা অন্তর জ্বলে ওঠে। কিছু না বলে কোদাল-ঝুড়িটা কাঁধে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। আর একবার তাকায় যন্ত্রগুলোর দিকে। জোরে পা চালায় বাড়ির দিকে। মনে মনে একটা সুকঠিন সঙ্কল্প যেন পাক খেতে থাকে।

নেপালী দরওয়ান বীর সিং কারখানা পাহারা দেয়। মাঝে মাঝে সে পাশের গ্রামে যায়। এখানকার গেঁয়ো মদ বীর সিংয়ের খুব ভাল লাগে। তাই মাঝে মাঝে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। এ সব খবর মালিক জানে না। জানলে তার নোকরি থাকবে না। আজও সে রাতের অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে পাশের গ্রামে গেল। বলাইয়ের এই সুযোগ। পেট্রল খেয়ে খেয়ে যন্ত্রগুলো এত লাফালাফি করে। আবার এগুলোই এদের মৃত্যুবাণ। এ কথা মনে হতে বুকটা তখন কেঁপে উঠেছিল। শিকারী কুকুরের মত চোখ দুটো একবার জ্বলে উঠেই নিভে গিয়েছিল। আজ মন স্থির করে নিয়েছে বলাই। গ্রামের এ জীবনকে সে ধ্বংস হতে দিতে পারে না। সে আজ নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে, একদিন এ যন্ত্রদানব নির্ঘাৎ গ্রামের টুঁটি চেপে ধরবে। এতদিনের স্মৃতিবহ গাছটাকে আজ এমন ভাবে বিনষ্ট করল। আর তার জন্য এমন পৈশাচিক উল্লাস! যেমন করে হোক এর কবল থেকে বাঁচাতে হবে এ গ্রামকে। যা করবার সে নিজেই করবে। বলাইয়ের নীল রগগুলো আবার দাপাদাপি শুরু করে। শরীরেও যেন হঠাৎ উষ্ণতা বেড়ে যায়।

খেতে বসে কিছুই প্রায় মুখে দেয় না বলাই। বউ জিজ্ঞেস করে, কি গো, অমন করে কী ভাব রাতদিন। চেহারাটা তো রোগা হয়ে গেল। শেষে আবার অসুখে পড়বে যে। বউয়ের চোখে একটা অজানা ভয়। ভীরু গ্রাম্য বুকটা একবার দুলে ওঠে। স্বামীর চোখে-মুখে কিসের একটা আতঙ্কের ছাপ যেন দেখতে পেয়েছে সে। গায়ে একটা ঠেলা মেরে জিজ্ঞেস করে, অমন করে কী অত ভাব শুনি?

এবার বলাই বউয়ের মুখের দিকে তাকায়। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে একসময়ে শব্দ করে হেসে ওঠে। বলে, কী আর ভাবব, তোরা যা ভাবিস আমিও তাই ভাবি। তারপর হাসি থামিয়ে গভীর ভাবে তাকিয়ে থেকে বলে, শহর হলে খুব ভাল হবে না রে?

বউ কোন জবাব দেয় না। স্বামীর কথার অন্তরালে একটা গোপন ব্যথা লুকিয়ে থাকে।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বলাই বিছানায় চোখ বুজে পড়ে থাকে অনেকক্ষণ। বউটা সন্দেহ করতে আরম্ভ করেছে।

যাঁরা ভাল স্বাস্থ্য ভালবাসেন তাঁরা সবসময়
লাইফবয় দিয়ে স্নান করেন
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
খেলাধূলোই বলুন বা কাজকর্ম্মই বলুন আমরা কখনই ধূলোময়লার থেকে নিরাপদ নয়। আর ময়লা বহন করে রোগের বীজানু যা সবসময় আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। লাইফবয় সাবান এই বীজানুগুলি ধুয়ে সাফ করে দেয় এবং আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখে।
প্রত্যেকদিন লাইফবয় সাবান দিয়ে স্নান করে আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখুন—এটি আপনাকে এত ঝরঝরে করে তোলে।
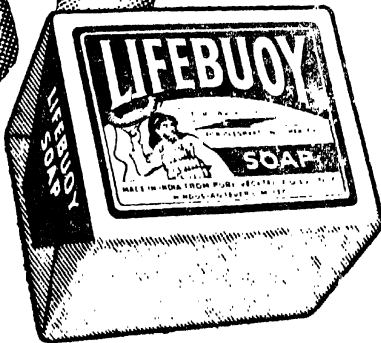
স্বামীর মতিগতি যেন কাদন ধরে কেমন কেমন ঠেকছে। রাত অনেক হয়েছে। সব শান্ত, নিঃঝুম। চারদিকে নিস্তব্ধতা। বলাই এক সময়ে আস্তে আস্তে বালিশের নীচে হাত দেয়। কাগজে মোড়ানো বারুদ মাখানো কাঠিগুলো আর একবার স্পর্শ করে নিশ্চিন্ত হয়। বীর সিং আজ যাবে দূর গাঁয়ে। সেও যেন এখানে এরই মধ্যে কিসের একটা বন্ধ-স্বাদ পেয়েছে। এবার উঠে পড়ে। এতক্ষণে বউ গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে। ঘরের চৌকাঠে এসে বাইরের দিকে চেয়ে একবার একটু নড়ে ওঠে। আকাশের কোল বেয়ে মর্ত্যপ্রাঙ্গণ পর্যন্ত একটা অন্ধ কৃষ্ণবর্ণ শিশু যেন অসহায়ভাবে ছুটাছুটি করছে। বুকটা শুধু একবার দুরু দুরু করে উঠল। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর সব ভয় সজোরে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বাইরে এস দাঁড়াল।

শ্মশানটার উপর এসে একবার চমকে থেমে যায়, তারপর আবার এগোয়।···নির্দিষ্ট স্থানটাতে এসে চুপটি করে দাঁড়ায় বলাই। সব নিঃঝুম-নিস্তব্ধ। বীর সিং হয়তো এতক্ষণে ভিন্ গাঁয়ে মহুয়ার রসে ডুবে গেছে। ড্রাইভারেরাও এতক্ষণে সারাদিনের ক্লান্তির পর ঢলে পড়েছে। মাঠের উপর ত্রিপল-ঢাকা অবস্থায় জানোয়ার-গুলো গাদাগাদি করে শুয়ে আছে যেন। হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। না হয় এতক্ষণে এগিয়ে এসে প্রচণ্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়ত শত্রুর উপর। এবার এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় মাঠের দিকে। হাতে সেই মৃত্যুবাণ। বুকটা এবার কেঁপে ওঠে। আকাশের তারা ঝিলমিল করে অবাক্-বিস্ময়ে যেন তাকিয়ে থাকে তার দিকে। অতীত আত্মারা সুদূর নীল আকাশের কোণটি থেকে ধূলার ধরণীর দিকে চেয়ে যেন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। একটা হাওয়ার ঝাপটা তীক্ষ্ণ ফলার মত এসে গায়ে বেঁধে। আবার এগোয়। রক্তের মধ্যে তখন একটা প্রলয়-উল্লাস। দূরে অন্ধকারের মধ্যে তাঁবুটা হারিয়ে গেছে। এবার যন্ত্রগুলোর কাছে এসে দাঁড়ায়। এখন কেমন যেন তারা সব শান্ত। এখন আর তাদের কোন বিক্রম নেই। একটু বিরাম—একটু বিশ্রাম। ডোজারটার গায়ে হাত দেয়। এটাই তার আবাল্য-বন্ধু বটগাছটিকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে চিরদিনের জন্যে। ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে আর একবার চেয়ে থাকে যন্ত্রটার দিকে। এগুলোই তার সব সাধের ইমারত ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। শহর থেকে সে পালিয়ে এসেছে যার ভয়ে—এখানেও তারই তাড়া। এখন মারণাস্ত্র তার হাতে। তারপর সব শেষ হয়ে যাবে। মাথাটা আবার টনটন করতে থাকে। রগ-গুলো দাপাদাপি শুরু করে। আর না। এবারই সে সব শেষ করে দেবে। যন্ত্রদানবের অত্যাচার থেকে যে করেই হোক রক্ষা করবে তার জন্মভিটেকে। কোন আপোয নয়। হাতের বারুদ মাখানো কাঠিটা এবার বন্য-আদিম উল্লাসে নেচে ওঠে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কাঠিটা মাটিতে পড়ে গেল। হঠাৎ যেন বলাইকে একটা তড়িতাঘাত করল। অন্ধকারে কারা সব ফিসফিস করতে লাগল। যেন তার এই চৌর্যবৃত্তিকে উপহাস করছে সবাই।

সহসা একটা চিন্তা তাকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। মনে হল, কী হবে অমনভাবে চুপিচুপি এগুলোকে ধ্বংস করে। একটা অনুকম্পা এল যন্ত্রগুলোর উপর। সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপর ধিক্কার জন্মাল। তার এই গোপন হিংসা, লুকিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা —এ যে নাগরিকতার চেয়েও মন্দ জিনিস! তা ছাড়া আজ এগুলিকে শেষ করে দিলেই তো চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হবে না এর জয়যাত্রা। আবার নতুন যন্ত্র আসবে। কর্মকর্তাদের যখন পছন্দ হয়েছে এ জায়গা, তখন এর উপর রোখ তাঁদের যাবে না সহজে। বলাই অন্ধকারে হাসবার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। এবার বলাই মাটিতে বসে পড়ে। মাথাটা যেন অসম্ভব ভারী ভারী ঠেকছে। বড় নিদারুণভাবে রহমতের কথাটা মনে পড়ে যায়। আমরা সব যন্তর বনে গেছি। গতরটাই যা আছে, প্রাণটা কবে মুছে গেছে দেহ থেকে। এখানেও নির্ঘাৎ তাই হবে। রাতের অন্ধকারে সুরার স্রোত বয়ে যাবে কারখানার আশেপাশের ভাটিখানায়। তারপর আর ভাবতে পারে না বলাই। মাথাটা ঘুরে যায়। কিছুক্ষণ নিঃসাড়ভাবে বসে থেকে এবার উঠে দাঁড়ায় বলাই।' হেরে গেল আজ সে। বড় নির্মম এ পরাজয়ের গ্লানি। প্রবল একটা স্রোতোমুখে সে চিরতরে হারিয়ে গেল। সারা শরীরটাকে কে যেন ব্যর্থতার চাবুকে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। হৃৎপিণ্ড থেকে অঝোরে রক্ত ঝরছে। বাড়ির পথ ধরে বলাই। মাতালের মত পা দুটোকে কোন রকমে টানতে টানতে এগিয়ে যায়। থেকে থেকে তাঁর দেহটা কেঁপে ওঠে—আর তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামের প্রাণকেন্দ্রটাই যেন প্রবলভাবে কাঁপতে থাকে।

প্রকৃতি ও প্রতিকৃতি

শ্রীসুশীলচন্দ্র সিংহ

বলতে বলতে দাদু সহসা ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল : সিতু, তোমার মাকে ডাক, এখনই চল সব বাড়ির বাইরে গিয়ে দাঁড়াই !

আমি উচ্চকিত হয়ে বলে উঠলাম, কেন, কী হল ?

দাদু এক রকম কাঁপতে কাঁপতেই বলল, দেখছ না, সমস্ত বাড়ি দুলছে ? আবার সেই বিহার-ভূকম্পের মত !

আমি বাধা দিয়ে বললাম, তুমি কী বলছ, দাদু ! আমাদের পুরাতন বাড়ি, নীচেই বড় রাস্তা দিয়ে দোতলা বাস যাচ্ছে, তাই কাঁপছে। এ রকম তো বড় গাড়ি গেলেই হয়।

দাদু ইজি-চেয়ারে বসে পড়ে বলল, কই, আমি তো এতটা কোনদিন বুঝি নি।

দাদু কিছুক্ষণ চুপ হয়ে গেল। আমি বললাম, দাদু, আর না, রাত হয়েছে, এবার তুমি ঘুমোও।

দাদু বলল, না সিতু, আর একটু আছে, শেষ করেই শান্তিতে ঘুমতে পারব।

দাদু আবার শুরু করল : হ্যাঁ, সেদিন ছিল রবিবার। সকালে উঠতে দেরি হয়ে গেল, দেখি, জ্ঞান তার নিয়মমত লেবরেটরিতে গেছে, রবিবারেও ফাঁক নেই ; কিন্তু শিবশঙ্কর গেল কোথায়, সে তো এ সময়ে কোথাও বেরোয় না! যা হোক, যোগীদৎ-দেওয়া প্রাতরাশ শেষ করে আমার চিরাচরিত লেখা শুরু করলাম ; তার এখনও কিছু কিছু মনে আছে, বুঝেছ সিতু—

আমি অর্থাৎ সিতু বলতে যাচ্ছিলাম, হ্যাঁ, মা বলে, তোমার নাকি স্মরণশক্তি প্রখর থেকে প্রখরতর হচ্ছে দৃষ্টিহীন হওয়ার পরে।

কিন্তু চেপে গেলাম। মনে হল, দাদু বলেছিল, দুঃখের কথা আবার মনে করা মানে পুনরায় নিজেকে দুঃখ দেওয়া। দাদু বোধ হয় চক্ষুষ্মান হতে পেরেছিল চোখ হারিয়ে ; কিন্তু চোখ হারাবার করুণ কাহিনী যখন শেষ হতে চলেছে তখন সেটার পুনরুল্লেখের কারণ হতে যাবার কী দরকার।

দাদুর এই কাহিনী শুরু হয়েছিল হঠাৎই। আমি চেঁচিয়ে পড়ছিলাম, গাছের অগ্রভাগ পত্র-পুষ্প-শোভিত দেখে ভাবলে চলবে না যে, গাছের গোড়ার কথাও এই। গাছ বেয়ে আমরা যদি শিকড়ের দিকে নামি তো দেখি, গাছ প্রাণপণ-বলে মাটি হতে সঞ্জীবনী রস সংগ্রহে ব্যস্ত। 'কোথা হতে আসা, কোথা পুনঃ যাওয়া'—যেন মানুষের আবহমানের কথা, এ জগতে বাঁচা ও থাকাও মানুষের সকল চিন্তার সার চিন্তা। তাই ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে সংঘর্ষ, সমষ্টিতে সমষ্টিতে বিগ্রহ। এ কথাটার মানে, 'আহার ও বিস্তার' (self-preservation and self-propagation)। প্রাণী-সাধারণের মত মানুষও এর অতীত হতে আসে নি। এই দুই উদ্দেশ্য নিয়ে বেড়ে ওঠে শহরে বাড়ি, হাওয়া-গাড়ি ; পাষাণের বুক চিরে, আকাশের আস্তরণ ফেঁড়ে, সমুদ্রে সেতু বেঁধে মানুষ প্রমাণ করতে চায় প্রকৃতির পরাজয়। কিন্তু মানব-প্রকৃতির জন্যই যে সব তা কি অস্বীকার করতে হবে! তা হলে প্রাণী-সাধারণের উদ্দেশ্য দুটির জন্যই কি বেড়ে ওঠে মানুষের বৈজ্ঞানিক কৌশল ও পরস্পরবিরোধী সত্য-দম্ভ ?

জীব-সাধারণের 'আহার ও বিস্তার' সনাতন মানুষের প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। এই প্রকৃতির তাগিদে মানুষের বিজ্ঞান বহিঃপ্রকৃতিকে যেন বেঁধে ফেলছে। কিন্তু বিজ্ঞান মানুষের পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের পরিধি যত বাড়াচ্ছে, ততই সে বুঝতে পারছে যে সে প্রকৃতি সম্বন্ধে কত অজ্ঞ। বিজ্ঞানের কল-কৌশলে সমস্ত পৃথিবী যেন ছোট হয়ে আমাদের গৃহকোণে এসে গেছে ; কিন্তু মানুষের বিজ্ঞানের পরিধির সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়গোচর পৃথিবীর পরিধিও কি বেড়ে যায় নি ?

অন্তঃপ্রকৃতির জন্য বহিঃপ্রকৃতির বন্ধনকে মানুষের এই বিজ্ঞান ভাবে প্রকৃতির পরাজয়। কিন্তু প্রকৃতি রহস্যময়ী! মানুষ তার হাত-পা বেঁধে ভাবছে, এইবার প্রকৃতির পরাজয়। পর-মুহূর্তেই প্রকৃতি একটু হেসে বাঁধা খুলে বলছে, বন্ধন চিরন্তন নয়—

হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠস্বরে উচ্চকিত হয়ে বুঝলাম, দাদু ঘুময় নি। ঘরের এক কোণে ইজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত দাদু বলে উঠল, এটা কার লেখা সিতু ?

আমি বললাম, আমাদের কলেজের এক ছাত্রের, কলেজ-ম্যাগাজিনে রচনাটা বেরিয়েছে।

কী আশ্চর্য, এই লেখাটা শুনে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের কথা, যে-কথা আমি সব সময়েই ভুলে যেতে ইচ্ছা করি ; কেন না, অতীত দুঃখের কথা মনে করা মানে আবার নিজেকে তার কাছাকাছি কোন দুঃখ দেওয়া—

কিন্তু দাদু, দুঃখের কথা কাকেও বললে কি মন হালকা হয়ে যায় না ?

সব ক্ষেত্রে নয়—

মায়ের কাছে শুনেছি তোমার স্বাস্থ্য ছিল খুব ভাল; কিন্তু শিশুকাল থেকে যে দুজন বন্ধু তোমার একান্ত আপনার ছিল তাদের তুমি হারালে পূর্ণ যৌবনে, তারপরেই তোমার শরীর ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে এবং নানান রোগভোগের শেষ পরিণতি তোমার এই দৃষ্টি-হীনতা—

হ্যাঁ, তা হলে তুমি বোধ হয় শুনেছ, এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখময় আঘাত; এ আঘাত শুধু বন্ধু-বিচ্ছেদেরই নয়, আমাদের জীবনে যে সূক্ষ্ম বিশ্বাসগুলো আমাদের সময়ে অসময়ে একান্ত বন্ধুর মত রক্ষা করে সেগুলোতেও পড়েছিল গভীর ছেদ।

দাদু কিছুক্ষণ থামল, তারপর আবার বলতে শুরু করল, তা হলে তুমি হয়তো জান যে, আমি, শিবশঙ্কর আর জ্ঞান কি রকম এক প্রাণ ও এক ধ্যান ছিলাম। নিতান্ত শৈশব থেকে আমরা একসঙ্গে পড়াশোনা করে ইস্কুলের এলাকা পার হয়ে কলেজে পড়তে শুরু করি। শিবশঙ্কর তার প্রিয় দর্শন-শাস্ত্রে নাম করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরল, জ্ঞান বিজ্ঞানের কী যেন বিষয় নিয়ে তখন গবেষণা শুরু করেছে। আমি ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করে গল্প আর পদ্য লিখে সময় কাটাই। আমরা এ রকম পরস্পর থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়লেও প্রতিদিনই মিলিত হতাম অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়ের জন্য কারও বাসায় এবং নানান গল্প-গুজব চলত।

এমনই কয়েক বছর কাটল। জ্ঞান তার গবেষণা শেষ করল। আমাদের তখন স্রেফ আড্ডা দেওয়া কাজ; আমার শুধু দু-একটা কবিতা দু-একটা মাসিকে বেরোয়, এই অবধি। জ্ঞান বলল, আর ভাল লাগে না, চল কোথাও ঘুরে আসি; দূরে যেতে চাও, চল কাশ্মীরের দিকে, কিংবা কাছের কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় চল। শেষে ঠিক হল, সাধারণতঃ লোকে বিহারের খ্যাত যে সব জায়গায় যায় আমরা সে-রকম জায়গায় যাব না, যাব 'অজ্ঞাতকুলশীল' কোন স্থানে। সব রকমের সুখ-সুবিধাময় কলকাতায় বসে বসে জমে গেছি। টাইম-টেবল দেখে, লটারি করে বিহারের এক অখ্যাত গ্রাম ঠিক করা গেল। তারপর আমরা দিনস্থির করে রওনা হলাম।

এক গেলাস জল দিয়ো তো।

দাদু জল খেল, তারপর বলতে শুরু করল, ট্রেন থেকে এই গ্রামের স্টেশনে নামলাম। কাছেই এক হালুইকরের দোকান; সেখানে ভোজন, বাসস্থান ও চাকরের ব্যবস্থা হল। অনতিদূরে মাটির বাড়ি, সঙ্গে পরিষ্কৃত জলের এক গভীর কুয়ো আর যোগীদৎ সুপকার-চাকর—এই নিয়ে আমাদের নূতন সংসারের শুরু।

তিনটে খাটিয়ার যোগাড় হয়ে গেল। 'হোল্ড-অল' সমেত আমাদের তিনটে বিছানা পাতা হল। হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল জ্ঞান, বলল, 'হোম, সুইট হোম'! শিবশঙ্কর মাথা নীচু করে কী যেন ভাবছে। আমি শুরু করলাম আমার অভ্যাসমত লিপি লিখতে:—সেই যে কবে রাঙা খেলনা হাতে জগতের কোলে এসে হাজির হলাম, তা মনেও নেই। শুধু মনে পড়ে, জগতের সবকিছু তখন অজানা, অথচ জানার অভাবও ঘটত না। তখন শুধু মনে মনে পরিচয়! রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ, জগতের যা কিছু মনের নয়নে অপূর্বরূপে ফুটে উঠত, তারই অভূতপূর্ব পরশে, শুধু ফোটারই আনন্দে মন পূর্ণ হয়ে উঠত, শিহরণ উঠত সর্ব শরীরে। যে হাওয়া এখন প্রাণ-মন টলিয়ে চলে, সে হাওয়াই তখন বাজাত বাঁশী। সুরের তালে তালে আমি হাততালি দিয়ে হেসে উঠতাম। আমার হাততালি দেখে লোকে হাসত, তাদের জাগতিক তালের সঙ্গে এ তালির সামঞ্জস্য খুঁজে পেত না। বেণুটির ছয়টি রন্ধ্রই যে তখন সুরে সুরে পূর্ণ! যা কিছু মিষ্ট তার মধুর মাদকতা নধর নবনীবিনিন্দী তনু'পরে তান তুলত। তখনকার সুর একটানা, কিন্তু একঘেয়ে নয়। তখনকার ফুল গন্ধে বর্ণে চিরনবীন, কিন্তু নিষ্কণ্টক। জগৎ দিনে দিনে যে নবীনতা নিয়ে আসত, তা কখনও পুরনো হত না, তা চির-নূতন! তখন আপেক্ষিকতা ছিল না; কোন কিছুর সাপেক্ষ না হয়েই প্রাণ সুষমা-লাবণ্যে, বর্ণে-গন্ধে, স্বপনের সোনালী আবেশে চঞ্চল হয়ে উঠত। নূতন যেন আর পুরাতন হতে চায় না, শুধু নিরপেক্ষ সৌন্দর্য, অনাবিল আনন্দ, নিষ্কলঙ্ক নিবিড়তা, শীতল স্নেহ—

দেখ, এখনও প্রায় সবটাই মুখস্থ আছে সেদিন যা লিখেছিলাম। 'শান্তিতে শয়ান' জ্ঞান হঠাৎ বলে উঠল, কী লিখছিস সুবোধ?

জ্ঞানকে আমি আমার লেখাটা পড়ে শোনাতেই সে বলল, তোমরা কবিরা বেশ আছ, যা অনুভব কর তা লিখে মনকে হালকা করে নাও, বাস্। বৈজ্ঞানিকরা যা অনুভব করে তা নানা দিক থেকে পরখ না করে একটি সত্য হিসাবে লিখতে নারাজ।

শিবশঙ্কর এতক্ষণ মাথা নীচু করে বসে ছিল, বলল, কী বললে জ্ঞান? পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বার-পথে তোমরা যে জ্ঞান আহরণ কর সেটাকে তোমরাও তো সত্য বলে গ্রহণ কর, তবে এক ইন্দ্রিয়-পথে আগত তথাকথিত সত্যকে অন্য ইন্দ্রিয়-পথে পরখ করে নাও। এই পরখে সাহায্য করে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। কিন্তু আমার মনে হয়, ঠিক ঠিক সত্য প্রকাশ কোনও ভাষার সাধ্যাতীত, আজও মানুষ-কথিত বা মানুষ-লিখিত এমন ভাষা নেই! কোন কিছু অনুভব করার বেলায় আমরা কতকটা স্বাধীন, কিন্তু প্রকাশের বেলায় মানতে হয় ভাষার বন্ধন।

...ওঁকে অবজ্ঞা
করবেন না

দেশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 15-50 BG
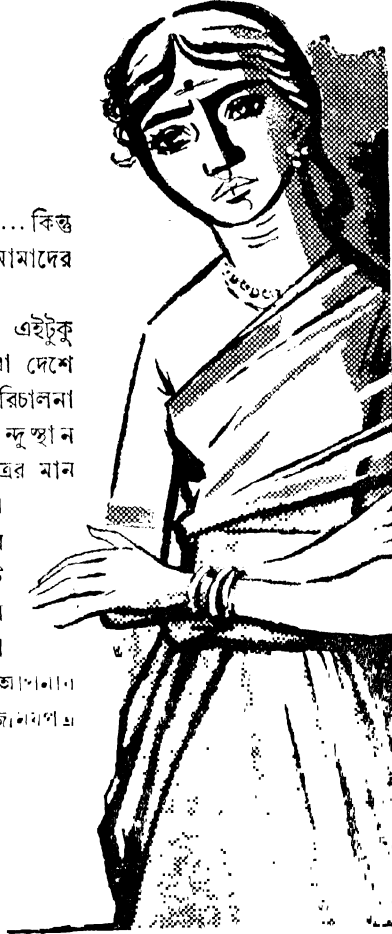
আমি হেসে বললাম, তাই তো 'নীরবের রব', ভাবের অভিব্যক্তিই শুধু ঠিক।

শিবশঙ্কর বলল, ঠাট্টা করা খুব সহজ, কিন্তু যা বলতে চাই সেটা ঠিক ঠিক প্রকাশ করা খুবই শক্ত।

আমি বললাম, বুঝেছি, জ্ঞান যা বলছে তা তুমি বরদাস্ত করছ না, আবার আমি যা বলছি তাও তুমি মানছ না; তা হলে সত্য প্রকাশের উচিত পন্থা কী?

তখন বিকেল হয়ে গিয়েছিল, যোগীদৎ গরম গরম লুচি তরকারী ও চা এনে হাজির করল। জ্ঞান হেসে বলল, এখন ক্ষুধার সময়ে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে সেইগুলো যেগুলো এইমাত্র প্রকাশ পেল আমাদের সামনে। এ প্রকাশ ঠিক ঠিক প্রকাশই হয়েছে।

আমরা খেতে শুরু করলাম। শিবশঙ্কর বলল, ঠিক এই কারণেই একটি সত্য হিসাবে তাড়াতাড়ি মত প্রকাশ করা উচিত নয়। জ্ঞানের খিদে পেয়েছে, তার কাছে লুচি এখন পরম সত্য। আমার খিদে পায় নি, আমার কাছে এখন লুচির অস্তিত্ব উপেক্ষণীয়। তাই আমাদের ভাল-মন্দ, যা নিয়ে আমরা এত দ্বন্দ্ব করি, তা স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভরশীল। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভাল মন্দ হয়, মন্দ ভাল হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী রকম?

শিবশঙ্কর বলল, গ্রীষ্মকালে সুস্থ ব্যক্তির ঠাণ্ডা সরবৎ খাওয়া শরীরের পক্ষে আরামদায়ক ও উপকারী হতে পারে, কিন্তু সর্দি-কাশির রোগীর পক্ষে নয়। এ গেল পাত্রের কথা। শীতকালের হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডায় সরবৎ আরামদায়কও নয়, উপকারীও নয়। এ গেল কালের কথা। তারপর দার্জিলিঙের মত শীতপ্রধান স্থানে সরবতের উপকারিতা ও আরামদায়কতা সাধারণতঃ সন্দেহজনক। এ গেল স্থানের কথা। এখন বুঝতে পারছ, আমি কী বলতে চাই।

আমি বললাম, তা হলে তোমার কথাতেই বলতে হচ্ছে যে, তুমি যা বলতে চাইছ তার ঠিক প্রকাশ হয় নি।

এতক্ষণে জ্ঞান খাওয়া শেষ করে বলল, আমি যে বলেছিলাম, তোমার মত কবিরা যা অনুভব করে তা সত্য বলে প্রকাশ করে খালাস, তার প্রমাণ তুমি লিখেছ, 'তখন আপেক্ষিকতা ছিল না'। অথচ আমাদের প্রতিটি সুখ, প্রতিটি আনন্দ বহু দুঃখানুবিদ্ধ, অর্থাৎ আপেক্ষিক।

শিবশঙ্কর অমনই বলে উঠল, তা তো বটেই, দুঃখ জয়েই সুখ। এ ছাড়া সাধারণ মানুষ আজ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন কোন সুখ আবিষ্কার করতে পেরেছে কিনা জানি না। মানুষের নানারকম ক্রীড়াকৌতুকে আনন্দ পাওয়াও এই দুঃখজয়রূপ সুখেরই প্রকারভেদ।

হ্যাঁ, কি বলছ সিতু, আমার দুধ খাওয়ার সময় হল? বিকেল হয়ে গেছে? বেশ, দুধ নিয়ে এস। কিন্তু তোমাকে বলে রাখছি, আমাদের এ রকম আমোদ-আলোচনায় দিন দশেক না যেতেই আমরা জ্ঞানকে হারালাম!

২

দুধ খাওয়া হলে দাদুকে বললাম, দাদু, তুমি বড় ক্লান্ত। আজ এই অবধিই থাক্। আবার কাল বোল।

দাদু বলল, না সিতু, তা হয় না। যখন একবার আরম্ভ করেছি, তখন শেষ না করা পর্যন্ত শান্তি নেই।

দাদু আবার বলতে শুরু করল, হ্যাঁ, কী বলছিলাম, আমরা তিন বন্ধুতে মিলে এ রকমে আড্ডা দিয়ে আর গ্রামের নানা স্থানে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করে বেড়াতে লাগলাম। কিন্তু এ রকম পাঁচ-ছ দিনের বেশী ভাল লাগল না। জ্ঞান বলল, চল, বাসায় এক অবৈতনিক প্রাথমিক ইস্কুল খুলে বসি, গ্রামের নিরক্ষরতা অপনোদনে সহায় হই।

আমাদের বাসায় ইস্কুল বসালাম, পড়ুয়ার সংখ্যা খুবই কম; কিন্তু বাড়তে শুরু হবার মুখে জ্ঞানকে হারালাম। চমকাচ্ছ কেন সিতু? হারালাম মানে আমাদের ইস্কুল-আড্ডা ইত্যাদি থেকে জ্ঞান অনুপস্থিত থাকতে লাগল। আমরা যে সময়ে ঘুম থেকে উঠে যোগীদতের তলব করতাম প্রাতরাশের জন্য সে সময়ে যোগীদৎ রোজই জানাত, জ্ঞানবাবু অতি প্রত্যুষে উঠে প্রাতঃভোজন শেষ করে বেরিয়ে গেছেন। সে ফিরত এত রাতে যে তখন আমরা 'সুপ্তিতে শয়ান'। দেখা হত শুধু দুপুরে খাওয়ার সময়ে, কিন্তু তখন সে এত ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে খেত যে আমাদের প্রশ্নের ভাল রকম কোন উত্তরই পেতাম না। খাওয়া শেষ হলেই সে আবার চলে যেত।

সেদিন আমরা ঠিক করলাম, জ্ঞানকে পাকড়াও করে তার এ রকম সরে থাকার জবাব আদায় করতে হবে, কেন না, সেই ছিল ইস্কুলটার উদ্যোক্তা। রাত্রে খাওয়ার পর আমরা তাই আলো কমিয়ে চুপ করে শুয়ে রইলাম জ্ঞানের অপেক্ষায়। আমরা যাতে না ঘুমিয়ে পড়ি তাই মাঝে মাঝে পরস্পরের সাড়া নিতে লাগলাম, শঙ্কর—সুবোধ···হঠাৎ হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকেই জ্ঞান আপন মনে বলল, ভেরি টায়ার্ড!

আমরা নিঃশব্দে শুয়েই রইলাম। খাওয়া-শেষে জ্ঞান হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল, ফোঁস করে এক গভীর নিঃশ্বাস তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। শিবশঙ্কর গম্ভীর গলায় অমনই বলল, জ্ঞান এলে? তুমি অমাবস্যার চাঁদের মত হয়ে উঠেছ! তোমার ব্যাপার কী, কিছুই বুঝছি না।

জ্ঞান বলল, বোঝবার কিছুই নেই, আমি একটা গবেষণায় ব্যস্ত। কাল একটু সকাল সকাল উঠো, চা খেতে খেতে এ সম্বন্ধে কিছু বলব; এখন ঘুমোতে দাও, বড় ক্লান্ত।

আমি এই সময়ে বলে উঠলাম, এ ক বছর কলকাতায় যথেষ্ট গবেষণা করেছ; এ গ্রামে বিশ্রাম করতে এসে আবার গবেষণার কী বিষয় পেলে?

জ্ঞান বলল, আশ্চর্য, সুবোধ এখনও ঘুমোও নি! এখানকার জমিদার ওমপ্রকাশ চৌধুরী এককালে বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ছিলেন, যৌবনে এই গ্রামে এসে বৃদ্ধ বাপের কাছ থেকে জমিদারির ভার নিয়ে তাদের বিরাট অট্টালিকার একাংশে এক লেবরেটরি করেন। আজ ওমপ্রকাশ প্রৌঢ়। তাঁর লেবরেটরি ধূলায় ধূসরিত হয়ে পড়ে ছিল। সেইটিকেই আমি কাজে লাগাচ্ছি আমার গবেষণায়। ওমপ্রকাশবাবু সব রকমে আমাকে সাহায্য করছেন কলকাতা থেকে লেবরেটরির নানান সরঞ্জাম আনিয়ে দিয়ে। বেশ লোক, যেমন সুন্দর দেখতে, তেমন চমৎকার ব্যবহার।

আমি বললাম, তা তো বুঝলাম, কলকাতায় গবেষণা করে মাথায় টাক পড়িয়েছ, এখানেও সে টাক বাড়িয়ে লাভ কী? তার সঙ্গে আ-কার যোগের ব্যবস্থা করতে পার, তবেই ভাল।

জ্ঞান হেসে বলল, টাকার কথা বলছ, তা হবে, আগে গবেষণায় কৃতকার্য হই।

শিবশঙ্কর বলল, আমাদের ইস্কুলের কথা তুমিই প্রথমে পেড়েছ অথচ ইস্কুল থেকে তুমি সরে থাকবে, তা হবে না।

জ্ঞান বলল, আমি খুবই দুঃখিত। এখন ঘুমোতে দাও, কাল সকালে এ সম্বন্ধে কথাবার্তা হবে।

আমি বললাম, এখানকার জমিদার-বাড়ি বোধ হয় আমি দেখেছি। ওই যে ছোট নদীটা, কী যেন নাম, গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে—সেই নদীর পাড় ধরে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। নদীর উঁচু পাড়ের উপর সরষে-ক্ষেত; তার ওদিকে হলদে সরষে ফুলের সঙ্গে সোনার অঙ্গ মিশিয়ে দাঁড়িয়েছিল এক সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী তরুণী। দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার কাছেই একটা পুরনো সেকেলে বড় বাড়ি—মনে হয়, এইটিই ওমপ্রকাশবাবুর বাড়ি।

জ্ঞান বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, ওইটিই ওমপ্রকাশবাবুর বাড়ি আর ওই তরুণীটি তাঁর একমাত্র মেয়ে।

এই সময়ে শিবশঙ্কর বলে উঠল, তাই বল জ্ঞান, তোমার গবেষণার বিষয় সজীব একটি—

জ্ঞান বাধা দিয়ে বলল, মোটেই না। যাকে লক্ষ্য করে তোমার এই ইঙ্গিত, তাকে আমি বরং ভয়ই করি। সে মাঝে মাঝে লেবরেটরিতে এসে অ্যাপারাটাস খুলে ফেলে, এখানকার জিনিস সেখানে করে আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। আর আবোল-তাবোল যা মুখে আসে তা-ই বলে—এসব করে কী হবে। বাবা এসব অনেক করেছে। স্বভাবের, প্রকৃতির কোন সত্যকে লেবরেটরির গণ্ডির মধ্যে এনে আবিষ্কারকের নবাবিষ্কার বলে আত্মতুষ্টি লাভ হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিতে যা থাকবার তা তো আছেই, আমরা জানি বা নাই জানি। তাই আমাদের জানার বহর যত বাড়তে থাকে ততই আমরা বুঝতে পারি আমাদের অজানার বহরটা। তাই জানা-অজানা আলো-অন্ধকার পাশাপাশি এগোতে থাকে। তাই আমাদের জ্ঞান-পথের শেষ আমরা খুঁজে পাই না। বৃত্তাকার পথে ঘুরে মরি। দেশে দেশে সমাজ-সভ্যতায় তাই দেখি পৌনঃপুনিক গতি। আমি বাধা দিয়ে বলি, এসব কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে? বৃত্তাকার পথটাকে আমরা সোজাও করে ফেলতে পারি, কিন্তু তার জন্যে কাজ করে যেতে হবে। সুতরাং আমাকে কাজ করতে দাও, গোলমাল কোর না। শুনছি, পাটনার কোন ইস্কুলে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে মেয়েটা।

শিবশঙ্কর বলল, মেয়েটির নাম কী?

জ্ঞান বলল, প্রকৃতি।

শিবশঙ্কর বলল, বাঃ চমৎকার, ঠিক প্রকৃতির মতই ব্যবহার বটে। বিজ্ঞানী চায় প্রকৃতিকে নানা দ্বার-পথে লেবরেটরির গণ্ডির মধ্যে এনে বন্দী করতে। কিন্তু প্রকৃতি রহস্যময়ী, কোন এক অজানা দ্বার-পথে বেরিয়ে এসে সে হেসে বলে, বন্ধন চিরন্তন নয়! বিজ্ঞানী প্রকৃতিকে ভালবাসে, তাকে লেবরেটরি-ঘরে ডেকে এনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে তার গোপন রহস্য জেনে নিতে চায়, তাকে ইচ্ছানুরূপ বন্ধনে বাঁধতে চায়।

আমি হেসে বললাম, তা হলে বিবাহ-বন্ধনেই বা আপত্তি কী?

জ্ঞান বলল, কী সব বাজে বকছ, ঘুমোতে দাও।

শিবশঙ্কর বলল, সুবোধ, তোমারও চান্স আছে। বিজ্ঞানী যখন প্রকৃতিকে চায় তার লেবরেটরির বন্ধনে, কবি তখন চায় তার ক্ষুদ্র গৃহকোণ থেকে বহু ঊর্ধ্বে, বহু দূরে নিজেকে বিস্তৃত করে দিতে ওতপ্রোতভাবে প্রকৃতির সঙ্গে। সুবোধ, তুমি কালই গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ করে এস।

জ্ঞান বলল, ওমপ্রকাশবাবু অভিজাত। গম্ভীর প্রকৃতির লোক তিনি, কথা হিসেব করে মেপে মেপে বলেন। তিনি চান না তাঁর মেয়ে পাড়ার শ্রমিকদের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে খেলে বেড়ায়। কিন্তু প্রকৃতি অন্য প্রকৃতির, সে সকলের সঙ্গেই সমানভাবে মেলামেশা করে।

শিবশঙ্কর বলল, তা তো হবেই, প্রকৃতির কাছে সব প্রাণীই সমান। বিজ্ঞানী যদি প্রকৃতির কাছ থেকে নিজের ইচ্ছামত কাজ আদায় না করতে চায়, তা হলেও প্রকৃতি তাকে নিজের থেকে সাহায্য করবে। প্রকৃতির বন্ধন চিরন্তন হবে।

জ্ঞান বলল, আঃ, সব সময়ে কী ঠাট্টা করছ; একটু সীরিয়স হও!

শিবশঙ্কর বলল, বেশ, তা হলে শোন। আদিমযুগ থেকে আধুনিক তথাকথিত সভ্যযুগ পর্যন্ত মানুষ একটা জিনিস পেয়ে বসে আছে, সেটা হচ্ছে তার চির-বর্তমান অবস্থায় অসন্তোষ। যেটা হয়ে থাকে সেটার সঙ্গে তার চিরকালের দ্বন্দ্ব; সে 'হয়'-কে তার 'হওয়া উচিত'-এ সব সময়ে পরিণত করতে চায়। প্রকৃতিকে বেঁধে সেই হিসাবেই সে কাজে লাগাতে চায়। তাই মানুষে যে রকম পরিবর্তন হল অন্যান্য প্রাণীতে সে রকমটা হল না। মানুষ ধীরে ধীরে নানান পোশাকে শরীর ঢাকল, মনও ঢাকল নানান পোশাকী কথায়। তাই ব্যষ্টির কাছে ব্যষ্টি আর সহজবোধ্য থাকল না, সমষ্টির কাছে সমষ্টি হয়ে দাঁড়াল একটা হেঁয়ালি। কিন্তু মানুষ তার 'হওয়া উচিতে'র জন্য 'হয়'কে ভুলতে পারল না, শুধু মনে ও শরীরে জটিলতাই বেড়ে গেল। তার শরীর হল সুকুমার। যে সব রোগে আদিম উলঙ্গ মানুষ পশুরই মত ছিল কতকটা 'ইম্‌মিউন্‌', আজকাল একটুতেই সে সেসব রোগে কাবু হয়ে পড়ে; অবশ্য তার বিজ্ঞান তাকে দিয়েছে রোগ-প্রতিষেধক ও রোগ-নিরাময়ক ঔষধ, কিন্তু রোগের বংশবৃদ্ধি কমে নি। যান্ত্রিক সুবিধায় দশজনের কাজ একজন সামান্য অঙ্গুলি-চালনায়ই করতে পারে, তাই মানুষ শারীরিক শক্তিহীন হয়ে পড়ছে। মনের দিক থেকে, সেই আদিম জৈব প্রবৃত্তি দুটিকে অর্থাৎ আহার ও বিস্তারকে ভুলতে পারে না; তাই তার 'হওয়া উচিতে'র চাপে সেগুলো প্রকাশ পায় নানান জটিল পথে। মাঝে মাঝে এই প্রকাশ এত বীভৎস যে মানুষেতর সাধারণ জীবের পক্ষে তা প্রায় অসম্ভব, কারণ এই মানুষ-কথিত নিকৃষ্ট জীবরা প্রকৃতির নগ্নবিধান মেনে চলে। কিন্তু পশুদের বলবার কিছু নেই, বৈজ্ঞানিকের বন্দুক তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। প্রয়োজনাতিরিক্ত পশুদের মানুষ শেষ করে এনেছে, মানুষের বিস্তারে পৃথিবী ভরে আসছে; কিন্তু পশুরা মানুষের বিচারালয়ে নালিশ পাঠাবে না যে, তাদের রাজত্বে মানুষ অনধিকার প্রবেশ করে জঙ্গল জ্বালিয়ে নিজেদের বাসস্থান বানিয়েছে। তারা এ কথাটাই জানে ও মানে যে, জোর যার মুলুক তার। মানুষ কিন্তু মুখে বলে, আরে ছিঃ, এটা হল পশুশক্তির কথা; আমরা বিচার-বিবেচনা করে যেটা ন্যায়সঙ্গত সেটাই করব। স্বার্থের সংঘাতে ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে, সমষ্টিতে সমষ্টিতে অনৈক্যের সৃষ্টি করে; একজনের ন্যায় আর একজনের কাছে অন্যায় মনে হয়, পরস্পর পরস্পরের অন্যায় প্রমাণ করতে তর্কের তুবড়ি ছোটায়। আপন দোষ লুকিয়ে অপরের দোষ বড় করে প্রচার করতে গিয়ে কথার লুকোচুরি খেলা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় সেই আদিম পশু-প্রবৃত্তি, 'জোর-যার-মুলুক-তার'ই সত্য; অবশ্য মানুষের বেলায় এ জোর কেবল শারীরিক শক্তিই নয়, নানান আনুষঙ্গিক শক্তিও।

এ সব ভাবলে মনে হয়, মানুষের তথাকথিত 'মনুষ্যত্ব' এত না থেকে যদি সাধারণ 'জীবত্ব' বেশী পরিমাণে থাকত তা হলে জ্ঞান, তুমি অকপটে স্বীকার করতে, প্রকৃতির মত সুন্দরী যুবতীকে তুমি শুধু ভয়ই কর না, আরও কিছু কর।

জ্ঞান দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেসে বলল, এতক্ষণে বুঝলাম যে কথাটুকু বলবার জন্য তুমি এই দীর্ঘ লেকচার দিলে তাতে তোমার দার্শনিকতার প্রশংসা করছি, কিন্তু সব ক্ষেত্রে তোমার সঙ্গে একমত হতে পারছি না।

আমি বললাম, কিন্তু জ্ঞান, যে ভূতের ভয় করে তাকেই ভূতে ধরে, সুতরাং প্রকৃতি থেকে সাবধান।

জ্ঞান বলল, যদিও আমি প্রকৃতির কথার উপর কোন গুরুত্ব দিই না তবুও বলতে হচ্ছে, শঙ্কর এত কথায় যা বলতে চেয়েছে প্রকৃতি দু কথায়ই তা একদিন আমাকে বলেছিল। সে বলেছিল, আপনারা ভাবতে পারেন মানুষের সুখৈশ্বর্য বাড়াচ্ছেন, কিন্তু আমি জানি, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক কিছু হারাচ্ছেনও। মানুষ যখন পশুর মত ছিল তখন সে পশুর মতই প্রাকৃতিক সহায়তা পেত; যতই সে তথাকথিত উন্নত হচ্ছে ততই সে এ সহায়তা হারাচ্ছে। শীতপ্রধান দেশে শীতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশুর গায়ে হয় বড় বড় লোম, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তা হয় না, দরকারও নেই; এই ব্যবস্থা করে প্রকৃতি। কিন্তু মানুষ এই ব্যবস্থা করে নিজেই স্থান-কাল-উপযোগী পোশাক পরে, গ্রীষ্মে পাতলা জামা, শীতে মোটা গরম জামা। জলে পড়ে গেলে পশুরা আপনা থেকেই প্রকৃতির সহায়তায় কম বেশী সাঁতার দেয়, কিন্তু মানুষকে সাঁতার শিখতে হয় তার উন্নত ভারী মাথার জন্য, বোধ হয়!

শিবশঙ্কর বলল, প্রকৃতি ঠিক প্রকৃতির উপযুক্ত কথাই বলেছে।

জ্ঞান বলল, যাক, আমি আর কিছুই বলব না। আর কোন রকম উত্তর আমার কাছ থেকে পাবে না, আমি ঘুমলাম।

অনতিবিলম্বে জ্ঞানের নাসিকাধ্বনি শোনা গেল। শিবশঙ্করও নিঝুম। আমার কিন্তু ঘুম এল না। আধ-জাগা, আধ-তন্দ্রায় নানান অদ্ভুত স্বপ্নের টুকরো মনের আকাশ আবিল করে তুলল। শেষে লণ্ঠন জ্বেলে লিখতে আরম্ভ করলাম:

আলোর যেন আকৃতি আছে, আর অন্ধকার নিরাকার। অন্ধকার তাই সঙ্কুচিত আবার উদার-প্রশস্তও। অন্ধকার সাদা কাগজ, আলো হিজিবিজি কাটা কাগজ। সাদা কাগজে ইচ্ছামত রাঙিয়ে ছবি আঁকতে পারি, কিন্তু হিজিবিজি কাগজে তা সম্ভব নয়। যে বাস্তবতা চর্মচক্ষে সামান্যই, কবি বা দার্শনিকের কল্পচক্ষে তা অসামান্য অসীম হয়ে উঠতে পারে। আঁধার আমাদের বাস্তিতে যে

রূপ দেয়, আলো তা পারে না; কালো তাই আলোর চয়েও আলোকময়; কালো কৃষ্ণের প্রেমে তাই রাধিকা ব্যাকুল—

আর মনে পড়ছে না সিতু, আরও কত কিছু লিখেছিলাম। তারপর হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়লাম।

৩

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ির তিন তলার উপর থেকে নীচে বড় রাস্তায় চলমান ট্রাম ও বাসের ঠুন-ঠুন ও ভেঁপুর শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। আমার সামনে ইজি-চেয়ারে অর্ধশায়িত দৃষ্টিহীন দাদু বলে চলল, বুঝলে সিতু, ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি, বেলা হয়েছে; রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়ায় শরীরে আলস্য ও চক্ষে জড়তা রয়েছে। ঘুম থেকে ঠেলে তুলে শিবশঙ্কর আমাকে বলল, কত ঘুমবে সুবোধ? জ্ঞানকে চায়ের টেবিলে আটকে রেখেছি, তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এস।

চায়ের টেবিলে গিয়ে দেখলাম, জ্ঞান চা ঢালছে আর বলছে, মানুষের কী ছিল তা দিয়ে আমার দরকার নেই। মানুষের যে জ্ঞানবুদ্ধি আছে তাকে মানুষের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করা উচিত।

শিবশঙ্কর বলল, কিন্তু তোমার 'উচিত'-কে মানুষ সমুচিত সম্মান দেখায় না। কবিরা দেশপ্রেমের গান গেয়ে, নানান 'ইজম্'-পন্থীরা নিজ নিজ 'ইজম্'য়ের প্রচারে মানুষকে করে তোলে ব্যষ্টির জন্য বা যে সমষ্টির সে অন্তর্গত তার জন্য স্বার্থান্ধ। তার এ রকম স্বার্থ-দৃষ্টি দিয়ে সর্ব জগতের কল্যাণকর কিছু দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

আমি এ সময়ে চেয়ারে বসে বললাম, শঙ্কর, তোমার দার্শনিকসুলভ বিশ্বপ্রেমের বাণী থামাও। কোন লোক বা কোন জাতি শুরুতেই গাছের আগায় উঠতে পারে না। সকল প্রেমের গোড়া হল আত্মপ্রেম। মানুষ নিজেকেই ভালবাসে সবচেয়ে বেশী। সে যখন পরিবার নিয়ে বাস করে তখন তার আত্মপ্রেম বিস্তৃত হয় তার পরিবার-ভুক্ত সকলের মধ্যে। এটাই হল তার দেশপ্রেম ইত্যাদি সকল প্রেমের গোড়ার কথা। বিশ্বপ্রেম পর্যন্ত উঠতে হলে তাকে ধীরে ধীরেই উঠতে হবে। এ সব কথা এখন রেখে, তুমি যখন আমার ঘুম ভাঙালে তখন যে মজার স্বপ্ন দেখছিলাম সে কথাটা শোন।

জ্ঞান বলল, সেই ভাল, সুবোধ বলতে থাক আর আমি ততক্ষণ লুচিগুলোর সদ্ব্যবহার করি।

আমি বললাম, লুচিতে যে তোমার রুচি বেশী তা জানি, কিন্তু শঙ্করের ঠেলাঠেলিতে জেগে ওঠবার আগেই আমি দেখলাম, তোমার রুচি কলহে। একটা বাগানের মত জায়গা, জমিদার-পুত্রী প্রকৃতির সঙ্গে জ্ঞানের ভয়ানক বচসা হচ্ছে; তারপরেই যেন দেখলাম, জ্ঞান প্রকৃতির একটা হাত মোচড়াতে চাইছে। প্রকৃতির কিন্তু হাসিমুখ, আর তার হাতটা একেবারে শ্বেতপাথরের হয়ে গেছে, জ্ঞান সে হাত মোচড়াতে গিয়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে···

এই সময়ে শিবশঙ্কর বলে উঠল, তা তো হবেই, প্রাকৃতিক শক্তিকে বিজ্ঞান কোনদিন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারে পাবে কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

তাতে জ্ঞান বলল, দেখ শঙ্কর, আমরা তোমাদের মত সন্দেহবাদী নই, আমরা সত্যের মন্দিরে বিশ্বাসী কর্মবীর। আমরা আশাবাদী, দূর ভবিষ্যতে কী হতে পারে বা না হতে পারে তা ভেবে আমরা নিশ্চেষ্ট নই; প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে আমরা সদাই চেষ্টা করে চলব এবং প্রাকৃতিক শক্তির যতটা সম্ভব ততটা মানুষের সুখ-সুবিধায় কাজে লাগাতে চাইব।

শিবশঙ্কর বলল, চাওয়া-পাওয়ার ভারসাম্য যথোচিত স্থিরীকৃত না হওয়া পর্যন্ত শুধু মানুষের আমিত্বের, বাসনার, আবিষ্ক্রিয়ার উত্তেজনায় কিছু চেষ্টা করা উচিত নয়, তা হলে সেটা হবে দুশ্চেষ্টা।

জ্ঞান বলল, বুঝলাম না।

আমি বললাম, কী মুশকিল! আমি বললাম আমার স্বপ্নে-দৃষ্ট বচসা-দৃশ্যের কথা প্রকৃতি ও জ্ঞানকে নিয়ে, আর তোমরা এনে ফেলছ নানান তত্ত্ব ও তথ্য প্রকৃতি ও বিজ্ঞানকে নিয়ে।

জ্ঞান হেসে বলল, ঠিক বলেছিস সুবোধ, এই জ্ঞান আর বিজ্ঞান দুই আয়ত্তে আনতে পারবে প্রকৃতিই, জমিদার-পুত্রী প্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি!

আমি বললাম, এই তো চাই; তুমি বলছিলে কিনা সে তোমার বিজ্ঞান-সরঞ্জাম এদিক-ওদিক করে তোমাকে ব্যস্ত করে তোলে, তাই তুমি তাকে ভয় কর; এতে কেমন সন্দেহ হচ্ছিল।

শিবশঙ্কর বলল, আমার কিন্তু মনে হয়, প্রকৃতির মত মেয়েকে করায়ত্ত করা জ্ঞানের কর্ম নয়; সুবোধ বরং চেষ্টা করে দেখতে পার।

আমি বললাম, আমি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে মানি, তার জীবন্ত সত্তাকেও মানি; আধুনিক ফলিত বিজ্ঞানের সজীবতাকেও না মেনে উপায় নেই। তোমার মত দার্শনিকের বাদ-প্রতিবাদকেও মানি। যদি নাকি আমার সৌন্দর্যবোধ ব্যাহত না হয়। আমার শুধু ভয় হয়, মানুষের আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা যেদিকে চলেছে সেদিকে পুরুষ হয়ে চলেছে হৃদয়হীন ধন-আহরণের যন্ত্রবিশেষ আর স্ত্রী হৃদয়াবেগশূন্য বংশরক্ষার কবচ যেন!

জ্ঞান বলল, কিন্তু শঙ্কর, আমাদের চেষ্টাকে দুশ্চেষ্টা বলছিলে কেন? বিজ্ঞান কি মানুষের যথেষ্ট ভাল করে নি? অবশ্য, যুদ্ধের সময়ে এক পক্ষের তথাকথিত ভাল করতে গিয়ে অপর পক্ষের ক্ষতি করেছে; তবু তাতেও ফলিত বিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। আসলে, মানুষের হননেচ্ছা বন্ধ হলে বিজ্ঞানকে আর বন্দুক বানাতে হয় না। বিজ্ঞানের কাজ তখন হবে শুধু গঠনমূলক। পৃথিবীময় রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা যেন এই চেষ্টাই করে যাতে জগৎজোড়া একাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

শিবশঙ্কর বলল, তুমি কি বলতে চাও, মানুষের হননেচ্ছার প্রতীক হল বিজ্ঞানের বন্দুক? তা হলে বলতে হয় মানুষের কাপুরুষতার প্রতীকও ওই বন্দুকই! ছেলেবেলায় কারুর সঙ্গে লড়াই করে না পারলে দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে মারতাম; ঢিল ছোড়া কি বন্দুক ছোড়ার সামিল নয়?

আমি বাধা দিয়ে অমনই বললাম, শঙ্কর, তোমার ওই এক দোষ, কোন গুরুত্বপূর্ণ কথার সঙ্গে লঘু কথা মিশিয়ে ফেলা।

জ্ঞান বলল, বিজ্ঞানের দানে পৃথিবীটা ছোট হয়ে আমাদের ঘরের কোণে এসে গেছে। এখন অজ্ঞাত-অখ্যাত অংশের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানে বাধা নেই। যেখানকার যা ভাল তা সংগৃহীত হবে সকলের জন্য। বিজ্ঞানের সহায়তায় পৃথিবীজোড়া ভালর জয়যাত্রা হবে। পত্তন হবে জগৎজোড়া সাধারণতন্ত্রের, পৃথিবীময় সকলের সমান অধিকার, সকলের সমান সুযোগ, সকলের সমান সম্মান।

শিবশঙ্কর বলল, বাঃ চমৎকার, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের কত সহজ মীমাংসা! কিন্তু জ্ঞান, তোমাকে উদাহরণ দিয়ে একদিন বলেছিলাম, ভাল স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে মন্দ হয়ে যেতে পারে। আর তা ছাড়া, পোশাকী মানুষ রঙ-বেরঙের পোশাকেই শুধু শরীর ঢাকে না, মনও ঢাকে নানান কথার রঙে আর চোখেও থাকে নানা রঙের চশমা—চশমার কাচ তার ব্যক্তিগত ও বংশগত বিশ্বাসের রঙে রঙিন! মহাসম্মেলন নানা সময়ে নানা স্থানে পৃথিবীর বুকে বসছে, কিন্তু স্থায়ী মীমাংসা হচ্ছে না, শুধু কথার লুকোচুরি খেলা বেড়ে চলেছে; কিংবা এক পক্ষ জোর করে বলছে, জিনিসটা নীল, অপর পক্ষ তেমনই জোর করেই বলছে, না, জিনিসটা লাল; কেন না, একজনের চোখে নীল চশমা, আর একজনের চোখে লাল চশমা; জিনিসের আসল রঙের কেউই খোঁজ করতে চায় না। তা ছাড়া সকলের সমান কিছু থাকাটাও স্বাভাবিক নয়।

পৃথিবীতে স্তরতারতম্য একটা অতি স্বাভাবিক সত্য; আবার এটাও অনস্বীকার্য সত্য যে, এই স্তরতারতম্য সব সময়েই সমান হতে চাইছে। এতেই জীবন-চাঞ্চল্য বজায় থাকে। নদী উচ্চ স্তর থেকে বয়ে চলে নিম্ন স্তরে, যা কিছু বদ্ধ পচা তা ভাসিয়ে নিয়ে যায়; আবার নীচু জায়গা পলি দিয়ে ভরাট করে উঁচু করে তোলে এক উর্বর শস্যক্ষেত্ররূপে।

জ্ঞান বাধা দিয়ে অমনই হেসে বলে উঠল, বিদ্যুৎ-প্রবাহও বহে উচ্চ 'পোটেন্‌শিয়াল' থেকে নিম্ন 'পোটেন্‌শিয়াল'-এ, তাপ-প্রবাহও বহে উচ্চ তাপ থেকে নিম্ন তাপ অভিমুখে। বিজলী-তরঙ্গ বিজলী-বাতির মাধ্যমে আমাদের দেয় আলো আর তাপ-তরঙ্গ আমাদের চায়ের জল গরম করে। শঙ্কর, যোগীদৎকে আর একটু চায়ের ব্যবস্থা করতে বল।

শিবশঙ্কর বলে চলল, সে হবে। দেখ, এই স্তর-তারতম্য মানুষ-সমাজেও চিরকাল ব্যষ্টিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে বিদ্যমান আছে। সকল মানুষ সমান সুযোগ, সমান মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়ে জন্মায় না; বংশগত ও জন্মগত কারণে মানুষে মানুষে যেমন শারীরিক অবয়বে ব্যবধান, মানসিক অবয়বেও তাই; এ সবের জন্য ব্যষ্টিগত স্তরতারতম্য। ভাষাগত, দেশগত, ধর্মগত, রাজনীতিগত ইত্যাদি দিক থেকেও সকল মানুষ-গোষ্ঠী সমান নয়; তাই সমষ্টিগত স্তরতারতম্য। এই সব স্তরের মধ্যে চিরকালই হয়ে আসছে দ্বন্দ্ব ও লড়াই, তথাকথিত নিম্নস্তরের মানুষ বা মানুষ-গোষ্ঠী উচ্চস্তরে উঠতে চায়; এও স্তর-ব্যবধানের সমান হতে চাওয়া। এই কারণে পুরাকালে হত 'ক্রুসেডে'র মত ধর্মযুদ্ধ, এখন হয় নানান রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে যুদ্ধ; ব্যাপার একই, স্তরতারতম্য ও স্তরতারতম্যের সমান হতে চাওয়া। আগেই বলেছি, প্রকৃতির রাজ্যে এ দুটোই স্বাভাবিক, এতেই গতি ও প্রাণ-চাঞ্চল্য বজায় থাকে। কিন্তু যখন মানুষের আধুনিক বিজ্ঞান ছিল না তখন এই সব লড়ায়ে যে শক্তি ক্ষয়ে মরত দশজন, এখন আধুনিক বিজ্ঞানের সহায়তায় সেই শক্তিতে মরে হাজার হাজার জন। আবার মানুষের প্রতি সুখটি এত দুঃখানুবিদ্ধ যেন বিস্তৃত মরুভূমির মাঝে মরূদ্যানের মত, তাই সুখ উপভোগ্য ও মহার্ঘ। এই কারণে আধুনিক বিজ্ঞান যখন মানুষের সুখ বাড়াতে গেছে তখন সেই অনুতাপেই দুঃখ না বাড়িয়ে পারে নি; ফলে দুঃখের ভাগই বেড়ে গেছে অনেক।

জ্ঞান এ সময়ে বাধা দিয়ে বলল, আমিও আপেক্ষিক সুখের কথা সেদিন সুবোধকে বলেছিলাম, কিন্তু এটাও ঠিক যে, মানুষের মাঝে শুধু বেঁচে থাকাটাই কত আনন্দের হতে পারে; কি বল সুবোধ, তুমি তো কবি?

আমি বললাম, নিশ্চয়ই, ভালভাবে বেঁচে থাকা তো আরও সুখের; আর তার জন্য চাই আধুনিক বিজ্ঞানের দান—সুখ-সরঞ্জাম। তারপর ইজি-চেয়ারে শুয়ে শুয়ে নানান দার্শনিক মতবাদ চিন্তা করা যাবে।

শিবশঙ্কর বলল, ঠাট্টা রাখ, গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছু আলোচনার সময়ে বিষয়টিকে খেলো করে দেবার জন্য তোমাদের সব আজে-বাজে কথা বলা অভ্যাস।

আমি বললাম, দেখ শঙ্কর, যা জানা তার দিকে আমার আকর্ষণ নেই, যা অজানা তার দিকে তো আকর্ষণের প্রশ্নই ওঠে না; যেটা জানা-অজানাময় আলো-ছায়ায় খেলা করে তারই রহস্য কবিকে আকুল করে।

শিবশঙ্কর ঠাট্টা করে বলল, বেশ তো, তোমার কল্পনা-কাননে গিয়ে তার সঙ্গে তুমি খেলা কর, আমরা বাধা দেব না।

আমি বললাম, কল্পনা? কল্পনাই তো বটে, পৃথিবীর কতটুকু বাস্তব আর কতখানি কল্পনা, তার আজও স্থির-নির্ণয় হয় নি। যদি বলি জাহাজ, জাহাজ হাতে নিয়ে বলি না; তোমরাও কল্পনায় জাহাজ বলতে যা বোঝায় তা স্থির করে নাও। এই রকমে বেশীর ভাগ জিনিসকেই আমরা 'রিপ্রেসেন্ট' করি, 'প্রেসেন্ট' করতে পারি না; তবেই বুঝতে পার, কতখানি কল্পনা আর কতটুকু বাস্তব।

এক গেলাস জল দিয়ো তো সিতু।

জল খাওয়া হলে দাদুকে বললাম, দাদু, রাত হয়ে গেছে, আজ এই অবধিই থাক, কাল আবার বোল, এখন খেয়ে-দেয়ে ঘুমোও।

দাদু বলল, না, তা হয় না সিতু, রাত্রে আমার ঘুম হবে না, আমাকে শেষ করতে দাও, আর বেশী বাকী নেই।

৪

নৈশ আহারের পর দাদু আরাম-কেদারায় আরাম করে লম্বমান হলেন, তারপর বললেন, বুঝেছ সিতু, সেদিন আর জ্ঞানের লেবরেটরিতে যাওয়া হল না, সে চটেও গেল বেশ, বলল, সমস্ত সকালটা তোমাদের সঙ্গে বাজে তর্ক করে সময় নষ্ট হল। এ তর্কের কার্যকরী মূল্য কতটুকু? অথচ এর জন্যে আমার ক্ষতি হল এক্‌স্‌পেরিমেন্টের।

আমি বললাম, বেশ তো, তোমার এক্‌স্‌পেরিমেন্টের দিকটা বোঝাও না।

জ্ঞান বলল, তোমাদের সঙ্গে আর একটুও সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমাদের সঙ্গ ছাড়তে হবে দেখছি।

শিবশঙ্কর অমনই বলে উঠল, জ্ঞান, তুই এ কথা বলতে পারলি—শুধু একটা সকাল তোর নিয়েছি বলে; আমাদের আশৈশব বন্ধুত্বের একটুকুও দাবি নেই? যাক, বোঝা যাচ্ছে, তোমার এহেন ভাষণ তোমার লেবরেটরির

অ্যাপারাটাসের আকর্ষণে নয়, সজীব প্রাণবন্ত কোন কিছুর আকর্ষণে!

জ্ঞান আরও রেগে বলল, দেখ, আমরা কবি নই, আমরা বিজ্ঞানী। আমরা জানার দেশে অজানার বহর বাড়াতে চাই না; লেখার কৌশলে সুস্পষ্ট-দৃষ্ট গতানুগতিকে অজানার রহস্য আরোপ করতে চাই না; আমরা বরং অজানার রহস্য কমাতে চাই জানার গণ্ডির মধ্যে তাকে এনে! আমাদের কাছে রাখা-ঢাকা দেওয়া রহস্যসৃষ্টি নেই; সব জিনিসকে আমরা পরিষ্কার আলোর মধ্যে এনে খোলাখুলি ভাবেই প্রকাশ করতে চাই। তুমি ভাবছ,- জমিদার-পুত্রীর আকর্ষণ বন্ধুবিচ্ছেদের কারণ হতে চলেছে, তা মোটেই নয়; আমি আমার অ্যাপারটাসের আকর্ষণের কথাই বলছিলাম।

শিবশঙ্কর গম্ভীর হয়ে বলল, তা হবে; আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক যুগের ধর্মই এই, যন্ত্র মানুষের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, মানুষ ভুলেছে যে মানুষই এই যন্ত্রের স্রষ্টা!

আমি বললাম, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? জগৎপাতা পরমেশ্বর যদি সব কিছুর স্রষ্টা হন তবে তাকেই বা কে মানে? সবকিছুর বিচার মানুষই করে তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা-বিশ্বাস দিয়ে, পরমেশ্বরের নামে ছেড়ে দেয় না।

শঙ্কর বলল, কিন্তু মানুষের ক্রমবিকাশের সঙ্গে তার জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা-বিশ্বাস বদলায়। তাই, মানুষের বিচার সর্বকালের সর্বস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে সুবিচার কখনই হতে পারে না; তবুও মানুষ ঈশ্বরের বা প্রকৃতির হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। এখানেই মানুষের আমিত্ব। সে যে বলে, সে শ্রেষ্ঠ আর সব মানুষেতর প্রাণী, তার মূলে তার এ আমিত্বও আছে! তবে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে মানুষ যেমন অনেক কিছু মেনে নিয়েছে ও বানিয়েছে সেই প্রয়োজনের তাগিদেই ভগবানে বিশ্বাস দরকার হতে পারে; জগৎ-পাতার সত্য-স্বরূপ ঠিক কি রকম তা জানবার দরকার হয় না। সত্যের চেয়ে মিথ্যার প্রয়োজন সাধারণ মানুষের অনেক বেশী হতে পারে। মানুষ সামাজিক জীব; তার সমাজ যখন তার দুঃখভার লাঘব করতে পারল না তখন সে ভগবানকে ডেকে তাঁর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে শান্তি পেল। অন্ধের যেমন যষ্টি দরকার, তারও তেমন ভগবানে বিশ্বাস দরকার হতে পারে—যেন সব কিছুই স্বার্থের খাতিরে, প্রয়োজনের তাগিদে।

জ্ঞান বলল, সে যার খাতিরেই হোক, মানুষের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মানুষেরই সেবা। ভগবান নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী?

আমি বললাম, শঙ্কর, তুমি বলছ মানুষের সব কিছু স্বার্থের খাতিরে, তা হলে বুদ্ধদেবের মত রাজার ছেলের সব ত্যাগ করে যাওয়া কার খাতিরে হল?

শিবশঙ্কর বলল, আমি দুঃখজয়-রূপ সুখান্বেষী সাধারণ মানুষের কথা বলছি; বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণদেব, এঁরা ঠিক সাধারণ মানুষ নন, এঁদের স্বার্থটাও তাই অনন্যসাধারণ। শরীরের যেমন একটা অ্যানোটমি আছে, বোধ হয় মনেরও এরকম একটা কিছু আছে। শরীরের যেমন চামড়ার তলে মাংস, তার তলে হাড়, হাড়ের ভেতরে মজ্জা, মনও সেই রকম স্তরে-স্তরে গভীর স্তরে নেমে গেছে। এঁরা মনের কোন্ স্তরের সে সম্বন্ধে আমার সম্যক্ জ্ঞান নেই। তবে সাধারণ মানুষের সত্য-মিথ্যায় কিছু যায় আসে না, প্রয়োজনের তাগিদে যা দরকার তা পেলেই হল। আমরা উন্নতজীব মানুষ, জীবসাধারণের মত প্রকৃতির উপর প্রায় সবটাই নির্ভরশীল হতে চাই না। জমিদারের মেয়ে যে জ্ঞানকে বলেছিল সে-কথা আমাকেও বলতে হচ্ছে যে, মানুষ শীত-তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য উপযুক্ত কোট নিজেরাই বানিয়ে নেয়—গরমের দিনে পাতলা কোট, শীতের দিনে মোটা গরম জামা; কিন্তু অন্যান্য জীবরা শীতপ্রধান স্থানে প্রকৃতির কাছ থেকেই বড় বড় রোমরাশির মত ব্যবস্থা পায়, গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে এর বিপরীত ব্যবস্থা। তারা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল, তাই প্রকৃতি তাদের সাহায্যও করে। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির উপর না নির্ভর করে আপন ইচ্ছামত তার কাছ থেকে কাজ আদায় করতে চায়, তাই প্রকৃতির প্রতিশোধও যেন নানান দিক থেকে বেড়ে চলেছে। কোন দুঃখদায়ক প্রাকৃতিক রহস্যকে আয়ত্তে আনতে না আনতেই তারই এক নতুন রূপ নতুন করে যন্ত্রণা দিতে শুরু করে।

জ্ঞান এতক্ষণ চুপ করেছিল, এখন বলে উঠল, ক রকম?

শিবশঙ্কর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল, যেমন নাকি তোমাদের অণুবীক্ষণ যন্ত্র আর জীবাণুর ব্যাপার। খালি চোখে যে-সব জীবাণু দেখতে পারছিলাম না, তোমাদের অণুবীক্ষণ সে-সব দেখাল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো রোগের কারণ হয়ে থাকবে। কিন্তু তোমাদের অণুবীক্ষণের 'ম্যাগনিফিকেশন'-এর কি কোন সীমা আছে? তাই নব-নব রোগ-বীজাণু আবিষ্কারেরও কোন সীমা নেই এবং তার বৈজ্ঞানিক প্রতিষেধকগুলিরও। অর্থাৎ, প্রকৃতির রোগবীজাণু-রূপ বিপর্যয়ের চরম নিষ্পত্তি হওয়া প্রায় অসম্ভব, একটা জীবাণুর পর আর একটা জীবাণু-রহস্য মানুষকে যন্ত্রণা দিয়ে চলবে।

শিবশঙ্কর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দূর আকাশের দিকে চেয়ে থাকল, তারপর বলল, বুদ্ধিমান জ্ঞানী মানুষের কূটনৈতিক বুদ্ধি যে-সব স্বরচিত অন্ধকূপের সৃষ্টি করেছে সেগুলোও সাধারণ মানুষকে যে কোন সময়ে তলিয়ে দিতে পারে।

কিছুক্ষণ থেমে শিবশঙ্কর আবার বলে চলল, দেখ,

আমরা যেন খুবই পরিশ্রান্ত সাঁতারু, যে কোন মুহূর্তে ডুবে যেতে পারি; এমত অবস্থায় সত্যের চেয়ে মিথ্যার প্রয়োজনই আমাদের কাছে বেশী। তুমি যদি আমাকে সত্য বল যে, আমি যখন-তখন ডুবে যেতে পারি তা হলে নিরাশ হয়ে তখনই হয়তো ডুবে যাব। আর যদি মিথ্যা বল যে, আমি সহজেই নদী পার হতে পারব তা হলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ সাঁতার দিতে পারব। তাই এমন অবস্থায় আমার দরকার মিথ্যার। প্রকৃতির উপর অনির্ভরেচ্ছু কূটনীতিজ্ঞানী মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিশোধে ও সখাতসলিলে নিমজ্জমান সাঁতারু ছাড়া আর কী? অতি পুরাতন কথাটাকে আবার বলতে হচ্ছে, আমাদের বাঁচাটাই আশ্চর্যজনক, মরাটাই খুব সহজ।

জ্ঞান বলল, তোমার চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের আমরা একমত নই। উন্নত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আমলে আমরা পরিশ্রান্ত সাঁতারু নই। ভাসমান অবস্থাটাই আমাদের পক্ষে সহজ, ডুবে যাওয়াটাই আশ্চর্য।

জ্ঞানের আর লেবরেটরি যাওয়া হল না। দুপুরে ভোজন-শেষে সে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। বলল, লেবরেটরিতে যখন যাওয়া হল না তখন দিবা-নিদ্রায় পূর্ণ বিশ্রাম নেব।

এদিকে পড়ুয়ারা আসতে শুরু করল আমাদের ইস্কুলে পড়তে। শিবশঙ্কর বলল, জ্ঞান, উঠে মাস্টারি কর, তোমার কথামতই এ ইস্কুল স্থাপিত হয়েছিল।

জ্ঞান বলল, ছুটি দিয়ে দাও একটা কোন কারণ দেখিয়ে।

শিবশঙ্কর বলল, তা তো বটে, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কার্য-কারণময় জগতে কারণ ছাড়া কেউ কিছু বিশ্বাস করে না; বেশ, ইস্কুল ছুটি দেবার কারণটা কী শুনি?

জ্ঞান বিরক্ত হয়ে বলল, কেন এত বকছ শঙ্কর? আমি ঘুমব; এতদিন তো তোমরাই কষ্ট করে পড়িয়েছ, আজও দয়া করে পড়াও।

৫

দাদু বলে চললেন তার জাতক:—যা হোক, যোগীদৎ-দেওয়া প্রাতরাশ শেষ করে আমার চিরাচরিত লেখা শুরু করলাম, বেশ কিছুটা লিখেছি—

এমন সময়ে শিবশঙ্কর এসে বলল, কী লিখছ সুবোধ?

আমি আমার লেখাটা পড়ে শোনালাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, এতক্ষণ ছিলে কোথায়?

শিবশঙ্কর বলল, তুমি ঘুমচ্ছ দেখে জ্ঞানের সঙ্গে তার লেবরেটরি দেখতে গেলাম।

আমি বললাম, কী দেখলে? প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ হল?

শিবশঙ্কর বলল, যতদূর মনে হল, প্রকৃতি চমৎকার বুদ্ধিমতী মেয়ে। তবে জ্ঞানের ব্যাপারটা আমার বিশেষ ভাল লাগল না; সে সুস্থ মানুষের তাজা রক্ত নিয়ে কী সব পরখ করছে!

আমি জিজ্ঞাসু হয়ে বললাম, ব্যাপারটা কী বল তো?

শঙ্কর বলল, ব্যাপারটা যা বুঝলাম তাতে ও বলতে চায়, একজন অতিমানব ও একজন পাগল বাহ্যতঃ একই রূপ। খুব শিশু ও খুব বুড়োতে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। খুব বড় দিকে চিন্তা করতে করতে মানুষ হারিয়ে যায়, খুব ছোট দিকেও তার একই অবস্থা। 'স্যাকারিন' অতি মিষ্টতায় পরিণত হয়েছে তিক্ততায়! আমরা রামকে, যিশুখ্রীষ্টকে মনে রাখি, অমরত্ব দিয়েছি; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাবণকে, তৈমুরলঙ্গকে ভুলতে পারি না, তারাও অমরত্ব পেয়ে গেছে। আমাদের জন্ম-মৃত্যু আজও রহস্যাবৃত, ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-সবে মনে হয়, দুটো উলটো দিকের শেষে যারা আছে, তাদের গুণাগুণে বেশ সাদৃশ্য আছে। এই অবস্থাটা যদি একটি সোজা লাইনে ব্যক্ত করা যায়, তা হলে লাইনটির আরম্ভে ও শেষে যারা আছে, তাদের মধ্যে নানান সাদৃশ্য দেখা যাবে। এ রকম কেন হয়, সেটা বোঝাতে জ্ঞান বলে যে, এই লাইনটির আরম্ভ ও শেষটা একই জায়গায় ভেবে নিতে হবে; অর্থাৎ একটি নিখুঁত গোলাকার বৃত্তকে আঁট-সাঁট ভাবে বেষ্টন করতে হবে এই লাইন দিয়ে যাতে লাইনটির দু দিকের শেষ একই বিন্দুতে এসে মেশে। যা হোক, জ্ঞানের এখন পরীক্ষা চলেছে খুব বুড়ো ও খুব শিশুতে কেন এত সাদৃশ্য। এ ব্যাপারে অনেক রকম পরখ হয়ে গেছে। এখন জ্ঞান খুব শিশু ও খুব বৃদ্ধদের তাজা রক্তের আণুবীক্ষনিক ও রাসায়নিক পরীক্ষায় ব্যস্ত—এই সাদৃশ্যের কারণ সংগ্রহের জন্য। এই রক্ত সে যোগাড় করছে জমিদার বাড়ির নিকটবর্তী বস্তীর শিশু ও বৃদ্ধদের কাছ থেকে সামান্য সামান্য পয়সার পরিবর্তে। এটা আমার ভাল লাগল না। যা হোক, যোগীদৎকে বোল, আজ জ্ঞান খেতে আসতে পারবে না, দুপুরে তার খাবারটা যেন তার লেবরেটরিতে দিয়ে আসে।

আমি বললাম, কেন, এ রকম তো জ্ঞান কোন দিন করে নি?

শঙ্কর বলল, সে আজই যেন তার গবেষণা শেষ করতে চায়; সে বারবারই বলল, আর সময় নেই।

দাদু বলে চলল, দুপুরে খাওয়ার পর ঘুমের আশায় খাটিয়ায় লম্বমান হলাম। যোগীদৎ জ্ঞানের জন্য খাবার নিয়ে জমিদার বাড়ির দিকে গেল। শিবশঙ্কর মাথা নীচু করে স্থির হয়ে বসেছিল; বললাম, শঙ্কর, আজ রবিবার, ছাত্ররা তো আসবে না, একটু ঘুমিয়ে নাও।

শঙ্কর বলল, ঘুম যদি আসে, নিশ্চয় ঘুমব।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। হঠাৎ মনে হল, আমাকে 'স্যাকো পাঞ্জা'র মত কারা যেন কম্বলে লোফালুফি করছে! ঘুমের জড়তা কাটিয়ে দেখলাম, সত্যই যেন সবকিছু কম্পমান! ঘরে আমি একলা, শঙ্করও নেই। তবে কি ভূমিকম্প! এমন সময়ে ঝঞ্ঝাভরা স্বরে কানে এল—ভূগোল, ভূগোল—আর বুঝতে বাকী রইল না, ভূমিকম্প হচ্ছে! তাড়াতাড়ি উঠে ফাঁকায় যেতে চাইলাম, বারবারই পড়ে গেলাম; কম্পন বেশ জোরেই হচ্ছে। কোনমতে দরজার খিলানের তলে এসে দাঁড়ালাম। একবার চেঁচিয়ে বললাম, শঙ্কর, বাড়ির ভেতর কোথায়ও আছ নাকি? ফাঁকায় বেরিয়ে পড়। তারপরই মনে হল জ্ঞানের কথা, সে এখন কী করছে, যোগীদৎইবা কোথায়!

অল্পকাল পরেই পৃথ্বীর এ নৃত্যবেগ প্রশমিত হল; কিন্তু নানাদিক থেকে নানারূপ হাহাকার কানে এসে পৌঁছতে লাগল। আমি দ্রুত বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই মনে হল, জ্ঞানের কাছে যাই, সেখানে শঙ্করও হয়তো আছে। মেঠো পথে যেতে যেতে দেখলাম এখানে-সেখানে জড়ো হয়েছে আপামরসাধারণ, অভিজাত-নগণ্য, ধনী-দরিদ্র, কোন ব্যবধান নেই; সব একসঙ্গে ছেলে-মেয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে করুণ চোখে দেখছে তাদের ধুলোয় পতিত গৃহ ও মৃত প্রিয়দের, আর মাঝে মাঝে হৃদয়বিদারক কান্না কেঁদে উঠছে।

জমিদারের তিন মহলা বাড়ির ফটক পার হতেই মনে হল, প্রকৃতিই যেন কোন গানের কলি গুন গুন করতে করতে বাইরে আসছে। বললাম, তুমি বোধ হয় জমিদারবাবুর মেয়ে প্রকৃতি।

সে বলল, হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

বললাম, আমার বন্ধু জ্ঞান তোমাদের লেবরেটরিতে গবেষণা করে, তার কাছে আমাকে নিয়ে চল।

সে চমকিয়ে উঠল, তারপর বলল, জ্ঞানবাবু আপনার বন্ধু?

তারপর কয়েকবার ঢোক গিলে বলল, লেবরেটরিটা ছিল বাড়ির পেছন দিকে, ভূমিকম্পে সে দিকটা ধ্বসে পড়েছে, তাঁর লেবরেটরির সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে, তিনিও চাপা পড়েছিলেন; বাবা লোকের সাহায্যে তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ধ্বসের তলা থেকে বের করে তখনই তাঁর মোটরে শহরের হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

জিজ্ঞেস করলাম, তার অবস্থা এখন কেমন?

প্রকৃতি বলল, তা তো জানি না, হাসপাতালের খবর এখনও পাই নি।

আমি হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর গমনোদ্যত প্রকৃতিকে বললাম, প্রকৃতি, তোমার নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর, এহেন বিপর্যয়ে স্বতঃস্ফূর্ত গান আমাকে অবাক করেছে। তোমার বাড়িতে যে বিপত্তি ঘটে গেল তার জন্য তোমার কী একটুও চাঞ্চল্য একটুও ব্যাকুলতা আসে না? জ্ঞান আমার বন্ধু, না হলেও তোমার মত ধীর বাক্যস্ফূর্তি আমার হত না!

প্রকৃতি বাধা দিয়ে ধীরে বলল, আমার উত্তেজনা

বা উৎকণ্ঠায় আপনার বন্ধু যে-পরিমাণে আহত হয়েছেন, তার কি রদ-বদল হত? অথচ এটা একটা নিতান্তই স্বাভাবিক ঘটনা। এ রকমটা যে হতে পারে, তাতে কারও আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। তাঁকে তো যথেষ্ট বাধা দিতাম যাতে তিনি তাঁর রক্তমোক্ষণের গবেষণা ত্যাগ করেন। এখন আর এ সব কথা চিন্তা করে লাভ নেই। ভাঙা-গড়া জগতের চিরন্তন সত্য। পুরাতন ক্ষয় হয়ে ভেঙে গুড়িয়ে রেণুরেণু হয়ে যায় নূতনের স্থান করে দেবার জন্য। যা কোনদিন কোন ধর্ম, কোন বিধান, কোন ব্যক্তিত্ব ব্যাপকভাবে পারে নি তাই আজ অবলীলাক্রমে সংসাধিত হল মানুষের ধুলোয় ধূসরিত ব্যাকুল-বেদনায়! এ এক অদ্ভুত উপায়ে সকলকে একীকরণ নয় কী?...আজ একাসনে আসীন আপামরসাধারণ, পৃথিবীর ধুলোয় একই স্তরে স্বেচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ধনীকে দরিদ্রদের সঙ্গে, অভিজাতকে সাধারণের সঙ্গে দাঁড়াতে হয়েছে।

বাধা দিয়ে আমি বললাম, এত কথা শোনবার মত মনের অবস্থা এখন আমার নেই। বন্ধুপ্রীতির মত কোন কিছু যদি তোমার থাকত তা হলে আমার অবস্থা বুঝতে তুমি কিছুটা পারতে।

সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকৃতি বলল, জ্ঞানবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আপনার বন্ধুত্বের চেয়ে কম ছিল না। যে সম্বন্ধ গড়ে উঠছিল সেটা আচার আর বিচারের সম্বন্ধের মত বলতে পারেন।

দাদুর কথা জড়িয়ে আসছিল, এইবার হঠাৎ নিঝুম হয়ে গেল, বললাম, দাদু তোমার ঘুম পেয়েছে, বিছানায় চল।

দাদু বলল, হ্যাঁ, তারপর বাসায় ফিরলাম কলের পুতুলের মত স্থানকাল বিস্মৃত হয়ে। বাসায় এসে দেখি, শঙ্কর তার খাটিয়ায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে। বললাম, শঙ্কর—

শঙ্কর বলল, সব জানি; এইমাত্র খবরও পেলাম, জ্ঞান আর নেই!

এমন সময়ে ঘরে মা এলে বললাম, মা, বহিঃপ্রকৃতিকে আরও একটু ভালবেসে কী মানিয়ে নেওয়া যায় না? তাতে স্ব-সৃষ্ট ভয়মুক্তিও বোধ হয় কিছুটা হত। জাতি-ভেদের গুরুতারতম্য রাজনৈতিক মতভেদের গুরু-তারতম্যে এসে দাঁড়াচ্ছে। ধর্মে-ধর্মে লড়াইয়ের বদলে শুরু হচ্ছে নানান রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে লড়াই। ধর্মের গণ্ডির পরিবর্তে আর এক রকমের গণ্ডি তৈরি হচ্ছে আর পূর্বতন ক্রুসেড রঙ বদলিয়ে একই রক্তক্ষয়ের কাজ করে চলেছে। মানুষের চোখ কবে সাদা কাচের চশমার ভেতর দিয়ে জিনিসকে তার নিজ রঙে দেখবে, জানি না। দলীয় খেলোয়াড় কোন দলেরই গুণাগুণ সঠিক বিচার করতে পারে না, কেন না তার মন কোন একটি দলের ক্রীড়নক হয়ে থাকে। সমঝদার দর্শকই এ বিচারে সমর্থ। মুশকিল হচ্ছে, মানুষ আজও মুখের চেয়ে মুখোশের সম্মান বেশী করে। যে আহার ও বিস্তারের কারণে মানুষে মানুষে অবুঝ বৈসাদৃশ্যের দ্বন্দ্ব-কলহ, সেই আহার ও বিস্তারের সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রাণী-সাধারণের সঙ্গে একীভূত নয় কী? মুখোশ আমাদের এই মুখের সমতাকে বুঝতে দেয় না। প্রাইভেসির দরকার হতে পারে, কিন্তু সিক্রেসির এত বাড়াবাড়ি কেন? মানুষে মানুষে সে বিশ্বাস কবে আসবে?

দেশপ্রেম যদি জিঘাংসা জাগায় তা হলে কবিরা দেশপ্রেমের গান না গেয়ে মানবপ্রেমের গান কেন গায় না? ঘুমপাড়ানী গানে, ছেলে ভুলানো ছড়ায়, সাহিত্যের সঙ্গে গানের সঙ্গে দেশে দেশে, দিকে দিকে এ কথাই কেন বার বার বলা হয় না যে, আমরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ মানুষ—তারপর আর কিছু।

দাদুর তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বর আবার ভেসে উঠল, এর পরে শঙ্করেরও আর খোঁজ পাই নি, সে যেন হঠাৎ উবে গেল! পরে শুনেছিলাম, সে যেন কোথায় প্রোফেসর হয়ে চলে গেছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য : শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। আট টাকা।

শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী রচিত উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা পুস্তকটি দেখিয়াছি। প্রথম অংশে (পৃঃ ১-১৬৩) কবিওয়ালাদের পরিচয় ও দ্বিতীয় অংশে (পৃঃ ১৬৪-৩৪২) কবিগানের সংকলন রচনাটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। নূতন তথ্যের সংগ্রহে গ্রন্থকারের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসার যোগ্য। তাহার উপর রহিয়াছে এই অধুনালুপ্তপ্রায় গানগুলির প্রতি তাঁহার স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুরাগ। যে দু-চারিটি প্রাচীন গানের সংগ্রহ গত শতাব্দীতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখন দুষ্প্রাপ্য। কেবল সেগুলি হইতে নয়, নিজেও সংগ্রহ করিয়া, এবং সেগুলি রচয়িতার নামানুসারে সুষ্ঠুভাবে সাজাইয়া প্রকাশ করায়, তাঁহার পুস্তকের মূল্য বর্ধিত এবং আলোচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। কবিওয়ালা ছাড়া, অন্যান্য গীতকার প্রসঙ্গে রামনিধি গুপ্ত, রূপচাঁদ পক্ষী, মধুসূদন কান প্রভৃতি সমধর্মী গানের সংগ্রহ ও আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কেবল একটি বিষয়সূচীর অভাব অনুভব করিলাম।

নবীন গ্রন্থকারের সাহিত্যিক উদ্যম উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিশালী হউক, এই কামনা করি।

শ্রীসুশীলকুমার দে

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য : শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন। পপুলার লাইব্রেরি, ১৯৫।১ বি, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। পাঁচ টাকা।

মনস্বী লেখক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' পুস্তকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান কয়েকজন কবি ও গদ্যলেখক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থটি যে পাঠকসাধারণ্যে সবিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছে উহার প্রমাণ প্রথম প্রকাশের অত্যল্পকাল মধ্যেই গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ। আজকাল সমালোচনা-গ্রন্থও যে পাঠকসাধারণ কর্তৃক আদৃত হয়, ইহা সুখের বিষয়।

গ্রন্থটিতে সুপণ্ডিত লেখক রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিহারীলালের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, কারণ গ্রন্থকার এই গ্রন্থে কেবলমাত্র সেই সব লেখকের উপরই মনোযোগ স্থাপন করিয়াছেন যাঁহাদের রচনায় উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট যুগ-লক্ষণগুলি প্রকাশ পাইয়াছে; রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের মানস-সন্তান হইলেও বিশ শতকেই তাঁহার প্রতিভার সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে।

ত্রিপুরাশঙ্করের সমালোচনারীতির বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁহার বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ ভাবোচ্ছ্বাসবর্জিত মননসমৃদ্ধ। তাঁহার চিন্তার প্রকাশের মধ্যে কোন জড়িমা নাই কুয়াশা নাই। এমন পরিচ্ছন্ন প্রাঞ্জল রীতির অধিকারী গদ্য-লেখকের প্রয়োজন বর্তমান বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী। যে সকল লেখকের বিষয়ে গ্রন্থকার এই গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের সাহিত্যের সৌন্দর্যবিচারের দিকটিই শুধু তাঁহার আলোচনায় প্রাধান্য পায় নাই, সেই সঙ্গে তাঁহাদের মনোজীবনের বৈশিষ্ট্য এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গীও আলোচনায় উপযুক্ত স্থান অধিকার করিয়া আছে। ইহা ত্রিপুরাশঙ্করের বিশিষ্ট মনোগঠনেরই দ্যোতক। তাঁহার আলোচনা নিছক রসবিচার নহে, মননশীলতার ছটায় উহার প্রতিটি ছত্র দেদীপ্যমান। ভারতীয় জীবনদর্শনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধাশীল অথচ সর্বপ্রকার লৌকিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে স্থাপিত এবং ঔদার্য ও সহনশীলতার দ্বারা মণ্ডিত লেখক বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-বিভাগের সেবায় যত

বেশি আত্মনিয়োগ করিবেন আমাদের ততই কল্যাণ হইবে। ত্রিপুরাশঙ্করের রচনারীতি বার বার আমাদিগকে উনিশ শতকের প্রথম যুগের যুক্তিবাদী লেখকদের রচনাদর্শকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই গ্রন্থে যে সকল গদ্য-লেখকের আলোচনা তিনি করিয়াছেন তাঁহাদেরই উত্তর-সাধক তিনি—সার্থক উত্তর-সাধক।

আধুনিকতা-প্লাবিত বর্তমান বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকীয় পূর্বাচার্যদের পঠন-পাঠন যত বেশী হয় তত ভাল। সুপণ্ডিত লেখকের প্রদর্শিত রেখাচিহ্ন অনুসরণ করিয়া বিগত মনীষী ও কবিদের সাহিত্যকৃতির অনুশীলনের মাধ্যমে পাঠকসাধারণ ও সাহিত্যসেবী সম্প্রদায়ের মধ্যে উনিশ শতকের মূল্যবোধে আস্থা যদি কিছু পরিমাণেও ফিরিয়া আসে তাহা হইলে অন্ধকার পরিস্থিতিতে উহা একটি বড় রকমের কাজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই গ্রন্থের সর্বাধিক সার্থকতা সেইখানেই। পরিশেষে সুবিজ্ঞ লেখককে অনুরোধ, তিনি উনিশ শতকের সকল দিক লইয়া একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হউন, তাঁহার শক্তির উপযুক্ত প্রয়োগক্ষেত্র এই রকমের মহৎ কার্যের মধ্যেই বিস্তৃত রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। এমন একটি গ্রন্থ যাহাতে শুধু উনিশ শতকের সাহিত্যই আলোচনার বিষয়ীভূত হইবে না, তৎসঙ্গে উনিশ শতকীয় নবজাগরণ, যুক্তিচর্চা, ধর্ম-আন্দোলন, জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা ইত্যাদিরও সম্যক্ বিশ্লেষণ আলোচনার মধ্যে অখণ্ডভাবে সুগ্রথিত হইবে।

নারায়ণ চৌধুরী

কনে-দেখা-আলো—বাণী রায়। ডি. এম. লাইব্রেরি, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। তিন টাকা।

যৌবন-বেদনা-রসে অনুচ্ছল যার দিনগুলি, এমনই একটি নারীকে নিয়ে কাহিনীর সূত্রপাত। সে 'ওলড মেড হতে চলেছে। তার বয়েস ছত্রিশ পার হল।' বিলম্বিত কুমারী নামের উগ্র বিভীষিকায় সে অধীর। রাত্রের নিঃসঙ্গ শয্যায় সে নিদ্রাহীন। তার 'ডাল-ভাত-জড়িত' ত্রিশোত্তীর্ণ জীবনে যে প্রেম এসেছিল, তা অনুত্তেজিত, শান্ত। বিগত ছ বছরের 'নিত্য দিনের প্রেম, নিত্য দিনের সাক্ষাৎ' প্রেমিককে এতটুকু চঞ্চল করে নি। সে 'চরিত্রবান্ পুরুষের অসহ্য প্রতীক'। সেই 'বিমুখী পুরুষ-চিত্ত'কে ভোলাতে হবে ভেবে হাসি পায় তার।

'কন্যাসমা' মামাতো বোন মিত্রার বিয়েতে গিয়ে নিজের রিক্ততা বড় বেশী করে উপলব্ধি করল ছত্রিশ-পার-হওয়া উৎপলা। সে নিজে কেরানী এবং অনন্ত দত্ত নামে আর এক কেরানীর সঙ্গে তার পরিচয় ও প্রেম ছ বছর ধরে। 'কিন্তু আজও তো মিলন এল না!' অনন্ত-চরিত্র বিশ্লেষণ করে উৎপলা বুঝেছে যে, এই ছ বছরে "অগ্নিমান্দ্য" হয়েছে তার। রেস্তোরাঁয় বসে ভোজ্যের পরিবর্তে এক গ্লাস সোডা খায় সে। উৎপলা 'গুণে গুণে' দেখেছে যে, অনন্ত তাকে "এক হাতের আঙুলের কড়ের বেশী চুম্বন করে নি।" মিত্রার বিয়ের পর থেকেই উৎপলা অনুভব করল কতটা বিস্বাদ তার এই কুমারীত্ব, কতখানি গ্লানিভরা এই স্থবির জীবন। অস্থির হয়ে অনন্তকে ফোন করল সে আসবার জন্যে। নিজের শরীরকে "প্রগলভ প্রসাধনে" পুষ্পমণ্ডিত করল। তার অচরিতার্থ বাসনা অন্ধ আবেগে উন্মত্ত হয়ে উঠল: "আজ আর গোপন চুম্বন ভীরু আলিঙ্গন নয়। আজ তারা একা।"

এইভাবে শুরু হল যে কাহিনী পাঁচটি চরিত্রের ভাবনার মধ্য দিয়ে তা এগিয়েছে। সেই জন্যে ঘটনার গতি মন্থর, চিন্তার উপলে প্রতিহত।

বিধবা মা হরিমতি এবং 'শিক্ষিতা ঝি' জ্ঞানদাকে নিয়ে উৎপলার সংসার। যৌবনে বিধবা হয়ে ভাইয়ের সংসারে আশ্রয় নিয়েছিলেন হরিমতি। সেখানেই উপেক্ষা অবহেলার মধ্যে মানুষ হল উৎপলা। বি. এ. পাস করবার পর মামাই তাকে চাকরী সংগ্রহ করে দিলেন। তখন মাকে নিয়ে বাসা করল সে। অনন্ত ব্রাহ্মণ নয় বলে প্রথম প্রথম হরিমতির আক্ষেপ হত। পরে তিনি বুঝতে শিখেছিলেন, কায়স্থ হলেও অনন্ত "হাতের পাঁচ।" নিজের মেয়ের বিবাহ-পূর্ব প্রেম সম্পর্কেও তাঁর আশ্চর্যরকম উদারতা—

"পাওয়ার আগে এই মধুর প্রণয়লীলা বড় সুন্দর, বড় পবিত্র।" কিন্তু মিত্রার বিয়ের কিছু দিন পরেই ঈশ্বরকে ডেকে আর্তনাদ করতে হল—যেদিন কলঘর থেকে একটা

অতিপরিচিত বীভৎস বমনের শব্দ তাঁকে জানিয়ে দিল যে তাঁর কুমারী কন্যা গর্ভবতী!

এদিকে শ্বশুরবাড়িতে এসেও দিদির জন্যে ভাবনায় মিত্রার চোখে ঘুম নেই। ঘরের সুরভিত অন্ধকারে টুইন বেডে শুয়ে মিত্রা ভাবে, অনন্তদার সঙ্গে দিদির বিয়ে হলে বেশ হয়! পাশে নিদ্রিত স্মরজিতের "বাদামী শরীর ক্ষিপ্রগতি ডালকুকুরের মত" লাগে মিত্রার কাছে। পরদিন দুপুরে উৎপলা নিজে এসে মিত্রাকে দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি দিল। আজ সকালেই রেজেষ্ট্রি অফিসে অনন্তের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে। দিদিকে খেতে দিয়ে অবাক হল মিত্রা, দিদি সন্দেশ স্পর্শও করল না। "লোভীর মত" ঝাল সিঙারা "গিলল"। দিদিকে অনেক কিছুই উপহার দিতে চাইল মিত্রা। কিন্তু দিদি কেবলমাত্র শাড়িটাই নিল। মিত্রা লুকিয়ে শাড়ির ভেতরে একটা সাদা পাথরের শিবলিঙ্গ দিয়ে দিল।

অনন্তের বাড়ির লোকেরা যখন তার বিয়ের খবর পেল তখন একটা নারকীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সেখানে। মা এবং বোনেরা এমন সব কথা বলতে লাগল যে, অনন্ত অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় পালিয়ে বাঁচল। উৎপলাদের বাড়িতে গিয়েও শান্তি নেই তার। "শিরিষ কাগজের মত খরখরে গলায়" উৎপলা অনন্তকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলল। অনন্ত ভাবল, তাকে হয় পার্কে আশ্রয় নিতে হবে, নতুবা বাড়িতে গিয়ে "মায়ের মুখখিস্তি" শুনতে হবে!

অনন্তের বাড়ির পরিবেশে ছোট ভাই বরুণ যেন ছন্দপতন। দাদার দুঃখ সে বোঝে। "মায়ের মুখ খারাপ করার অভ্যাস" তাকে পীড়া দেয়। মা যখন "কুকুরের মত কেউ কেউ" করেন বা দিদি যখন "সাপের মত নিশ্বাস ছেড়ে" কথা বলে তখন বরুণ অস্থির হয়ে ওঠে। অবশেষে বউদি এল বড় গাড়িতে চড়ে ঐশ্বর্যে সমারোহে ঝলমল করতে করতে। মিত্রাদি নিজে কেঁদে মাকে এবং দিদিদের কাঁদিয়ে গেল। বউদি মায়ের স্নেহে আশ্রয় পেল।

কাহিনী শেষ হল উৎপলা-অনন্তর বোঝাপড়ায়। উৎপলা এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের জন্যে পুরোপুরি দায়ী করতে চায় অনন্তকে। "সমস্ত দোষ ঐ পশুপ্রবৃত্তির লোকটির।" মিলনের লগ্নেও "চাপা বিদ্রূপের গলায় সর্পিণীর মত বিষ ঢেলে" কথা বলে উৎপলা। কারণ, "ঐ পুরুষ তার প্রেমিক নয়, তার বন্ধু নয়, তার স্বামী নয়, তার কেউ নয় সে।" ফুলশয্যার রাত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একজন বলে, "লম্পট!" অন্যজন বলে, "তুমিও সতীশিরোমণি নও।"

উৎপলা স্থির করল পথে নামবে। পরদিন সে যখন সত্যিই সিঁড়িতে পা দিয়েছে তখন বরুণ তাকে আটকাল। সমস্ত বঞ্চনা বেদনা অভিমান ছাপিয়ে উৎপলার চোখে অশ্রুর বন্যা নামল; পশ্চিমের আকাশে তখন কনে দেখা আলো।

গতানুগতিক প্রেমের উপন্যাস এ নয়। আমাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের একটা বড় সমস্যাকে লেখিকা মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর পরিণত চিন্তার ফল বলেই আলোচ্য উপন্যাসে ঘটনা অপেক্ষা ভাবনা বেশী। চরিত্রগুলি সবই মোটামুটি স্বাভাবিক। কেবল উৎপলা যেন একটু বেশী তীব্র—অনন্ত সম্পর্কে তার পূর্বাপর আচরণ একটু অসমঞ্জস লাগে। ভাষা বিষয়ে লেখিকাকে একটু অব্যবস্থিত মনে হয়। কথ্যরীতির মধ্যেও 'দুটি' বদলে আগাগোড়া 'দুইটি' ব্যবহার করেছেন। "পঞ্চাশ মাইনে সামান্য, গলগ্রহ মাতা" এখানে 'মা' লিখলেন না কেন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। ভাষা কখনও 'মাগী' এবং 'মুখখিস্তি'তে মলিন; কখনও বা 'বাসকশয়ন', 'মঞ্জুভবন' এবং 'চেলাবগুণ্ঠনে' কুলীন।

তবু বইটির গুণের তুলনায় এসব কিছুই নয়। শেষ করবার পরেও শেষ হয় না। এর বক্তব্যে আমরা বহুক্ষণ চিন্তিত থাকি।

বইটি আদৃত হবে বলে মনে করি। প্রচ্ছদটি সুন্দর।

অরুণকুমার মিত্র

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮

৩০শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

শনিবারের চিঠি

আশ্বিন
১৩৬৫

সংবাদ-সাহিত্য

এবার শারদীয়া পূজার ঠিক প্রাক্কালে সুদূর প্রাচ্যের জাপান ও নিকট প্রাচ্যের তিব্বত-ভুটান-সিকিমের সহিত ভারতের যোগাযোগ বৃদ্ধি যেমন আশাপ্রদ, আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী পাকিস্তানের সহিত বিবিধ গোলযোগপ্রসূত 'ছিট্‌মহল' ব্যবস্থা তেমনই নৈরাশ্যজনক হইয়া দেখা দিয়াছে। মহিমান্বিতা লেডি নুনের পদস্খলিত মখ্‌মলের চটি আমাদের পরাজয়ের প্রতীক মাত্র।

এদিকে পূর্বদিগন্ত হইতে জঙ্গীশাসনের পশ্চিমে সম্প্রসারণও ভারতীয় পূজার আনন্দকে বিঘ্নিত করিবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে গণতন্ত্রের এই ক্রমিক পতন শুভসূচনা নহে। প্রথমে ব্রহ্মদেশ, তার পর পাকিস্তান। মনে হইতেছে পঞ্চশীল ও ও-ভাগান্ত ইউনেস্কো, ইউএনো, নাটো, সিয়াটো প্রভৃতি বাহিরের আবরণ মাত্র, চেঙ্গিজী-হিটলারী মনোবৃত্তি সেই আবরণ ফুঁড়িয়া মুহুর্মুহু আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং এতদ্দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে মানুষের শুভবুদ্ধি এখনও জাগ্রত হয় নাই। বেচারা রাজনৈতিক ওয়েণ্ডেল লিউইস উইল্কি তাঁহার ১৯৪৩ সনের 'এক-বিশ্ব'-'ওয়ান-ওয়ার্ল্ড'-তত্ত্ব সহ ১৯৪৪ সনেই সম্পূর্ণ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন; এবং বৈজ্ঞানিক বলিয়াই জন বার্ডন স্যাণ্ডারসন হলডেন তাঁহার 'সম্ভাব্য বহুজগৎ' 'পসিব্‌ল্ ওয়ার্ল্ড্‌স' (১৯২৭) এবং 'মানুষের বিষমতা' 'দি ইনইকুয়ালিটি অব ম্যান' (১৯৩২)-তত্ত্ব লইয়া এখনও শুধু জীবিত নাই, পৃথিবীর সর্বশেষ তীর্থ দক্ষিণেশ্বরের গোকুলে দিনে দিনে বাড়িতেছেন।

আশার কথা এই যে, ভারতবর্ষ বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের উত্তরে-দক্ষিণে ইহার মধ্যেই যে 'হা-অন্ন, হা-অন্ন' আর্তনাদ উঠিয়াছে দেবী স্বয়ং তাহার প্রতিকার-ভার স্বহস্তে লইয়া আগমন করিতেছেন; জেইন সেইনদের বাহাদুরি করিবার সুযোগই তিনি দিবেন না। 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'য় দেখিতেছি, দেবীর গজে আগমন, ফলং—"গজে চ জলদা দেবী শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা" এবং নৌকায় গমন, ফলং—"জলে চ শস্যবৃদ্ধি স্যাৎ।" অতএব মা ভৈঃ, বাঙালী, তুমি যেখানেই থাক, খাইতে পাইবে।

—

নাট্যকার দ্বিজু রায়ের কৃপায় আমরা জানিয়াছি, দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষের মাটিতে পা দিয়াই তাঁহার সেনাপতি সেলুকাসকে বলিয়াছিলেন, "সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ।" "দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য"—ইত্যাদি কতকগুলা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য দেখিয়াই তিনি তাজ্জব বনিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের মানুষ কী পরিমাণ বৈচিত্র্য সম্পাদন করিতে পারে তাহা প্রণিধান করিবার মত অবকাশ ও মনের স্থৈর্য তাঁহার ছিল না। থাকিলে, তাঁহার মুখের ওই বক্তৃতাংশ সম্পূর্ণ 'ডিলিট' করিবার কড়া আদেশ ডি. এল. রায়কে দিয়া তবে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতেন। ম্যাসিডন-রাজ এক নম্বর ফিলিপের এই কৃতী সন্তানটি যদি অদ্য তারিখে কোনও গতিকে আর একবার উপস্থিত হইতে পারিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের মানুষের সৃষ্ট বিচিত্র কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তাঁহার মুখে বাক্য নিঃসরণ হইত না। তিনি পত্রপাঠ গ্রীক দার্শনিক ডাওজিনিসের পদপ্রান্তে ছুটিয়া গিয়া ব্যাকুল প্রার্থনা

জানাইতেন, 'দাদাগো, তোমার রোদ তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, তুমি আমাকে ভারতবর্ষের সেই 'প্রচণ্ড সূর্য্যে'র জ্বালা হইতে রক্ষা কর !' জ্বালা নয় তো কী ! একদিকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ঠেলায় ভারতবর্ষের যাবতীয় ভূমি ও জমির মাটি—ইঁট-পাথর-সিমেন্টে মাটি হইতে বসিয়াছে, অন্যদিকে বিনোবা ভাবে জয়প্রকাশ নারায়ণেরা ভূদান-যজ্ঞ করিয়া বেড়াইতেছেন ! বৌদ্ধ অশোকের ধর্মচক্রশোভিত সিংহাসনের উপরে ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ছট্ পরবের সিন্দূরলাঞ্ছিত ললাটে নির্বিকার ভাবে বসিয়া আছেন। কোটি কোটি তীর্থযাত্রী ভক্তের পদরজপূত প্রয়াগের ধূলিধূসরিত জওহরলাল ইটন-হ্যারোর চোস্ত ইংরেজী মারফত 'সেকুলার' ভারতবর্ষকে আবিষ্কার করিয়া তাহার মন্ত্রী সাজিয়া বসিয়াছেন এবং বেদ-উপনিষৎ-গীতার দেশের বাতিল ও বহিষ্কৃত বৌদ্ধধর্মের পঞ্চশীল প্রচার করিতেছেন।

অধিক বিস্তারে লাভ নাই। সেলুকাস, সত্যই এ দেশ বিচিত্র।

—

আজকাল সংবাদপত্র খুলিলেই দেখিতে পাই, উচ্চ, মাঝারি, নীচ সরকারী কর্মচারীদের নানাবিধ দুর্নীতির কাহিনী ফলাও করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে বেতনভোগী কর্মচারীদের গণ্ডী ছাড়াইয়া দুর্নীতির অপবাদ সভা-পরিষদ-সদস্যদের জড়াইয়া মন্ত্রী-মহামন্ত্রী পর্যন্ত ধাওয়া করিতেছে। অনেক সময় একদিন মাত্র পাঠকের চক্ষু ঝলসাইয়া (Flash করিয়া) সংবাদটির উপর অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দেওয়া হয়, কোন কোন সময় আরও দুই চারিদিন সংবাদ লইয়া নাড়াচাড়া হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশের মানুষ জানিতেই পারে না সংবাদ সত্য কি না এবং সত্য হইলে দুষ্কৃতদের শাস্তি হইল কি না। সরকারের তরফ হইতে এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে আসল তথ্য বা সত্য উদ্ঘাটিত না হইলে জনসাধারণের মনে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে ঘটনা সত্য, সরকার ধামা চাপা দিয়াছেন। ফলে, শাসন-ব্যবস্থার উপর তাহাদের আস্থা শিথিল হইতে থাকে এবং ধীরে ধীরে সরকারবিরোধী দল এইরূপ সত্য মিথ্যা সন্দেহের সাহায্যেই বল সঞ্চয় করে। সরকারের অবিবেচনা ও অব্যবস্থার জন্যই তাহা ঘটিতে পায়।

সম্প্রতি 'আনন্দবাজার পত্রিকা' 'যুগান্তর' 'যুগবাণী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় শিবপুর বোটানিকাল উদ্যানে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুষ্ঠিত ভৈরবীচক্রের বীভৎস ব্যভিচারের যে চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে এবং এতদ্সম্পর্কে শ্রীনবগোপাল দাসের অনুসন্ধানের ফল, তাঁহার পদত্যাগ ইত্যাদি যে ভাবে যুক্ত করা হইতেছে তাহাতে আমাদের মত সাধারণ মানুষের বিভ্রান্ত হইয়া ভাবা স্বাভাবিক, অল ইজ নট ওয়েল ইন দি স্টেট অব ডেনমার্ক। এ-বিষয়ে জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার গুরুতর দায়িত্ব যদি বিধান-সরকার বা নেহরু-সরকার পালন না করেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রজাদের বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন। জিপ, ট্র্যাক্টর, গৃহ-নির্মাণ, নলকূপ, খাদ্য-ব্যবস্থা, শস্য-পচন প্রভৃতি বহুবিধ কলঙ্কে ইতিমধ্যেই স্বাধীন ভারতের মাত্র দশ বৎসরের ইতিহাসের অনেক পৃষ্ঠা কালো হইয়া উঠিয়াছে। শিবপুর-উদ্যান-কলঙ্ক বোঝার উপর শাকের আঁটি না হইয়া উষ্ট্রের পৃষ্ঠভঙ্গকারী শেষ খড়গাছাও হইতে পারে।

—

সরেজমিনে আমরা তো দেশের এই হাল দেখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়াছি, ওদিকে গোপালদা দূরে বসিয়া বাংলা-সাহিত্য-সংসার সম্বন্ধে যে দুরভোগ ভুগিতেছেন একটি কবিতায় তাহা আমাদের গোচর করিয়াছেন। অনুমান করিতেছি কলিকাতার পথে পথে শারদীয় সংখ্যা বাংলা সাময়িকপত্রের সিনেমা-বিজ্ঞাপন-লাঞ্ছন প্ল্যাকার্ডগুলির কথা কেহ তাঁহাকে জানাইয়া থাকিবে। তিনি এত বেশী দুঃখ পাইয়াছেন যে ক্ষেপিতেও পারেন নাই। শিরোনামা সহ তাঁহার কবিতাটি এই :—

নির্জগাম যদা দেবী

জননী, তোমার পূজামণ্ডপ
বড়বাজারের পোস্তা কি সে ?
শুধু কোলাহল, শুধু রেষারেষি,
শুধু বুকজ্বালা ঈর্ষাবিষে !

কুল-নারিকেল-গাঁদা ও পলাশ,
শ্যামল দুর্বা 'খসখসে' ঘাস
আনে না তো কেহ তোমার সকাশ
অঞ্জলি ভরি যবের শীষে।
স্তম্ভিত হয়ে তাই কি মা তুমি
সন্তানে হের নিনিমিষে।

বাজে ঢাকঢোল কাড়া ও নাকাড়া,
ড্রাম ভেঁপু রামশিঙাও বাজে,
কাঁসর ঘণ্টা শিকেয় উঠেছে
ধূলায় শঙ্খ পড়িয়া লাজে।
অগুরু ধূপের সুরভি-পুলকে
ভরে না চিত্ত, ঘৃত দীপালোকে ;
নিয়ন-বাতির তীব্র ঝলকে
ঝলসে চক্ষু—মদের ঝাঁজে
মত্ত বাতাস মাতাল করিছে
ভক্তজনেরে প্রভাতে সাঁঝে।

বাহন মরাল পলাতক, প্যাঁচা
তাই কি বসেছে আসনে এসে ?
বিষে জ্ব'লে কালী হয়ে শ্বেতভুজা,
ছিন্নমস্তা হলে কি শেষে !
বাণী-মন্দিরে বীণাঝঙ্কার
হেথা কি জননী, উঠিবে না আর ?
শুধু হানাহানি শুধু হুঙ্কার,
আত্ম-আঘাত সর্বনেশে
তোমার পূজার নামে মা ভারতী,
চলিবে ভঙ্গ বঙ্গদেশে !

নয়ন-ধাঁধানো বাঁধনে বাঁধিয়া
জ্যাকেটে চিত্তচমৎকারী,
কিবা ছবি, কিবা ছাপার বাহার,
কিবা পরিচিতি পাঠকমারী !
পূজোপকরণ শাস্ত্রমাফিক—
নৈবেদ্যও না থাকুক ঠিক,
বিজ্ঞাপনেই মাতে দশদিক
পাড়ের বাহারে যেমন শাড়ি—
কাঁচা দগদগে না করিলে ঘা-টা
নিকটে আসে না মাছির সারি !

তোমার পূজার রীতি কি মা এই ?
ঐশ্বর্যের অসহভারে
বাণীবিনোদন হয় কি কখনো
আড়ম্বরের অহঙ্কারে ?
প্রতিমাবিহীন মন্দির-ঠাট,
পুষ্পবিহীন হেমময় টাট,
শুধু ছলাকলা ভান আর ঠাঠ
মলাটে জ্যাকেটে চিত্রহারে
ইঙ্গিতময় কদর্যতায়,
আর বীভৎস রুচিবিকারে !

তোমারেই জানি, তুমিই মা একা
বঙ্গবাসীর গতি, ভারতী,
তুমি চলে গেছ, তাই এ অশুভ,
চারিদিকে তাই এ দুর্গতি।
ফিরে এসো ত্বরা বাণী বীণাপাণি,
সুর ও ছন্দ পুনঃ দাও আনি ;
বাজার ভাঙিয়া আশ্রমখানি
আবার গড়িতে দাও মা, মতি।
তোমার প্রসাদে প্রসন্ন কর
প্রমত্ত জনে, সরস্বতী ॥

—

উপরে মুদ্রিত কবিতাটির সঙ্গে গোপালদা একটি পত্রাঘাতও করিয়াছেন। পত্র পাঠে বুঝিতে পারিতেছি আমাদের গত সংখ্যার চাউচাউ ও পাখির-বাসার-ঝোল মার্কা মন্তব্যটি এখনও গোপালদার চোখে পড়ে নাই। তবু রক্ষা। সে মন্তব্য দেখিলে তিনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চীনের প্রাচীরের একখণ্ড আস্ত প্রস্তর আমাদের বাগে নিক্ষেপ করিতেন। হয়তো অতঃপর করিবেন। আপাততঃ তাঁহার পত্রটি উপস্থিত করিতেছি। গোপালদা লিখিয়াছেন :

"ভায়া হে, বহু বৎসর হইতে চলিল, ভারতবর্ষের তথাকথিত স্বাধীনতালাভের তখনও কয়েক বৎসর বাকি,

একটা কবিতা, মানে গদ্য কবিতা লিখিয়াছিলাম। নাম দিয়াছিলাম "আরব্য-উপন্যাসের দেশ।" তোমাদের মতন সমতল ভূমিতেই দণ্ডায়মান ছিলাম তখন; দেশে দেশে আলের ব্যবধানটাই বড় বেশী প্রকট ছিল। "আরব্য-উপন্যাসের দেশ" বলিতে তাই সম্মুখস্থ পরিচিত পরিধিকেই বুঝাইয়াছিলাম। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন তখন স্তিমিত। লিখিয়াছিলাম:

আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
দিনের বেলায় সবাই ঘুমিয়ে রাত্রে জেগে আছে।
শ্মশ্রুতে কেশে যাদের মৃত্যুর স্পর্শ, তারা কইছে কথা,
যাদের ধমনীতে তাজা রক্ত, তারা মূক।
দিনের আলোক ঝলমল করছে, তবু আঁধার করেছে
আকাশ
রকপক্ষীর পাখা।
ক্লান্ত বুড়ো রকপাখী—
* * * *
আরব্য-উপন্যাসের দেশ—
আবু হোসেন বাদশা সেজে বসেছে।—
পাগল আবু হোসেন।
ঘুঁটে-কুড়ুনীর পুত্র একরাত্রির রাজা—
হাতে মাথা কাটছে। মদ খাচ্ছে,
আর মেয়ে-মানুষের হল্লা।
কর্মচারীরা আছে, রিপোর্ট লিখছে, বক্তৃতা লিখছে—
আবু হোসেন দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে।
কিন্তু হারুণ-আল-রসীদের উদ্দেশ্য কি
বোঝা যাচ্ছে না।

তাহার পর আমার জীবনে, তোমাদের জীবনে এবং দেশের জীবনে অনেক বিপর্যয় ঘটিয়াছে। আমিও সমতল ত্যাগ করিয়া অনেক হাজার ফুট উর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছি। সমতলভূমির দিকে চাহিয়া আজ আর আলগুলি দেখিতে পাইতেছি না। সমগ্র পৃথিবীটাকেই "আরব্য-উপন্যাসের দেশ" বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে মূল উপাখ্যানের সূত্রপাত তোমাদের অতি নিকটেই। সুলতান শাহরিয়ার হয়তো উপযুক্ত কারণ বশতঃই অবিশ্বাসী ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। আঘাতটা এত বেশী যে ব্যাধিটা 'ক্রনিক' হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় একটি করিয়া মন্ত্রী বাছাই করিতেছেন এবং নিশান্তে তাহাকে গর্দান ধরিয়া (কাটিয়া বলিলেও আপত্তি করিবার ছিল না) বহিষ্কার করিতেছেন। কবে যে বুদ্ধিমতী শাহারজাদীর আবির্ভাব ঘটিবে এবং তিনি মনোরম গল্প ফাঁদিয়া প্রেসিডেন্টকে আত্মবিস্মৃত করিয়া আত্মরক্ষা করিবেন সুলতানের দেশ তাহারই প্রতীক্ষায় থম্‌থম্‌ করিতেছে।

ওদিকে সুদূর উত্তরে চোরের উপর বাটপাড়ি করিয়া যিনি আলিবাবার নিশ্চিন্ত মহিমায় আজ গ্যাঁট হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহার আশেপাশে চল্লিশ জন জাঁদরেল জাঁদরেল দস্যু কুপোর মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আলিবাবা-বিরোধী সর্দারের ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিল। কৌশলী আলিবাবার বাঁদী আর বান্দা—মরজিনা-আবদাল্লা গরম তেল লইয়া প্রস্তুত হইয়াই আছে। হুকুম পাইলেই কুপোর মুখে তাহা ঢালিয়া এক একজনকে তাহারা 'লিকুইডেট' করিয়া দিতেছে। সংবাদপত্রে দেখিলাম, এই কয়দিন আগেই একজন গেল! তুমি আমি শুনিলাম—আত্মহত্যা। আলিবাবার চিচিংফাঁক-মোহর ভাই-কাসেমের কুনকেতেই মাপা হইতে লাগিল।

আমার নাকের উপরেই দেখিতেছি সেই আদ্যিকালের থুড়থুড়ো বুড়োটা লাল হলুদ নানা ফলের রসে সঞ্জীবিত হইয়া বেচারা সিন্দবাদের ঘাড়ে উঠিয়া বসিয়াছে এবং তাহার দুই পায়ের চাপে সিন্দবাদের দম বন্ধ হইবার আর বাকি নাই। তবে সিন্দবাদকে আমি যতটুকু জানিয়াছি তাহাতে এই বিশ্বাস আমার হইয়াছে যে বুড়াকে নেশায় বেহুঁশ করিয়া মাটিতে ফেলিতে ও পাথরের ঘায়ে তাহার মাথা ভাঙিতে সিন্দবাদের বেশীদিন লাগিবে না।

যেদিকে তাকাই আরব্য-উপন্যাসের খেলাই দেখিতেছি। দেখিতেছি, মুস্তাফা দর্জীর একমাত্র পুত্র আলাদিন আফ্রিকাবাসী মায়াবীর বুদ্ধিতে ভূগর্ভ হইতে সেই আশ্চর্য প্রদীপটি হস্তগত করিয়া তাহার সাহায্যে চক্ষের নিমেষে বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছে এবং এখনও প্রাসাদের উপর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া চলিয়াছে। নানা দিগ্দেশ হইতে নানা মতলব লইয়া মায়াবীরা সেখানে উপস্থিত হইয়া আলাদিনকে প্রাসাদের গম্বুজে রকপক্ষীর ডিম টাঙাইবার পরামর্শ দিতেছে। ক্রোধান্ধ দৈত্যের হুঙ্কার তোমরা হয়তো

কল্পনায় শুনিতে পাইতেছ। অন্ততঃ আমি তো পাইতেছি। কাজেই আবার সেই পুরাতন কবিতায় ফিরিয়া যাইতেছি :

ক্লান্ত বুড়ো বকপাখী—
বকপাখীই আগে ছিল বুলবুল, গান গাইত,
ডিম একটা পেড়েছে, কিন্তু ডিম ফুটে বাচ্চা বের হল না,
আলাদিনের প্রাসাদে গম্বুজের তলায় সেটা টাঙানো।
সবাই অবাক হয়ে চেয়ে দেখছে আর 'হায় হায়' করছে—
তা দিয়ে সেটা ফুটিয়ে দেবে কে ?
কখন্ ঝড়ের বেগে জিন এসে পড়বে,
আকাশ বাতাস করবে তোলপাড়,
আলাদিনের প্রাসাদ যাবে মিলিয়ে।"

—

গোপালদা থাকেন থাকেন বেশ থাকেন, বেশ সোজা কথা সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় মিষ্ট করিয়া বলিতেও পারেন এবং মর্মভেদ করিয়াও বলিতে পারেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁহার কি যে হয়, "বোর্দো" হইতে কোন্ তিব্বতী লামার ভূত তাঁহার স্কন্ধে ভর করে, তখন তিনি যাহা বলেন তাহা বোঝে কাহার সাধ্য! এইবারেও পূজার উপহারস্বরূপ তিনি একটি কঠিন হেঁয়ালি ছাড়িয়াছেন। নাম দিয়াছেন "ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ"। বোকার মতন তাহা যথাযথ ছাপিয়া দেওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। আমরা তাহাই করিতেছি।

ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ

গোলকের মত গড়াতে গড়াতে
　　আর কত নীচে নাম্‌বি তোরা,
ছিলি শালগ্রাম, তোদের বরাতে
　　হলি শেষতক শিলের নোড়া!
মন্দিরে গেয়ে ধ্রুবপদী গান,
খ্যামটা আসরে বিকালি রে প্রাণ ;
প্যালা বেশী পেয়ে খোয়ালি যে মান,
　　ও দাদা নিতাই, ও ভাই গোরা।
নাম-করা রেসে　নেমে কি না শেষে
　　ছ্যাকরা গাড়ির হলিরে ঘোড়া।

নিলামের হাটে সব কিছু মেলে,
　　এ কথাটা জানা ছিল না আগে,
বামুনের টিকি মেকেঞ্জি-সেলে
　　বিকোয়, তা দেখে অবাক লাগে।
ওরা পাড়ে হাঁক—এক, দুই তিন—
বেশী যত দেয় তত করে দীন ;
সতীলক্ষ্মীর এ কী দুর্দিন,
　　বারবনিতার সঙ্গ মাগে!
বুনো রামনাথ গালে দিয়ে হাত
　　গালি শুধু দেয় তেঁতুল-শাগে!

এ কী ভয়ানক দীনতা তোদের
　　ভাই গোরাচাঁদ, নিতাই দাদা,
না ছাড়িস যদি সঙ্গ ওদের
　　পাঁকের সঙ্গে হবি রে কাদা।
ছায়া হয় নাই আজো সব ছবি,
চাঁদ ঢালে সুধা, আলো দেয় রবি ;
গুড়ের হাঁড়িতে সব মৌ-লোভী
　　ভ্রমরেরা আজো পড়ে নি বাঁধা ;
টাকা আনা পাই আজো পারে নাই,
　　ঘুচাতে সবার সরম-বাধা।

ভুলিস্‌নে ভাই, তোরা দিগ্‌গজ,
　　খাস্‌নে এমন ব্যাঙের লাথ,
দেখ রে খতিয়ে খাটিয়ে মগজ,
　　সোনা-মুষ্টিও নেবায় বাতি।
তোরা ব্রাহ্মণ, তোরা শিরোমণি,
বহু মানে তোরা হয়েছিস ধনী,
অন্তরে যার হীরকের খনি
　　কোন্ দুখে হবে কাচের সাথী ?
ওরে ব্রাহ্মণ, শুচি কর্ মন
　　বোস্ পূজাধ্যানে আসন পাতি ॥

—

সাদাকাগজের অস্বাভাবিক দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার দরুন আমরা আমাদের পাঠক ও লেখক সম্প্রদায়ের কাছে লজ্জাকর জবাবদিহির ফেরে পড়িয়াছি। শারদীয় সংখ্যায় যে যে রচনা প্রকাশ করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম তাহার সকলগুলি এই বর্ধিতায়তন সংখ্যাতেও কুলাইল

জুঁইয়ের গন্ধ

শ্রীকালিদাস রায়

নগর পথে যেতে যেতে মধুর গন্ধ পেয়ে
শেঠের কুঠির গেটের 'পরে চম্‌কে দেখি চেয়ে
জুঁই ফুটেছে, পেলাম তাদের হাসির নমস্কার।
সঙ্গে পেলাম অঙ্গে আমার ঠাণ্ডা পরশ কার?
আমার কানে মিঠা গলায় জুঁইয়ের গন্ধ কয়,
চিনতে পার? জানি কবি তোমার পরিচয়।
কিন্তু একি, তোমারও নেই বিন্দু অবসর
তুমিও আজ পর হয়েছ করছ অনাদর।
শোন তবে, তিন শো বছর আগেও ছিলে কবি,
এই জনমে ভুলে গেছ সেই জনমের সবি।
তোমার বেঁশো খ'ড়ো ঘরের উঠানে এক কোণে
জুঁইয়ের মাচান বাঁধা ছিল পড়ছে তা কি মনে?
কাজল ঋতুর সজল বাতাস এম্‌নি ছিলাম ভরে,
চিন্‌তে পার কি না দেখ বাতাস টেনে জোরে।
দাওয়ায় বসে সকাল-বিকাল লিখতে ব্রজগীতি,
যেতাম রয়ে তাতেও হয়ে ঝুলন দোলার স্মৃতি।
শ্বাসবায়ুতে আমিই পশি অন্তরে তোমার,
ঘুম ভাঙাতাম তোমার হৃদয়কুঞ্জে রাধিকার।
প'রে খোঁপায় যূথীর মালা রাধার দূতীসমা
একটি পাশে রইত বসে তোমার প্রিয়তমা।
বর্ণে শুধু চাঁপার মত আঙুল ছিল তার,
কিসের গন্ধ মিলত তাতে? জুঁইয়ের না চাঁপার?
সে সব গীতি গুনগুনিয়ে গাইতে দুজনায়
তৃপ্তি পেতে পরম চরম, তাতেই হতো সায়।
জুঁইয়ের মতই ফুটত স্বতই গন্ধ তারাও দিত,
রোমাঞ্চিত জীবন তোমার রাখত সুরভিত।
তোমার পাশে কপোতগুলি আসত উড়ি উড়ি
ডাকত দূরে থেকে থেকে ডাহুকী দাহুরী।
তোমায় ঘেরি চাল গড়ায়ে ঝরত বারিধারা,
তারই ফাঁকে দেখতে ধরায় মায়ায় সালঙ্কারা।
মেঘের ধ্বনির তরঙ্গেতে গগন যেত ভরি'—
দেখছ ঘড়ি? ছিল না ভাই সে দিন কোন ঘড়ি।
ভুবন, পবন, জীবন ছিল মন্থরতায় ভরা,
সহজ ছিল দিনের খেয়া সন্তরণেই তরা।
সত্যি তখন কবি ছিলে, এযুগ তোমার নয়,
সব ভুলেছ গীতি লেখাও ভুললে ভালো হয়।
বন্ধু, একাল আমারও নয়, এ নয় মোদের ঠাঁই,
স্থান-কালের সঙ্গে মোদের সঙ্গতি যে নাই।

না, বেশ কিছু পরিমাণ নির্বাচিত রচনা হাতে রাখিয়া দিতে হইল। শ্রীমতী বীণা চক্রবর্তী, শ্রীপ্রভাত দেবসরকার, শ্রীমানবেন্দ্র পাল ও শ্রীদেবব্রত ভৌমিকের উপচীয়মান গল্পসম্ভার পরবর্তী সংখ্যার শোভা বর্ধন করিবে। এই অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তনের জন্য আমরা লেখক-পাঠক উভয় সম্প্রদায়ের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

"গ্রন্থ-পরিচয়" বিভাগও এই ব্যস্ততার ও স্থানাভাবের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হইল না।

কার্তিকে আমাদের নূতন বৎসর আরম্ভ। পূজাবকাশের অব্যবহিত পরে কার্তিক-সংখ্যা বিশেষ নববর্ষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে। উহাকে শারদীয় সংখ্যার পরিপূরক সংখ্যাও বলিতে পারি। কার্তিক সংখ্যা হইতে শ্রীঅমলা দেবীর একটি উপন্যাস 'শনিবারের চিঠি'তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইবে।

বার্ষিক ও ষান্মাসিক চাঁদা ইত্যাদির কথা কর্মাধ্যক্ষের বিজ্ঞপ্তিতে দ্রষ্টব্য।

জাম্বু-হনু-সংবাদ

"বনফুল"

জাম্ববান কহিলেন, ভাই হনুমান,
নহে ইহা মিথ্যা অনুমান
ষোল-আনা ফাঁকি রাম দিয়াছে মোদের।
জান দিয়া প্রাণ দিয়া মোরা লড়িলাম
সীতার উদ্ধার কার্য মোরা করিলাম
কিন্তু চাকরি সব পাইতেছে অযোধ্যাবাসীরা,
শ্রীরামের আত্মীয়ের আত্মীয়ের ক্ষুদ্রতম শিরা-উপশিরা
রুধিরে ভরিয়া গেল দাদা,
ঘোড়ার শিরোপা পেল ছিল যারা অতি বাজে গাধা।
তোমার যে পূজা হয় মহাবীর নামে
ছোট বড় মন্দিরেতে নানাবিধ ধামে
সে পূজা কি তুমি পাও? পেট ভরে তাতে?
সব খায় পুরুতে পাণ্ডাতে।
বাহিরে তোমার ওড়ে ধ্বজা
কিন্তু সব লুচি-মণ্ডা-গজা
যায় যাহাদের পেটে তারা তব বংশধর কিগো?
শাখা-মৃগ ছিল তারা, আজও তারা আছে শাখা-মৃগ।
তুমি বীর হনুমান পেটের জ্বালায়
লাফায়ে ঝাঁপায়ে ফের ডালে ডালে নর্দমা নালায়,
শাক-পাতা ফল-টল চুরি টুরি করি
কোন-ক্রমে আছ প্রাণ ধরি।
নূতন আইন না কি হয়েছে প্রচার
হনুমানে কর ত্রাখ-মার।
আমি তো লুকায়ে থাকি বনে ও বাদাড়ে
তবু ভাই আমারে না ছাড়ে
মারে, ধরে, পুরে ফেলে লোহার খাঁচায়,
নাকেতে ঢুকায়ে দড়ি কখনও নাচায়।
শ্রীরামের এই কি বিচার?
নাই এর কোন প্রতিকার?
দরখাস্ত করেছি বহু, ওরা কিন্তু চুপ!
সংক্ষেপে হনুমান কহিলেন—'হুপ'!

আয়নায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কখনো পিঁপড়ের দেখা
কখনো পাখির
তাই নিয়ে গেঁথে গেঁথে
দুঃখ সুখ যন্ত্রণা উল্লাস
জীবনের বয়ন-বিলাস।

সে নকশায় মনে হয়
নেই কোন ফাঁক।
ছক-কাটা তার রঙ দাগ,
তাই দিয়ে সোজা মানে খুঁজে
দিনরাত্রি এঁকে যাই
লাল নীল হলুদে সবুজে।
তারপর হঠাৎ অবাক,
দেখি নকশা ফুটো করে
একদিন কালের বল্মীক
উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তের কাছে
খুলে দেয় আর এক দিক।

সেখানে সঞ্চয়মত্ত
পিপীলিকা-মন দিশাহারা
উধাও পাখির ডানা
সেখানে পায় না সুখে ছাড়া।

বিবরের দেখা নয়
নয় মুক্তি নীল শূন্যতায়
নিজেরই স্তম্ভিত মুখ
দেখি আয়নায়।

স্বপন ফেরি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

স্বপন বেচি—তোমরা আমায় চিনবে কি ?
স্বপ্ন আমার রত্ন আমার কিনবে কি ?
তমালে যা স্বপন দেখে শুক-সারী—
বৃন্দাবনে—আমি যে পাই ভাগ তারি,
হীরা হবে স্বপন দেখে কয়লা গো,
আনন্দেতে আমি যে পাই তার ভাগও।
মোর স্বপনের রঙ দেখিবে
স্বাতীর সলিল-বিম্বে কি ?

২

পরশমণির পরশনের নাই দেরি,
লৌহ যারা চলছে—বাজে জয়ভেরী।
তাদের স্বপন ভরা আমার মঞ্জুষায়,
কে নেবে গো ? উল্লাসে তা মন মাতায়।
আসছে দেবী সঙ্গে লয়ে বর অভয়,
দেখছে স্বপন সাধক—তা কি করবে ক্রয় ?
গুচ্ছে গুচ্ছে ফলবে স্বপন
মুগ্ধ হবে তাই হেরি।

৩

স্বপ্ন ঘোরে মানস-সরে দিনযামি,
নন্দনে যায় কল্পতরুর ফলকামী।
ধ্রুবলোকে সত্য ডাকে নিত্য তায়,—
ক্ষীরোদ-সাগর সৈকতে সে ঘর বানায়
স্বপ্ন আমার ফিরছে সুধার মেঘ লয়ে,
ভিজবে কি কেউ আমার সাথে এক হয়ে ?
কোহিনূরের কিরীট চেয়ে
স্বপ্ন আমার ঢের দামী।

ঊর্ধ্বে ও নিম্নে

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

নিম্নে চেয়ে পথ চলো ভাই
পায় তলে ঘোর অন্ধকার,
গর্তগুলোয় পাপের বাসা
উঠছে কী দুর্গন্ধ তার !
খল সাপেরি দল সেখানে
ওত পেতে রয় দংশনে,
হঠাৎ হলেই অসাবধানী
মৃত্যু হবে কোন্‌ক্ষণে।
কেউ জানে না নিম্নেতে কোন্‌
লুকিয়ে আছে মহাত্রাস।
একটু গেলেই পিছলে চরণ
অমনি হবেই সর্বনাশ।
সর্বদা ভাই ঊর্ধ্বে চলো
স্বর্গ সেথায় মর্তেতে,
ঊর্ধ্বলোকে শান্তি শুধুই
দুঃখ নীচে গর্তেতে।
নিম্নে শুধুই পতনভীতি
ঊর্ধ্ব উজ্জলভর্গে লাল।
উত্থানেরি সোপান বাঁধা
ঊর্ধ্বে শুধুই প্রাতঃকাল।
নিম্নে রেখে বাইরেরি চোখ
বিঘ্ন সেথায় সবখানে,
ঊর্ধ্বে রেখো মনের নয়ন
অমৃতেরি সন্ধানে।
নরক কোথা ? নরক নীচে
শয়তানেরি সেথায় গান,
ঊর্ধ্বলোকে সর্ববিপদ
দুঃখেরি ভাই পরিত্রাণ।
কখনো ভাই নীচের সাথে
রাখবে না যোগসূত্ররে,
ঊর্ধ্বে থেকে সবাই হয়ো
অমৃতেরি পুত্র রে।

ওলা-কচু

('কবিতা-গদ্য')

শ্রীগোপালপাদ বিরচিত

ও তৎকৃত গো-পালতাড়নী টীকা-সম্বলিত

[গোপালদা আবার এক নূতন চ্যালেঞ্জ থ্রো করিলেন, অর্থাৎ নূতন ফ্যাসাদের সূত্রপাত করিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কবির "শ্যাম্পেন বোতলের ছিপিকা" পর্যন্ত যত লাইনভাঙা গদ্য লিখিত ও লাইন-ভাঙিয়া মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাকে যদি 'গদ্য-কবিতা' নামে অভিহিত করা হয় তাহা হইলে গোপালদা দাবি করিতেছেন,

"ছন্দে মিলে সাজানো গদ্যকেই বা 'কবিতা-গদ্য' অভিধা দিব না কেন? আমার 'ওলা-কচু' সেই মহা-সম্ভাবনার সূচনামাত্র। ইহার পূর্বেও হাজারো কবিতাবদ্ধ গদ্য হাজারো লোকে লিখিয়াছেন। ভারতের সর্বপ্রগতি-পাইওনীয়ার-পাইথন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের 'মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' হইতে আধুনিক কবির 'কোনো ভেদাভেদ নাই' পর্যন্ত রচিত 'কবিতা-গদ্যে'র সংখ্যা কোটিতে কুলাইবে না, পরার্ধে গণনা করিতে হইবে। একা ঈশ্বর গুপ্তই লিখিয়াছেন হাজার দেড়েক। তবু 'ওলা-কচু'কে 'কবিতা-গদ্যে'র সূচনা বলিতেছি মহামতি নিউটনের নজিরে। তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব আবিষ্কারের পূর্বে কোটি কোটি আপেল ফল মাটিতে পড়িয়া মাটি হইয়াছে, কিন্তু কোনটিই মাধ্যাকর্ষণের টানে পড়ে নাই। কারণ, নিউটনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের আগে মাধ্যাকর্ষণই ছিল না। তেমনই এই 'কবিতা-গদ্য' মৎ-কর্তৃক আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে এই জাতীয় গদ্য যাহা রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি নিছক পদ্য, 'কবিতা-গদ্য' এই প্রথম। আমিই এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সার আইজাক নিউটন। আমার আবিষ্কার শুধু যুগান্তকারী নয়, সমূহ ও সুমহৎ সম্ভাবনাপূর্ণ। শ্রীমান হরপ্রসাদ মিত্র ও শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠীরা এই শুভলগ্নটিকে স্মরণ করিয়া রাখিলে কবিতা, অকবিতা ও আধুনিক কবিতার লক্ষণ-নির্ণয়ে বাংলা কাব্যে বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি অর্জন করিতে পারিবেন।"

গোপালদার টীকা 'ওলা-কচু' শব্দের ব্যাখ্যা দিয়া আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "'শ্যাওলা'র 'ওলা' এবং 'কচুরিপানা'র 'কচু' লইয়া 'ওলা-কচু' হইয়াছে। আসল শিরোনামা 'শ্যাওলা-কচুরিপানা'কে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে হ্রস্ব করিয়া 'ওলা-কচু' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে দুই পক্ষেরই কুটকুটুনি 'ওল' ও 'কচু'তে অব্যাহত থাকিতেছে। আধুনিক সময়-সংক্ষেপের যুগে এই পদ্ধতিটাও আমার নূতন আবিষ্কার কিনা তাহা সুধীজনের বিবেচনাসাপেক্ষ।"

কী ধরনের ফক্কুড়িতে গোপালদা অবতীর্ণ হইতেছেন তাহা সঠিক নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমরা শিরোনামা-সহ তাঁহার সটীক 'কবিতা-গদ্য' মুদ্রিত করিতেছি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তিনি এখনও রংবাক-মন্দিরেই আছেন। কোনও বৈদেশিক কালাপাহাড়ী প্রভাবে তাঁহার মনের সহজাত ধর্মের গাম্ভীর্য ও মহিমা শিথিল ও ধূলিসাৎ হইতে বসিয়াছে, এই ক্লেশকর সন্দেহও এই সঙ্গে মনে উঁকি দিতেছে। ভগবান বুদ্ধ তাঁহাকে সুমতি দিন, ইহাই প্রার্থনা।—সম্পাদক, 'শনিবারের চিঠি']

পূর্ব দুয়ারে ছিল বহু ডোবা পুরাতন,
এঁদো ডোবা ভরা ছিল দামে আর শ্যাওলায়।
পচে হেজে নিস্তেজপ্রায় সে ঝাঁজির বন,
মালিকেরা শোচে—তুলে ফেলে কোথা
এ জ্বালায়॥

শব্দার্থ। পূর্ব দুয়ার=ভারতবর্ষের ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার। দাম=জলজ তৃণবিশেষ। ঝাঁজি=জলজ গুল্ম বা শৈবাল-বিশেষ। মালিকেরা=ভারত-ভাগ্যবিধাতারা। শোচে=(রাষ্ট্রভাষা) ভাবে, চিন্তা করে, বিচার করে। জ্বালায় =জ্বালায় যে তাহাকে=অবাঞ্ছিতকে।

[গো-পালতাড়নী টীকা।

ভেবে ভেবে বিহ্বল—রাম,
কাম, বাম, আর বলরাম,
সংঘ, সভা, ব্লক ডান-বাম
সাত দল মিলে কাঁদে চোখে জল উথলায়।
বৃদ্ধ গৃধ্র বলে, "ছলে বলে কৌশলে
বিলকুল কেটে বাদ দিয়ে দাও ও-শালায়।
দুধে দিতে জল চাই, কিবা কাজ শ্যাওলায়।"

টীকার শব্দার্থ। রাম—রামরাজ্যপ্রার্থী, কংগ্রেস। কাম—যাহারা কাম করে, মজদুর। বাম—বামপন্থী, সি. পি. আই.। বলরাম—হলধর, হল চালায় যারা, কৃষক-প্রজাপার্টি, প্রজা সোসালিস্ট পার্টি। সঙ্ঘ—জনসঙ্ঘ। সভা—হিন্দুমহাসভা। ব্লক ডানবাম—বাম ডান বা কখনও লেফ্‌ট কখনও রাইট হাঁকিয়া যাহারা আগাইয়া যায়, ফরওয়ার্ড ব্লক। বৃদ্ধ গৃধ্র—রাজাগোপালাচারী, 'দি ওয়ে আউট' পুস্তকে বাংলা দেশকে ভারত হইতে সম্পূর্ণ বাদ দিতে বলিয়াছিলেন। দুধে জল···শ্যাওলায়—দুধে অবাধে জল মিশানো চলে কিন্তু জলে শ্যাওলা থাকিলেই ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। দুগ্ধব্যবসায়ীদের কাছে শ্যাওলাই কণ্টক।]

ঈশান-অগ্নিকোণ জুড়ে পূবে ওঠে ঝড়,
উত্তাল হয়ে ফুঁসে ওঠে নদ-নদী জল।
কচুরিপানায় ভরা খালবিল সরোবর
ঢালু পশ্চিম পানে সহসা নামায় ঢল॥

শব্দার্থ। ঈশান—শ্রীহট্ট-নোয়াখালি। অগ্নি—চট্টগ্রাম-বরিশাল।

[গো-পালতাড়নী টীকা।

সব বাঁধ ভেঙে একাকার,
শৃঙ্খলা ছিঁড়ে ছারখার;
প্রবল সে স্রোত ক্ষুরধার
পশু পাখী মানুষেরে ঠেলে দেয় রসাতল।
দর্শনা-বেনাপোলে নিষেধ-নোটিশ ঝোলে,
কে কার বারণ শোনে, কে বা মানে শৃঙ্খল!
খল-খল হাসে শুধু থৈ থৈ ঘোলা জল।]

জল নেমে গেলে দেখি সীমানার সে ডোবায়
শ্যাওলার বুক জুড়ে কচুরিপানার রাশ।
মুমূর্ষু-মুখে মৃদু প্রতিবাদ শোনা যায়—
"কী আপদ! এরা দেখি ঘটায় সর্বনাশ॥"

[গো-পালতাড়নী টীকা।

জমি ও রেফুজী ঋণ নিয়ে
কেউ কাঁদে ইনিয়ে-বিনিয়ে,
কেউ থাকে ছুরিটা শানিয়ে।
লেগে থাকে ঠেলাঠেলি লাঠালাঠি বারোমাস।
কেউ দূরে যায় সরে কেউ যায় হেজে মরে
গিয়ে ফের ফিরে এসে এখানেই করে বাস।
শ্যাওলার দলে শেষে মেশে কচুরির রাশ।]

নবীনের ছোঁয়া লেগে প্রবীণের মরা প্রাণ
আবার সজীব হবে, ইথে নাই সংশয়।
শ্যাওলার 'ওলা' আর কচুরির 'কচু'খান
মিলে গিয়ে 'ওলা-কচু'—সবে গাবে তারি জয়॥

[গো-পালতাড়নী টীকা।

ওলা-কচু মিলে মিশে রও,
এক আশা, এক ভাষা হও,
তোমরা তো দুই কভু নও—
পরস্পরেরে তবে কেন এ হিংসা-ভয়?
এক মন এক প্রাণ ওলা-কচু-জয়-গান
লিখিতেছে ভাবীকাল, মিলে যদি এক হয়
অজেয় হইবে এরা ইথে নাই সংশয়।]

কচুরির রসে তাজা হোক্ শ্যাওলার প্রাণ,
ভনিছে গোপালপাদ, দু'য়ে মিলে হেথা থাক্
জীবনে মহৎ হোক্; প্রাণ দিয়ে বলিদান
কম্পোস্ট সার রূপে চিরজীবী হয়ে যাক॥

শব্দার্থ। গোপালপাদ—তিব্বতে বসিয়া বৌদ্ধতন্ত্রমতে গোপালদা চর্যাপদকার কানুপাদ, লুইপাদ, ডম্বরুপা সরোরুহপাদের অনুসরণে নবচর্যাপদ রচনা করিতেছে

রবীন্দ্র-জীবনীর উপকরণ

শ্রীসারদারঞ্জন পণ্ডিত

[রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালে ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ হইতে আমরা কখনও ধারাবাহিক ভাবে, কখনও বিক্ষিপ্ত ভাবে রবীন্দ্র-জীবনীর উপকরণ প্রকাশ করিয়াছি। সে সকল উপকরণ এখন সর্বসাধারণের সম্পত্তি। কেহ বলিয়া এবং কেহ না বলিয়া এগুলি নিজেদের গবেষণায় ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতেই আমরা খুশি। রবীন্দ্র-জীবনীর উপকরণ যত অধিক সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হয় বাংলা সাহিত্যের ততই কল্যাণ। শ্রীমান সারদারঞ্জন এই সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া গোড়াতেই যে পত্রগুলি সাধারণের দরবারে উপস্থিত করিতেছেন তাহার মূল্য অনেক। রবীন্দ্র-জীবনের অনেক ফাঁক ইহার দ্বারা পূরণ হইবে। বলা বাহুল্য, বিশ্বভারতীর সৌজন্যে এইগুলি প্রকাশিত হইতেছে। টীকাগুলি আমরাই যোজনা করিয়া দিলাম। স., শ. চি.]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা তিনখানি অপ্রকাশিত পত্র আমি সংগ্রহ করেছি। পত্রগুলির মধ্যে রবীন্দ্র-জীবনীর উপকরণ পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের দোষ-ক্রটি দেখিয়ে সাহিত্য-সমালোচক অমরেন্দ্রনাথ রায় 'রবিয়ানা' নাম দিয়ে একখানি ছোট পুস্তিকা লেখেন (২৬শে শ্রাবণ, ১৩২৩)। কয়েক মাস পরে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় (পৌষ, ১৩২৩)। এই পুস্তিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা-সাহিত্য-জগতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে রবীন্দ্র-ভক্তরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। সেই সময় জনৈক রবীন্দ্র-ভক্ত একখানি 'রবিয়ানা' কবিগুরুকে পাঠিয়ে দিয়ে লেখেন,—'এর প্রতিবিধান করা উচিত।' তাঁর উত্তেজিত অবস্থা শান্ত করার জন্য তাঁকে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্র লেখেন। পত্রটি এই :

কলিকাতা

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আজ এই মাত্র আপনার পত্র পাইলাম। কাল ডাকযোগে যখন রবিয়ানা বইখানি আমার হাতে আসিল তখন মনে করিয়াছিলাম স্বয়ং গ্রন্থকার আমাকে স্মরণ করিয়াছেন। আমি পড়ি নাই, হাতেও রাখি নাই। লেখকের উদ্দেশ্য ও বক্তব্য যদি সত্য হয় তবে তিনি সত্য ফল পাইবেন। যদি না হয় তবে দেশসুদ্ধ লোকে তাঁকে বাহবা দিলেও তাঁর লেখা অমর হইবে না। তাঁকে আমি চিনি না, তাঁর সম্বন্ধে আমার কোনো নালিশ নাই। সত্য নিজেকেই নিজে রক্ষা করে—আমাদের কিই বা শক্তি, কদিনেরই বা মেয়াদ!

অমরেন্দ্রবাবুকে crush করিবার জন্য আপনি এত উত্তেজিত কেন? জীবনে ইহার চেয়ে আরো অনেক বড় কাজ আছে। কে দলিত হইবে এবং কে আদৃত হইবে তার ভার মহাকাল নিজের হাতে লইয়াছেন, তাঁর উপরে

গোপালপাদ ভনিতায় তিনি সেই ইঙ্গিত করিতেছেন। তিব্বতেও গুরুক্রমে মারপা, অর্থাৎ মারপাদ এবং মিলারেপা অর্থাৎ মিলারেপাদ একাদশ-দ্বাদশ শতকের মানুষ হইয়াও আজিও পূজিত হইতেছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে বাংলা চর্যাপদের তিব্বতী, চীনা ও সংস্কৃত টীকাকারেরা বাঙালীর সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছেন। সুতরাং গোপালদার স্বকৃত টীকা অশোভন নয়। কম্পোস্ট সার—কচুরিপানা ও শ্যাওলা গোবরের সহিত মিশাইয়া মাটির গভীরে কিছুদিন রাখিয়া দিলে সব পচিয়া মিলিয়া উৎকৃষ্ট কম্পোস্ট সার হয়।

[গো-পালতাড়নী টীকা।

ভাষা নিয়ে হাসি-অবহেলা,
ই-বি হয়ে ফুটবল খেলা,
দলাদলি ছাড় এই বেলা;
মিলে বঙ্গে-রাঢ়ে হও পাঁচ কোটি বিশ লাখ।
দুনিয়ায় তুলে শির ঘোষ জয় বাঙালীর,
অভাগা গোপাল পুনঃ নষ্ট শান্তি ফিরে পাক,
এবং স্বদেশে ফিরে দুধে-ভাতে সুখে থাক্।]

নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করিতে পারেন। আর একটি সবিনয় অনুরোধ, আমাকে কবি বলিয়া আদর করিতে চান সম্মানিত হইব, কিন্তু ঋষি বলিয়া পরিহাস করিবেন না। যাঁরা আমাকে ঋষি প্রমাণ করিতে ব্যস্ত এবং যাঁরা কোমর বাঁধিয়া তার প্রতিবাদ করিতে উদ্যত উভয়েই এমন প্রহসন অভিনয় করেন যার হাস্যকরতা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহাদের নাই। এই সমস্ত সাহিত্যিক গ্রাম্যতা ও দীনতা যাঁদের রুচিকর তাঁরা আনন্দে থাকুন, তাঁদের ভোগের সামগ্রীর কোনোদিন অভাব হইবে না। ইঁহাদের হাতের মার খাওয়াই আমার সৌভাগ্য—আপনি শান্ত থাকিবেন—আমার জন্য উদ্বিগ্ন হইবেন না। ইতি ৭ই আষাঢ় ১৩২৪

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই পত্রখানি পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায়। 'রবিয়ানা' প্রকাশের পূর্বে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'মিঠেকড়া' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয় (১৩০১)। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা ছিল। এর পর কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথ-রচিত 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যের বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী চালনা করেন। "কাব্যে নীতি" নাম দিয়ে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্যে' তিনি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬)। এই প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল লেখেন—"রবীন্দ্রবাবু অর্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন দেখুন। একজন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। * * * 'অশ্লীলতা' ঘৃণার্হ বটে কিন্তু 'অধর্ম' ভয়ানক। ঘরে ঘরে 'বিদ্যা' হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়। কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য। আর রবীন্দ্রবাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি পারেন নাই। সেইজন্য এই কুনীতি আরও ভয়ানক।" ('সাহিত্য', পৃঃ ১১৬-১৭)

এই সমালোচনার যোগ্য উত্তর দেন রবীন্দ্র-সাহিত্যসঙ্গী কবিবর প্রিয়নাথ সেন। তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' নাম দিয়ে ৩২ পৃষ্ঠাব্যাপী এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন ('সাহিত্য', কার্তিক, ১৩১৬)। সেই সময়ের ৭।৮ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রিয়নাথ সেনকে একখানি পত্র লেখেন (ইং ২৫।২।০২)। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথের সেই সময়ের মানসিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পত্রটি এই :

ওঁ

ভ্রাতঃ

আমাকে তুমি আদর্শ চরিত্র কল্পনা করিয়াছিলে—এরূপ অসঙ্গত কল্পনা আঘাত পাইতে বাধ্য। আমি বিনয়ের আড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না কিন্তু আমার চরিত্রে নানা ছিদ্র আছে তাহা কোন কালে আমি অস্বীকার করিতে পারি না। উন্নত আদর্শের প্রতি হৃদয়ের যতটা আকর্ষণ আছে ততটা বল নাই এ কথা আমাকে যে জানে সেই বুঝিতে পারে। ঈশ্বরের মধ্যে আমি সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি এইটুকুমাত্র বলিতে পারি—কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝিতে ও অন্যকে ভুল বুঝাইতে চাই না। এখন আমি নিজেকে নিভৃতে রাখিতে ইচ্ছা করি। যদি যথাস্থানে হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়া বল লাভ করিতে পারি তবে সংসার কোলাহলের মাঝখানে নিজের চরিত্রের দ্বারা এবং ঈশ্বরের আদর্শ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া শান্তি প্রীতি ও মঙ্গলের মধ্যে সহজে বাস করিতে পারিব। এখন আমি আত্মরক্ষা এবং আত্মস্থিতিসাধনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এখন আমি যত্ন করিয়া সাংসারিক সমস্ত ক্ষোভ মনের চতুঃসীমা হইতে দূর করিতে বসিয়াছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আমার যেটুকু বিচ্ছেদ তাহা বিরোধাত্মক বিচ্ছেদ নহে। মনুষ্যচরিত্রে ইকনমির আবশ্যকতা আছে—সময়বিশেষে নিজেকে যথাসম্ভব নানাদিক হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া একদিকে সংহত করিতে হয়—লেখাপড়া শিল্পচর্চ্চায়ও এই নিয়ম পালন না করিলে চলে না—জীবনের গভীরতর সাধনাতেও এই নিয়মের প্রয়োজন আছে। যাহা কিছু আমার এখনকার প্রয়োজনের পক্ষে অনুকূল আমি কেবল তাহাই চতুর্দিকে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করি—আর সকলকে ইহাদের জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিতেই হইবে। তুমি আমাকে বড় মনে করিয়োনা—মহৎ মনে করিয়োনা—আমাকে যাহা বলিয়া মনে হইতেছে যদি বা ঠিক তাহা নাই হই তবু আমি সেই রকমেরই একটা কিছু। ভুলও করি, অবিচারও করি, অভিমানও করি—

আবার হৃদয়কে মার্জ্জনা করিয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভেরও চেষ্টা করিয়া থাকি।

তোমার

এই পত্রের নিম্নে রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষর নেই।

কবিবর প্রিয়নাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অন্যতম প্রেরণাদাতা ও অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। আর একখানি পত্রে এর সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। পত্রটি এই :

ওঁ

ভাই

আজ সুরেনের [সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের পুত্র] চিঠি পেলুম। শুনলুম সে তোমার সঙ্গে দেখা করেছে। সে লিখেছে, ৯ পার্সেন্টে সহজে বন্দোবস্ত হতে পারে তুমি তাকে বলেচ—এই জন্যে আমার প্রতি তার পরামর্শ এই যে, ৯ পার্সেন্টেই প্রস্তাব খতম করে ফেলা। কেবল খরচাটা যাতে দুঃসহ না হয় সেই দিকে দৃষ্টি রাখা। কি বল? তাই না হয় ঠিক করে ফেল! সেজন্যে কি আমার কলকাতায় যাওয়া দরকার হবে—সুরেনের প্রতি আমার Power of attorney আছে—সকলপ্রকার ক্ষমতাই দিয়েছি—যদি সেটাতে কাজ চলে তাহলে আর নড়তে চাই নে।

কাগজ সম্বন্ধে সমাজওয়ালারা কেন চন্দ্র ব্রাদার্সের ওখানে যায় নি প্রশ্ন করে সেই "উদ্যোগ" ব্রাহ্মণটিকে পত্র লিখেছি—আগামী কল্য নাগাদ উত্তর পেলে সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়া যাবে।

এখানে কৃষ্ণপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সমাগম হয়েছে—পূর্ণচন্দ্রাননা গৌরী হঠাৎ একদিনেই নীলনীরদবরণী শ্যামামূর্ত্তি ধারণ করেচেন। তোমাকে যে দেবী কোন্ মূর্ত্তিতে দর্শন দেবেন কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু ক্ষণিকা সমালোচনার জন্যে তুমি চিন্তা করচ কেন? লোককে বোঝাবার চেষ্টামাত্র কোরোনা—ভাল লাগা আবার বোঝাবে কি? কেবল যেখানটা তোমার ভাল লাগ্‌চে সেই জায়গাটাতে গলা ছেড়ে বলে উঠো—বাঃ বেশ লাগ্‌চে! অমনি পাঠকেরাও বল্‌বে বেশ লাগ্‌চে। আগুনটা একবার ধরিয়ে দিলেই কাঠ খড় অঙ্গার সমস্ত আপনি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, নইলে তর্কশাস্ত্রের সহস্র লগুড়াঘাতে তাদের চিরান্ধকার ঘোচে না। তুমি আমার কথা একেবারে বিস্মৃত হয়ে চক্ষু বুজে লিখে যেয়ো।

শরতের [ভাবী জামাতা কবিবর বিহারিলালের পুত্র শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী] শেষ চি... কি আশাপ্রদ? অবিনাশের [বিহারিলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র] ভাবটা কি রকম? শরৎ নিজে যদি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ না করে তাহলে কি তার মা সহজে সম্মত হবেন? কিন্তু শরতই বা বেলার [কবির জ্যেষ্ঠা কন্যা, পরে শরচ্চন্দ্রের পত্নী] কোনপ্রকার পরিচয় না পেয়ে কিসের জোরে মার কাছে প্রবল ইচ্ছা জ্ঞাপন করবে? এই সমস্ত নানা কারণে বিশেষ আশা করবার কোন হেতু দেখা যায়না।

লোকেন [লোকেন পালিত] আমাকে দিনকতকের জন্যে খুলনায় যেতে পীড়াপীড়ি লাগিয়েছে—সে যেরকম কড়া হাকিম, হয় ত না নিয়ে গিয়ে ছাড়বেনা।

কাপিরাইট?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এখন রবীন্দ্রনাথের যে সব অপ্রকাশিত চিঠি পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি ক্রমশঃ এই পত্রিকায় প্রকাশের ইচ্ছে রইল। এই সব চিঠি থেকে রবীন্দ্র-জীবনের অনেক উপকরণ পাওয়া যাবে বলে আশা করি।*

* পত্রগুলি কবি প্রিয়নাথ সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রমোদনাথ সেনের সৌজন্যে পাইয়াছি।

তাসখেণ্ডে এশিয়া ও আফ্রিকা লেখক সম্মেলনে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যের এই প্রথম সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করা আমাদের সকলের পক্ষেই এক মহান সৌভাগ্যের কথা। বহু ক্ষুদ্রের সমন্বয়ে বৃহতের সৃষ্টি হয়, ব্যষ্টির সমন্বয়ে সমষ্টিই বিরাট সৃষ্টি করে, সেই সৃষ্টিতে আমরা নিশ্চয়ই শ্লাঘা বোধ করতে পারি। যৌথভাবে আমরা এই দুই মহাদেশের মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী, এবং উদীয়মান প্রাচ্যের আশা ও স্বপ্নের বাহক। মিশরের পিরামিড এবং চীন-ভারতের মৃত্তিকাগর্ভস্থ প্রাচীন সভ্যতার উপর মাটির আবরণ বিদীর্ণ হয় নি, আমরা এশিয়া ও আফ্রিকার লেখকবৃন্দ সেই ভূমির উপরেই সেই প্রাচীন ভাব-জীবনের সঙ্গে নবজীবনের উপলব্ধি নিয়ে নব অভ্যুত্থানে উত্থিত হয়েছি। এশিয়া ও আফ্রিকা মানবজাতির আদি বাসভূমি, ভৌগোলিক ও মনের দিক, দুই দিক দিয়েই। মানবজাতির বিভিন্ন শাখা হয়তো কালক্রমে পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তবু মর্মমূলে তারা আজও একই রয়েছে, যেন গঙ্গা ও ভল্গার জল, নীল ও ইয়াংসিকিয়াংয়ের স্রোতোধারা; এক সঙ্গে মিলিয়ে দিলে প্রমাণ করা যাবে না যে তাদের উৎসের মধ্যে হাজার যোজনের ব্যবধান। এই মনীষী-সঙ্গমে আজ তেমনই এক মহাসঙ্গম সৃষ্টি হয়েছে। এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্য-স্রষ্টাদের চিত্তের এই মহাসঙ্গমে অনুভব করতে পারছি পরস্পরের হৃদস্পন্দনের ভাষা, আবেগ অনুভব করছি একাত্মতার প্রীতির ও আত্মীয়তার। স্বতন্ত্র সত্তাকে বিস্মৃত হতে চাচ্ছি। এবং পরিধিতে আরও বিস্তৃত হতে চাচ্ছি, ভাবনায় জীবনাবেগে সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য-নায়কদের এই একাত্ম পরিমণ্ডলের মধ্যে আগ্রহ অনুভব করছি, অনুভব করছি এক বিরাট মানব-পরিবারের মহতী চিন্তা ও ভাবনার মধ্যে বিরোধ কোথায়, কিসের বিরোধ? মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়ে এর জন্যই তো পথ চলি, যেমন অরণ্য-সভ্যতার যুগে গহ্বর বাসভূমি ত্যাগ করে মানুষ আমরা আজকের এই সমাজ সংগঠনের পথে যাত্রা করেছিলাম।

মানুষের মন যখন আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগে জীবনের বিচিত্র পরিচয়ে ফুলের মত ফুটে উঠেছিল আমার দেশ মানুষের সেই আদিম যুগের গানকে আজও ধরে রেখেছে বেদমন্ত্রের মধ্যে। ভারতের তপোবনে অনেক হাজার বছর আগে এই গান গীত হয়েছিল, তারপর থেকে কবি-পরম্পরায় সেই গানের ধারা চলে এসেছে আজ পর্যন্ত। আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সর্ববস্তু এবং ভূতের অনুরাগে, নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর পটভূমিকায় ভারতবর্ষের কাব্য এবং সাহিত্য মানুষের জীবনের মহান পরিণতির স্বপ্ন দেখেছে। জীবনের অভিজ্ঞতা যত বেড়েছে মানুষে মানুষে একাত্মতাবোধও আমাদের মধ্যে ততই দৃঢ় হয়েছে। আমরা বুঝতে পেরেছি জ্ঞান ও প্রীতির পরিধি বিস্তৃত হয়ে যেদিন বিশ্বকে এবং সকল মানুষকে আমরা উপলব্ধি দিয়ে আলিঙ্গন করতে পারব সেই দিনই ঘটবে মানব-সভ্যতার বাঞ্ছিত পরিণতি। এবং ইতিহাস সেই পরিণতির দিকেই পথ কেটে চলেছে।

হর-পার্বতী আমার জননী, মানুষ আমার ভাই, ত্রিভুবন আমার আবাস। চিরকাল ধরে ভারতীয় কবির এই ঘোষণা। আমাদের গৌরবময় দিনে যখন বৈষয়িক এবং আত্মিক বিকাশে আমরা বিশ্বসভ্যতার পুরোভাগে, তখন সম্রাট অশোকের মৈত্রী ও করুণা নিজ সাম্রাজ্যের কূলকে অতিক্রম করে উদ্বেল আগ্রহে দেশ-দেশান্তর প্লাবিত করেছে। আবার এই আধুনিক কালে আমাদের পরম লজ্জা ও অবমাননার দিনে মহাত্মা গান্ধীর প্রেম মানুষকে নূতন পথ দেখিয়েছে। আমি যে এই দুই ঐতিহাসিক মহামানবের নাম উল্লেখ করলাম তার কারণ এই নয় যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশ্বপ্রেম শুধু তার মহৎ ব্যক্তিদের আদর্শের ছায়ামাত্র। ইতিহাস যতদূর যায় তারও আগে থেকে এই মানবিকতা-বোধ সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবেই ভারতের জীবনধর্মের অঙ্গীভূত হয়ে আছে।

আজ আমি আপনাদের সকলের কাছে ভারতবর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি, যে প্রীতি ও শুভেচ্ছা

আমাদের জীবন ও কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত একটি মনোভাব মাত্র নয়। যৌথ জীবনের সর্ববিধ কর্মের মধ্যে এই প্রীতি এবং বোঝাপড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার পথ প্রশস্ত করুক এই কামনা করি।

অধুনা বহু বিরাট ব্যাপার পৃথিবীতে ঘটছে। আরও বিরাটতর সম্ভাবনার রূপায়ণ আমরা প্রতীক্ষা করছি। ইতিহাসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে বিজ্ঞান আমাদের ও আমাদের বংশধরগণের জন্য যে দেবভোগ্য উপচার সাজাচ্ছে দেবতার মতই তা আমরা ভোগ করতে চাই। কিন্তু সন্দেহ, সংশয়, বিদ্বেষ এবং নিরবচ্ছিন্ন ভয় আজ আমাদের প্রতিনিয়ত একাত্মতার দেবভূমি থেকে পিছনে ঠেলে নিয়ে এক মহা সর্বনাশের কিনারায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। প্রীতি ও প্রজ্ঞার সঞ্জীবনী দিয়েই আমাদের এই বিষ থেকে নিরাময় হতে হবে। এ ছাড়া আমাদের অন্য পথ নাই। এ পথে যদি আমরা আর ভুল করি তা হলে বিধাতা আমাদের আর ক্ষমা করবেন না। হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায়, ত্যাগে ও সহিষ্ণুতায় আমরা যা কিছু সঞ্চয় করেছি তার সব কিছুই আমরা হারাব এবং স্রষ্টার বীক্ষণাগারে স্বল্পবুদ্ধি অতিকায় সরীসৃপের যে দশা হয়েছিল আমাদেরও তাই হবে। নিজের মেদমাংসের প্রচণ্ড চাপে মহতী বিনষ্টিই হবে পরিণতি। পৃথিবীর অন্য একটি প্রজ্ঞাবান প্রাচীন দেশ মহাচীনের সঙ্গে এক যোগে এই আসন্ন বিপর্যয়ের প্রতিষেধকের নির্দেশ ভারতবর্ষ দিয়েছে—সে হল 'পঞ্চশীল'। শুধু সাময়িকভাবে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্রয়োজনেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বাস-সিদ্ধ একটি কর্মনীতি হিসাবে। 'পঞ্চশীলের' সার্বজনীন স্বীকৃতির আজ প্রয়োজন হয়েছে। এবং এই ব্যাপারে সাহিত্যিকের গুরু দায়িত্ব রয়েছে।

পৃথিবীর বৈষয়িক ব্যাপারের নিয়ন্ত্রণ সাহিত্যিকের হাতে নাই সত্য কথা। কিন্তু সেই কারণে আমাদের হীনম্মন্যতার কোন কারণ নেই। কেন না তরঙ্গ-বিক্ষোভের নীচে ইতিহাসের যে ধারা, সেখানে চিরকাল ভাবের নিয়ন্ত্রণই বলবৎ রয়েছে। দিগ্বিজয়ী বীর অথবা ধুরন্ধর রাজনীতিকের স্থান সেখানে ভাব-নায়কের পাদপীঠে। দার্শনিক ও শিল্পীরা সেখানে সম্রাট। সেখানেও শিল্পীর শক্তি দার্শনিকের শক্তিকে অতিক্রম করে যায়। কেন না শিল্পীর শক্তির প্রভাব অনেক বেশী বিস্তৃত ও গভীর। তাই সাহিত্যিকের দায়িত্ব অসামান্য। সে দায়িত্ব আমরা কি ভাবে পালন করব সে বিষয়ে গভীর চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। যদি আমরা হেলাফেলা করে শুধু লোকরঞ্জনের তাগিদেই সৃষ্টিকার্য করে যাই তা হলে আমরা সর্বনাশকেই ত্বরান্বিত করব। আর যদি আমরা জীবনের সত্য এবং সুন্দরের উপচারে শিবের পূজা করি তা হলে শক্তি এবং সমৃদ্ধিতে আমরা একদিন দেবপদ লাভ করব, বিজ্ঞান যার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

সাহিত্যিকের সৃষ্টিধর্মের মধ্যে মানবধর্মকে মিশিয়ে দিতে হবে। যেমন বিবাহিত প্রেমের মধ্যে মিশে থাকে কাম ও গৃহরচনার ইচ্ছা, পরস্পরের পরিপূরক এবং ধারক হয়ে। এশিয়া এবং আফ্রিকার সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে বিশেষ কর্তব্য আছে। কেন না বিগত দু শো বছরের লাঞ্ছনা এবং অবমাননার অভিজ্ঞতার মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকা বর্তমান সভ্যতার অন্ধকার দিকের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছে। মানুষের আদি বাসভূমি হিসাবে বহু সভ্যতার স্বাদ রয়েছে এশিয়া ও আফ্রিকার অভিজ্ঞতায়। মানুষের জীবন-দেবতার কল্যাণতম রূপ সে দেখেছে; আর দেখেছে ক্ষুধিত নৃশংস ক্ষমাহীন নরসিংহ মূর্তি। প্রীতির পাত্রে ইতিহাসের সেই অমৃত ও বিষকে পাক করে নবজীবনের রসায়নে পরিবেশন করতে হবে এশিয়া ও আফ্রিকার সাহিত্যিককে। এই সম্মেলন আমাদের সেই কর্তব্যের সহায় হোক।

দ্বন্দ্ব

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সমুদ্র বলে, পৃথিবী, আমি মৃত্যুর মত রহস্যময়। আমার অকূল অতলে লুকিয়ে রেখেছি আদিম বার্তা। পৃথিবী বলে, সমুদ্র, আমি জীবনের মত বিশদ। আমার স্বচ্ছ দিবালোকে ফুটিয়ে রেখেছি অনন্ত সম্ভাবনা।

গয়ানাথ নুলিয়া যুবক, শাখা-প্রশাখাহীন সরল তমালকাণ্ডের মত তার দেহ। ভোর না হতেই দুখানা কাঠের টুকরো জোড়া-দেওয়া ভেলা নিয়ে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। তখন নীল জলের আসরে চলছে সাদা ফেনার পাশা-গড়ানো।

সমুদ্র বলে, পৃথিবী, আমি মৃত্যুর মত চঞ্চল, পৃথিবীর কূলে কূলে আমি উচ্চারণ করছি নিশ্চয়তার মন্ত্র।

পৃথিবী বলে, সমুদ্র, আমি জীবনের মত ধ্রুব, সমুদ্রের কানে কানে জানাচ্ছি আঁকড়ে ধরবার আগ্রহ।

গড়িয়ে-ছুটে-আসা ত্রিবলী তরঙ্গের ঝাপটায় ওলট-পালট খায় গয়ানাথের ভেলা, আকাশের দিকে উঠে তখনই যায় তলিয়ে, কেবল কালো মাথার বিন্দুটা দেখা যায় নীলজলের পটে।

সমুদ্র বলে, পৃথিবী, আমি রত্নাকর, লুকিয়ে রেখেছি পরম ঐশ্বর্য নীলার মঞ্জুষার নিভৃতে। পৃথিবী বলে, সমুদ্র, আমি ষড়ৈশ্বর্যময়ী, মেলে রেখেছি আমার সম্পদ মরকতের দিগন্ত-জোড়া থালায়।

দুপুরবেলা আকাশে অসংখ্য চিলের রেখার মত সমুদ্রের পটে ভেলার দাগ। ওর মধ্যে কে বলবে কোন্‌খানা গয়ানাথের। ওরা নির্ভয়ে যায় এগিয়ে, ভূখণ্ডের বাড়িঘর, গাছপালা মিলেমিশে সব যায় একশা হয়ে; কেবল জেগে থাকে শ্রীমন্দিরের তর্জনী। ওই ওদের ভরসা। সেটা হেলে পড়ে মিলিয়ে যাবার আগেই মুখ ফিরিয়ে দেয় ওরা ভেলাগুলোর।

মুঠো মুঠো শুক্তি নিক্ষেপ করে আনমনা পৃথিবীর মন টানতে চেষ্টা করে সমুদ্র, তার বালুচরী শাড়িতে সাদা ফেনার ফুল ফুটিয়ে দেয়, দমকা বাতাসে এলোমেলো করে দেয় তার কুন্তল। কী বলছ, বলে পৃথিবী।

আমাদের দ্বন্দ্ব কি মিটবে না?

জীবনমৃত্যু দ্বন্দ্বের সীমান্ত কোথায়, শুধায় পৃথিবী।

কেন, ওই সৈকতে যেখানে তোমার আমার দুজনেরই অধিকার, যেখানে জোয়ারে আমার লীলা, যেখানে ভাটায় তোমার আসন, জোয়ারেও মৃত্যুর গ্রাস, ভাটায়ও জীবনের সত্তা। শিশু চন্দ্রকলার মত ওই কন্যাভূমি, ওখানে কি মেলে নি জীবন আর মৃত্যু, মেলে নি কি সমুদ্র আর পৃথিবী?

বুঝতে পারি নে তোমার কথা, তুমি সত্যই রহস্যময়।

সে রহস্য কি তোমার মৌনের চেয়েও গূঢ়তর!

ভোরবেলা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখি মূর্ছিত পড়ে আছে আকুলমূর্ধজা রমণী।

কে?

গয়ানাথের স্ত্রী।

কেন?

গয়ানাথের ভেলা ফিরে এসেছে, গয়ানাথ ফেরে নি। কন্যাবেলাভূমিতে শায়িত নারীর পা দুখানা গ্রাস করেছে জোয়ারের জল, শিয়রে আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে বালুচরী শাড়ির প্রান্ত। জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্ব কি ওর মিটল!

জীবন-বেদের অভিধান

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ছেলে বয়সে শুনিয়াছি, সংস্কৃত শুদ্ধরূপে লিখিবার জন্য শুধু দুটি ধাতুর রূপ জানিলেই চলে। 'ভূ' ধাতু (হওয়া) আর 'কৃ' ধাতু (করা)। তখন কিন্তু বুঝিতে পারি নাই মানুষের সমস্ত জীবনটাই হইতেছে শুধু 'করা' আর 'হওয়া'র বিচিত্র রূপ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের জীবনের লক্ষ্য হইতেছে 'করা', আর আমাদের জীবনের লক্ষ্য 'হওয়া'। কথাটা এই হিসাবে সত্য যে, লক্ষ্যহীন কর্ম-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেওয়াকে আমরা কখনও জীবনের পরম কল্যাণ বলিয়া মনে করি নাই, পূর্ণতা লাভের সাধনাকেই আমরা শ্রেয়ের পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ভগবান ঈশার মন ছিল প্রাচ্য ধাতুতে গড়া, তাই তিনি পূর্ণতা লাভের কথাই বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও।

'Be ye, therefore, perfect even as your Father which is in Heaven is perfect.'

কিন্তু এই পূর্ণতা লাভের জন্য চাই কঠোর সাধনা, উদগ্র তপস্যা। কর্মের মধ্য দিয়াই মানুষের জীবনে আসে পূর্ণতা, মানুষ লাভ করে দিব্য জীবন, দিব্য চেতনা। সুতরাং কর্মের মধ্য দিয়া 'হওয়া'-ই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

কর্মের মধ্যে একটা নেশা আছে, একটা উত্তেজনা, একটা উন্মাদনা আছে। এই উন্মাদনা যখন মানুষকে পাইয়া বসে, তখন সে মনুষ্যত্বের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয়। এইজন্য গীতা নির্দেশ দিয়াছেন, যোগস্থ হইয়া কর্ম কর। পাশ্চাত্ত্য মনীষী রুডলফ্‌ অয়কেন (Rudolph Euken) বলিয়াছেন, যে কর্মের দ্বারা আমাদের আত্মোপলব্ধি হয় তাহাই কর্ম। নিছক বাঁচিয়া থাকা ও বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে কর্ম তো ইতর প্রাণীরাও করিয়া থাকে, এইসব কর্মের মূলে থাকে সহজ প্রেরণা। মানুষ সহজ প্রেরণার বশেও কর্ম করে, আবার তাহাকে কর্তব্যবোধে পরিবার প্রতিপালনের জন্য কর্ম করিতে হয়। কেহ কেহ সমাজ বা দেশের হিতের জন্যও কর্মও করেন। যাঁহারা লোকহিত বা লোক-সংগ্রহের জন্য কর্ম করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অবশ্য খুব বিরল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই মানুষ কর্ম করুক, প্রত্যেকেরই কর্মপাশে জড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা আছে। এইজন্য ভগবান গীতায় নির্দেশ দিয়াছেন, নিষ্কাম ভাবে কর্ম কর। কথাটা বলা খুবই সহজ কিন্তু কার্যে পরিণত করা অতিশয় শক্ত। জার্মান দার্শনিক কাণ্ট বলেন, সহজ প্রবৃত্তি বা ভাবাবেগের বশে কর্ম করিও না, কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কর্ম কর। কাণ্টের নির্দেশ অনুসারে চলাও খুব সহজ নয়। অথচ কর্ম মানুষকে করিতেই হইবে, নতুবা সে বাঁচিবে কেমন করিয়া, বাড়িবে কেমন করিয়া, উন্নতি লাভ করিবে কেমন করিয়া? কর্ম না করিলে তো প্রেয় বা শ্রেয় কোনটাই লাভ করা যাইবে না। কিন্তু তুমি কি করিতেছ, সে বিষয়েই শুধু তোমাকে সচেতন হইলে চলিবে না। তুমি কি হইতেছ, সে বিষয়েও তোমার মনকে সজাগ রাখিতে হইবে। জীবনের অভিধানে দুইটি মাত্র ধাতু—'কৃ' ধাতু আর 'হ' ধাতু, আর সকল ধাতু ইহাদের অন্তর্গত। আবার যে যাহা চিন্তা করে, সে তাহাই হয়। তাই যে ছেলে বা মেয়ে প্রতিদিন ভাবে, আমি বড় হইব, আমি মানুষ হইব, তাহার আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয়, সে বড় হয়, সে ধীরে ধীরে মানুষ হইয়া উঠে। সকল শাস্ত্রের নির্দেশ মাত্র দুইটি ধাতুর দ্বারা প্রকাশ করা যায়। পড়াশুনা কর ও আত্মচিন্তা কর, জ্ঞানী হইবে; মনকে বশীভূত কর, জিতেন্দ্রিয় হইবে, শারীর-চর্চা কর, সুস্থ ও বলিষ্ঠ হইবে ইত্যাদি। আবার কি করিবে না ও কি হইবে না, শাস্ত্র তাহারও নির্দেশ দিয়াছে। আমাদের দুইখানি জাতীয় মহাকাব্যের উপদেশও তাহাই—'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন তু রাবণাদিবৎ', রামচন্দ্র প্রভৃতির মত হইবে, রাবণাদির মত নয়', 'যুধিষ্ঠিরাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্‌ ন তু দুর্যোধনাদিবৎ'। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, রামচন্দ্র বা যুধিষ্ঠিরের কি সকল কার্যই সমর্থনযোগ্য? সে প্রশ্নের উত্তর দিবার স্থান ইহা নয়। আমরা শুধু একটি

কথা এখানে বলিতে চাই। 'ভূ' ও 'কৃ' ধাতুর দ্বারা আমরা শ্রীভগবানের স্বরূপও যেন কতকটা বুঝিতে পারি। শ্রীভগবান অক্লান্তকর্মা ও বিচিত্রকর্মা পুরুষ অর্থাৎ তিনি সর্বদাই অতন্দ্রিত ভাবে কার্য করিতেছেন এবং ভক্তের চোখ দিয়া দেখিতে গেলে তিনি তিলে তিলে নূতন হইতেছেন।

* * *

মানুষের জীবন বিচিত্র ইচ্ছার সমষ্টি। তবে সকল মানুষের মধ্যে সকল ইচ্ছা সমান পরিস্ফুট নহে। কাহার মধ্যে কোন্ ইচ্ছা প্রবল, তাহা জানিতে পারিলে আমরা বলিয়া দিতে পারি, সে কোন্ স্তরে অবস্থান করিতেছে। আমরা কয়েকটি 'সন্' প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারা মানুষের এই বিচিত্র ইচ্ছাগুলিকে প্রকাশ করিতে পারি।

(১) বাঁচিবার ইচ্ছা বা জিজীবিষা
(২) ভোগের ইচ্ছা বা রিরংসা
(৩) জয়ের ইচ্ছা বা জিগীষা
(৪) হননের ইচ্ছা বা জিঘাংসা
(৫) যশোলাভের ইচ্ছা বা যশোলিপ্সা
(৬) জানিবার ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসা
(৭) শুনিবার ইচ্ছা বা শুশ্রূষা
(৮) মুক্তিলাভের ইচ্ছা বা মুমুক্ষা
(৯) সৃজনের ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা

ইহাদের মধ্যে বাঁচিবার ইচ্ছা ও ভোগের ইচ্ছা ('ভোগ' কথাটি এখানে সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে) নিছক জৈব প্রবৃত্তি, ভারতের ঋষিগণ এই দুইটি প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। ঈশোপনিষদে বলা হইয়াছে :

'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে'॥

আসক্তিশূন্য ভাবে কর্ম করিয়া শত বর্ষ বাঁচিতে ইচ্ছা কর। ইহা ভিন্ন কর্মপাশ হইতে মুক্তিলাভের আর কোন উপায় নাই।

আবার শাস্ত্রকার নির্দেশ দিলেন : পশুর মত ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিয়ো না। সুসন্তান-লাভের জন্য ইন্দ্রিয়সমূহকে ও মনকে সংযত কর। তারপর, সামাজিক কর্তব্যপালনের উদ্দেশ্য সংযত হইয়া ভোগ কর।

জিগীষা ও জিঘাংসার মূলে রহিয়াছে যুযুৎসা অর্থাৎ যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি রজোগুণ-সমুদ্ভব। আমাদের শাস্ত্রে বলে জিগীষা ও জিঘাংসা সকল সময়ে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কারণ, ক্ষত্রিয়ের জীবনের ব্রত : অধর্মের দলন, ধর্মের স্থাপন।

যশোলিপ্সার মূলে আছে আত্ম-প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা। ইহাও রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। আমাদের দেশের কবি-সময়প্রসিদ্ধি অনুসারে যশ শুভ্রবর্ণ। বিষ্ণুশর্মা বলেন, যে সকল গুণ মহতের প্রকৃতিসিদ্ধ তাহার মধ্যে যশোলিপ্সা একটি। বাস্তবিক যশোলিপ্সা হইতে সংসারে অনেক মহৎ কর্ম উৎসারিত হইয়া থাকে। কিন্তু আবার অনেক হীন কার্যের মূলেও থাকে যশোলিপ্সা।

মানুষের যথার্থ জ্ঞানলাভের মূলে থাকে জিজ্ঞাসা ও শুশ্রূষা। যিনি তত্ত্ববস্তু বা সত্যকে জানিতে চাহেন তাঁহাকে বলা হয় জিজ্ঞাসু আর যিনি আচার্য্যের মুখে তত্ত্বকথা শুনিতে আগ্রহান্বিত, তাহাকে বলে শুশ্রূষু। আজকাল তেমন আচার্যও মিলে না, জিজ্ঞাসু বা শুশ্রূষু শিষ্যও মিলে না। এখন আছেন 'বহবো গুরবো দেবি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ'। গীতায় কিন্তু জিজ্ঞাসুকেও ভক্ত বলা হইয়াছে। শুশ্রূষু শিষ্য সম্পর্কে ভগবান মনু বলিয়াছেন :

'যথা খনন্ খনিত্রেণ নরো বার্য্যধিগচ্ছতি।
তথা গুরুগতাং বিদ্যাং শুশ্রূষুরধিগচ্ছতি'॥

মানুষ খনিত্রের দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে যেমন পরিশেষে জলের সন্ধান পায়, তেমনই শুশ্রূষু শিষ্যও গুরুগত সমস্ত বিদ্যাকে প্রাপ্ত হয়।

এই জিজ্ঞাসা ও শুশ্রূষা হইতেই জাগে মুমুক্ষা অর্থাৎ মুক্তিলাভের ইচ্ছা। সংসার অনিত্য, দেহ অনিত্য, এই ধারণা যখন স্পষ্ট হয়, তখনই মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে। পাখি যখন নিজের বন্ধনদশায় ক্লেশ অনুভব করে, তখনই সে মুক্ত আকাশের দিকে উড়িয়া যাইতে ব্যগ্র হয়। যাহারা মুক্তিকামী তাহারা ধন্য। কিন্তু সংসারে হাজার-করা নয় শত নিরানব্বই জনেরই ধারণা নাই যে, তাহারা বন্ধনদশা ভোগ করিতেছে। আচার্য শঙ্কর বলেন, সংসারে তিনটি জিনিস দুর্লভ, দৈবানুগ্রহ ভিন্ন ইহার কোনটিই লাভ করা যায় না। এই তিনটি জিনিসের নাম—মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের সঙ্গ।

মানুষের মধ্যে আর একটি ইচ্ছা আছে উহা সৃজনের ইচ্ছা বা সিসৃক্ষা। ইহারও মূলে রহিয়াছে আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা। কবি, চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি ইহারা সকলেই স্রষ্টা। আমাদের শাস্ত্রে কবিকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। কবি বা শিল্পীরা মায়ার জগতের মধ্যে আর একটি মায়ার জগৎ সৃষ্টি করেন, জগদ্রূপ সুখদুঃখদাত্মক স্বপ্নের মধ্যে নূতন নূতন স্বপ্ন দেখাইয়া আমাদিগকে অলৌকিক আনন্দ দান করেন। কবিরা যে অলৌকিক জগৎ সৃষ্টি করেন, সেই জগতের রহস্যের যাঁহারা সন্ধান করেন, তাঁহাদিগকে বলা হয় আলঙ্কারিক। সাহিত্যিক বা শিল্পী যে সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করেন, উহা আমাদের মনে জাগায় সীমাহীন বিস্ময়, সেই বিস্ময় হইতেই পাশ্চাত্য দেশে নন্দন-তত্ত্ব বা সৌন্দর্য-শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যের মনীষীরা মানুষের জীবনকে গ্রন্থের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। আমরা বলি, জীবন-গ্রন্থ যিনি পাঠ করিতে পারেন, তিনি অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি লাভ করিতে পারেন। সুতরাং এরূপ পাঠকের কাছে জীবন একটি মহাগ্রন্থ, ইহা বেদ। আমরা আমাদের প্রবন্ধের নামকরণ করিয়াছি 'জীবন-বেদের অভিধান', কারণ, আমরা দেখাইয়াছি, মানুষের সমগ্র জীবনটাই দুইটি ধাতুর বিচিত্র রূপ মাত্র, আর মানুষের বিভিন্ন কর্মধারা ও চিন্তাপ্রবাহের উৎসমুখে আছে কয়েকটি বিশিষ্ট ইচ্ছা। এই 'ইচ্ছা' বা 'এষণা'গুলিকে সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও সুপথে পরিচালিত করিয়াই মানুষ নবজন্ম লাভ করে ও অমৃতত্বের অধিকারী হয়।

তোমাকে দিলাম

শ্রীশিবদাস চক্রবর্ত্তী

তোমাকে দিলাম।
জানি না তোমার চোখে কোনদিন পড়ে কি না পড়ে,
তবুও অতীত স্মৃতি মনে স্মরে আজ
আমার প্রথম বই তোমাকে দিলাম।
যদি কোন দিন হাতে পড়ে
পড় বা না পড়,
একবার নেড়েচেড়ে স্পর্শ দিয়ে ধন্য করো একে ;
রেখে দিয়ো এক খণ্ড নানাবিধ সঞ্চয়ের স্তূপে।
জানবে না কেউ এর রচনার গুপ্ত ইতিহাস,
পাঠকের কাছে হব আমি গ্রন্থকার।
ভালয়-মন্দয় মিশে কিছুকাল ধরে
হয়তো স্মরণে রব সহৃদয় কোন পাঠকের ;
তারপর ডুবে যাব বিস্মৃতির অতল সাগরে
অগণিত যশঃপ্রার্থী মন্দ কবি সম।
সে যা হোক—এহো বাহ্য,
আমার আসল কথা এই—
তোমারই অদৃশ্য হস্ত এই গ্রন্থ করেছে রচনা,
আমি শুধু অনুগত লেখনী তোমার।
বাড়িয়ে বলি নি কিছু, এ আমার সত্যের স্বীকৃতি।

আমার এ মন ছিল নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য নদী সম,
আপন সীমার মাঝে নিয়ে নিজ নির্বাক জগৎ।
তুমি এলে,—এল সাথে আলোক, পুলক
জাগল সে নদীবুকে সহস্র কল্লোল।
এ বইয়ের পাতায় পাতায়
সে সহস্র কল্লোলের অগণিত ধ্বনি
অলক্ষ্যে পড়েছে ধরা অক্ষরের অমর বাঁধনে।
তাই আত্মপ্রকাশের এই শুভক্ষণে
সমস্ত অতীত স্মৃতি মনে মনে স্মরে
আমার প্রথম বই তোমাকে দিলাম।

কন্নড় ভাষার কয়েকজন বিশিষ্ট নারী-কবি

শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

কর্ণাটক-ভূমি ভারতের বহু মনস্বিনী মহীয়সী মহিলার জনয়িত্রী। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি বিজ্জা বা বিদ্যা বা বিজয়াঙ্কা, মণ্ডনমিশ্রের পত্নী উভয়-ভারতী. সহ্যপর্বতের নিকটবর্তী "বিজ্জেয়া বিভু"র অধিবাসী ভাস্করের কন্যা লীলাবতী (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) এবং আরও পরবর্তী যুগে বীরকম্প রায়ের পত্নী মধুরা-বিজয় সংস্কৃত কাব্যের রচয়িত্রী গঙ্গাদেবী স্বীয় গৌরব-বিভায় কর্ণাটদেশ প্রোজ্জ্বল করে রেখেছেন। গবেষণাক্রমে আরও দৃষ্ট হয় সে ধর্ম-প্রবণতা হেতু এই দেশের নারীগণ, যখনই যে ধর্মের অভ্যুদয় ঘটেছে, তার সমুন্নতিকল্পে দেহমন ও সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছেন। এই সকল মহীয়সী নারীদের কীর্তিকলাপ কন্নড় ভাষার নিগড়বদ্ধ থাকায় এবং তাঁদের সম্বন্ধে গবেষণার অভাব হেতু—এঁদের অনেকের সম্বন্ধে আমাদের দেশবাসী কিছুই অবগত নন। স্বল্প পরিসরে আমি এঁদের কয়েকজনের সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

১। কান্তি

কন্নড়-ভাষা-কবিদের মধ্যে সর্বপ্রাচীনা হচ্ছেন কবীশ্বরী কান্তি (জন্ম খ্রীষ্টীয় ১১০৫)। তিনি জৈনধর্মাবলম্বিনী ছিলেন। হয়সাল-রাজ বিষ্ণুবর্ধনের (খ্রীষ্টীয় ১১০৬-১১৭২ সন) সভার তিনি অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। অভিনবপম্পা নাগচন্দ্রও এই সভার অন্যতম ধন্য কবি ছিলেন। নাগচন্দ্র কান্তির প্রশংসার জন্য বিশেষ লালায়িত থাকতেন, কিন্তু কান্তি কিছুতেই তাঁর প্রশংসা করতেন না। সমস্যাপূরণমুখে উভয়ের কবিত্ব-প্রতিভার বিশেষ স্ফুরণ হত রাজসভায়। ফলে নাগচন্দ্র কান্তির প্রশংসালাভের ঐকান্তিক আশায় একদিন ঘোষণা করিয়ে দিলেন যে তাঁর পরলোকপ্রাপ্তি ঘটেছে আকস্মিক ভাবে। জীবনে যাঁকে কান্তি কখনও প্রশংসা করেন নি, মৃত্যুর পরে তাঁর তিনি স্তুতিবাদ করলেন, তাঁর বাড়িতে ছুটে এসেই—

কবিরায় কবিপিতামহ কবিকণ্ঠাভরণ
কবিশিখামণি ভাপুরে (দুঃখসূচক-সম্বোধন)।
কবিচক্রেশঙ্গে সাবু (মৃত্যু) সামনিচিত (ঘটেছে)
কটা (হায় দুঃখ)॥
ইন্নেকে (তা হলে কেন) দোরসুওগ-লগন
(দ্বারের বা দ্বারসমুদ্রের দরবারে)
ইন্নেকে কবিত্ববাদতর্ক সমস্যাং
ইন্নেকে বলবিচারম্।
চেন্নিগ (উত্তম) কবিপম্পারাজং
অলিদ বলিক্কম্ (মরণের পরে)—

এবং এই বলে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। এই কবিতা ও কান্না শুনেই মৃত পম্পারাজ নাগচন্দ্র উঠে বসলেন এবং বললেন, "তোমার প্রশংসা অর্জন করার পরে প্রতিযোগিতায় আমার জয়লাভ ঘটেছে" এবং হাসতে লাগলেন।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর কন্নড়-কবি বাহুবলি কান্তিকে দ্বারসমুদ্ররাজ বিষ্ণুবর্ধনের সভার মঙ্গললক্ষ্মী শুভগুণচরিতা অভিনব বাগদেবী বলে স্তুতি নিবেদন করেছেন—

বিবুধজনস্তুত-শ্রীবীর-দোরণ
সভেগে মঙ্গললক্ষ্মিয়নিপ।
শুভগুণচরিতে কান্তিকের পগলবে[1] না-
নভিনব[2]—বাগদেবিয়র॥

আজ কালপ্রকোপে এই নারী-কবির কয়েকটি কবিতা মাত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে পাওয়া যায়। তাঁর রচিত কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বিষ্ণুবর্ধনের মন্ত্রী ধর্মচন্দ্রের পুত্রের জ্যোতিষ্মতী তৈল প্রভাবে কবীশ্বরী কান্তির ঋদ্ধি-সিদ্ধি বিষয়ে যে কিংবদন্তী আছে, তার গূঢ় রহস্য অনুসন্ধেয়।

২। মহাদেবী অক্কা (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী)

কন্নড় দেশের ভাষা-কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নারী-কবি হচ্ছেন বীরশিব—ধর্মের প্রবর্তক বসবদেবের সমসাময়িক এবং বীর শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রপঞ্চয়িত্রী মহাদেবী অক্কা (ভগিনী)। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ

---

১ হোগুলবে—(আমি) প্রশংসা করি।

২ নানু=আমি। নানু+অভিনব=নানভিনব।

তাব্দীর মধ্যভাগে তিনি জীবিতা ছিলেন। তাঁর রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হয়ে স্থানীয় (উড়তডির) রাজা কৌশিক বলপূর্বক তাঁর পাণিগ্রহণ করলেও ধর্মবিষয়ে, জীবনের গতিপথে অন্যান্য বিষয়েও, বিশেষ মতানৈক্য হেতু—রাজা তাঁকে বেশীদিন প্রাসাদের রাজসুখভোগে মুগ্ধ করে রাখতে পারে নি। তাঁর অবস্থিতি সময়ে রাজপ্রাসাদ শিবপূজা, আরাধনা ও উৎসবের মুখ্য স্থান হয়ে দাঁড়ায়। ফলে, একদিন তর্ক-বিতর্কের ফলে তিনি ধরণীর মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ান। এ সময় কল্যাণপত্তনে বসবদেব ও তাঁর সারথিগণ শৈবধর্মপ্রচারণ বিষয়ে আত্মনিয়োগপূর্বক অবস্থান করছিলেন। মহাদেবী অক্কাও তাঁদের সঙ্গে যোগদান করলেন।

মহাদেবীর রচনাবলী :—(১) বচনগলু (বচনসমূহ); (২) যোগাঙ্গ-ত্রিবিধি (ত্রিপদী); (৩) স্বৃষ্টিয় বচন (ব্যাখ্যান-গদ্য) এবং (৪) অক্কগড়—পীঠিকে।

বীরশিব যোগি-ভক্তেরা শিবের এক একটি নামের অবতারণাপূর্বক স্বীয় রচনায় তাঁকে সর্বদা ওই নামেই আহ্বান করেন এবং প্রাণের আকুতি, আরাধনা, আবেদন-নিবেদন-প্রার্থনা জানান। মহাদেবী অক্কার শিব নাম চন্ন (বা সুন্দর) মল্লিকার্জুন। বসবদেব ও প্রভুদেব যেমন প্রভূত পরিমাণ সমাজ-শিক্ষণ বাণী প্রচার করেছেন, অক্কা মহাদেবী তা করেন নি। কিন্তু যিনি দেশের ও দশের হিতের জন্য নিজের যাবতীয় জাগতিক সুখভোগের উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, ভক্তির চরম প্ররোচনায় গভীর উপেক্ষায় সব ছেড়ে চলে আসতে পারেন, তিনিই বলতে পারেন, জগদ্বাসীকে সংবোধন করে—মান-অপমানের কটূভাষণের বা মিষ্টভাষণের জন্য অত ব্যতিব্যস্ত হলে কি চলে? তাঁর একটি বচনে তিনি বলেছেন, "পাহাড়ের উপর গৃহ-নির্মাণ করে জীবজন্তুকে ভয় করলে চলবে কেন? সমুদ্রসৈকতে গৃহ নির্মাণ করে তরঙ্গমালা ও ফেনরাশিকে ভয় করলে কি চলে? বাজারের উপর গৃহ-নির্মাণ করে জন-কোলাহল বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে কি ফল? এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে প্রশংসা বা অপ্রশংসায় বিচলিত না হয়ে ধৈর্য স্থৈর্য সহকারে সবকিছু মেনে নিয়ে শান্ত সমাহিত হওয়া প্রয়োজন।"

এই নারী-কবির স্নেহ-মমতা-প্রেমপ্রপূরিত হৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাস ও প্রকাশ অতুলনীয়। একটি বচনের শেষ অংশে তিনি বলছেন, "শুষ্ক পত্র খেয়েও আমি বেঁচে থাকতে পারি। যদি পর্বত আমার উপর এসে পড়ে, আমি তাকে পুষ্প বলে মনে করি। হে চন্ন মল্লিকার্জুন! যদি আমার মস্তক কর্তিত হয়, তা হলে আমি মনে করি, আমি তোমার কাছে সত্যিই সমর্পিত হলাম।"

কবির "যোগাঙ্গ-ত্রিবিধি" প্রভৃতি গ্রন্থও রূপে রসে-গন্ধে অনুপম। স্থানান্তরে আমরা তার আলোচনা করব।

৩। সাঞ্চিয় হোন্নম্মা

হোন্নমা মহীশূরের রাজা চিক্ক দেবরায়ের (খ্রীষ্টীয় ১৬৭২-১৭০৪) মহিষী এলেন্দুরু দেবম্মার স্নেহভাজন ছিলেন। তিনি ছিলেন, কাদম্বরীর ভাষায় দেবরায়ের "তাম্বূল করঙ্ক-বাহিনী" বা পানের বাটা সাজিয়ে দেওয়ার অধিকারিণী। রাণীর অনুরোধে অলসিংহরার্য হোন্নম্মাকে সংস্কৃত ও কন্নড় উভয় ভাষাই শিক্ষা দেন। কবির "হদিবদিয়-ধর্ম" বা সতীনারীর ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, তিনি অতি অল্প বয়স থেকেই রাজ-পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি মহিষীর এত স্নেহের পাত্রী ছিলেন যে মহিষী তাঁকে "কট্টনিয় পেনমণি" বা "নগরের রমণী-মণি" উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই কবির পূর্বোক্ত গ্রন্থটি ব্যতীত আর কোনও রচনা পাওয়া যায় না, কিন্তু ওই একটি গ্রন্থই তাঁকে অমরত্ব প্রদান করেছে। এই গ্রন্থ নয় সর্গ এবং ৪৭৯টি কবিতায় সম্পূর্ণ। কবি সতীনারীর ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভারতীয় নারীজীবনের মাহাত্ম্য যত দিকে ফুটে উঠতে পারে, সব দিকেই বিশেষ দৃষ্টিদান করেছেন এবং পরম সাবলীল সুমধুর ভাষায় হৃদয়ের বাণী অকুণ্ঠভাবে প্রচার করেছেন। প্রথম সর্গে প্রধানতঃ পতিব্রতামাহাত্ম্য, দ্বিতীয়ে সাধ্বীগণের দৃষ্টান্ত, তৃতীয়ে সাধ্বী নারীর পতি-সেবা, চতুর্থে পরিবার-সেবা, পঞ্চমে পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয় কুলের প্রতি আচরণ-পদ্ধতি, ষষ্ঠে স্বামী-স্ত্রীর সর্ববিষয়ে অভিন্নত্ব, সপ্তমে বিরহিণীর মর্মন্তুদ দুঃখ, অষ্টমে সতীনারীর বহুবিধ গুণাশীলন এবং নবমে তাঁর নিষ্কাম কর্মসাধন, ইষ্টার্থ-সাধন প্রভৃতি পারমার্থিক কার্যকলাপ বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের উপান্ত্যভাগে কবি প্রার্থনা করেছেন যেন সতীনারীর

পতিপ্রেম বিবর্ধিত হয়, সমস্ত পৃথিবী সতীমহিমায় প্রপূরিত হয়, দেশে সতীধর্ম শাশ্বত স্থান লাভ করে—

পতিয়োলবক্কে সতিয়র্তু সতিয়রু
পতিপাদ ভক্তেয়বক্কে।
সতিয়র মৈমে সকল জগদোলু নিক্কে
সতীধর্ম শাশ্বতমক্কে॥

৪। শৃঙ্গারম্মা

শৃঙ্গারম্মা সংগত্যাছন্দে রচিত তাঁর "পদ্মিনী-কল্যাণ" গ্রন্থে তিরু-পতি শ্রীনিবাস এবং পদ্মাবতীর বিবাহ বর্ণন করেছেন। হোন্নম্মার মত শৃঙ্গারম্মাও চিক্ক দেবরায়ের সভাকবি ছিলেন। কাজেই তিনিও খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কর্ণাটক দেশ ভূষিত করেছিলেন।

৫। চেলুবাম্মা

মহীশূর-রাজ কৃষ্ণরাজ ওয়াডেয়ারের[১] পত্নী চেলুবাম্মা সাংগত্যছন্দে "বরনন্দি-কল্যাণ" নামক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ সাত খণ্ডে সমাপ্ত। এই গ্রন্থে বর্ণিত মেলকোটের চেলুব রায় স্বামীর সঙ্গে দিল্লীর বাদশাহের কন্যার বিবাহ-বৃত্তান্ত অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এই গ্রন্থে মানব-হৃদয়ের বহু অভিব্যক্তি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চেলুবাম্মা হোন্নম্মার "হদিবদিয়-ধর্মে"র বিরহিণী অংশের দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছেন মনে হয়।

৬। হেলবনকট্টি গিরিয়ম্মা

ইনি কর্ণাটকের "দাসকূট সম্প্রদায়ের" অন্তর্ভুক্ত ভক্ত নারী-কবি। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এঁর কার্যকাল। ভক্তিমূলক সঙ্গীত ব্যতীতও গিরিয়ম্মা চন্দ্রহাসন কথে, সীতা-কল্যাণক-কথে এবং উদ্দালিকন কথে নামক কন্নড়-ভাষাগ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

কবির রচনাশৈলীর উদাহরণরূপে তাঁর "চন্দ্রহাসন কথে"র[২] প্রথমাংশ থেকে দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করছি—

শ্রীরমণীয় মনোহর, সুজনমন্—
দার, এয়ভুবনোদ্ধার।
কারুণ্যনিধি হেলবনকট্টে রঙ্গইয়া[৩]
নারায়ণ শরণেংবে॥১ * * *
সুরপুরবাস লক্ষ্মীয় কান্ত[৪] ভক্তরগে
ওরেদন্থ (বিরচিত) জৈমিনিযোলগে।
পরমভক্ত চন্দ্রহাসন কথেয়ন্থ
চরিতেয় মাড়ি বর্ণিসুবে॥৭

এইরূপ রচনা-পারিপাট্য গ্রন্থের সর্বত্র সুপ্রকট। ভক্ত কবির বর্ণনায় স্বভাবতঃই ভক্তি-প্রবাহ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত আপন গতিতে ছুটে চলেছে।

এই নারী-কবির জীবন ছিল পরম পবিত্র। সংসারসুখ-প্রবণ পতির সঙ্গে তিনি অন্য নারীর বিবাহ সংঘটন করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর শ্বশুর তাঁর প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, কিন্তু জগতের শাশ্বত নিয়ম অনুসারে তাঁর শাশুড়িই খড়্গহস্ত ছিলেন। শাশুড়িকে একদিন কবি খেদ-সহকারে বলেছিলেন, "ভগবান্ আমাকে হাত-পা দিয়েছেন আপনাদের সেবার জন্য—তা তো সে কাজেই ব্যস্ত আছি। কিন্তু আমার জিহ্বা যদি দেবনামকীর্তন করে, তাতে আপনাদের ক্ষতি কি?"

কর্ণাট দেশ নারী-কবির আকর-বিশেষ। বীরশৈব নারী-কবি-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকজনের নামমাত্র এখানে লিপিবদ্ধ করছি। ধর্মের প্রগাঢ় প্রেরণায় দিশেহারা এই নারী-কবিরা "বচন"-সাহিত্যকে অপূর্ব লাবণ্য, সৌন্দর্য, মাধুর্যে মহিমময় করেছেন। বসবন্নের পত্নী গঙ্গাম্বিকে, মরৈয়া, কোণ্ডে মঞ্চন্ন, ও উরিলিঙ্গ পেড্ডির পত্নীগণ, মুক্তযক্কা, রেম্মব্বে, কলব্বে, অন্য একজন রেম্মব্বে ও কলব্বে, রেচব্বে, গঙ্গাম্মা, অক্কা নাগয়ি, নীলাম্বিকে, বোন্তদেবী, অন্য কলব্বে, রেকম্ম, গোগ্গব্বে, মসম্ম, থয়ম্ম, গুদ্দব্বে, সত্যক্ক, রেমম্ম ও সুবর্ণ দেবী।

কন্নড় সাহিত্যকে জৈন, বীরশৈব, হরিদাস এবং বর্তমান এই চার ভাগে ভাগ করা চলে। তন্মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের নারী-কবিগণের কিছু বিবরণ আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করেছি। বারান্তরে আমরা এঁদের উত্তরাধিকারিণী বর্তমান যুগের কন্নড় সাহিত্যের সাধিকাদের চিন্তাধারা ও কৃতিত্ব বিষয়ে মতামত লিপিবদ্ধ করব।

(১) এঁর রাজত্বকাল খ্রীষ্টীয় ১৭১৩—১৭৩৫ সন।
(২) এই গ্রন্থ ৪টি সর্গে ৩৫৫টি কবিতায় সম্পূর্ণ।
(৩) হেলবনকট্টে নামক স্থানের রঙ্গনাথ বা কৃষ্ণ।
(৪) লক্ষ্মীশ কবি জৈমিনি-ভারত কন্নড় ভাষায় প্রচার করেন।

পরিব্রাজকের ডায়েরি

(আমেরিকা)

নির্মলকুমার বসু

বার্কলে, ক্যালিফর্নিয়া

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

প্রিয়বরেষু জিতেন,*

তোমার ডাঃ শশাঙ্ক মুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ আজ আমাকে খুঁজে বার করেছেন। রাধাকান্তবাবু এখানে ছিলেন, আমার নাম খবরের কাগজে দেখে, বার করার চেষ্টা করেও পান নি। উনি এখন ইংলণ্ডের পথে। শশাঙ্কবাবু সস্ত্রীক, সকন্যা এসে আলাপ পরিচয় করে গেলেন, আগামী ২৩শে ওঁর বাড়িতে রাত্রে থাকব।

উনি তোমায় খবর দিতে বলেছেন যে তোমার 'পরিচয়ে'র ইংরেজী অনুবাদ অর্ধেকটা ওঁর সংশোধন করা হয়েছে, ধীরে ধীরে করছেন। ওঁর স্ত্রীটি বেশ শিক্ষিতা এবং নৃতত্ত্বের বিষয়ে জানবার জন্যে বেশ আগ্রহান্বিতা দেখলাম। শনিবার ওঁদের বাড়িতে রাত্রে থাকছি, তারপর কেমন লাগে তোমায় আবার জানাব।

ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গান্ধীজী ও বর্তমান বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিচ্ছি। একটা জিনিস লক্ষ্য করছি, এদের পয়সা আছে অসম্ভব। খরচ করতে চায়, জগতের সর্বত্র যত বন্ধু সম্ভব তত করতে চায়। কিন্তু একটু ছেলেমানুষী ভাবও আছে। মোটের ওপরে মন্দ লাগছে না। কিন্তু এই অসম্ভব সুখের ও সমৃদ্ধির মধ্যে এদের এত ভয় কেন তাই বুঝতে পারছি না। রুশ দেশে Sputnik তৈরি করে ফেলেছে, এরা তো হৈ-হৈ করছে, "আমরা পেছিয়ে থাকব কেন? আমরাও এমন খেলা দেখাব যাতে সবাই চমকে উঠবে।" রুশ দেশের কর্তারা এদের দিকে তাকিয়ে বলছেন, "দুয়ো! পারলে না তো।" সমস্ত ব্যাপারটা একটু হালকা সুরের বলে আমার মনে হচ্ছে।

খুব গভীর উপলব্ধিসম্পন্ন লেখক বা চিন্তাশীল শিল্পীর সঙ্গে এখনও দেখা হয় নি। তাঁদের কাছ থেকেই দেশের তো সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া যায়। ভালবাসা নিয়ো। পরে আবার চিঠি দেব।

নির্মলদা

[২]

বার্কলে, ক্যালিফর্নিয়া

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮

ভাই জিতেন,

তোমার এই পৌষের চিঠি ঠিক সময়মত এসেছিল। ঠিক ওই সময় এখান থেকে দু হাজার মাইল দূরে শিকাগোতে যেতে হয়। ফিরে এসে শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে পুনরায় গেছলাম। তারপর এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষ ও গান্ধীজী সম্বন্ধে বারংবার বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। ফলে অনেক চিঠিপত্রের উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেছে। তার মধ্যে তোমারটিও পড়ে গেছল, রাগ করো না।

এখানে নানা রকম মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও আলোচনা হচ্ছে, এদেশের সম্বন্ধে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছি, যা বইয়ে পাওয়া যায় না। বোধ হয় মানুষের মারফতই একটা দেশকে বেশী বোঝা যায়। এরা ধনী, এক জায়গায় বাস্ত আঁকড়ে পড়ে থাকা এদের স্বভাববিরুদ্ধ। চলাই এদের ধর্ম। আর চলাকেই এরা উন্নতির নিশানা বলে মনে করেছে। দুজনের সংবাদ দিচ্ছি। দুজনেই সাধারণ আমেরিকান থেকে একটু ভিন্ন; কিন্তু এঁদের চরিত্রের থেকে আমেরিকার একটা ছবি সংগ্রহ করতে পারবে।

জর্জ ও রুথ স্ট্রাউস নামে এক দম্পতির সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। জর্জ শিল্পী, রুথ ডাক্তার; কিন্তু উপস্থিত এক ডাক্তারী পত্রিকার পরিচালিকা। 20th Century Fox, (সিনেমাজগতে বিরাট কোম্পানি) রুথকে নাটক ইত্যাদি লেখার জন্যে চাকরি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু রুথ

* ছাপরার উকীল, 'পরিচয়' নাটকের রচয়িতা শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

আমাকে বললেন, "এই ব্যবসাদারী সভ্যতার সঙ্গে কিছুতে নিজেকে মানাতে পারছি না। ডাক্তারী পত্রিকা চালিয়ে ভেবেছিলাম লেখার আনন্দ ও মানুষকে সেবা করার তৃপ্তি লাভ করব। এক মাসের মধ্যেই টের পেলাম, ডাক্তারী-মহল ব্যবসায়-বুদ্ধিতে ডুবে আছে। যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরাও রোগীকে গিনিপিগের মত ভাবে। একটি রোগী মারা যাবেই। তাকে জোর করে, বিজ্ঞানের ভেল্‌কি দেখিয়ে, বহু যন্ত্রণা দিয়ে, অথবা যন্ত্রণা যাতে টের না পায়, ওষুধ দিয়ে ঝিমিয়ে রেখে, শুধু দু সপ্তাহ আরও বাঁচিয়ে রাখা হল। বিজ্ঞানের জয়-জয়কার হল। কিন্তু এতে ডাক্তারের বিদ্যায় অভিমান ছাড়া আর কিছুই পরিতৃপ্ত হল না। আমি ডাক্তার হিসাবেই এই কথা বলছি। সমস্ত পাশ্চাত্য সভ্যতা abstraction-এ বিশ্বাসী হয়ে পড়েছে। রোগী inabstraction একটি গিনিপিগের সামিল। মানুষ হিসেবে তার মূল্য নেই। এই abstract চিন্তা করার ফলে গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, ইঞ্জিনীয়ারিং বা কলকব্জা প্রভৃতি অসম্ভব রকম উন্নতি লাভ করেছে মানি। কিন্তু যে দাম আমাদের দিতে হয়েছে, মানুষকে আমরা যে ভাবে খর্ব করেছি, তার প্রতিশোধ প্রকৃতি নেবেই। Abstraction-এর অভ্যাস এবং মানুষকে সর্বোচ্চ স্থান না দেওয়ার ফলে অ্যাটম বোমা আজ সম্ভব হয়েছে। জানি না আমরা কোথায় যাব।"

আমেরিকাকে সত্যিই অন্তরের সঙ্গে রুথ ভালবেসেছেন বলেই তাঁর এই বেদনার বোধ।

আর একটি অল্পবয়স্কা মেয়ের কথা বলি। এর বাবা ও মা বর্মায় মিশনরি। মেয়ে যখন ন মাসের তখন সেখানে সঙ্গে নিয়ে যান। মেয়েটি এখন কুড়ি-একুশ, অন্তরে শিল্পী। একটু বড় হতে দেশে (আমেরিকায়) পাঠিয়ে দেন। সেখানে একটি paranoid যুবক ওর প্রেমে পড়ে। ক্ষণে ক্ষণে তার চিত্তের অপূর্ব সৌন্দর্য ফুটে উঠত, ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটিকে সে হত্যাও করতে চেষ্টা করেছে। দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে মেয়েটি এই আমেরিকান সভ্যতার স্বেচ্ছাচারিতা বা অবাধ inhibitionless ভাব থেকে মুক্তি পাবার জন্যে বর্মা ও পরে ভারতে যায়। একটি ইন্দোনেশীয় হিন্দু যুবকের সঙ্গে ভালবাসা হয় এবং বিয়ে স্থির হয়ে গেছে। অকস্মাৎ বিবাহের সপ্তাহ খানেক পূর্বে এই ইন্দোনেশীয় যুবকটি ওর অপর এক পরিচিত বন্ধু প্রতি অস্বাভাবিক ঈর্ষাপরায়ণতা দেখায়; ভয়াবহ ভাবে ফলে মেয়েটি বিবাহ স্থগিত রেখে, আমেরিকায় পড়ে চলে এসেছে। ও নিজের ভাবী স্বামীকে ধীর ভাবে ভাবে বলেছে, তার ভালবাসা কি শুধু অধিকারের আকাঙ্ক্ষা, ন সত্যিই স্ত্রীর স্বধর্মে সাহচর্যদানের, উভয়ের ধর্মাচরণে ভিত্তির উদ্দেশ্যে গঠিত হবে। অপূর্ব মেয়ে, বালি দ্বীপে নাচ শিখেছে। সমাজবাদী সঙ্ঘে যোগ দিয়েছে। নিজে সকল সত্তা দিয়ে মানুষকে কী ভাবে ভালবাসবে, দে ও পাত্রের ব্যবধান অতিক্রম করে কী করে সেবা করে এই চিন্তায় নিমগ্ন। অথচ চিত্তের ও শরীরের প্রয়োজ প্রেমের নদীতে স্নানও করতে চায়। সেই বাসনা তৃপ্ত হলে ওর শিল্প ও সমাজসেবার ব্রতও ক্ষুন্ন হয়ে যাবে কিন্তু যুবকদ্বয়ের অধিকারপ্রবৃত্তির আঘাতে এর চি বেদনায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

এরা সচল, সমাজে বাধার বেড়া কম। কিন্তু মানুষে সেই চিরন্তন সমস্যা স্বদেশেও যেমন, এদেশেও তেমনই কাল এবং দেশের ব্যবধানে মানুষের জীবন এক এ ঘটনার আবর্তে বয়ে চলে। নদী কোন দেশে খরস্রো কোথায়ও মন্থরগতি। কিন্তু জীবনের তরণী দেশ-কাল ব্যবধানকে অতিক্রম করে চলেছে, একই ধারা এব সমস্যাবহুল অনিশ্চয়তার দিকে, এটুকু অনুভব করছি তার ভিতরে কারও জীবন নিষ্পেষণে চূর্ণ হয়ে যায়, বে ধীরতার সঙ্গে সংগ্রাম করে চলে, পরাজয়কে স্বীক করে না—এদেশেও যেমন, ওদেশেও তেমনই। বাইরে সংস্কৃতির প্রকারভেদ, মানবচিত্তের এই যাত্রাকে ঠে রাখতে পারে নি। স্বাধীনতার যেখানেই অভাব ঘটে সেখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব আরও দ্রুত মরে গেছে। এ আমাদের সমাজের চেয়ে হয়তো আর একটু হাত পা নে জীবনের পথে চলার সুযোগ পায়। সেটুকু ভাল। বি শেষের সমস্যা সেই চিরন্তন—একই সমস্যা।

গল্প বলতে গিয়ে অন্যান্য খবর তো দিতে পারলুম ন শশাঙ্কবাবু প্রতিজ্ঞা করেছেন, মার্চের মাঝামাঝি তোম অনুবাদের সংশোধন শেষ করে আমায় দেবেন। ত শিকাগো যাব। অতএব সেই সময়ে নাটকের কী ক যায়, দেখা যাবে। ভালবাসা নিয়ো।

নির্মলদা।

তোমার নাম কি?

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অরুণাদি আমাদের প্রসূতি-সদনের নার্স। চেহারার ভেতর কি যে আছে তার কে জানে, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

নিজের কাজ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকে সে। দিবারাত্রি শুধু কাজ আর কাজ!

কোন্ মেয়ের ব্যথা উঠেছে, ডাক অরুণাদিকে। কোন্ বাচ্চাটা দুধ টানছে না, ডাক অরুণাদিকে। প্রসূতি-সদনের যত কিছু শক্ত কাজ অরুণাদি এলেই যেন সহজ হয়ে যায়।

একখানা আলাদা ঘর নিয়ে থাকে অরুণাদি। তার ওপর অগাধ বিশ্বাস কর্তৃপক্ষের।

সেদিন রাত্রে দেখলাম ঘরে তার আলো জলছে। চুপিচুপি ঢুকে পড়লাম। গিয়েই দেখি, শুয়ে শুয়ে কি যেন লিখছে অরুণাদি। আমাকে দেখেই বালিশের নীচে লেখাটা লুকিয়ে রাখল।

ভাবলাম নিশ্চয় প্রেমপত্র। নইলে লুকিয়ে রাখবে কেন?

কিছু বলতে সাহস হল না। শুধু বললাম, বড় অসময়ে এসে পড়েছি। চলি।

অরুণাদি বলল, না না, যাবি কেন, বোস্।

কথাটা একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা অরুণাদি, সিঁথিতে তোমার সিঁদুর রয়েছে, স্বামী নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কই কোনদিন তো—

আমাকে জিজ্ঞাসা করলি বেশ করলি, বলল অরুণাদি। জীবনে কোনদিন কাউকে এ রকম করে জিজ্ঞাসা করিস না। হিন্দু মেয়েদের এই সিঁদুরের সঙ্গে কত দুঃখের, কত বেদনার, কত কলঙ্কের কাহিনী লুকিয়ে থাকে, কেউ যদি তা না বলতে চায়…

বললাম, তুমি বলবে না তাই বল।

অরুণাদি বলল, না, বলব না।

আমি কিন্তু লেগেই রইলাম তার পেছনে। নিশ্চয়ই একটা কিছু রহস্য আছে ওর জীবনে।

মাসের শেষে মাইনে পেলেই দেখি, অরুণাদি ছোটে বইয়ের দোকানে। যত রাজ্যের বাংলা বই ওর ঘরে গিয়ে দেখি থরে থরে সাজানো। গল্প উপন্যাস পড়তে হলে অরুণাদির শরণাপন্ন হতে হয়।

পিওন সেদিন একটা মাসিকপত্র দিয়ে গেল আমার হাতে। অরুণাদির নামে এসেছে কাগজখানা। ছুটে গেলাম তার ঘরে। অরুণাদি ছিল বাথরুমে। স্নান করছিল।

বললাম, তোমার নামে একটা কাগজ এসেছে অরুণাদি।

রাখ্। আমি আসছি।

বললাম, কাগজটা খুলব?

খোল্।

খুলে তার পাতা ওলটাতেই দেখি, একটা গল্পের মাথার ওপর লেখিকার নাম—অরুণা চক্রবর্তী। বললাম, অরুণাদি, তুমি বুঝি গল্প লেখ?

এই মরেছে! তুই বুঝি আমার কাগজপত্র হাঁটকাচ্ছিস?

বলতে বলতে কাপড়টা কোন রকমে গায়ে জড়িয়ে স্নানের ঘর থেকে সে বেরিয়ে এল।

বললাম, না, তোমার কাগজপত্র দেখি নি। এই ছাখ, এই তো ছাপা হয়েছে—মা ও ছেলে: অরুণা চক্রবর্তী।

অরুণাদি মুখ টিপে একটু হাসল। বলল, খবরদার কাউকে বলিস নি।

বললাম, বলিস নি মানে? তুমি তো ধরা পড়ে গেছ। কাগজে তোমার নাম ছাপা হয়েছে—

অরুণাদি বলল, যদি বলি ও-নাম আমার নয়।

বললাম, বা রে, এই যে অরুণা চক্র—ওহো, তুমি বুঝি চ্যাটার্জি, চক্রবর্তী নও?

অরুণাদি বলল, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি, আমি দুইই। চক্রবর্তী আমার স্বামীর উপাধি, আর চ্যাটার্জি আমার বাবার উপাধি। অরুণা চক্রবর্তী লেখিকা, আর অরুণা চ্যাটার্জি হল নার্স।

'মা ও ছেলে' গল্পটি পড়লাম। নারী-জীবনে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা। বেশ ভাল লাগল। অরুণাদির মন যেন খানিকটা ধরা পড়েছে মনে হল।

তারপর—

বেশীদিনের কথা নয়।

আমাদের প্রসূতি-সদনে কত মেয়েই তো আসে!

সেদিন একটি মেয়ে এল। সাধারণ গৃহস্থের বধূ বলেই মনে হয়। একটি বিকৃত বিকলাঙ্গ ছেলে প্রসব করল। ছেলেটা মরা ছেলে।

সেই মরা ছেলের জন্যে মেয়েটার কী কান্না।

আমরা কত করে তাকে বোঝালাম। বললাম, ও ছেলে তোমার বেঁচে না থাকাই তো ভাল।

ছেলেটা ছিল অদ্ভুত। মুখখানা ছিল ঠিক ছাগলের মত। লম্বা ছুঁচলো কদাকার একটা ছাগলের মুণ্ডু—মনে হল যেন হাত-পা ওলা মানুষের শরীরে বসিয়ে দিয়েছে। পা দুটো ধনুকের মত বাঁকা। প্রসূতি-সদনের চাকর দারোয়ান পর্যন্ত ছুটে এসেছিল এই অদ্ভুত জীবটাকে দেখবার জন্যে।

সেদিন রাত্রেই প্রসূতির হল জ্বর। জ্বরের পর বিকার। খুব বাড়াবাড়ি হল।

প্রসূতি-সদনের ডাক্তারেরা এলেন। অরুণাদি এল। সবাই মিলে আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করলাম তাকে বাঁচিয়ে তোলবার।

সকালে মেয়েটিকে অক্সিজেন দেওয়া হয়েছে।

আশা আর নেই। তবে যতক্ষণ বাঁচে। খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তার বাড়িতে।

সারারাত জেগে আমি আর অরুণাদি—সকালে গেলাম স্নান করে একটু বিশ্রাম করতে। অন্য নার্স এল আমাদের জায়গায়।

আমি বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম। অরুণাদি যেতে দিল না। বলল, আয়, আমার ঘরেই স্নানটা সেরে নে।

স্নান করে অরুণাদির ঘরে বসে বসে চা খাচ্ছি। হঠাৎ কান্নার শব্দে চমকে উঠলাম।

অরুণাদি তার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, মেয়েটা বোধ হয় মারা গেল।

এত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছে কে?

পুরুষমানুষ এরকম করে তো কাঁদে না! চায়ের কাপ দুটো নামিয়ে আমরা দুজনেই নীচে নেমে এলাম।

মেয়েটি ছিল 'সি' ব্লকে। কার্টেন টেনে দেওয়া হয়েছে। ঘর থেকে কাঁদতে কাঁদতে যে-ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, তিনিই বোধ হয় তার স্বামী।

লোকটিকে দেখেই অরুণাদি চট করে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অরুণাদি কী যেন ভাবছে!

বললাম, এস।

না।—বলে অরুণাদি আবার তার নিজের ঘরে ফিরে এল।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওরকম করে দাঁড়ালে যে তখন? উনি কি তোমার চেনা?

অরুণাদি তার বালিশের তলা থেকে হাতে-লেখা কয়েকটা কাগজের পাতা আমার হাতে দিয়ে বলল, চুপি চুপি পড়্।

পড়লাম—

প্রকাণ্ড তেতলা ব্যারাক-বাড়ি।

একই ছাদের নীচে মুখোমুখি বাস করে বারোটি সংসারের ওই অতগুলি মানুষ। কিন্তু কেউ কারও খবর রাখে না। বহু বিচিত্র জীবনের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

সকাল সন্ধ্যা বারোটি উনুন একসঙ্গে ধরানো হয়। কয়লার ধোঁয়া বেরিয়ে যাবার পথ পায় না। এ-ঘরের ধোঁয়া ও-ঘরে গিয়ে, ও-বাড়ির ধোঁয়া এ-বাড়িতে এসে চারদিক একেবারে গুলজার করে দিয়ে সিঁড়ির কাছটায় কুণ্ডলী পাকিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে বের হয়ে যায়।

বারোটি বাড়ির অধিকাংশ পুরুষ ব্যাটাছেলেরা

আপিসে-কারখানায় চাকরি করে। মেয়েরা ভাত রাঁধে, কাপড় কাচে, ঘর-সংসারের কাজ করে, ছেলেপুলের মা হয়।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কখনও সিঁড়িতে কখনও ছাদে ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ায়। ফিরিওলারা সরাসরি সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে আসে। ঝগড়াঝাঁটি কান্নাকাটি কলহ-কোলাহল যা কিছু হয় ঘরের ভেতরেই হয়। বাইরে শুধু দেখা যায়—প্রতিদিন বিকেলবেলা বাড়ির অল্পবয়সী বউ-ঝিয়েরা কাপড় কেচে চুল বেঁধে রাস্তার দিকের রেলিংয়ের গায়ে ঝুঁকে পড়ে পথের ওপর লোক চলাচল দেখে।

তিন নম্বর ব্যারাকের কালীচরণের কাজকর্ম কিছু নেই। বুড়ো বাপ মুন্সেফী করে কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছেন, বুড়ো বয়সে ছেলে-বউ নিয়ে একটি ব্যারাক ভাড়া করে বাস করছেন। তাঁরই একমাত্র ছেলে কালীচরণ—বয়স প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ, গায়ের রঙ কালো, বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষটি, চেহারা দেখলে মুন্সেফের ছেলে বলে মনে হয় না। তা না হোক, এই কালীচরণই শুধু একটিমাত্র মানুষ, যে এই বারোটি সংসারের যোগসূত্র একটুখানি বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে।

সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত এই তার একমাত্র কাজ। এক নম্বর থেকে বারো নম্বর পর্যন্ত সর্বত্র তার অবাধ গতি।

কিন্তু একটি বড় বিচিত্র ব্যাপার, পুরুষদের সঙ্গে কালীচরণ কোনও সম্পর্ক রাখে না, মেয়েদের সঙ্গেই তার কারবার। মেয়েদের মত কথা বলে, মেয়েদের মত হাঁটে, চালচলন হাবভাব সবই তার মেয়েদের মত।

দুষ্ট লোকে কত কথা বলে। বলে, ভগবান তাকে মেয়ে গড়তে গিয়ে পুরুষ গড়ে ফেলেছেন।

ছেলেগুলো ক্ষেপায়। দেখতে পেলেই ডাকে কালীদি বলে!

কালীচরণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। সে নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

কালীচরণ সেদিন চার নম্বরে গিয়ে ডাকল, কই গো, মাসীমা কোথায়? কী হচ্ছে?

রান্নাঘরে বসে মাসীমা ময়দা মাখছিলেন। বললেন, এস বাবা এস।

ময়দা মাখছেন?

কালীচরণ তাঁর কাছে গিয়ে বসল। বলল, দিন চাকা-বেলুনটা, আমি বেলে দিই, আপনি ভেজে নিন।

চাকা-বেলুনটা টেনে নিয়ে কালীচরণ লুচি বেলতে বসল। অন্য কেউ হলে মাসীমা হয়তো নিষেধ করতেন, কিন্তু কালীচরণ নিষেধ বারণ শুনবে না, তা তিনি জানেন।

লুচি বেলতে বেলতে কালীচরণের গল্প শুরু হয়।

আপনার বউমা গো মাসীমা, সব কাজই শিখল, শুধু এই লুচি বেলাটি ছাড়া।

মাসীমা বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন, কালীচরণ বুঝি বলছে তাঁর বউমার কথা। বললেন, না বাবা, আমার বউমা তো লুচি বেলতে জানে!

কালীচরণ হাসল। সে কী অপরূপ হাসি!

পান-রাঙা দাঁতগুলি বের করে সলজ্জ হাসি হেসে কালীচরণ বলল, মাসীমা একটু বোঝে কম! বউদির কথা বলি নি মাসীমা, বলছি আমার বউয়ের কথা। বিভা—বিভা—আমার 'বদ্ধাঙ্গিণী'। হল তো এবার! খারাপ কথা বলাবেন তবে ছাড়বেন!

বলেই লজ্জায় যেন মরে গেল কালীচরণ। মাথা হেঁট করে হাসতে হাসতে লুচি বেলতে লাগল খুব জোরে জোরে।

মাসীমা বললেন, না বাছা বুঝতে পারি নি। তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। কিচ্ছু জানে না মাসীমা, কিচ্ছু জানে না। মেমেদের ইস্কুলে পড়ে পড়ে শুধু গান শিখেছে আর সেলাই শিখেছে। বাপের বাড়ি থেকে কিছুই শিখে আসে নি মাসীমা, আমিই সব হাতে ধরে ধরে শেখালাম।

মাসীমা মুখ টিপে একটু হাসলেন। বলবার মত কথা তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু কালীচরণকে কিছু বলতে হয় না, সে নিজেই বলে চলে—

আপনার পেটে কথা থাকে, তাই আপনাকেই বলছি মাসীমা, শুনুন।

এই বলে সে তার গলার আওয়াজটা একটু খাটো করে চুপি চুপি বলে, রান্না-বান্না কিচ্ছু জানে না মাসীমা,

সবই আমাকে করে দিতে হয়। ও শুধু ঘর-বার করে আর লোক দেখে। লোকজন কেউ এলেই আমি হেঁসেল ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। বাবা বুড়ো মানুষ, চোখে ভাল দেখতে পায় না, আর অত সব খবরও রাখে না বুড়ো। এ কথা বিভাকে যেন বলবেন না মাসীমা।

মাসীমা বললেন, না না, ছি! তাই বলে!

হঠাৎ একটা কথা মাসীমার মনে পড়ে গেল। বললেন, হ্যাঁ বাবা কালীচরণ, পরশু রাত্রে মনে হল যেন তুমি কাঁদছ। কথাটা জিজ্ঞাসা করব করব ভাবছি—

কথাটা শেষ করতে দিলে না কালীচরণ। বলল, শুনেছেন তা হলে? বলি তবে শুনুন।

বলেই কালীচরণ আরম্ভ করতে যাচ্ছিল তার কান্নার কাহিনী, কিন্তু পাঁচ নম্বরের বীণাপাণি এসেই দিলে সব মাটি করে। কালীচরণকে দেখেই তার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। হাত থেকে তার চাকা-বেলুন কেড়ে নিয়ে বললে, ওঠ। ওঠ ঠাকুরপো, ওঠ। ব্যাটাছেলে, মেয়েদের কাজ করবে কি? যাও, চট করে বিভাকে পাঠিয়ে দাও গে।

কালীচরণকে বাধ্য হয়ে উঠে দাঁড়াতে হয়। বলে, দেখছেন মাসীমা, বউদি তো নয়, যেন দস্যি!

থাক্, আর ন্যাকামি করতে হবে না। যাও।

বীণাপাণি চোখ পাকিয়ে তার দিকে তাকাতেই কালীচরণ চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, বিভা আমাদের চুল বাঁধছে, এখন আসতে পারবে না—এই আমি বলে গেলাম কিন্তু।

চুল সে সত্যিই বাঁধছিল, কিন্তু নিজেদের বাড়িতে নয়, পাশের ব্যারাকে খুকি চুল বেঁধে দিচ্ছিল বিভার।

চমৎকার সুন্দরী মেয়ে বিভা। যেমন গড়ন তার তেমনই গায়ের রঙ। পিঠে একপিঠ কালো চুল এলিয়ে দিয়ে ঘরের মেঝের ওপর বিভা বসেছিল পেছন ফিরে, আর খুকি তার পেছনে একটা মোড়ার ওপর বসে বসে সেই চুলের ওপর চিরুণী চালাচ্ছিল।

হঠাৎ বিভার কাঁধের ওপর খুকির হাত পড়ে যেতেই বিভা চিৎকার করে উঠল, উঃ!

কি রে, অমন চেঁচিয়ে উঠলি যে?

বিভা বলল, না, কিছু না।

না না, কিছু না কেন, কি হয়েছে বল্।

বিভা বলল, কাঁধের এইখানটায় খুব লেগেছে।

কেন?

বিভা বলল, তোরা বলিস ওর রাগ নেই! বাবাঃ, কাল আমি দেখেছি, কোনও দোষ করি নি, শুধু শুধু এমন মার মারলে—এই ত্যাখ্ না—এইখানটা এখনও ব্যথা করছে।

এই বলে সে তার কাঁধটা দেখিয়ে দিল।

খুকি একটুখানি সহানুভূতি দেখাবে কোথায়, ফিক্ করে হেসে ফেলল।

বিভা বলল, এই ত্যাখ্, হাসছিস তো? এইজন্যেই আমি বলতে চাই না।

খুকি বলল, তুই তোর বরটিকে ব্যাটাছেলে সাজাতে চাইলে কি হবে ভাই, আমরা জানি, ও হবে না কিছুতেই।

বিভার ইচ্ছে করছিল এখান থেকে উঠে চলে যায়। কিন্তু পারল না যেতে। মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

খুকি তার চুলের ওপর চিরুণী চালাতে চালাতে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, রাগ করছিস কেন ভাই!

বিভা বলল, না, রাগ করবে না। মারতে বুঝি এক তোর বর ছাড়া আর কেউ জানে না।

আরও কি যেন সে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার বরাত মন্দ, ঠিক সেই সময়েই পাশের বাড়ির ঘুলঘুলির পথে কালীচরণকে দেখতে পাওয়া গেল না কিন্তু তার ডাক শোনা গেল।—বলি অ খুকি! আমাদের বিভা রয়েছে ওখানে? একবার পাঠিয়ে দে ভাই।

খুকির হাসি তখনও থামে নি। বিভার গায়ে একটা ঠেলা মেরে বলল, মেরেছিল কিনা জিজ্ঞাসা করব?

কর্ না কী জিজ্ঞাসা করবি।—বিভা উঠে দাঁড়াল।

খুকি বলল, চুল বাঁধবি না?

শুনে আসি।—বলেই সে মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বেরিয়ে গেল কালীচরণের কথা শোনবার জন্যে নয়, নিজের কথা কালীচরণকে শোনাবার জন্যে।

কিন্তু শুনিয়ে লাভ কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। কালীচরণ সে ধাতু দিয়ে গড়াই নয়।

নাক মলে কান মলে কালীচরণ প্রতিজ্ঞা করে যে এবার থেকে বিভা যা বলবে সে ঠিক তাই করবে, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পার হতে না হতেই কালীচরণ আবার যে কে সেই! আবার ঠিক তেমনই করে কাপড়ের আঁচলটা গায়ে দিয়ে মেয়েদের মত হাত নাড়তে নাড়তে বারো নম্বরের যে-কোনও এক নম্বরে গিয়ে হাজির।

হাত জোড় করে বিভা বলে, দোহাই তোমার, দুটি পায়ে পড়ি, তুমি এই ব্যারাক-বাড়িটার কারও ঘরে যেয়ো না। রাস্তায় বেরিয়ে যাও, পয়সা নাও, নিয়ে থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখে এস বরং তাও ভাল, তবু···

কালীচরণ বলে, তুমি জান না বিভা, কারও বাড়িতে গিয়ে আমি আর গল্প করি না তো! গল্প করা একদম ছেড়ে দিয়েছি।

তবে যাও কি জন্যে মরতে?

কালীচরণ বলে, দ্যাখ, পরের উব্‌গার একটুখানি করতে হয়। এটা সেটা কাজকর্ম করে দিই। সবাই আমাকে ভালবাসে।

বিভা বলে, ছাই বাসে। তোমাকে দেখে সব হাসাহাসি করে। পুরুষ ব্যাটাছেলে, মেয়েদের কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতে তোমার লজ্জা করে না?

কালীচরণ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তার মুখের দিকে।

বিভা বলে, আর যদি কোনদিন যাবে তো আমি গলায় দড়ি দেব, আর নয় তো কোনদিক দিয়ে পালাব।

সর্বনাশ! বিভা বলে কী! কালীচরণ ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যায়!

তার সেই শুকনো মুখখানা দেখে বিভার মনে দয়া হওয়া দূরে থাক্, রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে। বলে, এত লোক মরে, আমার মরণ হয় না!

কালীচরণের আর চুপ করে থাকা চলে না। বলে, বালাই ষাট, ছি, ওই কথা কি মুখে আনতে আছে বিভু!

বলেই সে তার কাছে সরে গিয়ে বিভাকে একটুখানি আদর করবার জন্যেই বোধ করি হাত বাড়িয়েছিল, বিভা এক ঝাঁকানি দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে তাকে মারলে এক ধাক্কা! কালীচরণ উলটে পড়ে গেল।

বিভা বলল, খবরদার, তুমি আমার গায়ে হাত দিয়ো না। গা আমার ঘিনঘিন করে।

ভাবল, হয়তো সে রাগবে, রেগে দুটো কথাও অন্ততঃ বলবে, কিন্তু কালীচরণ নির্বিকার।

বিভা সহ্য করতে পারল না। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

সেখানেও রক্ষা নেই। কালীচরণ তার পিছু পিছু সেখানেও গিয়ে হাজির।

বিভা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। ঘরের এক কোণে ছিল কয়লার গাদা। বিভা সেখানে গিয়ে বসল। উনুন ধরাবার জন্যে কয়লা বাছতে লাগল।

ছোট ছোট কয়লার টুকরো বেছে বেছে রাখছিল একটা টুকরির ভেতর। কালীচরণ পেছন দিক থেকে হাত বাড়িয়ে ফস করে চুপড়িটা তুলে নিয়ে কয়লা বাছতে বসে গেল। বলল, তোমাকে আমি আজ কোনও কাজ করতে দেব না বিভু, তুমি রাগ করেছ—

বিভার আপাদমস্তক জ্বলে উঠল। হাতের কাছে ছিল কয়লাভাঙা লোহার হাতুড়ি। তাই না দিয়ে চট করে নিজের কপালের ওপর এমন জোরে মারল এক বাড়ি যে, দেখতে দেখতে দর দর করে কাঁচা রক্ত গড়িয়ে এল সারা মুখে। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখের ওপরের রক্তটা সে মুছে ফেলল। মুখ দিয়ে একটি কথাও সে উচ্চারণ করল না। চুপ করে গুম হয়ে বসে রইল সেইখানে।

বিভা চুপ করে থাকলে কি হবে, কালীচরণ চুপ করে রইল না। মাথা চাপড়ে বুক চাপড়ে হায় হায় করতে করতে জল এনে ন্যাকড়া এনে, টিনচার আইডিনের শিশি এনে কেঁদেকেটে গোলমাল করে মুহূর্তের মধ্যে একটা হৈচৈ কাণ্ড বাধিয়ে তুলল।

বিভা তার পায়ে ধরল হাত জোড় করল মুখে কাপড় চাপা দিল, কিন্তু কিছুতেই তাকে থামাতে পারল না।

বিভা যত তাকে চুপ করতে বলে, সে তত চেঁচায়।

বুড়ো বাপ লাঠি ধরে হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

বিভা কালীচরণের কাছে গিয়ে চুপিচুপি তাকে মিনতি করে বলল, ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ছি, তুমি বল যে আমি দোষ করেছিলাম, তুমি আমাকে হাতুড়ি দিয়ে মেরেছ।

কিন্তু সে মিনতির অর্থ কালীচরণ বুঝল না। এবার যে কাণ্ড সে করে বসল তা যেমন মর্মান্তিক, তেমনই নিষ্ঠুর।

কালীচরণের মড়াকান্না চেঁচামেচি গোলমাল শুনে তখন চার নম্বর থেকে মাসীমা এসে দাঁড়িয়েছেন, পাঁচ নম্বর থেকে এসেছে বীণা-বউদি, পাশের বাড়ি থেকে এসেছে খুকি, এমন কি সাত নম্বরের মোটা গিন্নি পর্যন্ত নেমে এসেছেন থুপ্ থুপ্ করে; আর সেই এক গাদা মেয়ের সুমুখেই কালীচরণ ফস্ করে বলে বসল, হ্যাঁ, তা আবার বলব না! দোষ তুমি করলে না, আর আমি মিছে করে বলে দোষ আমি মেরেছি!

বীণা-বউদির গা টিপে দিয়ে খুকি হেসে উঠল ফিক্ ফিক্ করে।

মাসীমা বুঝতে পারেন নি। জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে বাবা কালীচরণ?

কালীচরণ বলল, তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলছি মাসীমা, আমি কিছু করি নি, শুধু শুধু, বলা নেই কওয়া নেই, কাছে গিয়ে কয়লাগুলো বেছে দিচ্ছি আর বাস্— ওই হাতুড়ি দিয়ে নিজেই নিজের মাথায়—এই দ্যাখো মাসীমা, বউদি এসে তুমিও দেখে যাও, আর একটু হলে কী সব্বনাশ যে হত—

বলেই বিভার মাথার কাপড়টা তুলে কপালের কাটা দাগটা কালীচরণ তাদের ভাল করে দেখিয়ে দিয়ে বলল, আবার বলে কিনা তুমি মিছে করে বল, আমি মেরেছি!

বিভা তখন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে লজ্জায়, আর আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়েও হাসি চাপতে পারছে না খুকি!

বিভা আর সহজে তিন নম্বর থেকে বেরোতে চায় না। সংসারের কাজকর্ম করে, আর পড়ে পড়ে শুধু কাঁদে। কাপড়জামা ময়লা, মাথার চুলে তেল নেই, মুখখানি ম্লান। কেউ ডাকতে এলে দরজায় খিল বন্ধ করে দেয়।

ভাল তেলের শিশি থেকে বাটিতে খানিকটা তেল ঢেলে নিয়ে কালীচরণ তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, এস, লক্ষ্মীটি, এস—

বাটিসুদ্ধ তেল পা দিয়ে উলটে ফেলে দিল বিভা, বলল, তুমি যাও।

কালীচরণ তেলটা মেঝে থেকে বাটিতে তুলতে তুলতে বলল, আমি তো আর কারও বাড়ি যাই না বিভা।

বিভা বলল, যেয়ো।

কালীচরণ তেল হাতটা নিজের মাথায় ঘষতে ঘষতে বসল গিয়ে ঘরের এক কোণে। তারপর পা ছড়িয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিভা উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল খাটের ওপর। উঠল সেখান থেকে। তারপর কালীচরণের কাছে গিয়ে তার একটা হাত ধরে তাড়াতাড়ি করে তাকে টেনে তুলে দিয়ে বলল, বাইরে কাঁদগে যাও।

সত্যিই তো! এমন করে কাঁদা তার উচিত নয়। বিভা ঠিকই বলেছে। কালীচরণ সুড়সুড় করে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বিভা অনেক কিছু করে দেখল। কিছুতেই কিছু হবার নয়। এ পৃথিবীটা যেন তার জন্যে নয়। সে যেন সব থেকে স্বতন্ত্র।

আগে সে সংসারের কাজকর্ম মুখ বুজে করে যেত। কদিন থেকে তাও দিয়েছে বন্ধ করে। তাতেও কিছু আসে-যায় না এদের। কালীচরণ নিজেই সব করে ফেলে।

বুড়ো বাপ—কিছু বুঝতেও পারে না ছাই!

ভগবান সেদিন বোধ করি মুখ তুলে চাইলেন।

রোজ যেমন দেয় সেদিনও তেমনই বাপের খাবার থালাটা ধরে দিয়ে এসেছিল কালীচরণ।

এঁচোড়ের ডালনাটা খেতে খুব ভাল হয়েছে সেদিন। হঠাৎ তিনি ডেকে বসলেন, বউমা!

বিভাকে যেতে হল বাধ্য হয়ে।

বললেন, বড় ভাল রান্না করেছ মা।

বাবা চোখে ভাল দেখতে পান না, তারই সুযোগ নিয়ে কালীচরণ হাতের ইশারায় বিভাকে অনেক করে বলতে নিষেধ করল, বিভা কিন্তু কোনও কথাই শুনল না। বলল, রান্না আমি করি নি।

কে করেছে?

বিভা বলল, আপনার ছেলে।

মুন্সেফবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রান্না কর নি কেন?

কালীচরণ বলে উঠল, ওর অসুখ করেছে কিনা—

কী অসুখ করেছে? ডাক্তার দেখিয়েছিস?

কথাটা শেষ করতে দিলে না বিভা। বলল, না, আমার অসুখ করে নি। আমার মন ভাল নেই। আমাকে নৈহাটি পাঠিয়ে দিন।

নৈহাটিতে বিভার পিসিমার বাড়ি। এই পিসিমাই তার সব। এইখান থেকেই তার বিয়ে হয়েছে।

শ্বশুর জিজ্ঞাসা করলেন, মন খারাপ কেন?

জানি না।

বলেই বিভা উঠে চলে গেল সেখান থেকে।

বউয়ের ব্যবহারটা শ্বশুরের পছন্দ হল না। না হবার কথাই। আজ না হয় তিনি বৃদ্ধই হয়েছেন, চোখে না হয় কিছু কমই দেখেন, তাই বলে মুন্সেফ-শ্বশুরের মুখের ওপর জবাব দেবে—জানি না? পিসিমার বাড়িতে মানুষ, নিতান্ত দীন-দরিদ্র ঘরের মেয়েটাকে দয়া করে একটি পয়সা না নিয়ে ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন, একটিমাত্র ছেলে তাঁর—সুখের সংসার, এখানেও তার মন ভাল নেই?

বাবা বললেন, যা, দিয়ে আয়গে তার পিসিমার কাছে—নৈহাটিতে। দিনকতক সুখে থেকে আসুক গে। দেখবি, দুদিন পরেই পালিয়ে আসবে বাপ্ বাপ্ করে।

কালীচরণ বলল, না বাবা, তুমি জান না ওকে। ওর ভারি রাগ।

কার ওপর রাগ?

কালীচরণ বললে, আমার ওপর।

মুন্সেফবাবু বললেন, যাক না পিসির কাছে, দু বেলা পেট ভরে খেতে পাবে না। রাগ তখন বেরিয়ে যাবে।

কালীচরণ বলল, সেই ভাল বাবা, তা হলে দিয়েই আসি। বলে দেব, সাত দিনের বেশী থেক না। থাকলে আমাদের মন কেমন করবে।

না না, ও-সব বলিস নে।

পরের দিন বিভাকে নৈহাটিতে রেখে এল কালীচরণ। কাঁদতে কাঁদতে গেল, আবার কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। পিতৃবাক্য অবহেলা করে আসবার সময় বিভাকে সে না বলে কিছুতেই থাকতে পারল না—সাতদিন পরে আমি নিতে আসব, তখন যেতে হবে। এ কদিন আমি যে কী করে কাটাব বুঝতে পারছি না। ভারি মন কেমন করবে।

যেদিন গেল সেইদিনই ফিরে আসবার ইচ্ছা কালীচরণের ছিল না। কিন্তু ফিরে আসতে বাধ্য হল। বুড়ো বাপ একা আছে বাড়িতে। উনুন ধরাতে হবে, রান্না করতে হবে।

সাতটা দিন কোনও রকমে কাটাল কালীচরণ।

দিন আর কিছুতেই কাটে না। কাটবে কেমন করে? এত যে তার কষ্ট তা বীণা-বউদি কানই দিতে চায় না। খুকি তো শুধু ফিক ফিক করে হাসে।

একমাত্র আশ্রয় তার চার নম্বরের মাসীমা। তাঁর কাছে চোখের জল ফেলেও সুখ।

কিন্তু এ কী হল? সাত দিন পরে কালীচরণ নৈহাটি গিয়ে শুনল, বিভা তিন দিনের বেশী নৈহাটিতে থাকতে পারে নি। তিন দিন পরেই সে কলকাতায় চলে গেছে।

কলকাতায় গেছে, অথচ তাদের বাড়ি যায় নি—এ কেমন কথা! খবরটা শুনে কালীচরণের মাথাটা ঘুরে গেল।

বিভা তা হলে গেল কোথায়?

বিভার পিসিমাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কালীচরণ জিজ্ঞাসা করল, বিভা কার সঙ্গে গেল?

পিসিমা বলল, এখান থেকে কলকাতা যাবার সঙ্গীর ভাবনা?

কালীচরণ বলল, সোমত্ত ওই জোয়ান মেয়ে পাড়াপড়শী যার তার সঙ্গে চলে গেল?

পিসি বলল, কলকাতায় যখন পড়ত, তখন তো একাই যাওয়া-আসা করত বাবা।

কখন গেল, কটার ট্রেনে গেল, কি রকম শাড়ি পরে গেল, যাবার আগে ভাত খেয়ে গিয়েছিল কিনা, পয়সাকড়ি সঙ্গে ছিল কিনা, এইরকম সব নানান প্রশ্নে বিভার বুড়ী পিসিমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল কালীচরণ।

পিসি শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হল : অত সব জানি না বাছা।

কালীচরণ এতক্ষণে উঠল। বলল, যাই, আবার থানায় খবর দিইগে।

পিসি বিরক্ত হয়েই তাকে বিদায় করল। বলল, হ্যাঁ, তাই থানাতেই যাও।

থানা পর্যন্ত গেল কালীচরণ। দুবার পায়চারি করল থানার দরজায়। শেষ পর্যন্ত ভয়ে ঢুকতে পারল না। ফিরে এল।

মুন্সেফ-বাপের সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

বাপ শুনেই বলল, বাস, হয়ে গেছে। হতভাগা মেয়ে পালিয়েছে কারও সঙ্গে।

একে তো কালীচরণের চোখ দুটো জলে ভরেই ছিল, এবার সে-জল দর দর করে গড়িয়ে পড়ল।

বাপ বলল কথাটা বলিস নে কাউকে। লজ্জায় আমাদেরই মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

কিন্তু এত বড় একটা কথা, কালীচরণ বলবে না বলবে না করেও বলে ফেলল চার নম্বরে।

বলল, চুপি চুপি একটা কথা বলব মাসীমা, কাউকে যদি না বল তো বলি।

মাসীমা অনেকটা জিব বের করে বললেন, সে কি কথা বাবা। কত লোকের কত কথা পেটের ভেতর গজ গজ করছে, তার একটা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে কেউ যদি বলতে পারে তো গুণে গুণে সাত জুতো খাব মাথায়।

কালীচরণ বলল, আমি আর বাঁচব না মাসীমা। এত দুঃখে মানুষ বাঁচে না।

কেন বাবা, এমন কী দুঃখু হল তোমার?

কথাটা বলবার আগেই কালীচরণের চোখ দিয়ে জল গড়াল। কাপড়ের খুঁটে চোখের জল মুছে বলল, বিভু নেই।

মাসীমা সত্যিই চমকে উঠলেন। বললেন, বউমা মারা গেছে? বলিস কি রে!

কালীচরণ বলল, ওই একই কথা মাসীমা। পাড়ার একটা ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া আর মারা যাওয়া একই কথা।

পালিয়ে গেছে?

হ্যাঁ মাসীমা। আমি আর বলতে পারছি না।

মাসীমা বলল, থাক্ আর বলে কাজ নেই।

বউ এমন কত লোকের পালিয়ে যায়!

তাই বলে অত বড় একটা মুন্সেফের ছেলে কালীচরণ নিজের হাতে দু বেলা রান্না করবে, সে আবার কি রকম কথা!

মুন্সেফবাবু একটু উঠে পড়ে লাগলেন। একটা বিজ্ঞাপন পাঠালেন কাগজে।

রিটায়ার্ড মুন্সেফের একমাত্র পুত্র, হুগলী জেলায় বিরাট সম্পত্তির মালিক, বিপত্নীক। সুন্দরী গৃহকর্মনিপুণা বয়স্থা পাত্রী চাই।

এক মাসের মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল। পঞ্চাশটি মেয়ের ভেতর থেকে একটি মেয়ে বেছে নেওয়া হল। ব্যারাক-বাড়ির ফটকে নহবত বসল। তিন নম্বর আলো করে এল নতুন বউ।

চার নম্বর থেকে মাসীমা এলেন বউ দেখতে। বউ দেখে বললেন, না বাছা, বিভার মতন সুন্দরী হল না। তা না হোক, আমাদের এই ভাল।

কালীচরণের বীণা-বউদি বলতে বলতে এল, দেখি, ঠাকুরপো আবার কার সর্বনাশ করলে দেখি!

বউ দেখে খুকি তো ফিক ফিক করে হেসেই সারা।

আবার সেই বারোটি সংসারের চিরাচরিত জীবন-যাত্রা—আগেও যেমন চলছিল এখনও ঠিক তেমনিই চলতে লাগল।

কলঙ্কিনী বিভার কথা আর কারও মনেই রইল না।

পড়া শেষ করে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, খোলা জানলার কাছে অরুণাদি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বললাম, তোমার নাম তা হলে অরুণা নয়?

অরুণাদি বলল, না। আমার নাম বিভা।

বিদূষক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"Laugh, Clown, laugh"

॥ এক ॥

ছেলেবেলা থেকেই আমি লোককে খুব হাসাতে পারি।

আর ছেলেবেলাই বা কেন বলি? আমার জন্মের পরেই মা মারা যায়। শুনেছিলুম মার কী অসুখ করেছিল। কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। আসল কারণটা আমি জানি। আমার চেহারা দেখেই হাসতে হাসতে মরে গিয়েছিল মা।

আমার চওড়া চ্যাপটা নাকটা ওপরের পুরু পুরু ঠোঁটের

গাঁদাপাতা ছেঁচে আঙল বাঁধতে বাঁধতে পিসিমা বলেছিল, এখন দেখছি লোকে ঠিক কথাই বলে। তুই মানুষ নস্—হয় রাক্ষস, নয় ডাকাত।

পিসিমা বোধ হয় ভাবত, ডাকাতরা মানুষ নয়; তারা গালপাট্টা বেঁধে, মুখে ভুষো-কালি মেখে, হাতে খাঁড়া নিয়ে মায়ের পেট থেকে জন্মায়।

ব্যথা পেলেই আমি হাসতুম। আমার শরীরটা যেন হাসির তার দিয়ে তৈরি একটা যন্ত্রের মত—ঘা লাগলেই তাতে স্বর উঠত। শুধু তাই নয়; কেউ কাঁদলে আমার হাসি পেত, কেউ রাগ করলে আমার হাসি আসত। আমার ভেতরটা এমন হাসি দিয়ে ঠাসা বলেই বোধ হয় শরীরটাও এমন হাস্যকরভাবে তৈরি হয়েছিল।

পাঁচ-ছ বছর যখন বয়স হল, তখন অন্যকেও নিজের মত করে হাসাতে চেষ্টা করেছি আমি। কোত্থেকে একদিন একটা আলপিন কুড়িয়ে পেলুম। নিজের গায়ে সেটা একটুখানি বিঁধিয়ে দিতেই সেই হাসির সুড়সুড়ি। একবিন্দু রক্ত বেরিয়ে এসেছিল, হাসতে হাসতে আমি চেটে নিলুম সেটুকু। সেই প্রথম নিজের রক্তের নোনা স্বাদ পেলুম আমি। সে স্বাদ আশ্চর্য, সারা জীবন সেই আমাকে অপরূপ নেশার খোরাক জুগিয়েছে।

যাই হোক, আলপিনটার কথাই বলি। পাড়ার যে তিন-চারটি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি খেলা করতুম, তাদের ভেতর যাকে আমার পরম বন্ধু বলে মনে হত, তারই উরুতে আগাগোড়া আলপিনটা বসিয়ে দিলুম।

ভেবেছিলুম, খুব হেসে উঠবে। ভেবেছিলুম, আমাদের খেলাটা দারুণ জমে উঠবে এবার। কিন্তু ফল হল একেবারে উল্টো। কেঁদে চেঁচিয়ে সে হাট বসাল, ছুটে পালাল বাড়ির দিকে।

আমার তখন ছ বছর বয়স, কিন্তু সেজন্যে কেউ আমাকে রেয়াত করল না। আমার চেহারা কুৎসিত, আমার স্বাস্থ্য অসম্ভব ভাল, আমাকে দেখায় দশ বছরের মত। যে ছেলেটার উরুতে পিন ফুটিয়ে দিয়েছিলুম, তার দাদা এসে আমাকে প্রকাণ্ড এক চড় বসিয়ে দিল। ঘুরে আমি মাটিতে পড়ে গেলুম।

যখন উঠে দাঁড়ালুম, তখন দাঁতের গোড়া থেকে গড়িয়ে-আসা রক্তের অদ্ভুত স্বাদে আমার মুখ ভরে গেছে। সেই স্বাদে আমি হি-হি করে হেসে উঠলুম।

যে চড় মেরেছিল, সে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর কেমন ভয় পেয়ে পিছু হটতে হটতে বাড়ির দিকে চলে গেল। আশা করেছিলুম, আরও মারবে; কিন্তু আমার হাসি দেখে এমন করে সে ভয় পেয়ে যাবে, সে কথা ভাবতেই পারি নি।

আর একদিনের কথা বলি।

ছুটির দুপুরবেলায় দেখি, বাবা বিছানায় চিত হয়ে একটা বিড়ি ধরিয়েছে। বিড়িটায় দুটো টান দিতে না দিতেই ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর দেখলুম, আঙুলের ফাঁক দিয়ে জ্বলন্ত বিড়িটা পড়ল ঠিক বাবার বুকে গেঞ্জির ওপর। আমার ভারী মজা লাগল। দেখতে লাগলুম, কী হয়।

বেশীক্ষণ গেল না। গেঞ্জিটা পয়সার মত গোল হয়ে পুড়ে উঠতে লাগল। পোড়া লোমের গন্ধ উঠল, তার পরেই 'উরেঃ বাপ রে' বলে বাবা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আমি তখন হাসিতে ফেটে পড়ছি।

বাবা খড়ম নিয়ে তেড়ে এল, প্রাণ খুলে হাসবার জন্যে তৈরি হলুম আমি। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কোথা থেকে এসে পড়ল পিসিমা। প্রায় ছোঁ মেরে আমাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। শুনতে পেলুম, পেছনে বাবা সমানে চিৎকার করছে: ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ওই পেত্নীর ছানাটাকে আজ আমি খুনই করে ফেলব।

বাবা আমার অনেক নাম দিয়েছিল। এখন মনে হয় সব লিখে রাখতে পারলে বেশ হত। শ্রীকৃষ্ণের শত নামকেও আমি টেক্কা দিয়ে যেতে পারতুম।

সেই বাবারই শেষে একদিন আমার ওপরে চোখ পড়ল।

আলপিন ফোটানোর ব্যাপারের পর থেকে পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমার সঙ্গে কিছুদিন খেলাধুলো বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপরে আস্তে আস্তে আবার ফিরে এল সবাই। শুধু কথা দিতে হল, আর কারও গায়ে আমি কোনদিন পিন ফোটাতে পারব না।

আমি রাজী হলুম। আর কোন কারণে নয়—ওরা আমাকে খেলায় নেবে না বলে।

কিন্তু ওরাও আমাকে বুঝতে পেরেছিল। ছোটরা বড়দের চাইতে অনেক সহজে বুঝতে পারে, চিনে নিতে পারে মানুষকে। আমাকে খুশী করবার উপায় খুঁজে

পেয়েছিল ওরা। নিজেরা ব্যথা পেয়ে নয়, আমাকে ব্যথা দিয়ে।

কয়েকদিন আগে গ্রামের ভেতর দিয়ে হাতি গিয়েছিল একটা। আমাকে ওরা হাতি সাজাল।

ছ বছর বয়সে আমার দশ বছরের শরীর, স্বাস্থ্যও তেমনই। ছু জন করে সোয়ারী হল আমার পিঠে। তারপর একটা গাছের ডাল দিয়ে সপাসপ্ করে পিটতে পিটতে বললে, চল্—চল্—

চাবুক পড়ে আর আমি চলি। চাবুকের ঘায়ে কখনও কখনও কালশিরা পড়ে যায় পিঠে, পাঁজরায়। আমি হাসতে হাসতে ওদের নিয়ে চলতে থাকি। হাঁটু ছুটো ছড়ে যায়, রক্ত নামে, নিজের সর্বাঙ্গকে আমার বেলুনের মত মনে হয়, যেন হাসির গ্যাস দিয়ে ঠাসা।

হাতি হই, ঘোড়াও হতে হয়। তারপর একদিন আমগাছ হতে হল।

ঢিল ছুঁড়ে সবাই আম পাড়ছে। একটা ঢিল এসে মুখে লাগল, ভেঙে গেল ছুটো দাঁত, রক্ত গড়াতে লাগল কষ বেয়ে। সেই রক্ত চাটতে চাটতে আমি হেসে উঠেছি, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দারুণ ভয়ে ওরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালাল। (আজ আমি জানি, মানুষ কী অস্বাভাবিক ভীতু, রক্ত দেখলে কী যে ছেলে-মানুষী ভয় হয় তার!) আর সেই সময় বাবা সেখানে এসে হাজির।

কালীপুজো সেরে ফিরছে। এক হাতে নতুন গামছায় মস্ত বড় একটা পুঁটলি, আর এক হাতে একটা পাঁঠার মাথা। মাথাটার নীচে খানিকটা কালো রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। বাবার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছিল, তাই চলছিল খুব তাড়াতাড়ি। আর চোখমুখ লাল। বোধ হয় রোদে হেঁটে আসছিল অনেক দূর থেকে।

আমার দশা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল বাবা।

এ কি!

আমরা খেলছিলুম।

এ কি খুনে-খেলা? দাঁত ভেঙে রক্ত পড়ছে, আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিস তুই!

রক্তমাখা মুখে আবার খানিকটা হেসে বললুম, আমার খুব ভাল লাগছে বাবা।

ভাল লাগছে!—ঠাস ঠাস করে বাবার তিন-চারটে চড় পড়ল আমার পিঠে: তুই মানুষ, না গণ্ডারের ছানা! বাড়ি চল্ শীগগির, চল্ বলছি—

সেই আমার ওপর বাবার চোখ পড়ল।

বাড়ি ফিরে এলে, পিসিমার হাঁউমাউ বন্ধ হলে, গরম জল দিয়ে মুখ-টুখ ধোয়া হয়ে গেলে, বাবা বলল, বামুনের ছেলে গোমুখ্যু হয়ে থাকবি, আর সকলের কাছে মারধোর খাবি? তোকে পড়াব আজ থেকে। তারপর হাতে-খড়ি হয়ে গেলে ভর্তি করে দেব ইস্কুলে।

আমার পড়া শুরু হল।

হাসবার সুযোগ পেয়েছিলুম আবার। বাবা কড়া মেজাজের পণ্ডিত, পেটানোতে তার নাম আছে। আমার জন্যেও তার হাতে চড় তৈরি হয়েই ছিল। কিন্তু সে সুযোগ আমি নিতে পারলুম না। একবার ছুবারেই আমি অ-আ-ক-খ একেবারে মুখস্থ করে ফেললুম!

বাবা চমৎকৃত! ছেলেটার তো মাথা আছে!

পিসিমা ছুটে এল। বলল, আমি তো তখুনি বলেছিলুম ও সাধারণ ছেলে নয়। ও ক্ষণজন্মা, দশজনের মধ্যে একজন ও হবেই এ তোমরা দেখে নিয়ো।

হ্যাঁ, আমি সাধারণ নই। দশজন নয়, লাখের মধ্যে একজন হওয়ার জন্যেই জন্মেছি। আজ মনে পড়ে, ঠিক সেই সময় বাড়ির সামনেকার নারকোল গাছটার ওপর বিদ্যুতের মত আলো ছড়িয়ে দিয়ে উল্কা ছুটে গিয়েছিল একটা। যেন আমার জন্মলগ্নের নক্ষত্রটা হা-হা করে একটা নিঃশব্দ হাসিতে তখন আকাশটাকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিল।

॥ ছুই ॥

আরও ছ মাস পরে আমি ইস্কুলে ভর্তি হলুম।

ইস্কুল ঠিক আমাদের গ্রামে নয়, পাশের গ্রামে। ছু-খানা আখের ক্ষেত, একটা পদ্ম দীঘি, তার পাশে ডোমদের পোড়ো ভিটে, তারপর নিম-নিশিন্দের মজা-খালটার সাঁকো পেরিয়ে তবে বিষ্টু নগর। ইস্কুল সেখানেই। আধ ক্রোশের ওপর রাস্তা।

আমাদের গ্রামের ছু-চারটে ছেলে পড়ে সেখানে। বাকী সব অচেনা। সব নতুন মুখ।

তালগাছের মত ঢ্যাঙা হেড মাস্টার, গলাবন্ধ কোট, চোখের চশমা নাকের আধখানা অবধি ঝুলে রয়েছে। এক টিপ নস্যি নাকে দিতে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে চোখ পড়তেই হাতটা মাঝপথে থেমে গেল। ঠিক কেমন করে যে তাকিয়ে রইলেন আমি বলতে পারব না। (আজ বলতে পারি। ও-রকম দৃষ্টি লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখে আমি দেখেছি তারপর।)

বাবা বলল, আমার ছেলে। মুরারি। মুরারি, প্রণাম কর ওঁকে।

প্রণাম করলুম।

নিজের নামটা বলে ফেলেছি এখানে। কিন্তু বলতে কেমন একটা আশ্চর্য লাগছে। ওরকম একটা নাম যে কোনদিন আমার ছিল, এ যেন বিশ্বাস করতেও ইচ্ছে হয় না। অন্য কারও একটা বেমানান জামার মত নামটা আমাকে বয়ে বেড়াতে হয়েছে কিছুদিন, কখনই ওটা আমার সঙ্গে খাপ খায় নি। নিজের মানানসই নাম স্কুলেই খুঁজে পেয়েছিলুম সেদিন।

হেড মাস্টার শুধু বললেন, তা বেশ, বেশ।

ক্লাসে গেলুম। ক্লাসসুদ্ধ ছেলের চোখ ঘুরে আমার উপর এসে পড়ল। পেছন থেকে পরিষ্কার শুনতে পেলুম: এটা কী রে? ভূতের বাচ্চা নাকি?

আর একজন বলল, না থার্ড পণ্ডিতের ছেলে।

যেমন—বাবাকে একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে বলল, থার্ড পণ্ডিত, তেমনি তার ছেলে!

সঙ্গে সঙ্গে পিঠে একটা চিমটি পড়ল।

আর তৎক্ষণাৎ আমার শরীরের হাসির যন্ত্রটায় ঝঙ্কার উঠল। হা-হা করে হেসে উঠলুম আমি। তারপর সেই হাসিটাকে আরও ভাল, আরও জমাট করে তোলবার জন্যে পেছন ফিরে একটা দাঁত বের করা ছেলের গায়ে প্রাণপণে একটা চড় বসিয়ে দিলুম।

আমার ন বছরের গায়ে বারো বছরের বল, হয়তো আরও বেশী। চড় খেয়ে একবার আঁক করে উঠল ছেলেটা। অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁ করল কাঁদবার জন্যে, কিন্তু কাঁদতে আর পারল না। তার আগেই শিবনেত্র হয়ে বেঞ্চি থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ল।

ভেবেছিলুম সারা ক্লাসটা হাসিতে ফেটে পড়বে। কিন্তু ফল হল উলটো। কিছুক্ষণ সবাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর চার-পাঁচটা ছেলে এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর।

আমার হাসির যন্ত্রটায় যেন সেতারের ঝালা চলতে লাগল। হাত-পা সমানে চালাতে লাগলুম আমি। ওদেরও খুব ভাল করে হাসানো দরকার।

কিন্তু কেউ হাসতে পারল না। দুজনের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। একজনের কান গাল ছড়ে একাকার। দুজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

সেই সময় ক্লাসে ঢুকলেন মাস্টার। থমকে দাঁড়ালেন কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। তারপর ঘর-ফাটানো গলায় চিৎকার করে উঠলেন, এই উল্লুক শুয়োর-হারামজাদার দল, কী হচ্ছে এসব?

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ। তারপর—

এই থার্ড পণ্ডিতের ছেলেটা স্যার—

শুধু শুধু আমাদের মারছে স্যার—

আমার নাক ভেঙে দিয়েছে স্যার—

চুপ। মাস্টার চিৎকার করে উঠলেন।

চিৎকারের শেষ দিকটা কেমন কান্নার মত শোনাল। বললেন, যেমন রূপ, গুণও দেখছি তেমনি। চল হেড মাস্টারের কাছে।

তালগাছের মত লম্বা হেড মাস্টার সব শুনে বেঁকে গেলেন টাট্টু ঘোড়ার মত। ডাক ছাড়লেন: রামজয়বাবু!

রামজয় বাবার নাম।

ব্যাপারটা এর মধ্যেই সারা ইস্কুলে রটে গেছে, বাবারও শুনতে বাকি ছিল না। কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল বাবা। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে বাবার মুখটা—চেনাই যায় না। তারপর হেড মাস্টার হাঁ হাঁ করে ওঠবার আগেই বাঘের মত লাফিয়ে পড়ল আমার ওপরে।

আমি হাসতে লাগলুম। পৃথিবীর যেখানে যত হাসি আছে, সব যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এসে আছড়ে পড়ল আমার ওপর। আমি দেখছিলুম, দেওয়ালে ঝোলানো মস্তবড় ম্যাপটা হাসির দমকে দুলে দুলে উঠছে, দেওয়াল-ঘড়িটা একরাশ কালো কালো দাঁত বের করে শব্দহীন হাসিতে ভরিয়ে তুলছে চারদিক, বাবার বিকৃত বীভৎস মুখটা থেকেও যেন হাসির উচ্ছ্বাসে সাদা সাদা ফেনা

গড়িয়ে পড়ছে। তারপর পৃথিবীর সমস্ত হাসি আকাশ-ছোঁয়া একটা ঢেউ হয়ে এসে আমাকে টেনে নিয়ে গেল—অন্ধকার থেকে আরও গভীর, কালো কালো অন্ধকারে আমি ডুবে গেলুম।

কখন আমাকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল আমি জানি না। যখন চোখ মেললুম, তখন দেখি, পিসিমা কাঁদছে।

বাপ তো নয়, আদত কসাই! এমন করেও মারে? ছেলে এখন বাঁচলে হয়!

কিন্তু অত সহজেই তো আমার মরলে চলে না। দুদিন পরেই উঠে দাঁড়ালুম আমি। সুস্থ, সবল, স্বাভাবিক। শুধু বাঁ দিকের চোখের ভ্রূ থেকে কানের ডগা পর্যন্ত একটা লম্বা কাটা দাগ আমার চেহারাটাকে আরও অপরূপ করে তুলল।

তিন দিন পরে বাবা বললেন, চল্ ইস্কুলে।

পিসিমা চিৎকার করে উঠল। বলল, না, ও-ইস্কুলে আর যেতে হবে না ওকে। সবাই মিলে ছেলেটাকে মেরেই ফেলবে।

বাবা ভেংচি কেটে উঠল: মেরে ফেলবে? কে মারতে পারে ওকে? কিচ্ছু ভাবিস নি, দেখবি দিনকয়েক বাদে ও নিজেই খুনের দায়ে ফাঁসিতে ঝুলবে।

পিসিমা বলল, ঝোলে তো ঝুলুক। কিন্তু ইস্কুলে গিয়ে দরকার নেই ওর।

বাবা বলল, নাঃ, দরকার নেই? বামুনের ছেলে, শেষে রাঁধুনি বামুন হবে নাকি? তাও যে চেহারা, কোনও ভদ্দরলোকের বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেবে না। নে—চল্ আমার সঙ্গে। ফের যদি কোনও গণ্ডগোল করবি ইস্কুলে, খুন করে ফেলব একদম। মনে থাকে যেন কথাটা।

আমি ইস্কুলে ফিরে এলুম।

এবার কেউ ঠাট্টা করল না, কেউ টিপ্পনি কাটল না আমাকে। বরং ভয় আর কৌতূহল নিয়ে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারলুম, আমার হাসির ধাক্কাটা ওদের পক্ষেও মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। এমন কি, ক্লাস-মাস্টার পর্যন্ত কেমন ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন।

তিন-চারদিন পর্যন্ত আমাকে কেউ পড়া জিজ্ঞেস করল না, একটা ছেলেও মিশল না আমার সঙ্গে। তারপরে একদিন টিফিনের ঘণ্টায় যে ছেলেটাকে আমি প্রথম চড় মেরেছিলুম সে-ই নিজে থেকে ভাব করতে এল।

তোর বাবা সেদিন তোকে মেরে মেরে অজ্ঞান করে ফেলল, আর তুই হাসছিলি?

আমাকে কেউ মারলে আমার ভীষণ হাসি পায়।

মারলে হাসি পায়!—চড় খেয়ে যেমন হাঁ করে ছিল, তার চাইতেও দ্বিগুণ হাঁ করে রইল ছেলেটা। বলল, তুই মানুষ না আর কিছু?

কী জানি। বাবা আমাকে রাক্ষস বলে।

ছেলেটার নাম আনন্দ। পরে জেনেছিলুম, চার বোনের সে একমাত্র ভাই। ফরসা রোগা চেহারা, মেয়েলি মেয়েলি গড়ন, ভারি শান্ত, ভারি মিষ্টি মুখখানা। পেছন থেকে ও যে আমাকে সেদিন চিমটি কেটেছিল, ওকে দেখে সে-কথা বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে হয় না।

আনন্দ বলল, যাঃ, তুই রাক্ষস হতে যাবি কেন? চেহারা কারুর দেখতে খারাপ হলেই কি সে রাক্ষস হবে? আমাদের ড্রিল-মাস্টার বিভূপদবাবুকে দেখতে তো হাতির মত লাগে, তাই বলে সত্যিই হাতি নাকি তিনি?

কথাটা আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম।

আনন্দ আবার বলল, কিন্তু ভারি আশ্চর্য তো! কেউ মারলে তোর হাসি পায়? সত্যি বলছিস?

সত্যি বলছি।

লাগে না?

লাগে বইকি।

কষ্ট হয় না?

তা তো জানি না। দারুণ হাসি পায়।

একটু চুপ করে থেকে আনন্দ বলল, তুই ভারি অদ্ভুত।

অদ্ভুত কথাটা শুনে আমার কী একটা মনে হল। আমি বললুম, তুই আমাকে ভূত বলে ডাকিস।

আনন্দ বলল, কেন রে?

মুরারি নামটা আমার ভাল লাগে না। কেমন বিশ্রী শোনায় কানে।

আনন্দ বিব্রত হয়ে বলল, তোর সঙ্গে আমি ভাব করে নিয়েছি, তোকে আমি ভূত বলতে পারব না।

তা হলে ভূতো বলিস।

এবারে ও হেসে ফেলল।

আচ্ছা, তাই বলব। কিন্তু ইস্কুলে নয়। তোকে একা পেলে ওই নামে ডাকব।

আনন্দের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

অনেক দিন ভেবেছি, আমার কুৎসিত এই বীভৎস চেহারা সত্ত্বেও কেন এমন করে আমার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল আনন্দ। তার চেহারা সুন্দর, স্কুলের সকলের চাইতে সুন্দর। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে প্রায়ই সেকেণ্ড মাস্টার একটা ইংরেজী কথা বলতেন: বিউটি অ্যাণ্ড দি বীস্ট। সেদিন কথাটার মানে বুঝতে পারি নি, কিন্তু আজ বুঝেছি। বুঝেছি অনেক দাম দিয়ে। আরও বুঝেছি, কেন আনন্দর আমাকে ভাল লেগেছিল।

কিন্তু সে কথা এখন থাক্। পরের কথা পরেই বলব।

ইস্কুলের দিনগুলো কাটতে লাগল এক রকম। আস্তে আস্তে আমিও সকলের চোখে সয়ে গেলুম। কেবল মধ্যে মধ্যে দু-একটা নতুন ছেলে এলে আমার দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা তাদের সাবধান করে দিত: ওকে ঘাঁটাস নি, ওটা বুনো মোষ।

আর একটা নতুন নাম। আমার সহস্র নামের তালিকায় নতুন আর একটা সংযোজন।

তারপর অনেকদিন আমার আর হাসবার সুযোগ আসে নি—হাসাবারও না। শরীর যেমনই হোক, লেখা-পড়ায় আমার মাথা ছিল। পরীক্ষায় আমি থার্ড হলুম। আর এক বছর কাটল। সেকেণ্ড হলুম সেবার।

আনন্দ বলল, তুই ফার্স্ট হতিস। সেকেণ্ড মাস্টার তোকে দেখতে পারে না—তাই ইচ্ছে করে তোকে ইতিহাসে অনেক কম নম্বর দিয়েছে।

এই সেকেণ্ড মাস্টার! একটা আশ্চর্য ধরনের লোক। আমার মধ্যে মধ্যে ওঁকে হাসাতে ইচ্ছে করত।

ইস্কুলে মারকুটে পণ্ডিত বলে বাবার নামডাক ছিল, আর সেকেণ্ড মাস্টারের নাম ছিল মজার লোক বলে। খুব মজা ভালবাসতেন সেকেণ্ড মাস্টার। দু আঙুলের ভেতরে পেনসিল পুরে চাপ দিতে দিতে আদর করে বলতেন, লাগছে? আহা না-না, বেশী লাগবে কেন? বেশ আরাম বোধ হওয়ারই তো কথা। কি বলিস, অ্যাঁ?

কাউকে বা হাফ-ডাউন করে রেখে তার পিঠে বেশ আদর করে টোকা দিতে দিতে বলতেন, বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে। চতুষ্পদ না হলে কি তোমাকে মানায় বাপধন? এইবার একটি ল্যাজ বেরুলেই আর কিছুটি বলবার থাকে না।

কেবল আমাকে একটু আদর করতেন। আমি পড়া না পারলেও হাত তুলতেন না, অর্থাৎ পেনসিলের চাপ বা হাফ-ডাউনের ব্যবস্থা করতে পারতেন না। তখন আমার বয়স দশ—ষোল বছরের মত জোর আমার গায়ে। অত বড় ভারী ব্ল্যাকবোর্ডটাকে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে আমি টেনে নিতে পারি। আমার চেহারা, আমার গায়ের জোর—আর, আর হয়তো আমার হাসির ভয়েই আমাকে এড়িয়ে চলতেন সেকেণ্ড মাস্টার।

শুধু একদিন সামলে নিয়েছিলেন একটুর জন্যে।

ইস্কুলে আসবার পথে বৃষ্টি এল। বাবার আগেই সেদিন বেরিয়ে পড়েছিলুম—বাবার সঙ্গে আসতে আমার ভাল লাগে না। একা আসছিলুম, ছাতা ছিল না।

আখ ক্ষেত পেরুতে ঝেঁকে বৃষ্টি। দাঁড়াবার জায়গা পাই না। শেষে ডোমদের একটা পোড়ো চালার নীচে দাঁড়ালুম। বৃষ্টি পুরোপুরি আটকাচ্ছিল না। চুঁইয়ে চুঁইয়ে দু চার ফোঁটা পড়ছিল গায়ে মাথায়। তারপর বৃষ্টি ধরলে যখন ইস্কুলের ক্লাসে গিয়ে ঢুকেছি, তখন সে মাস্টার পড়াতে শুরু করেছেন। আমাকে দেখেই কেমন করে যেন তাকালেন।

আমি টের পাই নি, উপর থেকে ঝুল-গলানো জলের কালো কালো দাগ আমার গায়ে মুখে পড়েছিল।

একবারের জন্যে চোখ পিটপিট করে উঠল সেকেণ্ড মাস্টারের। বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বৎস? ভেতরে এস।

আমি ভেতরে ঢুকতেই আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না। কোন্ গাছ থেকে নেমে এলে?

ফস করে বলে ফেললুম, আপনার গাছটার পাশের গাছ থেকে স্যার।

ওই বয়সে কথাটা আমার মুখে কে জুগিয়ে দিল জানি না। কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টারের মুখের রঙ একবার লাল হল, একবার কালো হল, আবার লাল হল, তারপরে

আবার কালো হয়ে গেল। একটু চুপ করে থেকে বলল, নিজের জায়গায় বসে থাক্ গে, যা।

সেদিন আর ক্লাসটা তাঁর জমল না। কেমন ভাঙা গলায় পড়িয়ে গেলেন।

কিন্তু আসল মজাটা জমল দিন তিনেক পরে।

বাবা মারধোর করত, ছেলেরা ভয় করত তাকে। কিন্তু সেকেণ্ড মাস্টারকে তারা ভয় করত না, অন্য চোখ দিয়ে দেখত। আজ বুঝতে পারি, ঘৃণা করত। ওই বয়সেও ভেতরে ভেতরে তাদের অসহ্য হয়ে উঠেছিল।

আমি কিচ্ছু জানতুম না। কারা যে আগে থেকে সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে টেরও পাই নি। ঘণ্টা পড়েছে, সবাই এসে চুপটি করে বসেছে নিজের নিজের জায়গায়। তারপর সেকেণ্ড মাস্টার এসে বসলেন চেয়ারে।

কিন্তু বসবার সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ারটা গাড়ির মত চলতে আরম্ভ করল। সেকেণ্ড মাস্টার সামলে উঠে পড়বার আগেই উল্‌টে পড়ল চেয়ার। ধপাস্ করে মাটিতে পড়লেন সেকেণ্ড মাস্টার, আর চারটে মারবেল ছিটকে গেল চার-দিকে।

আধ মিনিটের মধ্যে প্রলয় হয়ে গেল।

কয়েকটা ছেলে ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে, বাকীগুলো হাসি চাপবার মিথ্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি পারলুম না। হা-হা করে হেসে উঠলুম—হাসির বেগ আর আমার থামতে চায় না।

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন সেকেণ্ড মাস্টার। চোখ দুটো আগুনের মত লাল। আলুথালু জামাকাপড়, একপাটি জুতো খুলে পড়েছে পা থেকে। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, আমার সঙ্গে ঠাট্টা—অ্যাঁ, আমার সঙ্গে—

যিনি সকলকে নিয়ে ঠাট্টা করতে ভালবাসেন, আশ্চর্য, তাঁর নিজের এটুকু সইল না।

কিছুক্ষণ লাল চোখ দুটো তাঁর চরকির মত ঘুরতে লাগল ক্লাসময়। যারা মুখ চেপে হাসছিল, ভয়ে তারাও থমকে গেল। শুধু আমিই কিছুতে হাসিটাকে রুখতে পারলুম না। একটার পর একটা ধাক্কার মত আমার পেটের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগল।

সেকেণ্ড মাস্টার সোজা ছুটে এলেন আমার দিকে। বেত নিয়ে ক্লাসে আসেন না, তাই কিল-চড়-ঘুষি আমার উপরে বৃষ্টির মত পড়তে লাগল। কড়মড় করে হাড় চিবুনোর মত আওয়াজ উঠতে লাগল দাঁত থেকে।

খুন করব, খুনই করে ফেলব তোকে আজ। এসব তোরই কারসাজি। যেমন তোর শয়তানের মত চেহারা, তেমনি শয়তানের মত স্বভাব। পাজী, উল্লুক, গাধা, বদমাশ, তোকে শেষ না করে আমি ছাড়ব না।

আজও আমি হেসে চলেছি, আমার হাসির যন্ত্রে হিংস্র ঝঙ্কার বেজে চলেছে। সেকেণ্ড মাস্টারের মুখটাকে বুনো শুয়োরের মত দেখাচ্ছে। এতদিন লক্ষ্যই করি নি, ওঁর দু দিকের দাঁত দুটো অত বড় বড়।

টের পাচ্ছি, আমার মুখ রক্তের স্বাদে ভরে গেছে, সেই আশ্চর্য অপরূপ স্বাদ, যার মত নেশা পৃথিবীর আর কোনও জিনিস যোগাতে পারে না। মাথার ভেতরটা ঝিমঝিম করে উঠছে, একটু পরেই আমি সেই অতল গভীর সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যাব।

আর সেই সময় দাঁড়িয়ে উঠল আনন্দ। চার বোনের এক ভাই। মেয়েলি, মিষ্টি ছেলে আনন্দ।

তীক্ষ্ণ সরু গলায় আনন্দ চেঁচিয়ে উঠল, শুধু শুধু ওকে মারছেন স্যার, ওর কোনও দোষ নেই, ও কিছু করে নি। ওকে মারবেন না স্যার, মারবেন না—

মারব না?

সেকেণ্ড মাস্টার এক পলকের জন্যে থামলেন। চোখ দুটো থেকে যেন রক্ত ছুটে বেরুচ্ছে, ঝকঝক করছে ধারালো বড় বড় দাঁত দুটো। তারপর বিকট বীভৎস আওয়াজ করলেন একটা।

বটে, মারব না? চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা? তা হলে তোকেই—

আমি হাসছিলুম, কেন জানি না আমার হাসি বন্ধ হয়ে গেল। চার বোনের এক ভাই আনন্দ, ওর বাবা পর্যন্ত কোনদিন ওর গায়ে হাত দেয় নি। ভীরু, কোমল, নরম মানুষ আনন্দ, ওদের বাড়িতে গিয়ে দেখেছি, শিউলি ফুলের বোঁটা, লাল-নীল-কালি আর কাঁচা হলুদ ঘষে ও কী সুন্দর ছবি আঁকে। হঠাৎ আমার মনে হল, এখানে আর হাসি চলে না। কিছুতেই সহ্য করা চলে না। সেকেণ্ড মাস্টার আনন্দর গায়ে হাত তুলবে!

সেকেণ্ড মাস্টার এক হাতে আনন্দর চুল মুঠো করে ধরেছেন তখন। হঠাৎ আমি লাফিয়ে উঠলুম হাই বেঞ্চির ওপর। তারপর সেকেণ্ড মাস্টারের চড়টা আনন্দের গালে পড়বার আগেই আমি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম।

আর একবার উলটে পড়লেন সেকেণ্ড মাস্টার, টেবিলের সঙ্গে ঠুকে গেল মাথাটা। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার রুদ্ধ হাসিটা আবার ছুটে বেরিয়ে এল। সেই অবস্থাতেই সেকেণ্ড মাস্টারের মুখে আমি কয়েকটা ঘুষি বসিয়ে দিলুম। হাসতে হাসতে বলুলম, মজা লাগছে স্যার, বেশ ভাল লাগছে?

উত্তরে সেকেণ্ড মাস্টারের গলা দিয়ে শুধু গোঁ গোঁ করে খানিক আওয়াজ বেরিয়ে এল।

পেছন থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, পালা, মুরারি পালা, এখুনি হেড মাস্টার এসে পড়বে—

আমি এক লাফে পালালুম ক্লাস থেকে। দরজা দিয়ে নয়, পেছনের খোলা জানলা দিয়ে। তারপর খেলার মাঠ পার হলুম। পার হয়ে গেলুম চৌধুরীদের ঠাকুরবাড়ি, পেরিয়ে গেলুম ফসল-কাটা ধানের ক্ষেত, তারপর সোজা গঙ্গার খালের ধারে একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লুম। আমাকে দেখেই একটা শেয়াল ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

বসে পড়লুম গাছের একটা মড়া গুঁড়ির ওপর। তলায় স্যাঁতসেঁতে ভিজে মাটি, বর্ষার সময় এখানে গঙ্গার জল উঠে আসে।

সামনে খানিকটা বুনো ওলের ঝোপ। ডোরাকাটা সাপের মত তাদের ডাঁটাগুলো, তারই পাশে পড়ে আছে একটা মড়ার মাথা, কালচে সবুজ শ্যাওলা বসেছে তাতে। হাওয়া বইছে অল্প অল্প, বাবলার হলদে ফুল ঝরছে চারপাশে। মাথার ওপর পিঠুলি গাছে ডানা মুড়ে পাশাপাশি বসে আছে দুটো শঙ্খচিল, বাতাসে অসংখ্য বাঁদরলাঠি দুলছে।

বসে বসে হাঁপাতে লাগলুম আমি।

কেন পালিয়ে এলুম? মারবে বলে! না, মারকে আমার ভয় নেই। আমার ভয় শুধু সেই অন্ধকারটাকে— যার মধ্যে আমি ক্রমাগত ডুবতে থাকি; ডুবতেই থাকি— যার ভেতরে কোথাও তলা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সেই বয়সেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম ও যেন মৃত্যুর মহড়া। জন্মাবার পর থেকে সবাই আমার মৃত্যু চেয়েছিল, তাই আমি বেঁচে থাকতে চাই, তাই যেমন করে হোক আমাকে বাঁচতেই হবে।

বাড়ি ফিরে গেলে বাবা কি ভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করবে সে আমি জানি। না, আমি ওতে রাজী নই। হাসতে আমার আপত্তি নেই, মানুষ যাকে যন্ত্রণা বলে ভাবে, আমার কাছে তা একটা অপরূপ অনুভূতি, একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। কিন্তু অনুভূতির সেই উচ্ছ্বাসটা যখন চড়া পর্দায় উঠে শূন্যতার মধ্যে ভেঙে-চুরে একাকার হয়ে যায়, তখন সেটা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না।

সেই বয়সে কি এত কথা নিজের সম্পর্কে আমি ভেবেছি? না। কিন্তু অস্পষ্টভাবে এমনি একটা চেতনা নিশ্চয়ই আমার মধ্যে ছিল, আজ যেটাকে কথা দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি, বোঝাতে পারি, সেদিন যেন জৈব সংস্কারের ভেতর দিয়েই আমি তাকে বুঝতে পেরেছিলুম।

না। বাড়ি আর ফেরা চলে না।

গাছের গুঁড়ি থেকে উঠে আমি সেখানে চলে এলুম, সেখানে এক মুঠো সবুজ ঘাস উঠেছে, দুটো একটা ভুঁইচাঁপা উঁকি দিয়েছে এখানে ওখানে। সারা শরীর ক্লান্তিতে আর দুশ্চিন্তায় এলিয়ে এসেছিল। হাতের উপর মাথা রেখে সেই অনিশ্চিত দুর্ভাবনার মধ্যেও আ[illegible] নির্ভাবনার ঘুমে তলিয়ে গেলুম।

জেগে উঠলুম শেয়ালের ডাকে।

চারদিকে কালো নিথর অন্ধকার, হঠাৎ মনে হল, আমি কি মরে গেছি? যে-মৃত্যুর কাছ থেকে প্রতিমুহূর্তে আমি প্রাণপণে বাঁচতে চাই, আমি কি ডুবে গেছি তারই ভেতরে? (না, সে বয়সে এত সব কথা আমার মনে হয় নি। শুধু অনুভবটা ছিল, এতদিন পরে তাকে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি।)

চোখের সামনে দেখলুম এক ঝাঁক জোনাকি উড়ছে ঝোপে ঝাড়ে, আবছাভাবে যেন বুঝতে পারলুম, তাদের কয়েকটা সেই মড়ার মাথাটার উপর গিয়ে বসেছে, যেন ওই মাথাটাতে অসংখ্য চোখ জ্বলে উঠেছে।

ঝিঁঝির ডাকে ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মাথার ভেতরটা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল, জোনাকির বিন্দুজ্বলা মড়ার মাথাটা যেন একটু একটু করে উঠে আসছে মাটি

থেকে, একটু পরেই সমস্ত শরীরটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াবে।

একটা তীব্র চিৎকার এসে গলার শিরাগুলোয় থরথর করে কাঁপতে লাগল। চেঁচিয়ে উঠতে পারলে ভয় হয়তো অনেকখানি ভেঙে যেত, কিন্তু আমি চেঁচাতে পারলুম না। ছুটে বেরিয়ে এলুম জঙ্গল থেকে। তাকিয়ে দেখলুম, পেছনে পেছনে জোনাকির ঝাঁকগুলো যেন আমাকেই তাড়া করে আসছে।

আমি আর হাসতে পারছি না। কিন্তু জঙ্গলে শেয়াল ডাকছে। যে অন্ধকারকে আমি ভয় করি, সেই অন্ধকারের হাসির মত তাদের ডাক ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

পুবের দিকে কয়েকটা আলো মিটমিট করছিল।

জানি ওইদিকেই রেলের স্টেশন।

॥ তিন ॥

মহবুব মিঞা ভাঙা ভাঙা বাংলায় বলল, এইখানে থাকবি বাচ্চা। এই লেড়কাদের সঙ্গে। যো যো কাম শিখলিয়ে দিব, ওদের সাথ্ মিলেমিশে তাই করবি। লেকিন, ভাগবার চেষ্টা করবি তো মেরে হাড্ডি চুর-চুর করে দেব।

সংক্ষেপে যা বলবার বলে মহবুব মিঞা চলে গেল।

আমি তাকিয়ে দেখলুম চারদিকে। একতলার ছোট ঘর একখানা। মাথার ওপর এই দিনের বেলাতেও মিটমিট করে লালচে একটা আলো জ্বলছে।

ঘরে কয়েকটা ছোট ছোট বিছানা গোটানো। দেওয়ালে এলোমেলো লাল সাদা দাগ। পরে জেনেছিলুম, কিছু চুনের, কিছু ছারপোকার রক্তের। তা ছাড়া রঙ-বেরঙের অসংখ্য ছবি আঠা দিয়ে সাঁটা। সব মেয়ের ছবি। মেঝেতে বিড়ির টুকরো আর ছাই ছড়িয়ে আছে।

আমি কিছু বলবার আগেই ঘরের লোকেরা আমাকে অভ্যর্থনা করল।

তিন চারটি ছেলে। বয়েস বারো থেকে ষোলর ভেতরে। পরনে ময়লা ময়লা পাজামা, কারও গায়ে গেঞ্জী, কারও ছেঁড়া শার্ট। দুজন এক কোণায় বসে ফিসফিস করে কী বলছে, একজন একটা ভাঙা চেয়ারে বসে বিড়ি টানছে—তার মাথায় আবার একটা কালো রঙের টুপি। আর একজন চিত হয়ে একটা গোটানো বিছানা মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

চেয়ারে বসে যে বিড়ি খাচ্ছিল সে হঠাৎ তড়াক করে নেমে এল আমার দিকে।

এই রে, কি নাম তোর ?

বললুম, জলিল।

দূর বে, ও তো মহবুব মিঞার দেওয়া নাম। আসল নাম কি তাই বল্।

আমি জবাব দিলুম না। মহবুব মিঞা বলতে আমাকে বারণ করে দিয়েছিল।

ছেলেটা আমাকে যাচ্ছেতাই একটা গাল দিয়ে বলল, ঘর দুয়োর কিছু ছিল, না এখানে মরতে এলি ?

ঘর দুয়োর !

অনেকক্ষণ পরে যেন আমার ঘোর কেটে গেল। একটা নেশার মধ্য দিয়ে চলেছিলুম, এইবার চমকে জেগে উঠলুম।

মাথার ওপর সেই লালচে আলোটার দিকে তাকিয়ে মনে পড়তে লাগল, আমাদের বাড়িতে লণ্ঠনের আলোর রঙও ঠিক ওই রকম। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা পিসিমা তিনটে করে লণ্ঠন জ্বালায়, তারই একটা হাতে নিয়ে বাবা পড়াতে যায় সেক্রেটারির বাড়িতে—সেই আখের ক্ষেত আর পদ্মদীঘি পার হয়ে এক মাইল দূরের ভিনগ্রামে।

মনে পড়ল আনন্দর চিৎকার : ওকে মারবেন না স্যার, ও কোন দোষ করে নি। তারপর সেই জঙ্গল, সেই অন্ধকার, সেই মড়ার মাথাটার উপরে জোনাকির ঝিলিমিলি। সেখান থেকে ছুটতে ছুটতে স্টেশনের নীল আলো। বড় বড় বস্তায় ভরা একটা আধা-অন্ধকার টিনের চালা। তারই ভেতর বস্তার পাশে লুকিয়ে বসে থাকা। শেষে চারদিকে ঝড় তুলে রেলগাড়ি এল। পিসিমার সঙ্গে একবার তারকেশ্বরে গিয়েছিলুম, রেল আমি চিনি। টুক করে চেপে বসলুম।

কলকাতা। সবাই বলছিল, কলকাতা। একটা মস্ত ঘরের মধ্যে এসে রেলটা থমকে থেমে গেল।

সব লোক নামছে, আমিও নেমে পড়লুম। সবাই

যেদিকে চলেছে, সেই দিকেই এগিয়ে চললুম। তারপর লোহার দরজার মুখ দিয়ে যেখানে একটি-একটি করে লোক বেরুচ্ছে, সেখানে কালো কোট পরা কে একজন খপ করে আমার হাত চেপে ধরল।

টিকিট ?

নেই।

আমি জানতুম, রেলে চাপলে টিকিট কাটতে হয়।

আমার হাত চেপে ধরে কালো কোট-পরা লোকটা বলল, টিকিট নেই কি না পরে দেখছি। দাঁড়িয়ে থাক এখানে।

পাশ থেকে আর একজন কালো কোট বলল, ছেলেটার চেহারা দেখেছ ঘোষ ? বাপ্‌রে—কী ভয়ানক !

ঘোষ বলল, হ্যাঁ, এরাই হচ্ছে আসল ক্রিমিন্যাল। ট্রেনে চুরি-ছ্যাঁচড়ামো করে। পুলিসে দেব।

ক্রিমিন্যাল ! হ্যাঁ। কথাটা আমার মনে ছিল। আমার স্মৃতিশক্তি যে ভাল সে পরিচয় বাবা পেয়েছিল, ইস্কুলের সেকেণ্ড মাস্টারও পেয়েছিল। তা ছাড়া সেই বয়েসে, সেই সব দিনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত আমি মনে করতে পারি। জীবনের অনেক ছোট ছোট জিনিসই এমনি ভাবে গাঁথা হয়ে থাকে। অনেক বড় বড় বেদনা কাটা ঘায়ের মত, তারা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়, কিন্তু এমন ছোট ছোট অসংখ্য আঘাত আছে, যারা কাঁটার মত মাংসের গভীরে গিয়ে প্রবেশ করে—চিরদিন তাদের অস্তিত্বকে অনুভব করতে হয়।

দু নম্বর কালো কোট আবার একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার দিকে।

যেন ফরমাশ দিয়ে তৈরি। এমন অপূর্ব জীব এমনিতে পয়দা হয় না।

ঘোষের একটা হাত শক্ত করে আমার মুঠোটা ধরে রেখেছিল। অন্য যাত্রীদের কাছ থেকে টিকেট নিতে নিতে সে বলল, দেখছি আমি, জীবটি কেমন।

সেই সময় কোথা থেকে এল মহবুব মিঞা। এখন মনে পড়ছে, গাড়ি থেকে যখন আমি নামি, তখনই সে আমাকে একদৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল। আমিও দেখেছিলুম তাকে। চওড়া-চেতানো বুক, বাবরি করা চুল, কব্জীর ওপরে মস্ত একটা সোনার ঘড়ি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল।

মহবুব এগিয়ে এসে পকেট থেকে একটা এক টাকার নোট বের করে ঘোষের বুক-পকেটে গুঁজে দিল। হেসে বলল, আরে, ছোড় দিজিয়ে বাচ্চাকো, মেরা আদমি—

তারপর—

তারপর আমি চমকে উঠলুম। সেই বড় ছেলেটা আমার চুল ধরে টান দিয়েছে।

কি রে, কথা বলছিস না কেন ?

চুলে টান পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সারাটা শরীর খুশীতে দুলে উঠল। মনে হল, সে খুশীর অংশ ওকেও দেওয়া দরকার। আমি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়লুম ছেলেটার ওপরে।

লাগ ভেলকি লাগ, ঘরশুদ্ধু ছেলে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

বেশীক্ষণ দেরি হল না। ইস্কুল থেকে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে আরও খানিকটা হিংস্র শক্তি এসেছে আমার শরীরে। আমার অদ্ভুত অস্বাভাবিক শরীরের প্রত্যেকটা মাংসপেশী যেন জানত—পৃথিবীতে বাঁচতে হলে এবারে নিজের পায়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে। দু মিনিটের মধ্যে ওর বুকের ওপর আমি চেপে বসলুম। তারপর ওর চুলগুলো শক্ত মুঠোতে টেনে ধরলুম।

বল্ কেমন লাগছে এইবার।

আমি হাসছিলুম, কিন্তু ছেলেটার মুখ যন্ত্রণায় নীল হয়ে গেল।

আঃ ছাড়্—ছেড়ে দে। মেরে ফেলবি নাকি ?

আমার ঘাড়ে বাঘের মত কার একটা থাবা এসে পড়ল। এক টানে তুলে ফেলল আমাকে। তারপর বজ্রের মত একটা চড়। আমি হেসে উঠবার আগেই আবার সমুদ্রের মত অন্ধকার।

তার আগে বিদ্যুৎ-চমকের মত দেখলুম মহবুব মিঞার মুখ।

জ্ঞান হল একটু পরেই। জলের ছিটে দেওয়ার দরকার ছিল না, ঘাড় ঝাঁকুনিতেই আমি উঠে বসলুম।

বাঘের মত দুটো চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল মহবুব মিঞা। মুখের ভেতর কড়কড় করছিল দাঁত। বলল, ইবলিশের বাচ্চা! ফের মারামারি করবি তো জিন্দা গোর দিয়ে দেব।

আমার নতুন জীবন আরম্ভ হল।

বাড়ির কথা ভাবি নি? অনেকবার ভেবেছি। এক একদিন রাতে হাত বাড়িয়ে খুঁজেছি পিসিমাকে। ঘুমের ঘোরে দেখেছি, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আনন্দ।

আমাদের বাড়ি যাবি আজ মুরারি? মা গোকুলপিঠে করেছে, যেতে বলেছে তোকে।

চমকে জেগে উঠেছি। অন্ধকার ঘর। আরশোলা ফরফর করে বেড়াচ্ছে আশপাশে। নোনাধরা দেওয়ালের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ ভাসছে হাওয়ায়। পাশের বিছানায় দুটো ছেলে কী গল্প করছে নীচু গলায়! বিড়ি খাচ্ছে আর হেসে উঠছে মধ্যে মধ্যে।

পিসিমা নয়—আনন্দ নয়—কেউ নয়। কলকাতা। মুরারি বলে যে ছিল, সে মরে গেছে অনেক কাল। এখন আমার অন্য নাম। অন্য জীবন। অন্য পরিচয়।

ঘুম আর আসবে না। কান পেতে শুনেছি ওদের গল্প। এক দিন নয়, দু দিন নয়—অনেক দিন। প্রথম প্রথম তার অর্থ বুঝি নি, বুঝেছি অনেক দিন পরে। বিকৃত যৌন অভিজ্ঞতার কাহিনী। তার সঙ্গে আরও বিকৃত কল্পনার খেয়াল।

দু বার পালাবার চেষ্টা করেছি এখান থেকে, পালাতে পারি নি। মহবুব মিঞার চোখ যেন হাজারটা হয়ে পাহারা দিয়েছে। তারপর আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এদের সঙ্গে। মার খেয়েছি, হেসেছি, মারামারি করে হাসিতে উতরোল হয়ে উঠেছি। মাতাল হয়ে এসে একদিন মহবুব মিঞা জানোয়ারের মত আমাকে ঠেঙিয়েছে, এক-একটা করে হাসির দমকের সঙ্গে এক-একটা করে দাগ পড়ে গেছে পিঠের ওপর।

ছেলেগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওরা যা শেখাতে চেয়েছিল, শিখে নিলুম। এক বছর পরে যখন স্বাধীন হয়ে কাজ করতে বেরুলুম, সেদিন নিয়ে এলুম দুটো ফাউন্টেন পেন আর একটা মানিব্যাগ। ব্যাগে এক শো টাকার ওপর ছিল।

সেদিন আড্ডায় মহবুব ছিল, কালু ছিল, গণেশ ছিল। অর্থাৎ ওস্তাদের সঙ্গে বড় সাকরেদরা সবাই।

একগাল হেসে মহবুব আমার পিঠ চাপড়ে দিল। ব্যাগ থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আমাকে দিয়ে বলল, নে—তোর বকশিশ।

কিন্তু কি করব আমি বকশিশ নিয়ে?

ছেলেগুলো জোঁকের মত আমার সঙ্গ ধরল।

চল্, ফুর্তি করে আসি।

ফুর্তি? কাকে বলে তা তো ঠিক জানি না।

ওদের সঙ্গেই বেরুলুম।

রেস্তোরাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল এর মধ্যেই। চপ-কাটলেট-মাংস খাওয়া হল সবাই মিলে। তারপর দলের দুজন বড় ছেলে বলল, দুটো টাকা ধার দে।

কি করবি টাকা দিয়ে?

যাব এক জায়গায়।

ওদের চোখে দৃষ্টি চকচক করে উঠল। আর সেই হাসি—যার অর্থ এর মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

বললুম, আমিও যাব।

তুই ছেলেমানুষ, এখন নয়। সময় হলে নিয়ে যাব তোকে।

ঘরে ফিরে এলুম। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হতে লাগল মনের ভেতর। ওদের হাসি, ওদের গল্পের ভেতর দিয়ে যে এলোমেলো আভাস পেয়েছিলুম, সেগুলো অদ্ভুত কল্পনা তৈরি করতে লাগল।

আরও দু বছর।

এর ভেতরে আরও তৈরি হল হাত। পকেট মেরেছি, ধরা পড়েছি, মার খেয়েছি প্রচুর। কিন্তু একটা অভিজ্ঞতা এর মধ্যেই আমার লাভ হয়েছিল। দেখেছি, মার খেয়ে আমি যতই হেসে উঠি, লোকগুলো ততই ক্ষেপে যায়। ততই কিল-চড়-লাথি সমানে পড়তে থাকে আমার গায়ে।

মারকে আমার ভয় নেই; যন্ত্রণার ঘায়ে আমার হাসির যন্ত্রটা আরও দ্রুত লয়ে বাজতে থাকে। কিন্তু ভয়

কার মৃত্যুকে। ভয় করি সেই সমুদ্রকে—যার শেষ নেই, যার তল নেই, যার মধ্যে আমি ডুবতে থাকি, ডুবেই চলি। হিংস্র আক্রমণের আঘাতে আমার লোহার মত শরীরটাও টলে ওঠে একসময়। একটা ঝাঁঝরির পাশে হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ি, নিজের রক্তের স্বাদে আমার শিরাস্নায়ু আচ্ছন্ন হয়ে যায়—তারপরেই ঢেউয়ের পরে ঢেউ। প্রাণপণে হাত দিয়ে একটা কিছু আঁকড়ে ধরি, ফুটপাথের কোণা, লোহার পোস্ট, এক টুকরো পাথর। ঢেউয়ের ওপর মাথাটাকে তুলে রাখতে চেষ্টা করি, কিন্তু তারপর—

এখন আর হাসি না। হাসিটাকে বুকের ভেতরে চেপে রাখতে চেষ্টা করি। একটা অদ্ভুত ঘড়ঘড়ানি ওঠে গলা দিয়ে, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। মারবার জন্যে যারা হাত তুলেছিল, তারা থমকে যায় এক পলকের জন্যে। মৃগী নাকি? রোগ আছে কিছু? সেই ফাঁকে সোজা রাস্তার ওপর উবুড় হয়ে পড়ি, দু হাতে চেপে ধরি মুখটা, তারপর বন্ধ হাসিটাকে মুক্তি দিই। সারাটা শরীর হাসিতে থর থর করে কাঁপতে থাকে। আবার থমকে যায় লোকে। পিঠে মাথায় পেটে কয়েকটা লাথি মেরে কদর্য গালাগাল দিতে দিতে চলে যায়।

এর মধ্যে অনেক দেখে নিয়েছি দুনিয়াকে। অভিজ্ঞতার কোথাও কিছু বাকি নেই। বকশিশের টাকা হাতে এলে এখন আর আমাকে ছেলেমানুষ বলে ওরা ফেলে রেখে যায় না।

অভ্যাসে যাই ওদের সঙ্গে। কিন্তু আমার ভাল লাগে না। সমস্ত ব্যাপারটাকেই কেমন অর্থহীন, অসঙ্গত বলে মনে হয়। মানুষ এমন অদ্ভুত হাস্যকর হয় কেন? আর সবটাই যখন এমন হাস্যকর, তখন আমি হেসে উঠলে সবাই রাগ করে কেন?

এরই এত গল্প? এর জন্যেই এত জল্পনা-কল্পনা, এত ফিসফিসানি, ধেৎ!

একদিন একজন বলেছিল, আমাদের যদি এতই ঘেন্না, তবে আসিস কেন?

ঘেন্না করি না তো। মজা দেখতে আসি।

মজা দেখতে আসেন! যেমন বিটকেল যমদূতের মত চেহারা, তেমনি কথার ছিরি! খবরদার, আর আসবি নি।

না এলে তোরা খাবি কী?—আমি চটপট জবাব দিয়েছিলুম: সঙ না দেখালে তোদের তো খাওয়া জোটে না!

আমাদের খাওয়া জুটুক বা না জুটুক, তোর কি? ড্যাক্‌রা হতচ্ছাড়া—বেরো এখান থেকে।

আমি বেরিয়ে এসেছিলুম। আর যাই নি।

সোজা গিয়ে বসেছিলুম গঙ্গার ধারে। বাঁধানো পোস্তার অনেকখানি পর্যন্ত ঘোলা জল জোয়ারে উঠে এসেছে। প্রায় জলটা ছুঁয়ে আমি ঘাটের ওপরে বসলুম।

দুটো লোক টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়া করছে। একজন বলছে, তোকে দেখে নেব। দেখে নেবার জন্যে ভাবনা কি, পাশেই তো বসে আছে—যত খুশী দেখে নিলেই তো হয়। সে কথাটা অত চিৎকার করে বলার কী দরকার ছিল?

একজন কেরোসিনের টেমি জ্বেলে ওড়িয়া ভাষায় সুর করে কি পড়ছে, তিন-চারজন হাঁ করে তাই শুনছে। কয়েকবার 'ড়ামচন্দ্রো' 'ড়ামচন্দ্রো' শুনে বুঝলুম রামায়ণ। রামায়ণের গল্প আমি জানি। পিসিমা রামায়ণ পড়ত, আমি শুনেছি। কিন্তু গঙ্গার ধারে কেন? অমন সুর করেই বা কী হবে?

মাঝিদের দুটো নৌকো বাঁধা আছে, সেখান থেকে ইলিশ মাছের ঝোলের গন্ধ আসছে। আমার ক্ষিদে পেল। একটা বিড়ি বের করে ধরালুম পকেট থেকে।

গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলুম, আকাশটা উলটে আছে তার ভেতরে। নৌকোর ছায়াগুলো উলটো, নানা রঙের আলো যেন জলের মধ্য থেকে জ্বলে উঠছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন ঘোর এল—মনে হল সব উলটো-পালটা; নৌকোগুলো আঁকাবাঁকা; আলোগুলো ভাঙা-চুরো—কোনও কিছুর কোন মানে হয় না। গঙ্গায় ঢেউ দিয়েছে, জলের আওয়াজ উঠছে পোস্তার গায়ে। আমার মনে হল, পরিষ্কার একটা হাসির আওয়াজ আমি শুনতে পেলুম।

আর মনের ভুলে, বিড়ির জলন্ত দিকটা উলটো করে যেই মুখে দিতে গেছি—অমনি চমকে উঠলুম। ঠোঁটটায় ছ্যাঁক্ করে উঠল, হেসে উঠেই বিড়িটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম জলের ভেতরে।

শালা!

গালটা আমি দিতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই আর একজন দিল। তাকিয়ে দেখি, সেই টাকা-পয়সার হিসেব যারা করছিল, তাদেরই একজন। এখন মুখোমুখি উঠে দাঁড়িয়েছে।

আর একজন আরও যাচ্ছেতাই করে গালাগালি দিল।

যে শালা বলেছিল, সে যেতে যেতে মুখ ফেরাল। বলল, আচ্ছা, মনে থাকবে—দেখে নেব তোকে।

পুলিস। আমিও দেখে লুব তোকে। নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দুবো।

দেরি করে কী হবে—এখনই দেখে নাও না। আর দেখে নিলেই বা নিজের নাম ভুলবে কেন! আমি ভেবে পেলুম না।

ও-রকম লোকে বলে। কিন্তু কেন বলে?

গঙ্গার জলে সব এলোমেলো, আঁকাবাঁকা, ভাঙাচুরো দেখাচ্ছে। আলোগুলো যেন জ্বলছে জলের তলায়। আকাশটা নেমে পড়েছে গঙ্গায়। গঙ্গা আকাশে উঠলে কেমন হয়!

জোয়ারের জলে হাসির শব্দ। আমি উঠে পড়লুম।

উঠে হাঁটতে লাগলুম পথ দিয়ে। বুড়ো রিক্‌শওলার গাড়িতে চেপে দুটো মোটা মোটা লোক বলছে, জলদি চলো—জলদি চলো। বুড়োটার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে বলে মনে হল।

একটা মোটা ষাঁড় বসে বসে জাবর কাটছে, তার দুটো শিঙে আর কপালে কারা যেন সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। ষাঁড়ের কপালে সিঁদুর কেন? সিঁদুর তো বিয়ে হলে মেয়েরা কপালে দেয়!

গরমা গরম ডালমুট বেচছে একজন, দেখলুম সেগুলো দু দিনের বাসী। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আধবয়েসী একজন বিধবা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছে, 'অমন ভাসুরের মুখে ঝাড়ু'—কিন্তু তার হাতে ঝাঁটা নেই, ভাসুরকেও কোথাও দেখতে পেলুম না।

মেয়েটা রাগ করে বলেছিল এখানে মজা দেখতে আসিস কেন?

সত্যিই তো। তাকিয়ে দেখি, মজার অভাব কোথাও নেই। একটা পা-কাটা রোগা কুকুর সমানে খ্যাঁক খ্যাঁক করে চ্যাঁচাচ্ছে, অথচ যে কুকুরটাকে দেখে এত লম্ফঝম্প, সে তেড়ে এলে ওকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

দেওয়ালের গায়ে বড় বড় করে নিষেধ লেখা আছে, আর তারই তলায় সার দিয়ে বসেছে তিন জন লোক। তার কাছেই তেলেভাজার দোকানে বসে একটা পুলিস প্রায় চোখ বুজে ফুলুরী খেয়ে চলেছে। কোমরের পেটিটা আধখানা খোলা, লাঠিটা এমন ভাবে রয়েছে যে, কেউ ইচ্ছে করলেই সেটা নিয়ে সরে পড়তে পারে।

পুলিসটার সঙ্গে চেহারার মিল আছে বলেই বোধ হয়, আমার মহবুব মিঞাকে মনে পড়ল। ওই তো জোয়ান—অমনি বাঘের মত শরীর। কিন্তু একটু জ্বর হলেই কেমন কাঁদতে থাকে ছেলেমানুষের মত। কোন্ এক লাল বিবিকে তার মনে পড়ে। দশ বছর আগে সে ফৌত হয়েছে, অথচ একটানা ফোঁপাতে থাকে তার জন্যে। আর বলে, ম্যয়, আপনা ঘর চল্ যাউঙ্গা—জরুর চলা যাউঙ্গা—

অথচ মহবুব মিঞার ঘর নেই। আমরা জানি, অনেককাল আগেই কুশী নদীর বানে সে ঘর ভেসে গেছে।

চলতে চলতে শ্মশানের সামনে এসে দাঁড়ালুম। কী ভেবে ঢুকে পড়লুম তার ভেতরে।

কালি-পড়া দেওয়াল, মানুষের নামের আঁচড় এদিকে ওদিকে। খুব বড় বড় হরফে এক জায়গায় পোড়া কয়লা দিয়ে লেখা: ৺হরবল্লভ দে সরকার, সাং জনাই, জেলা হুগলী, মৃত্যু—১৩—

নিমতলার শ্মশানে পুড়ে যে কবে ছাই হয়ে গেছে, তার সাকিন কার কী কাজে লাগবে আমি ভেবে পেলুম না। কেউ কি সেখানে তাকে চিঠি লিখবে, না, খুঁজতে যাবে? বরং ভূত যদি হয়ে থাকে, তা হলে কোন্ গাছে বাসা বেঁধেছে সেটা জানতে পারলে তার শত্রুরা নিশ্চিন্ত হত।

কথাটা মনে আসতেই আমার হাসি পেল। আমি হা-হা করে হেসে উঠলুম।

একটা সাধু গাঁজা খাচ্ছিল, সে চোখ লাল করে তাকালো আমার দিকে। আধপোড়া চিতার পাশে বসেছিল চার-পাঁচজন, তারাও চোখ ফেরাল।

পাগল নাকি ?

পাগল না ব্রহ্মদৈত্য—কে জানে ! কী কদাকার দেখতে ।

তখন আমার চিতার দিকে চোখ পড়ল। বাঁশ দিয়ে ডোম চিতা ঝাড়ছে, আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে চারপাশে। আমি হঠাৎ মড়াটাকে দেখতে পেলুম। এক-সময় নিশ্চয় মানুষ ছিল, হয়তো আমার মত বীভৎস ছিল না—খুব চমৎকার ছিল চেহারা। কিন্তু এখন ? একটা কোঁচকানো কালো পুতুলের মত দেখতে—নাক নেই, মুখ নেই, কিচ্ছু নেই। যেমন বিকট, তেমনি কদাকার।

হেসে উঠতে গিয়েও আমি হাসতে পারলুম না। মনে হল, একদিন যখন অমনি করে আমিও চিতার আগুনে পুড়তে থাকব, তখন কারও সঙ্গে আমার কোনও তফাত থাকবে না। একটা খোলসের তলায় সব এক রকম—সমান কুৎসিত, সমান অসঙ্গত, সমান হাস্যকর। পেটের দায়ে যে মেয়েরা সঙের খেলা দেখায়, তারা জানে, একদিন না একদিন সবাইকেই সঙ সাজতে হবে। কেউ বাদ যাবে না—কেউ নয়।

॥ চার ॥

এইখানে আমার কথা কিছু সংক্ষেপ করে আনব।

আমি দ্বিতীয়বার জেলে গেলুম। এবার ঠেলল ছ মাস। বেরিয়ে আসতেই দলের একজনের সঙ্গে দেখা।

মহবুব মিঞা খুন করেছে কালুকে। যে মেয়েটাকে টাকা দিয়ে রেখেছিল মহবুব, কালু নাকি চুপিচুপি আসা-যাওয়া করত তার কাছে। একদিন তৈরি হয়েই যায় মহবুব, হাতে হাতে ধরে কালুকে, তারপর বড় ছোরাটা সোজা কালুর পেটের মধ্যে চালিয়ে দেয়। সেই থেকে মহবুব ফেরার। আড্ডার উপর পুলিসের চোখ পড়েছে, গণেশ আর আসতে ভরসা পায় না, ছেলেরা সব ছিটকে পড়েছে এদিক-ওদিক।

যে খবর দিয়েছিল তার নাম হারুণ। বলল, আমি আছি খিদিরপুরে। শেখ বাচ্চুর আড্ডায়। যাবি ?

আমি চুপ করে রইলুম। চোখের সামনে কালুর চেহারাটা ভাসছিল। ডান হাত ছিল সে মহবুবের। অথচ, তাকেই সে খুন করে ফেলল একটা মেয়ের জন্যে ? অথচ মেয়েরা—

আমি হেসে উঠলুম।

হারুণ বিরক্ত হয়ে বলল, তোর হাসির পাগলামো বন্ধ কর্। যাবি ?

না।

চল্ না। ওখানকার কাজ আরও ভাল। খুব জবর কারবার। ডকের মাল-সরানো আছে, জাহাজ থেকে আফিং-সোনা পাচারের কাজ আছে। লাল হয়ে যাবি।

বললুম, মরবার পরে তুই কালুকে দেখেছিলি ? কালু হাসছিল ?

হারুণ গাল দিয়ে বলল, তোর সত্যিই মাথা খারাপ। চুলোয় যা তুই। তবে যদি কখনও বেকায়দায় পড়িস, খিদিরপুরে মজিদ মিঞার হোটেলে খোঁজ করিস। বাজারের ওপরেই।

হারুণ চলে গেল।

আমি কালুর মুখটাকে ভাবতে চেষ্টা করছিলুম। দুটো সোনা-বাঁধানো দাঁত ছিল ওর। নানারকম কাজ করত কালু। একদিন সন্ধ্যার সময়ে আমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলুম। চৌরঙ্গীর পেছন দিকে ঘুরঘুর করত। লোক বুঝে তার কাছে গিয়ে ফিসফিসিয়ে বল' প্রাইভেট স্যার, স্কুল-গার্ল, অন্‌লি সিক্সটিন—

দেখলুম, বেশ ঝকঝকে তকতকে একটি ভদ্রলোক ওর পিছু পিছু রিক্‌শায় গিয়ে উঠল।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলুম। কালু ফিরে এল একটু পরেই। সেই সোনা-বাঁধানো দাঁতের ঝিলিক দেখিয়ে হেসে বলল, বারো টাকা দালালী পেলুম। মেয়ের কাছ থেকেও পাব।

আমি কালুর সেই দাঁতগুলোর কথা ভাবছিলুম। মরবার সময় কি তেমনি দাঁতের ঝলক বের করে হেসেছিল কালু ? আর মহবুব কি খুলে নিয়েছিল দাঁত দুটো ? বেশ খানিকটা সোনা ছিল তাতে।

কিন্তু কালুর কথা থাক্। আমি কোথায় যাই ?

আড্ডা ভেঙে গেছে, মহবুব ফেরার। কারও কাছে আমার কোনও দায় নেই। দেশে ফিরে যাব ? একটা পার্কে এসে বসে ভাবতে লাগলুম, কেমন হয় ফিরে গেলে ?

পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে, পিসিমা কি বেঁচে আছে এখনও? বাবা কি আজও তেমনি করে আখের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, পদ্মদীঘির ধার দিয়ে সেই ইস্কুলে পড়াতে যায়? এখনও কি সেই সেকেণ্ড মাস্টার তেমনি করে ছেলেদের নিয়ে মজা করতে ভালবাসে? চার বোনের এক ভাই আনন্দ কেমন আছে এখন—কত বড় হয়েছে সে?

ফিরে যাব? না—আর ফেরা যায় না। ফিরলে আবার বাবা, আবার স্কুল, হয়তো আবার সেই সেকেণ্ড মাস্টার। নাঃ, আর উপায় নেই তার। গ্রামে গিয়ে আমি থাকতে পারব না।

পিসিমাকে আমি তো প্রায় ভুলেই গেছি, সে-ই কি আর মনে রেখেছে? আর বাবা তো আমাকে ভুলতে পারলেই খুশী হয়। আনন্দর কত বন্ধু জুটেছে এতদিনে। আমি পকেটমার, আমি জেল খেটেছি, আমার জীবন একেবারে আলাদা হয়ে গেছে। কী হবে ফিরে গিয়ে? কারও সঙ্গেই আমার আর মিলবে না।

কিন্তু আমারও আর ভাল লাগে না। এখন মনে হচ্ছে, হঠাৎ যেন ছুটি পেয়ে গেছি। এতদিন সব সময় মহবুবের ছায়াটা পেছনে দাঁড়িয়ে থাকত—যেন নিজের ইচ্ছেয় কিছু করি নি, তার ভয়টাই আমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়েছে। আর নয়। এ আর আমার ভাল লাগে না।

একটা কিছু চাই। আমার বার বার মনে হয়েছে, এ আমার কাজ নয়। হাসির মসলা দিয়ে আমি তৈরি হয়েছিলুম, নিজে হাসব, সকলকে হাসিয়ে যাব। এখন দেখছি, এতদিন নিজে হাসতে পারি নি, প্রতি মুহূর্তে হাসিটাকে আমায় প্রাণপণে চাপতে চেষ্টা করতে হয়েছে। মার খেয়ে যত হেসেছি, মারের জোরটা তত বেড়ে উঠেছে। তারপর চোখ ভরে সেই অন্ধকার নেমে এসেছে—যাকে আমি এত বেশী ভয় করি; আর সেই অন্ধকারে [illegible]র শেষ বিন্দুগুলো জোনাকির মত জ্বলে উঠেছে—যেমন দেখেছিলুম সেই পালানোর রাত্রে—সেই মড়ার খুলিটার ওপরে।

কাউকে হাসাতে পেরেছি? না। আমার দিকে আচমকা চোখ পড়লে লোকে কেমন আঁতকে উঠেছে। পকেট মেরে নিরাপদ জায়গায় সরে এসে দেখেছি লোকটার হাউ হাউ কান্না: মাইনের টাকাটা নিয়ে গেল মশাই, এবার সারা মাস উপোস করতে হবে ছেলেপুলে নিয়ে। আমার সর্বনাশ করে দিয়ে গেছে।

কান্না দেখলে আমার হাসি পায়। জ্বরের ঘোরে মহবুব যখন লাল বিবির জন্যে ডুকরে উঠত, তখন হাসি চাপবার জন্যে ঘরের বাইরে বেরিয়ে যেতুম। হাসতে দেখলেই ওই অবস্থাতেও মহবুব জলের গ্লাস ছুঁড়ে মারবে, যা মুখে আসে তাই বলে গালাগাল দেবে। দলের ছেলেরা কেউ লাগতে এলে যখন তার হাত মুচড়ে ধরেছি, আর মুখটাকে অদ্ভুত করে সে চেঁচিয়ে উঠেছে, তখন হেসেছি প্রাণ খুলে। কিন্তু আস্তে আস্তে দেখেছি, সব কান্নায় হাসি পায় না, কখনও কখনও বুকের ভেতরটায় কেমন যেন টনটন করে ওঠে।

এ কাজ আমার নয়। এ সব আমি ছেড়ে দেব। এতদিন যা করেছি, নিজে করি নি, মহবুব করিয়েছে আমাকে দিয়ে। এবার নিজের মত করে কাজ আমায় খুঁজে নিতে হবে।

খিদে পেয়েছিল, পকেটে একটা পয়সা নেই। একবার ভাবলুম, হারুণের ওখানেই যাই, সেই খিদিরপুরে মজিদ মিঞার হোটেলে। কিন্তু তার আগে কিছু খাওয়া দরকার।

চেনা রেস্তোরাঁয় যাওয়া চলে। ওরা আমাদের ভয় করে—বাকীতেও নিশ্চয় দেবে। কিন্তু তখুনি সে লোভটাকে আমি সামলে নিলুম। বলা যায় না, দলের কারও সঙ্গে হয়তো দেখা হয়ে যাবে। কে বলতে পারে, মহবুব মিঞা কোথাও ঘাপটি মেরে বসে আছে কি না। তারপরে হয়তো আর ফিরতে পারব না। আবার যেতে হবে সেই জীবনে, সেই শিকারের চেষ্টায়, সেই ফুর্তির সঙ দেখতে। নাঃ, অসম্ভব!

উঠে হাঁটতে হাঁটতে এলুম চৌরঙ্গীতে।

ঝকঝকে হোটেলে ঝলমলে আলো। খাবারের গন্ধ। খিদেটা মোচড় দিচ্ছে পেটের ভেতর। একজন মোটা মারোয়াড়ী গেল পাশ দিয়ে, মানিব্যাগটা দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। একবারের জন্যে হাত নিশপিশ করে উঠল। নাঃ—আর নয়।

কিন্তু খিদেটা সহ্য করা যাচ্ছে না। যেমন করে হোক কিছু খাওয়া দরকার।

দুজন সায়েব বেরুল হোটেল থেকে। এই সন্ধ্যেবেলাতেই মদে চুরচুর। শুনেছি, মদ খেলে ওদের মেজাজ খুলে যায়। আমাদের দলের একজন একবার একটা মাতাল সায়েবকে ট্যাক্সি ডেকে দিয়েছিল। গাড়িতে ওঠবার সময় সায়েব তার হাত থেকে সোনার ঘড়ি খুলে বকশিশ দিয়েছিল ওকে। ঘড়িটাকে লুকোবার জন্যে ও অনেক তাল করেছিল, কিন্তু মহবুব মিঞার চোখ এড়াতে পারে নি। ঘড়িটা কেড়ে তো নিলই, যা মার মেরেছিল সে আমার আজও মনে আছে।

হঠাৎ কী হল, আমি সায়েবদের কাছে গিয়ে হাত পাতলুম।

চার আনা পয়সা দাও না সায়েব, খাব।

আমার দিকে তাকিয়ে ওরা থমকে গেল।

ইউ নিগার! জোয়ান আড্‌মি, ভিখ্‌ মাঙ্গতা?

একবারের জন্যে আমার লজ্জা হল। মনে হল ছিঃ ছিঃ, সত্যিই আমি ভিক্ষে চাইছি ওদের কাছে! কিন্তু ভিক্ষে না চাইলেও আর একটা রাস্তা খোলা আছে সামনে। পকেট মারতে হবে। না, কিছুতেই নয়।

খেতে পাই না সায়েব।

নোক্‌রি কর, নোক্‌রি কর, ইউ নিগার।

নোক্‌রি মেলে না সায়েব।

(মিথ্যে কথা বললুম। চাকরির কথা আমি কখনও ভাবি নি। চাকরি যে কী করে করতে হয় তাও জানা নেই আমার।)

হট! সায়েবরা এগোতে চেষ্টা করল।

আমার কেমন রোখ চেপে গেল। সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে বললুম, কিছু দিয়ে যাও সায়েব, অন্ততঃ চার আনা পয়সা, খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

হট যাও হটো।

বলে হঠাৎ পা তুলল একজন। প্রচণ্ড একটা লাথি এসে পড়ল আমার পাঁজরায়।

আমি ঘুরে পড়ে গেলুম। কিন্তু চোটটা বেশী লাগে নি, তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়েছি আমি। আর আমার হাসির যন্ত্রে তখন ঝঙ্কার উঠেছে, হাসিতে আমি ফেটে পড়ছি।

আশেপাশে লোকজন ছিল না; কিন্তু যে দু চারজন ছিল, তারা সব ঘুরে দাঁড়াল আমার দিকে। সায়েবদের চোখগুলোতেও আতঙ্ক আর বিস্ময়ের ছায়া।

লাফিং!

হাসতে হাসতে আমি বললুম, মারুন স্যার, আবার মারুন। কিন্তু চার আনা পয়সা আমাকে দিতেই হবে।

আর একটা লাথি পড়ল। গড়িয়ে গেলুম না, গিয়ে ধাক্কা খেলুম একটা গাড়িবারান্দার থামে। মাথাটা ঝনঝন করে উঠল, চোখের সামনে অন্ধকারের ঢেউটা আছড়ে পড়তে না পড়তে চৌরঙ্গীর একরাশ উজ্জ্বল আলোর মধ্যে মিলিয়ে গেল।

মুখে নোনা রক্তের স্বাদ। জিভ দিয়ে দাঁতের গোড়া থেকে রক্ত লেহন করতে করতে আমি হেসে বললুম, স্যার, চার আনা পয়সা—

এবার ওরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একটা পাঁচ টাকার নোট উড়ে এল আমার দিকে।

চারদিকে তখন ভিড় জমবার উপক্রম। একটা পুলিসও যেন এগিয়ে আসছে দেখা গেল। আর দেরি করা নয়। নোটটা কুড়িয়ে নিয়ে আমি বললুম, স্যার, বহুৎ সেলাম।

তারপর ভিড়ের ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলুম।

জাল নয়, আসল পাঁচ টাকার নোট।

একটা গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটাকে আমি পরীক্ষা করলুম। কি মনে হল, গন্ধ শুঁকেও দেখলুম একবার। পোড়া তামাকের গন্ধ জড়িয়ে আছে নোটের গায়ে।

শার্টের পকেটে ময়লা রুমালটা ছিল, সেটা দিয়ে মুখ মুছে ফেললুম। ঢুকে পড়লুম একটা মুসলমানী হোটেলে। পেট ভরে রুটি-মাংস খাওয়া গেল অনেকদিন পরে। জেলের খাবার খেয়ে শরীরে কিছু আর ছিল না।

এইবার যাব নাকি হারুণদের ওখানে? দূর, কী হবে গিয়ে? যে ফাঁদ থেকে একবার বেরিয়ে এসেছি, আবার ঠেলে দেবে তারই ভেতরে। মহবুব মিঞার জায়গায় এসে দাঁড়াবে বাচ্চু শেখ। আমি ওদের চিনে নিয়েছি। সব এক রকম, কারও সঙ্গে কারোর কোন তফাত নেই।

তার চাইতে এই ভাল। লাথি খেয়ে আমি হাসতে

পারি, অন্যকে খুশী করে বকশিশ পেতে পারি। এই তো বেশ। এই করেই চমৎকার চলে যাবে। শুধু লক্ষ্য করতে হবে, কখন সায়েবগুলো মাতাল হয়ে বেরিয়ে আসে হোটেল থেকে।

থাকার একটা আস্তানা খুঁজে নিতে হবে। আজকের জন্যে আমার ভাবনা নেই, শেয়ালদা কিংবা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকব। পরে যেখানে হোক, ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবেই।

রাস্তায় নেমে এসে এক বাক্স সিগারেট কিনলুম। একটা ধরিয়েছি, এমন সময় কে বলল, শোন।

ফিরে তাকালুম। স্যুটপরা মিশমিশে কালো একটা লম্বা লোক। এক নজরেই দেখলুম, চমৎকার স্বাস্থ্য। মাথায় কোঁকড়া কালো চুল, পুরু পুরু ঠোঁট। ঝকঝকে দাঁত বের করে সে হাসছে।

আমাকে বলছেন ?

হ্যাঁ, তোমাকেই।

বলুন, কি বলবেন।

এখানে নয়, অন্য জায়গায় চল।

আমি চোখ কুঁচকে লক্ষ্য করলুম লোকটাকে। আর একজন মহবুব মিঞা! কিন্তু আর আমার ভয় নেই। এখন পনের বছর বয়স আমার। অনেক দেখেছি, অনেক শিখেছি। আজ আর সহজে আমার কিছু করতে পারবে না।

কোথায় যেতে হবে ?

চল ওদিকের মাদ্রাজী হোটেলে। তোমাকে কফি খাওয়াব।

বাংলা বলছে বটে, কিন্তু বাঙালী নয়। এবার বোঝা গেল মাদ্রাজী। কিন্তু মাদ্রাজী ? কলকাতার কোন্ পাড়ায় কোন্ পকেটমারদের আস্তানা, মোটামুটি তার সবই [illegible] কোনও মাদ্রাজীর দল কোথাও আছে বলে তো শুনি নি।

বললুম, আমি এখুনি খেয়ে এসেছি। তা ছাড়া শুধু শুধু আমাকে কেন কফি খাওয়াবেন আপনি ?

আবার কালো ঠোঁটের ভেতর থেকে আশ্চর্য উজ্জ্বল সাদা হাসি সে হাসল। বলল, কিচ্ছু ভেব না, আমি পুলিসের লোক নই।

পুলিসকে যেন আমি ভয় পাচ্ছিলুম! পুলিসের লোক নয় বলেই আমার ভয়।

বেশ, কফি না খাও, একটু গল্পই করবে আমার সঙ্গে।

না, লোকটা মহবুবের দলের কেউ নয়। এ হাসি আলাদা। এর চেহারা, এর পোশাক, এর কথা বলবার ধরন সম্পূর্ণ অন্য জাতের। মহবুবরা হলে আমি চিনতে পারতুম। ট্রামে বাসে পথে অচেনা পকেটমারকে দেখলেও আমরা যেমন সঙ্গে সঙ্গেই তাকে স্বজাতি বলে বুঝতে পারি।

আচ্ছা, চলুন।

একতলায় একটা ছোট মাদ্রাজী রেস্তোরাঁ। লোকটা ঢুকতেই রেস্তোরাঁর মালিক হেসে মাথা নাড়ল। বুঝলুম, ওকে চেনে, খাতিরও করে। ওদের ভাষায় কী বললে জানি না, তবে 'ম্যানেজার' কথাটা শুনতে পেলুম।

কোণা দেখে আমরা বসলুম। এক পেয়ালা কফি নিয়ে লোকটা বলল, তুমি বাঙালী ?

হ্যাঁ, বাঙালী।

আশ্চর্য। (কথাটা বললে: আচ্‌চড়্‌জ্জো। কিন্তু ওর সব কথাগুলো যেমন শোনাচ্ছিল, তা বলে লাভ নেই। যা বলেছিল, তাই বলি।)

আশ্চর্য কেন ?

তোমার চেহারা। বাঙালী এমন অদ্ভুত দেখতে হয়, জানতুম না।

আমি হাসলুম। নিজের সম্বন্ধে ও-কথাটা এতবার আমি শুনেছি যে, আমারই বলতে ইচ্ছে করে: আমার আগে এমন কখনও জন্মায় নি, আবার পরেও কোনদিন জন্মাবে না।

কফিটাতে আলগা একটা চুমুক দিয়ে লোকটা আবার বলল, তুমি কী কর ?

কিছুই না।

কাজ করবে ?

কিসের কাজ ? কোনও কাজ আমার জানা নেই।

লোকটা মিনিট খানেক আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। কোঁকড়ানো চুলগুলো আলোয় চিক চিক করতে লাগল, ওর নেকটাইয়ের সোনালী সুতোগুলো জ্বলতে

লাগল। একটু চুপ করে থেকে বলল, সার্কাসে কাজ করবে?

সার্কাসে!

আমি অবাক হয়ে গেলুম।

তোমাকে আমি দেখেছি। দেখেছি লাথি খেয়ে পড়ে গিয়েও তুমি হাসতে পার। লক্ষ্য করেছি খুব ভাল তোমার শরীর। কিন্তু গোরার লাথি খেয়ে ভিক্ষে কর কেন? অপমান হয় না?

অপমান কেন?

অপমান বইকি। অনেককাল ওরা লাথি মেরেছে আমাদের, এখন সে লাথি ফিরিয়ে দেওয়ার দিন।

লোকটার চোখ এইবার জ্বল জ্বল করে উঠল: জান, এই নিয়ে ওরা নিজেদের দেশের কাগজে গল্প লেখে, দুনিয়াকে জানিয়ে দেয়, ইণ্ডিয়ানেরা কুকুরেরও অধম। আমি ওদের দেশে অনেক ঘুরেছি, আমি জানি। আবার একটু থেমে সে বললে, তুমি এস আমাদের সঙ্গে।

কোথায়?

ইণ্ডিয়ান কণ্টিনেণ্টাল্ সার্কাসের নাম শুনেছ?

ঠিক মনে নেই।

দু বছর আগে আমরা ক্রিস্‌মাসে কলকাতায় এসেছিলুম। সার্কাস দেখিয়েছি কলকাতা ময়দানে। আমি সেই সার্কাসের ম্যানেজার।

কিন্তু সার্কাসে গিয়ে আমি কী করব?

সবাই যা করে। খেলা দেখাবে। তার চাইতে আরও ভাল কাজ হবে তোমাকে দিয়ে। আমাদের একজন ওস্তাদ ক্লাউন দরকার। ক্লাউন জান?

আমি চমকে উঠলুম। বললুম, হ্যাঁ, জানি। তারা হাসায়।

ঠিক। তারা না হাসালে একঘেয়ে হয়ে যায়, সার্কাস জমে না। আর সব চাইতে ভাল ক্লাউন হচ্ছে সে-ই, যে ওস্তাদ খেলোয়াড়। খেলতে পারে, খেলতে খেলতে আছাড় খেতে পারে, আছাড় খেয়ে হাসতে পারে, লোককে হাসাতে পারে।

আমি পারব?

তুমিই পারবে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলুম। নিজের জীবনের অর্থটা যেন এখন পরিষ্কার হচ্ছে আমার কাছে। এই কি আমি চেয়েছিলুম? এরই জন্যে কি দিনের পর দিন প্রস্তুতি চলছিল আমার ভেতর? এই কি আমার জন্মনক্ষত্রের সংকেত?

আস্তে আস্তে বললুম, আচ্ছা, আমি রাজী।

কফির পেয়ালা নামিয়ে রেখে আমার কাঁধে হাত রাখল ম্যানেজার। বলল, ভারী খুশী হলুম। আমি দেখিয়ে দোব, গোরার লাথি খাওয়ার চাইতেও আরও বড় কাজ তুমি করতে পার।

মনে হল, ঠিক সেই সময় রাস্তায় কে হেসে উঠল হা-হা করে। চমকে গলা বাড়িয়ে দেখলুম, একটা পাগল। গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা, মাথায় ভাঙা একটা শোলা-হ্যাট। ঠিক ক্লাউনের পোশাক।

॥ ৫ ॥

মস্ত বড় দল ইণ্ডো কণ্টিনেণ্টাল্ সার্কাস।

মাদ্রাজে ঘাঁটি। মালিক, ম্যানেজার ছাড়াও দলের অধিকাংশই মাদ্রাজী। তা ছাড়া একটি জাপানী পরিবার আছে, স্বামী-স্ত্রী, সাত বছরের একটি বাচ্চা। একজন আর্মেনিয়ান, একজন জার্মান, তিনজন পাঞ্জাবী, একজন বাঙালী।

মনে আছে, ম্যানেজারের সঙ্গে প্রথম যেদিন গিয়ে পৌঁছলুম, সেদিন মেয়েরা আমার চারদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর সে কী হাসি।

চোখ লাল করে কি একটা ধমক দিল ম্যানেজার। হাসতে হাসতেই ছুটে পালালো তারা।

পরে শুনেছিলুম, তারা জানতে চেয়েছিল, এটা কী জানোয়ার? কোথায় পাওয়া গেল একে?

কিন্তু আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছিলুম চারদিক। ঘোড়াগুলোকে দু-তিনটে চাকর দলাই-মলাই করছে। একজন একটা জলের পাইপ দিয়ে স্নান করাচ্ছে হাতিকে। খাঁচার মধ্যে ঘুমুচ্ছে সিংহেরা, বাঘেরা চুপচাপ বসে আছে। একটা আবার হাই তুলল। পাখিরা চিৎকার করছে, দৌড়োদৌড়ি করছে কুকুরগুলো।

হাসতে হাসতে দুটি মেয়ে ছুটে গিয়ে রিং ধরে দুলতে

আরম্ভ করল। দু জন পুরুষ প্যারালাল বারে কসরত করছিল।

একজন হঠাৎ এগিয়ে এল আমার দিকে। তারপর আমি ভাল করে কিছু বোঝবার আগেই লোহার মত দু হাতে আমাকে ধরে তুলে সে শূন্যে ছুঁড়ে দিল।

এ অভিজ্ঞতা নতুন। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম। তারপর সোজা গিয়ে তিন চার হাত উঁচু একটা জালের ওপর গিয়ে আছড়ে পড়লুম। উঠে দাঁড়াতেই দুলে উঠল জালটা। টাল সামলাতে না পেরে আবার পড়ে গেলুম জালের ওপর।

আবার হাসির ঝড় উঠল। দেখলুম এবার ম্যানেজারও হাসছে। কি মনে হল জানি না—আমিও হেসে উঠলুম সেই অবস্থাতেই।

সার্কাসের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেল।

দলের বাঙালীটির সঙ্গেও সেই দিনই আলাপ হয়ে গিয়েছিল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, মেয়েরা বেরিয়েছে দল বেঁধে। চাকর-বাকরেরা ঝাড়পোঁছ করছে সব। পুরুষদেরও বিশেষ দেখা নেই, তারাও কে কোন্ দিকে বেরিয়েছে। শুধু বুড়ো আর্মেনিয়ান সায়েবটা একমনে ডন-বৈঠক দিয়ে চলেছে। পরে জেনেছিলুম ও বুকের ওপর হাতি নেয়। আর এক কোণে চুপচাপ বসে জাপানী লোকটি নিজের মনে কী একটা তারের যন্ত্র বাজিয়ে চলেছে।

আমি ওর বাজনা শুনছিলুম। কী বাজাচ্ছে জানি না—অমন সুর আমি কোনদিন শুনি নি। তবু মনে হচ্ছিল, আমি যেন পিসিমার কাছে ফিরে গেছি। আমাদের বাড়িটার চুণ-বালি-খসা দেওয়ালে ইটগুলো মুখ বের করে আছে, তার উপরে প্রদীপের আলো কাঁপছে, কারা যেন সার দিয়ে বসে আছে দেওয়াল ঘেঁষে। পিসিমা পড়ছে রামায়ণের পালা—অশোক-বনে সীতা বসে বসে কাঁদছেন আর রাবণ এসে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে। চৈত্র মাসের গরম হাওয়া এখনও ঠাণ্ডা হয় নি, আমাদের বাগান থেকে বয়ে আনছে চাঁপাফুলের গন্ধের ঝলক। অন্ধকার উঠোন দিয়ে একটা সজারু চলে গেল, তার কাঁটার ঝমঝমানি শুনতে পেলুম।

ওর বাজনার ভেতর দিয়ে যেন সেই চাঁপাফুলের গন্ধ আসছিল। যেন শুনতে পাচ্ছিলুম পিসিমার রামায়ণ পড়ার সুর, দেখছিলুম হাতের কোণা দিয়ে মধ্যে মধ্যে চোখ মুছে ফেলছে। আমার বুকের ভেতরটা কেমন দুলে উঠল। হাসি নয়—কী যেন আর একটা জিনিস, ঠিক বুঝতে পারি না।

এমনি আর একদিন হয়েছিল জেলখানায়। সেও ফাল্গুন-চৈত্র মাস হবে। হঠাৎ দেখেছিলুম একটা আমগাছ সোনা রঙের রাশি রাশি মুকুলে ছেয়ে গেছে।

আমার মনে পড়েছিল আনন্দকে। ইস্কুলের টিফিনের ঘণ্টায় এমনি একটা আমগাছের নীচে বসেছিলুম আমরা। হাওয়ায় ঝুরঝুর করে পড়ছিল মুকুলের কণা, শুকনো পাতায় মধু পড়ছিল টুপটুপিয়ে, ক্ষুদে মৌমাছিরা উড়ে বেড়াচ্ছিল ক্ষ্যাপার মত। আনন্দ আর আমি তাদের পাটালি দিয়ে মুড়ি খাচ্ছিলুম। হঠাৎ চিবনো বন্ধ করে আনন্দ বলছিল, জানিস, বড়দির বিয়ে হয়ে যাবে। চলে যাবে শ্বশুরবাড়িতে। বড়দিকে ছেড়ে আমি একদিনও থাকতে পারি না—ভারি কষ্ট হবে আমার।

সেদিন জেলখানাতেও মুকুলভরা আমগাছটার দিকে তাকিয়ে এই রকম কষ্ট হয়েছিল আমার।

আমি বাজনাটা শুনছিলুম। কখন সেটা থেমে গেছে টের পাই নি। এই সময় ডেকে উঠল হাতিটা, আমার চমক ভেঙে গেল।

পাশে একজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে।

মাথার চুলগুলো ছুঁচের মত খাড়া। ভ্রূর ওপর কয়েকটা শুকনো দাগ—কিসে যেন আঁচড়ে দিয়েছে মনে হয়। লোহা দিয়ে পেটা কালো শরীর। পরনে পাজামা আর হাফ-শার্ট।

লোকটাকে বিকেলবেলায় আমি দেখেছি, একটা মোটর সাইকেল নিয়ে ভট্ ভট্ আওয়াজ তুলে তাঁবুটার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

লোকটা এসে আমার সামনেই একটা কাঠের টুলে বসে পড়ল। পরিষ্কার মোটা গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি বাঙালী?

উচ্চারণ বাঙালে—ম্যানেজারের মত নয়। আমি বাঙালে ঢঙ শুনলে বুঝতে পারি। মহবুবের দলেই কয়েকজন ছিল।

বললুম, হ্যাঁ, আমি বাঙালী।

নাম কী ?

একবারের জন্যে ভাবলুম, কী বলব। মহবুব আমাকে যে নাম দিয়েছিল সেইটে ? কিন্তু ও-নাম আমি মুছে ফেলে দিয়েছি, ওই পাঁচ বছরের মধ্যে আর আমি ফিরে যেতে চাই না।

একটু চুপ করে থেকে বললুম, মুরারি ভট্টাচার্য।

বলতেই চমকে উঠলুম। নিজের কানেই এমন আশ্চর্য শোনাল যে কী বলব। হঠাৎ মনে হল যেন একটা মরা লোকের নাম বলছি—নিমতলার শ্মশানে কাঠকয়লা দিয়ে বড় বড় হরফে লেখা যেমন একটা নাম দেখেছিলুম।

লোকটা বলল, ব্রাহ্মণ ? দেশ কোথায় ?

আমি জবাব দিলুম না।

ও, বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ ? তা এখানে মরতে কেন ? আর জায়গা জুটল না ?

এবারেও চুপ করে রইলুম। মনে পড়ে গেল, মহবুব মিঞার আস্তানায় যেদিন প্রথম এসেছিলুম, সেদিন বড় ছেলেটাও আমাকে ঠিক এই কথাটাই জিজ্ঞেস করেছিল।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম, পৃথিবীতে আমার আসল জায়গা কোন্‌টা—কোন্‌খানে গেলে আমাকে মানাতো।

লোকটা আবার বলল, চাটগাঁ গেছ কখনও ? পাহাড়তলী ?

না।

সেইখানেই আমার বাড়ি। আমার নাম হরেন দাস। কিন্তু বাঙালী বলেই আসল নামটা তোমাকে বললুম এতদিন পরে।

এরা জানে, আমার নাম মোহন পাণ্ডে। তুমি এদের বলো না।

নাম লুকিয়েছেন কেন ?

তখনই জবাব দিল না হরেন দাস। জাপানী আবার তার তারের বাজনায় একটা নতুন সুর বাজাচ্ছে। কিছুক্ষণ দুজনেই শুনতে লাগলুম। হরেন দাসও বোধ হয় বাড়ির কথা ভাবছিল।

সে অনেক কথা। আর একদিন বলব।

দেশে যান না বুঝি ?

যাওয়ার উপায় নেই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল হরেন দাসের।

কিন্তু এ সার্কাস যদি কখনও চাটগাঁয় যায় !

গিয়েছিল বছর চারেক আগে একবার। আমি যাই নি। তার আগেই ছুটি নিয়ে চলে গেলুম।

আমি ভাবতে চেষ্টা করলুম—হরেন দাসও কি আমার মত কোনও সেকেণ্ড মাস্টারকে মেরে পালিয়ে এসেছে ? সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, আমাদের গ্রামে কখনও সার্কাস যায় না। আমার কোনও ভাবনা নেই।

হরেন দাস আবার কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আচ্ছা, পরে কথা হবে তোমার সঙ্গে।

আমি সার্কাসে শিক্ষানবিশী আরম্ভ করলুম।

সার্কাসের দলের বসে থাকবার জো নেই। আজ এখানে, কাল ওখানে। ম্যানেজারের সঙ্গে যেদিন আমি গিয়ে পৌঁছেছি, তার দুদিন পরেই কাশ্মীরে রওনা হলুম আমরা।

কাশ্মীরে এক মাস। সেখানে শীত নামল, নেমে এলুম লাহোরে। লাহোর থেকে দিল্লী।

এক নিঃশ্বাসে ছ মাসের কথা বলে গেছি। এর মধ্যে আমার কথা বলা হয় নি।

কাশ্মীরে আমার কিছু করবার ছিল না। শুধু সার্কাসের সময় চাকরদের সঙ্গে জিনিসপত্র টানাটানি করতুম। জাল নিয়ে আসতুম, বার সরিয়ে দিতুম, রোপ-ট্রিকের দড়ি খাটিয়ে দিতুম, বল কিংবা রেকাবির খেলা শেষ হয়ে গেলে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যেতুম ভেতরে। আর ওরই মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছিলুম, আমি ক্লাউন নই—তবু আমাকে দেখলেই একটা হাসির ঢেউ উঠত গ্যালারিতে।

একদিন ম্যানেজারকে বলেছিলুম, আমাকে নামতে দাও একবার। ওদের চাইতে ভাল হাসাতে পারব আমি।

ম্যানেজার পিঠ চাপড়ে বলেছিল, পারবে বই কি। সেই জন্যেই তো তোমাকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন ? আগে সব শিখে [illegible]তারপরে হবে।

শেখাও চলছিল।

সেই ভোর চারটের ওঠা। সারা শ্রীনগর শহর যখন কুয়াশায় ঢাকা, পাহাড়ের উপর-নীচে আশেপাশে

আলোগুলো যখন মিটি মিটি, শীত আর কনকনে হাওয়ায় রক্ত যখন জমে উঠতে চায়—তখনই আমাদের কাজ শুরু হত।

প্রথম প্রথম টেনে তুলত ম্যানেজার। একদিন উঠতে চাই নি, এক ঝটকায় আমাকে আছড়ে ফেলল মাটিতে। তারপর গালে বসিয়ে দিল একটা প্রকাণ্ড চড়।

তৎক্ষণাৎ আমি হেসে উঠলুম। আর হাসির দমকে দমকে আমার শিরায় শিরায় রক্ত ছুটে গেল। তার পরেই বুঝলুম, হাসির জন্যে আমার আর ভাবনা নেই ; এখানে সব নিয়মে চলে, কাঁটায় কাঁটায়। একটু এদিক থেকে ওদিক হলে আর কথা নেই। চড়-চাপড় তো তুচ্ছ, যে প্রকাণ্ড লম্বা চাবুকটা নিয়ে ম্যানেজার সিংহের খেলা দেখায়—তারও ঘা মুখে-পিঠে এসে পড়ে।

আর বাঁধা একটা গালাগাল আছে তার : বাঁদী কী বাচ্চা।

তিনদিন যেতে না যেতেই আমার অভ্যাস হয়ে গেল। ঠিক চারটে বাজতে না বাজতেই ছুটে আসতুম বড় তাঁবুটার মাঝখানে। আলোয় আলোয় তাঁবু ঝলমল করে উঠেছে দিনের মত, শুধু গ্যালারিতে লোক ছাড়া আর সবই আছে। তারই মাঝখানে চলেছে কসরত।

জাপানী জোশিদোর বাচ্চা ছেলে বুশিদো পিকক্ হচ্ছে। তার মা ওকুমা একটা বোর্ডের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিথর হয়ে, আর জোশিদো একটার পর একটা ছোরা ছুঁড়ে দিয়ে তার শরীরের দু পাশে সাজিয়ে দিচ্ছে ফ্রেমের মত। এই খেলাটা দেখতে প্রথম প্রথম ভয়ে বুজে আসত চোখ, মনে হত, একটা যদি একটুখানিও ফসকে যায় তা হলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু একটাও ভুল হত না। আর সেদিকে না তাকিয়েই নিশ্চিন্তে নানা র[illegible] ফিগার করে যেত বুশিদো—যেন রবারের পুতুলের মত। [illegible]টাকে যেমন খুশী ভেঙে চুরে যা ইচ্ছে তাই করত।

এক ম[illegible] সাত শো ডন বৈঠক দিয়ে যেত বুড়ো জার্মানী ম্যাথু। এই বুড়ো বয়সেও কী তার চেহারা—যেন লোহা দিয়ে পাঁজরাগুলো তৈরি করা। মুথুস্বামী আর হরদারাও নানা কসরত করত বারের ওপর, চিন্ন রিংয়ের খেলা করত, পাঞ্জাবী হরদেও আর নটরাজন্ উঠত ফ্লাইং ট্র্যাপিজে।

এক-একদিন লোহার মস্ত বড় খাঁচাটা টেনে আনা হত, মোটর সাইকেল নিয়ে তার মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করত হরেন দাস, শেষে আর তাকে দেখা যেত না, মনে হত একটা ঘূর্ণি ঘুরছে।

আর আসত মেয়েরা।

রুক্মিনী, পদ্মা, রাধা, রত্নাবলী। রুক্মিনী মুথুস্বামীর স্ত্রী, রত্নাবলী নটরাজনের বোন। পদ্মাই ছিল সব চাইতে ছোট আর সব চাইতে সুন্দরী।

মনে আছে, আমাকে দেখে পদ্মাই সব চাইতে বেশী হেসেছিল প্রথম দিন।

পদ্মা উঠত ফ্লাইং ট্র্যাপিজে। আর এই খেলাটাই আমার সব চাইতে রোমাঞ্চকর মনে হত। মাথার উপর দুলছে ট্র্যাপিজ, সেই ট্র্যাপিজে ঝড়ের মত দুলছে পদ্মা। নিখুঁত শরীর, নিটোল বুক—পদ্মাকে দেখে মনে হত যেন পাথর কুঁদে কুঁদে গড়া।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্ত।

হঠাৎ দুলতে দুলতে সে প্রচণ্ড বেগে এক দিকের ট্র্যাপিজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যেত তীরের মত। আমার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যেত। যদি ছিটকে বেরিয়ে যায়, তা হলে কত দূরে গিয়ে যে আছড়ে পড়বে ঠিক নেই! সমস্ত শরীরটা ওর মুহূর্তে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হত না, একেবারে নির্ভুল ভাবে সে ওপাশের ট্র্যাপিজের উপরে গিয়ে পড়ত। একবার দোল খেয়েই সোজা উঠে দাঁড়াত দড়ি ধরে। হাসিতে ঝলমল করত মুখ।

আমি স্তম্ভিত চোখে তাকিয়ে থাকতুম সেদিকে। আর তখনই হয়ত একটা চড় পড়ত গালে।

হাঁ করে ওদিকে কী দেখছিস বাঁদী কী বাচ্চা। নিজের কাজ কর্।

বলেছি, অদ্ভুত চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মেছিলুম আমি। দশ বছর বয়সে ষোল বছরের জোর ছিল আমার গায়ে। পনের বছরে পা দিয়ে আমি পঁচিশ বছরের জোয়ান হয়ে উঠেছিলুম। মানুষ পাঁচ আঙুলে যা ধরে ছ আঙুলে তার চাইতে আমি অনেক বেশী আঁকড়ে ধরতে পারতুম।

রুটি-মাংস-ডিম-ফলমূল খাওয়া, নিয়মিত ব্যায়াম, ঘড়ি ধরা কাজ। আমার ভয়ঙ্কর শরীর আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। কাশ্মীর থেকে যখন আমরা লাহোরে এসেছি, তখনই আমি তৈরি হয়ে গেছি অনেকখানি। তৈরি না হয়ে উপায় ছিল না। ম্যানেজার আমাকে ভালবাসত, হঠাৎ একটা কাজে কলকাতায় গিয়ে সে আমাকে কুড়িয়ে এনেছিল—হয়তো সে জন্যে আমার ওপর তার যেন দায়িত্বও জন্মেছিল খানিকটা। কিন্তু কাজে গাফিলতি হলে তার কাছে কোন ক্ষমা ছিল না।

একটু ভুল হলেই চড় পড়ত গালে। সঙ্গে সঙ্গে আমি হি-হি করে হেসে উঠতুম। আর ম্যানেজার মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকত আমার দিকে। তার দু চোখ যেন বলত: সাবাস সাবাস!

শুধু চাকরগুলোর অসহ্য ঠেকত। ওদের মধ্যে থেকেও আমি ওদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি। নানারকম ভাবে আমাকে বিরক্ত করবার চেষ্টা করত যখন-তখন।

যেখানে আমাদের তাঁবু পড়েছিল, সেখানে মস্তবড় চৌবাচ্চা ছিল একটা। ঠাণ্ডা কনকনে জল জমে থাকত তাতে। জানোয়ারদের জন্যে দরকার হত, আমাদের কাজে লাগত। একদিন সকালে এসে বসেছি সেই চৌবাচ্চার ওপর। হঠাৎ পাশ থেকে একটা ধাক্কা লাগল আচমকা। আমি ঝপাং করে সেই হিমশীতল জলের মধ্যে উলটে পড়লুম।

আঁকুপাঁকু করে উঠে দাঁড়াতেই দেখি বিঠু বলে একটা চাকর দাঁত বের করে হাসছে।

দাঁতগুলো ঠকঠক করে কাঁপছিল। সারা শরীরে অসহ্য হাসির উল্লাস। সেই উল্লাসেই আমি বিঠুর ওপরে লাফিয়ে পড়লুম।

বিঠু হয়তো এতটা ভাবতে পারে নি; হয়তো আন্দাজ করতে পারে নি পনের-ষোল বছরের শরীরে আমার কী শক্তি—হাসির নেশা লাগলে সে শক্তি কী বুনো, কী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

দু হাতের বারোটা আঙুলে লোহার আংটার মত আঁকড়ে ধরলুম ওকে। আমার মুখে ও একটা ঘুষি মারতে চেষ্টা করল, আমার হাসিটা তাতে আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আমি ওকে দু হাতে ওপরে তুলে ধরলুম, তারপর চৌবাচ্চার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

বিঠু মাথা তুলেই আমাকে কুৎসিত গাল দিতে শুরু করে দিল। এই এক মাসের মধ্যেই তেলেগু ভাষার গালাগাল আমি খানিকটা বুঝতে শিখেছি। বিঠু চৌবাচ্চা থেকে উঠে পড়বার আগেই জলের মধ্যে আবার আমি ওকে চেপে ধরলুম।

বিঠু ছটফট করতে লাগল। সেই উগ্র হাসির উত্তেজনায় হয়তো সেদিন বিঠুর হাসি চিরদিনের মতই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু ঠিক সেই সময় কোথা থেকে এল মুথুস্বামী। এক ঝটকায় আমাকে দূরে ফেলে দিয়ে বিঠুকে টেনে তুলল। বিঠু তখন খাবি খাচ্ছে।

ম্যানেজারের কাছে খবর গেল।

ম্যানেজার এল সেই প্রকাণ্ড লম্বা চাবুকটা হাতে করে। দু চোখে তার আগুন ঝরছে। আমার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, বাঁদী কী বাচ্চা!

চাবুক খাওয়ার জন্যে আমি তৈরি হচ্ছিলুম। মারকে আমার ভয় নেই। হাসির ঘোর আমার তখনও কাটে নি। মুথুস্বামী টেনে তোলবার পর বিঠুর মুখের চেহারাটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না।

ম্যানেজারের হাতের চাবুকটা বাতাসে শব্দ তোলবার আগেই রুক্মিনী এসে হাজির হল। বিঠুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ফর্ ফর্ করে ওদের ভাষায় কী বলে গেল খানিকটা। বোঝা গেল, আগাগোড়া ব্যাপারটা সে দেখেছে, আসল দোষ আমার নয়।

বিঠু কী বলতে গেল, তার আগেই ম্যানেজারের চাবুক পড়ল তার গায়ে। তড়াং করে লাফিয়ে উঠল বিঠু, আর এক ঘা পড়তেই কেঁদে ফেলল হাউ মাউ করে।

আর তার সেই কান্না দেখে আমার হাসি আর হাজারখানা হয়ে ভেঙে পড়ল। চোখ লাল করে [illegible] ম্যানেজার চাবুকটা তুলল আমার দিকেই। [illegible] বাঁদী কী বাচ্চা—

আমি ছুটে পালিয়ে এলুম। কিন্তু [illegible] থেকেই আমার পেছনে লাগা ওদের বন্ধ হয়ে গেল।

এমনি করেই দিন কাটতে লাগল। শ্রীনগর থেকে

(৬৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

যন্ত্র, গণতন্ত্র, জনসমাজ ও বুদ্ধিজীবী

বিনয় ঘোষ

> **O God...patron of thieves,**
> **Lend me a little tobacco-shop,**
> **Or instal me in any profession**
> **Save this damn'd profession of writing,**
> **Where one needs one's brains all the time.**
>
> EZRA POUND : *The Lake Isle*

বিদ্যাবুদ্ধির বেসাতি করে বেঁচে থাকা ক্রমেই বুদ্ধিমানদের সমাজে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সমস্যাটা যে কত জটিল ও গভীর তা আজ আর বিদ্যার ব্যাপারীদের বুঝতে বাকি নেই। তবু বুদ্ধিমান সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষই যেহেতু নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী সচেতন, তাই তার নিশ্ছিদ্র অহমিকার লৌহবর্ম ভেদ করে সহজে এই সমস্যা কোন নূতন চৈতন্য সঞ্চার করতে পারে না। বিদ্যাবুদ্ধির ব্যাপারে মানুষের মত এমন অঘোর অচৈতন্য আত্মপ্রেমিক জীব আর কেউ নেই। তার কারণ, বুদ্ধি থাকলেও মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের বিদ্যার্জনের [illegible]াগ নেই এবং অর্জিত বিদ্যার অহংকারও নেই কারও। নিজের বুদ্ধির শূন্যকুম্ভের শব্দঝংকার নিজের কানেই অপূর্ব শ্রুতিমধুর মনে হয় এবং ঘুমপাড়ানি গানের মত সেই শব্দের নেশায় বিভোর হয়ে থাকতে ভাল লাগে। রাস্তার রাম-[illegible]হিম থেকে আরম্ভ করে বিদ্যাবুদ্ধির দুর্ভেদ্য সাধনচক্রের [illegible]পুরুষ পর্যন্ত সকলকেই সমান স্তরের আত্মকামুক বলা [illegible]। তাই কবি এজরা পাউণ্ডের বীতরাগকে মনে হয় [illegible]তিক্রম। প্রবঞ্চকদের পৃষ্ঠপোষক ভগবানকে আহ্বান [illegible]রে কবি যে তামাকের দোকান ভিক্ষা করেছেন তা কোন [illegible], অথবা নেশাখোর, লেখক-বুদ্ধিজীবী সহজে [illegible] মনে হয় না। দেহের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে [illegible]ার উ[illegible] আস্থা অগাধ। মাথাটাকে অন্যান্য [illegible]মোডিটি'র [illegible]রা বাজারস্থ করতে চান না, যদিও [illegible]টা জগৎটাই [illegible]। বাজারদরের কথা যদি নিতান্তই [illegible], তা হলে 'প্রফেসার' নিশিকান্ত (সঙ্গীতজ্ঞ), [illegible]ফেসার' পঞ্চানন (যাদুকর), 'প্রফেসার' রামচন্দ্র [illegible]ায়ামবীর পালোয়ান) ও 'প্রফেসার' প্রফুল্লকুমার (কলেজের মাস্টার), সকল শ্রেণীর 'প্রফেসার' (এবং আমাদের ভৌতিক কাণ্ডপ্রধান দেশে সকলেই 'প্রফেসার') একবাক্যে মাথার দর সমান দাবি করবেন। মুশকিল হল, মাথা এমনই এক পদার্থ যা বিল্বফলের মত ফাটিয়ে দেখে যাচাই করা যায় না। মগজের ব্যাপারীদের সবচেয়ে বড় সুবিধা সেইখানে। বাকি থাকে, মগজের 'প্রোডাক্ট' দেখে যাচাই করার পন্থা। কিন্তু সেখানেও প্রশ্ন উঠবে, কে যাচাই করবে কার 'প্রোডাক্ট'? কোন্ কৃতী কার কীর্তি বিচার করবেন?

এক মাথা যখন অন্য মাথার বিচার করবে, তখনই মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি লাগবে। একই পণ্যের দুই ব্যবসায়ী যেমন নিজ পণ্যের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করতে ব্যস্ত থাকেন, মস্তিষ্কের কীর্তির ক্ষেত্রেও তেমনি প্রতিযোগীর সেই হীন আত্মশ্রেষ্ঠতা প্রকাশের ব্যস্ততা প্রকট হয়ে ওঠে। মাথা থাকা সত্ত্বেও মাথা নিয়ে যাঁদের মাথাব্যথা নেই, সেই সব সাধারণ লোক, মস্তিষ্ক-প্রধানদের অন্তরের দীনতা দেখে শিউরে উঠবেন। নানা আকারের অগুনতি গোলাকার মাথার চকমকি-ঘর্ষণে যে অগ্ন্যুদ্গীরণ হবে, তাতে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত সকলের বিদ্যাবুদ্ধিই ভস্মীভূত হয়ে গেছে। অর্থের মূলধন সমাজে কত অনর্থ ঘটাতে পারে, তা নিয়ে উনিশ শতকের মধ্য-ভাগে কার্ল মার্ক্স যুগান্তকারী গবেষণা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধির মূলধনও যে সমাজের কত অকল্যাণ, কত অনিষ্ট করেছে এবং করছে, তা নিয়ে বিশ শতকের মধ্যভাগে আজ রীতিমত চিন্তা করার সময় এসেছে। বর্তমান সমাজের চিন্তামণিরা তা নিয়ে অবশ্য চিন্তা করছেন, কিন্তু সমস্যার জটিলতা এত বেশী যে চিন্তার কোন

কিনারা পাচ্ছেন না তাঁরা। একালের ধাবমান সমাজের দিকে চেয়ে মগজসর্বস্ব এলিটশ্রেণী বা বিদ্বৎশ্রেণী সম্বন্ধে কোনরকম উজ্জ্বল ভবিষ্যদ্বাণী করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যাবুদ্ধির কোন বিশেষ উপরি সমাদর, স্বীকৃতি ও সম্মান ভবিষ্যৎ সমাজে আদৌ লভ্য হবে কিনা, সে বিষয়েও অনেকের মনে সন্দেহ জাগছে। যত দিন যাচ্ছে এবং সমাজের গণতান্ত্রিক গতির বেগ যত বাড়ছে, ততই এই সন্দেহের কৃষ্ণছায়া দীর্ঘতর হচ্ছে তাঁদের মনে।

বুদ্ধিজীবীর বা এলিটশ্রেণীর সত্তার স্বাতন্ত্র্য ভবিষ্যতের জনসমাজে স্বীকৃত হবে না। কোন বিশেষ সমাদর ও সামাজিক উচ্চমর্যাদার অধিকারী হবেন না তাঁরা। তাঁদের সমস্ত কীর্তি, ভেলকির মত অত্যাশ্চর্য ব্যাপার হলেও, দৈনিক সংবাদপত্রের চমকপ্রদ সংবাদের মতই গৃহীত হবে এবং ক্ষণিকের স্থায়িত্বই হবে তার প্রাপ্য। কীর্তিমানেরা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রাতঃকালে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠে, সেইদিন অপরাহ্নে বিস্মরণের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবেন। বহু কীর্তিমানের অজস্র ছোট-বড়-মাঝারি কীর্তির তলায় পূর্বের কীর্তি সমাধিস্থ হয়ে যাবে। ছোট-বড়-মাঝারি সব রকমের মাথাই থাকবে সমাজে, কিন্তু কেবল তাদের আকারগত নৃতাত্ত্বিক গুরুত্ব ছাড়া আর কোন 'গুরুত্ব' আরোপ করা হবে না। খ্যাতির বাতি জ্বলে উঠতে উঠতে ফুৎকারে দপ করে নিভে যাবে। পয়লা কার্তিকের কীর্তিমানদের পয়লা অগ্রহায়ণ চিনতে পারবে না কেউ। বিদ্যাবুদ্ধির নার্সিসাসদের তখন একমাত্র সান্ত্বনা হবে (যদি অবশ্য সমাজের গতির সঙ্গে তাঁরাও নিজেদের মানসিক গড়ন না বদলান)—'আমার কীর্তির চেয়ে আমি যে মহৎ'—এই মন্ত্র জপ করে বেঁচে থাকা। ক্রমে তাঁরা দেখবেন, তাঁদের কীর্তি তো দূরের কথা, তাঁদের ব্যক্তিত্বের মহত্ত্বও তাঁদের বিদ্যাবুদ্ধি কর্ষণ-সাধনের গুহ্যচক্রের একশত বর্গ ফুট (১০ ফুট×১০ ফুট একটি ঘরের আয়তন) এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তার জৌলুষের একটা রশ্মিও তার বাইরে ঠিকরে পড়ছে না, এবং বৃহত্তর সমাজে তা নির্মমভাবে উপেক্ষিত। দুদ্দাড়গতি জনসমাজের রথচক্রে সমস্ত রহস্যময় ইন্টিলেকচুয়াল সাধনচক্র চূর্ণ হয়ে যাবে। এক-একজন সিদ্ধপুরুষ ও তাঁর দুচারজন মন্ত্রশিষ্য নিয়ে যে সব elite-group গড়ে ওঠে সমাজে এবং মধ্যে মধ্যে তাঁরা যে সব ফতোয়া জারি করেন, তার মূল্য নির্ধারিত হবে বাইরের সমাজের প্রতিদিনের অসংখ্য পোস্টার হ্যাণ্ডবিল ইশতেহারের মত। চাঞ্চল্য যদিও বা জাগে কোন কারণে, তাহলেও বাইরের বিচিত্র চাঞ্চল্যের প্রবল ঘূর্ণীতে সেই একটিমাত্র ইন্টিলেকচুয়াল চাঞ্চল্যের কোন আকর্ষণই থাকবে না। চাঞ্চল্যের প্রতিযোগিতায় বিদ্যাজীবীরা সকলের পশ্চাতে পড়ে থাকবেন। চলচ্চিত্র, রাজনীতি, খেলাধূলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যেখানে প্রত্যক্ষ জনতার কাছে কৃতিত্ব প্রদর্শনের সুযোগ আছে, সেখানে কৃতী ব্যক্তিরা উত্তেজনা সঞ্চার করতে পারেন অনেক বেশী। আজকের সমাজে তাই অভিনেতা খেলোয়াড় ও রাজনৈতিক নেতার আবেদন হাজারগুণ বেশী জনসমাজে, বিদ্বৎজনের তুলনায়। কারণ বিদ্বানদের সঙ্গে জনসমাজের সংযোগ প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। এই পরোক্ষতার খেসারত দিতে হবে তাঁদের, হয় পর্দার আড়ালে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, অথবা ঠিক খেলোয়াড় অভিনেতাদের মত ক্রমাগত তাৎক্ষণিক উত্তেজনার খোরাক যুগিয়ে। অর্থাৎ বিদ্যা-বুদ্ধির ক্ষেত্রেও খেলোয়াড় হতে হবে, জবরদস্ত জিমন্যাস্ট। একবার খেলা দেখালেই হবে না, ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করতে হলে ক্রমাগত খেলা দেখাতে হবে, নিত্যনূতন খেলা। বিদ্যার খেলা নিত্যনূতন দেখান যে কত ক[illegible] তা বিদ্যাজীবী মাত্রই জানেন। তার উপর বিদ্যাসমাজ আধুনিক গণশিক্ষার ফলে যত প্রসারিত হবে এবং বিদ্যাব্যবসায়ীদের প্রতিযোগিতা যত তীব্র হবে, ত[illegible] তাঁদের নূতন নূতন লেবেল-আঁটা পণ্য সরবরাহের দি[illegible] নজর দিতে হবে। তা না হলে, মুক্ত প্রতিযোগিতা[illegible] তাঁদের উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। মোদ্দাকথা, যেদিক থেকে[illegible] ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিচার করা যাক না কেন, বিদ্যাবুদ্ধিজীবী[illegible] সামাজিক ভূমিকা, তাঁদের কীর্তিকর্মের মূল্যায়নের [illegible] খ্যাতিমর্যাদা ইত্যাদি সব দ্রুত বদলে যা[illegible]। [illegible] মানুষেরই বুদ্ধিজাত যন্ত্র, অন্যদিকে [illegible] বারোয়ারী গণতন্ত্র (mass de[illegible] এই দুই [illegible] আজ বুদ্ধিজীবীদের স্বাতন্ত্র্য, আত্মম্ভরি[illegible] গোষ্ঠীসংকীর্ণ[illegible] বিদ্যাগৌরব, এমন কি সুকীর্তি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন কর[illegible] সমুদ্যত।

আজও যাঁরা সমাজচিন্তায় নিযুক্ত, তাঁরা সকলে

ধরনের এমন সব কথা বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে বলেন যাতে হতাশ হয়ে যেতে হয়। বহুযুগের উন্নত মাথার হঠাৎ এমন শোচনীয় পতনের কথা ভেবে অনেক মাথাওয়ালা ব্যক্তি নিশ্চয় বিমর্ষ হবেন, কেউ কেউ হয়ত বিদ্রোহীর মত আস্ফালনও করবেন। আস্ফালন বৃথা। সমাজের নিশ্চিত গতি মস্তিষ্কের ডিভ্যালুয়েশনের দিকে। ক্রমবর্ধমান আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের মজবুত বলটু হিসেবে তার দাম বাড়বে, কিন্তু সামাজিক দাম কমবে। অবশ্য সামান্য একটু দার্শনিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, মস্তিষ্কের বাজারের এই তেজি-মন্দার সমস্যা নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু থাকে না। কোন মাথাই যখন চিরদিন স্থায়ী হবে না, তখন সেই মাথার কর্মকীর্তির স্থায়িত্ব নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন? গির্জাপ্রাঙ্গণের গোরস্তানে হ্যামলেটের কথা মনে পড়ে?

There's another : why may not that be the skull of a lawyer? Where be his quiddits now, his quillets, his cases, his tenures, and his tricks? Why does he suffer this rude knave now to knock him about the sconce with a dirty shovel, and will not tell him of his action of battery?

কিন্তু এই অদার্শনিকের সমাজে, দুঃখের বিষয়, দার্শনিক দৃষ্টি কারও নেই। বিত্তের পুঁজিপতিদের তো নেইই, বিদ্যার পুঁজিপতিদেরও নেই। সুতরাং তা নিয়ে আমাদের আলোচনারও প্রয়োজন নেই। সব মাথার খুলির শেষ পরিণতি যে একই, তা আমরা বিস্মৃত হতে পারি বলেই মস্তিষ্কচেতনা জীবদ্দশায় আমাদের এত প্রখর। আমাদের প্রতিপাদ্য হল, বিদ্যাচেতনার এই প্রাখর্য ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক জনতাসমাজে স্তিমিত হয়ে আসবে, এবং বনগ্রামে শৃগালরাজত্বকালের 'প্রতিভা'র যে সংজ্ঞা তাও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যাত হবে।

কেন হবে, বিচার করে দেখা যাক।

হবে প্রধানতঃ দুটি কারণে, একটি যান্ত্রিক বা টেকনোলজিক্যাল, এবং আর একটি সামাজিক।

[illegible]ক্রমে মানসলোকের দিকে এগিয়ে চলেছে, এবং [illegible] নয়, দ্রুতগতিতে। মানবমনের যা কিছু ধর্ম [illegible] নিয়ে এত দর্প এবং এতকালের রহস্যাচ্ছন্ন ইন্দ্রপুরী রচনা, তা সমস্তই আজ যন্ত্র অধিকার করতে উদ্যত। যে বুদ্ধি দিয়ে মানুষ যন্ত্র গড়েছে, সেই বুদ্ধির বিনাশের পথ আজ প্রস্তুত করছে যন্ত্র। 'Cybernetics' বা যন্ত্রমানসবিদ্যা নামে এক নূতন সাধনোপযোগী বিদ্যারই বিকাশ হয়েছে সম্প্রতি। আজও যাঁরা স্বতন্ত্রভাবে বিদ্বান-বুদ্ধিমান বলে পরিচিত তাঁরা বলছেন যে ভবিষ্যতে এই সাইবারনেটিক্সই অতীতের সমস্ত বিদ্যার জৌলুষ আচ্ছন্ন করে ফেলবে। যান্ত্রিক সমাজে, যান্ত্রিক মানুষ প্রধানতঃ যন্ত্রমানসবিদ্যার চর্চা করবে। সেই ভবিষ্যৎটা আর কত দূরে যদি জানা যেত, তাহলে হয়ত ক্রমবিলীয়মান বুদ্ধিজীবীদের মস্তিষ্কস্ফীতির দুরারোগ্য ব্যাধির খানিকটা উপশম হত। কিন্তু তা সঠিকভাবে জানবার উপায় নেই। তাই পদে পদে ব্যর্থ হয়েও অপদার্থ বুদ্ধিজীবীদের আশার অন্ত নেই। নৈষ্কর্ম্যের নামান্তর বুদ্ধিবিলাসের আত্মতৃপ্তিও তাঁদের অফুরন্ত। কিন্তু তাহলেও যন্ত্রের অনিবার্য নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতি নেই। Cybernetics-এর একখানি পপুলার বইয়ের মুখবন্ধে সম্পাদকরা লিখেছেন :

"একদা এক সাধুপুরুষ এমন একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, যা দিয়ে দেবতার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। খুব বুদ্ধিমান যন্ত্র না হলে এ রকম কাজ করতে পারে না। কিন্তু তার চেয়েও বুদ্ধিমান হলেন সাধুপুরুষটি, এত বুদ্ধিমান যে আজ পর্যন্ত কোন যন্ত্র তাঁর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান প্রমাণিত হয় নি। কোন যন্ত্রের সাহায্যে আজ পর্যন্ত এমন একজন সাধুপুরুষ তৈরি করা সম্ভব হয় নি যিনি যাই হোক কিছু প্রমাণ করতে পেরেছেন।

"তাহলেও, একথা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান শতাব্দীতে যন্ত্র ও মনের ব্যবধান অনেক কমে গেছে। হিসেব-নিকেশ, সমস্যাপূরণ ইত্যাদি নানারকমের কাজ যা এতদিন মানবমনের অন্যতম কর্ম বলে পরিগণিত হত, আজ তা বিচিত্র সব যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক কর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। এই সব কর্মরত যন্ত্রগুলি সত্যই ভয়াবহ। তাদের দিকে তাকালে মনে হয়, মনোরাজ্যে এই যন্ত্রের অভিযান কতদূর পর্যন্ত চলবে এবং কোথায় এর শেষ হবে! কেউ আজ নিশ্চিত বলতে পারেন না যে ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক দাবাখেলায় যন্ত্রে যন্ত্রে প্রতিযোগিতা হবে কি না। কেউ এমন কথাও বলতে পারেন না যে যন্ত্রই ভবিষ্যতে ভাল ভাল সনেট ও কবিতা লিখবে কি না এবং সেগুলি ছাত্রদের পাঠ্য হিসেবে সংকলনে স্থান পাবে কি না। শিল্পীদের মত ভাল ভাল ছবি।

[যাঁরা

আঁকতে পারবে না, বা রয়াল আকাদেমির প্রদর্শনীতে স্থান পাবে, এমন কথাও কেউ বলতে পারেন না আজ। অনেক শিল্পীচক্রের জটিল সাধনারও প্রতিদ্বন্দ্বী হবে যন্ত্র।

"এই সব ঘটনা হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে। আরও অনেক দূর এগোতে হবে যন্ত্রকে। কিন্তু তাতেও নিশ্চিন্ত হবার কিছু নেই, কারণ যন্ত্র দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। যন্ত্রকে আজ উপেক্ষা করলে চলবে না, মানুষের মত তাকেও বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। যন্ত্রকে না বুঝলে মানুষ নিজেকেও বুঝতে পারবে না।" (W. Sluckin. *Minds and Machines* : Editorial Foreword)

যন্ত্রের দুর্ধর্ষ অগ্রগতির এই চিত্র নিঃসন্দেহে ভয়াবহ। কিন্তু আজ আমাদের কাছে যা ভয়াবহ, ভবিষ্যৎ সমাজের মানুষের কাছে তা স্বাভাবিক ও সুখাবহ হতে পারে। যন্ত্রযুগের শৈশবকালে যে সব যন্ত্র মানুষের কাছে ভীতিপ্রদ মনে হয়েছিল, আজ তা এককণা বিস্ময়ও উদ্রেক করতে পারে না। মনোযন্ত্র ও বুদ্ধিযন্ত্র আজ যতই তাজ্জব মনে হোক, ভবিষ্যতে তা মানুষের মনসহা হয়ে যাবে। তার বৈপ্লবিক সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাতেই আজ আমরা স্তম্ভিত ও মর্মাহত হলেও, ভবিষ্যতের মানুষ আমাদের মনোভাবকে অর্ধবর্বর মনে করে মুচকি হাসবে। সমাজের আর কোন জনশ্রেণীর এই সর্বাত্মক যান্ত্রিকতায় বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি হবে বলে মনে হয় না, বরং লাভেরই সম্ভাবনা বেশী। সমূহ ক্ষতি হবে বুদ্ধিজীবীদের, তাঁদের একূল-ওকূল দুকূল যাবে। মগজের রহস্যলোকের সূক্ষ্মতম স্নায়ুচক্র যদি বাইরের অভিনব যন্ত্রের জটিল কলকব্জায় রূপান্তরিত হয় এবং তার আধিভৌতিক ক্রিয়ার সমস্ত বাহাদুরি যদি সেই দানবীয় যন্ত্র আত্মসাৎ করে বসে, তা হলে বেচারী বুদ্ধিজীবীর সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হয়ে যাবে। যন্ত্র যদি সনেট লিখতে বসে, দুর্বোধ্য ইন্টিলেকচুয়াল কবিতা অনর্গল রচনা করে যায়, বড় বড় অঙ্ক ফরম্যুলা স্ট্যাটিষ্টিক্স এক নিমেষে সমাধান করে ফেলে, অতীতে কবে কি হয়েছিল, সন তারিখ বসিয়ে দিলে যদি তার ঘটনাপঞ্জী তৈরি করে দেয়, কয়েকটি চরিত্র (যেমন একটি ছেলে দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে সাতটি মেয়ে, তেরটি ছেলে একটি মেয়ে ইত্যাদি) ব মধ্যে কাগজের টুকরোয় লিখে পুরে দিলে যদি যাবে

যন্ত্রশি

সেই যন্ত্র পার্মুটেশন-কম্বিনেশন করে হাজার রকমের উপন্যাস-কাহিনী রচনা করে ব্রডকাস্ট করতে পারে, তা হলে বুদ্ধিজীবীদের এতদিনের কারসাজি এবং সৃজনশীল (creative), মননশীল (intellectual) ইত্যাদি সাহিত্যকর্মের সমস্ত বুজরুকি ধরা পড়ে যাবে। বুদ্ধিজীবীরা তখন কি করবেন? কবি এলিঅটের ভাষায়—'Birth and Copulation and Death' ছাড়া—অর্থাৎ যান্ত্রিক উপায়ে 'জন্মগ্রহণ', যান্ত্রিক উপায়ে 'রমণ' এবং যান্ত্রিক উপায়ে 'মরণ' ছাড়া তাঁদের করণীয় আর কিছু থাকবে না। সৃজন-মননের যাবতীয় কর্ম তখন যন্ত্রই করবে, কেউ বুদ্ধিজীবী, কেউ শ্রমজীবী, কেউ কৃষিজীবী, এই ধরনের সনাতন সামাজিক শ্রেণীভেদ আর থাকবে না। সকলেই একশ্রেণীর মানুষ হবে—যন্ত্রজীবী। যে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে চার লাইন কবিতা লিখবে বা উপন্যাস নামে কাহিনী রচনা করবে সে সৃজনশীল, এবং যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে চিন্তাশীল বিষয় রচনা করবে সে মননশীল, বুর্জোয়াযুগের এই সব বস্তাপচা বিচারভেদ ধূলিসাৎ করে দেবে আগামীকালের মহাযন্ত্র। বুদ্ধিজীবীদের একশত বর্গফুটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক বুদ্ধিচক্র থেকে যদি কোন সিদ্ধপুরুষ কয়েক হাজার ভোল্টেরও বুদ্ধির খেলা দেখান, তা হলেও সমাজের লোক নির্বাক বিস্ময়ে তাঁকে আর প্রাগৈতিহাসিক যাদুকরের মর্যাদা দেবে না।

সেই মহাযন্ত্রের যুগ আসছে বললেও ঠিক হবে না, তার পদধ্বনি ক্রমেই জোরে শোনা যাচ্ছে। সশরীরে আবির্ভাবের আগে তার অশরীরী যান্ত্রিক আত্মা সমগ্র সমাজকে এর মধ্যেই প্রায় গ্রাস করে ফেলেছে। এখন আর কোন মানুষের সামগ্রিক (total) সত্তা বলে কিছু নেই। যে-কোন ক্ষেত্রের যে-কোন মানুষ এখন 'অংশ' (part) মাত্র, নাট-বল্টু মাত্র, সম্পূর্ণ মানুষ নয়। এখনকার 'সাহিত্যিক' বলতে এমন কি সেদিনকার বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মত পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যিক [illegible] সকলেই ভগ্নাঙ্গ (বা বিকলাঙ্গ) 'লেখক' [illegible] গল্প, কেউ কবিতা, কেউ উপন্যাস, কেউ [illegible] কেউ সমালোচনা, কেউ প্রবন্ধ-নিবন্ধ ইত্যাদির [illegible]লেখক'। অথচ এর মধ্যেও কাহিনী-লেখক ও পদ্য-লেখকরা সৃজনশীলতার (স্বয়ং ভগবান আর কি!) আত্মম্ভরিতাটুকু

শেষ পুঁজিপাটার মত আঁকড়ে ধরে আছেন। টুকরো-টুকরো হয়ে গেছেন, তবু প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করছে। আজ আর 'ঐতিহাসিক' বলে কেউ নেই ; কেউ অষ্টাদশ, কেউ উনবিংশ শতাব্দীর, কেউ মোগলযুগ, কেউ ব্রিটিশ যুগ, কেউ গুপ্তযুগের, কেউ রাজনৈতিক ইতিহাসের, কেউ সামাজিক, কেউ বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের, কেউ আবার একই শতাব্দীর একটিমাত্র পর্বের (যেমন ১৭০০ থেকে ১৭২৫ খ্রী:) 'বিশেষজ্ঞ'। আজ আর 'ডাক্তার' বলেও কেউ নেই ; চোখ নাক দাঁত গলা হৃৎপিণ্ড ইত্যাদির স্বতন্ত্র সব 'বিশেষজ্ঞরা' আছেন। কোন ব্যাধির জন্যে হয়ত চোখ গলা দাঁত পেট ও ফুস্‌ফুস্ যন্ত্রণা দিচ্ছে। তার জন্যে পাঁচজন বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে, তাঁরা পাঁচখানা প্রেসক্রিপশন দেবেন। কিন্তু সবকটি মিলিয়ে আসল ব্যাধিটা কি হয়েছে তা জানতে গেলে, পাঁচখানা প্রেসক্রিপশন নিয়ে কার কাছে যেতে হবে জানা নেই। এইভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, সমাজের সর্বক্ষেত্রের কর্মই যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে, খণ্ডিত হয়ে যন্ত্রের কলকব্জার মত টুকরো হয়ে গেছে। সব মানুষই বিকলাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ মানুষ নেই যান্ত্রিক সমাজে। এহেন অবস্থায় বুদ্ধিজীবীর ভবিষ্যৎ গোবি মরুভূমির মত ধূসর, চেরাপুঞ্জী থেকে একখানা মেঘও সেখানে আর উড়ে যাবে না কোনদিন।

তার উপর যন্ত্রযুগের বারোয়ারী গণতন্ত্রের (mass democracy) ধাক্কা তো আছেই। সব ঘটনার গুরুত্ব ও কীর্তির মহত্ব আজ স্নায়ুমণ্ডলীর সাময়িক শিহরণ-সুড়সুড়ি দিয়ে মেপে দেখে বিচার করা হয়। খ্যাতি-অখ্যাতি, প্রিয়তা-অপ্রিয়তা, প্রশস্তি-নিন্দা, সবই এ [illegible]জে সোডার জলের মত বজবজিয়ে ওঠে, এবং বিলীন [illegible] যায়। রাজনীতির নির্বাচনের (election) ক্ষেত্রে, [illegible]গমনের ক্ষেত্রে, সর্বদাই এই দৃশ্য নজরে পড়ে। [illegible]য়ুশিহরণসর্বস্ব গণতান্ত্রিক সমাজের এটি [illegible] উপসর্গ। সাহিত্য অথবা বুদ্ধিজীবীদের [illegible]সমাজবহির্ভূত বস্তু নয়। সুতরাং [illegible] ক্ষেত্রেও প্রকট হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর [illegible] দেশে হয়েছে, বাংলাদেশেও। এই উপসর্গ একজন [illegible]বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

The elites are not in direct contact with the masses. Between elites and the masses stand certain social structures, which, although they are purely temporary, have nevertheless a certain inner articulation and constancy. Their function is to mediate between the elites and the masses. Here, too, it can be shown that the transition from the liberal democracy of the few to real mass-democracy destroys this intermediate structure and heightens the significance of the completely fluid mass. (Mannheim : Man and Society, Pp. 96-97).

ম্যানহাইম বলছেন, বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে জনসমাজের প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। সেই সংযোগ মধ্যবর্তী কয়েকটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলির একটা যে নিজস্ব চরিত্র থাকে তা হঠাৎ বদলায় না। সংখ্যালঘিষ্ঠের উদার গণতন্ত্রের যুগ থেকে যতই আমরা বারোয়ারী গণতন্ত্রের যুগে এগিয়ে যাচ্ছি, ততই সমাজের এই মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলির গড়ন ও চরিত্র দুইই বদলে যাচ্ছে। সব ভেঙেচুরে নৈরাকার হয়ে গিয়ে সমস্ত সমাজটা একটা চেনাপরিচয়হীন নামগোত্রহীন জনস্রোতে পরিণত হচ্ছে। সাহিত্য শিল্পকলা সবই সেই স্রোতের অনুগামী হচ্ছে। তার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে ম্যানহাইম বলছেন :

It is in a society in a stage of dissolution that such a public supplants the permanent public which was formerly selected out of well-established and stable groups. Such an inconstant, fluctuating public can be reassembled only through new sensations. For authors the consequence of this situation is that only their first publications tend to be successful, and when the authors have produced a second and a third book the same public which greeted their first work may no longer exist. Wherever the organic publics are disintegrated, authors and elites turn directly to the broad masses. Consequently they become more subject to the laws of mass psychology... (Ibid)

এই ধরনের সদা-প্রবহমান সমাজে স্থায়ী 'জনসাধারণ' বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। জনসমাজের যেমন স্থিতি নেই, তেমনি তাদের আদর্শ, আচার, চিন্তা-ভাবনা, রুচি, রীতিনীতি, কোনটারই স্থিতি নেই। স্থিতিহীন জনগোষ্ঠীকে বারংবার নূতন নূতন উত্তেজনার বৈদ্যুতিক 'শক্' দিয়ে নাড়া দেওয়া প্রয়োজন এবং সেই ভাবে নাড়া না দিলে তাদের একত্রে জড়ো করা যায় না। সেইজন্য দেখা যায়, একালের সাহিত্যিক-লেখকরা যাঁরা

হঠাৎ একখানা বই লিখে রাতারাতি 'famous' হয়ে গেলেন, 'গরম কেকের' মত যাঁদের বই বিক্রি হল, দুদিন পরে পাঠকজনগোষ্ঠী তাঁদের ততোধিক দ্রুতগতিতে ভুলে গেল এবং তাঁদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বই বিকলো না তেমন। জনমনের গতি লক্ষ্য করে লেখকরা তখন তারই পরিতুষ্টির পথে অগ্রসর হলেন। সস্তা 'stunt', বিচিত্র সব উত্তেজনা, তাঁদের সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য করতে হল। বাংলা দেশের সাম্প্রতিক সাহিত্যের ধারায় এই উপসর্গ যেমন প্রকট হয়ে উঠছে, তেমনি অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও হচ্ছে। প্রতিভা, বুদ্ধি, মননশক্তি, অথবা তথাকথিত 'সৃষ্টিশক্তি', সবই যদি ক্ষণিকের চমক ও উত্তেজনা সঞ্চারের কর্মে নিয়োগ করতে হয়, তা হলে বুদ্ধিজীবীর সনাতন স্বাতন্ত্র্যাভিমান আর টিঁকে থাকে না। সেকালের ম্যাজিসিয়ান-পুরোহিতদের সগোত্র একালের বুদ্ধিজীবী ও 'সৃষ্টিশীল' শিল্পীরা, তাই মনে হয়, যন্ত্র ও বারোয়ারী গণতন্ত্র দুয়ের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে লোপ পেয়ে যেতে বাধ্য। ফরাসী মনীষী পল ভ্যালেরী (Paul Valery) তাঁর 'Our Destiny and Literature' রচনায় এই সম্ভাবনারই ইঙ্গিত করে গেছেন। দেশবিদেশের আরও অনেক চিন্তাশীল মনীষী স্বগোষ্ঠীর এই অবশ্যম্ভাবী বিলোপের কথা বলছেন। সমাজবিদরা তো বলছেনই। যন্ত্র-জনগণতন্ত্রের যুগে কেবল বুরোক্রাটিক বিপুল রাষ্ট্রযন্ত্র, অর্থনৈতিক উৎপাদনযন্ত্র এবং নিত্য-উদ্ভাবিত সব বুদ্ধিকর্মযন্ত্র থাকবে, এবং মানুষ থাকবে তার কব্জা-বন্টু হয়ে। অনুভূতি, বুদ্ধি, প্রতিভা, এসব কথার তাৎপর্যের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। 'মস্তিষ্ক' মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বরেণ্য অঙ্গ হলেও, দেহের হস্তপদাদি অন্যান্য অঙ্গে তার গুণগত কোন পার্থক্য থাকবে না। যন্ত্রদেবতা মানবসমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবেন। যান্ত্রিক সমাজে সমস্ত মনন-চিন্তাভাবনা, কাজকর্ম, চেতনা অনুভূতি সবই যন্ত্রবৎ পরিচালিত হবে। আমরা তারই সন্ধিক্ষণে বাস করছি। তাই বুদ্ধিজীবীর স্বাতন্ত্র্য ও অহমিকা আজও আমরা তৃণখণ্ডের মত আঁকড়ে আছি, মস্তিষ্কের ঐন্দ্রজালিক মোহ কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি না। এ মোহ যখন কাটবে, তখন আমরা নূতন সমাজের উপযোগী জীব হয়ে উঠতে পারব।

শকুন্তলা

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

মানুষটা মরে গেল শহরের পথে ঘুরে ঘুরে
মেলে নি যেখানে ছায়া শান-বেঁধা শাণিত রোদ্দুরে,
পাথরের চোখ ফেটে ফোটে নাই ফোঁটা টলমল,
এনেছে কৃত্রিম দন্ত অন্তহীন বিদ্রূপে কেবল
ব্যর্থতার বিচিত্র খাঁচায়,
কশাইয়ের ছুরি যেথা খুশী মত মরায়, বাঁচায়।
প্রাণের পিপাসা তার পরিতৃপ্ত ক্লান্তির কিনারে!
পঞ্জরের পাশাপণে এ পিঞ্জর হতে মুক্তি তারে
এবার নিশ্চয় দেবে পিঙ্গল ঝড়ের মত ডানা
নিঃশব্দ শূন্যের বুকে সাম্রাজ্যের ক্ষুধা নিয়ে হানা
শবলুব্ধ হিংস্র উল্লাসে
অকুণ্ঠিত প্রান্তরের দগ্ধতাম্র বিপ্রলব্ধ ঘাসে।

কঙ্কালের কীর্তি মাঝে ইতিহাস রচি আপনার
শকুনটা উড়ে চলে। শহরকে ধন্যবাদ তার;
যে শহর শোনে নাই বলে গেছে কি কথা বেহালা,
যে অন্ধ আপন দীপে, ভুলে যত অন্ধকার জ্বালা,
যে শহর পেয়েছে খবর
কি নিষ্ফল আস্ফালনে এই মাত্র হল সে কবর!
বেহালার তারে তারে হাওয়া এসে টেনে দেয় [illegible]
মৃত্যুরে ছাপিয়ে উঠে কেঁপে কেঁপে স্বপ্ন [illegible]
মানুষটা বেঁচে আছে, প্রকাণ্ড পিণ্ডে [illegible]
রাত্রির বিলাস টুটে নক্ষত্রের [illegible]
কান্নারা বেঁধেছে দানা চাঁদে;
শকুনটা মরে যায় আকাশের অতর্কিত ফাঁদে।

॥ দশম অধ্যায় ॥

॥ কবিজায়া মৃণালিনী দেবী ॥

"অদৃষ্ট আমাদের জীবনের তাসে অনেকগুলির মিল রাখিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে একটা একটা করিয়া গোলাম রাখিয়া দিয়াছেন, তাহার আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। চিরজন্ম গোলামচোর খেলিয়া আসিতেছি, কত বাজি যে খেলা হইল তাহার আর সংখ্যা নাই, খেলোয়ারদের মধ্যে কে জাঁক করিয়া বলিতে পারে যে, সে একবারো গোলামচোর হয় নাই? অদৃষ্টের হাতে নাকি তাস, আমরা দেখিয়া টানিতে পারি না, তাহা ছাড়া অদৃষ্টের তাসখেলায় নাকি গোলামের সংখ্যা একটি নহে, এমন অসংখ্য গোলাম আছে কাজেই সকলকেই প্রায় গোলামচোর হইতে হয়। আমরা সকলেই চাই,—মিলকে পাইতে ও অমিলকে তাড়াইতে। গোলাম পাইলে আমরা কোন উপায়ে গলাবাজি করিয়া চালাকী করিয়া প্রতিবেশীর হাতে চালান করিয়া দিতে চাই। * *

"আমাদের দেশের বিবাহপ্রণালীর মত গোলামচোরখেলা আর নাই। প্রজাপতি তাস বিলি করিয়া দেখেন [illegible]ত্যমিথ্যা জানি না, বিবাহিত বন্ধুবান্ধবের [illegible] পাই যে, তাসে গোলামের ভাগই অধিক। [illegible]র হাত হইতে তাস টানিবে; দেখিয়া [illegible]াত নাই। চৌধুরীর হাতে যদি ছুরি থাকে, আর হালদারের হাতেও ছুরি থাকে তবেই শুভ, নতুবা যদি গোলাম টানিয়া বসেন, তবেই সর্বনাশ। আন্দাজ করিয়া টানিতে হয়, আগে থাকিতে জানিবার উপায় নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথায় চৌধুরী কোথায় হালদার; হালদারের হাত হইতে চৌধুরী দৈবাৎ একটা তাস টানিল, চৌষট্টিটা [বাহান্ন] তাসের মধ্যে হয়ত সেইটাই মিলিয়া গেল। যেই মিলিল, অমনি মিল-দম্পতি বিশ্রাম পাইল। অন্যান্য অবিবাহিত তাসেরা হাতে হাতে মিল অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিল, তাহাদের আর বিশ্রাম নাই। এইখানে সাধারণকে বিদিত করিতেছি, আমি একটি অবিবাহিত তাস আছি, আমার মিল কাহার হাতে আছে জানিতে চাই। আমার বন্ধু-বান্ধবেরা আমাকে বলেন, গোলাম। বলেন, আমার মিল ত্রিজগতে নাই। যে কন্যাকর্তা টানিবেন তিনি গোলামচোর হইবেন। কিন্তু, বোধ করি তাঁহারা রহস্য করিয়া থাকেন, কথাটা সত্য নহে।..."[1]

নিজেকে এবং আমাদের বিবাহপ্রথাকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব রসিকতা ১২৮৮ বঙ্গাব্দের আষাঢ়-সংখ্যায় 'ভারতী'তে প্রকাশিত 'গোলামচোর' প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স কুড়ি বৎসর। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে গোলামচোর খেলার গোলামের পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। কেন না, তাঁরা বলতেন, তাঁর মিল ত্রিজগতে নেই। অতএব যে-কন্যাকর্তা তাঁকে টানবেন তিনি গোলামচোর হবেন। সেদিন কবি রসিকতার হালকা সুরেই বলেছিলেন, বন্ধুরা এ নিয়ে যাই রহস্য করুন না কেন, কথাটা সত্য নয়। কবির বিবাহ ও তাঁর বিবাহিত জীবনের আলোচনার প্রথমেই এই প্রবন্ধটির কথা মনে হল এই জন্যে যে, রবীন্দ্রনাথের মত অলোকসামান্য প্রতিভাবান পুরুষের জীবনসঙ্গিনী রূপে তাঁর মহাজাগতিক জীবনের 'যথার্থ দোসর' হওয়ার মত

মেয়ে বাংলাদেশে কেন সারা পৃথিবীতেই দুর্লভ। কাজেই পিরালী-ব্রাহ্মণ-সমাজের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে তার সন্ধান করা বিড়ম্বনা মাত্র। তবু ওই সমাজেরই একটি পল্লী-বালিকা তাঁর 'কনে' হিসাবে নির্বাচিতা হলেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দের চব্বিশে অগ্রহায়ণ রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হল।

বিবাহের পঞ্চান্ন বৎসর পরে মংপুতে একদিন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী কবির কাছে অনুরোধ জানালেন তাঁর বিয়ের গল্প বলতে। কবি বললেন, 'আমার বিয়ের কোনো গল্প নেই। বৌঠানরা যখন বড় বেশি পীড়াপীড়ি শুরু করলেন, আমি বল্লুম, 'তোমরা যা হয় কর, আমার কোনো মতামত নেই।' তাঁরাই যশোরে গিয়েছিলেন, আমি যাই নি। আমি বলেছিলাম, আমি কোথাও যাব না এখানেই বিয়ে হবে। জোড়াসাঁকোতে হয়েছিল।'[২]

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' গ্রন্থেও সামান্য একটু সংবাদ আছে। গ্রন্থকার বলছেন, 'রবিকার বিয়ে আর হয় না; সবাই বলেন বিয়ে করো বিয়ে করো এবারে, রবিকা রাজি হন না, চুপ করে ঘাড় হেঁট করে থাকেন। শেষে তাঁকে তো সবাই মিলে বুঝিয়ে রাজি করালেন।'[৩] কথাটা লক্ষ্য করবার মত। 'রবিকার বিয়ে আর হয় না; সবাই বলেন বিয়ে করো বিয়ে করো এবারে।'—এ কথার তাৎপর্য এ যুগে হারিয়ে গেছে। সে যুগে কুড়ি পেরিয়েও পুরুষের বিয়ে না হওয়া ছিল একটা অস্বাভাবিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স বাইশ পেরিয়ে তেইশ চলছে। তাঁর দাদাদের বিয়ে সতেরো-আঠারো-উনিশের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। কাজেই রবীন্দ্রনাথের বিবাহ কিঞ্চিৎ বিলম্বিত।

মংপুর প্রশ্নকর্ত্রীকে কবি বলেছিলেন তাঁর বিয়ের কোন গল্প নেই। কিন্তু অন্ততঃ একটি গল্প যে ছিল সে কথা সেদিনই কবি বলেছিলেন মৈত্রেয়ী দেবীকে। কবি বললেন: 'জানো একবার একটি বিদেশী অর্থাৎ অন্য Province-এর মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল। সে এক পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে, জমিদার আর কি বড় গোছের। সাত লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী সে। আমরা কয়েক জন গেলুম মেয়ে দেখতে, দুটি অল্পবয়সী মেয়ে এসে বসলেন—একটি নেহাৎ সাদাসিদে, জড়ভরতের মত এক কোণে বসে রইল; আর একটি যেমন সুন্দরী, তেমনি চটপটে। চমৎকার তার স্মার্টনেস্। একটু জড়তা নেই, বিশুদ্ধ ইংরেজি উচ্চারণ। পিয়ানো বাজালো ভালো—তারপর music সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। আমি ভাবলুম এর আর কথা কি? এখন পেলে হয়।—এমন সময় বাড়ির কর্তা ঘরে ঢুকলেন। বয়েস হয়েছে, কিন্তু সৌখীন লোক। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন মেয়েদের সঙ্গে। সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়ে বললেন,—'Here is my wife' এবং জড়ভরতটিকে দেখিয়ে 'Here is my daughter'।...আমরা আর করব কি, পরস্পর মুখচাওয়াচাওয়ি করে চুপ করে রইলুম; আরে তাই যদি হবে তবে ভদ্রলোকদের ডেকে এনে নাকাল করা কেন! যাক্, এখন মাঝে মাঝে অনুশোচনা হয়।... যা হোক্, হলে এমনই কি মন্দ হত। মেয়ে যেমনই হোক্ না কেন, সাত লক্ষ টাকা থাকলে বিশ্বভারতীর জন্যে ত এ হাঙ্গামা করতে হত না। তবে শুনেছি সে মেয়ে নাকি বিয়ের বছর দুই পরেই বিধবা হয়। তাই ভাবি, ভালই হয়েছে, কারণ স্ত্রী বিধবা হলে আবার প্রাণ রাখা শক্ত।'[৪]

এই স্বল্পাক্ষর কাহিনীটি কবির স্বভাবসুলভ পরিহাস-রসিকতায় উপাদেয়। অন্য প্রদেশের অর্থাৎ অবাঙালী একটি মেয়ের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাবের এই সরস গল্পটি বানিয়ে-বলা কি না, এ সংশয় তথ্যনিষ্ঠ পাঠকের মনে জাগ্রত হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু গল্পটি যে বানিয়ে-বলা নয়, অর্থাৎ কবিজীবনে যে এই ঘটনাটি সত্যি সত্যি ঘটেছিল তার কাব্য-প্রমাণ রয়েছে ১২৯০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠের 'ভারতী'তে। সাত লক্ষ টাকার যৌতুকের সঙ্গে একটি জড়-ভরতের বিবাহের কৌতুককর এই ঘটনাকে অবলম্বন করেই তরুণ রবির বড়দা দ্বিজেন্দ্রনাথ ওই সংখ্যার 'ভারতী'তে তাঁর "যৌতুক কি কৌতুক" নামক রঙ্গকাব্য রচনা করেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণে'র কবি বিচিত্র ছন্দে এই রঙ্গরস[illegible] কাব্যটি রচনা করেছিলেন। রাজপুত্র ও রাজক[illegible] একদিকে সত্যকার প্রেম, অন্য দিকে রাজকে[illegible] কেউ অবশেষে একটি কুরূপা মস্রজা দাসীকে রাজকন্যা[illegible] সাজিয়ে ছলনা। কবিকল্পিত কাহিনীটি সত্যকার ঘটনাকে কাব্যের আচ্ছাদনে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিন্তু কাব্যের শেষে যে ভাষায় উৎসর্গটি রচিত হয়েছে তাতে রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গে এর সম্পর্কটি আর লুক্কায়িত থাকে নি। 'ভারতী'র পৃষ্ঠা থেকে সেই অংশটি উদ্ধার করা গেল:

"ছদ্ম-বেশ-ধারী উৎসর্গ
—এক কথায়—
উপসর্গ।

শর্বরী গিয়াছে চলি! দ্বিজরাজ শূন্যে একা পড়ি
প্রতীক্ষিছে রবির পূর্ণ-উদয়।
গন্ধ-হীন দু চারি রজনীগন্ধা লয়ে তড়িঘড়ি
মালা এক গাঁথিয়া সে অসময়
সঁপিছে রবির শিরে এই আজ আশিষিয়া তারে
"অনিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক্
সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার! মন্ত্রজার কারে
যে পড়ে পড়ুক খাইয়া চোক।"

পরে যখন "যৌতুক কি কৌতুক" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় তখন এই উৎসর্গ-পত্রটির কিঞ্চিৎ অদল-বদল হয়েছিল। সেখানে 'মন্ত্রজা' 'কুরূপা' হয়েছে। 'রবীন্দ্রকথা'-কার খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, 'বিবাহের আশীর্বাণীস্বরূপ দ্বিজেন্দ্রনাথের 'যৌতুক কি কৌতুক' রচিত হয়।'[৫] কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'যৌতুক কি কৌতুক' পড়লেই বুঝতে পারা যাবে যে, বয়সে একুশ বছরের বড় দ্বিজেন্দ্রনাথের মত অগ্রজের পক্ষে তাঁর সন্তানতুল্য অনুজের শুভ বিবাহে এ জাতীয় রসিকতা করা নিতান্তই বিসদৃশ। প্রকৃতপক্ষে কবির বিবাহের অন্ততঃ সাত-আট মাস পূর্বে এই কাব্য-কৌতুক প্রকাশিত হয়েছিল। উপলক্ষ বিবাহ নয়, সাত লক্ষ টাকার লোভে "মন্ত্রজার কারে" যে ছোট ভাইকে পড়তে হয় নি সেজন্যে আনন্দিত অগ্রজের ওটি আন্তরিক আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদই কৌতুকের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ একান্ত স্নেহের ছোট ভাইটির [illegible] উদয়ের প্রত্যাশায় আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, [illegible]নিন্দিতা স্বর্ণ-মৃণালিনী হোক্ সুবর্ণ তুলির তব পুরস্কার।' [illegible]ত থেকেই বিবাহের দিনে কবিজায়ার না[illegible]লিনী'। কাজেই মৃণালিনী-নামকরণটিও রবী[illegible] নয়, এ নাম তাঁর স্নেহময় বড়দারই আ[illegible] সঙ্গে বিবাহের বহু পূর্বে কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত হয়েছে।

'রবীন্দ্রকথা'-কার বলেছেন, কবি স্বয়ং পাত্রী দেখে কন্যা মনোনীত করেছিলেন। তাঁর এই উক্তিও রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায় সমর্থিত হচ্ছে না। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, এই বিবাহে ঘটকালি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মাতুল ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের পিসীমা আদ্যাসুন্দরী। রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরের নাম বেণীমাধব রায়চৌধুরী। বেণীমাধব খুলনা জেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের শুকদেব রায়চৌধুরীর বংশধর। দক্ষিণডিহিরই নিকটবর্তী ফুলতলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বেণীমাধব। গোপাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা দাক্ষায়ণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের দুই সন্তান;—পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও কন্যা ভবতারিণী। বেণীমাধবেরা পিরালী ব্রাহ্মণ। তাঁদের বংশের সঙ্গেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বেশীর ভাগ বৈবাহিক সম্পর্ক হত। সুতরাং বেণীমাধব-দাক্ষায়ণী-দুহিতা ভবতারিণীর সঙ্গে পিরালী-কুমারী রবীন্দ্রনাথের বিবাহ কৌলিক ঐতিহ্য অনুসারেই হয়েছে। অবশ্য বিত্ত ও বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে বেণীমাধবকে মহর্ষি-পরিবারের সমকক্ষ কিছুতেই বলা যাবে না। তিনি ছিলেন ঠাকুরদের জমিদারিরই একজন কর্মচারী। কাজেই পারিবারিক মর্যাদার দিক দিয়ে বরকন্যার অনেক ব্যবধান। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে শ্যামলাল গাঙুলীর মেয়ে কাদম্বরী দেবীর সঙ্গে যখন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ স্থির হয়েছিল তখন সংস্কারপন্থী সত্যেন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি জানিয়ে লিখেছিলেন, 'জ্যোতি এই বিবাহে কেমন করিয়া সম্মত হইল, এই আমার আশ্চর্য মনে হইতেছে।' সত্যেন্দ্রনাথ এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী চেষ্টাও করেছিলেন যাতে প্রগতিশীল কোন তরুণীর সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। গুডীব চক্রবর্তীর মেয়ে সিস্‌টার বেনেডিক্টার [পরবর্তী নাম] সঙ্গে বিবাহের চেষ্টাও তাঁরা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। সে সময় মহর্ষিদেব বলেছিলেন, জ্যোতির বিবাহের জন্য একটি কন্যা পাওয়া গেছে এই-ই ভাগ্য। একে তো পিরালী বলে ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বিবাহে যোগ দিতে চায় না, তাতে আবার মহর্ষি-প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠানের জন্যে পিরালীরাও তাঁদের ভয় করে চলেন। কাজেই সমৃদ্ধি ও বিদ্যাবত্তায় রায়চৌধুরী বংশ মহর্ষি-পরিবারের সমকক্ষ না হলেও মহর্ষিদেব এই প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিয়েছিলেন। কিন্তু

প্রচলিত প্রথা অনুসারে কন্যার পিতা তাঁর বাড়িতে 'বরাহ্বান' করে বিবাহের প্রস্তাব করলে মহর্ষিদেব জানালেন যে, বিবাহ হবে জোড়াসাঁকোতে এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্ম মতে। বেণীমাধব এতে সম্মত হলে বিবাহের প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হল। "আশীর্বাদ" বা "পাকা দেখা"র অনুরূপ ব্যবস্থা করলেন মহর্ষিদেব। কর্মচারী সদানন্দ মজুমদারকে দিয়ে ফুলতলাতে নানা রকম খেলনা ও বসনভূষণাদি প্রেরিত হল। সেখানে মিষ্টান্নাদিও প্রস্তুত করে কন্যার পিতা ও তাঁর জ্ঞাতিপরিজনের গৃহে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

এদিকে কলকাতায় ব্যবস্থা হল গায়ে-হলুদ, আইবুড়ো-ভাতের। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া'তে বলছেন: 'গায়ে হলুদ হয়ে গেল। আইবুড়োভাত হবে। তখনকার দিনে ও বাড়ির কোনো ছেলের গায়ে হলুদ হয়ে গেলেই এ-বাড়িতে তাকে নেমন্তন্ন করে প্রথম আইবুড়োভাত খাওয়ানো হত। তারপর এ-বাড়ি ও-বাড়ি চলত কয়দিন ধরে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন। মা গায়ে হলুদের পরে রবিকাকাকে আইবুড়োভাতের নেমন্তন্ন করলেন। মা খুব খুশি, একে যশোরের মেয়ে তায় রথীর মা মার সম্পর্কে বোন। খুব ধুমধামে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। রবিকাকা খেতে বসেছেন উপরে আমার বড়োপিসীমা কাদম্বিনী দেবীর ঘরে, সামনে আইবুড়োভাত সাজানো হয়েছে—বিরাট আয়োজন। পিসীমারা রবিকাকাকে ঘিরে বসেছেন, এ আমাদের নিজের চোখে দেখা। রবিকাকা দোড়দার শাল গায়ে, লাল কী সবুজ রঙের মনে নেই, তবে খুব জমকালো রংচঙের। বুঝে দেখো, একে রবিকাকা তায় ওই সাজ, দেখাচ্ছে যেন দিল্লীর বাদশা। তখনই ওঁর কবি বলে খ্যাতি, পিসীমারা জিজ্ঞেস করছেন, কী রে বউকে দেখেছিস, পছন্দ হয়েছে। কেমন হবে বউ ইত্যাদি সব। রবিকাকা ঘাড় হেঁট করে বসে একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছেন আর লজ্জায় মুখে কথাটি নেই। সে মূর্তি তোমরা আর দেখতে পাবে না, বুঝতেও পারবে না বললে—ওই আমরাই যা দেখে নিয়েছি।'*

অবনীন্দ্রনাথ যে সময়কার কথা বলছেন তখন তাঁর বয়স বারো পেরিয়ে তেরো। কিন্তু শিল্পদৃষ্টির সহজাত প্রতিভা নিয়েই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বালক-শিল্পীর সেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তরুণ-কবির যে লজ্জা-বিনম্র স্নিগ্ধ সুন্দর আইবুড়ো-মূর্তিটি ধরা পড়েছিল সত্য সত্যই সে মূর্তি আর কেউ দেখতে পায় নি। সে মূর্তি আর কোথায়ও দেখতে পাওয়া যাবে না।

২

বিবাহকালে ভবতারিণীর বয়স ছিল এগারো বৎসর। হরিচরণ বলেছেন তাঁর জন্মবর্ষ ১২৮০ সাল। সে সময়কার তুলনায় কন্যার বয়সের দিক দিয়ে এগারো বৎসর একটু বেশীই বলতে হবে। ঠাকুরবাড়িতে এর পূর্বে আট ন' বছরের বালিকাবধূরাই এসেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বয়সের বারো বৎসর ব্যবধান যুগানুযায়ীই হয়েছে। বালিকা ভবতারিণী পিতৃগৃহে লেখাপড়ার দিক দিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হন নি। ফুলতলার আশেপাশে একটি মাত্র নিম্ন প্রাথমিক পাঠশালা ছিল। ওই পাঠশালাতেই তাঁর বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত, কিন্তু সমাজ-নিন্দার ভয়ে সুদূর পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। কাজেই কুমারী-জীবনে ভবতারিণীর দিনগুলি পুতুলখেলাতেই সানন্দে অতিবাহিত হয়েছে। হরিচরণ লিখেছেন, 'এই বালিকা-সুলভ খেলার সঙ্গিনীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বালিকা মৃণালিনী পিতৃগৃহে খেলাঘর পাতিয়া খেলা করিতেন। আঙিনা মেরামত করিবার জন্য তাঁহার পিতা পাশে একটি খাদ কাটিয়া মাটি লইয়াছিলেন। এই খাদেই খেলাঘর পাতিয়া কন্যা খেলা করিতেন। খাদের পাশ-দেয়ালে ছোট ছোট কুলঙ্গি শেলফ কাটিয়া খেলাঘরের আসবাব খোলামালা পরিপাটি করিয়া তিনি সাজাইয়া রাখিতেন। * * খেলাঘরে ঘরকন্নার সময় মৃণালিনীর স্বভাবের একটি বিশেষত্ব সকলেই লক্ষ্য করিতেন, ইহা সঙ্গিনীদের উপর তাঁহার কর্তৃত্বের সখী-সুলভ ব্যবহা[illegible] ইহাতে কর্তৃত্বের সহজাত তাপ-চাপ [illegible] প্রণয়-প্রবণতায় ইহা সুস্নিগ্ধ কোমল সহ[illegible] তাই সখীর নির্দেশ মানিত, খেলা[illegible] অবিরোধে। খেলাঘরের রান্না মৃণা[illegible] থাকিত, রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ান তাঁহার [illegible] ছিল।''

পত্নীর এই খেলাঘর আর খেলার সঙ্গিনীদের ছেড়ে

ভবতারিণী এলেন চতুর্দোলায় চড়ে জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালায়। শিশুরবির সাত বৎসর বয়সে এমনই করেই চতুর্দোলায় চড়ে এসেছিলেন তাঁর নোতুন বৌঠান। 'গলায় মোতির মালা সোনার চরণচক্র পায়ে।' সেদিন নববধূকে মনে হয়েছিল 'চেনাশোনার বাহির সীমানা থেকে মায়াবী দেশের মানুষ।' বারোয়াঁ সুরে বেজেছিল সানাই। তেইশ বৎসরের তরুণ কবি ছেলেবেলার সেই রূপকথার রাজ্য ছেড়ে মানুষের সংসারের কঠিন কংকরময় পথে অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। আজ আর রাজকন্যা নয়, বাংলার ছায়াসুনিবিড় পল্লীর নীড় থেকে এল শ্যামকান্তময়ী একটি ভীরু পল্লী বালিকা। বারোয়াঁ সুরে আবার সানাই বাজল কবির জীবনে। সানন্দে নববধূকে বরণ করে নেবার জন্যে প্রস্তুত হলেন কবি। তাঁর অন্তরঙ্গ সারস্বত-বান্ধবেরা তাঁর কাছ থেকে পেলেন এক অভিনব নিমন্ত্রণপত্র। কবি প্রিয়নাথ সেনকে লেখা পত্রখানি তার নমুনা হিসাবে উদ্ধারযোগ্য :

প্রিয়বাবু,

আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬নং যোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়া আমাকে এবং আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন। ইতি।

অনুগত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চিঠির ভাব ও ভাষাটি লক্ষ্য করবার মত। রবীন্দ্রনাথ নিজের বিবাহের নিমন্ত্রণ নিজেই করে লিখছেন, "আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ।" কবি যেন নিজেকে দ্বিধাবিভক্ত করে দুই-'আমি'তে রূপান্তরিত [illegible]য়েছেন। নিমন্ত্রণকর্তা ও বিবাহকর্তা,—একই পুরুষের দুই যুগ্মসত্তা, একজন দ্রষ্টা আর একজন ভোক্তা। [illegible] আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় ছিল। [illegible]জারচলতি চিঠির কাগজে লেখা। কাগজের [illegible] কোণে ছিল একটি ব্লক, তাতে লেখা [illegible]শার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়"। কবি প্রিয়বাবুকে লেখা চিঠিতে ওই ব্লকের পাশে লিখে দিয়েছিলেন, 'আমার motto নহে'। সমস্তটাই উচ্চাঙ্গের রসিকতা হতে পারে, অথবা হয়তো সবটাই রহস্যাবৃত প্রহেলিকা। এই কবিত্বসুলভ আত্মপ্রকাশের অভিনবত্ব সেদিন সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-বাসরে মহর্ষিদেব উপস্থিত ছিলেন না। তখন তিনি নদীপথে ভ্রমণ করতে করতে বাঁকিপুরে গিয়েছিলেন। সেখানে একই সঙ্গে তাঁর কাছে পরিবারের দুটি সংবাদ পৌঁছয়। যেদিন কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের বিবাহ সম্পন্ন হল সেই দিনই শিলাইদহে মহর্ষির জ্যেষ্ঠ জামাতা সারদাপ্রসাদ লোকান্তরিত হলেন। জোড়াসাঁকোয় এই মৃত্যুসংবাদ এল বিবাহের পরদিন। স্বভাবতঃই সেই মর্মান্তিক শোকসংবাদে উৎসবপ্রাঙ্গণের আলোকমালা মরণের কালো ছায়ায় ঢাকা পড়ল। এই ছিল কবির নিয়তি। তাঁর জীবনে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত লগ্নে মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটেছে বার বার। বার বার মৃত্যুর হাত থেকেই তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছে অমৃতের পানপাত্র!

৩

ফুলতলার দাক্ষায়ণীসুতা ভবতারিণী হলেন জোড়াসাঁকোর কবিপ্রিয়া মৃণালিনী। মহর্ষি পরিবারে মৃণালিনী দেবীর শিক্ষা ও অনুশীলনের চিত্রটি কৌতূহলোদ্দীপক। বিবাহের পর নববধূকে বিদ্যাশিক্ষা ও গার্হস্থ্য শিক্ষাদানের মুখ্য দায়িত্ব পড়ে হেমেন্দ্রনাথের স্ত্রী নীপময়ী দেবীর উপর। মহর্ষিদেবের অনুমতি ও নির্দেশ অনুসারে হেমেন্দ্রনাথের কন্যাদের সঙ্গে নববধূকেও লোরেটো গার্ল স্কুলের ছাত্রী করে দেওয়া হল। সেখানে ইংরেজী ভাষা শেখা, পিয়ানো বাজানো এবং সংগীত প্রভৃতির চর্চা চলতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এবং কলকাতার অভিজাত পরিবারের উপযুক্ত আদবকায়দা ও সুচারু গৃহস্থালী শিক্ষা শুরু হল। শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে যশোরের বাঙাল-উচ্চারণ সংশোধন একটা বড় স্থান অধিকার করে থাকত। কিন্তু মৃণালিনী দেবী সেই পর্যায়েই বসে থাকেন নি। ইংরেজী বাংলা ও সংস্কৃতে অনুপ্রবেশের মোটামুটি যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার গৃহশিক্ষক ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কবির প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথও সংস্কৃতে

বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনিও সংস্কৃত কাব্য নাটকাদির শ্লোক ব্যাখ্যা করে সরল বাংলায় অনুবাদ করে কাকীমার সংস্কৃত-চর্চায় সাহায্য করতেন। স্বামীর নির্দেশে মৃণালিনী দেবী সংস্কৃত রামায়ণের মূল আখ্যায়িকা সহজ গদ্যে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর কৃত সেই অনুবাদের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। কবি তার অনেক সন্ধান করেও খুঁজে পান নি। রথীন্দ্রনাথ তাঁর জননীর স্বহস্তলিখিত একখানি ছিন্নপত্র রবীন্দ্রভবনে উপহার দিয়েছেন। তাতে মহাভারত মনুসংহিতা ও উপনিষদের কয়েকটি অনুবাদ আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের কৈশোরে ঠাকুর-পরিবারের পারিবারিক নাট্যাভিনয়ে পরিবারের কন্যা ও বধূরা অংশ গ্রহণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' নাটক ১২৯৬ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মকালে সোলাপুরে রচিত। পরবর্তী পূজাবকাশে সত্যেন্দ্রনাথ ছুটিতে কলকাতায় এলে তাঁর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে 'রাজা ও রাণী'র প্রথম অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ সেজেছিলেন রাজা বিক্রমদেব আর মেজো বৌঠান রাণী সুমিত্রা। দেবদত্ত সেজেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, ত্রিবেদী অক্ষয় মজুমদার, কুমার প্রমথ চৌধুরী, ইলা প্রিয়ংবদা। মৃণালিনী দেবীও এই অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সেজেছিলেন নারায়ণী। রথীন্দ্রনাথ বলছেন এই অভিনয়ই তাঁর প্রথম ও শেষ অভিনয়। সম্ভবতঃ স্বামীর অনুরোধেই তিনি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে 'নারায়ণী' অভিনয়ে সম্মত হয়েছিলেন, নইলে শুদ্ধান্তঃপুর ছেড়ে পাদপ্রদীপের সম্মুখে নিজেকে প্রকাশ করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। আসলে মৃণালিনী দেবীর গৃহলক্ষ্মী মূর্তিতেই তাঁর স্বরূপ সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। অন্তঃপুরে অনলংকৃত জীবন যাপনেই তিনি অধিকতর স্বস্তি অনুভব করতেন। হরিচরণ বলেছেন, সাজপোষাকের দিকে যেমন তাঁর দৃষ্টি ছিল না তেমনি গায়ে গয়নাও তিনি অল্পই পরতেন। একদিন কবিপত্নী কানে দুটি ফুলঝুলানো বীরবৌলি পরেছিলেন। সে সময় হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে কবির আবির্ভাব হল। লজ্জিত হয়ে মৃণালিনী দেবী দু হাত দিয়ে কানের বীরবৌলি কবির দৃষ্টি থেকে ঢেকে রাখবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস করতে লাগলেন। কবি নিজেও সাদাসিদে জীবন যাপনেরই পক্ষপাতী ছিলেন। একবার কবির জন্মদিনে মৃণালিনী দেবী একসেট সোনার বোতাম গড়িয়ে দিয়েছিলেন। বোতাম দেখে কবি বলে উঠলেন, 'ছি ছি, পুরুষ মানুষে আবার সোনা পরে, লজ্জার কথা, তোমাদের চমৎকার রুচি!'

কবিজায়ার সম্পর্কে উর্মিলা দেবীর বর্ণনাটি সুন্দর। যেদিন তিনি প্রথম ঠাকুরবাড়িতে মৃণালিনী দেবীকে দেখলেন সেদিন "তিনি নিতান্তই সাদাসিধে একখানা শাড়ি পরে বসেছিলেন।" উর্মিলা দেবী বলছেন, 'গায়ে গয়নাও তেমন দেখলুম না। সাহস করে মুখের দিকে চাইলাম—এই কবিপ্রিয়া! রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী, সে রকম তো ভাল দেখতে নন। আবার ভাল করে চেয়ে দেখলাম। তখন দেখি এক অপরূপ লাবণ্যে সমস্ত মুখখানা যেন ঢলঢল করছে, আর একটা মাতৃত্বের আভায় যেন মুখখানা উজ্জ্বল। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে হয়। * * ক্রমেই বুঝতে লাগলাম তিনি খুবই অসাধারণ নারী। যে মাতৃত্বের আভা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাই দিয়ে যেন শুধু নিজের ছেলেমেয়ে নয়—আত্মীয়স্বজন দাসী চাকর সকলকেই আপন করে রেখেছিলেন। সাজগোজ বেশী কখনও করতেন না। কবিবর মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠতম সন্তান—ভাইপো ভাইঝিরা কেউ সমবয়সী, কেউ বা অল্পই ছোট; কিন্তু কবিপ্রিয়া এই সম্বন্ধের গুরুত্বটা যেন বেশ বুঝতেন। তিনি 'কাকিমা', 'মামিমা', বড় বড় ছেলে-মেয়ে-বউদের সামনে আবার সাজগোজ করবেন কি—এমনি যেন ভাবটা। রান্না করে মানুষ খাইয়ে বড় তৃপ্তি পেতেন। আমার দাদা [দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ] যখনই যেতেন, সিঁড়ি থেকেই বলতে বলতে উঠতেন "কাকিমা, আজ কিন্তু এটা খাব", "আজ কিন্তু ওটা খাব"; তক্ষুনি রান্নাঘরে গিয়ে সেটা তৈরি করতে বসতেন।'[৮]

মৃণালিনী দেবীর শৈশবলীলায় আমরা দেখেছি খেলাঘরের পুতুল খেলায়ও বেঁ[illegible] সবা[illegible] খাওয়ানোর দায়িত্ব তিনি সর্বদা সানন্দে [illegible] শ্বশুর-গৃহে এসে তাঁর এই সহজাত [illegible] অশিক্ষিত-পটুত্ব সুচারু অনুশীলনের ফলে [illegible] অর্জন করেছিল। ঠাকুরবাড়িতে গৃহকর্মের একটি অঙ্গ ছিল বিচিত্র ধরনের রান্না ও আহার্যসামগ্রী [illegible]ত করা। 'রবীন্দ্রকথা'র লেখক বলেছেন, তখনকার দিনে

মহর্ষি পরিবারে বিভিন্ন প্রকার আমিষ ও নিরামিষ রান্না ও নানা ধরনের মিষ্টান্ন পাক কন্যা ও বধূদের অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় ছিল। বস্তুত আহারে বাঙালীর রুচি আন্তর্জাতিক। এই প্রসঙ্গে খগেন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বৈদিক যুগের আনন্দ নাড়ু, তিলের নাড়ু, বড়া পূপ ; খাঁটি বাংলার বাহান্ন ব্যঞ্জন ; মাড়োয়ারীর পুরী-কচৌরী-পাঁপড়-বালুসাই মিঠাই-লাড্ডকি-লাচ্ছা ; বসাকশেঠেদের আচার ও রকমারি মোহনভোগ (হালুয়া), রাধাবল্লভি, জৈন জহুরীর নানাপ্রকার বরফি ও পেঁড়া ; খাস বাংলার ছানার মিষ্টি ; মোগলের কাবাব-কোর্মা-কালিয়া ; ইংরেজের চপ্-কাটলেট-ক্রকে-বুঙ্গাল-আইসক্রীম ; ফরাসী সালাদ, আইরিশ স্টু প্রভৃতির সম্মিলন' বাংলার ধনিগৃহের আহার্যতালিকায় স্থানলাভ করেছে। মহর্ষি পরিবারের অন্যান্য কন্যা ও বধূদের মত মৃণালিনী দেবী ও উপরের তালিকার অনেকগুলি আয়ত্ত করেছিলেন। খগেন্দ্রনাথ আরও বলেছেন, নারিকেলের নানাপ্রকার মিষ্টান্নে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। তখনকার দিনে ঠাকুরপরিবারে ও তাঁদের আত্মীয়দের মধ্যে আমসত্ত, আচার, বড়ি, আমকাসুন্দি প্রভৃতি কেউ বাজার থেকে কিনে আনতেন না। এসব বাড়িতে মেয়েরাই তৈরি করতেন। যশোরের বৈবাহিক গৃহ থেকেও এসব ঘরে-তৈরি জিনিস, নলেন গুড়ের পাটালি, কুলের বড়ি, ঘৃতকলম্বা লেবু, চইলতার মূল এবং দীর্ঘাকৃতি মানকচুর সঙ্গে সজ্জিত হয়ে তত্ত্ব করা হত। ঘি ও চিনি মিশিয়ে মানকচুর মুড়কি ও মালপো প্রস্তুত হয়ে জলখাবারের মিষ্টান্নথালার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করত। মানকচু দিয়ে মুড়কি ও মালপো রচনায় মৃণালিনী দেবীর ছিল বিশেষ দক্ষতা। হরিচরণ বলেছেন তাঁর হাতের চিঁড়ের পুলী, দইএর মালপো এবং পাকা আমের মেঠাই যিনি একবার খেয়েছেন তার স্বাদ তিনি জীবনে কখনো ভুলতে পারেন নি।

ভাবতে বিস্ময় বোধ হয় যে, এই রন্ধনকর্মে কবিও ছিলেন তাঁর গৃহলক্ষ্মীর নিত্য-উৎসাহী সহায়ক। নতুন নতুন ছন্দ আবিষ্কারের মতই নতুন নতুন খাদ্য আবিষ্কারের শখ ছিল তাঁর গার্হস্থ্য-জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ। মনে হয় পত্নীর রন্ধনকুশলতাই তাঁকে এদিকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি রন্ধনরত পত্নীর পাশে মোড়ায় বসে নিত্যনূতন [illegible]র রান্নার ফরমাশ করতেন, মাল-মসলা দিয়ে নূতন [illegible] শিখিয়ে শখ মেটাতেন এবং [illegible] গৌরব করে বলতেন, 'দেখলে, [illegible], তোমাদের কেমন এই একটা শিখিয়ে [illegible] ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি টেনে হারমানার [illegible], 'তোমাদের সঙ্গে পারবে কে! জিতেই [illegible] বিষয়ে।'[৯]

[illegible]তঃ, কবি নিজেও তাঁর গৃহিণীর এই রন্ধননৈপুণ্য [illegible]নে মনে গৌরবান্বিত হতেন এবং বন্ধুবান্ধবদের ডেকে তাঁর ঘরের আহার্য সামগ্রী পরিবেশন করে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করতেন। খাওয়া-দাওয়া সম্পর্কে কবি নিজে অত্যন্ত খেয়ালী ছিলেন, কিন্তু অন্যকে খাইয়ে আনন্দ পাওয়াতে তিনি ছিলেন তাঁর পত্নীর যথার্থ দোসর। এ সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে' গ্রন্থে শান্তিনিকেতনের এক প্রাতরাশের বর্ণনায় বলছেন, 'তাড়াতাড়ি এসে বসলুম টেবিলে। রবিকা বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলে তুমি। এদিকে আমি চা নিয়ে বসে আছি তোমার জন্যে। নাও, খাও।' বলে এটা এগিয়ে দেন, ওটা এগিয়ে দেন। রবিকার সামনে বসে খাওয়া, সে কি ব্যাপার জানোই তো। তার পর চায়ের সঙ্গে আমার একটু রুটি চলে শুধু। রবিকা বললেন, 'একটু গুড়' খাও দেখিনি। গুড়টা ভালো জিনিস।' সকালবেলা গুড়! মহামুস্কিল; এদিক ওদিক তাকাই; রবিকা আবার মস্ত একটি কেক এগিয়ে দিলেন 'খাও ভালো করে।' * * যাক্, সকালের ফাঁড়া তো কাটল। প্রতিমাকে বললুম, 'প্রতিমা, যে কদিন আছি ভোরের চা-টা তোর কাছেই খাইয়ে দিস। কেন আর বারে বারে আমায় সিংহের মুখে ফেলা।'[১০] সিংহই বটে এবং এ বিষয়ে তিনি সিংহিণীরই যোগ্য ভর্তা!

৪

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবনশিল্পী। চারুচর্যা ছিল তাঁর প্রতিমুহূর্তের নিত্যব্রত। তাই এই মহাশিল্পীর অন্তঃপুরও হয়ে উঠেছিল একটি অপূর্বসুন্দর শিল্পশালা। তেইশ বৎসর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়, আর তাঁর বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনসঙ্গিনীর ইহলীলার অবসান ঘটে। এই অপূর্ণ-কুড়ি বৎসরব্যাপী কবির দাম্পত্যজীবনের পূর্ণ চিত্র পাওয়ার উপায় আর নেই। চিঠিপত্র প্রথম খণ্ডে যে সাড়ে পঁয়ত্রিশখানি চিঠি মুদ্রিত হয়েছে সেগুলি তাঁর বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি থেকে ১৯০১ সনের মধ্যে লেখা। 'স্নেহমুগ্ধ জীবনে'র ওই দু-চারিটি 'চিহ্নমাত্রে' পাঠকের মন মোটেই তৃপ্ত হয় না। রবীন্দ্রনাথের পত্ররচনাও ছিল একটা বিশেষ শিল্প। শেষ দিন পর্যন্ত কবিজায়ার কাছ থেকে চিঠি পাওয়ার জন্যে কবি উন্মুখ হয়েই থাকতেন। স্বভাবতই প্রিয়াকে লেখা তাঁর তরুণ দাম্পত্যজীবনের প্রথমার্ধের প্রেমপত্রগুলি কেমন ছিল তা জানবার কৌতূহল চিরদিনই পাঠকের চিত্তে অতৃপ্ত থাকবে। দ্বিতীয়ার্ধের যে পত্রগুচ্ছ আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে সেগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভার্যার কাছে ভর্তার লেখা বৈষয়িক পত্র। কবিচিত্তের পরিচয় তাতে প্রায় নেই। আদরসূচক আবেগগর্ভ উক্তিগুলিও সম্পাদকের স্থূলহস্তাবলেপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেবল সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'ভাই ছোট বউ' শেষ পর্যন্ত "ভাই ছুটি"তে পরিণত হয়ে কবিকণ্ঠের সম্বোধন-সংগীতকে যেন

দুটি অক্ষরের ধ্বনিমন্ত্রে অবিনশ্বর করে রেখে গেছে। উর্মিলা দেবী তাঁর 'কবিপ্রিয়া' প্রবন্ধে কবিদম্পতির প্রৌঢ়লীলার একটি সংক্ষিপ্ত ছবি এঁকে রেখেছেন। 'মৃণালিনী দেবী' তখন 'রথীর মা'। অর্থাৎ সেটি কবিজায়ার যশোদামূর্তি। ওই প্রবন্ধের একস্থানে উর্মিলা দেবী লিখছেন, 'কবির একটা অভ্যাস ছিল, সিঁড়ি থেকে সু-উচ্চ কণ্ঠে "ছোটবউ—ছোটবউ" করে ডাকতে ডাকতে উঠতেন। আমার ভারি মজা লাগত শুনে, তাই বোধ হয় আজও মনে আছে।' কিন্তু "ছোটবউ"ও তো কবিজায়ার পারিবারিক জীবনেরই পরিচয় বহন করছে। নিভৃত আলাপনে কবি তাঁর কিশোরী প্রিয়াকে কী নামে ডাকতেন সে কথা কোথায়ও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। "শাজাহান" কবিতায় কবি বলেছিলেন :

জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে কানে ডাকা
রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

কবির নিজের নিভৃত মন্দিরের সেই কানে-কানে-ডাকা নামটি মহাশূন্যেই হারিয়ে গেছে।

শুধু রসিকচিত্তের এই কৌতূহলের দিক থেকেই নয়, কবির দাম্পত্য-জীবনের বহু উপকরণই লুপ্ত হয়ে গেছে, সেজন্য এদিক থেকে রবীন্দ্র-জীবনী চিরদিনের জন্যেই অসম্পূর্ণতা বহন করে চলবে। ভাবরূপে কবি দাম্পত্যলীলাকে 'স্মরণে'র একটি কবিতায় ধ্যান করেছেন। কবির দাম্পত্যস্বপ্নকে চেনার জন্যে 'স্মরণে'র সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধার করা যেতে পারে :

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
যে-ভাবে সুন্দর তিনি সর্বচরাচরে,
যে-ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে-ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,
যে-ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

যে ভাবে পরম-এক আপনাকে দুই করে মিলন-বিরহের আনন্দ-বেদনার মধ্য দিয়ে নিজেরই মাধুরী আস্বাদন করছেন সেই লীলারহস্যের আভাসই রয়েছে এই কবিতায়। কবিজীবনের এই পর্বে তাঁর বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই সেই রহস্যের সন্ধান করতে হবে। বিবাহের পরে কবির প্রথম পর্বাধ্যায়ের প্রেমের কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে, 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে। আমি 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলেছি, 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিতে কবিচেতনা দ্বিধাবিভক্ত। কিন্তু ওর মধ্যেই কতকগুলি কবিতা আছে যেগুলির আলম্বন তরুণ-কবির পঞ্চদশী কিশোরীবধূ।

ওই তনুখানি আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।

* * *

ওই দেহখানি বুকে তুলি নেব বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

তরুণ কবিপ্রেমিক এখানে প্রেয়সী বধূর তনুলাবণ্যে দাম্পত্য-লীলার স্বপ্নস্বর্গ রচনা করেছেন। 'স্তন', চুম্বন', 'বিবসনা', 'বাহু' 'চরণ' প্রভৃতি কবিতা সেই একই রতিরসের বিচিত্র আলম্বন ও উদ্দীপন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। দাম্পত্য-মিলনকুঞ্জে সম্ভোগপ্রেমের এমন অপূর্ব সুন্দর চিত্র, দেহের পাত্রে মর্ত্যজীবনের পরম পিপাসার এমন মধুর আস্বাদন বৈষ্ণবপদাবলীর পরে আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেহরতি পুষ্পসুকুমার সৌন্দর্যস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে কী অসামান্য কাব্যলাবণ্য লাভ করতে পারে, এ কবিতাগুলি যেন তারই চূড়ান্ত নিদর্শন।

'কড়ি ও কোমল'-এর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মানসী' 'মানসী'র যুগে কবি কখনো কলিকাতা কখনো শিলাইদহ, কখনো বোলপুরে কাটিয়েছেন। কিন্তু এর তৃতীয় পর্যায়ের কবিতাগুলি লেখা হয়েছে গাজিপুরে। বিবাহের চার বৎসর পরে [কবিজায়া তখন ষোড়শী] ১২৯৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে কবি সপরিবারে গাজিপুরে গিয়ে বেশ কিছুদিন কাটান। বাংলা থেকে দূরে, পশ্চিমের গঙ্গাতীরে গাজিপুরের গোলাপবাগান তরুণ কবির স্বপ্নকে আকর্ষণ করেছিল। কবির তখন প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে। সকন্যা কবিজায়াকে নিয়ে তিনি গাজিপুরে নিভৃত কবিকুঞ্জে জীবনের মাধুর্যলীলার পূর্ণ আস্বাদ[illegible] সুযোগ পান। কবির দাম্পত্যজীবনে এই গা[illegible] পর্বটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। [illegible] কলিকাত[illegible] পরিবারের দশজনের মধ্যে তাঁ[illegible] অতিবাহিত হয়েছে। গাজিপুরেই তাঁরা [illegible] পরম নির্জনতায় উভয়ের অন্তরঙ্গতম স[illegible] সুযোগ পেলেন। স্বভাবতঃই গাজিপুরের এ[illegible] নিবিড়তম দাম্পত্যমিলনের আলেখ্য বিরচি[illegible] এই শ্রেণীর একটি কবিতা 'অপেক্ষায়'। প্রিয়া[illegible] প্রত্যাশী কবি রজনীর সুস্নিগ্ধ অন্ধকারের [illegible]

উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন, তাই নিদাঘের বিলম্বিত অপরাহ্ণ তাঁর কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। তাঁর মনে হয়েছে 'সকল বেলা কাটিয়া গেল বিকাল নাহি যায়।' গোধূলিলগ্নে বধূরা নেমেছে দীঘির ঘাটে। কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে।

সেও কি এতক্ষণে
নীলাম্বরে অঙ্গ ঘিরে
নেমেছে সেই নিভৃত নীরে,
প্রাচীরে ঘেরা ছায়াতে ঢাকা
　　বিজন ফুলবনে।

কবি কল্পনাদৃষ্টি দিয়ে দেখছেন :

স্নিগ্ধজল মুগ্ধভাবে
　　ধরেছে তনুখানি।
মধুর দুটি বাহুর ঘায়
অগাধ জল টুটিয়া যায়
গ্রীবার কাছে নাচিয়া উঠে
　　করিছে কানাকানি।

*　　*　　*

বুঝি বা তীরে উঠিয়াছে সে
　　জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে,
যৌবন লাবণ্য যেন
　　লইতে চাহে কেড়ে।

তারপর অবগাহন-স্নানে শীতল হয়ে গোধূলিপ্রসাধন শেষ করে :

বনের পথে নদীর তীরে
অন্ধকারে বেড়াবে ধীরে,
গন্ধটুকু সন্ধ্যাবায়ে
　　রেখার মত রাখি।

এতক্ষণ পরে কবির মিলন-প্রতীক্ষা সার্থক হবে :

বাজিবে তার চরণধ্বনি
　　বুকের শিরে শিরে।
কখন, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে,
[illegible] [illegible]খিন বায়ু
　　জাগায় ধরণীরে।

[illegible] কাছে দাঁড়াবে গিয়ে
　　আর কি হবে কথা?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায়
থমকি রবে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
　　সুখের ব্যাকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
　　আলোর ব্যবধান।
আঁধার তলে গুপ্ত হয়ে
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষ কোটি
　　জাগ্রত নয়ান।

*　　*　　*

আঁধারে যেন দুজনে আর
　　দুজন নাহি থাকে।
হৃদয় মাঝে যতটা চাই
ততটা যেন পুরিয়া পাই,
প্রলয়ে যেন সকল যায়,
　　হৃদয় বাকি রাখে।

*　　*　　*

দুদিক হতে দুজনে যেন
　　বহিয়া খরধারে
আসিতেছিল দোঁহার পানে
ব্যাকুল গতি ব্যগ্রপ্রাণে,
সহসা এসে মিশিয়া গেল
　　নিশীথ পারাবারে।

থামিয়া গেল অধীর স্রোত
　　থামিল কলতান,
মৌন এক মিলন রাশি
তিমিরে সব ফেলিল গ্রাসি
প্রলয়তলে দোঁহার মাঝে
　　দোঁহার অবসান।'[১১]

নিতান্ত অদীক্ষিত অরসিক না হলে কেউ এ কবিতার ব্যাখ্যা দাবি করবে না। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগের এমন ঋজু-শুভ্র চারু-চিকণতা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে দ্বিতীয় বার দেখা যায় নি বলেই এই কবিতাটির মূল্য অপরিসীম।

৫

'মানসী'র পর থেকে কবির দাম্পত্যচেতনা এক অপরূপ কল্যাণশ্রীতে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। দাম্পত্যপ্রণয়াস্বাদে রবীন্দ্রনাথ কালিদাস পন্থ প্রেমেরই উত্তরসাধক। 'কুমার-সম্ভবে'র মহাকবি বিবাহসজ্জায় সজ্জিতা গৌরীর বর্ণনায় বলেছেন :

সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী
গৃহীতপত্যুদ্‌গমনীয়বস্ত্রা।
নিবৃত্তপর্জন্যজলাভিষেকা
প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে॥

'গৌরী যখন মঙ্গলস্নানে নির্মলগাত্রী হয়ে পতিমিলনের উপযুক্ত বসন পরিধান করলেন তখন তিনি বর্ষার জলাভিষেকের অবসানে কাশকুসুমে প্রফুল্ল বসুধার মত

বিরাজ করতে লাগলেন।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন: 'পতিব্রতার মুখচ্ছবিতে বিবাহিত রমণীর যে গৌরবশ্রী অঙ্কিত আছে, তাহা নিয়ত আচরিত কল্যাণকর্মের স্থির সৌন্দর্য,—শম্ভুর কল্পনানেত্রে সেই সৌন্দর্য যখন অরুন্ধতীর সৌম্যমূর্তি হইতে প্রতিফলিত হইয়া নববধূবেশিনী গৌরীর ললাট স্পর্শ করিল, তখন শৈলসুতা যে লাবণ্যলাভ করিলেন, অকালবসন্তের সমস্ত পুষ্পসম্ভার তাঁহাকে সে সৌন্দর্য দান করিতে পারে নাই।'

মঙ্গলস্নানে নির্মলগাত্রী দাক্ষায়ণীসুতার মধ্যেও কবি শারদলক্ষ্মীর মূর্তিকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই কবি তাঁর নিজের দাম্পত্যজীবনের দিনগুলিকে শরৎ ঋতুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'জীবনস্মৃতি' "বর্ষা ও শরৎ" অধ্যায়ে কবি লিখছেন: 'আমি যে সময়কার কথা বলিতেছি সে-সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায়—সেই শিশিরে ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন গুন করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি—সেই শরতের সকালবেলায়।—

আজি শরৎতপনে প্রভাতস্বপনে
কী জানি পরাণ কী যে চায়!

* * জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক। সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ—সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা বোঝাই-করা শরৎ—আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।'

শরৎ-ই যে কল্যাণময় দাম্পত্যমিলনের উত্তম লগ্ন এ অনুভূতি কবি তাঁর পরিণত বয়সের প্রেমকাব্য 'মহুয়া' "লগ্ন" কবিতায়ও প্রকাশ করেছেন। 'প্রথম মিলন দি: নিবিড় আষাঢ়েও নয়, উন্মত্ত বসন্তেও নয়। 'যেদি: আশ্বিনে, শুভক্ষণে আকাশের সমারোহ ধরণীতে পূর্ণ হ: ধনে' সেদিনই আসে মিলনের লগ্ন। সেদিন

বনলক্ষ্মী শুভব্রতা
শুভ্রের ধেয়ানে তার মেলিয়াছে অম্লান শুভ্রতা
আকাশে আকাশে
শেফালি মালতী কুন্দে কাশে।
অপ্রগল্ভা ধরিত্রী সে প্রণামে লুণ্ঠিত,
পূজারিণী নিরবগুণ্ঠিত,
আলোকের আশীর্বাদে শিশিরের স্নানে
দাহহীন শান্তি তার প্রাণে।
দিগন্তের পথ বাহি
শূন্যে চাহি
রিক্তবিত্ত শুভ্র মেঘ সন্ন্যাসী উদাসী
গৌরীশঙ্করের তীর্থে চলিয়াছে ভাসি।
সেই স্নিগ্ধক্ষণে, সেই স্বচ্ছ সূর্যকরে,
পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে
মুক্তির শান্তির মাঝখানে
তাহারে দেখিব যারে চিত্ত চাহে, চক্ষু নাহি জানে।

দাম্পত্যজীবন সাধনায় রবীন্দ্রনাথও 'পূর্ণতায় গম্ভীর অম্বরে মুক্তির শান্তির মাঝখানে' কবিজায়াকে একদিন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেদিন তাঁর জীবনাকাশে তাঁর গৃহলক্ষ্মী শারদলক্ষ্মীর মঙ্গলসৌন্দর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন। কবির সংসারজীবনের সেই 'শেষ মাধুরী', শারদলক্ষ্মীর কৌন্দী-রাগরঞ্জিত তাঁর চিত্তলোকে স্বকীয়া প্রেমের সেই আলো-আঁধারি লীলার বর্ণনা করে কবিজীবনের এই অনালোকিত অধ্যায়ের আলোচনা আগামী সংখ্যায় সমাপ্ত হবে।

[ক্রমশ]

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ 'গোলাম-চোর', ভারতী, আষাঢ় ১২৮৮, পৃ. ১১২-১১৫।
২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২১।
৩ ঘরোয়া, পৃ ৬৩।
৪ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ২১।
৫ রবীন্দ্রকথা, পৃ. ২৫৪।
৬ ঘরোয়া, পৃ. ৬৩।
৭ 'কবির কথা' গ্রন্থে 'মৃণালিনী দেবী' অধ্যায় ... পৃ. ১০-১১
৮ বিশ্বভারতী, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা,
৯ দ্রষ্টব্য, কবির কথা, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
১০ জোড়াসাঁকোর ধারে, পৃ. ৭৭।
১১ মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী-২, পৃ. ১৯২-১৯

মহর্ষি ভুবনমোহন

মন্মথ রায়

॥ ভূমিকা ॥

দিনাজপুর জেলা তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গে মহর্ষি ভুবনমোহন ছিলেন প্রাতঃস্মরণীয়। বন্ধুবর সজনীকান্ত দাস বাল্যকালে যখন দিনাজপুরবাসী ছিলেন, তখন মহর্ষি ভুবনমোহনের সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ভুবনমোহনকে চোখে দেখিবার সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সান্নিধ্যলাভ করিবার সুযোগ আমার হয় নাই। 'আত্মস্মৃতি' গ্রন্থে সজনীকান্ত মহর্ষি ভুবন-মোহনের মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিয়াছেন; মূলত সেই বর্ণনাকেই ভিত্তি করিয়া মহর্ষির স্মৃতির পুণ্য-বেদীতে আমিও আমার শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করিতেছি আমার এই ক্ষুদ্র একাঙ্কিকায়। ঘটনাসৃষ্টি কার্যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিলেও, মহর্ষি ভুবনমোহনের পুণ্য চরিত্রের যে আভাস আমি দিয়াছি তাহা কাল্পনিক নয়; বরং আমার অক্ষমতার দরুন হয়তো তাঁহার মহত্ত্ব পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট করিতে পারি নাই। একমাত্র ভরসা, শ্রদ্ধার্ঘ অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাহা নিবেদন করা যায়। অলমিতি বিস্তরেণ।

জন্মাষ্টমী, মন্মথ রায়
১৩৬৫

[ইংরেজী ১৯১৪ সন। দিনাজপুরের বালুবাড়ি ল্লী। 'পণ্ডিত মশায়' নামে পরিচিত মহর্ষি ভুবনমোহন রের ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাসগৃহ সংলগ্ন দাতব্য ঔষধালয়। হা বালুবাড়ির চৌমাথাস্থিত বটতলায় অবস্থিত। াতব্য চিকিৎসালয়ের বারান্দা। বারান্দার এক দিকে াীদের বসিবার জন্য একয়েক সাধারণ বেঞ্চি; অপর ...য়ের বসিবার জন্য অতি সাধারণ ... মধ্যস্থলে ঘরের অভ্যন্তরে যাইবার দরজা- ...দার সম্মুখভাগে ছোট একটু প্রাঙ্গণ। পূর্ববর্ণিত বালুবাড়ির চৌমাথাস্থিত বটতলা। ...ণ্ডিত মহাশয় অশীতিপর বৃদ্ধ। শ্মশ্রুগুম্ফ এক হইয়া ...সারিত, সাদা ধবধব করিতেছে। সৌম্যদর্শন, ...মূর্তি, মুখখানি করুণায় মণ্ডিত, কপালের আব তাঁহার মুখ-সৌন্দর্যকে কেমন যেন প্রশান্ততর করিয়াছে। জামা বা পিরহান তিনি কখনই ব্যবহার করেন না, খাটো মোটা ধুতি এবং একখানি গামছা তিনি উত্তরীয়-স্বরূপ ব্যবহার করেন। পণ্ডিত মহাশয় চিরকুমার, কিন্তু 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। পূর্বোক্ত বারান্দায় একটি দেওয়াল-ঘড়ি আছে। উহাতে দেখা যাইতেছে বেলা আড়াইটা বাজিয়াছে। শান্ত অপরাহ্ণ। চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক সজনীকান্ত আজ রবিবার ছুটির দিনে এখানে আসিয়া বারান্দায় বসিয়া আপন মনে কি যেন লিখিতেছে। পথ হইতে একটি বৃদ্ধ, রুগ্ন ভদ্রলোককে সযত্নে এবং সাবধানে ধরিয়া লইয়া একটি যুবকের প্রবেশ]

যুবক। (সজনীকে) এটাই কি পণ্ডিত মশায়ের ডিসপেনসারি?

বৃদ্ধ। মানে, ভুবনমোহন কর—এককালে ঢাকায় নর্মাল স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন, এখন এই দিনাজপুরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন, এটা তাঁরই ডিসপেনসারি তো?

সজনী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা?

যুবক। আমরা ঢাকা থেকে এসেছি আজ। ইনি আমার বাবা।

বৃদ্ধ। পণ্ডিত মশাই এককালে আমাকে চিনতেন, যখন ঢাকায় হেডপণ্ডিত ছিলেন। সে প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। তখনও একবার আমায় চিকিৎসা করে বাঁচিয়েছিলেন। তারপরেই পেনসন নিয়ে দিনাজপুরে চলে আসেন। আমরা ওঁকে ভুলি নি; কিন্তু আজ এই ১৯১৪ সনে উনি আমায় চিনবেন কিনা জানি নে। গিয়ে বল, আমার নাম হরিহর বোস। এটি আমার ছেলে—মনোহর। আমরা এখনই একটু দেখা করতে চাই। যাও বাবা, যাও।

সজনী। বসুন, বসুন আপনারা। ব্যস্ত হয়ে লাভ নেই। ঠিক সময়মত তিনি আসবেন—না আগে, না পরে।

[পিতাপুত্র বেঞ্চিতে বসিলেন। হরিহর ওই কয়েকটি কথা বলিয়াই হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন]

হরিহর। পণ্ডিত মশাই কোথায়? বাড়ি আছেন তো?

সজনী। আছেন। ভাত-ঘুমে রয়েছেন।

হরিহর। ভাত-ঘুমে!

সজনী। দুপুরে খাওয়ার পর উনি ওই বটতলায় একটা মাদুর বিছিয়ে একটু বিশ্রাম করেন। সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেন। উনিই বলেন, ভাত-ঘুম।

হরিহর। ও। কিন্তু এখন কটা বাজল?

মনোহর। (দেয়াল ঘড়িটি দেখিয়া) আড়াইটে বেজে গেছে।

হরিহর। আড়াইটে বেজে গেছে! সওয়া তিনটে বাজতে এখনও একটু দেরি আছে। (ব্যাকুলভাবে) সওয়া তিনটের মধ্যে ওঁর ঘুম ভাঙবে তো? এখানে আসবেন তো? আমার সঙ্গে দেখা হবে তো? (হাঁপাইতে লাগিলেন)

মনোহর। আঃ বাবা— তুমি—

সজনী। আপনি এমন করছেন কেন? হাঁপাচ্ছেন দেখছি! ঘড়িতে ঢং ঢং করে তিনটে বাজলেই ওঁর ঘুম ভাঙবে।...আপনি এমন করছেন কেন?

হরিহর। গণকে বলেছে আজ সওয়া তিনটেয়— হ্যাঁ, ১৯১৪ সনের আজ এই বিশে ডিসেম্বর, বেলা সওয়া তিনটেয়—আমার মস্ত ফাঁড়া। নিজেও বুঝছি গণকের কথা মিথ্যা হবে না—আমার সময় হয়ে এল। (বুক চাপিয়া ধরিয়া) উঃ, আঃ—

[সজনীকান্ত মনোহরের দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল]

মনোহর। এই মৃত্যুভয়টাই হচ্ছে ওঁর ব্যাধি। পণ্ডিত মশায়ের চিকিৎসার ওপর ওঁর অগাধ বিশ্বাস। এক পণ্ডিত মশাই যদি ওঁকে বাঁচাতে পারেন, এই ওঁর আশা। সেই আশাতেই ঢাকা থেকে মরি-পড়ি করে আমাকে নিয়ে ছুটে এসেছেন আজ এই দিনাজপুরে।

[হরিহর হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্লান্ত হইয়া বেঞ্চিতে হেলান দিয়া চোখ বুজিয়া রহিয়াছেন। কেবল মাথাটি মাঝে মাঝে এপাশ-ওপাশ দুলিতেছে]

সজনী। এখন একটু শান্ত হয়ে আছেন দেখছি!

মনোহর। অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। দেখি, এখন পণ্ডিত মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হলে যদি তিনি কিছু করতে পারেন! তুমি কে ভাই?

সজনী। আজ্ঞে আমি এই দিনাজপুরেই থাকি। স্কুলে পড়ি। ছুটির দিনে পণ্ডিত মশায়ের কাছে আসি। রোগীদের চিঠিপত্র পড়ে তার উত্তর লিখে দেবার কাজ দিয়েছেন আমাকে।

মনোহর। কিন্তু দেখছি তুমি কাগজে ক খ লিখছ।

সজনী। আজ্ঞে হাতের লেখা মক্‌শ করছি। মানে আমার হাতের লেখাটা তত ভাল নয়। পণ্ডিত মশাই বলেন, তুই একজন লেখক হবি সজনী, হাতের লেখাটা ভাল কর্। তা এত চেষ্টা করছি কিন্তু তবু সেই কাকের ঠ্যাং আর বকের ঠ্যাং। দেখুন না।

মনোহর। না-না, ক-খ বলে চেনা যাচ্ছে। তোমার নাম বুঝি সজনী?

সজনী। আজ্ঞে হ্যাঁ। শ্রীসজনীকান্ত দাস।

মনোহর। পণ্ডিত মশায়ের আত্মীয় তুমি?

সজনী। আজ্ঞে না। আমার বাবা শ্রীহরেন্দ্রলাল দাস এখানে পার্টিশন ডেপুটি কালেক্টর। এই পাড়াতেই আমাদের বাসা। আত্মীয় না হলে কি হবে, পণ্ডিত মশাই ছেলের চেয়েও আমাদের বেশী ভালবাসেন।

মনোহর। কিন্তু বাবার কাছে শুনেছি উনি তো চিরকুমার। ওঁর ছেলে—

সজনী। হ্যাঁ চিরকুমার। নিজের ছেলে নেই, দিনাজপুরের সব ছেলেমেয়েই ওঁর ছেলেমেয়ে। ওঁকে আপনি বুঝি দেখেন নি?

মনোহর। না। বাবার কাছে অদ্ভুত ওঁর সব গল্প শুনেছি। এখানে এসেও যাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, সবাই বললেন, পণ্ডিত মশাই মানুষ নন, দেবতা।

সজনী। এখানকার লোকে ওঁকে মহর্ষি ভুবনমোহ[illegible] বলেন।

মনোহর। হ্যাঁ, তাও শুনে[illegible] [illegible]

পড়লেন নাকি!

সজনী। হ্যাঁ, তাই তো! নাক [illegible]

আপনারও কি এ ভয় হচ্ছে যে আজ সওয়া [illegible]

মারা যাবেন!

মনোহর। এ রকম উনি অনেকবার বলেছে[illegible] বেঁচেও আছেন। তবে মাঝে মাঝে মৃত্যুভয়ে ওঁর

ব্যারামটা বেড়ে যায়, আর কষ্ট পান খুব। আজ বরং পণ্ডিত মশায়ের কাছে এসে পড়াতে অনেকটা সাহস পেয়েছেন দেখছি। পণ্ডিত মশাইকে বাবা মনে করেন ধন্বন্তরি। বলেন, ওঁর হোমিওপ্যাথি ওষুধে নাকি ম্যাজিক আছে। এত বড় ডাক্তার, কিন্তু রোগীপত্র তো দেখছি না!

সজনী। বলেন কি! ভোর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত ওঁর রোগী দেখার সময়। রোজ গড়পরতা খুব কম করে উনি দু শো রোগী দেখেন আর ওষুধ দেন। যারা এখানে আসতে পারে না, তাদের বাড়ি গিয়েও দেখে আসেন বেলা একটা পর্যন্ত—পায়ে হেঁটে।

মনোহর। অথচ একটা পয়সা নেন না কারুর কাছ থেকে! চলে কি করে?

সজনী। ওষুধপত্র যোগান গবর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপালিটি আর পাব্লিক। একাহারী লোক। নিরামিষ খান। থাকেন ভাইপোদের সংসারে, তা ছাড়া পেন্‌সনও তো পাচ্ছেন।

মনোহর। বয়স তো এখন আশী।

সজনী। আশী হলেও উনি এখনও যা খাটতে পারেন তা আপনিও পারবেন না স্যার। এক ঘোড়ার একটা পালকি-গাড়ি আছে বটে, কিন্তু দেখে মনে হয় ঘোড়ার সেবা উনি যতটা না পান, ওঁর সেবা ঘোড়াটা পায় অনেক বেশী। মানে রোদ বৃষ্টি হোক, ঘোড়া থাকবে ঘরে আর উনি যাবেন বাইরে, পদ-রথে।

মনোহর। বাঃ! তুমি তো বেশ বল হে! পণ্ডিত মশাই তোমার সম্বন্ধে ঠিকই বলেছেন। বড় লেখক হবে তুমি। লেখা-টেখা শুরু করেছ নাকি?

সজনী। (সলজ্জভাবে) এই পণ্ডিত মশাইকে নিয়ে আমি লিখেছি একটা কবিতা।

মনোহর। কই, দেখি!

[illegible] ...ুলে পড়ি, অনেক ভুল-টুল [illegible] ...ণ্ডিতমশাইকে দেখে শুনে কেন যেন [illegible] কেবলই কবিতা লিখতে ইচ্ছে হয়। [illegible] আমার উপায় নেই, এমনি মনে হয়। [illegible] হয় সবাইকে পড়াই আমার কবিতাটা।

...হর। বেশ তো। দাও না আমি পড়ি।

...। কিন্তু বিপদ কি জানেন, আমার লেখা আবার কেউ পড়তে পারে না, তাই ওটা পড়তে হবে আমাকেই।

মনোহর। বেশ তো, পড় না!

সজনী। পড়ছি, কিন্তু সবটা হয়তো পড়া হবে না। দেখছেন তো, তিনটে বাজতে আর বেশী দেরি নেই।

মনোহর। ও। তিনটের তিনি আসবেন। তাঁর সামনে বুঝি—

সজনী। ওরে বাবা! না। কান মলে দেবেন। তবু যতটা পারি পড়ছি।

[কবিতা পাঠ]

"ভুবন মোহন কর তোমরাই হে মহাপুরুষ -
নহে তারা স্বর্ণ কিরীটী শোভে মস্তকে যাদের।
ভুবনমোহন তুমি, নাহি জানি কোন্ মহাক্ষণে
কোন্ স্বর্গলোক হ'তে পাপ-তাপ ভরা এ ধরায়
অবতীর্ণ হ'লে আসি, বিতরিলে করুণা অপার
অভাগা পতিত দলে। কর্মযোগী তুমি, ডুবে আছ
মহাকর্ম-সমুদ্রের মাঝে, উর্দ্ধে দেবতার পানে
আছে তবু চিত্ত স্থির তব। শুনি নাই কভু, তুমি
কর্মমাঝে আত্মহারা হয়ে তাঁহারে করেছ হেলা
কর্ম যাঁর অভিপ্রেত, সুখে দুঃখে আহারে-বিহারে
প্রতি পলে প্রতি দণ্ডে প্রতি মুহূর্তেতে জপিতেছ
মুখে প্রিয় নাম, কর্মফলস্পৃহা ত্যজি, অবিরাম
তাঁরি পদে সঁপিতেছ জীবনের অর্জিত গৌরব।"

[ইতিমধ্যে এখানে সজনীকান্তের বন্ধু রতন প্রবেশ করিয়াছে। দেয়াল-ঘড়িটায় ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল]

সজনী। আর না।

মনোহর। কিন্তু বেশ হয়েছে।

রতন। কিন্তু ছন্দের দোষ আছে, আর রবিঠাকুরের ইনফ্লুয়েন্স। (হরিহর চমকাইয়া ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন দেখিয়া) কিন্তু এ কি! ইনি এমন করে চমকে উঠলেন যে সজু! তোমার কবিতা শুনে নাকি?

সজনী। (রতনকে) থাম্। তুই কি জানিস? ব্যাপারটা সিরিয়াস। (মনোহরকে) আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি পণ্ডিত মশাইকে সব বলে, তাঁকে এখনি নিয়ে আসছি।

[সজনী ছুটিয়া বটতলায় চলিয়া গেল]

হরিহর। (মনোহরকে) সওয়া তিনটে। সওয়া তিনটে বাজতে যে কয়েক মিনিট বাকি তারই মধ্যে যদি পণ্ডিত মশাই এসে আমাকে রক্ষা করতে পারেন। হ্যাঁ। বুকের ব্যথাটা একটু একটু করে বেশ বাড়ছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হচ্ছে। শোন্ বাবা মনোহর, যদি না বাঁচি—তো শেষ কয়েকটা কথা শুনে নে।

মনোহর। তুমি থাম বাবা।

হরিহর। না না, আর হয়তো বলার সময় পাব না। তোর মাকে বলিস, তাকে কারণে অকারণে অনেক মার-ধোর করেছি। এখন সেজন্য বুকটা আমার—উঃ! সে যেন আমাকে মাপ করে—

মনোহর। তুমি থাম বাবা। এসব পারিবারিক কথা এখন রাখ।

হরিহর। থামছি—থামছি বাবা, জন্মের মত থামছি। হলধর মণ্ডলের দেড় শো টাকার হ্যাণ্ডনোটটা তামাদি হবার কথা ২০শে চৈত্র। পশুপতির বন্ধকী দলিলটা তামাদি হবার কথা ৩০শে চৈত্র। দেখিস বাবা, যেন তামাদি না হয়। ওরা যদি সুদ-টুদ কিছু না দেয়—দিবি ঠুকে নালিশ।

মনোহর। আঃ! এসব নিয়ে এখন তুমি মাথা ঘামাচ্ছ কেন বাবা? লোকে মরবার সময় হরিনাম করে আর তুমি কিনা—

হরিহর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস বাবা। ওই হরিমতি ঝিটাকে একখানা শান্তিপুরের শাড়ি দেব বলেছিলাম, আমার নাম করে তুই কিনে দিস বাবা। তবে দেখিস বাবা, এ কথাটা যেন তোর মার কানে না ওঠে। উঃ! বুকটা আমার গেল, আমার দম আটকে আসছে। এই সওয়া তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে—হরিমতিরে—আমি জন্মের মত—

মনোহর। আঃ! বাবা, এ সব কী হচ্ছে?

রতন। হরিনাম হচ্ছে। আর কি হচ্ছে!

[সজনীকান্তসহ পণ্ডিত মশাই মহর্ষি ভুবনমোহনের প্রবেশ। তিনি সরাসরি হরিহরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

পণ্ডিতমশাই। সজুর কাছে সব শুনলাম। তোমার কথা আমার বেশ মনে আছে ভাই হরিহর। ঢাকার শাঁখারিপাড়ায় ছিল তোমার মহাজনী গদি।

হরিহর। অ্যাঁ! এ অধমকে মনে আছে! (পায়ের ধুলা লইতে গেলেন)

পণ্ডিতমশাই। না-না, পায়ের ধুলো কেন? কতকাল পরে দেখা, এস ভাই কোলাকুলি হোক।

[উভয়ের কোলাকুলি]

হরিহর। আঃ! আমার বুকটা জুড়িয়ে গেল। (মনোহরকে) ওরে হতভাগা পায়ের ধুলো নে।

[মনোহর প্রণাম করিতে গেল। কিন্তু প্রণাম করিবার আগেই পণ্ডিত মশাই তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন]

পণ্ডিতমশাই। (হরিহরকে) তোমার ছেলে বুঝি?

হরিহর। হ্যাঁ পণ্ডিত মশাই, আমার সবেধন নীলমণি, শিবরাত্রির সলতে, মনোহর।

পণ্ডিতমশাই। বাঃ! খাসা ছেলে। (মনোহরকে) সকলের মন হরণ করো বাবা। (হরিহরকে) বুকের যন্ত্রণাটা এখন কম মনে হচ্ছে কি?

হরিহর। অনেক, অনেক কম। কিন্তু—কিন্তু সওয়া তিনটে বাজতে আর কত বাকি?

পণ্ডিতমশাই। (হাসিয়া) তোমার সওয়া তিনটে পার হয়ে গেছে, ভাই হরিহর।

হরিহর। সওয়া তিনটে পার হয়ে গেল, তবু আমি বেঁচে আছি?

মনোহর। হ্যাঁ বাবা, কথা কইছ।

পণ্ডিতমশাই। জলজ্যান্ত বেঁচে আছ ভায়া। বিশ্বাস না হয় নিজের গায়ে চিমটি কাট, লাগে কিনা একবার দেখ।

হরিহর। (দেওয়াল-ঘড়িটা পুনরায় দেখিয়া) কিন্তু বুকের যন্ত্রণাটা এখনও রয়েছে।

পণ্ডিতমশাই। যাবে, ঠিক মত ওষুধ পড়লে ও যন্ত্রণাটাও যাবে। সজু, লক্ষণগুলো যা লক্ষ্য করেছিস্ আর একবার বল্ দেখি!

সজনী। অতিশয় স্নায়বীয় — অতিশয় ও চিত্তের উৎকণ্ঠা। ভীততাসূচক মুখ জীবনের শোচনীয়তা; রোগ সাংঘাতিক বলিয়া নিশ্চিত ধারণা; মৃত্যুর দিন-ক্ষণ, বেদনায় অসহিষ্ণুতা, বেদনাবশতঃ ক্ষিপ্ততা, great distress in heart and chest. একেবারে হুবহু একোনাইট।

পণ্ডিতমশাই। বাঃ! আমার মুখে শুনে শুনে একেবারে তোতা পাখিটি হয়ে গেছিস দেখছি! রতন তুই কী বলিস?

রতন। Great anguish, extreme restlessness and fear of death, এ লক্ষণগুলো Arsenic-এও আছে।

সজনী। আছে। কিন্তু ইনি যে কবে মারা যাবেন তার দিনক্ষণ পর্যন্ত বলে দেন, predicts the day he will die, এটা একোনাইটেই আছে।

পণ্ডিতমশাই। তা বটে, তা বটে।

রতন। আচ্ছা, আপনি কি এক শয্যা হইতে অন্য শয্যায় যাইতে চান? কখনও এখানে কখনও সেখানে শয়ন করিয়া থাকেন?

হরিহর। হ্যাঁ, তা—কিন্তু এসব প্রাইভেট খবরে তোমাদের কী কাজ হে ছোকরা?

রতন। এটা আরসেনিকের লক্ষণ পণ্ডিতমশাই।

পণ্ডিতমশাই। কিন্তু আরসেনিকের বড় লক্ষণটা হল গিয়ে বল্ দেখি সজু!

সজনী। জ্বালাকর বেদনা। (হরিহরকে) তপ্ত অঙ্গারে আপনি দাহ হচ্ছেন, দেহে যেন দাবানল জ্বলছে এমনি মনে হয় কি?

হরিহর। ওরে বাবা! না-না।

সজনী। উত্তপ্ত পানীয় দ্রব্য ভাল লাগে কী? উত্তাপ প্রয়োগে জ্বালার উপশম হয় কী?

হরিহর। না-না। গরমে আমার ব্যারাম আরও বাড়ে। হরিমতীকে তাই ঘরে রাখি, সারারাত বাতাস করে।

পণ্ডিতমশাই। অসুখটা কী তোমার মধ্য-রাত্রের পরে বাড়ে ভাই?

হরিহর। না দাদা, শেষরাত্রে বরং একটু ভাল বোধ [illegible]

[illegible] বে কিছুতেই আরসেনিক নয়। তা ছাড়া [illegible] াছে, খাদ্যদ্রব্যের গন্ধ বা দর্শন সহ্য করিতে [illegible] আপনার তাই কী?

[illegible]। অ্যাঁ!

[illegible]াহর। না-না, খাওয়ার লোভটা বয়স আন্দাজে [illegible] একটু বেশী।

হরিহর। কিন্তু এসব প্রাইভেট খবরে তোমাদের কী দরকার হে ছোকরা?

পণ্ডিতমশাই। না-না, আর দরকার নেই। একোনাইটই তোমার ওষুধ।

[পাড়ার আর একটি ছেলে, নাম জগদীশ, আসিয়া দাঁড়াইল]

পণ্ডিতমশাই। এই যে, আমার আর এক অ্যাসিসটেণ্ট এসে গেলেন। (জগদীশকে) তা বাবা জগদীশ, এই ভদ্রলোককে একোনাইট-২০০ এক শিশি দিয়ে পার কর বাবা।

[জগদীশ আদেশ পালন করিতে ভিতরে চলিয়া গেল]

পণ্ডিতমশাই। ওরে সজু, এদিকে আয় দেখি। এই চিঠিটা নে। দেখ্ তো কে লিখেছে। পড়ে দেখ্।

[চিঠিটা লইয়া সজনী এবং রতন দূরে গিয়া একটি বেঞ্চিতে বসিল ও পড়িতে লাগিল]

পণ্ডিতমশাই। (হরিহরকে) ঢাকা থেকে এসেছ—এতদূর এই দিনাজপুরে! এসেছ, তাই দেখা হল। এখানে কোথায় উঠেছ?

হরিহর। উঠেছি একটা হোটেলে।

পণ্ডিতমশাই। দুদিন থাকছ তো?

হরিহর। কেবলই মনে হয় আমি আর বাঁচব না। এই মৃত্যুভয় আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমার এই ভয়টা ঘুচিয়ে দিন পণ্ডিত মশাই, নইলে আমি আর আপনার কাছ থেকে নড়ব না।

পণ্ডিতমশাই। এত ভয় কেন? জান ভাই, মরা মানুষও বাঁচাতে পারতেন বুদ্ধদেব। ও, সে কাহিনী বুঝি জান না?

হরিহর। না। মরা মানুষও বাঁচে?

পণ্ডিতমশাই। হ্যাঁ, বাঁচে।

হরিহর। আপনি বাঁচাতে পারেন?

পণ্ডিতমশাই। বুদ্ধদেবের কৃপায়—হ্যাঁ, আমিও পারি।

মনোহর। বুদ্ধদেব! আপনি না ব্রাহ্ম?

পণ্ডিতমশাই। (হাসিয়া) হ্যাঁ বাবা, আমি ব্রাহ্ম। কিন্তু তাতে কি? বুদ্ধদেবও আমার গুরু। জগতের সকল মহাপুরুষই আমাদের সকলের গুরু।

হরিহর। (মনোহরকে) তুই থাম্। আপনি মরা মানুষ বাঁচাতে পারেন ?

পণ্ডিতমশাই। হ্যাঁ, পারি। বুদ্ধদেবের কাহিনীটা আগে শোন। (সজনী ও রতনকে) এই, তোরাও শোন্। শ্রাবস্তী নগরে এক অভাগিনীর ছিল একটিমাত্র পুত্রসন্তান। তা এমন কপাল, অসুখে ভুগে সে ছেলেটি গেল মারা। বুদ্ধদেব তখন শ্রাবস্তীতে। সিদ্ধপুরুষ বলে তখন তাঁর দেশ-জোড়া খ্যাতি। অলৌকিক তাঁর শক্তি। লোকের ধারণা, মরা মানুষকেও তিনি বাঁচিয়ে তুলতে পারেন। অভাগিনী মা ছুটে গিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে। আমার মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও প্রভু—বলে কাঁদতে লাগল। বুদ্ধদেব বললেন, হ্যাঁ মা, দিচ্ছি। তিল দিয়ে একটা ওষুধ তৈরি করে দেব। মুখে পড়লেই তোমার মরা ছেলে বেঁচে উঠবে। একমুঠো কৃষ্ণ-তিল তুমি আমায় এনে দাও—এমন কোনও বাড়ি থেকে, যে বাড়ির কেউ কখনও মরে নি। পুত্রশোকাতুরা মা ছুটে তখনই বেরিয়ে গেল আনতে।

মনোহর। বুঝলাম।

সজনী। বুদ্ধদেবের খুব বুদ্ধি বলতে হবে।

রতন। নইলে আর বুদ্ধদেব!

হরিহর। (পণ্ডিত মশাইকে) তিল পেল ?

পণ্ডিতমশাই। যে বাড়ির কেউ কখনও মরে নি, সেই বাড়ির তিল তুমি আমায় এনে দিয়ে মর, আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলব ভাই হরিহর।

হরিহর। বুঝলাম, আমিও বুঝলাম।

পণ্ডিতমশাই। কেন বুঝবে না? মৃত্যু একদিন আসবেই। মরতে হবে সবাইকে। আমি তো তার নোটিশ পেয়েছি, তুমি পাও নি ?

হরিহর। নোটিশ! কই না তো।

পণ্ডিতমশাই। (সজনী ও রতনকে) এই ছেলেরা, তোরাও শোন্—নোটিশের কাহিনীটা শোন্। এক জমিদার। তার ছিল এক ভৃত্য—খুব প্রভুভক্ত। প্রভু-ভৃত্যে এত ভালবাসা বড় একটা দেখা যায় না।

সজনী। যেমন পণ্ডিত মশাই, আপনার ঘোড়া আর আপনি।

পণ্ডিতমশাই। (প্রাণ খোলা হাসি হাসিয়া) হ্যাঁ, তা বলতে পারিস। ভৃত্যটির হঠাৎ কলেরা হল। তাকে কিছুতেই আর বাঁচানো যায় না দেখে শেষ মুহূর্তে প্রভু ভৃত্যকে বললেন, ওরে তুই তো যমের দুয়ারে চললি। এত কাল আমার খুবই সেবা করেছিস তুই, যে আদেশ যখনি দিয়েছি, অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিস। মরেও কিন্তু প্রভু-ভৃত্যের এই সম্বন্ধটা রাখিস।

হরিহর। অ্যাঁ? মরেও!

পণ্ডিতমশাই। হ্যাঁ। ভৃত্য মরতে বসেও প্রতিজ্ঞা করল, হুকুম করুন কর্তা, মরেও আমি তা পালন করব। প্রভু তখন বললেন, ওরে দেখ্, তুই যেমন হঠাৎ চট করে মরে যাচ্ছিস, আমাকে এমনি মরতে হলে আমার এত বড় বিষয়সম্পত্তি সব নয়-ছয় হয়ে যাবে। মরতে একদিন হবেই জানি, তবে কবে মরব সময়মত জানতে পারলে বিষয়-আশয় বেশ গুছিয়ে রেখে যেতে পারব। চিত্রগুপ্তের আশেপাশেই তো তুই থাকবি। চালাকি করে আমার মরবার তারিখটা খাতাপত্র থেকে দেখে নিবি। আর বেশ সময় থাকতে যেমন করেই হোক সেটা আমায় তুই জানিয়ে দিবি।

হরিহর। জানিয়েছিল ?

সজনী। হ্যাঃ! কেউ বুঝি তাই জানাতে পারে!

রতন। আঃ! গল্পটা শোন না।

মনোহর। এটা জানানো কি সম্ভব ?

পণ্ডিতমশাই। প্রভু ভৃত্যের কাছ থেকে নোটিশ পাবার আশায় বসে আছেন। নোটিশ আর পান না। বেশ কয়েক বছর বাঁচলেন, তারপর হঠাৎ কয়েকদিনের জ্বরে প্রভু গেলেন মারা। যমালয়ে প্রভু-ভৃত্যে দেখা। প্রভু তো রেগেই কাঁই। ভৃত্যকে বলেন, ওরে ব্যাটা নেমকহারাম, কথা দিয়ে এসেছিলি, কবে মরব—সময় থাকতে তার নোটিশ দিবি। না দেওয়ায় কিছুই আমি গুছিয়ে রেখে আসতে পারলাম না। শেষটায় তুই কি বিশ্বাসঘাতক হলি! এত বড় [illegible]

বলে, হুজুর, নোটিশ তো আমি দিয়ে[illegible] (নোটিশ) দিয়েছি। আপনার দাঁতগুলো একে একে পড়ে যায় নি ? তারপর, চোখে[illegible] পড়ে নি ? পায়ে বাত ধরে নি ?

সজনী। বুঝেছি, বুঝেছি। ওইগুলোই তা নোটিশ ছিল!

পণ্ডিতমশাই। (প্রাণখোলা হাসি হাসিয়া) হ্যাঁ-হ্যাঁ-হ্যাঁ। (হরিহরকে) তা এ নোটিশ তো আমি পেয়ে গেছি ভাই! তুমিও পেয়েছ নিশ্চয়ই। এখন আমাদের তৈরি থাকতে হবে, বুঝলে ভায়া!

[ইতিমধ্যে জগদীশ এক শিশি ঔষধ হরিহরের জন্য লইয়া আসিয়াছে। ঔষধের শিশিটি সে হরিহরের হাতে দিতে গেল]

হরিহর। মৃত্যুভয়ের ওষুধ?

জগদীশ। (হাসিয়া) হ্যাঁ।

হরিহর। এ খেলে কি মৃত্যু আটকাবে? তা যখন আটকাবে না, মরতে যখন হবেই, দু দিন আগে নয় দু দিন পিছে।

পণ্ডিতমশাই। হ্যাঁ ভাই, দু দিন আগে, নয় দু দিন পিছে। রোজই তো লোক মরছে দেখছি। অথচ কি আশ্চর্য, ওই কথাটাই আমরা ভুলে যাই ভাই।

হরিহর। কিন্তু আর ভোলবার উপায় কই? নোটিশ তো আমি পেয়ে গেছি, আর ভুললে চলে না। ভয় না করে বরং আমি তৈরিই থাকব। ও ওষুধ আর আমার দরকার নেই ভাই।

পণ্ডিতমশাই। না না, তবু ওষুধটা খেয়ো। কাল সকালে খালি পেটে খাবে। তোমার আর সব জ্বালা-যন্ত্রণাও যাবে। ঢাকায় ফেরবার আগে আর একবার দেখা করে যেয়ো।

হরিহর। (জগদীশের হাত হইতে ঔষধ লইয়া) সে কথা আর বলতে? আপনিই হলেন সত্যিকার বৈদ্য। দেহের আর মনের ব্যাধি দুই যিনি সারাতে পারেন তাঁকে আর আমি কি বলব? লোকে আপনাকে মহর্ষি বলে।

পণ্ডিতমশাই। লোকে কি না বলে!

হরিহর। ওরা যা খুশী বলুক, আমি বলব আপনি ...ং ঈশ্বর, একটু পায়ের ধুলো—

[illegible] ..., বুকে এস ভাই, বুকে এস।

[illegible] হরিহরকে আলিঙ্গন করিলেন। সেই [illegible] পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিল। [illegible] পিতা-পুত্র চলিয়া গেলন]

[illegible]শাই। (সজনীকে) চিঠিটা পড়েছিস তোরা?

[illegible]ন। শুধু পড়া হয় নি পণ্ডিতমশাই, সজু উত্তরও [illegible]লেছে, কিন্তু উত্তরটা বড় কাব্যধর্মী হয়ে গেছে।

পণ্ডিতমশাই। বটে বটে! কি লিখেছিস, পড় দেখি!

সজনী। (লিখিত পত্র পাঠ)

"কল্যাণীয়াসু,

মা সাবিত্রী, তোমার পত্র পাইয়া বড় ব্যথা অনুভব করিলাম। তোমার প্রাণধন চন্দ্রাবলীর প্রাণধন হইয়া চন্দ্রাবলী-কুঞ্জে রাত্রিযাপন করিতেছে লিখিয়াছ—

পণ্ডিতমশাই। এ সব আবার কি?

সজনী। (সলজ্জভাবে) সাবিত্রী দেবী অনেকটা এই রকমই লিখেছেন পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিতমশাই। থাম্ হতভাগা, থাম্। এ সব চিঠি তোদের পড়বার কথা নয়। কেন পড়লি তোরা ও চিঠি। দে, আমাকে দে। (চিঠিটি ফেরত লইয়া) নাঃ! এখন দেখছি সব চিঠি আমাকেই আগে পড়তে হবে। লিখতে গেলে হাত কাঁপে বলেই জবাব লিখতে তোদের ডাকি, তাই বলে এ সব চিঠি নয়। তোরা বস্। আমি জবাবটা লিখে আনছি।

[চিঠিটি হাতে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেলেন]

জগদীশ। কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড করলি তুই!

সজনী। আমার কি দোষ! উনি না পড়ে দিলেন কেন? জবাব লেখা আমার কাজ, তাই আমি লিখে দিলাম। ভাবলাম, উনি খুশীই হবেন।

রতন। তাই বলে অমন কাব্য করে, রসিয়ে জবাব লিখলি?

সজনী। আঃ! ওই বেশ্যাটির নামই যে চন্দ্রাবলী। আর চন্দ্রাবলী শুনলে কুঞ্জ আর কাব্য আপনা থেকেই আসে।

জগদীশ। চুপ। ওই কে এলেন!

[কলিক রোগাক্রান্ত বিষ্ণু ভট্টাচার্যের প্রবেশ]

বিষ্ণু। এই যে, তোমরা আছ! পড়াশোনা সব ছেড়ে দিয়ে, পণ্ডিত মশাইয়ের ডিস্পেনসারিটা দেখছি তোমাদের একটা আড্ডা করে তুলেছ! তা বেশ, তা বেশ, এখন বল দেখি পণ্ডিত মশাই কোথায়?

সজনী। ভেতরে আছেন।

বিষ্ণু। বেশ বেশ। একটা খবর দিতে পারবে?

রতন। কী, বলুন!

বিষ্ণু। আজ ফুলি মেথরাণীর বাড়ি ওঁর মধ্যাহ্ন-ভোজনের নেমন্তন্ন ছিল।

সজনী। সে আমরা জানি নে।

বিষ্ণু। তোমরা জান না, আমি জানি। জেনে-শুনেই বলছি।

জগদীশ। তা হবে! মেথরাণীদের পণ্ডিত মশাই 'জগৎজননী' 'জগদ্ধাত্রী' মা বলে ডাকেন। মেথর হোক, মুচি হোক আর মুদ্দফরাসই হোক ঘৃণা করেন না উনি কাউকেই। তারা কেউ ওঁকে খেতে নেমন্তন্ন করলে উনি আপনাদের বাড়ির নেমন্তন্নের চেয়ে বেশী আনন্দ পান। নিজের পাথরের থালা আর বাটিটি নিয়ে যান, ভুরিভোজন করে ফিরে আসেন।

বিষ্ণু। জানি হে ছোকরা, জানি। এ সব জানি। তোমরা আর ওঁকে কদিন দেখছ? আমি শুধু একটা কথা জানতে চাই। আজ ফুলি মেথরাণীর বাড়ি থেকে নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে এসে উনি চান করেছেন কি?

সজনী। কেন? চান করবেন কেন?

রতন। চান করেই তো লোকে খেতে যায়!

জগদীশ। খেয়ে উঠে কেউ চান করে নাকি?

বিষ্ণু। ও-সব বাড়িতে গেলে নোংরা-টোংরা মাড়াতে হয় তো! ফিরে এসে চান করবারই কথা।

সজনী। না স্যার। উনি চান করেন নি।

বিষ্ণু। কী করে তুমি জানলে? উনি যখন ফিরে আসেন, তখন কি তুমি ছিলে?

[পূর্বোক্ত চিঠিটির জবাব লিখিয়া উহা একটি খামে পুরিতে পুরিতে পণ্ডিত মশাইয়ের পুনঃপ্রবেশ]

পণ্ডিতমশাই। এই যে, বিষ্ণু যে! কলিক পেনে নাকি খুব ভুগছ?

বিষ্ণু। জানেন দেখছি! ব্যথাটা যখন ওঠে, মনে হয় আত্মহত্যা করি। এত ডাক্তার কোবরেজ দেখালাম, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আজ এরই মধ্যে দুবার ব্যথা উঠে গেছে। আর একবার যদি ওঠে, তা হলে আর বাঁচব না পণ্ডিত মশাই!

পণ্ডিতমশাই। সে কি হে! বাঁচবে না কি! আমি ওষুধ দিচ্ছি।

বিষ্ণু। কিন্তু—

পণ্ডিতমশাই। কিন্তু কি হে। লক্ষণগুলো বল।

বিষ্ণু। কিন্তু—তার আগে আপনি আমায় একটা কথা বলুন পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিতমশাই। কী বাবা!

বিষ্ণু। ফুলি মেথরাণীর বাড়িতে আজ দুপুরে নেমন্তন্ন খেয়েছেন জানি, কিন্তু ফিরে এসে চান করেছেন কি?

পণ্ডিতমশাই। না তো! চান করব কেন?

বিষ্ণু। নাঃ! তবে আর হল না। চলি—

পণ্ডিতমশাই। চলে যাচ্ছ কেন বাবা, কী হল?

বিষ্ণু। আপনাকে ছুঁতে পারব না। আপনার হাতের ওষুধও খেতে পারব না। হাজার হলেও ভটচাযি্য ঘরের ছেলে—জাত খোয়ালে যজমানরা আর ডাকবে না। ব্যারামে মরলেও ভাতে মরতে পারব না। আমি মরলেও ছেলেটার পুরুতের ব্যবসাটা থাকবে।

[কিন্তু এই সময়ই তাহার আবার কলিক পেন উঠিল। যন্ত্রণার সে এক ভয়াবহ দৃশ্য]

বিষ্ণু। ওরে বাবা রে—ওরে মা রে—আবার সেই কলিক। আবার সেই শূল-ব্যথা।

[বেদনায় অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাঁজ হইয়া পড়িল ও আবর্তন সহকারে কাতরাইতে লাগিল]

সজনী। 'উদরে যন্ত্রণাপ্রদ বেদনা, তজ্জন্য রোগীর অবশীর্ষ হইয়া দ্বিভাঁজ হইয়া থাকা, তৎসহকারে অস্থিরতা—'

রতন। দেখছ না, দু হাতে কেমন করে পেটটা চেপে ধরেছে! তার মানে, 'শক্ত প্রচাপনে উপশম।'

জগদীশ। তার মানে 'কলোসিন্থিস'।

পণ্ডিতমশাই। যা বলেছিস। এখনি এক ডোজ খেলে সেরে যায় কিন্তু বাবা বিষ্টু।

বিষ্ণু। আপনি না। আপনার ওই ছাত্রদের কাউকে ওই ওষুধটা দিতে বলুন।

সজনী। কিন্তু আমি তো[illegible] ...শাইকে এই আগেও ছুঁয়েছি। তারপর আমার তো[illegible]

রতন। আমারও ঠিক ওই একই ব্যা[illegible]

জগদীশ। আমারও। আমরা কেউ[illegible]

আপনার জাতটা থাকছে না ভটচাযি্য খুড়ো।

বিষ্ণু। পণ্ডিত মশাই, তবে কী হবে? [illegible]

আমি আর বাঁচব না?

পণ্ডিতমশাই। ওরে, মেথরের বাড়িতে থেয়ে আমি তো পতিত। শত ডুবেও শুদ্ধ হব না। তোরাই না হয় কেউ বাবা, একটা ডুব দিয়ে এসে ওষুধটা খাইয়ে দে।

সজনী। অবেলায় ডুব দেওয়া আমার সইবে না পণ্ডিত মশাই।

রতন। আমি সবে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছি। আমি পারব না।

জগদীশ। আমার সর্দি-কাশির ধাত। ডুবার চান করলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া।

বিষ্ণু। দে বাবা, আর পারি নে, আর ডুব দিতে হবে না। ওষুধ দে। আগে প্রাণে বাঁচি, তারপরে জাত—

পণ্ডিতমশাই। (ছেলেদের প্রতি অনুনয়ে) দে বাবা, দে। দু শো শক্তির এক ডোজ কলোসিন্থ দে। ওর এ কষ্ট আর চোখে দেখতে পারছি না।

[জগদীশ ছুটিয়া অন্দরে চলিয়া গেল]

বিষ্ণু। তোরা আয় বাবা, আমার পেটটা একটু জোরে চেপে ধর্।

[সজনী ও রতন এ অনুরোধ রক্ষা করিল। ইতিমধ্যে জগদীশ ছুটিয়া আসিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া দিল। সকলে রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঔষধের ফল ফলিবার অপেক্ষায় রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঔষধে মন্ত্রবৎ কাজ হইল। স্পষ্ট দেখা গেল, বিষ্ণু ভট্টাচার্য ক্রমশঃ আরাম পাইতেছেন। ব্যথা দূর হইল]

রতন। ব্যথাটা তবে গেল ?

বিষ্ণু। হ্যাঁ, বাবা। তাই তো মনে হচ্ছে।

জগদীশ। ম্যাজিক।

সজনী। Miracle ! সত্যিই miracle !

বিষ্ণু। না না, বলা যায় না। এরকমও হয় যে [illegible]মে গেল, আবার এল।

পণ্ডিতমশাই। বেশ তো, খানিকটা সময় এখানে বসে দেখে[illegible]না!

[illegible], সেই ভাল ভটচায খুড়ো।

[illegible]বাড়ি যাবেন, চান করবেন, আবার ব্যথা [illegible] ওষুধ খেতে এখানে আসবেন, আবার [illegible]চান করতে হবে।

[illegible]শ। ফুল, নির্ঘাৎ নিউমেনিয়া।

[illegible]। তোমরা ছোকরারা খুব মজা পেয়েছ না ? [illegible] বটতলার আড্ডায় খুব ঢাক-ঢোল পিটিয়ে গল্পটা রটাবে, না ? (কাঁদো-কাঁদো ভাবে) দেখুন তো পণ্ডিত মশাই—

পণ্ডিতমশাই। (ছেলেদের প্রতি) না হে না। এই রতন, আমি সেই চিঠিটার জবাব লিখে এনেছি, তুই তোর সাইকেলে চেপে যা তো বাবা! চিঠিটা প্রাণধনের বাড়িতে তার স্ত্রীকে দিয়ে আয়। মা লক্ষ্মীকে গিয়ে বলে আয়, তার ছেলে গোপালকে যেন এখনি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়। যদি সম্ভব হয়, তোর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে চলে আয়। যা বাবা যা, শিগগির যা।

[রতন তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল]

বিষ্ণু। প্রাণধন ? হতভাগা !

পণ্ডিতমশাই। কেন, সে আবার তোমার কী করল বিষ্টু !

বিষ্ণু। স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার সব ছেড়ে দিয়ে, চন্দ্রাবলী নামে একটা মেয়েমানুষের পাল্লায় পড়ে একেবারে গোল্লায় গেছে।

পণ্ডিতমশাই। তোমার ব্যারামটা দেখছি বেশ সেরে গেছে বিষ্টু !

[সজনী ও জগদীশ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল]

পণ্ডিতমশাই। (বিরক্ত হইয়া) আঃ !

[জগদীশ ও সজনী সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করিয়া ভাল মানুষটি সাজিল। একটি ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া থামিবার শব্দ পাওয়া গেল]

জগদীশ। কে যেন এলেন।

পণ্ডিতমশাই। কিন্তু আমাকে তো রোগী দেখতে এখনি বেরুতে হবে।

হ্যাঁ। (ঘড়িটা দেখিয়া) এখন না বেরুলে সন্ধ্যায় ফিরে এসে ছাত্রদের নিয়ে ক্লাস করতে পারব না।

[অবগুণ্ঠনবতী একটি রুগ্না নারীকে ধরিয়া লইয়া এখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন এক ভদ্রলোক। ইনিই প্রাণধন]

বিষ্ণু। (সবিস্ময়ে) একি ! প্রাণধন তুমি !

[প্রাণধন আসিয়াই পণ্ডিত মশায়ের পায়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন]

পণ্ডিতমশাই। একি ! একি ! ওঠ বাবা ওঠ।

[প্রাণধন উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অবগুণ্ঠনবতী চন্দ্রাবলী ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে বোঝা গেল]

প্রাণধন। (কাঁদিতে কাঁদিতে) এই মেয়েটির যক্ষা হয়েছে পণ্ডিত মশাই!

বিষ্ণু। হয়েছে তো! হতেই হবে, হতেই হবে। এ বাবা সতী সাধ্বীর দীর্ঘশ্বাস যাবে কোথায়?

পণ্ডিতমশাই। (বিরক্ত হইয়া) তাই যদি হয়, তোমার কেন শূল বেদনা হল? সেটাও তবে ভেবে দেখ। (চন্দ্রাবলীকে) এস মা, আমার সঙ্গে ভেতরে এস। (প্রাণধনকে) তুমিও এস বাবা প্রাণধন।

[পণ্ডিত মহাশয় উভয়কে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন]

বিষ্ণু। কোথায় শূল বেদনা আর কোথায় যক্ষা। শূলের ব্যথা কার না হচ্ছে? যে একটু বেশী ঝাল খায় তারই হচ্ছে!

জগদীশ। আর আপনার সে ব্যথাটা একেবারে সেরেও গেল দেখছি।

সজনী। যদি কোন পাপে আপনার ওই শূল যন্ত্রণা হয়েই থাকে, এখন যখন সেরে গেছে, আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

বিষ্ণু। মস্করা হচ্ছে! আমার সঙ্গে মস্করা হচ্ছে? গুরুজনের ওপর তোমার এই আচরণের কথা আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে বলব।

সজনী। তাতে হয়তো আমি দু-চারটে কানমলা খাব, কিন্তু মেথরাণীর ছোঁয়া পণ্ডিতের দেওয়া ওষুধ খাওয়ার কথাটা তাতে কি আরও বেশী রটনা হবে না ভটচায মশাই!

বিষ্ণু। না না বাবা, ও আমি কথার কথা বলছিলাম। কিন্তু তোমরাও বল দেখি, এত বড় দুশ্চরিত্র একটা লোককে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া পণ্ডিত মশাইয়ের উচিত হল কি? নিজের স্ত্রী-পুত্রকে এক রকম অনাহারে রেখে ওই লোকটা একটা বাজারের মেয়েমানুষের পিছে তার বেতনের সব টাকাটা ঢালছে—কত বড় নরাধম বল দেখি।

[পণ্ডিত মহাশয় বাহিরে আসিলেন। তাঁহার পশ্চাতে রোরুদ্যমানা চন্দ্রাবলীকে ধরিয়া লইয়া প্রাণধনও আসিলেন]

পণ্ডিতমশাই। (প্রাণধনকে) তোমরা বাড়ি যাও।

প্রাণধন। চলে যাব?

চন্দ্রাবলী। তবে কি আমাকে দয়া করবেন না বাবা?

প্রাণধন। চিকিৎসা করবেন না? ওষুধ দেবেন না?

পণ্ডিতমশাই। আমাকে ভাবতে হবে। তুমি বাড়ি যাও মা। আমি পুথি-পুস্তক ঘেঁটে আবার তোমাকে দেখতে যাব মা।

চন্দ্রাবলী। না না, আমার বাড়ি আপনি যাবেন না বাবা। ও নোংরা পাড়ায় আপনি যাবেন না।

পণ্ডিতমশাই। ওরে পাগলি, মায়ের বাড়ি যত নোংরাই হোক, তবু সেটা মায়ের বাড়ি। ছেলের না গিয়ে উপায় কি? তুমি বড় দুর্বল। হাঁটাহাঁটি আর করবে না। তোমার সবচেয়ে বড় দরকার এখন বিশ্রাম। (প্রাণধনকে) আর ওইসব পথ্য—যা তোমাকে বললাম।

চন্দ্রাবলী। সে তো অনেক খরচ বাবা! উনি কি তা পারবেন? সামান্য মাইনে। নিজের একটা সংসার আছে। তবু উনিই আমাকে দেখছেন—যদ্দূর পারেন করছেন। আমার এই ব্যাধি দেখে আমার কাছে আর কেউ আসে না বাবা!

পণ্ডিতমশাই। ওর প্রাণধন নাম মিথ্যে হয় নি মা! ওর প্রাণ আছে। তোমার ভাবনা ও ভাবছে, ওর সংসারের ভাবনা—সে না হয় আমিই ভাবব মা!

প্রাণধন। এ আমি কী শুনছি! এত বড় একটা বোঝা তুমি মাথায় নিলে বাবা?

পণ্ডিতমশাই। আমার এ বোঝাটা তবু হালকা বাবা, কিন্তু তুমি যে ভার মাথায় তুলে নিয়েছ, কটা মানুষ তা নেয়! (চন্দ্রাবলীকে) তোমার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে, আমি বুঝতে পারছি। প্রাণধন, তুমি আর দেরি করো না বাবা, ওকে গাড়ি করে নিয়ে যাও ওর বাড়ি। শিগগির যাও বলছি—নইলে এর পর তুমি আর যেতে পারবে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তোমার গোপাল আসছে—গোপাল আসছে। তোমরা এখন চলে যাও—চলে যাও।

[চন্দ্রাবলীকে ধরিয়া লইয়া প্রাণধ[illegible] [illegible]রে দিকে চলিল]

বিষ্ণু। কিন্তু এটা কি আপনি ভাল[illegible] মশাই? ওই দুশ্চরিত্র লোকটাকে—

পণ্ডিতমশাই। দুশ্চরিত্র! কিন্তু ইচ্ছে ক[illegible] লোকটি এর চেয়েও খারাপ হতে পারত— মেয়েটিকে তার এই অসময়ে ছেড়ে যেত।

[প্রাণধনের বালক-পুত্র গোপালকে লইয়া রতনের প্রবেশ। প্রাণধনের সামনে গোপাল আসিয়া পড়িতেই প্রাণধন ও গোপাল উভয়েই চমকিয়া উঠিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল]

প্রাণধন। গোপাল!

গোপাল। বাবা!

প্রাণধন। তোর কি হয়েছে গোপাল?

[গোপাল কোনও উত্তর দিল না। সে ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল বারান্দায় পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে। বাবার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রতন সজনীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল]

প্রাণধন। (গোপালের উদ্দেশে) আমার সঙ্গে তুই কথা বলবি না, আমি জানি। তোর মাও বলে না। তুই তোর মাকে বলিস গোপাল, আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তই করছি। আর তারই ফলে আজ তোদের ভাবনা ভাবছেন ওই পণ্ডিত মশাই—ওই দেবতা।

[চন্দ্রাবলীকে লইয়া প্রাণধনের প্রস্থান]

পণ্ডিতমশাই। (গোপালকে বুকে টানিয়া লইয়া) তোর গলা দিয়ে একদিন রক্ত পড়েছিল বাবা?

গোপাল। হ্যাঁ। আর সেই থেকে মা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। বাবা বাড়িতে আসে না, মা রাতদিন শুধু কাঁদে।

বিষ্ণু। কাঁদবারই কথা।

পণ্ডিতমশাই। তুমি থাম বিষ্টু। বেশী বকলে তোমার ব্যথাটা হয়তো আবার—

বিষ্ণু। ওরে বাবা! আমি চলে যাচ্ছি পণ্ডিত মশাই। হ্যাঁ, এসব দেখলে মুখ বুজে থাকা মুশকিল—তার চেয়ে আমার চলে যাওয়াই ভাল।

[বিষ্ণু ভট্টাচার্য ত্বরিৎপদে প্রস্থান করিলেন। সজনীকান্ত, জগদীশ ও রতন হাসিয়া উঠিল]

পণ্ডিতমশাই! তোরা বড় হাসিস! তা ভাল—হাসা ভাল। তোদের কোন্ কবি যেন গান লিখেছেন 'হেসে নাও দুদিন বই তো নয়।' (গোপালকে) চল্ বাবা আমার সঙ্গে।

গোপাল। কোথায়?

পণ্ডিতমশাই। তোমাদের বাড়ি।

সজনী। ঘোড়ারগাড়িটা জুত্‌তে বলব?

প[illegible], ঘোড়াটা পায়ে একটা চোট [illegible] [illegible]ন তুই আর ওকে বের করব না। আমি [illegible]ব। কাছেই তো! আয় গোপাল, চল্ তোর [illegible]বার দেখে আসি।

[illegible]ল। অসুখ আমার, মার তো কোনও অসুখ [illegible]।

পণ্ডিতমশাই। না [illegible] অসুখের জন্যে নয়। তা বেশ [illegible]র হয় নি [illegible]তো, তাঁকে যে কথাটা আমি বলবার জন্যে যাচ্ছিলাম, তুই পারবি তাঁকে সে কথাটা বলতে?

গোপাল। কী বলতে হবে?

পণ্ডিতমশাই। বলবি, পণ্ডিত মশাই বলেছেন, অমাবস্যা পার হয়ে গেছে—পূর্ণিমা আসছে। পারবি বলতে?

গোপাল। কেন পারব না? বলব পণ্ডিত মশাই তোমাকে বলেছেন মা, অমাবস্যা পার হয়ে গেছে—পূর্ণিমা আসছে।

পণ্ডিতমশাই। বাঃ। ঠিক বলতে পেরেছিস। তুই পারবি। তবে আজ আর আমি তোদের বাড়ি যাব না। চল্ দেখি ভেতরের উঠোনে। তোর গলাটা আমি ভাল করে দেখব। হ্যাঁ, এখনও সূর্যের আলো আছে। আয় আমার সঙ্গে।

[গোপালকে লইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন]

জগদীশ। সূর্যের আলোটা এই বাইরের উঠোনেও ছিল। ব্যাপারটা কি বুঝলে?

সজনী। সে আর বুঝি নি? তবে অ্যাদ্দিন কী দেখছি?

রতন। সংসার খরচের কিছু টাকা গোপালের হাতে গুঁজে দেবেন।

জগদীশ। নিশ্চয়ই তাই। আমি দেখছি।

[জগদীশ ভিতরে চলিয়া গেল]

রতন। পণ্ডিত মশায়ের ওপর তোর লেখা কবিতাটা অর্ধেক শোনা হয়েছে। বাকি অর্ধেকটা পড়্ দেখি। এই পরিবেশে তোর লেখাটার সব দোষ ঢাকা পড়ে যাবে।

সজনী। অর্থাৎ অমাবস্যা পূর্ণিমা হবে! শুনবি? শোন্:

[কবিতা পাঠ]

"আপনার শান্তিসুখ হে সন্ন্যাসী, দিলে বিসর্জন
নিবারিতে দুঃখশোক তাপিতজনের। না করিলে
ভীষ্মসম দারপরিগ্রহ। পূজিলে আজন্মকাল
মাতৃজ্ঞানে রমণী জাতিরে। তুমি চাও পারে যেন
এই ভ্রষ্টজাতি ধর্মরূপ বর্মমাঝে লভিবারে
পরম আশ্রয়। ঘৃণা নাহি করি পতিত-অন্ত্যজে
বুঝে যেন এরা সার—মানুষের কর্তব্য মহান
স্নেহ করা তাপিতেরে, প্রেম করা দীনহীনজনে।
ভুবনমোহন তুমি, যশ চাহ নাই এ ভুবনে
একাকী নীরবে শুধু করিয়াছ দুঃস্থজনসেবা,
তোমারে প্রণমি' করি এ প্রার্থনা দেবতার কাছে—
তোমার আদর্শ যেন ঠাঁই পায় প্রতি ঘরে ঘরে।"

॥ যবনিকা ॥

চার্লস ল্যাম

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যারিস্টার মিঃ স্যামুয়েল সল্টের কেরানী জন ল্যাম। শুধু কেরানী নয়; দরকার হলে চাপরাশির কাজও করতে হয়। হাসিমুখেই সব কাজ করেন ল্যাম। ব্যারিস্টারের ডান হাত। ক্ষুদ্রাকৃতি কৃশকায় মানুষ। পাখির মত ছোট ছোট চোখ; উঁচু নাক সামনের দিকে বাঁকা হয়ে নেমেছে। কাজ করতে করতে কখনও গুনগুন করে গান করেন। কিছু কিছু পদ্য লেখারও হাত আছে। স্ত্রী এলিজাবেথের সঙ্গে তাঁর কোনও দিক থেকেই মিল নেই। এলিজাবেথের তুলনায় জন মাথায় এবং ব্যক্তিত্বে খাটো। বিবাহিত জীবনে এলিজাবেথের সুখ নেই। উঁচু স্তর থেকে স্বামীর সংসারে নীচু স্তরে নেমে এসেছেন। এখন আর উপায় নেই; তাঁর মনের ক্ষোভে সর্বদা সংসারে থমথমে ভাব বিরাজ করে।

১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। এলিজাবেথের সর্বশেষ সন্তানের জন্ম হল। পুত্রসন্তান। বাঁচবে তো? সকলের মনে কেবল এই আশঙ্কা। ক্ষুদ্রকায় দুর্বল শিশু; শুধু চামড়া দিয়ে কাঠির মত সরু সরু হাড় কখানা জুড়ে রাখা হয়েছে। সকলের আগে চোখে পড়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের মাথাটি। এর পূর্বে ছটি সন্তানের মধ্যে মাত্র দুটি বেঁচে আছে—একটি ছেলে, একটি মেয়ে। জন্ম থেকেই যার এমন স্বাস্থ্য তার বাঁচবার আশা কোথায়?

কিন্তু আশ্চর্য, সে বাঁচল। মায়ের তার প্রতি কোনও আকর্ষণ নেই। মা ভালবাসেন বড় ছেলেকে, কারণ সে মামারবাড়ির ধারা পেয়েছে। কিন্তু এই ছোট ছেলে পেয়েছে বাবার চেহারা; শীর্ণ তোবড়ান দেহপিণ্ডের দিকে চাইলেই তার মন বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে। পিসিমা সারা ল্যাম এবং দিদি মেরি এই শিশুর ভার গ্রহণ করল। পিসিমা ভাইয়ের সংসারেই আছে; সংসারে তার আর কোনও অবলম্বন নেই। দশ বছরের মেয়ে মেরিরও বাড়িতে সঙ্গী নেই; দাদা বোর্ডিংয়ে থেকে স্কুলে পড়ে। সুতরাং এ দুজন শিশুকে মানুষ করবার দায়িত্ব পিসিমা সাগ্রহে গ্রহণ করল। নামকরণের পূর্বে মৃত্যু হলে পাছে নরকবাস করতে হয় এই ভয়ে জন্মের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাড়াহুড়া করে নামকরণ করা হয়েছে। শিশুর নাম রাখা হয়েছে চার্লস, চার্লস ল্যাম।

চার্লস একটু একটু করে হাঁটতে শিখল। সরু সরু পা, বড় মাথা; দেখতে লাটিমের মত। দিদির পিছনে পিছনে ঘোরে; কখনও বা পিসিমার কোলে বসে গল্প শোনে। চার্লস কথা বলতে শিখেছে অনেক দেরিতে। প্রথম প্রথম জড়ানো কথা শুনে সবাই ভেবেছে এটা আদুরে ছেলের ন্যাকামি। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল চার্লস তোতলা; মাঝে মাঝে কথা বেশ আটকে যায়।

কথা বলতে বাধত; এর ক্ষতিপূরণ হিসাবেই বোধ হয় চার্লস মাত্র পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে দ্রুত বই পড়তে শিখল। হাতের লেখাও ওই বয়সেই বেশ গোটা গোটা সুন্দর। এত অল্প বয়সে এমন লেখা ও পড়ার ক্ষমতা দেখে লোকে বিস্মিত হয়ে যেত। দিদি অবশ্য তাকে অধিকাংশ গল্পের বই পড়ে শোনাত। ভাই বোনের অধিকাংশ সময় কাটত রূপকথার রাজ্যে। বিকেলবেলায় পার্কে বেড়াতে যেত। পিসিমাও প্রায়ই তাদের সঙ্গী হতেন। দিদি আর পিসিমাকে নিয়েই তার জগৎ। বাবা ছিলেন একটু দূরে, মা আরও দূরে।

পাঁচ বছর বয়স পূর্ণ হতে তখনও কয়েকদিন বাকি আছে; চার্লস অসুখে পড়ল। ডাক্তার এসে বলল, বসন্ত। তখনকার দিনে বসন্তকে মনে করা হত সাক্ষাৎ যম। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল সবাই। চার্লসের দাদা তখন স্কুলের ছুটিতে বাড়ি এসেছিল; সে আবার বোর্ডিংয়ে ফিরে গেল। সেবা করবে কে? মার [illegible]গ্রহ নেই। দিদি আর পিসির মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে [illegible]ত মেরির। এমন কঠোর পরিশ্রম বুড়ী পিসিমার [illegible]ক্ষে [illegible] নয়। মেরির বয়স তখন মাত্র পনের। শুধু [illegible] আশঙ্কা নয়। আছে রূপ বিকৃত হবার ভয়। [illegible] জীবন সামনে পড়ে আছে। বিকৃতরূপা তরুণীর ভাব[illegible] জীবনের সকল সম্ভাবনা[illegible]ও থারা[illegible] মুছে যাবে। তবু [illegible]

[illegible]র এই অসময়ে ছে[illegible]

কিছু উপেক্ষা করে মেরি প্রাণ দিয়ে সেবা শুরু করল। মেরি আর চার্লস বিভীষিকা, অস্পৃশ্য; কিছুদিনের জন্য তারা দুজন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল সংসার থেকে। যমে মানুষে টানাটানি। সাতদিন ধরে চার্লস অজ্ঞান। ডাক্তারের কোনও আশা নেই। তবু আশ্চর্য, এমন ভঙ্গুর দেহে এমন দুর্দমনীয় প্রাণশক্তি। চার্লস চোখ খুলল, উঠে বসল, বেঁচে গেল। আরও সৌভাগ্যের কথা, বসন্তের বিষ মেরিকে স্পর্শ করল না।

কিন্তু এর চেয়ে মারাত্মক বিষ প্রবেশ করেছে মেরির দেহে। একদিন অকস্মাৎ তা প্রকাশ পেল। মেরির বয়স তখন ষোল। চার্লসকে নিয়ে একদিন বেড়াতে বেরিয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে দাঙ্গার সামনে পড়ে গেল। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে দাঙ্গা। লণ্ডনের প্রকাশ্য রাজপথে দাঙ্গা চলেছে। মেরি ভয় পেয়ে একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু সম্পূর্ণ রক্ষা পেল না। এক দাঙ্গাবাজ মাতাল নির্জনতার সুযোগ পেয়ে আক্রমণ করল মেরিকে। এক ভদ্রলোক এসে না পড়লে কী হত সেদিন বলা যায় না। তবু যতটা লাঞ্ছিত হয়েছে তার আঘাতেই মেরির মন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। এক সপ্তাহ যাবৎ সে শয্যাশায়ী হয়ে রইল; কথা ও ...না অসংলগ্ন। প্রায় উন্মাদ। মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে।

মেরির জীবনে এই প্রথম উন্মত্ততা। হয়তো পুরোপুরি ...য়, কিন্তু মস্তিষ্কবিকৃতির সুস্পষ্ট লক্ষণ পাওয়া গেল। ...শয়ের কোনও অবকাশ ছিল না। মা তো কথায় কথায় ...লেন, পাগলের গোষ্ঠী! জন ল্যামের মাথায় ছিট ...াছে। বুড়ী পিসিমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে তো ...কলেরই সন্দেহ। বংশপরম্পরায় মেরির মধ্যেও যে ...লামির বিষ আসতে পারে এমন আশঙ্কা কারও কারও ...ছিল। প্রথম বার ...রি তাড়াতাড়ি সেরে উঠল। ...র (...বন বেঁচে ছিল ঘুরে ঘুরে রোগ ...প্রায় প্রত্যেক বছরই তাকে কিছু সময়ের জন্য ...থাকতে হয়েছে।

... পরে মেরি চার্লসকে সঙ্গে করে দিদিমার ...কসওয়ারে বেড়াতে গেল। দিদিমা জাঁদরেল মেয়ের বিয়ে ভাল ঘরে হয় নি বলে তাঁর মনে সর্বদা ক্ষোভ ছিল। চার্লসের চেহারা জামাইয়ের মত হয়েছে দেখে তিনি বিরূপ মনে নাতিকে গ্রহণ করলেন। দিদিমার প্রতিবেশীর মেয়ে অ্যান সিমসন চার্লসের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হয়ে উঠল। লণ্ডনের বাইরে চার্লসের এই প্রথম আসা। দিদিমা, অ্যান ও ব্লেকসওয়ার চার্লসের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী জীবনে চার্লস তাঁর রচনায় এদের অমর করেছেন।

লণ্ডনে ফিরে এসে চার্লস স্কুলে ভর্তি হল। কিছুকাল ছোট দুটো স্কুলে কাটিয়ে চলে এল ক্রাইস্ট হসপিট্যাল বিদ্যালয়ে। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে এই বিদ্যালয়ের নাম নানা কারণে অমর হয়ে আছে। এখানে চার্লসের সঙ্গে আলাপ হল কোলরিজের। আজীবন দুজনের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিদ্যালয়ে মোটা একটা বাঁধানো খাতা রাখা হত। যে সব ছাত্র ভাল লিখত শিক্ষক অনুমোদন করলে তাদের লেখা এই খাতায় স্থানলাভ করত। কোলরিজের কয়েকটি কবিতা আগেই স্থান পেয়েছে। চার্লস ভয়ে ভয়ে তারও কয়েকটি কবিতা শিক্ষককে দেখতে দিল। শিক্ষক কবিতা দেখে খুশী হলেন। একটি কবিতা স্কুলের খাতায় উঠল। চার্লসের লেখা এই প্রথম সমাদৃত হল।

কিন্তু চার্লসের স্কুলে থাকা আর সম্ভব হল না। বাবার পক্ষে একা সংসারের দায়িত্ব বহন করে পড়ার খরচ চালানো কঠিন। আর পড়েই বা কী হবে? এই তো স্বাস্থ্য, এই চেহারা; তার উপরে তোতলা। ভাল চাকরি পাবে না; ব্যারিস্টার, শিক্ষক বা পাদ্রি হতে পারবে না। সুতরাং এখনই চাকরি শুরু করা ভাল। দাদাও চাকরি করছে। বাবা তাঁর মনিবকে বলে চার্লসকে একটি চাকরি সংগ্রহ করে দিলেন। সওদাগরী আপিস 'সাউথ সী হাউসে' চাকরি। বেতন মাসে পঁচিশ টাকা। চার্লসের বয়স তখন পনের পূর্ণ হয় নি।

সাউথ সী হাউসের হিসাব-বিভাগে আঠারো মাস চাকরি হল। সকাল নটা থেকে বিকেল ছটা পর্যন্ত আপিস। বাড়ি থেকে আপিস বেশ দূর। চার্লস দু বেলা হেঁটেই যাতায়াত করত। হাঁটতে তার ভাল লাগে। পথে যত বইয়ের দোকান আছে, সকালে বিকেলে তাদের শো-কেস দেখা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল।

এই কিশোর কেরানীকে আপিসের কর্তা স্নেহ

করতেন। তাঁরই চেষ্টায় চার্লস ইণ্ডিয়া হাউসে একটি চাকরি পেল। সেখানে চাকরির ভবিষ্যৎ অপেক্ষাকৃত ভাল। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরি পেলে তখন অনেকেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করত।

নতুন চাকরিতে যোগ দেবার কয়েক দিন বিলম্ব আছে। চার্লস এই ফাঁকে দিদিমার বাড়ি বেড়াতে এল। দশ বছর পরেও ব্লেক্‌সওয়ার বিশেষ পরিবর্তিত হয় নি। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে অ্যান সিমন্‌সের সঙ্গে দেখা হল। দশ বছর পূর্বে যে ছোট মেয়েটির সঙ্গে খেলা করেছে, সে এখন ষোল বছরের তরুণী। চার্লস তার চেয়ে বছর খানেকের বড়। অপরিচিত জায়গায় ছেলেবেলার সঙ্গিনীকে নতুন করে পেয়ে খুব আনন্দ হল চার্লসের। দুজনে এক সঙ্গে বেড়াতে বেরুত, গল্প করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অ্যানের মা তাকে বেশ যত্ন করতেন। চার্লস লণ্ডনের ছেলে হলেও অনাত্মীয়া মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পায় নি। শহরের মেয়েরা চার্লসের মত ছেলেকে আমল দেয় না। ওই তো চেহারা! কাঠির মত সরু সরু পা; বেমানান বড় মাথা; দূর থেকে লাটিমের মত দেখতে; তার উপর তোতলা। এখানে অ্যানের কাছে চার্লসের আছে স্বতন্ত্র মূল্য। সে লণ্ডনের ছেলে, কাজ করে বড় আপিসে। তা ছাড়া অ্যানের হৃদয় মমতায় পূর্ণ, মফস্বলের প্রকৃতির মত। চার্লস মুগ্ধ হল, আত্মবিস্মৃত হয়ে ভালবাসল অ্যানকে। তার চেয়ে বড় কথা, লণ্ডনে ফিরে আসবার আগেই সে জেনে এল অ্যানও তাকে ভালবাসে। দুজনেই প্রতিশ্রুতি দিল তারা পরস্পরকে ভালবাসবে, কোনও বাধা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আনতে পারবে না। বর্ষার জল যেমন শূন্য শুষ্ক খাল-বিল-পুকুর পূর্ণ করে দেয়, তেমনই ভালবাসার বন্যা চার্লসের জীবনের সকল শূন্য স্থানগুলি পূর্ণ করে দিল।

এক বছর পরে মেরিকে নিয়ে চার্লস আবার বেড়াতে এল দিদিমার বাড়ি। এবার অ্যানের সঙ্গে চার্লসের ঘনিষ্ঠতা দিদিমার চোখে পড়ল। চার্লস ও অ্যানের সম্পর্ক আর এক ধাপ এগিয়েছে। চার্লস অ্যানকে বিয়ে করবে। চার্লস ও মেরি চলে যাবার পর অ্যানের মা-বাবা এলেন দিদিমার সঙ্গে ওদের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। দিদিমা বিস্মিত হয়ে বললেন, পাগলের বংশে মেয়ের বিয়ে দিতে চাও? তোমরাও কি পাগল হয়েছ? চার্লসের জ্যেঠামশাই পাগলা-গারদে মারা গেছে; ওর পিসিমা পাগল; বাবার মাথায় ছিট আছে। আর এই যে শান্ত মেয়ে মেরিকে দেখলে, কয়েক বছর আগে সেও পাগল হয়ে গিয়েছিল।

সিমন্‌স্ দম্পতি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন যে, দিদিমার নির্মম সত্যপ্রীতির জন্য তাঁরা এমন ভয়াবহ খবরটা আগেই জানতে পেরেছেন।

ওদিকে লণ্ডন পৌঁছে চার্লস তার দিনলিপিতে লিখল: আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের সপ্তাহ কাটিয়ে এলাম। আজ মনে হয় কোনও মানুষেরই বুঝি এত সুখ পাবার অধিকার নেই। অ্যানকে ঘরে আনাই আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

লীডেন হল স্ট্রীটের ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসে চার্লসের নতুন চাকরি শুরু হল। বত্রিশ বছরের দীর্ঘ চাকরি-জীবনের আরম্ভ। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের হিসাব রাখার কাজ। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত মোটা খাতার পৃষ্ঠাগুলি একে একে পূর্ণ করে হিসাবের জটিল অঙ্ক দিয়ে। আপিসের কাজ তার খারাপ লাগে না। কিন্তু একমাত্র অ্যানের চিন্তা ছাড়া অন্য কোনও কিছুতে তার মন নেই। অ্যানের কাছ থেকে যেমন ঘন ঘন আবেগপূর্ণ চিঠি যাবে বলে আশা করেছিল, তেমন চিঠি পায় না। সংবাদ এল দিদিমার মৃত্যু হয়েছে। দিদিমার বাড়ি বেড়াতে গিয়ে অ্যানের সঙ্গে দেখা করবার সম্ভাবনাটাও দূর হয়ে গেল।

এখন চার্লসের অবসর সময়ের অধিকাংশ কাটে এলিজাবেথান নাট্যকারদের নাটক পড়ে। অন্যের লেখা পড়তে পড়তে নিজের লেখার আকাঙ্ক্ষা হল। লি[illegible] কিছু উপরি আয় হলে বেশ হয়। যে মাইনে পায় [illegible] উপর নির্ভর করে বিয়ে কর[illegible] যায় না। রাজনৈতি[illegible] কবিতা কয়েকটি পাঠাল সংবা[illegible] ছাপা[illegible] সব ফেরত এল। কোলরিজ চার্লসের সবচে[illegible] বন্ধু। তাঁরই সুপারিশে চার্লসের চার[illegible] কাব্য-সঙ্কলনে ছাপা হল। সাহিত্যের [illegible] নিয়েই প্রথম প্রবেশ চার্লসের। এইটুকু সাম[illegible] তাঁর সে সময়কার সমস্যাজর্জর জীবনের একম[illegible]

মেরির জীবনে আবার অন্ধকার নেমে এসেছে। এবার কয়েক মাস যাবৎ সে উন্মাদ হয়ে রইল। বাবার স্বাস্থ্য খুব খারাপ, তার উপর মনে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি ক্রমশঃ যেন লোপ পেয়ে যাচ্ছে। মার শরীরও খুব খারাপ, সর্বদা তাঁর কাছে কারও থাকা প্রয়োজন। আর আছে অথর্ব বুড়ি পিসিমা। সব ভার চার্লসের উপর। দাদা অন্যত্র থাকে।

যাকে নিজের চেয়েও বেশী ভালবাসে তার কাছে তো কিছুই গোপন করবার নেই। চার্লস অ্যানকে লিখল মেরির অসুখের কথা। এতদিন অ্যান দ্বিধা করছিল। এই চিঠি পেয়ে আর কোনও সংশয় রইল না। চার্লস তার বিংশতি জন্মদিবসে অ্যানের পত্র পেল। অ্যান লিখেছে: আমরা ভুল করেছিলাম। সেই ভুলকে আর বেশীদূর টেনে নিয়ে লাভ নেই। আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ হোক। আর চিঠি লিখে কী হবে? তুমি রাগ করো না।

চার্লসের জীবনের ভিত্তিভূমি বিচলিত হল। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। এমন ভালবাসা নেই সংসারে যা লাভ-ক্ষতির হিসাব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে, যে মেয়েটিকে ভালবেসেছিল কোলরিজ! সম্প্রতি তাকে বিয়ে করেছে। বন্ধুর সঙ্গে তুলনা করে নিজের জীবনের ব্যর্থতা বড় হয়ে দেখা দিল।

মেরি এখন সুস্থ হয়েছে। চার্লসের শরীরের অবস্থা দেখে সে ভয় পেল। যেন ঝড়ে পতনোন্মুখ একটা গাছকে ঠেকা দিয়ে কোনও রকমে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। অ্যানের মা চিঠি দিয়েছেন। বিয়ের নিমন্ত্রণ-পত্র। কোন্ এক রিচার্ড বারট্রামের সঙ্গে অ্যানের বিয়ে। আর সে সইতে পারল না। বংশের ধারা অনুসারে কঠোর আঘাত [illegible]বার মত শক্ত মন নয় চার্লসের। একদিন রাত্রিতে [illegible] বসে [illegible] তার বুদ্ধিদীপ্ত চেতনাপ্রবাহ অবরুদ্ধ [illegible]ল। সে চেঁচিয়ে উঠল, শান্ত লোকটি উগ্রভাবে [illegible] উঠেছে।

ভা[illegible] এল। চার্লসের উপর নেমে এসেছে বংশগত [illegible]প। পাগলা-গারদে পাঠাতে হবে। মেরি কিছুতেই যেতে দেবে না। সে সব ভার নেবে চার্লসের; [illegible]রে তাকে ভাল করে তুলবে। কিন্তু ডাক্তার রাজী হল না। হাতকড়া লাগিয়ে তাকে নিয়ে গেল। মেরি অশ্রুসিক্ত চোখে দাঁড়িয়ে রইল, আর মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল, হে ভগবান, এখন যেন আমার মাথা আবার খারাপ না হয়! তা হলে মা-বাবাকে কে দেখবে, কে চার্লসের খোঁজ করবে!

বেশ কিছুকাল পাগলা-গারদে কাটিয়ে চার্লস বাড়ি ফিরে এল। মেরির যত্নে চার্লস সুস্থ হয়ে উঠল। সৌভাগ্যক্রমে তার চাকরি যায় নি। এখন চার্লসের কোনও রাগ নেই অ্যানের উপর। তাকে প্রত্যাখ্যান করে সত্যি সে বিবেচনার কাজ করেছে। মাত্র একুশ বছর বয়সেই সে তার সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি দেখতে পায় আজকাল। শেষ পর্যন্ত মেরি আর সে-ই পরস্পরের অবলম্বন। পাগল দুই ভাই-বোন। যে যখন ভাল থাকবে সে তখন অন্যকে দেখবে। আর কেউ আসবে না তাদের জীবনে। কেউ তাদের ভালবাসতে পারবে না।

চার্লস ভাল হয়ে ওঠবার কিছুদিন পরেই মেরির অসুস্থ হবার লক্ষণ দেখা গেল। ডাক্তার ডাকতে গেছে চার্লস। এর মধ্যে খাবার টেবিলে কী নিয়ে একটা তর্ক উঠেছে। হঠাৎ মেরি ক্ষিপ্ত হয়ে মাংস-কাটা ছুরিটা আমূল বিদ্ধ করে দিল মার বুকে। চার্লস ফিরে এসে দেখল সব শেষ। মার প্রাণহীন দেহটা রক্তাপ্লুত হয়ে পড়ে আছে। বুড়ী পিসিমা কিছু না বুঝে হাউ হাউ করে কাঁদছে। স্তিমিত-চেতন বাবার বোধ নেই কী ঘটেছে ঘরের মধ্যে। ছেলেকে দেখে তাস ভাঁজতে ভাঁজতে বলল, আয়, একহাত খেলি।

এমন ক্ষিপ্ত পাগলকে সারাজীবন সরকারী গারদে রাখা উচিত। না হলে কখন যে কার ক্ষতি করবে কে জানে! কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করল না চার্লস। এই দিদি তার জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তাকে চিরদিনের জন্য দূর করে দিয়ে কী নিয়ে থাকবে? দিদিকে মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। তারপরে থানা আর আদালতে ছুটোছুটি করে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলল। সর্বদা কেবল ভয় যদি এত বড় আঘাত সে সইতে না পারে? যদি সেও পাগল হয়ে যায়!

মেরি সুস্থ হয়ে ফিরে এল। কিন্তু একে একে মৃত্যু হল পিসিমার ও বাবার। পিসিমা তাকে প্রাণ দিয়ে

ভালবাসতেন। স্কুলে পড়বার সময় রোজ অনেকটা পথ হেঁটে পিসিমা তার জন্য দুপুরের খাবার নিয়ে যেতেন। স্নেহকোমল চিরপরিচিত মুখগুলি একে একে হারিয়ে যেতে লাগল: All, all are gone, the old familiar faces.

মেরি পাগল হয়ে নিজের মাকে খুন করেছে, চার্লস পাগলা-গারদে কিছুকাল কাটিয়েছে,—এসব খবর প্রতিবেশী ও পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে আর অজানা নেই। সমাজের দুষ্ট ব্যাধির মত তারা চিহ্নিত হয়ে গেছে। পথে বের হলে দুষ্টু ছেলেরা তাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে, পাগল! ভদ্রসমাজে তারা অপাংক্তেয়। পাড়ার বাইরে কিছু দূরে এক ভদ্রলোকের বাড়ি আমন্ত্রিত হয়েছিল চার্লস। খুব ভদ্র পরিবার। ভদ্রলোকের দুই মেয়ে; তারাও এল আলাপ করতে। একটি মেয়ের নাম হেস্টার সেভরি। তার শান্ত সৌন্দর্য ও নম্র ব্যবহারে চার্লস আকৃষ্ট হল। পরে হেস্টারের উদ্দেশে একটি কবিতাও রচনা করেছে সে। কিছুদিন পরে যখন হেস্টারের আকর্ষণেই আবার সে বাড়ি গেল তখন দুটি মেয়ে আর তার সামনে এল না। চার্লস বুঝতে পারল তাদের আসতে দেওয়া হয় নি। ইতিমধ্যে আমন্ত্রণকর্তা জানতে পেরেছেন তার পাগলা-গারদের ইতিহাস।

পথে বেরুন যায় না লোকের মন্তব্যের যন্ত্রণায়। মেরি আর চার্লস নতুন পাড়ায় উঠে গেল। কিছুদিন একটু স্বস্তি পাওয়া যাবে।

কিন্তু কদিন? মেরিকে তো বছরে একবার করে উন্মাদ হাসপাতালে পাঠাতে হয়! অনেকটা পালাজ্বরের মত নিয়মিত ঘুরে ঘুরে আসে মস্তিষ্কের এই ব্যাধি। চার্লস তখন একা। ভয়ে ভয়ে থাকে কখন সেও আক্রান্ত হয়ে পড়ে। মেরি যখন বাড়ি থাকে না তখন সময় কাটাবার প্রধান অবলম্বন মদ ও ধূমপান। কোলরিজের সাহচর্যে এই দুটি নেশার অভ্যাস হয়েছে। স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ; ডাক্তারের উপদেশ মেরির অনুরোধ তাকে এই অভ্যাস থেকে মুক্তি দিতে পারে নি।

এ ছাড়া বই পড়ে ও কিছু কিছু লিখেও তার সময় কাটে। সমাজের অন্য সকলে তাকে এড়িয়ে চললেও লেখকদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃ বাড়ছে। কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ডরোথি, ক্র্যাব, হ্যাজলিট, গডউইন প্রভৃতি লেখক এবং বিভিন্ন কাগজের সম্পাদকদের সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা চলে; কখনও মুখোমুখি, কখনও চিঠির মাধ্যমে।

চার্লসের কবিতা কিছু কিছু বেরিয়েছে সাময়িক পত্রিকায়। পরিচিত লোক, পরিচিত দৃশ্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কেন্দ্র করে রচিত এই সব কবিতা। ১৭৯৮ সনে বেরিয়েছে তার গদ্য কাহিনী 'দি টেল অব রোজামাণ্ড গ্রে…'। এ বইয়ের প্রতি সমালোচকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি; বারো তেরো কপির বেশী বিক্রি হয়েছে কিনা সন্দেহ। শেলীর কিন্তু রোজামাণ্ড গ্রের কাহিনী খুব ভাল লেগেছিল। এর পরে চার্লস লিখল একটি ট্র্যাজেডি 'জন উডভিল'। থিয়েটার থেকে পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরে এল। অভিনয়ের যোগ্য নয়। ১৮০২ সনে নিজের পয়সায় নাটকটি ছাপাল চার্লস। এই ট্র্যাজেডি বিশেষ সমাদর লাভ করল না।

কয়েক বছর পূর্বে শেলীর শ্বশুর উইলিয়াম গডউইনের অনুরোধে চার্লস শেক্সপীয়ারের নাটকের কাহিনী কিশোরদের উপযোগী করে গদ্যে লিখে দিতে সম্মত হল। কাজ হাতে নিয়ে চার্লস তার দিদি মেরিকেও গল্প লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করল। মেরি তো প্রথম হকচকিয়ে গেল। সে আবার লিখবে কী? কিন্তু চার্লসের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত লিখতে রাজী হল। মোট কুড়িটি গল্পের মধ্যে চোদ্দটি কমেডির কাহিনী মেরির লেখা; চার্লস লিখেছে ছটি ট্র্যাজেডির গল্প। মেরি ও চার্লস দুজনের নামাঙ্কিত হয়ে ১৮০৭ সনে বইটি প্রথম বেরিয়েছে। এখনও এটি ইংরেজী শিশু-সাহিত্যের ক্লাসিক হিসাবে স্বীকৃত।

পর বৎসর লঙম্যান্‌স্ প্রকাশ করল Specimens of English Dramatic Poets'। দুই খণ্ডের বড় বই। দীর্ঘকাল পরিশ্রমের ফল। ভূমিকা [illegible] যোগ করে সযত্নে সম্পাদনা করেছে চার্লস। কিন্তু এ বইও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করল না। বই বেরুবার কি[illegible] একটা পার্টিতে এক ভদ্রলোক চার্লসকে [illegible] 'কোয়ার্টার্লি রিভিউ' বর্তমান সংখ্যায় তোমার বই কী বলেছে দেখেছ? সমালোচক বলেছে তোমার [illegible] গুলি নাকি পাগলের উক্তি।

ঘরের কোলাহল হঠাৎ থেমে গেল। চার্লস মাথা নত করে বসে রইল।

এর কিছুদিন পূর্বে চার্লসের ছোট একটি ফার্স 'মিঃ এইচ—' অভিনয়ের জন্য গৃহীত হয়েছিল বিখ্যাত ড্রুরি লেন থিয়েটারে। অভিনয় মোটেই জমে নি। একদিন পরেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চার্লস লাভবান হয়েছিল তরুণী অভিনেত্রী মিস ফ্যানি কেলির সঙ্গে পরিচিত হয়ে। মিস কেলির সহানুভূতিপূর্ণ মধুর ব্যবহার প্রথম থেকেই চার্লসকে আকৃষ্ট করল। প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হলেও মিস কেলির ব্যবহারে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না। তার এই চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে চার্লস লিখল :

> You are not, Kelly, of the common strain,
> That stoop their pride and female honour down
> To please that many-headed beast The Town,
> And vend their lavish smiles and tricks for gain ;

মিস কেলির সঙ্গে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা হল। মেরি একদিন বলল, চার্লস, কেলি তোমাকে ভালবাসে। ওকে বিয়ে কর না কেন ?

ভালবাসে ? প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে না। সেবারের ক্ষতটা এখনও শুকোয় নি। ভয় হয়, আবার হয়তো কঠিন আঘাত পেতে হবে। সে আঘাত সইতে পারবে তো ? তবু বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়। কেলির মমতাভরা দুই চোখ, তার মধুর ব্যবহার চার্লসের বিচারবুদ্ধিকে নেশাগ্রস্ত করে। বয়স হয়েছে চুয়াল্লিশ ; মাইনে বেড়েছে। বিয়ে করলে সংসার স্বচ্ছন্দেই চালাতে পারবে। জীবনে এই শেষ আশা। কিন্তু ভয় জেগে আছে মনের কোণে। প্রত্যাখ্যানের ভয়। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না, পাছে মুখের উপর 'না' শুনতে হয় !

২০শে জুলাই, ১৮১৯ সন। চার্লস নিজের মনের কথা জানিয়ে চিঠি লিখল মিস কেলিকে। চিঠি পেয়ে তক্ষুনি জবাব দিল মিস কেলি। না, চার্লসকে ভালবাসা তার পক্ষে সম্ভব নয় ; বিয়ে করা তো আরও দূরের কথা ! তুমি যে আমাকে ভালবেসেছ সেজন্য গৌরব বোধ করছি। কিন্তু আর কখনও এ প্রসঙ্গ তুলো না, ভালবাসার কথা বলো না। আমরা আগের মতই বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলব।

চার্লস চিঠি পেয়েই জানাল, তোমার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত [illegible]

একদিন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সব আশা শেষ হয়ে গেল। আশা অবশ্য কখনও সত্যি ছিল না ; সে ভুল করেছিল। [illegible]ল। ভালবাসা সে পায় নি, পাবেও না [illegible] সৃষ্টি ও সমাজের ব্যতিক্রম ; জীবনের [illegible]কে চিরদিনের জন্য নেমে দাঁড়াতে হবে।

[illegible]ার মধ্যে চার্লস সান্ত্বনা খুঁজতে চাইল। ঠিক এই সম[illegible]ণ্ডন ম্যাগাজিনের সম্পাদক লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করল চার্লস। লেখা বেরুল ছদ্মনামে। কারণ চার্লসের এই নতুন জীবনের শুরু ; স্বনামে লিখলে পুরনো জীবনকে এড়ানো যাবে না। তার এক সহকর্মীর নাম একটু বদলিয়ে ছদ্মনাম গ্রহণ করল Elia. বিভিন্ন সময়ে নানা কাগজে প্রকাশিত এই ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলি 'Essays of Elia' নামে সঙ্কলিত হয়ে ইংরেজী সাহিত্যে অমর আসন লাভ করেছে। চার্লস ল্যামের সাহিত্যখ্যাতি এই প্রবন্ধগুলির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গভীর সহানুভূতি ও মানবতাবোধ চার্লসের ব্যক্তিগত প্রবন্ধকে অসামান্যতা দিয়েছে। যারা অবহেলিত, যাদের জীবন বেদনাক্লিষ্ট, এবং যে-সব পুরনো লোক পুরনো জগৎ নিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রতি চার্লসের দরদের শেষ নেই। আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রায় প্রতিটি লাইনে চার্লসকে চেনা যায়। ইংরেজী সাহিত্যে চার্লসের মত ব্যক্তিকেন্দ্রিক লেখক আর দ্বিতীয় নেই। চার্লস এ সম্বন্ধে সচেতন ছিল। 'নিউ ইয়ার্স ঈভ' প্রবন্ধে কৈফিয়ত হিসাবে বলছে : আমার স্ত্রী নেই, সন্তান নেই, সংসার নেই ; তাই একমাত্র লেখা ছাড়া আর কিছুর মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করবার সুযোগ নেই। লেখার মধ্যেই নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেষ্টা করি।

মিস কেলির প্রতি আকৃষ্ট হলেও চার্লস যে অ্যানকে ভোলে নি তার প্রমাণ পাই Dream Children (1821) প্রবন্ধে। অ্যানের সঙ্গে বিয়ে হলে তার জীবন কেমন কাটত তারই কল্পনা। চার্লসের বয়স হয়েছে, বিশ্রাম করছে আরাম-কেদারায়। ছেলেমেয়েরা এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে মা-বাবার ছেলেবেলার গল্প শোনবার জন্য। চার্লস তাদের সঙ্গে গল্প করছে, কত ধৈর্য ধরে সাধনা করে তাদের মায়ের হৃদয় জয় করে তাকে ঘরে আনতে পেরেছিল। হঠাৎ তন্দ্রার মধ্যে দেখতে পেল ছেলেমেয়েরা একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে গেল। মনে হল যাবার আগে তারা বলে গেল : "We are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice call Bartrum father. We are nothing ; less than nothing, and dreams. We are only what might have been, and must wait upon the tedious shores of Lethe millions of ages before we have existence, and a name,—and immediately awaking, I found myself quietly seated in my bachelor arm-chair..."

স্বপ্ন-শিশুর দল ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়ে গেছে। অ্যানের (প্রবন্ধে অ্যালিস) বিয়ে হয়েছে

বারট্রামের সঙ্গে, ল্যামের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। অ্যান তার জীবনের জাল দিয়ে চার্লসের স্বপ্নকে ধরতে চায় নি। তাই সেই স্বপ্ন এখনও আকাশে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

শুধু স্বপ্ন নয়, অ্যানকে ভুলতে পারে নি চার্লস। শুনেছে এখন অ্যান সপরিবারে লিসেস্টার স্কোয়ার অঞ্চলে থাকে। কতদিন সে ওখানকার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে শুধু একবার অ্যানকে দেখবে বলে। একবার দেখেই চলে আসবে। কতদিন দেখে নি!

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইতালিয়ান পড়তেন আইসোলা নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। তাঁর নাতনী এমা আইসোলাকে মেরি ও চার্লস পালিত কন্যা হিসাবে গ্রহণ করল। এমা তাদের শূন্য জীবন একটু পূর্ণ করেছে। এই নবযৌবনা তরুণী অনুক্ষণ চার্লসের সঙ্গী। এক সঙ্গে তারা বেড়ায়, গল্প করে, বই পড়ে। চার্লসের বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে; এমার বয়স আঠারো-উনিশ। চার্লসের বেদনায় এমার গভীর সহানুভূতি, চার্লস উপলব্ধি করল এমা তার জন্য আত্মদান করতে প্রস্তুত। এই উপলব্ধি চার্লসকে দুর্বল করল; বয়স হলেও তার মনের আকাঙ্ক্ষা মরে নি। ভয় হল, পাছে তার জন্য এমার ক্ষতি হয়! জীবনের প্রান্তে এসে একটি মধুর সম্ভাবনার পরিচয় পেল। কিন্তু এখন সে পরিচয়ে লাভ কী? এখন শুধু ক্ষতি করতে পারবে, কারও জীবনকে পূর্ণ করবার ক্ষমতা আর নেই। নিজের উপর আস্থা হারিয়েছে চার্লস। সে তাড়াতাড়ি উদীয়মান প্রকাশক এডওয়ার্ড মক্সনের সঙ্গে এমার বিয়ের ব্যবস্থা করল। এমা অভিমান করেছিল; কিন্তু চার্লস জানে এ অভিমান দুদিনেই দূর হয়ে যাবে।

স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। ডাক্তারের পরামর্শে দীর্ঘ বত্রিশ বছর পরে চার্লস চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করল। পেন্সনের পরিমাণ ভাই-বোনের পক্ষে যথেষ্ট। টাকার অভাব নেই। কিন্তু জীবন হঠাৎ একান্তরূপে শূন্য হয়ে গেল। ইস্ট ইণ্ডিয়া হাউসের ফাইলের স্তূপে তিলে তিলে জীবন ক্ষয় করবার সুযোগ পর্যন্ত রইল না। রিক্ত, নিঃসঙ্গ জীবনে অনন্ত অবসর।

মেরি এখনও প্রায়ই উন্মাদ হয়ে যায়। সে যখন বাড়ি থাকে না তখন একাকীত্ব দুর্বহ হয়ে ওঠে। এরূপ নিঃসঙ্গ জীবন অপেক্ষা উন্মাদ মেরির সাহচর্যও কাম্য। লণ্ডনের বাসা ছেড়ে শহরের বাইরে এক উন্মাদ হাসপাতালে ঘর ভাড়া করে মেরি ও চার্লস উঠে এল। যতদিন বাঁচবে আর বিচ্ছেদ হবে না। পাগল হলেও না।

কোলরিজের মৃত্যু হল। চার্লসের একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। মৃত্যুশয্যায় কোলরিজ চার্লস ও মেরির নাম উল্লেখ করেছে। কম্পিত হস্তে চার্লস ও মেরির নাম লিখে তাঁর কাব্যগ্রন্থ উপহার দিয়ে গেছে। শেষ উপহার।

মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া চার্লসের এখন আর কোনও কাজ নেই। রাত্রিতে বৃষ্টি হয়েছে; পথ পিছল। চার্লস পথে বেরিয়েছে বেড়াতে। হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেল। মুখে আঘাত লাগল। চামড়া কেটে রক্ত বেরিয়েছে। সামান্য ঘা, কোন যত্ন নেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না।

দু দিন পরে মুখ ফুলে উঠল। ডাক্তার বলল, বিসর্প। এই রোগে চার্লসের মৃত্যু হল ২৭শে ডিসেম্বর, ১৮৩৪ সনে।

And Lamb, the frolic and the gentle,
Has vanished from his lonely hearth.

পাগ্‌লা-গারদের কবিতা

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

গান

গান শেষ করে অভিবাদন জানালেন মঞ্জরীবাঈ।
বিরক্ত শ্রোতার দল অধৈর্য হয়ে শুনছিল,
এইবার হাঁফ ছেড়ে বললে, "বাঁচা গেল।
এখন না থামলে ঠিক হাততালি দিতুম।"

একদিন ছিল যখন মঞ্জরীবাঈয়ের গান শেষ হলে
হায় হায় করে উঠত শ্রোতার দল।
আজ মঞ্জরীবাঈয়ের দেহে মনে কণ্ঠে বার্ধক্য,
তান দিতে দমে কুলোয় না,
আলাপ চুপিসাড়ে বিলাপ হয়ে ওঠে,
গলা ভেঙে যায় তারাসপ্তকের শুরুতেই,
ভুল হয়ে যায় আস্থায়ী অন্তরার বাণী।

নীরব আসর। কোনো হাতে বাজছে না তালি;
পাছে তালিকে বাহবা ভেবে
আবার একখানা গান ধরেন মঞ্জরীবাঈ,
এই আতঙ্কে আতঙ্কিত সমবেত শ্রোতার দল।

গভীর ব্যথায় মলিন মঞ্জরীবাঈয়ের মুখ।
আজ কেউ তাঁকে অনুরোধ করছে না আবার গাইতে;
তাচ্ছিল্যের এই অপমানে অভিমানে ছলছল
মঞ্জরীবাঈয়ের দু নয়ন।

কিন্তু না, অপমানের ব্যথা নিয়ে বিদায় নিতে
আমি তোমায় দেব না, মঞ্জরীবাঈ।
উঠলাম আসন ছেড়ে। এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে
যেখানে নীরব শুয়ে আছে মঞ্জরীবাঈয়ের করুণ তম্বুরা,
পাশে বসে আছে না-কাঁদা-কান্নায় ম্রিয়মাণা মঞ্জরীবাঈ,
ব্যথিত সারেঙ্গিয়ার স্কন্ধলগ্ন তখনও সারেঙ্গী,
পুরনো তবলচীর হাত দুটি বাঁয়া তবলার ওপর
স্তব্ধ হয়ে আছে মঞ্জরীবাঈয়ের মুখ চেয়ে,
ব্যথায় ছলছল।

কুর্নিশ করে ডাকলাম "বাঈ সাহেবা!"
করুণ মিনতির সুরে বললাম,
"শুনতে চাই আর একখানা গান।
তৃপ্তি হল না একটি মাত্র গানে।"

আমার ওপর ক্ষেপে উঠল শ্রোতারা।
আমার অমার্জনীয় ন্যাকামির জন্যে
আর একখানা অশ্রাব্য গান মুখ বুজে সইতে হবে সবাইকে
নিছক ভদ্রতার খাতিরে!

জল চিক্‌চিক্ করে উঠল মঞ্জরীবাঈয়ের চোখে—
আমার খাঁটি দরদের ছোঁয়া কাঁদিয়েছে তাঁর মনকে।
এ আসরে আর সবাই বেদরদী,
আর কেউ শুনতে চায় না তাঁর গান—
আমারই জন্যে আবার তম্বুরা তুলে নিলেন তিনি।
ভ্রূকুটিতে ভরে উঠল আসরের অগুন্‌তি চোখ।

গান ধরলেন মঞ্জরীবাঈ,
অতি করুণ সুরের একখানা ঠুংরী গান।
আমি আবার গাইতে বলে তাঁর মান বাঁচিয়েছি,
এবার আমার মান বাঁচানো তাঁর হাতে।
হৃদয়ের সব কৃতজ্ঞতা যেন কান্না হয়ে ঝরে পড়ল
মঞ্জরীবাঈয়ের গানে,
কেঁদে কেঁদে উঠতে-লাগল অপূর্ব সারেঙ্গীর সুর,
গভী[illegible] সুর কান্নার জাদু বিছিয়ে দিল তবলচীর হাতে,
তা[illegible]গুলো কেঁদে কেঁদে উঠতে লাগল বাঁয়া তবলার
বুকে।

সারা আসর নীরব, নিথর, মন্ত্রমুগ্ধ,
শ্রোতাদের সবার চোখে জল ছলছলিয়ে উঠেছে।
ধীরে ধীরে শমে এসে সমাপ্ত হল গান,
অভিবাদন করলেন মঞ্জরীবাঈ।
কিছুক্ষণ স্তব্ধ নীরবতা।
তারপর চোখ মুছে বললেন ভূতপূর্ব বিরক্ত শেঠজী:
"অ্যায়সা গানা কভি নহী শুনা।"
ধ্বনিত হল বহু ব্যাকুল কণ্ঠের সমবেত মিনতি:
"আর একখানা গান মেহেরবানী করুন, বাঈ সাহেবা।"

ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি

("ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে!!!!!")
ধ্বনি হারাইয়া যায়, প্রতিধ্বনি তারই লাগি করে হাহাকার,
সে আর্তক্রন্দন যদি কারও কানে শোনা যায় ব্যঙ্গের মতন,
কি করিবে প্রতিধ্বনি? বার বার ব্যর্থ হাতে ধ্বনির দুয়ার
মুখরিয়া তোলে, আর রূপ-হ্রদে খুঁজে মরে অরূপ রতন।

ইউক্লিডের প্রতিধ্বনি জ্যামিতির পত্রে পত্রে আজও কাঁদে
ঢের,
আর্কিমিডিস গেছে, বেঁচে আছে ইউরেকা, প্রতিধ্বনি তার।
যেথা ছিল ক্লিওপ্যাট্রা গুম্ফহীনা, সেথা আজি সগুম্ফ নাসের,
পীড়াগ্রস্ত পিরামিড বালুর ব্যাকুল বাণী করিছে প্রচার
আকাশের বক্ষ ফুঁড়ে। কোথা নীলনয়নার ভিড়
নীল-নদ-তটে-তটে? বৃন্দাবনে বৃন্দার সন্ধান
যদ্যপি বিফল জানি, চিত্ত তবু নিতান্ত অস্থির
বেহুঁশ মণ্ডপ-'পরে নিত্য যথা ব্যর্থ পঞ্চবাণ।

আপন বিধান-জালে আপনারে জড়ান বিধাতা,
চিত্রগুপ্ত যত লেখে তত আরও বাকী থাকে খাতা।

[টীকা:—উক্ত রচনাটি রচিত হইতে হইতে কখন সনেট হইয়া গিয়াছে টের পাই নাই। ইতালিয়ান রূপ-তাত্ত্বিক ক্রোচে, জার্মান দার্শনিক স্পিনোজা ও শোপেন-হাওয়ার, ফরাসী ভাবুক আঁরি বের্গসঁ, পোর্তুগালের ভাস্‌কো-ডা-গামা প্রভৃতি অনেকের প্রচ্ছন্ন প্রভাব উক্ত সনেটটিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ সন্দেহ কাহারও কাহারও মনে জাগরিত হওয়া অসম্ভব নহে।]

[রস-রচনা]

কাক ও কোকিল

পরিমল গোস্বামী

যুগধর্মে পুরনো অনেক ভাঙাচোরা ফেলে-দেওয়া জিনিসকে আমরা কালচরাল রিভাইভ্যালের নামে নতুন করে ভালবাসতে শিখছি। জাতীয় জাগরণের সঙ্গে এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

এই নতুন মূল্য নির্ণয়ের আলোয় আরও একটি বহু-নিন্দিত এবং অবহেলিত জিনিসকে তার হারানো মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা উচিত বলে আমার মনে হয়। সে হচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী বা সহযাত্রী কাক। কাকের কণ্ঠকে আমরা বংশ বংশ ধরে গাল দিয়ে আসছি, কিন্তু এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে এ গাল তার প্রাপ্য নয়। আমি যতই ভাবছি ততই আমাদের এই পরমাত্মীয়টিকে ভাল লাগছে। আত্মীয়ই কারণ সম্পর্ক বিচারে কাক আমাদের সবার (পুরুষদের) ভ্রাতুষ্পুত্র। সে সবাইকে কাকা সম্বোধন করে।

আত্মীয়তার কথায় অনেকে হয়তো স্বজনপোষণ বা নেপোটিস্‌ম্‌-এর কথা তুলবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে কথা ওঠে না, কারণ কাক বাঙালী মাত্রেরই ভ্রাতুষ্পুত্র। শুধু বাঙালীর নয়, হিন্দু বাঙালীর। এর কারণ উষাকালে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে হিন্দুদের একমাত্র কাকই ভরসা। মুসলমানদের পাড়ায় মুরগী যেমন, হিন্দুদের পাড়ায় কাক তেমনি। অবশ্য হিন্দু পাড়ায় বর্তমানে মুরগী পোষণ চলছে, কিন্তু সে শোষণেরই নামান্তর, কারণ পোষা হয়েছে কারি-কাটলেটের উপাদান রূপে। কাক আমাদের দেহদান করে না, শুধু ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, অতএব সম্পর্কটা দৈহিক নয়, আত্মিক। এবং আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যে গেয়েছিলেন "তোমার সুর শুনায়ে যে-ঘুম ভাঙাও, সে ঘুম আমার রমণীয়"—তা কাকের উদ্দেশেই। আর কোনো কবি কাককে আদর করে কবিতা লেখেন নি। বনফুলের কাক এর ব্যতিক্রম, কারণ এতে যে নিন্দা আছে তা অহিংস নিন্দা, এমন কি কবিতাটিকে সামান্য একটু ঘষলেই ভিতর থেকে আদর বেরিয়ে পড়বে। এটি নিন্দার ছলে স্তুতি, একে ব্যাজনিন্দা বলা যায় নিশ্চয়।

"প্রকৃতি-মায়ের আদুরে দুলাল
একেবারে বয়ে যাওয়া
ভোর হতে উঠে নাই কোনও কাজ
খালি খাওয়া আর খাওয়া।"

প্রায় মাতৃস্নেহে উদ্বুদ্ধ বলা চলে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় কাকের সঙ্গে কোকিলের তুলনায় কোকিলকে বড় ও কাককে হেয় করার চেষ্টা দেখা যায়।

"কাক কারও করে নাই সম্পদ হরণ,
কোকিল করেনি কারও ধন বিতরণ,
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে
কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে।"

(খল ও নিন্দুক)

কিন্তু তবু ভাল যে নিন্দা করতে গিয়েও তিনি অজ্ঞাতসারে কাককে অনেকখানি প্রশংসা করে ফেলেছেন বলেছেন, "কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ।" কিন্তু "কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে" এ কথার প্রমাণ কোথায়? সংসারে রুচিভেদ আছে, সুতরাং কোনো একটি জিনিস সবার কাছে সমান খারাপ, এমন তো সংসারে দেখা যায় না। আমার তো বরং মনে হয় কাকের রবের মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা আছে, কারণ কাক হাজার হাজার বছরের বিরূপতা সহ্য করে আজও সমান ভাবে গান গেয়ে চলেছে। বিরুদ্ধ সমালোচনায় কত শিল্পী সাহিত্যিক গায়ককে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যেতে হয়েছে, কিন্তু কাককণ্ঠ আজও সমান সতেজ।

কালজয়ী হওয়াই আমি উৎকর্ষ বা মহত্বের একমাত্র প্রমাণ বলছি না। কিন্তু প্রমাণ বলতে বাধাই বা কোথায়? গাধার কণ্ঠও কালজয়ী, সেও চিরদিনের বিরূপ সমালোচনা সহ্য করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে গাধাকেও আমরা জাতে তুলব কি না। আমার মনে হয় আত্মীয়তার দিক দিয়ে বিচার করলে তোলাই উচিত। কাক যেমন আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্র, গাধা তেমনই আমাদের ভাই। আমরা সবাই ধরাপৃষ্ঠে বিবর্তনের পথে এগিয়ে যেতে যেতে এক-একটি পৃথক মুখোশ পেয়েছি, সেই মুখোশ পরে আ[illegible] নিজ ভূমিকা অভিনয় করে চলেছি। কাক ভাল কি কোকিল ভাল, গাধা ভাল কি ঘোড়া ভাল, এ প্রশ্ন তাই নিরর্থক। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সীমানার মধ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এবং

সবচেয়ে বড় কথা, সবাই প্রাণবান এবং নিজেকে যতখানি প্রকাশ করা দরকার তাই করেছে। যার মধ্যে প্রাণের প্রকাশ তাই তো রূপবান, তাই তো সম্পূর্ণ। শিল্পে, সাহিত্যে, সঙ্গীতেও আমরা এই প্রাণের প্রকাশ খুঁজি। শিল্পসৃষ্টির মধ্যে প্রাণের প্রকাশ যদি থাকে, তবে তার বহু ছোটখাটো আঙ্গিকগত ত্রুটি আমরা অনায়াসে অগ্রাহ্য করি। কাকের মধ্যে জীবনের সম্পূর্ণ প্রকাশ আছে, গাধার মধ্যেও আছে। অতএব কাক অথবা গাধা বিধাতার শিল্পসৃষ্টিরূপে আমাদের অভিনন্দনযোগ্য। কোকিলও তাই। কিন্তু মানুষের বিচারে ওদের প্রকাশ শেষ হয়ে গেছে, তাই ওরা মানুষের শিল্পবিচারে গ্রাহ্য নয়। প্রাণীকুলে একমাত্র মানুষের প্রকাশই আজও শেষ হয় নি। মানুষের মনে যে ছবি ফোটে, তার কলমে বা তুলিতে তা সম্পূর্ণ ফোটে না। সে সব সময় আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে মরছে, অথচ আজও সম্পূর্ণ প্রকাশের পথ খুঁজে পেল না, তার ভাষা আজও অসম্পূর্ণ। এইখানে "শিল্প"-রূপে মানুষ ওদের চেয়ে বড়, কারণ কাক কোকিল গাধার মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নেই, তারা শিল্প সাহিত্যের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশে কদাপি ব্যাকুল হয় না। তাদের দেহ ও মন সবই আমাদের চোখের সামনে মেলা আছে, কিন্তু মানুষের মনকে কে দেখতে পায়? মানুষের অস্পষ্ট অংশই বেশী। পারিপার্শ্বিক এবং জিন (gene, যার মধ্যে জন্মের পূর্ব থেকেই ভবিষ্যৎ স্বভাবের উপকরণ নিহিত থাকে)—এই দুইয়ের দ্বারা শর্তাবদ্ধ থাকলেও মানবচরিত্রের একটা প্রধান অংশ সব সময় অনুমানের বাইরে—unpredictable। যে মানুষের সব নির্দিষ্ট হয়ে গেছে, সে হয় গাধা, না হয় দেবতা।

অতএব কাক কোকিলের তুলনামূলক আলোচনা অসার্থক। ব্যক্তিগত বিচারে দুইয়েরই তুল্য মূল্য। তাই কাককে অপদস্থ করার কোনো মানে হয় না। আমার মতে তার প্রাপ্য সম্মান ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করা উচিত। শুধু বিরুদ্ধ প্রোপাগাণ্ডার হাতে মার খেয়ে কাক আজ জাতিচ্যুত, এবং ওকালতির ফলে কোকিল সবার আদরের। যেমন এককালে এক ছাগল বিরুদ্ধ-প্রচারের ফলে কুকুর হয়েছিল "ছাগব্রাহ্মণ কথা" নামক প্রাচীন গল্পে। প্রচারের কৌশলে দিনকে রাত এবং রাতকে দিন বানানো হচ্ছে প্রতিদিন, এ তো আমরা সবাই জানি।

একটা সহজ কথা সবার ভেবে দেখা উচিত যে কাক ও কোকিলের মধ্যে কোকিল আমাদের আত্মীয় নয়। সে সুখের [illegible]। সে তার পছন্দ মত একটি ঋতুতে আসে এবং ঋতু [illegible] হলেই পালিয়ে যায়। ঘোর স্বার্থপর। সে আপন ডিমের তদ্বিরের ভার পর্যন্ত সরলপ্রাণ কাকের উপর ছেড়ে দেয়।—প্রতারণার চরম দৃষ্টান্ত। কাক সর্বঋতুতে, রোদে বর্ষায় বাদলে চিরদিন আমাদের প্রতিবেশী। ঝোড়ো কাক দেখেছি, কিন্তু ঝোড়ো কোকিল কখনও দেখি নি। কোকিল দুদিনের আভাসে মানুষকে ছেড়ে যায়। শুধু প্রোপাগাণ্ডার জোরে সে উঁচু আসনে বসেছে। "কু" দিয়ে যে স্বরের আরম্ভ, তার সঙ্গে "হু" যোগ করলেই 'Who is Who'-র দলে স্থান পাবে, এমন মনে করবার কারণ দেখি না। এদেশে কোকিলের প্রধান প্রচারসচিব কবি কালিদাস, তারপর বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথও কিছু কিছু প্রচার করেছেন। আরও অনেকে করে থাকবেন, সে-সব গবেষকেরা আবিষ্কার করুন। ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের নামও এ সম্পর্কে মনে আসছে—

> "O blithe newcomer I have heard,
> I hear thee and rejoice.
> O cuckoo, shall I call thee bird,
> Or but a wandering voice..."

এ প্রশ্ন তুলে কবি নিজেই গদগদ হয়েছেন।

কোকিল প্রশস্তি কোন্ যুগে কোন্ কবির হাতে প্রথম হয়েছে আমার জানা নেই, তবে আধুনিক যুগের এক ইংরেজ স্কুলের ছেলে কোকিলের যে বর্ণনা দিয়েছিল তা মনে রাখবার মত। সে লিখেছিল "A cuckoo is a bird which lays other birds' eggs in its own nest।" এটি বিশুদ্ধ প্রোপাগাণ্ডার ফল। কোকিল সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থেকেই তাকে সমর্থনের চেষ্টা!—এবং শিশুকাল থেকেই। অথচ কাকের পক্ষে কেউ নেই। আমার হৃদয় এজন্য কাকার্ত। মনে বিষম আবেগ। তাই কথা এখন গদ্য ছেড়ে পদ্যে পৌঁছতে চায়—

> কাক,
> তোমার কণ্ঠ খারাপ এমন
> নিন্দুকেরা বলে
> সমালোচন ছলে,
> তাদের কথা থাক্।
> (কান দিও না বাজে কথায়
> মধু কিংবা যদুর)
> আমার মতে তোমার কা-কা
> বারো আনাই মধুর
> —মাত্র চারি আনার ফাঁক।
> কোকিল বড়, কোকিল ভাল,
> এমন কথায় ভাববার নেই কিছু,
> থাক্ না হাজার মানুষ ওদের পিছু।
> মিথ্যা খ্যাতি লাভ করেছে কোকিল,
> যতই তাহার থাক্ না ভক্ত ভকিল।

গল্প

কবর

সুভাষ সমাজদার

জানালার ওপারেই চোরকাঁটায় ভরা শুকনো বাঁজা মাঠ। তারপরেই রেললাইন। রেললাইনের পরেই পাকিস্তানের সীমানা শুরু হয়েছে। রোজই দেখা যায় মাঠের বুকে একটি দুটি করে নতুন ঘর উঠছে। পদ্মা মেঘনা পার থেকে বাস্তুত্যাগীরা এসে বাসা বাঁধছে। খাঁ খাঁ করা মাঠটার অভিশপ্ত শূন্যতার ভেতরে তরঙ্গিত প্রাণের কলরোল উঠবে। খোলা জানলার দিকে তাকিয়ে সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর প্রবন্ধ লিখতে লিখতে অন্যমনস্ক হয়ে যায় মালতী বসু। হু হু করে বয়ে-আসা হাওয়ায় তার পাণ্ডুলিপি ফর ফর করে ওড়ে। কলমের ক্যাপ বন্ধ করে মালতী ভাবে: পৃথিবীর বুকের ওপরে এই বিচিত্র জীবন-তপস্যা অবিরাম চলেছে! আজ যেখানে বোবা মাঠ, সেখানে গড়ে উঠবে মায়ামমতা-ঘেরা টুকরো টুকরো সংসার। প্রাণ কখনও মরে না। আজ যে গাছ থেকে ফুল ঝরে, রাত্রিশেষে আবার সেই গাছেই ফুল ফোটে।

কি রে তোর প্রবন্ধ কতদূর লিখলি?—ঘরে এল মালতীর দাদা লোকেন। চঞ্চল হয়ে উঠল মালতী। বলল, কি লিখেছি শুনবে দাদা?

শোনা দেখি।

মালতী পড়ে: বাস্তুহারাদের বিপুল প্রাণশক্তিতে এই দেশের বিজন প্রান্তর সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়াছে এ কথা সত্য। কিন্তু নিষ্করুণ দারিদ্র্য ও পুঞ্জীভূত দুঃখদুর্দিনের অন্ধকারে ওদের জীবন আচ্ছন্ন। বরিন্দের আদিগন্ত বিস্তৃত প্রান্তর, কালো জলের ঐশ্বর্যে ভরা বড় বড় দীঘি আর শাল-পলাশের মিষ্টি ছায়া বক্ষে লইয়া সুপ্তিমগ্ন হইয়া আছে। এখানে কল-কারখানা ফ্যাক্টরি নাই বলিয়াই সৎভাবে উপার্জনের কোন পথ তাহারা পাইতেছে না। বাধ্য হইয়াই তাহাদের অসৎপথে রোজগার করিতে হইতেছে। সরকারকে শুল্ক ফাঁকি দিয়া ওপারে জিনিস পাচার করার ব্যবসা।

এই জায়গাটা হয় নি। শোন্, যারা বর্ডারে থাকে, তারা সবাই স্মাগলিং করে না।

তুমি কি বলতে চাও, ওদের ভেতরে এমন একজনও কেউ আছে, যে সৎভাবে বাঁচতে চায়?

নিশ্চয়ই! দেখবি তাকে সে এক আশ্চর্য মানুষ।

লোকেন যখন মালতীকে নিয়ে হিলির বিবিগঞ্জের দিকে রওনা হল, তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। হিলির যমুনা নদীর কালো জলে চাঁদের রূপালী আলো গলে গলে পড়ছে। বিবিগঞ্জের কাছে আসতেই তাদের কানে এল একতারার মিষ্টি ঝঙ্কার আর উদাস গলার গানের সুর। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে তারা সেই আত্মমগ্ন শিল্পীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

এ কি বাবু! দিদিমণিকে নিয়ে এসেছেন?—একতারা রেখে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল মহম্মদ কালিকানন্দ গোস্বামী। চেঁচিয়ে ডাকল, বউ—ও বউ—দুটো মোড়া নিয়ে আয়। কিন্তু বউ এল না। চাপা বিরক্তিতে বিকৃত হয়ে উঠল মহম্মদের রেখাজটিল মুখখানা। অস্ফুটস্বরে বিড় বিড় করে বলল, নিশ্চয়ই বর্ডারে মাল পাচার করতে গেছে—

গান থামালে কেন মহম্মদ?

গান আর আসে না বাবু। দেখছেন না কতকগুলো জন্তু-জানোয়ারের ভেতরে বাস করছি। চারদিকে কেবল চোর চোর, আর ধর ধর রব উঠছে অহরহ।—তার পিচুটিমাখা কুঞ্চিত চোখে ঘৃণার আগুন ঠিকরে পড়ল।

তুমি এখান থেকে আখড়া উঠিয়ে নিয়ে যাও না কেন মহম্মদ?

কোন কথা বলল না মহম্মদ। কিন্তু দু চোখে সুদূর স্মৃতির ছায়া নেমে এল। অস্ফুট গলায় বলল, যাওয়া কি সহজ বাবু! আমি যখন হিলিতে এসেছিলাম, তখন তিস্তা নদীর জল ওই যমুনায় এসে পড়ত। যমুনায় বজরা ভাসিয়ে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করতে আসত।

সে তো অনেক দিনের কথা মহম্মদ!—লোকেন বিস্মিত হয়ে বলল, তোমার তা হলে বয়স কত মহম্মদ?

সে বাবু ঠিক বলতে পারব না।

তোমার নামের শেষে গোস্বামী আছে কেন? তুমি কি ব্রাহ্মণ ছিলে? বললল মালতী।

হ্যাঁ দিদিমণি। আমার পূর্বপুরুষরা কনৌজী ব্রাহ্মণ।

তোমরা মুসলমান হয়েছিলে কেন?

কেন মুসলমান হয়েছিলাম! চড়া গলায় তীব্রস্বরে বলল মহম্মদ!—পরমুহূর্তেই থেমে গেল। যেন নিঃশব্দ রাতে বাতাসে কোন পোড়ো বাড়ির দেউড়ি একবার ককিয়ে উঠেই থেমে গেল। কিছুক্ষণ পরে ছাড়া ছাড়া গলায় বলল, শুনেছি, আমার পূর্বপুরুষ হিন্দুদের উঁচু জাতের গোঁড়ামি দেখে ঘেন্নায় মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য বিখ্যাত পীর ফকির বাহাউদ্দীন তাকে প্রেরণা দিয়েছিল। যাই বলুন বাবু আমাদের ইসলাম ধর্মে কিন্তু পাপী তাপী সকলের স্থান আছে—জ্যোৎস্না [illegible] উঠোনে একটা দীর্ঘমূর্তির ছায়ার দিকে তাকিয়ে [illegible] গেল মহম্মদ। সামনে এসে দাঁড়াল অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যের লাবণ্যে ভরা এক তরুণী মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মহম্মদের বার্ধক্যজীর্ণ দেহটা তীরের মত সোজা হয়ে উঠল। চিৎকার করে

বলল, কেন গিয়েছিলি তুই বর্ডারে ? তুই আমার বিবি হয়ে চোরাই মালের কারবার করবি ?

খিলখিল করে চারিদিক কাঁপিয়ে হেসে উঠল মহম্মদের বিবি আমিনাবান্থ। হাসির গমকে থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল তার দীর্ঘ তনু। কাঁধহাতা দৃষ্টিকটু লাল জামাটা একটু এঁটেসেঁটে ঠিক করে নিয়ে কটাক্ষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মাল চোলাইয়ের পয়সা দিয়েই ও দু বেলা খাচ্ছে বাবু। আর আমারই ওপর চোখ রাঙায়।

কেন, শহরের বাবুরা বুঝি আমার গান শুনে পয়সা দেয় না ?

তা দিয়ে আমার পান খাওয়ার পয়সা পর্যন্ত হয় না।—বলেই হেসে উঠল। মাথায় চুড়ো করে বাঁধা মস্ত খোঁপাটা ভেঙে এলিয়ে পড়ল। মহম্মদের দু চোখে আগুন ঝরছে। তীব্র একটা ব্যথায় চিৎকার করে আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে বলল, হা আল্লা! তুই আমার বিবি হয়ে মাল চোলাই করবি। তোর পাপের পয়সায় আমাকে খেতে হবে ? কেন, কেন আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ আল্লা—

সেই মুহূর্তে মহম্মদের বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে দূরে ধূ-ধূ প্রান্তরে নিঃশব্দে চন্দ্রহাস রাত্রির দিকে তাকিয়ে লোকেনের মনে হয়েছিল, মহত্ত ও পুণ্যবোধে উদ্দীপ্ত সুদূর একটা অতীত কালই যেন কুটিল পঙ্কিল বর্তমানের কশাঘাতে মর্মান্তিক আর্ত চিৎকার করছে।

বাড়িতে ফেরার পথে লোকেন বলল, দেখলি কী অদ্ভুত সৎপ্রকৃতির মানুষ!

কিন্তু ওই বুড়ো স্মাগলার বউটাকে ঘরে রাখে কেন ? না দাদা, তুমি যাই বল, মহম্মদকে যত সৎ ভাবছ ও তা নয়।

যা, বলিস কি !—বিরক্তি ঝরে পড়ল লোকেনের গলায়: আপন লোক কোন অন্যায় করলেই বুঝি তাকে ত্যাগ করা যায় ?

চুপ করে গেল মালতী। তারা নিঃশব্দে পথ চলতে লাগল। হঠাৎ চমকে উঠল মালতী।

ওরা কারা ?

ওরাই তো স্মাগলার। ওদেরই তো 'চোলাইদার' বলে। হাতে করে চিনির পোঁটলা, সিঙ্গার মেশিনের পার্টস, দেশলাই ইত্যাদি নিয়ে সব ওপারে যাচ্ছে।

মালতী দেখল দূরে যমুনার ওপারে খাড়া পাড়ের ওপর দিয়ে কতগুলো ছায়াশরীর এগিয়ে চলেছে—ছেলে বুড়ো, মেয়েপুরুষ। লোকেনের চোখে বিষাদের ছায়া নামল: দেখ্, দারিদ্র্য মানুষকে কোথায় নামিয়ে দেয়!

আ[illegible]ই লিখেছিলাম।—বলল মালতী।

দু দিন পর। লোকেন খবর পেল, মহম্মদের বিবি আমিনাকে এপারের সীমান্তরক্ষীরা ধরেছে। পুলিস তার বাড়ি তন্ন তন্ন করে তল্লাশী করেছে। লোকেনের মনে হল, যাক, এবার মহম্মদ বেশ নিশ্চিন্তে জীবন কাটাতে পারবে।

কিন্তু লোকেন দেখল, মহম্মদ আর শহরে আসে না। গান গায় না। ভিক্ষে করে না। যেন দু দিনে দু বছর বয়স বেড়ে গেছে মহম্মদের। একদিন সন্ধ্যায় বিবিগঞ্জের দিকে গেল লোকেন। বুড়ো বটগাছটার নীচে মহম্মদের ঘরটা কালো অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কোথাও নেই!

আশ্চর্য, মহম্মদ গেল কোথায় ? তবে কি মালতীর কথাই ঠিক! সঙ্গে সঙ্গে সে বুকের ভেতরে একটা ব্যথা অনুভব করল। সে স্কুলমাস্টার। আদর্শপ্রবণতা তার রক্তে রক্তে। সীমান্তের জনজীবনের আদর্শহীনতার মরুপ্রান্তরে মহম্মদের পুণ্যবোধ তার কাছে সতেজ সবুজ একটি চারাগাছের মত। সেই মহম্মদও শেষ পর্যন্ত সর্বনাশা ধ্বংসের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। ভারী হয়ে উঠল লোকেনের মন। বাড়ির দিকে ফিরতেই দেখল, যমুনার ওপারে একটা জনতার জটলা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে কি করছে। সকলের সমবেত কোলাহলকে ছাপিয়ে একটা তীক্ষ্ণ গলার স্বর ভেসে আসছে, না না, আমি স্মাগলিং করতে যাই নি। আমি অত ছোট কাজ করি না। লোকেন গিয়ে দেখল, এপারের সীমান্তরক্ষী পুলিসরা মহম্মদকে ঘেরাও করেছে। আর শাসাচ্ছে, বল্ কেন তুই বর্ডারের কাছে রোজ রাত্রে ঘুর ঘুর করিস ? তারা তার পরনের জামাকাপড় তন্ন তন্ন করে সার্চ করে কিছু পেল না। ছেড়ে দিল। নড়বড়ে দেহটাকে কোন রকমে টেনে টেনে টলতে টলতে মহম্মদ বাড়ির দিকে রওনা হল। লোকেন বলল, তুমি বর্ডারের দিকে এসেছিলে কেন মহম্মদ ? তোমার বিবির সঙ্গে দেখা করতে ? কোন কথা বলল না মহম্মদ। কিন্তু তীব্র বিস্ময়ে লোকেন দেখল, তার অজস্র রেখা-আঁকা মুখের ভাঁজে ভাঁজে আশ্চর্য একটা জ্যোতির্ময় দীপ্তি ঝলমল করছে। শুধু হাত জোড় করে অনুনয়ে ভেঙে পড়ে বলল, না বাবু, বিবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে কি স্মাগলিং করতে আমি ওপারে যাই নি।

তবে কেন গিয়েছিলে বর্ডারে ?

সে বাবু আপনাকে বলতে পারব না। মাপ করবেন বলেই লোকেনের উপর যেন একটু বিরক্ত হয়েই বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। কয়েক পা গিয়েই থেমে গেল মহম্মদ। তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মৃদু করুণ গলায় বলল, বাবু, আমিনাকে দেখতে যাওয়ার কথা বলছেন ?

থাক্ মহম্মদ, তোমার যদি বলতে আপত্তি থাকে—

লোকেনের কথা যেন শুনতেই পেল না মহম্মদ। ঘুমের ঘোরে কথা বলার মত করে বলল, আমিনাকে পুলিসে ধরেছে। কিন্তু একদিন না একদিন ও আমার কাছ থেকে চলে যেতই। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আমাকে ওর মনে ধরবে কেন ?—ম্লান অন্ধকারে মহম্মদের জলভরা চোখ দুটো চকচক করতে লাগল: এই বুড়ো বয়সে কী নিয়ে বেঁচে

থাকব বাবু, বলতে পারেন ! গান আর হয় না।—কেমন করে দিন কাটবে বাবু!—চারদিকের তরল অন্ধকারে মহম্মদের কথাগুলো কাতর কান্নার মত শোনাল।

তুমি আর সকলের মত চোর নও, ছোট কাজ কর না, এই গর্বই তোমাকে বাঁচার প্রেরণা দেবে মহম্মদ।—উদ্দীপ্ত হয়ে লোকেন বলল।

আর একদিন। পুলিসের বড় দারোগা এসে লোকেনকে বলল, মাস্টারমশায় চলুন তো, মহম্মদের বাড়ি সার্চ করতে হবে। আপনাকে সাক্ষী করব।

পুলিসের সঙ্গে মহম্মদের বাড়িতে গিয়ে লোকেন দেখল, একতারাটা উঠোনের এক কোণে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে আছে। কেউ কোথায়ও নেই। শুধু প্রেতিনীর কান্নার মত শোঁ-শোঁ বাতাস বেজে চলেছে শূন্য বাড়িটার চারদিকে। পুলিস বাড়ি তল্লাশী করে কিছু পেল না।

চলুন তো বর্ডারের রাস্তায়, দারোগা বলল। ম্লান চাঁদের আলোয় যমুনা নদীকে একটা ভোঁতা ছুরির মত মনে হচ্ছে। ওপারে প্রেতের চোখের মত দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে আলেয়ার আলো। বিবিগঞ্জ ছাড়িয়ে যমুনার পাড়ের গা-ঘেঁষে যে রাস্তাটা পাকিস্তানের ইসলামপুরে চলে গেছে, সেই রাস্তা ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কে আসছে মনে হচ্ছে।

কে যায় ? থাম।—বড় দারোগা গর্জন করে উঠলেন।

লোকেন সামনে গিয়ে দেখল, মহম্মদ। চোখেমুখে ভয়ের লেশ পর্যন্ত নেই। কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি, হাতে একতারা নিয়ে দীপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

কেন গিয়েছিলে ওপারে ? পাসপোর্ট আছে তোমার ?

পুলিসের একটা কথারও উত্তর দিল না মহম্মদ। নির্বিকার মুখে সেই আশ্চর্য এক জ্যোতির্ময় দীপ্তি। চোখের সুদূর দৃষ্টিতে কিসের যেন চিন্তার ছায়া।

কথা বলছ না কেন ? কেন তুমি পাসপোর্ট না করিয়ে রোজ রাত্রে বর্ডারের ওপারে যাও ?

কেন যাই !—যেন নিজের মনেই স্বপ্নের ঘোরে বিড় বিড় করে বলল মহম্মদ : মাল চোলাই করি না বাবু।

কৌতূহলে জ্বলে যাচ্ছে লোকেনের মাথাটা। তার মনের ভেতরে মুহুর্মুহু নিঃশব্দ প্রার্থনা উঠছে—অনেক বিশ্বাস আর আশা দিয়ে গড়া মহম্মদের ছবিটা যেন তচনচ না হয়ে যায়। বিদ্যুৎ চমকের মত তার মনে হল, নিশ্চয়ই বুড়ো পত্নীপ্রেমে পাগল! আমিনাকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করতেই গিয়েছিল।

তোমাকে আজ বলতেই হবে, কোথায় যাও তুমি ?

নিঃশব্দে শীর্ণ হাতটা তুলে যমুনার পাড়ের ওপরে একটা মৃদু আলোর দিকে ইঙ্গিত করল মহম্মদ।

কিসের আলো ওটা ?

কোন কথা বলল না মহম্মদ। রাগে বিরক্তিতে চেঁচিয়ে উঠল বড় দারোগা, তোমার বুজরুকি আমি ভেঙে দেব।

মহম্মদের ঠোঁটের কোণায় কোণায় ঝিকঝিক করছে হাসি। আশ্চর্য, ও যদি অন্যায়ই করে থাকে, তা হলে এত অবিচলিত আছে কী করে।

মহম্মদকে নিয়ে লোকেন আর পুলিসের দলটা যমুনার পাড়ের ওপরে উঠে এল। নীচেই পাকিস্তানের সীমানা। ওপারের সীমান্তরক্ষীদের সঙীনের ফলা রাতের অন্ধকারে চকচক করে উঠল। তাদের কম্যাণ্ডার চেঁচিয়ে বলল, ওই বুড়ো ফকিরকে নিয়ে আপনারা কোথায় আসছেন ?

ও স্মাগলার !—বলল এপারের পুলিস।

স্মাগলার !—হো হো করা একটা হাসির ঝড় বয়ে গেল ওদের শিবিরে। মুহূর্তে দারোগার মনে সন্দেহ ঘনীভূত হল।

একেবারে সীমানার তারের বেড়ার কাছে এসে থেমে গেল মহম্মদ। লোকেনরা দেখল, কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ওদের সীমানায় প্লাটাবনের আবেষ্টনের ভেতরে একটা ভাঙা দরগার কাছেই একটা কবরের ওপরে প্রদীপ জ্বলছে।

পীর ফকির বাহাউদ্দীনের কবর বাবু! আমি এখানে রোজ রাতে প্রদীপ জেলে দিয়ে যাই।

পীর ফকির বাহাউদ্দীন!—লোকেন চমকে উঠল। ফকির বাহাউদ্দীন! যিনি আজ থেকে তিন শো বছর আগে বরিন্দের এই অঞ্চলের জনতার মনে সম্রাটের মহিমা নিয়ে বিরাজ করতেন ; যাঁর ইসলাম ধর্মের সুললিত ব্যাখ্যায়, উদার মধুর অমায়িক ব্যবহারে শত শত হিন্দু মুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় মুসলমান ধর্মকে বরণ করেছিল—সেই বিখ্যাত পীর ফকির এইখানে দেহ রেখেছিলেন! হতাশ হয়ে গেল পুলিসের দল। অসহায়ভাবে পাকিস্থানের সীমানার ভেতরে মাটির প্রদীপের আলো-উজ্জ্বল নরম সবুজ ঘাসে ঢাকা কবরের দিকে তাকিয়ে দারোগা বলল, তুমি বিনা পাসপোর্টে ওপারে যাও, তোমাকে গার্ডরা ধরে না ?

ধরবে কেন বাবু, পীরের কবরে আমি তো সন্ধ্যে-বাতি দিতে আসি।

ঠিক সেই মুহূর্তে লোকেনের মনে হল, তারা ভরা আকাশের পশ্চাৎপটে মহম্মদের ছায়াময় মূর্তিটি যেন স্থাপত্যসুলভ জোরালো রেখায় আঁকা প্রাচীন যুগের কোন সত্যনিষ্ঠ বলিষ্ঠ মানুষের আকৃতি আর—

আর ওপারের কবরের ওপরে এপারের মানুষের নিবিড় শ্রদ্ধার উপহার ওই জ্বলন্ত প্রদীপের ছায়া-কাঁপা আলো একটি অমোঘ সত্যকে উজ্জ্বল করে তুলল লোকেনের মনে : রাষ্ট্রনীতি দেশের মাটিতে তারের বেড়া [illegible] ভাগ করতে পারে, কিন্তু দুপারের মানুষের ম[illegible]একান্তে ধর্মবোধের ক্ষেত্রে উদার ঐক্যের উপলব্ধি আজও ফল্গুধারার মত বয়ে চলেছে।

দৈনন্দিন

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তিন দিন ধরে কথা বন্ধ আছে। অচলা ওপরের বারান্দায় ডেক-চেয়ারে হেলান দিয়ে একটা বই পড়ছিল, পড়বার চেষ্টা করছিল বলাই ঠিক—তাড়াতাড়ি উঠে বইটা ভেতরে রেখে এসে বোনার সরঞ্জাম নিয়ে বসল। মুখটা সাধ্যমত ভার-ভার করে নিল। নীচে একটা মোটর এসে দাঁড়িয়েছে; ওর দাদা সচিব এসেছে। যে চটে রয়েছে তার চটা-চটা ভাবটা ধরে রাখাই ভাল; কেসটা জোরালো হয়।

সচিবও উঠে আসছে—পায়ের শব্দটা যেন কিরকম কিরকম। অচলা বোনা থামিয়ে একটু ভ্রূ কুঁচকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে, সচিবের টুপিটা দেখা গেল সিঁড়ির মাথায়। অচলা আবার মুখ ভার করে নিয়ে কাজটা হাতে করেই উঠে পড়ল, এগিয়ে গিয়ে বলল, এস দাদা, অনেকদিন আস নি যে?

আসি নি!···বলে কথাটায় একটা টান দিয়ে চেয়ারের দিকে এগিয়ে এল সচিব। দুজনে বসল সামনাসামনি হয়ে। সচিব বলল, আসি নি···সে অনেক কথা। ব্রজেশ কোথায়?

কে কোথায় আমি কী করে জানব? আমার খোঁজই কে রাখে তার ঠিক নেই।···মুখটা আবার ভার হয়ে উঠল অচলার।

আবার ঝগড়া করে মরেছিস তো দুজনে? এ-রোগের কী ওষুধ বুঝি নে তো?

আমিই করছি ঝগড়া সবার সঙ্গে!

একলা করবি কেন? বললাম তো দুজনে। এক হাতে কখনও বাজে তালি? এই একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোকে। এত দিন পরে এলাম, তা খাতিরের যা নমুনা দেখছি তা সত্ত্বেও তো এসে বসলাম মুখ বুজে। আর ঝগড়ার সম্ভাবনা আছে ভাই-বোনে?

[illegible] হাতের কাজটা সামনের টিপয়ে রেখে দিয়ে—আচ্ছা দাদা···বলে আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, উঠে পড়ে বলল, দাঁড়াও, তোমার চায়ের কথাটা বলে দিয়ে আসি আগে।

চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করে আসতে যে দেরিটুকু হল, সচিব গুনগুন করে একটা গানের কলি গেয়ে কাটাল। অচলা ফিরে এসে আবার আরম্ভ করল, শোন দাদা বেশ সবটুকু মন দিয়ে। শুনে যদি মনে কর অচা পোড়ারমুখীরই দোষ তো যা সাজা দেবে মাথা পেতে নোব। মনসাতলায় এক মস্তবড় সাধু মহারাজ এসে বসেছেন। কদিন থেকে মনে করছি একবার দর্শন করে পায়ের ধুলো নিয়ে আসি, দেখছই সংসারে একটা না একটা লেগেই রয়েছে—তা কাজ থেকে ফুরসত হবে তবে তো যাব দাদা, তুমিই বল না···

সংসার বলতে দুটি প্রাণী; ওদিকে চাকর, দাসী, পাচক-ঠাকুর; কাজ বলতে একরকম ওই হাতের কাজই, ফুল তোলা, উল বোনা, আর নভেল। এক একদিন টিপ্পনী করে রাগিয়েও দেয় বোনকে সচিব। আজ কিন্তু সেদিকে গেল না, এমনিই তো চটে রয়েছে। বলল, এত কাজের মধ্যে তোরা যে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর কথা ভাবিস কি করে আমার তো সেইটেই আশ্চর্য বোধ হয়।

মুখের ভার-ভার ভাবটা কমে আসছে অচলার; বলল, সে কথা ভাবে কে বল। যাক, পরশুকার কথা, মনে হল এমন করে ফুরসতের আশায় আশায় থাকলে আর হবে না, সাধু মহারাজ তো আমার জন্যে বসে থাকবেন না, বেরিয়েই পড়ি দুর্গা-শ্রীহরি বলে। অপরাধের মধ্যে ফিরতে একটু দেরি হয়েছিল। হবে না দাদা, তুমিই বল। আমি তো একা নয়, আরও কত সব এসেছে, মেয়ে-পুরুষ, জোয়ান-বুড়ো সবরকম। সবার কথা শুনে, মিষ্টি কথা বলে, মায়ের ফুল দিয়ে বিদেয় করতে হচ্ছে, নইলে আর সাধু কি বল দাদা! তাইতেই একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখি মুখ হাঁড়িপানা করে বসে আছেন···

কে, ব্রজেশ?

আবার কে?

তুই বুঝি গাড়িখানা নিয়ে গিয়েছিলি?

থাম। তা হলে আর এসে বোনকে দেখতে হত না তোমার, বনবাসে পাঠিয়ে দিতেন। আমি গিয়েছিলাম একটা রিক্‌শা ডাকিয়ে এনে শেতজর মাকে সঙ্গে করে। ভেবেছিলাম বেরিয়েই গিয়ে থাকবেন, দেরি হয়ে গেছে তো, গাড়ি-বারান্দায় মোটরটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু হন্তদন্ত হয়েই উঠে এসেছি। দেখি আফিসের সাজগোজ করে আরাম-কেদারায় বসে আছেন। মুখখানা এই রকম এক তোলো-হাঁড়ি…

অচলা নিজের মুখের চারিদিকে হাতটা ঘুরিয়ে প্রায় চারগুণ সাইজের একটা হাঁড়ির আকার দেখিয়ে দিল, বলল, আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি গো, আফিস যাও নি এখনও? শুনতে দেরি, অমনই খনখন করে তোলো হাঁড়ি বেজে উঠল দাদা…

সচিব একটু কুণ্ঠিতভাবেই বলল, একটু সমীহ করে বলবি নি?…ইয়ে…গুরুজনই তো।

অমনই গুরুজনের দিকে হয়ে গেলেন! আমি তা হলে কার কাছে বলি? থাক্‌।

মুখটা তোলো-হাঁড়ি করে একটু ঘুরিয়ে নিল। সচিব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, বেশ বেশ, বল্‌, ঝগড়া থাকলে অমন একটু হয়েই যায় কড়া।…হ্যাঁ, তোলো-হাঁড়ি খনখন করে বেজে উঠল; তারপর?

বললেন, আমি আছি কি নেই, আফিস গেলাম কি না গেলাম, খোঁজ নেওয়ার লোক আছে দেখছি তা হলে একজন।…আমিই বা ছেড়ে কথা কইব কেন দাদা তুমিই বল।

ছাড়বি কেন? ভয়টা কিসের?

বললাম, একজনের যদি এতদিনে সে হুঁশটা না হয়ে থাকে তো আমি কার জন্যে ঠাকুর-দেবতা, সাধু-সন্ন্যিসীর দরজায় দরজায় মাথা কুটে মরছি?

বাস্‌, আর যায় কোথায়!—আমার জন্যে কাউকে কারুর দরজায় মাথা কুটতে হবে না—আমি ওসবে বিশ্বাস করি না মোটে—আজকাল বিজ্ঞানের যুগ, নিজের শক্তিতে চাঁদ ধরতে ছুটেছে লোকে—এই যুগে ধুনির ছাই, ঠাকুরের ফুল!—একটা রীতিমত কলেজে-পড়া মেয়ের এই মতিগতি! নিশ্চয় ধান-খেঁসারি দিয়ে পড়িয়েছিলেন শ্বশুরমশাই—সে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি যা মুখে এল দাদা—শেষকালে যখন সিঁথির সিঁদুর পর্যন্ত নিয়ে…

সিঁদুর!…সে তো ওর জন্যেই!—বেশ শিউরেই উঠল সচিব।

হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি তোমায়?—চাই না আমার এসব—লক্ষ্মী-পুজো, মনসা-পুজো, পিত্তি পড়িয়ে উপোস, মাথায় টাক পড়িয়ে এক ইঞ্চি চওড়া সিঁদুর—যত সব সেকেলে অন্ধ সংস্কার, যতটা রয় সয় ততটুকুই ভাল…সে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি যা মুখে আসছে দাদা—অপরাধটা কি আমার? সবই ঠিকঠাক করে ঝি, চাকর আর ঠাকুরকে বলে গেছি, শুধু বেরুবার সময় পানটা হাতে করে…হ্যাঁ, কী যে বলছিলাম দাদা?—হ্যাঁ, একটু চওড়া করে সিঁদুর পরি, মা বলে গিয়েছিলেন। তাই নিয়ে খোঁটা—বিজ্ঞানের যুগ—যত কিছু অন্ধ সংস্কার…। আর সহ্যি হয় দাদা, তুমিই বল? তখন আমিও বললাম, তবে আমি আমার কুসংস্কার নিয়ে থাকি, যার খুশী সে বিজ্ঞান নিয়ে থাকুক, আজ থেকে কোন সম্পর্ক রইল না।

ঠাকুর ট্রেতে করে চায়ের সরঞ্জাম আর এক প্লেট হালুয়া আর নিমকি এনে রাখল। অচলা টী-পটটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল, অন্যায় বলেছি দাদা?

সচিব একটা নিমকি তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে বলল, কম করে বলেছিস—মাথার সিঁদুর ঠিক থাকলেই হল, আর কার সঙ্গে কি সম্পর্ক?

অচলা চা ঢালতে ঢালতে সন্দিগ্ধভাবে চোখ তুলে বলল, ঠাট্টা করা হচ্ছে!

এই দেখ! তোরা আমাদের কি ভাবিস বল্‌ দিকিন? সিঁদুর নিয়ে একজন বেটাছেলে খোঁটা দিচ্ছে, একজন ঠাট্টা করছে—কি ভাবিস আমাদের তুই?

হালকা ভাবেই বলছিল, তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ে যেতে একবার বাইরের দিকে চেয়ে নিয়ে বলল, অথচ এই সিঁদুরের জোরে কি অত্যাচারটাই তোরা না করছিস?

সুরটা হঠাৎ এত বদলে গেল যে, অচলা [illegible]য়ে দিতে যাচ্ছিল, থমকে মুখের দিকে চেয়ে বলল, দাদা!

মুখে খুব সূক্ষ্ম একটু কৌতুকের হাসি ফুটে আসছে।

সচিব ভার-ভার মুখটা একটু উলটো দিকে বেঁকিয়ে নিয়ে উত্তর করল, কি ?

ব্যাপারখানা কি বলতে হবে। তুমি যখন উঠে আসছ তখন থেকেই বুঝেছি কিছু হয়েছে একটা। নাও, বলতে হবে, ছাড়ছি নে।

ব্যাপার আর নতুন কি ?

আমি বলব তা হলে ? ঠিক ঝগড়া করে এসেছ তুমি বউদির সঙ্গে···

চাটা সামনে এগিয়ে দিয়ে হাতটা ওর হাতের ওপর রেখে বলল, এই আমার গা ছুঁয়ে বল, 'না'।

কৌতুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মুখটা।

সচিব একটু ধমকের সুরেই বলল, আমি করেছি বলতে চাস তুই ?

এত খুশীর খবর অনেকদিন পায় নি অচলা এদিকে, সেইজন্য ভেতরে যে কৌতুকরসটা ফেনিয়ে উঠছে সেটাকে চেপে রাখা দায় হয়ে পড়েছে। কোন রকমে মুখটা গম্ভীর করে উত্তর দিল, তা আমি কেন বলতে যাব যে এক হাতে তালি বাজে না। পোড়ারমুখীরাই যখন দুষী সবতাতে তখন নিশ্চয়···

আর এগুতে না পেরে ঘুরে চেয়ারের পিঠে মুখ গুঁজে চাপা হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগল।

একটু চুপচাপ গেল। রাগের চোটে (অবশ্য, বধূর ওপর) হালুয়াটা তাড়াতাড়িই খেয়ে যেতে লাগল সচিব, তারপর পিরিচসুদ্ধ চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বলল, আচ্ছা, শোন্ তা হলে মন দিয়ে সবটা অচু, তুই-ই বিচার কর্।

অচলা সেইভাবে থেকেই মাথা নেড়ে বলল, ও বাবা! আমি বিচার করতে পারব না, দুজনেই গুরুজন!

একটু থেমে খুক-খুক করে হেসে বলল, কেউ কম নয়।

চালাকি করে রায় দেওয়া হয়ে গেল—কেউ কম নয়! আচ্ছা বেশ, বিচার করতে হবে না, ঘুরে বোস্, শোন্ সবটা।···তরশুদিন বিকেলের কথা।

ওরে বাবা, ওদের আবার চারদিন!

ঘুরে বসতে যাচ্ছিল অচলা, ডুকরে হেসে একেবারে পাক খেয়ে আবার উলটে পড়ল চেয়ারের পিঠে।

সচিব চা খেতে খেতে মাঝে মাঝে গরগর করতে লাগল, বাঁদরী—পোড়ারমুখী—কখন হাসতে হয় জানে না। হাসিটা কমবার কোন লক্ষণ না দেখে—তবে চললুম এই—বলে উঠতে যাবে, নীচে গাড়ির শব্দ হল, আর তারপরই বেশ ত্রস্তপদেই ব্রজেশ ওপরে উঠে এসে কয়েক পা এগিয়ে বিস্মিতভাবেই থমকে দাঁড়াল।

একি, সচিব যে হঠাৎ ?···আর, ও ওরকম করে ঘাড় মুষড়ে রয়েছে কেন!

এলাম একবার, অনেকদিন দেখি নি। তুমি এ সময় আফিস থেকে যে ?

এলাম···বেরুবার সময় শুনলাম শরীর খারাপ, খাবে না, তাই···। আরে, হাসে যে!

যে হাসিটা একটু বন্ধ ছিল, দুজনার স্খলিত বাক্যালাপে কী সে পেল, আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। তাতে বিরোধ থেকে একেবারে সন্ধির মধ্যে গিয়ে পড়তে সুবিধাই হল। অচলা মাথাটা ঝাঁকিয়ে তুলে স্বামীর দিকে সোজা চেয়েই সেই উচ্ছ্বসিত হাসির মধ্যে বলল, উঃ ভারী দরদ! অনেক দিন দেখেন নি!—বউদির সঙ্গে ঝগড়া করে চলে এসেছেন—ওঁদের আবার চারদিন!

ঝগড়া করে! চারদিন!—দুজনের মধ্যে বোধ হয় কথাও বন্ধ!···নাঃ, কি করে পার যে তোমরা কথায় কথায় এত ঝগড়া করতে!···ওঠ, চল, মিটিয়ে ফেলতে হবে—ওঠ অচু।

এগিয়ে ওর প্লেট থেকে একটা নিমকি তুলে নিল।

একটা যেন কিছু বলতেই হয়। বোধ হয় সেই হিসেবেই সচিব বলল, অচু এখনও খায় নি যে।

সে হবে 'খন। বোন বলে না পায়, শান্তিদূত বলেও একমুঠো পাবে তো। নাও, উঠে পড়।

পুরুষকার

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

বড় মেয়ে ইন্দিরা নিরীহ মুখে যেন মায়ের দিক টেনেই বলল, না মা, এখনকার যত কিছু সব তোমার ওই ঠাকুর নারায়ণের কল্যাণে।

শুনে রমানাথবাবু হাসতে লাগলেন মুখ টিপে। দাদা আর ছোট বোন মন্দিরাও। মনোরমা দেবী রাগে গজগজ করে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে : থাম্ ইন্দি, বাড় বেড়েছে খুব না? ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ঠাট্টা করতে আর আটকায় না মুখে, লেখাপড়া শিখে মস্ত পণ্ডিত ভাবিস নিজেদের, কেমন?

এটুকুর জন্যেই বলা। ইন্দিরা মুখখানি করুণ করে তুলতে গিয়ে পিছন থেকে মন্দিরার চিমটি খেয়ে হেসে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলেও। মনোরমা দেবীর সব রাগ গিয়ে পড়ল স্বামীর ওপর : তোমার আসকারা পেয়ে পেয়েই ওরা অমন হয়েছে, নিজে তো দু হাত এক করে কপালে ঠেকালে না কোনদিন, এখন এদের সুদ্ধু দলে টান আর হাস খুব করে, যেন কত বাহাদুরির কথা!

বড় ছেলে প্রভাত প্রতিবাদ করল তৎক্ষণাৎ : আমাদের তুমি মিথ্যে বাবার দলে ফেলছ মা, রোজ ওই নারায়ণের সাত রকমের প্রসাদ আর চন্নামৃত খেয়েই তো বেঁচে আছি, ভাত আর কটা খাই?

থাম্, আর ফস ফস করতে হবে না, আছিসই তো বেঁচে, ঠাকুর-দেবতা নিয়ে ইয়ারকি ঠাট্টা না করলে কারও আর ঘুম হয় না!—রাগ করে ঘর ছেড়ে প্রস্থান করলেন তিনি।

রমানাথবাবু ছেলে-মেয়ের উদ্দেশ্যে অনুযোগ করেন এবার : কেন যে তোরা এভাবে জ্বালাতন করিস যখন-তখন, একটা বিশ্বাস নিয়ে আছে, থাকতে দে না।

কিন্তু এ ধরনের বাক-বিতণ্ডায় খুশী যে সব থেকে বেশী তিনিই হন, সেটা তাঁর মুখে এখনও স্পষ্ট লেখা। ছেলে-মেয়েরা নিজের থেকে কিছু না বললে অনেক সময় তিনিই উসকে দেন। তারপর মজা দেখেন চুপচাপ আর হাসেন।

এ রকম প্রায়ই ঘটে। যেমন আজ। ছেলে বলেছিল, দু টাকা দিয়ে লটারির টিকিট গছিয়েছে এবারে একজন, কাল ড্রইং, যদি লেগে যায়—

রমানাথবাবু নিরীহ মুখে বলে ফেলেন, তোর মাকে ভাল করে ধরলেই তো লেগে যেতে পারে।

এর বেশী আভাসের দরকার নেই। ছেলে তৎক্ষণাৎ মাকে চড়াও করল : তোমার নারায়ণকে ভাল করে একটু ভোগটোগ দিয়ে বলে-কয়ে দেখ না মা যদি লটারিটা পাইয়ে দেন।

মা বললেন, অত ঠাট্টার কী আছে, ঠাকুর সদয় হলে সবই হতে পারে। কী ছিল এই সংসার আর কী হয়েছে সে শুধু আমিই জানি।

জবাবে বড় মেয়ে ইন্দিরার ওই টিপ্পনী এবং সঙ্গে সঙ্গে মায়ের রাগ আর বাবার সকৌতুক নিস্পৃহতা।

এই হাসি-ঠাট্টা এবং রাগ-বিরাগের পিছনে একটুখানি ইতিহাস আছে। বি. এ. পাস করেও চাকরির দুর্দিনে রমানাথবাবু সাপ্তাহিক বেতনে রাবার ফ্যাক্টরির কর্মক্ষেত্রে একদা ঢুকেছিলেন ট্রলি ঠেলার কাজ নিয়ে। শক্তি-সামর্থ্য ছিল ভদ্রলোকের। তার থেকেও বেশী ছিল উদ্যম। ট্রলি ঠেলা থেকে প্রোডাকশনে এসেছেন। সাপ্তাহিক বেতনেই নাইট ডিউটি করেছেন বছরের পর বছর। সর্বোচ্চ কাজের রেকর্ড বজায় রেখেছেন সর্বত্র। কোম্পানির প্রচারপত্রে তাঁর ছবি পর্যন্ত ছাপা হয়েছে একাধিকবার। সাপ্তাহিক ছেড়ে মাসিক বেতন হয়েছে দু বছরের মধ্যে। শেষের দিকে প্রমোশন পেয়েছেন। গড়ে প্রায় বছরান্তে একটা করে। নাইট ডিউটির পালা অনেক আগেই শেষ হয়েছে। বর্তমানে বার শো টাকা মাইনের মস্ত অফিসার তিনি। বিলিতি খেতাব বা ডিগ্রী থাকলে আরও কোথায় উঠতেন ঠিক নেই। রমানাথবাবু বলেন, এ সবই হল পুরুষকার, সে যার আছে [illegible] ধাপার মাঠে ফেলে দিলেও দাঁড়াবে।

কিন্তু এই পঁচিশ বছরের ইতিহাস আবার মনোরমা দেবীর মুখে শুনলে অন্যরকম লাগবে। সকাল-

বিকেল চার দফায় ছেলে পড়িয়েও পঁচিশ টাকা হত না মাসে। আর, চাকরিও সপ্তাহে ন টাকায় শুরু। কোলে ছেলে এসেছে তখন। ওই টাকায় সংসার চালাও আবার ওই থেকে বাঁচিয়ে দেশে পাঠাও শ্বশুরের কাছে। চলে নাকি? দেনায় দেনায় হাড় কালি। শাশুড়ী অনেক আগেই গত হয়েছিলেন, চাকরির বছর খানেকের মধ্যে শ্বশুরও চোখ বুজলেন। কিন্তু আরও ছেলে থাকা সত্ত্বেও যাবার আগে নারায়ণ সেবার ভার দিয়ে গেলেন এইখানেই। নারায়ণের দয়া। নারায়ণ এলেন। নিজেদের হোক না হোক নারায়ণ সেবার ব্যবস্থায় কোনদিন কোন ত্রুটি রাখেন নি মনোরমা দেবী। অভাবের সংসারে বাড়াবাড়ি দেখে স্বামী কতদিন বিরক্ত হয়েছেন, চোখ রাঙিয়েছেন। কিন্তু মনোরমা দেবী কান দেন নি মোটে, যা করার করে গেছেন। আর এখন? দেখছিস না কী থেকে কী হয়েছে? ঠাট্টা যে করিস, কোথায় থাকতিস সব নারায়ণের অনুগ্রহ না হলে?

এই এক দুঃখ মনোরমা দেবীর। তেমন ভক্তিশ্রদ্ধা নেই কারও। ছেলেমেয়েদের যদি বা বকে-ঝকে বাগ মানানো গেল, ওই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে পেরে উঠলেন না কোনদিন। ঠাকুরের পায়ে মাথা নোয়ানো যেন মস্ত হাসির ব্যাপার। যতটা উঠেছে তাতে তো মন ওঠে না দেখি। বার শো টাকা মাইনেতেও মাসের শেষে টানাটানি। তার ওপর আবার চিন্তা, পরে কী হবে, এতবড় সংসারের ঠাট বজায় থাকবে কী করে। মনোরমা দেবীর বিশ্বাস পরের কথা না ভেবে এখনও ঠাকুরের পায়ে একটু ভক্তিভরে নির্ভর করতে পারলেই আর ভাবনা-চিন্তার কারণ থাকে না। পুরুষকার আছে তো আছে, কিন্তু তার সঙ্গে এই ভক্তিটুকু থাকতে ক্ষতি কী?

কিন্তু বলেন কাকে? সুখের থেকে সোয়াস্তি ভাল, বলে কাজ নেই। অনেক বলেছেন আর হাড়ে হাড়ে চিনেছেন। বার মাস নারায়ণের ভোগের ব্যাপার লেগেই আছে। ভোগ শেষ হতে না হতে মনোরমা দেবী ছেলেমেয়েদে[illegible] হিড় করে টেনে নিয়ে আসেন আশীর্বাদী নিতে। কিন্তু কর্তাকে?

বাড়িতে থাকলে ডাকলেই আসবেন, আশীর্বাদী নেবেন। কিন্তু মনোরমা দেবী ভুল করেও ডাকেন না তাঁকে। ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত হেসে ওঠে, যেন একটা মজার কিছু ঘটেছে। ঠাকুর-দেবতা নিয়ে এরকম হাসাহাসিতে মনোরমা দেবীর বিষম ভয়! ওভাবে আশীর্বাদী নিলে ঠাকুর তুষ্ট না হয়ে রুষ্ট হতে পারেন ভেবেই কণ্টকিত তিনি। পুরুতকে বলেন, ওঁর আশীর্বাদী আগে সংকল্পে উৎসর্গ করে নিন ঠাকুরমশাই।

বড় সংসার; তিন ছেলে, তিন মেয়ে। বড় ছেলে এম. এস-সি. পাস করে সবে একটা প্রাইভেট কলেজে মাস্টারিতে ঢুকেছে। সামান্য মাইনে। রমানাথবাবু খুশী নন একটুও। মাস্টারিতে একবার মন বসলে আর দেখতে হবে না, ভবিষ্যৎ কালো! ভবিষ্যতের কথা মনে হলেই অসহিষ্ণুতায় গরগর করে ওঠেন তিনি। ছেলেটার যদি একটুও উদ্যম থাকত। কটা বছরই বা আর আছে নিজের চাকরির। তারপর? তার পরের কথা মনে হলেই ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠেন রমানাথবাবু।

বার শো টাকার সংসার থেকেও অনটন গেল না। কেমন করে যাবে। ইন্দিরা এম. এ. পড়ছে, মন্দিরা এবারে এম. এ. পড়া শুরু করবে। তার পরের কটি পর পর ইস্কুলে পড়ছে। ইনকাম ট্যাক্স, লাইফ ইনসিওরেন্স, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বাদ দিয়ে ঘরে আনেন ন শো টাকা। দু শো টাকা বাড়িভাড়া দেন, মেয়েদের গানের মাস্টার আর বাচ্চাদের দুটি পড়ার মাস্টার এই তিন মাস্টারকে গুনে দিতে হয় দু শো টাকা। বাকি থাকল পাঁচ শো। এত বড় সংসারে মাস গেলেও পাঁচ শো টাকায় পাঁচ পয়সাও থাকে না।

মনে মনে অনেক হিসেব করেছেন রমানাথবাবু। হিসেব করে মাথা গরম করেছেন। চাকরিতে পেনসন নামমাত্র। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ভরসা। কিন্তু সে ভরসা আর কতটুকু? অথচ ইস্কুলের গণ্ডি পেরুতেই তিনটি বাকি এখনও। এসব চিন্তার মধ্যে স্ত্রীর নিশ্চিন্ততা দেখলে মেজাজ মাঝে মাঝে বিগড়েই যায় রমানাথবাবুর। যেন সত্যিই ওঁর নারায়ণ ঠাকুর এসে সব ভাবনা-চিন্তার অবসান করে দিয়ে যাবেন।

যতক্ষণ কাজ নিয়ে থাকেন ভদ্রলোক, ভাল থাকেন। অবকাশ মাত্রেই একটা বিষণ্ণতার ছায়া এসে পড়ে কেমন। এমন দিনে বড় ছেলে একটা খবর নিয়ে এল। খবর ঠিক

নয়, কথায় কথায় বলল, তার এক সহপাঠী বিলেত যাচ্ছে কিসের ট্রেনিং নিতে, দু-তিন বছর বাদে ফিরে এসে মোটা গদিতে বসে যাবে···সুযোগ সুবিধে থাকলে সেও যেতে পারত, ইত্যাদি।

আর কারও কানে ঢুকল না তেমন, কিন্তু রমানাথবাবুর কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মর্মে গিয়ে পৌঁছল। বাইরে থেকে বোঝা গেল না কিছু। নিস্পৃহ মুখে এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কিসের ট্রেনিং, ক বছরের ট্রেনিং, কত টাকা লাগবে মাসে, ফিরে এলে কী হতে পারে ইত্যাদি।

সে রাতে আর ঘুম হল না রমানাথবাবুর। তন্দ্রার মধ্যেও মগজে একটা হিসেব-নিকেশ চলতে লাগল। অফিসের কাজেও মন বসল না পরদিন। এমন বড় হয় না। সে রাতটাও ভাবনার মধ্যে কেটে গেল। পরদিন বেশ অসুস্থ দেখাল তাঁকে। তবু ভাবনা ছাড়তে পারলেন না। মনোরমা দেবী লক্ষ্য করছিলেন। উদ্বিগ্ন মুখে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে তোমার বল তো?

কিছু না।—তিনি পাশ কাটালেন।

কিন্তু রাত্রিতে একান্তে ডাকলেন স্ত্রীকে। বললেন, একটা কথা ভাবছি—

সে তো কদিনই দেখছি, কী ভাবছ এত?

ছেলেকে বিলেত পাঠালে কেমন হয়?

জবাবে মনোরমা দেবী হাঁ করে চেয়ে রইলেন খানিক। পরে জিজ্ঞাসা করলেন, বিলেত পাঠাবে, টাকা কোথায়?

এরই মধ্যে ব্যবস্থা করে নিতে হবে।

ব্যবস্থাটা কী করে সম্ভব মনোরমা দেবী ভেবে পেলেন না। বললেন, তোমার সবেতেই বাড়াবাড়ি, মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে না, তাই বরং ভাব বসে, কাজ হবে।

কিন্তু রমানাথবাবু অতশত ভাবতে রাজী নন এখন। মেয়েদের বিয়ের ভাবনা পরে ভাববেন। ভবিষ্যতের অনটন-সম্ভাবনার সঙ্গে কোনও আপোস নেই তাঁর। সেটাই বোঝাতে বসলেন স্ত্রীকে: এর পরে চলবে কী করে ভেবে দেখেছ? কটা বছর আছে আর চাকরির, তারপর? তোমার নারায়ণঠাকুর তো সত্যিই আর হাতে করে দিয়ে যাবে না কিছু। কিছু করলে তবেই কিছু হওয়া সম্ভব।

ভাবনার বোঝা খানিকটা স্ত্রীর কাঁধে চাপিয়ে একটু হালকা হলেন তিনি। শলা-পরামর্শ চলল। মনোরমা দেবী বললেন, যা ভাল বোঝ কর, কী দিয়ে কী হবে আমি তো বুঝছি না।

মন স্থির করে ফেলেছেন রমানাথবাবু। ছেলের ডাক পড়ল। বললেন, ওই যে ট্রেনিংয়ের কথা বলেছিলি, কালই একটা টেলিগ্রাম করে দে, সীট পাওয়া যাবে কি না, পেলে তোর জন্যে রিজার্ভ করা হয় যেন, তাদের জবাব এলেই টাকা পাঠান হবে। আর এদিকে তোর সেই বন্ধুর কাছে খোঁজ-খবর নে সব।

ছেলের বিস্ময় কাটতে না কাটতে টেলিগ্রাম চলে গেল। যথাসময়ে জবাবও এল। এবারে যাত্রার উদ্যোগ।

এ কদিনে বাড়ির হাওয়া পর্যন্ত বদলে গেছে। কখনও আনন্দ, কখনও অস্বস্তি। রমানাথবাবু চিন্তিত, কিন্তু বিচলিত নন। মনে মনে বরং গর্বিত একটু। এরই নাম পুরুষকার, যেমন করে হোক ব্যবস্থা একটা হবেই, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে আর কী হবে! ঘাবড়াবার মানুষ নন তিনি।

তবু পাকাপাকি হিসেবনিকেশ একটা করাই চাই। চার শো টাকা করে লাগবে মাসে। কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করতে বসলেন। বললেন, এদিকে তো দেখছি গানের মাস্টার আর পড়ার মাস্টার তুলে দিলে দু শো টাকা বাঁচে মাসে—তোমার দিকের কতটা কী করতে পার?

মনোরমা দেবী প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। গম্ভীর মুখে জবাব দিলেন, দুধ আর বাজার খরচ কমিয়ে টেনেটুনে পঞ্চাশ টাকা বাঁচাতে পারি।

আরও পঁচিশ টাকা বাঁচলে খুশী হতেন রমানাথবাবু। আর সেটা বাঁচাবার জায়গাও আছে। কিন্তু উল্লেখমাত্রে একটা গোলযোগ ঘটার সম্ভাবনা, স্ত্রীর মুখের দিকে এক-নজর চেয়েই সেটা আঁচ করে নিলেন। আপিস থেকে মাসে এক শো টাকার মত সংগ্রহ করতে পারবেন, বছরের বোনাসে সেটা শোধ হয়ে যাবে। যাই হোক, আর ঘাঁটাঘাঁটি না করে মোটামুটি নিশ্চিন্ত [illegible] তিনি।

হিসেবের দিকটা মিটে যেতে বাড়ির সকলেই উৎসাহিত। রমানাথবাবুর উদ্যম যেন দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ইন্দিরা মন্দিরা সানন্দে ছোটদের পড়ানোর ভার নিয়ে

অনেকক্ষণ বাদে মুখ খুললেন তিনি, বললেন, তোমাদের সেই ব্যাচটার কথা এখনও মনে পড়ে। আমি যখন রামপুরহাট স্কুলে মাস্টারি নিয়ে এলাম, তখন তোমরা ক্লাস ফাইভে পড়—তুমি, বিরূপাক্ষ, মৃগাঙ্ক, মিহির, তেজেশ, এই পাঁচ জন। এতদিন মাস্টারি করছি, অমন ব্যাচ আর পেলাম না। আমি তোমাদের বলতাম পঞ্চপাণ্ডব।

একটু থামলেন তিনি, তারপর বললেন, ওই পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিল মিহির। মিহির নন্দী। মনে আছে তার কথা? সে ছিল একটা জুয়েল। অনেক আশা করেছিলাম আমি তার কাছে।

পুরনো কথা ভাল করে মনে পড়ে গেল আমার। জিজ্ঞাসা করলাম, সে এখন কোথায়? কি করছে?

বলছি। আজ বড় চমৎকার সুযোগ পাওয়া গিয়েছে। তোমার চাকরটিও নেই। ধীরে ধীরে বলছি, শোন।

ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন ফণীভূষণবাবু। বলতে লাগলেন রামপুরহাটের কথা। সেখানে মিহিরকে নিয়ে তাঁর কত নাকাল, তার কথা। ছাত্রদের কাছে কত গঞ্জনা, কত অপমান। এমন কি, কদর্য কুৎসিত কথা বলতেও কেউ ছাড়ে নি, সেই সব পুরনো কথা। আমাদের জানা কথাগুলো, কিন্তু তিনি সেই জানা কথা বলেই বুঝি আরাম পাচ্ছেন। বললেন, সেসব স্ক্যাণ্ডালের কথা নিশ্চয় জান। তুমিও সেইসঙ্গে যোগ দিয়ে আমার নামে কুৎসা রটিয়েছিলে কিনা জানি নে।

যেন প্রতিবাদ করে উঠলাম, বললাম, এসব কী কথা বলছেন?

না। দোষের কি তাতে। যার মনে যা ধারণা সে তা প্রকাশ করবেই।

ফণীভূষণবাবু এবার একেবারে সোজা হয়ে বসলেন, বললেন, কিন্তু মিহির আমাকে বঞ্চনা করল, আমাকে অপদস্থ করল। আমি আর মুখ দেখাতে পারি নে রামপুরহাটে।

কি করল সে?

কি করল? ফেল করল সে ম্যাট্রিকে। আমার মুখ ডোবাল। যাকে জুয়েল বলে জেনেছি, পাঁচজনকে জানিয়েছি, সে মান রাখল না আমার। যার জন্যে কত অপবাদ বরদাস্ত করেও—

চুপ করে গেলেন ফণীভূষণবাবু। দম নিতে লাগলেন বুঝি। তারপর বললেন, তুমি তো ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে ও-স্কুল ছেড়ে চলে এসেছিলে, না? মিহির সেবারও ফার্স্ট হল, পরের বছরও। ইতিমধ্যে সে যে রামপুরহাটের কতকগুলো বদ ছেলের সঙ্গে মেশা আরম্ভ করেছে জানতেই পারি নি। ওদের সঙ্গে প্রত্যেক শনিবারে নাকি চলে যেত তিনপাহাড়ে। তিনপাহাড় দেখেছ কখনও? যাও নি বুঝি সেখানে? খাসা জায়গা। তুমি আর্টিস্ট, তোমার আরও ভাল লাগবে। জায়গাটা যেমন মনোরম, দুষ্টুমি করার পক্ষেও তেমনি আইডিয়াল। ব্যাপারটাকে মোলায়েম করে দুষ্টুমিই বললাম।

এই সব ব্যাপারে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে নাকি আমাদের সেই ক্লাস-ফ্রেণ্ড মিহির নন্দী। অল্প দিনের মধ্যেই নাকি যথেষ্ট নষ্ট হয়ে যায় সে। ফলে, শুধু ম্যাট্রিক ফেল করা কেন, আর পড়াশুনাই হল না তার।

আক্ষেপের কথা এই—মিহিরের এই পরিবর্তনের জন্যেও নাকি দায়ী সাব্যস্ত হন আমাদের মাস্টারমশাই এই ফণীভূষণ বিশ্বাস।

তিনি বললেন, আমি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা তবু করতে লাগলাম, ভূপাল। কি করে তাকে ফেরাতে পারি তার অনেক পথ ভাবতে লাগলাম। অকপটেই বলি তবে তোমাকে—মিহির গোল্লায় গেছে বলে তাকে সকলে বর্জন করল, তার বাড়ির লোকেরাও। কিন্তু আমি ত্যাগ করতে পারলাম না তাকে। একে তুমি যদি বল দুর্বলতা, আমি তা হলে চরম দুর্বল, ভূপাল।

তাঁর গলা ধরে এল, ক্লান্তিতে যেন স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল।

অমন একজন বলিষ্ঠ মানুষের মুখে এই কথাগুলো শুনে আমার বড় মায়া হতে লাগল তাঁর উপর। কিন্তু মায়া-মমতা প্রকাশ করার ভাষা খুঁজে পেলাম না।

মিহিরকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে ঠিক পথে আনার জন্যে অনেক চেষ্টা নাকি তিনি করেছেন। তাঁর এই নতুন চেষ্টার জন্যে নতুন করে তিনি বিরাগভাজন হয়েছে অনেকের কাছে। এমন কি তাঁর স্কুলের চাকরি নিয়েও নাকি টানাটানি হয়েছে অনেক।

বললেন, আমি কি করলাম জান? সুশ্রী একটা মেয়ে দেখে বিয়ে দিলাম মিহিরের। আর, বোলপুরের ডাক্তার তাপস ব্রহ্মচারীকে বলে তার ডিস্পেন্সারিতে কম্পাউণ্ডারের চাকরি জুটিয়ে দিলাম তার।

এর পর লক্ষ্য করতে লাগলাম মতি ফেরে কিনা মিহিরের। তার সে চেহারা তখন আর নেই, সে রঙ নেই, সে নধর শরীরও নেই। সে তখন হয়ে গেছে অন্য মানুষ। ভাবলাম, ঠিকমত ভদ্রভাবে জীবন কাটালে আবার সে হয়তো ফিরে পাবে সবই। আমরাও হয়তো ফিরে পাব আবার সব। ফিরে পাব সেই জুয়েলকে। বোলপুর তো রামপুরহাট থেকে দূর নয়। প্রায়ই যেতাম ওর খোঁজখবর নিতে। কি[illegible]ত খোঁজ আর নেব। আমারও তো সংসার অ[illegible] ছেলেপুলে আছে, তাদের প্রতি কর্তব্যও তো [illegible]রি।

কিন্তু আক্ষেপ এই—ফণীব[illegible] চেষ্টা নাকি ব্যর্থ হল। বিয়ের পর কিছুদিন সে একটু [illegible]ান্ত ছিল, আবার হয়ে উঠল দুরন্ত।

বললেন, অপবাদ অপযশ দুর্নাম অনেক ভোগ করেছি। বয়স হয়েছে। আর যেন সহ্য হয় না। এবার একটু মুক্তি চাই। তাই এসেছি তোমার কাছে পরামর্শের জন্যে।

ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কী করতে পারি, বলুন।

আমাকে সাহায্য কর ভূপাল।

কী সাহায্য করব, কী পরামর্শ দেব, কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। একবার তাকালাম ঘড়ির দিকে। সিনেমা ভাঙতে আর কত দেরি, হিসাব করতে লাগলাম।

ফণীভূষণবাবু বললেন, মোস্ট ইর়েসপন্‌সিবল ক্রিচার। য়োর্ ক্রুয়াল অ্যান এ ব্রুট। নিজের পাপ সহ্য করতে না পেরে সুইসাইড করল মিহির—মরফিয়া ইনজেকশন নিয়ে। তার স্ত্রীর কথা মনে হল না তার। এই হেল্‌প্‌লেস মেয়েটার কি হবে গতি, তা ভাবলও না।

ডাক্তার ব্রহ্মচারীর কাছে অনেক গালমন্দ খেতে হল ফণীবাবুকে। কিন্তু সে সব তুচ্ছ। মিহিরের স্ত্রীকে নিয়ে তিনি পড়লেন বিপদে। তাঁর গৃহে ঠাঁই হল না মেয়েটার। ওসব আপদ ঘরে তুলতে রাজী নয় কেউ।

রামপুরহাটের ইস্কুলের চাকরি মানে মানে ছেড়ে দিয়ে ফণীবাবু গেলেন মালদহে চাকরি নিয়ে। মেয়েটিকে তো ফেলতে পারেন না, তিনি দেখেশুনে বিয়ে দিয়েছেন, খানিকটা দায়িত্ব তো তাঁর আছেই। কী করেন? তিনি তাকেও নিয়ে গেলেন মালদহে। সেখানে তার জন্যে তাঁদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে একটা ঘর ভাড়া করে দিলেন।

সংসারী মানুষ আমি। ছেলেপুলে আছে। বড় হয়েছে তারা। বাড়িতে একটা অশান্তি বাধানো ঠিক নয়। আমি গিয়ে গিয়ে দেখে আসি মেয়েটাকে—এইমাত্র।

শুয়ে পড়লেন ফণীবাবু। চোখ বুজে বললেন, একবার যাও মালদহে। কী ব্যাপার দেখে এস। কী স্ক্যাণ্ডাল। মুখ দেখানো ভার। মিহিরের সঙ্গে কী যে শত্রুতা ছিল আমার! সে বেঁচে থেকে আমাকে অপদস্থ করল, মরে গিয়েও রেহাই দিল না!

আমার বুক দুরদুর করে কাঁপতে লাগল। ইনি এখন কী প্রস্তাব যে করে বসবেন, কী সাহায্য চাইবেন, এবং কী পরামর্শ—কে জানে। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতে ভরসা পাচ্ছি নে।

ফণীবাবু উঠলেন, বললেন, মাধবীকে ডাকি। আলাপ করিয়ে দিই তোমার সঙ্গে।

বাধা [illegible]গেলাম, তিনি বললেন, তোমারই তো ক্লাস-ফ্রেণ্ডের ওয়াইফ। যত দায়িত্ব সব কি এই মাস্টারমশাইয়েরই, তোমাদের কি কিছু নেই?

তাঁর মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করলাম এবার। ওই চোখ দুটোর চাউনির ভিতর থেকে কিছু ধরা যায় কিনা দেখার চেষ্টা করলাম। বুঝতে পারলাম না কিছু।

আমা'কে তিনি যেন সাহস দিয়ে বললেন, বি ব্রেভ, অ্যাণ্ড ইউ উইল বি হ্যাপী। মাধবী বড় ভাল মেয়ে।

কোনও মেয়ে সম্বন্ধে কোনও সার্টিফিকেট চাই নি, কিন্তু আমি ভীত হয়ে উঠলাম ভয়ানক। কি বলব কিছু বুঝে উঠতে পারলাম না। তিনি বললেন, ডাকি ওকে।

এমন সময় দরজায় শব্দ হল। ভৃত্য এসে গেছে। বুকে যেন বল পেলাম। বললাম, মাস্টারমশাই, কি রান্না হবে।

শব্দ করে হেসে উঠে তিনি বললেন, এই রাত বারোটায় রান্না? বেশ হোক। আজ একটা নতুন উৎসব, কি বল?

হঠাৎ যেন তাঁর চোখে একটা ভয়ানক অচেনা দৃষ্টি দেখতে পেলাম। ও-দৃষ্টিটার মানে কী? আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে উঠল। চুপ করে বসে রইলাম।

দরজায় আবার খুটখুট শব্দে আওয়াজ হতেই মাস্টারমশাই দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বললেন, এস ব্রাদার। দেখ গিয়ে ভেতরে কে বসে আছেন।

এই নতুন মানুষটির কথা বলার এই ধরন দেখে এবং তাঁর এই আচরণ দেখে বুঝি একটু আশ্চর্যই হয়েছে ভৃত্য।

আমার মুখের দিকে তাকাল সে। যেন জানতে চায়, কে ইনি।

কিন্তু ইনি যে কে তা জানানো আমার পক্ষেও কম কঠিন নয়। অনেক কাছ থেকে যখন আমরা দেখেছি এঁকে তখনও এঁর উপর খুব প্রসন্ন ছিলাম না। কিন্তু তখন এ কথা জানতাম যে, লোকটা খুব অমায়িক। সে অমায়িকতা তো নেহাত বাইরের জিনিস। তাঁর ভিতরটা সেদিনও দেখি নি, আজ দেখা আরও অসম্ভব।

কালো পাড়ের আড়ালের মুখটা মনে পড়ছে। বেচারীর উপর একটু মায়াও যে না হচ্ছে তা নয়। মিহির সম্বন্ধে যা শুনলাম, সে হয়েছিল তার স্বামী। আর এখন আমাদের মাস্টারমশাই ফণীবাবু তার গার্জেন।

এ দুজনের মধ্যে কে যে ভাল, সে কথা আমার জানার কথা নয়। তা বলতে পারে বুঝি ও।

ভৃত্য ভিতরে চলে যেতে আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, মালদা থেকে বুঝি পালিয়েও চলে আসতে হল?

স্বীকার করে ফেললেন তিনি, বললেন, হ্যাঁ। তুমি একটু আশ্রয় দাও। আমাকে না দাও, ওকে।

কী উত্তর দেব বুঝতে পারলাম না, বললাম, ভেবে দেখি।

তিনি বললেন, ফেলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছি ভেব না। আমি মাঝে মাঝে এসে খোঁজ নিয়ে যাব।

আবার বললাম, ভেবে দেখি।

দেখলাম, ভ্রূ দুটো নড়ে উঠল ফণীবাবুর।

আধুনিক মার্কিন কবিতার ধারা

দক্ষিণারঞ্জন বসু

আমেরিকার বিখ্যাত লাইব্রেরি অব কংগ্রেসের 'পোয়েট্রি কনসালটাণ্ট' বিখ্যাত মার্কিন কবি র‍্যান্দাল জারেল আলোচনাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন : আমেরিকার কোনও একজন আধুনিক কবিকে সমগ্র মার্কিন কবিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি বলা চলে না। যেমন ধরুন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইংলণ্ডের কাব্যের রোমাণ্টিক যুগের প্রতিনিধি। টেনিসন ভিক্টোরীয় যুগের। আমেরিকায় কিন্তু এই রকম প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এমন কবি নেই।

বর্তমান যুগের পরিবর্তিত অবস্থা সম্ভবতঃ এর কারণ। পৃথিবীতে সবক্ষেত্রেই এখন একটা ওলট-পালট অবস্থা দেখা দিয়েছে। আমাদের পায়ের তলার মাটি পর্যন্ত সরে যাচ্ছে। এই অবস্থায় অভিজ্ঞতার সমতা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে অনেক কিছু ঘটছে যে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে না পেরে মানুষ আজ নিজের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজছে। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়-কুটো আঁকড়ে থাকে, আজকের মানুষ কিছু না পেয়ে তেমনই নিজেকেই আঁকড়ে আছে। এর ফলে সব অভিজ্ঞতা আজ ব্যক্তি-কেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। আনন্দ আজ আর সর্বব্যাপ্ত নয়। একটি মানুষের মনেই তার উদ্ভব ও বিলয়। কবিদের ভাষাও তাই পৃথক। কিন্তু এদের সবাইকে একত্রিত করেই গড়ে উঠেছে মার্কিন কবিতার বৈচিত্র্য।

আধুনিকতার প্রচণ্ডতা অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় আমেরিকাকেই বেশী আঘাত করেছে। তার ফলে কবিদের মনে কবিতার বিষয়বস্তুর মধ্যেও প্রচুর বৈচিত্র্য এসেছে—অগডেন ন্যাশের চতুর ছন্দ থেকে শুরু করে রবার্ট ফ্রস্টের মহিমান্বিত কাব্য পর্যন্ত এই বৈচিত্র্যের বিস্তার। এমিলি ডিকনসন, জারেল, শাপিরো, উইলিয়ামস্, পাউণ্ড, অডেন, কামিংস প্রভৃতি সকলকে নিয়েই গড়ে উঠেছে মার্কিন কাব্য-সাহিত্য।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের তুলনা করলে কবিতা ও কবিত্বানুভূতির মধ্যে আজ যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। মার্কিন কবিতার পূর্ব-ইতিহাসও কাব্য-সাহিত্যে ঐতিহ্যশালী অন্য যে কোনও দেশের মতই। প্রথম দিককার সেই সব কবিতায় থাকত গাছপালা আর জীবজন্তুর বর্ণনা, বিভিন্ন ঋতু পরিবর্তনে কবির বিস্ময় ইত্যাদি। স্মারক-কাব্য এর অনেকটা স্থান জুড়ে ছিল এবং অ্যানা ব্র্যাডস্ট্রীটও (যাঁর 'টু মাই ডিয়ার অ্যাণ্ড লাভিং হাজব্যাণ্ড' আজও রয়েছে) মানুষের বিভিন্ন বয়স, বিভিন্ন ঋতু সম্পর্কে না লিখে পারেন নি। ইংরেজ কবি এডওয়ার্ড টমসনের "সীজনস" ব্রায়াণ্টকে প্রভাবি[ত] করেছিল এবং তিনিই প্রথম মার্কিন মহাকাব্য লেখেন [।] জন উইলসনের কবিতায় স্প্যানিয়ার্ডদের প্রতি ইংরে[জ] কলোনীবাসীর ঘৃণা ফুটে উঠেছে। কিন্তু এই কবিতা[য়] সর্বত্রই যে জিনিসটি বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হ[ল] আগন্তুকদের একটা নতুন জগতের স্বপ্ন। মহৎ উদার [ও] শান্তিময় ভাষায় তাদের সেই স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমান যুগের আরও একটু কাছে আসা যাক [।] হুইটিয়ার ও লংফেলো নৈসর্গিক কবিতার ধারাকে আর[ও] এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এডগার অ্যালান পো স্বসৃষ্ট এ[ক] বিচিত্র জগতে বাস করতেন এবং এই জগতের 'মেজাজ' এখনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে রয়ে গেছে। অন্য দি[কে] এমার্সনের কবিতায় আধ্যাত্মিক ভাব ফুটে উঠেছে সবচে[য়ে] বেশী।

ওয়াল্ট হুইটম্যান আসার সঙ্গেই আমেরিকায় 'বর্তমা[ন] কবিতার যুগে'র সূচনা। কবিত্বানুভূতি এবং কবিতা[র] ভাষা এই দুই দিক দিয়েই তিনি নবযুগের প্রবর্তক [।] সবচেয়ে সাবলীলভাবে তিনি কবিতা লিখতে পেরেছেন [।] তাঁর গণতন্ত্রের সংগীতের সুর আজকের আধুনিক কাব্য জগতেও ধ্বনিত হচ্ছে।

হুইটম্যানের কবিতার সম্বন্ধে যেটা সবচেয়ে প্রথমে লক্ষ্য করার বিষয় সেটা হচ্ছে তাঁর কাব্যের সজীবতা এব[ং] মানবীয় আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির প্রকাশ। নিজেকে তিনি 'তুমি' বলে জগতের সামনে উপস্থিত করেছেন এব[ং] এই 'তুমি'র মধ্যে দিয়েই এক ব্যক্তিবিশেষ বিশ্বজনীন হ[য়ে] দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের গুরুত্ব তাঁর কল্পনায় ছো[ট] হয়ে যায় নি :

> "The whole theory of the universe is directed to o[ne] single individual—namely to You."

অতীত, বর্তমান এবং তাঁর স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্ব[প্নে] অনুপ্রাণিত ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখপাত্র তিনি [।] 'Song of Myself' কবিতায় তিনি নিজেকে সাধার[ণ] লোকেদের একজন বলেই ভেবেছেন :

> "I am enamoured of growing out-doors,
> Of men that live among cattle, or taste of the oceans
> or woods,
> Of the builders and steerers of ships, and the
> Wielders of axes and mauls, and the driv[ers of] horses;
> I can eat and sleep with them week in and week out."

কিন্তু যখন তিনি সমগ্র বিশ্ব এবং অনন্তের কথা বলে[ন] তিনি তাঁর পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কবিদের মত খাঁ[টি] আমেরিকান।

নতুন জগতের স্বপ্ন চার শো বছর ধরে প্রত্যেকটি আমেরিকান কবির অন্তরে যে সাড়া জাগিয়েছিল, হুইটম্যানও অন্তরে সেই সাড়া অনুভব করেছিলেন।

"Walt Whitman am I, a Kosmos, of
Mighty Manhattan the son,..." (Song of Myself)

কিন্তু যদিও তিনি স্বাধীনতার এবং মানুষের গান গেয়েছিলেন এবং এই দিক দিয়ে বর্তমান যুগের কবিতার মূল সুরটি ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তবুও ম্যানহাটেনের এই প্রিয় সন্তানের কবিতার গভীর আশাবাদ আধুনিক আমেরিকার কবিতায় যেন খুবই বিরল হয়ে পড়েছে।

হুইটম্যানের পর মার্কিন-সাহিত্যে যাঁর খ্যাতি অত্যন্ত আকস্মিকতা নিয়ে প্রকাশ পেল তিনি মহিলা কবি এমিলি ডিকিনসন।

এমিলি ডিকিনসনের খ্যাতি প্রধানতঃ গীতিকাব্যের রচয়িত্রী হিসাবে। তাঁর লেখা গীতিকবিতার সংখ্যা প্রায় ২ হাজারের মত। বিচিত্র শখ ছিল তাঁর। হাতের কাছে যা টুকরো কাগজ পেতেন, তাতেই তিনি তাঁর কবিতার খসড়া করতেন। তাঁর কবিতাকে অনেকেই প্রথমে 'অদ্ভুত' ভাবতেন। কিন্তু তাঁর যে গুণাবলী উনিশ শতকের কবিদের বিমূঢ় করেছিল, ঠিক সেই গুণাবলীই বিংশ শতাব্দীর কবিদের অনুপ্রাণিত করেছিল। নিজেদের চিন্তাকে প্রকাশ করার নতুন প্রণালী সন্ধান করতে গিয়ে এই শতাব্দীর কবিরা তাঁর 'ইচ্ছাকৃত বিকৃতি' থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন।

ডিকিনসনের কবিতার চরণগুলো সাধারণতঃ সংক্ষিপ্ত এবং কখনও কখনও দুর্বোধ্যও। কিন্তু অধিকাংশ জায়গাতেই কল্পনার চমকপ্রদ সজীবতা লক্ষ্য করা যায়। তিনি লিখেছেন: 'একটা সাপ যেন রৌদ্রের মধ্যে বেণী খোলা চাবুকের মত', 'বাতাসের আঙুলগুলো যেন আকাশকে চিরুণী দিয়ে আঁচড়ে দিচ্ছে।' এমনই সব।

কোনও কোনও সময়ে তিনি ভগবানকে তাঁর পুরনো বন্ধুরূপে কল্পনা করেছেন, যেন অনায়াসে অবাধে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আবার কয়েকটি কবিতায় তাঁর তাপিত চিত্তেরও প্রকাশ দেখা গিয়েছে।

শান্তির জন্য তাঁর আগ্রহ ও আকুলতা ছিল এতই তীব্র যে অনেক সময় শান্তি যখন সুদূরপরাহত তখনও তিনি মনে করতেন, প্রত্যাশা করতেন শান্তি সমাসন্ন বলে। একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন:

"I many time thought peace had come,
When peace was far away;
As wrecked men deem they sight the land
At centre of the sea..."

কবি এমিলি ডিকিনসনের এই প্রশান্তির ভাব তাঁর অসংখ্য ছোট ছোট কবিতার উপমার মধ্যে খুব সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন:

"How happy is the little stone
That rambles in the road alone,
And does not care about careers;
And exigencies never fears...
And independent as the sun,
Associates or glows alone,
Fulfilling absolute decree
In casual simplicity".

ডিকিনসনের এমনই সব আশ্চর্য অনুভূতি বিংশ শতাব্দীর কবিদের প্রভাবিত করলেও তাঁর সমসাময়িক কালকে বিমূঢ়ই করেছিল। তখনকার আর কোনও কবি তাঁকে অনুসরণ করে কবিতা লিখেছেন বলে জানা যায় না।

পরবর্তী কালের কবিদের মধ্যে যাঁর কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে, তিনি রবার্ট ফ্রস্ট্। আজকের আমেরিকার জীবিত কবিদের মধ্যে তিনি প্রথমের সারিতে প্রথম এবং একথাও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সর্বকালের বিখ্যাত কবিদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। তিনি হাস্যোদ্দীপক এবং বেদনাময় কাহিনীর মধ্য দিয়ে নরনারীর হৃদয়ের কথা বলেন। পারিপার্শ্বিক জগতের সৌন্দর্য সম্পর্কে তিনি সচেতন এবং তাঁর লেখা পৃথিবী এবং পরলোক দুয়েরই কাছাকাছি। পৃথিবীকে ঘৃণা না করে দূরে সরে যাওয়া এবং না এড়িয়ে গিয়ে প্রত্যাবর্তন করা, এই হচ্ছে তাঁর কবিতার আসল কথা, কারণ তিনি যৌবন, প্রেম এবং মৃত্যুকে জেনেছেন। তাঁর একটি ছোট্ট কবিতার মধ্যে এই ভাবটা খুব ভাল ভাবে ফুটেছে:

"Nature's first green is gold,
Her hardest hue to hold
Her leaf's an early flower,
But only for an hour."

কোনও মানুষের প্রতিজ্ঞার প্রতি সাহিত্যসুলভ করুণা দেখানো ফ্রস্ট পছন্দ করেন না। যখন কারুর কিছু করবার ক্ষমতা নেই, তখন পারিপার্শ্বিক অবস্থা-প্রবাহ থেকে তার দূরে সরে যাওয়াই ভাল। মাটি এবং মানুষের তিনি দৃঢ় সমালোচক, কিন্তু তবুও চারিদিকের বিচিত্র জিনিসকে তিনি ভালবাসেন:

"And were an epitaph be my story
I would have a short one ready for my own
I would have written of me in stone
He had a lover's quarrel with the world."

বছরের মধ্যে শীতকাল আর সারাদিনের মধ্যে রাত্রিকেই তিনি পছন্দ করেন। "My November's Guest" কবিতায় তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন:

"The love of bare November days
Before the coming of the snow."

ফ্রস্টের কবিতার আর একটি আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা। "অনেক দেখেছি আমরা, কিন্তু সত্যি আমরা কোথায়?" জীবন-সীমার বাইরেও কবি

জ্ঞানের অনুসন্ধান করতে চান—কবি আশা করেন সেইখানেই তিনি মুক্ত হবেন, স্বাধীন হবেন।

আমেরিকার সৌন্দর্যের প্রভাব ফ্রস্টের ওপরও পড়েছে। নিউ ইংল্যাণ্ডের সুন্দর দৃশ্যাবলী দেখতে এবং সেখানকার কৃষকদের গৌরব-গাথা গাইতে তিনি যত ভালবাসতেন, এমন আর কিছুকেই বাসতেন না। কৃষকদের নিয়ে লেখার ব্যাপারে তাঁর চেয়ে উপযুক্ত কবি আর কেউই নেই। "Mowing", "The Pasture" ইত্যাদি বইতে তিনি কৃষকদের নিয়েই লিখেছেন। আমেরিকা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

"The land was ours before we were the land's
She was our land more than a hundred years
Before we were her people. She was ours
In Massachusetts, in Virginia......"

একজন সমালোচক ফ্রস্টের কবিতার সুরের প্রশান্তির সঙ্গে রোমান কবি হোরেসের সুরের তুলনা করেছেন। আমেরিকানরা তাঁকে ঋষি-কবির সম্মান দিয়েছে। আজ এই পঁচাশি বছর বয়সেও তিনি তাঁর নির্জনতা বজায় রেখে চলেছেন।

কিন্তু ফ্রস্টকে সাধারণতঃ অন্যান্য আধুনিকদের থেকে পৃথক করে দেখা হয়। তাঁর কবিতার সুর একটু পৃথক। সব সময়েই যে তিনি আধুনিক চিন্তা ও প্রকাশধারা অনুসরণ করেন তাও নয়।

সাধারণতঃ অনেকে বলে থাকেন এই আধুনিক কবিতায় আন্তরিকতার স্পর্শ নেই। কিন্তু নতুন কবিরা পূর্ববর্তীদের তুলনায় আরও সত্যনিষ্ঠভাবে জীবনকে দেখতে চেয়েছেন এবং অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন নতুন ভাবে।

উইলিয়াম কার্লো উইলিয়ামস্ ১৯০৯ সন থেকে কবিতা লিখছেন। প্রথম দিকে তিনি এজরা পাউণ্ড, ওয়ালেস ষ্টিভেন্স, হিল্‌ডা ডুলিটল ও ইউরোপীয় চিন্তা-ধারার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু উইলিয়ামস্ নিঃসন্দেহে আমেরিকার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম এবং তিনি একজন খাঁটি আমেরিকান কবি। তিনি যা দেখেছেন তার স্বচ্ছ ও সুন্দর বর্ণনা তাঁর কবিতায় অদ্ভুত ফুটে উঠেছে। উইলিয়ামসের কাব্যধর্মের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে 'ইমেজিস্ট' কথাটা ব্যবহার করা চলে। তাঁর এই সব ছবির পরিচ্ছন্নতা ও সজীবতা বিস্ময়কর। আর একটি গানের সামগ্রিক ফলশ্রুতি অর্জনই তাঁর লক্ষ্য। তাঁর কবিধর্মকে তিনি প্রকাশ করেছেন এই ভাবে :

"It's all in
the Sound. A Song.
Seldom a Song. It Should
be a Song..."

কিন্তু তাঁর প্রথম দিকের কবিতার অনেক বৈশিষ্ট্যই শেষের দিকে হারিয়ে গেছে। শেষের দিকে তাঁর কবিতায় অস্পষ্টতা এসে গেছে। শেষের দিকে কবিতার আঙ্গিক[illegible] নিখুঁত করার দিকেই তাঁর দৃষ্টি পড়েছে। তাঁর কা[illegible] কাব্যের গঠন কাব্যসৃষ্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। 'Collecte[illegible] Later Poems'-এর ভূমিকায় তিনি বলেছেন :

"There is no poetry of distinction without form[illegible] invention, for it is in the intimate form that works [illegible] art achieve their exact meaning..."

অন্যান্য নতুন কবিদের মত উইলিয়ামসের কবিতা[illegible] 'মুক্তছন্দে' (free verse) লেখা। কিন্তু পার্থক্য রয়েছে। তাঁর পংক্তিগুলি অত্যন্ত দৃঢ় সংবদ্ধ। মাঝে মা[illegible] সেগুলো হয়তো স্বচ্ছন্দ নয়, কিন্তু বিস্ময়কর রকমের সূক্ষ্ম।

এজরা পাউণ্ড উইলিয়ামসের বিপরীতধর্মী। মার্কি[illegible] কবিতায় উইলিয়ামসের একটা নির্দিষ্ট অবদান রয়েছে, কিন্তু উইলিয়ামসের প্রথম দিকের অনুপ্রেরণা যিনি যুগিয়েছিলেন সেই পাউণ্ড নিজেকে দুর্বোধ্যতার আড়ালে অস্পষ্ট করে রেখেছেন। উইলিয়ামস্ বিনা দ্বিধায় বলতে পারেন :

"Good ! the air of the
Uplands is Stimulating,"

কিন্তু পাউণ্ডের প্রথম Canto-র সুন্দর ছন্দে শুধু বিষাদ প্রকাশ :

"I slept in Circe's ingle
Going down the long ladder unguarded,
I fell against the buttress,
Shattered the nape-nerve, the Soul sought Avernus.
But thou, O King, I bid remember me, unwept, unbur[illegible]
Heap up mine arms, be tomb by Sea-board,
and inseri bed,
A man of no fortune, and with a name to come
And set mine oar up, that I swing mid-fellows".

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কার হয়ে ওঠে, পাউণ্ডের লিরিকধর্মী কবিতার লেখার সামর্থ্য এবং এক অপূর্ণ স্বপ্নের জন্য বিষাদ। তাঁর ব্যক্তিত্বের মত তাঁর কবিত্বশক্তিও বিরাট। কিন্তু তাঁর বিপর্যয় এল অন্য পথে। ইউরোপীয় সংস্কৃতির দ্বারা তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং হতে চেয়েছিলেন সাহিত্যরাজ্যের ডিক্টেটর। অনেক লেখকের, যেমন অ্যামী লোএল বা হিল্‌ডা ডুলিটলের তিনি অযাচিতভাবেই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। প্রচলিত রীতি মোটেই মানেন না, বড় বেশী ইউরোপীয়'—এই অভিযোগে তাঁর অধ্যাপকের চাকরিটি গেল। বড় বেশী 'ইওরোপীয়' বলে তিনি আমেরিকার কাব্য-জগৎ থেকেও বিতাড়িত হলেন।

'Tulips and Chimneys'-এর মাধ্যমে যখন ই. ই কামিংসের আবির্ভাব ঘটল তখন তিনি 'বিপ্লবী' হিসেবে অভিনন্দিত হলেন। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে তিনি যথাসম্ভব স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন বলেই এই খ্যাতি তিনি পেয়ে[illegible]

ছিলেন। কিন্তু ব্যাকরণের বিকৃতি সত্ত্বেও তিনটি জিনিস তাঁর কবিতায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথমতঃ—

"One thought alone : to do or die
For God for Country and for Yale."

দ্বিতীয়তঃ, বয়স্কদের সম্পর্কে বীতরাগ; তৃতীয়তঃ, বিদেশীদের সম্পর্কে একটা অপছন্দের ভাব। প্রেমও আছে এবং তাঁর 'I×I' কবিতায় এই প্রেমের প্রকাশ সর্বাপেক্ষা সুন্দর :

"Sweet Spring is your
time is my time is our
time for springtime is love-time
And viva sweet love."

কথায় এই চাতুরীর পেছনে ভাষা ও অনুভূতির খাঁটি মার্কিন সজীবতা ঢাকা পড়ে নি।

জন ক্রো র‍্যানসমের কবিতায় বুদ্ধি, ব্যঙ্গ ও বীরত্ব ভাবের উপভোগ্য সংমিশ্রণ ঘটেছে। লিরিক কবিতার ক্ষেত্রে র‍্যানসমের ক্ষমতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর লিরিক কবিতাগুলিতে ছন্দের সৌন্দর্যের সঙ্গে ব্যঙ্গ ও বাক্‌চাতুর্যের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। "Bells for John Whiteside's Daughter" থেকে উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি স্তবক উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"There was such speed in her little body,
And such lightness in her footfall,
It is no wonder that her brown study
Astonishes us all.

Her wars were bruited in our high window
We looked among orchard trees and beyond ;
Where she took arms against her shadow,
Or hurried to the pond

The lazy geese, like a Snow cloud
Drippling their Snow on the green grass,
Tricking and stopping, sleepy and proud,
Who cried in goose, Alas,
For the fireless heart within the little
Lady with rod that made them rise
From their noon apple dreams, and Scuttle,
Goose-fashion under the skies !"

আর্চিবল্ড ম্যাকলীশ টি. এস. এলিয়ট ও এজরা পাউণ্ডের কাছে ঋণী। তাঁর কবিতা নিয়ে অনেক পাঠকের মধ্যে ভুল বোঝার সৃষ্টি হয়েছিল। ম্যাকলীশ ঘোষণা করেছিলেন : 'I speak to my own time, to no other time.' এবং নিজেকে চিত্রায়িত করেছিলেন এই অনিশ্চিত বিশ্বের এক হ্যামলেট রূপে। তাঁর "Too Late Born" কবিতায় একটা শোকসূচক ভাব ছড়িয়ে আছে এবং অনুরূপ পরিবেশ ম্যাকলীশের অনেক কবিতারই বৈশিষ্ট্য :

"We too, we too, descending once again
The hills of our own land, we too have heard
Far off—Ah, que Ce Cor a longue haleine—
The borne of Roland in the passages of Spain,
The first, the Second blast, the failing third,
And with the third turned back and climbed once more
The Steep road Southward, and heard faint the sound
Of swords, of horses, the disastrous war,
And crossed the dark defile at last, and found
At Roncevarx upon the darkening plain
The dead against the dead and on the silent ground
The silent slain—"

ত্রিশের যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে অডেন ও এলিয়ট ভারতীয় পাঠকদের কাছে বিশেষ পরিচিত। অডেন মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন, কিন্তু এলিয়টকে মার্কিন কবিতার আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত হবে না। আমেরিকায় জন্ম হলেও দীর্ঘকাল ধরে তিনি লণ্ডনে বাস করেছেন এবং তাঁর অধিকাংশ রচনা সেখানেই লেখা।

আজকের দিনের কবিদের মধ্যে কার্ল শাপিরো ও রান্দাল জারেল, সবচেয়ে জনপ্রিয়। শাপিরোর কবিতায় একটু 'সেন্টিমেণ্টালিটির' পরিচয় পাওয়া যায় এবং এ ক্ষেত্রে তিনি নিঃসন্দেহে লুই ম্যাকনিস কর্তৃক প্রভাবিত। বিখ্যাত 'Poetry' পত্রিকার তিনি সম্পাদক। তাঁর 'V-Letter' বইটির জন্য তাঁকে 'পুলিৎজার পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে।

রান্দাল জারেল কিন্তু একেবারে অন্য ধরনের। সহজ, সরল ভাষায়—যা একজন চাষিও বুঝতে পারে—তিনি যুদ্ধ ও যুদ্ধের করুণ দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। নিজে সৈনিক হিসাবে তিনি জীবনের নগ্ন সত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং এর ফলে তাঁর সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হয়েছিল। ইংরেজ কবি ওএনের মত তিনিও যুদ্ধক্ষেত্রের ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়ে তুলিয়েছেন এবং দমিত ক্রোধে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ :

"The lives stream out, blossom, and float steadily
To the flames of the earth, the flames
That burn like stars above the lands of men.
... ...The years meant this ?
But for them the bombers answes everything."

এতক্ষণ যা আলোচনা করা গেল মার্কিন কবিতা শুধু তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমের-ইণ্ডিয়ান ও নিগ্রো কবিতাও এর অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে নিগ্রো কবিতার শাখাটি বেশ পরিপুষ্ট। সে বিষয় পরের প্রবন্ধে আলোচ্য।

ইতিহাস

রণজিৎকুমার সেন

শিতিকণ্ঠ যখন অধ্যাপক নীলাম্বর মুখার্জির দরজার কড়ায় এসে ঘা দিল, নীলাম্বর মুখার্জি তখন তাঁর দ্বিতলের ঘরে বসে আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে একটি তথ্যবহুল গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত। নীলাম্বর বাংলার অধ্যাপক। তাঁর কলেজেরই ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের ছাত্র শিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য। নীলাম্বর মুখার্জির টিউটোরিয়াল ক্লাসে তার নিয়মিত যাতায়াত। বাংলা সাহিত্যের প্রতি ছেলেটির বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করে নীলাম্বর তাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখতেন। ক্লাসে তো কত ছাত্রই আছে কিন্তু সবাই তারা শিতিকণ্ঠের মত টেলেণ্টেড নয়। নীলাম্বর তাকে তাই মাঝে মাঝে বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন। শিতিকণ্ঠেরও দ্বিধা ছিল না। অধ্যাপকের পারিবারিক পরিবেশের সঙ্গে অল্পদিনেই সে নিজেকে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। নীলাম্বরের একমাত্র মেয়ে রুমি তখন সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রী, মাঝে মাঝে তার টেবিলে এসে অনাবশ্যকভাবে তার বইগুলোকে নাড়াচাড়া করে যেতে লাগল শিতিকণ্ঠ। নীলাম্বর বলতেন, মাঝে মাঝে সময় হাতে নিয়ে যখন আস, এক আধ বার রুমিকে তার দু একখানি বই তুমি বুঝিয়ে দিতে পার। সব দিক সামলিয়ে আমি আর রুমিকে নিয়ে বেশীক্ষণ বসতে পারি না। আপ্যায়িতের কণ্ঠে শিতিকণ্ঠ বলত, এ আর এমন কী কাজ, রুমিকে ডেকে আমি মাঝে মাঝে বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

বুঝিয়ে দিতেও বাকী ছিল না। সেই সঙ্গে অলক্ষ্যে বোধ করি দুজনের কিছু কিছু মন বোঝাবুঝিও চলছিল। সেইটুকু নীলাম্বরের না হলেও তাঁর স্ত্রী সুপ্রভার বুঝতে অসুবিধে হয় নি। একদিন স্বামীকে কাছে ডেকে তিনি বললেন, যত সহজে রুমির সঙ্গে তুমি ছেলেটাকে ভিড়িয়ে দিয়েছ, ব্যাপারটা কিন্তু তত সহজ নয়।

হেসে নীলাম্বর বললেন, শিতিকণ্ঠের মত টেলেণ্টেড ছেলে হয় না। দু দিন বাদে ওর বি. এ. পরীক্ষা। পাস করে যদি ভাল কোনও চাকরী পেয়ে যায়, তবে রুমির জন্যে ওর মত খাসা পাত্র হবে না। রুমিও ততদিনে স্কুল-ফাইনাল দিয়ে কলেজে অ্যাডমিশন নিতে পারবে। ওরা যদি দুজনে দুজনকে বুঝতে চায় তোমার তাতে এমন কী ক্ষতি।

কথা কেটে সুপ্রভা বললেন, কিছু হলে ক্ষতিটা আমার চাইতে তোমারই বেশী হবে। সেটুকু তুমি মনে রাখলেই যথেষ্ট।

সে কথা মনে রেখেই এ পর্যন্ত নীলাম্বর চাক…

আসছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দরজায় এসে শিতিকণ্ঠ আর একবার আঘাত করল।

দরজা খুলে দিয়ে রুমি জিজ্ঞেস করল: কী ব্যাপার শিতিদা, একটা সপ্তাহ ধরে তুমি আর এদিকে আসছ না যে!

শিতিকণ্ঠ বলল, আসব কি! দু দিন বাদেই যে টেস্ট! প্রিপারেশন একটুও ভাল হয় নি; ভয় হচ্ছে ক্লাসে থেকে না যাই!

হেসে রুমি বলল, তুমি থাকলে আর কোনও ছেলেকে পাস করে বেরোতে হবে না।

কথাটা শুনে মনে মনে বোধ করি খুশী হল শিতিকণ্ঠ। কিন্তু এই নিয়ে কিছু একটাও আর প্রশ্ন না করে জিজ্ঞেস করল, তোমার বাবা কোথায়?

রুমি বলল, বাবা তাঁর নিজের ঘরে বসে সভ্যতার ঠিকুজি করছেন। যাও না, গিয়ে নিজের চোখেই দেখে এস না? বলে পাশ কাটিয়ে বোধ করি শিতিকণ্ঠের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা করতে গেল রুমি।

শিতিকণ্ঠও আর অপেক্ষা করল না, সোজা সিঁড়ি ভেঙে উঠে একসময় সে নীলাম্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মুখ তুলে নীলাম্বর বললেন, আরে, শিতিকণ্ঠ যে, এস, এস; বস।

সামনের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বসল শিতিকণ্ঠ।

তারপর, কী খবর বল!—মুখ তুলে আর একবার ভাল করে তাকালেন নীলাম্বর।

আমতা আমতা করে শিতিকণ্ঠ বলল, এতদিন গোপনে গোপনে লেখার কিছু চর্চা করেছি, কিন্তু ছেলেমানুষি ছিল বলে কাউকে জানতে দিই নি। এবারে একটা বড় গল্প লিখেছি স্যার্। আপনাকে দেখাতে নিয়ে এলাম।

খুশীর সঙ্গে বিস্ময় এসে যুক্ত হলে যা হয়, নীলাম্বর মুখার্জির মুখ দেখে এবারে ঠিক তাই মনে হল। বললেন, বল কি, এরই মধ্যে তুমি বড় গল্প লিখে ফেলেছ—মানে নভেলেট?

প্রায় কাছাকাছি বলতে পারেন। কেমন একটা অলৌকিকতার চিহ্ন দু ঠোঁটে স্পষ্ট ধরা পড়ল শিতিকণ্ঠের।

একটু থেমে নীলাম্বর বললেন, কিন্তু গল্প লেখার মত মেণ্টাল মেকআপ তো তোমার নয় শিতিকণ্ঠ! তুমি তো লিখবে গুরুচালের প্রবন্ধ, তোমার ঝোঁকটা সেই দিকেই!

বার দুয়েক ঠোঁট নেড়ে তবে শিতিকণ্ঠ বলল, কথাটা

করা যায়। সেটাও দরকার। আপনি যদি একবার দেখে দেন, তবে লেখাটি সম্পর্কে সিওর হই।

ইচ্ছে ছিল নিজের রচনা থেকে কিছু কিছু অংশ শিতিকণ্ঠকে পড়ে শোনান নীলাম্বর, কিন্তু দেখলেন, সে সুযোগ কম। খাতার পৃষ্ঠা বন্ধ করে রাখতে রাখতে তিনি বললেন, আমি কি গল্পকার যে, গল্প বুঝব? তুমি গিয়ে বরং রুমিকে একবার পড়ে শোনাও। রুমির যদি ভাল লাগে, তবে জানবে তোমার গল্প নিঃসন্দেহে উতরে গেছে, তোমার পপুলারিটিকে কেউ রুখতে পারবে না।

কণ্ঠে বিনয় টেনে শিতিকণ্ঠ বলল, আপনি বুঝবেন না, শেষ পর্যন্ত বুঝবে রুমি? এ আপনি কী বলছেন সার্।

ঠিকই বলছি। নীলাম্বর বললেন, যে গল্প মেয়েদের মন স্পর্শ করে না, কোনও পাঠকের মনেই সে গল্পের কোনও স্থান নেই। তাই আমার চাইতে এখানে রুমির মতামতের মূল্য বেশী। আমার মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে, সমালোচনা আছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে আছে কেবল মুগ্ধতাবোধ। গল্পলেখকদের যেন পেট্রনই তো মেয়েরা!

দু হাত কচলাতে কচলাতে শিতিকণ্ঠ বলল, আমার এ গল্পেও অবশ্য নায়কই জিতেছে। নায়ক বিমলাক্ষ অতুল বিষয়-সম্পত্তির মালিক হয়েও বড় বেশী সেন্টিমেণ্টাল সেলফিস এবং ইডিয়ট, আর নায়িকা চন্দনা নিঃসম্বল আর নিরাশ্রিত হয়েও ত্যাগ আর চরিত্রে মহিমান্বিতা। ভেবেছি গল্পটা এবারকার কলেজ-ম্যাগাজিনে দেব।

চমৎকার আইডিয়া। টেবিল থেকে কলমটা তুলে নিয়ে গালে স্পর্শ করতে করতে নীলাম্বর বললেন, গল্পটা তো আমার প্রায় শোনাই হয়ে গেল। এর পর ছাপা হলে একটানা পড়ে ফেলতে কোনও অসুবিধেই হবে না।

উত্তরে এবারে কিছু একটা না বলে একটু চুপ করে থেকে শিতিকণ্ঠ বলল, রুমি বলছিল, আপনি নাকি সভ্যতার উপর কী লিখছেন! কোনও স্ট্রে আর্টিকল, না, পুরো বই?

ইচ্ছেটা অবিশ্যি পুরো একখানা বই লেখবারই, তবে গবেষণার কাজ, দু-এক বছরে শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে না। বলে অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নীলাম্বর।

শিতিকণ্ঠ বলল, সাহিত্যে ইতিহাস চর্চা এ যুগে প্রায় উঠেই গেছে। অথচ একদিন বঙ্কিমচন্দ্র এই নিয়ে কি কম বলেছেন বাঙালীকে? আপনি যদি লিখে শেষ করতে পারেন, তবে আপনার বই বাঙালীর একটা সম্পদ হবে সার্। এ যুগ সভ্যতা আর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের যুগ। প্রকাশকেরা এ রকম বইয়ের উপর ইদানিং প্রচুর লাভ করছে। লেখক হিসেবে আপনিও লভ্যাংশ পাবেন। তারপর যদি রবীন্দ্র আর আকাডেমি প্রাইজ দুটো পেয়ে যান, তখন আর শুধু এই কৃষ্ণনগর নয়, সারা ভারতবর্ষে আপনি ছড়িয়ে পড়বেন। গল্পের ভালমন্দের একটা নির্দিষ্ট কাল আছে, কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে লেখা বই চিরকাল লোকের কাছে সম্পদ হয়ে থাকবে।

অর্থাৎ জ্ঞান-তপস্বীদের কাছে আমি ফুটনোট হয়ে থাকব, এই তো? বলতে গিয়ে চোখ দুটো একবার গাঢ় হয়ে উঠল নীলাম্বর মুখার্জির।

শিতিকণ্ঠ বলল, শুধু ফুটনোট কেন, বিভিন্ন লেখকেরা আপনার বই নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখবে। আপনার গবেষণার উপর তখন নতুন করে গবেষণা শুরু হবে সকলের।

নীলাম্বরের মুখে এবারে কথা ফুটল না। শিতিকণ্ঠের কথাটা নিয়ে অনেকক্ষণ তিনি মনে মনে খেললেন। বেশ সুন্দর করে মনের কথা বলতে পারে শিতিকণ্ঠ। ভাবতে গিয়ে নীলাম্বরের মনটা ভিজে গেল।

শিতিকণ্ঠ ততক্ষণে নীচের তলায় রুমির টেবিলে এসে গল্পের ঝড় তুলেছে। রুমির সময় না থাকলেও তাকে শুনতে হবে, এবং শুনতেই হল। ঝড়ের মত উচ্ছ্বসিত-গতিতে শিতিকণ্ঠ একটানা পড়ে গেল তার বিমলাক্ষ আর চন্দনার কাহিনী।

শুনতে শুনতে রুমিও কম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিল না। এক একবার সে বিমলাক্ষর উপর ক্ষেপে উঠছিল, এক একবার আবার সহানুভূতিতে সারা মন ভরে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে চন্দনা এসেই কি কম ঢেউ দিচ্ছিল মনে! শিতিকণ্ঠের পড়া শেষ হলে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে উঠল, সুন্দর! তুমি এত সুন্দর গল্প লিখতে পার শিতিদা?

শিতিকণ্ঠ বলল, কিন্তু এর চাইতেও সুন্দরতর গল্প লিখতে আমি জানি।

ভাবাবেগের দৃষ্টি তুলে ধরে রুমি জিজ্ঞেস করল: সে গল্পটা কী?

কিছুমাত্র দ্বিধা না করে কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে এনে এবারে শিতিকণ্ঠ বলল, সে গল্পের নায়ক শিতিকণ্ঠ আর নায়িকা শ্রীমতী রুমি।

শুনে রুমির মুখখানি এবারে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু তাই বলে লজ্জা পেল না সে, বলল, লিখবে, আমাদের নিয়ে সত্যিই তুমি গল্প লিখবে শিতিদা?

মাথা নেড়ে শিতিকণ্ঠ বলল, সত্যি।

রুমি বলল, বস, তোমার জন্যে চা আর খাবার করে নিয়ে আসি। বলে ছুটে যাচ্ছিল রুমি।

বাধা দিয়ে শিতিকণ্ঠ বলল, এখন থাক্, অন্য কোনও সময় এসে খাব।

একটু কি ইতস্ততঃ করে রুমি বলল, বাবাকে গল্পটা শোনাও না, খুব খুশী হবেন।

শিতিকণ্ঠ বলল, খুশী করতেই তো গিয়েছিলাম, তিনি

সোজা তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তোমার ভাল লাগলেই নাকি বুঝব যে গল্পটা উতরেছে!

তাই বুঝি বলেছেন বাবা? রুমি বলল, বাবার লেখাপড়ার কাজে সাধারণতঃ আমিই হেল্প করি তো, আমার উপর বাবার স্নেহটাও তাই বেশী। তাই হয়তো আমাকে শোনাতেই তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তা—আমি কিন্তু বাবাকে গল্পটা না বলে পারব না। বলব, এ রকম গল্প আজকাল বাংলা সাহিত্যে হয় না।

দুষ্টু হেসে শিতিকণ্ঠ বলল, তা হলে তোমার বাবা আর তোমার ওপিনিয়ন কখনও কাউণ্ট করবেন না।

ইস, করবেন না বললেই হল! আমি এক্ষুনি যাচ্ছি বাবার কাছে। বলে জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ল রুমি।

শিতিকণ্ঠও আর অপেক্ষা করল না, সিঁড়িতে পা বাড়াতে বাড়াতে বলল, দেখো, আমাকে যেন আবার লজ্জায় ফেলো না। তারপর সামনের লন পেরিয়ে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এ ঘটনা কিছুকাল আগেকার।

এর পর শিতিকণ্ঠ ডিসটিংশনে বি. এ. পাস করে কোথায় যে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল জানা গেল না।

মনে ক্ষোভ থাকলেও লজ্জায় মুখ ফুটে কারুর কাছে খোঁজ নিতে পারে নি রুমি।

স্বামীর কাছে এসে ঠোঁট নেড়ে সুপ্রভা বললেন, কই, তোমার টেলেন্টেড ছাত্র গেল কোথায়? তাকে নিয়ে না তুমি সৌধ গড়ছিলে?

নীলাম্বর বললেন, ছেলেটা শেষ পর্যন্ত অনার্স ছেড়ে দিয়ে ভুল করল। কিন্তু তা হলেও শিতিকণ্ঠের টেলেণ্ট অস্বীকার করা যায় না। কলেজ-ম্যাগাজিনে ওর গল্পটা পড়ে দেখেছ? চমৎকার হাত। এ রকম লিখতে পারলে ভবিষ্যতে ও দাঁড়িয়ে যাবে। কাছে পেলে ওকে আমি কন্‌গ্রাচুলেট করতুম।

আর করেছ! তোমার কন্‌গ্রাচুলেশনের জন্যে সে বসে আছে! বলে স্বামীকে দ্বিরুক্তি করার অবকাশ না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার তিনি অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

কিন্তু শিতিকণ্ঠকে সত্যিই আর কোথায়ও খুঁজে পাওয়া গেল না। এখানে কোন্ এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে থাকত, তারা বললে, সে কলকাতায় গেছে।

কিন্তু নিজে থেকে সে যদি লিখে কিছু না জানায় তবে কলকাতা থেকে কি খুঁজে বার করা সহজ শিতিকণ্ঠকে? বাধ্য হয়ে এতদিনে হাল ছেড়ে দিতে হল নীলাম্বরকে।

যথাসময়ে রুমি স্কুল-ফাইনাল পাস করে বেরলো। কিন্তু রুমির যা গড়ন, তাতে আর তাকে বেশীদিন ঘরে রাখা যায় না। শিতিকণ্ঠকে দিয়ে সমস্ত আশাই যখন ব্যর্থ হল, তখন বাধ্য হয়ে এবারে রুমির জন্যে স্বতন্ত্র পাত্র দেখতে হল। নীলাম্বরের ছাত্রের অভাব ছিল না, তাদের মধ্য থেকেই এক অরবিন্দ ব্যানার্জিকে পাওয়া গেল। দেখতে শুনতেও ভাল, চিত্তরঞ্জন লোকমোটিভে চাকরিটাও মোটামুটি মন্দ করে না। সুতরাং নীলাম্বরের ঘরের দেউড়িতে সানাই বেজে উঠতে দেরি হল না।

বাসী বিয়ের দিন সকালে নীলাম্বরের হাতে হঠাৎ এক চিঠি এসে উপস্থিত। শিতিকণ্ঠ লিখেছে, নানা বিপর্যয়ে এতদিন সে কোন খবরাখবর রাখতে পারে নি। সম্প্রতি সে বোম্বে শহরে তার পিসেমশাইয়ের বিরাট বইয়ের কারবারের সঙ্গে যুক্ত আছে। কৃষ্ণনগরে শীগগির ফেরবার কোন নিশ্চয়তা নেই; ফিরে অবশ্যই দেখা করে পায়ের ধুলো নেবে।

চিঠি শেষ পর্যন্ত ঠিকই লিখল শিতিকণ্ঠ, কিন্তু ঠিকানা নেই। পড়ে নিজের মধ্যে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন নীলাম্বর। তিনি জানেন, রুমির জন্যে শিতিকণ্ঠকে না পেলেও শিতিকণ্ঠ নিঃসন্দেহে জীবনে উন্নতি করবে। এমন ছেলে সচরাচর হয় না। এমন কি রুমির বর অরবিন্দও অতটা চমৎকার নয়।

মেয়ে-জামাইকে একসময় বিদায় করে দিয়ে আবার তিনি নতুন করে রচনার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। তাঁর আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস শেষ হতে এখনও অন্ততঃ মাস দু-তিন লাগবে। বাংলার ইতিহাস-সাহিত্যের একটা বিশেষ দিক পূর্ণ হয়ে উঠবে এ বই দিয়ে। জীবন ভোর বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন করেও ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন নি নীলাম্বর মুখার্জি। যে জাতির ইতিহাস নেই, তার সাহিত্যও নেই। ইতিহাস অর্থেই সভ্যতার ইতিহাস আর সেই সভ্যতা কোনদিন একটা বিশেষ দেশকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে নি। সারা পৃথিবীর সভ্যতার এক একটি অংশ এক একটি দেশ। ভারতবর্ষের সভ্যতা আদি সভ্যতা হয়েও তাই অন্যান্য সভ্যতার কাছে কম ঋণী নয়। এই সভ্যতার কালগত বিচার আজও এদেশীয় ঐতিহাসিকরা সম্পূর্ণভাবে করেন নি। নীলাম্বর মুখার্জি অন্ততঃ তার ভিত রচনা করে যেতে চান।

কিন্তু কলেজ থেকে তাঁর রিটায়ার করবার বয়স উত্তীর্ণ হয়ে এসেছিল, সেদিকে এতদিন লক্ষ্য ছিল না নীলাম্বরের। সেদিন কলেজ থেকে হঠাৎ তাঁর রিটায়ারমেণ্টের চিঠি এল। চেষ্টা করলে যে বছর দু-তিনের এক্সটেনশন তিনি না পান, এমন নয়। কিন্তু চাকরীর উপর ইদানিং আর কোন মোহ নেই তাঁর। নিজে বেশী বয়সে বিয়ে করে একদিন সংসারে প্রবেশ করেছিলেন তিনি। তার পর আরও অনেক বেশী বয়সে রুমি এল। রুমিকে পাত্রস্থ করে আজ গৃহে তিনি সন্তানহীন। বাকী জীবনটা চাকরী না করলেও গ্রাচুইটি আর প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকায় তাঁর

আর সুপ্রভার দিব্বি চলে যাবে। বরং এখান থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় গিয়ে ছোটখাট একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকলে মোটা টাকার দু একটা টুইশনি সংগ্রহ করে নিতেও বিশেষ অসুবিধা হবে না। তারপর বইটা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে যদি ওই থেকে মোটা কিছু উপার্জন করতে পারেন, তবে হয়তো বার্ধক্যের দিনগুলিতে আর অন্যের মুখাপেক্ষায় অচল হয়ে বসে থাকতে হবে না।

কলকাতার পথেই একসময় তাই রওনা হয়ে পড়লেন নীলাম্বর। এসে অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে লেখাটাকে শেষ করলেন। মনে তাঁর অনেক আশা। জীবন ভোর শুধু ছাত্রই পড়ালেন তিনি, পাঁচজন বিশিষ্ট লেখকের মত খ্যাতি নিয়ে দেশময় ছড়িয়ে পড়তে পারলেন না। এতদিনে লেখাটাকে শেষ করে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন তিনি। বইটা প্রকাশ পেলে হয়তো খ্যাতির এক উজ্জ্বলনীল দিগন্ত তাঁর চোখের সামনে খুলে যাবে। এ সময়ে শিতিকণ্ঠ কাছে থাকলে অনেক সুবিধে হত, সাহায্য করতে পারত সে নীলাম্বরকে। তার বোম্বের ঠিকানাটা জানলে একবার তিনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারতেন তার পিসেমশাইয়ের দোকান থেকে বইটা বেরোতে পারে কিনা! কলকাতায় বইয়ের দোকানের অভাব নেই, কিন্তু অভাব থেকে গেছে যোগাযোগের। এখানে কার কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়াবেন? চিরকাল মফস্বল কলেজে প্রফেসারী করে মফস্বলেই কাটিয়েছেন। ছুটি-ছাটায় যাও বা কলকাতায় এসেছেন, কারুর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ঘটে নি। আজ এ যুগে নতুন করে কারুর দুয়ারে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে দাঁড়াতে মন সায় দেয় না। যদি ফিরিয়ে দেয়? ভাবতে গিয়ে নিজের মধ্যে কেমন যেন একবার মুষড়ে পড়লেন নীলাম্বর।

সুপ্রভা বললেন, সামনের মাসে রুমিকে নিয়ে অরবিন্দের আসার কথা আছে। অরবিন্দ তো কলকাতায় থেকে এম. এ. পড়েছিল! সে হয়তো অনেক প্রকাশককে চেনে। এলে তাকে দিয়ে বরং তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ।

কিন্তু এ কথাতেও কেন যেন মনে বড় একটা সাড়া পেলেন না নীলাম্বর। অরবিন্দ এক সময় তাঁর ক্লাসের ছাত্র থাকলেও আজ সে জামাই। নতুন জামাইয়ের কাছে নিজের গ্রন্থ প্রকাশ সম্পর্কে উপযাজক হয়ে কিছু বলতে যাওয়াটাও কেমন-কেমন নয় কি? কিন্তু সেই মুহূর্তেই আর একবার শিতিকণ্ঠকে মনে পড়ে মনটা কেমন যেন ঘুরে গেল। অরবিন্দের পরিবর্তে রুমিকে যদি তিনি শিতিকণ্ঠের হাতে তুলে দিতেন, তবে এতদিনে শিতিকণ্ঠও যে জামাই হত। শিতিকণ্ঠের কাছে যদি লজ্জা না করে থাকেন তবে অরবিন্দের কাছেই বা করবেন কেন। সুপ্রভার কথার উপর এবারে তাই মনে মনে অনেকখানি গুরুত্ব দিয়েই অরবিন্দের আসার অপেক্ষাতেই প্রহর গুনতে লাগলেন নীলাম্বর মুখার্জি।

মাসখানেক বাদে সত্যি সত্যিই একদিন রুমিকে নিয়ে এসে পৌঁছল অরবিন্দ। আগের চাইতে রুমির স্বাস্থ্য এখন আরও ভাল হয়েছে। গায়ের রঙও ফিরেছে সেই অনুপাতে। দেখে নীলাম্বর আর সুপ্রভা মনে মনে আশ্বস্ত হলেন। চিত্তরঞ্জনে অরবিন্দের কাছে রুমি তবে সুখেই আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের টেবিলে এসে বসতে যেতেই একখানি মনোজ্ঞ চকচকে প্রচ্ছদপটের বই চোখে পড়ে গেল নীলাম্বরের। হুইলার স্টল থেকে কিনে ট্রেনে পড়তে পড়তে আসছিল অরবিন্দ। আপন মনেই বইখানি নাড়াচাড়া করে দেখলেন নীলাম্বর। নাম 'উছল চাঁদ,' লেখকের পুরো নাম নেই, ছদ্মনাম—শ্রীভার্গব। এস. কি. পাব্লিকেশনের বই। ছয়ের দুই কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা থেকে প্রকাশ করেছেন শ্রীশিতিকণ্ঠ ভট্টাচার্য। চোখের দৃষ্টি হঠাৎ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল নীলাম্বর মুখার্জির। শিতিকণ্ঠ? শিতিকণ্ঠ কি তবে বোম্বে থেকে কলকাতায় এসে স্বাধীনভাবে বইয়ের দোকান নিয়ে বসেছে? লিখেছিল বোম্বেতে তার পিসেমশাইয়ের বিরাট বইয়ের কারবার। বাংলার হাজার হাজার হতভাগ্য কেরানীদের মত গোলামীতে না ঢুকে নিজের রুচি অনুযায়ী গ্রন্থপ্রকাশের রীতিনীতি শিখে শিতিকণ্ঠ সত্যিই যদি এখানে এসে দোকান খুলে বসে, তবে একটা কাজের মত কাজ করেছে বলতে হবে। তাঁর 'সভ্যতার ইতিহাস' রচনায় শিতিকণ্ঠের প্রেরণা কম ছিল না। আর কেউ না হোক অন্ততঃ শিতিকণ্ঠ এ বই প্রকাশ করবেই। শ্রীভার্গব নামের অন্তরালে যে শিতিকণ্ঠের নিজের লেখনীরই স্পর্শ রয়েছে, এ কথা জানবার কারণ ছিল না নীলাম্বরের। একসময় রুমিকে কাছে ডেকে বললেন, বইটা বোধ করি তোরা কেউ পড়তে পড়তে আমার টেবিলে রেখে গিয়েছিলি! তাতে একটা আবিষ্কার হল। এতদিন শিতিকণ্ঠের কোনও খোঁজই পাচ্ছিলাম না, 'উছল চাঁদ' থেকে মনে হল, এবারে তার আলো এসে ঠিকরে পড়ল।

রুমি বলল, কী বলছ তুমি, কিছু তো বুঝতে পারছি না বাবা!

কেমন করে বুঝবি বল্? নীলাম্বর বললেন, তোরা তো শুধু বইয়ের গল্পটাই পড়িস, কিন্তু কষ্ট করে যারা বই ছাপে, তাদের নাম তো তোদের চোখে পড়ে না। এই দ্যাখ—বলে 'উছল চাঁদে'র টাইটেল পৃষ্ঠাটাকে মেয়ের চোখের সামনে উল্টিয়ে ধরলেন নীলাম্বর।

বিস্ময়ের সঙ্গে রুমি প্রকাশকের নামটা উচ্চারণ করে পড়ে বলে উঠল, সে কি বাবা? আমাদের সেই শিতিদা?

হ্যাঁ, এবারে যা। বলে নিজের মধ্যে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে নিলেন নীলাম্বর। অর্থাৎ, রুমির বর হিসেবে শিতিকণ্ঠকে না পেয়ে জীবনে তিনি যে কত বড় রত্ন

হারিয়েছেন, এ সংসারে তো কারুর কাছে মুখ ফুটে বলবার নয়।

কিন্তু নীলাম্বর না বললেও তাঁর সামনে থেকে সরে যেতে যেতে রুমি সেটুকু স্পষ্টই বুঝে গেল। সারা মন দিয়ে সেও যে একদিন শিতিকণ্ঠকেই চেয়েছিল, সে চাওয়া যে এমনই করে ব্যর্থ হবে, ভাবতে পারে নি রুমি।

বিকেলের দিকে রোজ ফুটপাথ ধরে কিছুদূর অবধি বেড়াতে বেরন নীলাম্বর, কিন্তু আজ আর বেড়াতে যেতে মন চাইল না। তার চাইতে আজ একটু আগে আগেই কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের দিকে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। এস. বি. পাব্লিকেশন, ছয়ের দুই কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। শিতিকণ্ঠের সঙ্গে দেখা করে তাকে বাড়িতে টেনে না আনা অবধি একটুও স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি। কিন্তু গিয়ে যখন পৌঁছলেন, দেখলেন শিতিকণ্ঠ নেই। কাউণ্টার থেকে সেলসম্যান সনাতন মান্না বলল, এই কিছুক্ষণ হল বাবু কাজে বেরিয়েছেন, ফিরতে রাত হবে। আপনার যদি বিশেষ দরকার থাকে তো লিখে রেখে যেতে পারেন।

অগত্যা তাই করতে হল নীলাম্বর মুখার্জিকে। নিজের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে লিখলেন: এই ঠিকানায় কাল সকালের মধ্যে অবিশ্যি তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার সম্পর্কে রুমির কৌতূহলটাও কম নয়। Don't fail, অবশ্যই আসবে।

সনাতন মান্নার হাতে চিঠির স্লিপটা তুলে দিয়ে দোকানের চারদিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন নীলাম্বর। দিব্বি ফিটফাট ছিমছাম চারদিক। আলমারি, ব্র্যাকেট, সো-কেস ভর্তি নানা রঙের নানা বিষয়ের বই। বইয়ের প্রচ্ছদপটের আজ আর সেদিন নেই; শিল্পনৈপুণ্যে বইয়ের কভার আজ শুধু লোভনীয় হয়েই ওঠে নি, বইয়ের মর্যাদা অবধি তাতে বেড়ে গেছে। মনে মনে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে পুনরায় এসে ফুটপাথে পা দিলেন নীলাম্বর।

পরদিন সকালবেলায় সমস্ত কাজ তিনি তুলে রাখলেন। কখন শিতিকণ্ঠ এসে পড়ে, কিছু ঠিক নেই। তার জন্যে মনটাকে তৈরি করে রাখলেন তিনি। কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় এক একটা করে ঘণ্টা কেটে যেতে লাগল, অথচ শিতিকণ্ঠ এল না। তবে কি ভুল করলেন নীলাম্বর? এক নামে একাধিক লোক থাকা সংসারে বিচিত্র কিছু নয়। এ হয়তো দ্বিতীয় কোন শিতিকণ্ঠ হবে। আসল শিতিকণ্ঠের সঙ্গে এর মেলে কোথায়? বোম্বের পিসেমশাইয়ের বইয়ের দোকানের সঙ্গে তাঁদের আসল শিতিকণ্ঠের গ্রন্থাগার পরিচালনার যে সম্পর্ক আছে, দ্বিতীয় কোন শিতিকণ্ঠের সে সম্পর্ক থাকবেই, এমন কোন কথা নেই। হয়তো কাজের চাপে এসে পৌঁছতে পারে নি, হয়তো চিঠিটা তার হাতে পৌঁছে দিতে সনাতন মান্না ভুল করে থাকবে। খবর পেলে শিতিকণ্ঠ এসে দেখা করবে না, এ হতেই পারে না।

সুপ্রভা বললেন, তোমাদের কালের লোকগুলোর সঙ্গে আজকালকার ছেলেদের স্বভাব যদি একটুও মেলে! কৃষ্ণনগরে থাকতে এক রকম ছিল, এখানে আর এক রকম। সেখানে ছেলেরা তোমাকে উঠতে বসতে সার্ সার্ করেছে বলে যে এখানেও করবে, তাই বা তুমি ভাবলে কি করে?

নীলাম্বর বললেন, আমার ছাত্রদের তো আমি চিনি। অরবিন্দের কথাটাই ধর না। রুমিকে তো এক কথাতেই সে গ্রহণ করেছে। সুতরাং যা ভাল, যা সৎ তার সেকাল আর একাল বলে কোন কথা নেই। মাঝে মাঝে তুমি এমন সব বোকা বোকা কথা বল, যার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মনে মনে বোধ করি সুপ্রভা কিছুটা আহত হলেন। বললেন, বেশ তো, চিরকাল তুমি ছাত্র চড়িয়ে বেড়িয়েছ, তোমার কাছে মানে থাকলেই হল। বলে আর এক মিনিটও অপেক্ষা না করে স্বামীর সামনে থেকে সরে গেলেন সুপ্রভা।

মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীতে এরকম কথা কাটাকাটি যে না হয়, এমন নয়। কিন্তু নীলাম্বর কিছু মনে করে রাখেন না। চিরকালই কিছুটা সংসার-উদাসীন মানুষ তিনি। সংসারের ছোটখাটো ঘটনা তাঁর বিরাট-বিপুল ভাবরাজ্যের মধ্যে কোথায় যে তলিয়ে যায়, কেউ তার হিসেব রাখে না।

আজ শুধু একটা হিসেবের উপরেই বার বার ছক কেটে চলেছেন তিনি। তা হচ্ছে তাঁর 'আধুনিক সভ্যতার ইতিহাস'। ভাবীকালের মানুষদের জন্যে রেখে যেতে চান তিনি এ ইতিহাস। তাঁর এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিতে পারে শিতিকণ্ঠ। তার রুচি আছে, জ্ঞান সম্পর্কে নিষ্ঠা আছে; এত বড় কলকাতা শহরে এত বড় দোকান নিয়ে মস্ত ব্যবসা ফেঁদেছে। লক্ষ্মী আর সরস্বতীর দ্বৈত কৃপায় দু দিনেই কৃতী হয়ে উঠবে শিতিকণ্ঠ। আজ যে শিতিকণ্ঠকেই তাঁর একান্ত প্রয়োজন।

দিন দুয়েক তার জন্যে প্রতীক্ষা করে এবারে পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে নিয়েই পুনরায় ফুটপাথে পা বাড়ালেন নীলাম্বর। শিতিকণ্ঠের হাতে পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিতে পারলেই তিনি নিশ্চিন্ত।

যেতেই দেখা হয়ে গেল। আজ আর হাতে বিশেষ কোনও কাজ ছিল না শিতিকণ্ঠের। যেতেই নীলাম্বরের পায়ে উপুড় হয়ে প্রণাম করে সশ্রদ্ধ অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল সে, তারপর বলল, আপনার চিঠি পেয়েও কাজের চাপে আমি আপনার ওখানে গিয়ে উঠতে পারি নি সার্। আপনার শরীর ভাল তো? কৃষ্ণনগরের মায়া কাটিয়ে এখন আপনারা তবে

কলকাতাতেই আছেন; তাই না? এ বেশ ভালই হল। নইলে এমন করে এত শীগগির আপনার পায়ের ধুলো পাবার সুযোগ পেতাম না।

এতগুলো কথার জবাব একসঙ্গে দেওয়া এবারে কঠিন হল নীলাম্বরের পক্ষে। বললেন, কলেজ থেকে রিটায়ার করে এখন এখানেই আছি।

শিতিকণ্ঠ বলল, কিছুদিন খুব দুর্ভাবনায় কাটল, তাই কোথায়ও এক জায়গায় বেশীদিন স্থির হয়ে থাকতে পারি নি। এম. এ. পড়বার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হল না; রুজি-রোজগারের প্রশ্নটাই বড় হয়ে দাঁড়াল। পিসেমশাইয়ের কাছ থেকে পাব্লিকেশনের ব্যাপারে খুব উৎসাহ পেলাম। সেই উৎসাহ নিয়েই কলকাতায় এসে কয়েকটা বিলিতি বইয়ের ফার্মে কিছুদিন চাকরি করলাম। তারপর এই ব্যবসা। পিসেমশাইয়ের হেল্প না পেলে এতবড় কাজে হাত দিতে সাহস পেতাম না সার্।

তোমার আবার সাহসের অভাব।—নীলাম্বর বললেন, তোমাকে দিয়ে যে আমি এর চাইতেও বড় কাজ আশা করি শিতিকণ্ঠ। তোমাকে যে বড় হতেই হবে!

বিনয়ের সুরে শিতিকণ্ঠ বলল, যদি হই তো আপনার আশীর্বাদের জোরেই [হ]বে সার্, নইলে আমার সাধ্য কি যে, মহৎ কিছু করতে পারি! ছেলেবেলা থেকেই বাংলা সাহিত্যের উপর বিশেষ ঝোঁক ছিল, সেই সঙ্গে নিজেরও লেখার কিছু অভ্যাস ছিল। পাব্লিকেশনের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যে যদি ভাল কিছু পরিবেশন করতে পারি, তবেই আমার দোকানদারী সার্থক মনে করব।

মিছিমিছি সময় নষ্ট করতে চাইলেন না নীলাম্বর। শিতিকণ্ঠের কথার কিছু একটাও যথাযথ জবাব না দিয়ে বললেন, আই নো ইওর টেনাসিটি। আমার ইতিহাস রচনার ব্যাপারে সেবার তোমার কাছ থেকে অতখানি উৎসাহ না পেলে হয়তো বইখানা শেষ করাই সম্ভব হত না। আজ মনে হচ্ছে একটা কিছু কাজ করেছি, যা অন্ততঃ বাঙালীর কাছে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তার প্রথম ইন্স্পিরেশন তুমি ছিলে, এখনও তুমিই। পাণ্ডুলিপিটা আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তুমি যদি যত্ন করে ছেপে প্রকাশ কর, তবেই সুরাহা হয়। বলে পাণ্ডুলিপিটা এবারে শিতিকণ্ঠের হাতের দিকে এগিয়ে ধরলেন নীলাম্বর।

হাতে নিয়ে একবার উল্টে পাল্টে দেখল শিতিকণ্ঠ। ফুলস্কেপ কাগজের পুরো তিন শো পঁচাত্তর পৃষ্ঠা। ছাপার হরফে অন্ততঃ সাড়ে ছ শো পৃষ্ঠার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ বিষয়ের উপর এত বড় বই প্রকাশের ঝুঁকি কম নয়। বিশেষ করে লেখক হিসেবে বাজারে যাঁর নাম নেই, তাঁর বইয়ের ডিম্যাণ্ড হওয়াও কঠিন। অথচ এত বড় অপ্রিয় সত্য কথাটা মুখ ফুটে বলতে বাধল শিতিকণ্ঠের। সনাতন মান্নাকে ডেকে বলল, সাবুকে চা আনিয়ে দাও।
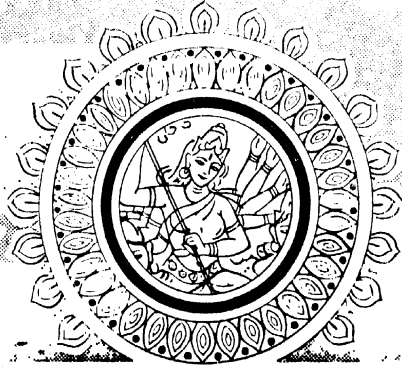
শুনে আপত্তি জানালেন নীলাম্বর, বললেন, না না, চায়ের কিছু দরকার নেই।

শিতিকণ্ঠ বলল, লেখাটা আপনি কমপ্লিট করেছেন এইটেই বড় কথা। এসব জিনিস নিয়ে কেই বা ভাবে আর কেই বা খাটে! ভাল পাবলিকেশন না হলে এসব লেখার মূল্যও থাকে না। আমি দেখি, কত তাড়াতাড়ি কী করতে পারি! বলে পাণ্ডুলিপিটাকে ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল শিতিকণ্ঠ, তারপর জিজ্ঞেস করল, রুমি এখন কী পড়ছে?

যথাসম্ভব নিজেকে চেপে নিয়ে নীলাম্বর বললেন, আপাততঃ তোমার পাবলিকেশন 'উছল চাঁদ'। শ্রীভার্গব কে জানি না, কিন্তু তার বই রুমি দোকান থেকে কিনে নিয়ে পড়ছে।

লজ্জা পেয়ে শিতিকণ্ঠ বলল, ছি ছি, কী বিশ্রী কাণ্ড হল! আপনি কলকাতায় আছেন জানলে আমি রুমিকে আমার পাবলিকেশনের এক সেট কবেই প্রেজেণ্ট করে আসতাম! এবারে আমি লোক দিয়ে রুমিকে বই পাঠিয়ে দেব। আমার প্রথম গল্পের শ্রোতা সে, তাকে কোন বই প্রেজেণ্ট করতে পারলেও যে আনন্দ!

কিন্তু রুমির জীবনের সাম্প্রতিক ঘটনার কথা জানলে শিতিকণ্ঠ বোধ করি তাকে বই প্রেজেণ্ট করা সম্পর্কে এতখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারত না। ভাবতে গিয়ে কোথায় যেন একটা মস্ত বড় ঘা লাগল নীলাম্বরের। আর দ্বিরুক্তি না করে এবারে বিদায় নিয়ে শিতিকণ্ঠের সামনে থেকে উঠে এলেন তিনি।

এর পর দিন দুয়েকও কাটল না। সেদিন সকালে চায়ের কাপ শেষ করে সবে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিলেন নীলাম্বর। সনাতন মান্না এসে হাজির হল।

নীলাম্বর জিজ্ঞেস করলেন, কি খবর, বাবু এলেন না?

দিন দুয়েকের জন্যে বাবু বর্ধমান গেছেন। যাবার সময় এই প্যাকেট দুটো আপনাকে দিতে বলে গিয়েছেন।

হাতে টেনে নিয়ে নীলাম্বর দেখলেন—একটা প্যাকেটের উপর তাঁর নিজের নাম এবং দ্বিতীয় প্যাকেটটার উপর রুমির নাম লেখা রয়েছে।

নিজের নামের প্যাকেটটা খুলতেই চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল নীলাম্বর মুখার্জির। শিতিকণ্ঠ তাঁর পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠিয়েছে, সেই সঙ্গে আলপিন দিয়ে এক টুকরো চিঠি গেঁথে দিয়ে লিখেছে: জরুরী কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে বলে আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে পারলাম না। নইলে আমি নিজে গিয়েই আপনার সঙ্গে বই প্রকাশ সম্পর্কে কথা বলতাম। নতুন দোকান নিয়ে বসেছি, যা বাজারে চলছে এরকম দু-চারখানা গল্প উপন্যাস প্রকাশ করে দাঁড়াতে চেষ্টা করছি। তাতে ঘরভাড়া আর কর্মচারীর মাইনেটা কোনও রকমে উঠে যায়, নিজের পকেটে কিছু আসে না। এ অবস্থায় আপনার বই প্রকাশের রিস্ক নিতে সাহস পেলাম না, তাই পাণ্ডুলিপিটা আপনাকে ফেরত পাঠালাম। কোনও উপযুক্ত লোকের হাত দিয়ে প্রকাশ পেলে এ বই তার নিজের মর্যাদায় নিজের স্থান করে নেবে সন্দেহ নেই। আমার অক্ষমতার যেন অপরাধ নেবেন না। রুমির জন্যে এক সেট বই পাঠালাম।

রুমিকে ডেকে তার নামের প্যাকেটটা যে তাকে হাতে তুলে দেবেন, এমন প্রবৃত্তি হল না নীলাম্বরের। চিঠিটা পড়ে এর অন্তর্নিহিত অর্থটা তিনি স্পষ্টই বুঝে নিতে পারলেন। যে রকম দোকান নিয়ে বই প্রকাশ করে চলেছে শিতিকণ্ঠ, সেখানে তাঁর বইটা ছাপতে না পারার কোনও হেতু ছিল না। একদিন শিতিকণ্ঠই বলেছিল: আপনার বই বাঙালীর একটা অ্যাসেট হবে। প্রকাশকেরা এ রকম বইয়ের উপর ইদানিং প্রচুর লাভ করছে। আপনার গবেষণার উপর নতুন করে গবেষণা শুরু হবে সকলের। তখন শিতিকণ্ঠ ছিল ছাত্র, আজ হয়েছে ব্যবসায়ী। আজ তার কাছে আদর্শ মিথ্যা, সংস্কৃতি মিথ্যা, সভ্যতা মিথ্যা; বাজারের ডিম্যাণ্ড অনুযায়ী যে কোনও রকম গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করে টাকা রোজগার করাই হচ্ছে আজ শিতিকণ্ঠের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাকে দিয়ে কী না আশা করেছিলেন তিনি?

সুপ্রভার সেদিনের কথাটার আজ একটা স্পষ্ট অর্থ খুঁজে পেলেন নীলাম্বর। সুপ্রভা বলেছিলেন: কৃষ্ণনগরে থাকতে এক রকম ছিল, এখানে আর এক রকম। সেখানে ছেলেরা তোমাকে উঠতে বসতে সার্-সার্ করেছে বলে যে এখানেও করবে, তাই বা তুমি ভাবলে কি করে?—ঠিকই বলেছিলেন সুপ্রভা। কৃষ্ণনগর আর কলকাতার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। সেখানে ছিল পল্লী-সংস্কৃতির সারল্য, এখানে নাগরিক সভ্যতার জটিলতা-কুটিলতা। সভ্যতার ইতিহাসে এই বিবর্তনের ধারা এক তিলও মিথ্যে নয়। ইতিহাসের এই বিবর্তনে সংসারের সবকিছুই বিবর্তিত হয়ে চলেছে। শিতিকণ্ঠও তা থেকে বাদ যায় নি। অথচ আধুনিক সভ্যতার এত বড় একটা বিকলাঙ্গ দিক ঢাকা পড়ে ছিল তাঁর রচনায়।

ব্যর্থতার দুঃসহ গ্লানির মধ্যে হঠাৎ নতুন করে যেন একটা জীবন-সত্য খুঁজে পেলেন নীলাম্বর মুখার্জি। যা আপন মূল্যে সত্য, দেশ একদিন তার মর্যাদা দেবেই। সেখানে এক শিতিকণ্ঠ গেছে, আবার নতুন শিতিকণ্ঠ আসবে, গড়ে উঠবে নতুন ইতিহাস। নিজের পাণ্ডুলিপিটার উপর আজ আবার নতুন করে কলম ধরলেন নীলাম্বর মুখার্জি।

দ্বীপ

প্রফুল্ল রায়

উদ্‌ভ্রান্ত, বন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল দিলোয়ার। তারপর প্রবল বেগে মাথা নাড়ল।

সময়টা উনিশ শো তিরিশ সনের শীতের এক মধ্য-দুপুর। জায়গাটা মধ্য আন্দামানের লং আইল্যাণ্ড।

কাঠের জেটিটা লং দ্বীপের মাটি থেকে নেমে, সমুদ্রে ঢুকে গিয়েছে। উপরে টিলার মাথায় চুগলুম, দিদু, প্যাডক গাছের জটিল অরণ্য। সামনে আন্দামান সমুদ্র; বিপুল, নিঃসীম, অফুরন্ত। দূরে দূরে ধোঁয়ার পাহাড়ের মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট দ্বীপ।

শীতের এই মধ্যদুপুরে যতদূর নজর ছোটে লবণদরিয়া শুধু জলে। বিরাট বিরাট ঢেউগুলি মুখে শাসানি নিয়ে অদ্ভুত আক্রোশে দ্বীপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বস্তুময়, অনড় স্থবির দ্বীপের আত্মা শিউরে ওঠে।

জেটির উপর গুটিকতক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। লং আইল্যাণ্ডের থানাদার পাণ্ডে, দুজন জমাদার, সিপাই। মজা দেখবার জন্য বন-বিভাগের একজন রেঞ্জার, জন তিনেক ফরেস্ট গার্ড, রাঁচী কুলি। আর এতোয়ারী এবং দিলোয়ার।

দিলোয়ার! রোমশ নগ্ন বুক, পিঙ্গল চুলে আপনা থেকেই জটা পাকিয়ে গিয়েছে, পোড়া তামাটে মুখে অজস্র জটিল রেখা, ভাঙা ভাঙা নখ, ক্ষয়িত দাঁত, দু চোখে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদের দৃষ্টি। সব মিলিয়ে দিলোয়ার বন্য, হিংস্র, ভীষণ।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে এতোয়ারীর দিকে তাকিয়ে ছিল দিলোয়ার। এতোয়ারীর মুখে বিশ-পঁচিশ বছর কি আরও বোধ হয় আর একটা জীবনের কথা পড়তে চেষ্টা করল। কিন্তু না, সে জীবনটাকে আদপেই মনে করতে পারল না দিলোয়ার। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে দৃষ্টিটাকে সমুদ্রে এনে ফেলল, যেখানে জেটির পাশে ছোট একটা ডিঙি বিরাট বিরাট ঢেউয়ের খেয়ালে একবার উঠছে, একবার নামছে।

থানাদার পাণ্ডে গর্দান ধরে দিলোয়ারের মুখটা এতোয়ারীর দিকে ফিরিয়ে দিল। তারপর হুমকে উঠল, আব্‌ শালে, খুব ভাল করে ইয়াদ কর্‌, চিনতে পারিস কিনা?

দাঁতে দাঁত ঘষে অদ্ভুত শব্দ করল দিলোয়ার। মুখে কিছুই বলল না। মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল, না।

মুখের উপর থেকে বুরখা উঠিয়ে দিলোয়ারের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল এতোয়ারী। শব্দ করে কাঁদছিল। দু আঁখে আঁশুর ফোয়ারা ছুটেছে। ধরা ধরা ভাঙা ভাঙা স্বরে সে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না আদমী! আমি এতোয়ারী। আমি, আমি—

থানাদার পাণ্ডে আস্তে আস্তে এতোয়ারীর কথার বাকিটুকু পূরণ করে দিল: জরু। সাদী করা জরু। চিনতে পারছিস না?

আবার মাথা ঝাঁকায় দিলোয়ার। যার অর্থ, না।

অনেকটা সময় পর পাণ্ডে বলল, গাঁও-মুলুকের কথা মনে পড়ে? সেই লক্ষ্ণৌ শহর, হজরতপুর গাঁও?

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল দিলোয়ার।

সস্নেহ গলায় পাণ্ডে বলতে লাগল, এই বেদরদী উল্লু, এতোয়ারীর দিকে তাকিয়ে ইয়াদ কর্‌।

দু হাতে দিলোয়ারের গলাটা আঁকড়ে আকুল স্বরে এতোয়ারী বলল, আদমী, তুমি কি সব ভুলে গেছ? জরু-বেটা, বাপ-মা, গাঁ-মুলুক, কারও কথাই কি মনে পড়ে না?

বিরক্ত, তীব্র চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল দিলোয়ার। গলা থেকে এক ঝটকায় এতোয়ারীর হাত দুটো ছুটিয়ে দিল। এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি সে। এবার জড়িত অস্ফুট জান্তব স্বরে শব্দ করে উঠল। কী যে বলল, কিছুই বোঝা গেল না।

কাঠের জেটিতে বসে পড়েছে এতোয়ারী। একেবারেই ভেঙে পড়েছে। দু হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আর বলছে, আদমীটা আমাকে চিনতে পারল না। বিশ-তিরিশ বছর আগের জমানার কথা একেবারেই ভুলল। ইয়ে খুদা আমার কী হবে? আমার জিন্দগী ডুবল।

এতোয়ারীর শরীরটা কাঁপতে লাগল।

এক ঝাঁক সিন্দুশকুন লং দ্বীপ থেকে আকাশ পাড়ি দিয়ে দূরের দ্বীপগুলির দিকে চলেছে। উপকূলের কিনার ঘেঁষে উড়ুক্কু মাছগুলি জল কেটে কেটে খানিকটা দূর গিয়েই সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। রোদে তাদের রূপালী ডানাগুলি ঝিকমিক করে।

কোন দিকে নজর নেই দিলোয়ারের। জেটির সঙ্গে বাঁধা ছোট ডিঙিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সে।

সময়টা উনিশ শো তিরিশ সনের এক মধ্যদুপুর। এ কাহিনীর শুরু কিন্তু এখান থেকে নয়। এ কাহিনীর সূত্রপাত উনিশ শো আট সনের এক সন্ধ্যায়।

সেলুলার জেলের নথিপত্রে উল্লেখ আছে, উনিশ শো আট সনের বারোই জুলাই দিলোয়ার হোসেন নামে এক কয়েদী পোর্ট ব্লেয়ার থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। সর্বশেষ তাকে ফোনিক্স উপসাগরের জেলেডিঙিগুলির কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গিয়েছিল।

উনিশ শো আট সনের সেই ভাগোয়া কয়েদীর সন্ধান আর মেলে নি। বঙ্গোপসাগরের দু শো চারটি দ্বীপের এই আন্দামানে কোথায় কোন্ দ্বীপে সে নিখোঁজ হয়েছিল, আদৌ কোথায়ও যেতে পেরেছে, না, দরিয়ার মর্জিতে ডিঙিডুবি হয়ে হাঙরের দাঁতে ছিন্নভিন্ন হয়েছে, কে তার হদিস দেবে?

উনিশ শো তিরিশে সার্ভের জন্য সরকারী বন-বিভাগের লোকেরা মধ্য আন্দামানের ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে গিয়েছিল। মধ্য আন্দামানের এই নির্জন অরণ্যময় দ্বীপগুলির একটিতে একটা উলঙ্গ অসভ্য বন্য মানুষকে তারা ধরেছিল। সেখান থেকে তাকে লং আইল্যাণ্ডে আনা হয়েছে।

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ভাগোয়া কয়েদীদের ফোটো আনিয়ে লং আইল্যাণ্ডের থানাদার পাণ্ডে মিলিয়ে দেখেছে। পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য এতোয়ারীকে আনিয়েছে। মানুষটা ভাগোয়া কয়েদী দিলোয়ার হোসেন; বাইশ বছর আগে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সে নিখোঁজ হয়ে যায়।

দিলোয়ার নিখোঁজ হবার পর সরকার থেকে এতোয়ারীকে খবর দেওয়া হয়। মুলুক থেকে পোর্ট ব্লেয়ার এসেছিল এতোয়ারী। পোর্ট ব্লেয়ারের এবারডীন বস্তীতে পুরো বাইশটা বছর কাটিয়ে দিল। আশা ছিল একরোজ নিজের আদমীটার খোঁজ-খবর মিলবে।

এতদিনে দিলোয়ারের খোঁজ মিলল। কিন্তু এ কোন্ দিলোয়ার? যার অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, পুরানা জিন্দগীর কথা যে একেবারেই ভুলে গিয়েছে, তাকে পেয়েই বা কী হবে! দু হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সমানে কাঁদছে এতোয়ারী।

সত্যিই এই বাইশ বছরে পুরানা জমানার কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছে দিলোয়ার। শহর লক্ষ্ণৌ, গাঁও হজরতপুর, জরু-বেটা, বাপ-মা কারও কথাই সে মনে করতে পারে না। জীবন থেকে তারা একেবারেই মুছে গিয়েছে।

তিন তিনটে কোতল করে তামাম জিন্দগীর দ্বীপান্তরী সাজা নিয়ে আন্দামান এসেছিল দিলোয়ার। কিন্তু বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপে কয়েদ খাটা তার পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠল। দু মাস বিশ রোজ পর সেলুলার জেল থেকে 'আন্দামান রিলিজ' পেয়ে কয়েদখানার বাইরে এল সে। তখন তার কাজ ছিল পাথর ভেঙে ভেঙে শহর পোর্ট ব্লেয়ারের সড়ক বানানো।

সেদিন ফোনিক্স উপসাগরের কাছে সড়ক বানানোর কাজ চলছিল। তাকে তাকে ছিল দিলোয়ার। উপসাগরটা যেখানে ঘোড়ার খুরের আকারে বেঁকে গিয়েছে, সেখানে খানকয়েক জেলেডিঙি বাঁধা।

সন্ধ্যার একটু আগে জমাদার যখন কয়েদী গুনাতে শুরু করল, ফাইল থেকে সকলের অজান্তে জেলেডিঙিতে গিয়ে উঠেছিল দিলোয়ার। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে উপসাগরের জাহাজ, মোটর-বোট, স্টীম-লঞ্চের অরণ্যের ফাঁক দিয়ে দিয়ে ডিঙি বাইতে বাইতে বাইরের দরিয়ায় এসে পড়েছিল। তারপর পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের খেয়ালে একবার উঠে একবার নেমে বিপুল সমুদ্রের কোথায় যে ভেসে গিয়েছিল সে কথা আজ আর মনে নেই দিলোয়ারের।

মনে নেই দুস্তর সমুদ্রে দু দিন ভেসে ভেসে কেমন করে মধ্য আন্দামানের সেই নাম-না-জানা দ্বীপের [illegible] ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা লেগে তলি ফেঁসে ডিঙি ডুবে গিয়েছিল। পুরো দুটো দিন দরিয়ার কয়েক ফোঁটা লবণজল ছাড়া পেটে আর কিছু পড়ে নি দিলোয়ারের।

উপকূলের কিনারে ক্ষয়িত শিলাস্তূপে ঘা খেয়ে খেয়ে দরিয়া কেঁদে ওঠে। ভাঙা পাথরের খাঁজে খাঁজে সন্তর্পণে পা ফেলে জনমানবহীন বিচ্ছিন্ন সেই দ্বীপে উঠে এসেছিল দিলোয়ার।

মধ্য আন্দামানের সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। চারপাশে সমুদ্র অবিরাম গর্জায়; জটিল অরণ্যে বঙ্গোপসাগরে উন্মাদ বাতাস ঝাঁপিয়ে পড়ে। যতদূর নজর চলে, শুধু জল আর জল, বিপুল অফুরন্ত লবণদরিয়া। মাঝে মাঝে ধোঁয়ার পাহাড়ের মত অস্পষ্ট দ্বীপ। আর দ্বীপের মাঝখানে ঢেউ খেলানো পাহাড়ী টিলায় চুগলুম, দিদু, টমকিঙ, গর্জন গাছের জটিল অরণ্য। উপকূলের কাছটা নারকেল গাছে গাছে ছয়লাপ।

আজ আর মনে নেই, সেদিন ক্ষিদের গুঁতোয় চোখের সামনে দুনিয়াটা আঁধার হয়ে গিয়েছিল। দুটো দিন এক কণা খাদ্য জোটে নি। প্রথমেই তরতর করে গাছে উঠে গোটা দুই নারকেল পেড়ে এনেছিল দিলোয়ার।

নারকেলের জলে আর শাঁসে ক্ষিদে মিটলে পাটল রঙের একটা পাথরের উপর বসল দিলোয়ার। কাঠের যে ডিঙিটায় পোর্ট ব্লেয়ারের ফোনিক্স উপসাগর থেকে মধ্য আন্দামানের এই দ্বীপ পর্যন্ত সে ভাসতে ভাসতে এসেছিল, সেটা তলি ফেঁসে উপকূলের কাছে পড়ে রয়েছে। বিপুল বঙ্গোপসাগর ছোট্ট ডিঙিতে পাড়ি দিয়ে আন্দামান থেকে ভারতের মেন ল্যাণ্ডে পালাতে চেয়েছিল দিলোয়ার। কিন্তু দরিয়ার মর্জি অন্য। ডিঙির তলি ফাঁসিয়ে সমুদ্র তাকে এই বিচ্ছিন্ন নির্মানব দ্বীপে আটক করে রাখল। নিরুপায় আক্রোশে ভাঙা ডিঙিটার দিকে তাকিয়ে রইল দিলোয়ার।

সকালবেলা এই দ্বীপে উঠেছিল দিলোয়ার। সারাটা দিন সেই পাটল রঙের পাথরখানার উপর বসেই কাটাল। আর মাঝে মাঝে নারকেল পেড়ে পেড়ে খেতে লাগল। সন্ধ্যার আগে দ্বীপগুলির আড়ালে সূর্যটা যখন ঢলে পড়ল, কুয়াশার পরদার মত আবছা অন্ধকার নামল দরিয়ায়, দিলোয়ার ভয় পেল; ভীষণ বিচিত্র এক ভয় চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরল।

পাথরটার উপর উঠে দাঁড়াল দিলোয়ার। মুখের কাছে হাত দুটো চোঙার মত করে চিৎকার করে উঠল, হো-ও-ও-ও—

হো-ও-ও-ও শব্দটা ঢেউয়ের মাথায় মাথায় কাঁপতে কাঁপতে সমুদ্রের কোন্ দিকে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

দিলোয়ার এবার হাঁকল, কোই হ্যায়?

কোই হ্যায়? সমুদ্র ফুঁড়ে উঠে-আসা ক্ষ্যাপা বাতাসে শব্দ দুটো নিমেষে মুছে গেল।

পাথর থেকে নীচে নামল দিলোয়ার। উপকূলের কিনার ঘেঁষে অজস্র নারকেল গাছ। ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটে প্যাডক আর চুগলুম।

ঝাঁকড়া একটা প্যাডক গাছের মাথায় উঠল দিলোয়ার। মোটা শাখা দেখে বসল। দ্বীপের অরণ্য অস্পষ্ট হয়ে আসছে। পপিতা, বেত, দিদু, পেমা, গর্জন—গাছগুলিকে আলাদা করে চেনবার উপায় নেই। ঘন অন্ধকারের একটা পিণ্ডের মত মনে হয় দ্বীপটাকে।

একটু পরেই চাঁদ উঠল। উজ্জ্বল আলোতে রাত্রির দরিয়া জ্বলতে থাকে। অরণ্য রহস্যময় হয়ে ওঠে।

এই অরণ্য—চুগলুম, দিদু, প্যাডক—এরাই এই দ্বীপের আদিম বাসিন্দা। একদৃষ্টে অরণ্য দেখছিল দিলোয়ার। হঠাৎ উপকূলের কিনার থেকে বিকট শব্দ করে কারা যেন কেঁদে উঠল। দিলোয়ার শিউরে উঠল। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের প্রেতাত্মারা যেন ককিয়ে উঠেছে।

প্যাডক গাছের শাখা থেকে নীচে পড়েই যেত দিলোয়ার। দুর্বল শিথিল হাতে কোনক্রমে শাখাটাকে আঁকড়ে ধরল। সেদিন নয়, অনেক কাল পর দিলোয়ার জেনেছিল, এগুলো প্রেতাত্মা নয়, সমুদ্রচর রেমোরা মাছ। এই মাছগুলির সঙ্গে একদিন তার দোস্তি-মহব্বতি হয়েছিল।

অরণ্যই এই দ্বীপের আদিম বাসিন্দা নয়। খানিকটা পরেই দ্বীপের রাত্রি যখন গভীর হল, আরও একদল বাসিন্দার দেখা পেল দিলোয়ার।

দূরের কোন একটা দ্বীপ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে সিন্ধুশকুন এসে উপকূল ঘেঁষে নামল। আন্দামান এসেই জেনেছিল দিলোয়ার, এগুলো গোয়েলেথ পাখি। গোয়েলেথ পাখির সাদা ডানাগুলি চাঁদের আলোতে চিকমিক করে। মনে হয়, বহুদূর পর্যন্ত এক আস্তর তুলোর স্তূপ ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝরাত্রির দিকে সিন্ধুশকুনেরা ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেল।

শেষরাত্রির দিকে সমুদ্র ফুঁড়ে উঠে এল গুটিকয়েক

অতিকায় কচ্ছপ। হেলেদুলে পাথরের খাঁজে এসে তারা বসল। আরও কত জলচর যে উঠল, দিলোয়ার তাদের কোন কালে দেখে নি।

সারারাত্রি দ্বীপের বাসিন্দাদের দেখল দিলোয়ার। দরিয়ার অবিশ্রান্ত গর্জন শুনল; সমুদ্র ফোঁড়া ক্ষ্যাপা বাতাসের তাণ্ডব দেখল। প্রথম রাত্রিতে এক মুহূর্তের জন্য চোখের পাতা জোড়া লাগল না।

সকালে কুয়াশা ফুঁড়ে ধারাল বর্শার মত রোদের রেখা দ্বীপে এসে পড়তে লাগল, তখন নজরে পড়ল। অরণ্যের অন্য বাসিন্দা, রাশি রাশি বুভুক্ষু জোঁক, তার রক্ত চুষে চুষে ফুলে শরীর থেকে খসে পড়ছে।

নীচে নেমে এসে দিলোয়ার ভাবল, এই নিদারুণ নির্জন দ্বীপে তিল তিল করে মরার চেয়ে পোর্ট ব্লেয়ারে কয়েদ খাটাই অনেক আরামের ছিল। এখান থেকে যেমন করেই হোক তার পালাতেই হবে। নইলে জান নির্ঘাৎ লবেজান হয়ে যাবে। কোন দিকে তার লক্ষ্য নেই। উপকূলের ক্ষয়িত শিলাস্তূপ আর ম্যানগ্রোভ বন ধরে সে ছুটতে লাগল এই বিপুল সমুদ্রের কোথাও যদি একটা জাহাজ, কি একটা স্টীম-বোটও পাওয়া যায়! দিলোয়ার জানে, ভাগোয়া কয়েদীর সাজা কী ভয়াবহ! তবু সে ধরা দেবে। মধ্য আন্দামানের এই নির্জন দ্বীপে একটা দিন কাটিয়ে সে বুঝেছে, একটু একটু করে মরার কী স্বাদ!

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপকূলে উপকূলে হন্যে হয়ে ঘুরল দিলোয়ার। কিন্তু না, দরিয়ার কোথায়ও জাহাজের মাস্তুল কি খাড়িতে স্টীম-বোটের একটা চোঙাও নজরে পড়ল না। হতাশ হয়ে সেই পাটল রঙের পাথরখানার উপর ফিরে এল দিলোয়ার।

তারপর একটার পর একটা দিন যেতে লাগল। পরনের কুর্তা আর ইজের নারকেল পাতার মাথায় বেঁধে উপকূলে উপকূলে আশায় আশায় সারাদিন ঘুরে বেড়ায় দিলোয়ার। যদি কোন জাহাজের নজরে পড়ে যায়। সন্ধ্যার সময় সব আশা সব উৎসাহ মরে যায়। ক্লান্ত শ্রান্ত পা ফেলে ফেলে পাথরখানায় ফিরতে ফিরতে দিলোয়ার ভাবে, বদনসীবের চক্রান্তে এই দ্বীপেই তাকে মরতে হবে।

প্যাডক গাছের ডগায় লতার বাঁধন দিয়ে একটা মাচান বেঁধে নিয়েছে। সারারাত সেখানে শুয়ে শুয়ে জিন্দগীর কথা ভাবতে চেষ্টা করে দিলোয়ার। এতোয়ারী, সেলুলার জেল, পোর্ট ব্লেয়ার, তামাম জীবনের সাজা—পুরানা জমানার সবকিছুকে ছত্রখান করে রেমোরা মাছগুলি ককিয়ে ওঠে, আবছা রহস্যময় আলোতে সাগরপাখিগুলো ডানা ঝাড়ে, গভীর অরণ্যের আত্মা থেকে কী এক পাখি যেন কাঁপা কাঁপা একটানা বিচিত্র সুরে চেঁচাতে থাকে।

পুরানা জমানার কথা আর ভাবতে পারে না দিলোয়ার। এই দ্বীপ একটু একটু করে তার জীবন থেকে অতীতকে মুছে দিচ্ছে। তাকে গ্রাস করতে শুরু করছে।

একটি একটি করে দিন যায়, মাস ফুরয়, বছর ঘোরে। দরিয়ার গর্জন, বাতাসের আক্রোশ একই থাকে। বঙ্গোপসাগরের এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপের দিন চিরকালের নিয়মেই কাটে। তার কোন ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই, পরিবর্তন নেই।

কিন্তু যে ভাগোয়া কয়েদী সভ্য দুনিয়া থেকে পালিয়ে এসে ডিঙি ফাঁসিয়ে এই নির্মানব দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে, তার অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। লোনা জলে লোনা বাতাসে ইজের-কামিজ ছিঁড়ে ফালি ফালি হয়ে গেল। এই দ্বীপ তাকে উলঙ্গ করে দিল। দাড়ি গোঁফ চুলে অযত্নে আঠা আঠা হয়ে জটা পাকিয়ে গেল।

প্রথম প্রথম জাহাজের আশায় সারাদিন উপকূলে উপকূলে ঘুরত দিলোয়ার। সন্ধ্যায় নিরাশ হয়ে প্যাডক গাছের মাচানে ফিরে হাউ হাউ করে কাঁদত। সকালে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে জাহাজ খোঁজা শুরু হত। বছরের পর বছর ঘুরতে লাগল। জাহাজ আর মিলল না।

একদিন জাহাজ খোঁজা ছেড়েই দিল দিলোয়ার।

জীবন যখন, তখন তার কতকগুলো জৈবিক দাবিও রয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপেও সেই জৈব দাবিগুলির হাত থেকে রেহাই নেই।

প্রথমেই খাদ্য। দ্বীপের অসংখ্য নারকেল আর শীতের মরশুমে কচ্ছপ এবং গোয়েলেথ পাখির রাশি রাশি ডিম খাবার এবং পানীয় যোগান দিতে লাগল।

খাদ্যের পরেই আশ্রয়। প্রথম কয়েক বছর প্যাডক গাছের শাখায় মাচান বেঁধে ঘুমের কাজ চালাত দিলোয়ার। কিন্তু আন্দামানের রোদ বর্ষা তাতে ঠেকানো দুরূহ। শেষ পর্যন্ত দ্বীপের মাঝখানে টিলার মাথায় একটা গুহা খুঁজে বার

[ক]রল দিলোয়ার। একখণ্ড বড় পাথর গুহার মুখে দরজার কাজ করত।

এই দ্বীপ খানা আস্তানা তুই দিল দিলোয়ারকে। খাদ্য এবং আশ্রয়ের পরও আরও কিছুর প্রয়োজন আছে। [শা]ন্তি-মহব্বতির সাথী চাই।

প্রথম প্রথম অরণ্যের সঙ্গে দরিয়ার সঙ্গে কথা বলত দিলোয়ার। এই দ্বীপেরও একটা নিজস্ব নিয়ম আছে। সেই নিয়মেই সে দিলোয়ারের সাথী যোগাল।

অজস্র কথাই বলত দিলোয়ার। কিন্তু অরণ্য কি [স]মুদ্রের জবাব মিলত না। একটু একটু করে একদিন এই [দ্বী]পের ভাষা শিখল দিলোয়ার। দ্বীপ কথা বলে না; [নি]ঃশব্দই তার ভাষা। দিলোয়ার কথা বন্ধ করল।

আগে আগে দিলোয়ারকে দেখলে সাদা সাদা সিন্ধু-শকুনগুলো উড়ে পালাত; আজকাল আর তারা ডরায় না; দ্বীপের বাসিন্দা একমাত্র মানুষটার মধ্যে ভয়ের কিছুই তারা পায় না। দিলোয়ারের গায়ে মাথায় পাখিগুলো উড়ে উড়ে বসে। দিলোয়ারও তাদের বুকে [চে]প ধরে; অতি সন্তর্পণে নখ দিয়ে তাদের পাখা আঁচড়ে [দে]য়। পাখিরা আরামে চোখ বোজে। মানুষ এবং পাখির [স]খ্য পাকা হয়।

শুধু পাখিই না, বিকেলের দিকে সমুদ্র থেকে অতিকায় কচ্ছপ উঠে আসে। এই দ্বীপের আগন্তুক আজব প্রাণীটাকে দেখে প্রথম প্রথম তারা দরিয়ায় নেমে যেত। দিলোয়ারও ভয় পেত। ধীরে ধীরে দু পক্ষের মধ্যেই বিশ্বাস জন্মাল। আজকাল দিলোয়ার কচ্ছপগুলোর পিঠে ওঠে; খোলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গলা টেনে বার করে।

একটা বিরাট কচ্ছপ—যার নাম সে দিয়েছে লিমা, তার সঙ্গেই খাতির সবচেয়ে বেশী। দিলোয়ারকে পিঠে তুলে লিমা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়; কুট কুট করে দিলোয়ারের হাতে পায়ে কামড় দিয়ে সোহাগ জানায়।

লিমা সারাদিন দ্বীপের মাটিতে ঘুরে বেড়ায়। রাত্রে সমুদ্রে নেমে যায়। শেষ পর্যন্ত এমন হল, টিলার মাথায় সেই গুহায় লিমাকে নিয়ে এল দিলোয়ার। আজকাল লিমা আর দিলোয়ার গুহার মধ্যে সংসার পেতেছে। একটি সভ্যতাছিন্ন মানুষ এবং একটি জলচর কচ্ছপের মধ্যে অদ্ভুত এক বন্ধন গড়ে উঠেছে।

সভ্য দুনিয়ার নিয়মে কত দিন, কত মাস, কত বছর পার হয়ে গিয়েছে দিলোয়ার তা জানে না। সভ্য দুনিয়ার নিয়মকানুন—সবই সে ভুলে গিয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ তার নিজের নিয়মে দিলোয়ারকে একটু একটু করে তৈরি করে নিয়েছে।

কথা না বলে বলে গলার স্বর জড়িয়ে গিয়েছে দিলোয়ারের। অনেক কথাই সে ভুলে গিয়েছে। গলার মধ্য দিয়ে এক ধরনের অস্ফুট জান্তব শব্দ বেরোয় তার।

লিমাটা বড় আয়েসী হয়ে উঠেছে। আজকাল আর সে গুহা থেকে নড়তেই চায় না।

লিমার খাওয়ার জন্য উপকূল থেকে শামুক তুলেছিল দিলোয়ার। হঠাৎ দরিয়ায় গর্জন ছাপিয়ে বিকট ভট্ ভট্ শব্দ উঠল। দিলোয়ার চমকে তাকাল। দ্বীপ থেকে খানিকটা দূর দিয়ে একটা বিরাট জাহাজ চলেছে।

এক মুহূর্ত উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে রইল দিলোয়ার। তারপর দৌড়ে একটা অতিকায় পেমা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকল। আশ্চর্য, এই দিলোয়ারই এই দ্বীপে আসার পর জাহাজের আশায় উপকূলে উপকূলে হন্যে হয়ে ঘুরত!

জাহাজটা দূরে, অনেক দূরে চলে গেল। ফারাকে যেতে যেতে একসময় বিপুল দরিয়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এবার পেমা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দিলোয়ার। লিমার জন্য কিছু শামুক জুটিয়ে ছুটতে ছুটতে গুহায় ফিরে এল।

উত্তেজিত অসহিষ্ণু দিলোয়ার অস্ফুট জান্তব জড়ানো জড়ানো স্বরে কী যেন বলতে লাগল। বোধ হয়, সে বলতে চাইল, লিমা, জাহাজ—ওই দরিয়া দিয়ে হুস্ হুস্ করে চলে গেল!

লিমা কী বুঝল কে জানে? খোলের মধ্যে থেকে গলাটা বের করে পিট পিট করে তাকাতে লাগল।

একদিন একটা সিন্ধুশকুনকে গুহায় নিয়ে এল দিলোয়ার। ডানা ভেঙে পাখিটা একটা গাছের মাথায় পড়ে ছিল। গুহায় এনে নারকেল পাতা বিছিয়ে তার বিছানা তৈরি করল। খাওয়ার জন্য পোকা-মাকড় ধরে দিল।

এক পাশ থেকে লিমা বিরক্ত কুতকুতে চোখে দেখতে লাগল। দেখে মনে হয়, তাদের সংসারে নতুন শরিককে দেখে আদৌ খুশী হয় নি লিমা।

কদিন পাখিটার খুব আদর-তোয়াজ করল দিলোয়ার।

তাজ্জবের ব্যাপার, যেদিন পাখিটাকে গুহায় নিয়ে এল দিলোয়ার, সেদিন থেকে শামুক-গুগলি খাওয়া বন্ধ করেছে লিমা। পয়লা পয়লা দিলোয়ার খেয়াল করে নি। যখন খেয়াল হল, জড়ানো জড়ানো স্বরে বলল, শালীর গোঁসা হয়েছে; খা শালী, খানা খা।

গোটা দুই শামুক ভেঙে লিমার মুখের সামনে ধরল দিলোয়ার। লিমা খেল না।

হারামী বহুত হিংসুক। গজর গজর করতে করতে বাইরে বেরিয়ে গেল দিলোয়ার।

দিলোয়ার তো জানে না, এই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ যেমন তাকে একটু একটু করে আদিমতা দিয়েছে, তেমনই তার কাছ থেকেও অনেক কিছু নিয়েছে।

সারাদিন নারকেল, বুনো লতার মূল, শামুক যোগাড় করে সন্ধ্যার আগে আগে গুহায় ফিরল দিলোয়ার। আর কদিন পর বর্ষা শুরু হবে। আন্দামানের বর্ষা; একবার শুরু হলে তার ক্ষান্তি নেই। অবিরাম, অবিশ্রাম, দিনের পর দিন তার তাণ্ডব চলে। তখন আর গুহার মধ্যে থেকে বেরুবার উপায় থাকে না। তাই আগে থেকেই দিলোয়ার তার আর লিমার খাদ্য সংগ্রহ করে রাখছে।

গুহায় ফিরেই দেখল, সাগরপাখিটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে লিমা। রক্তমাখা পালকগুলো চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে; ঘাড়টা ভেঙে পড়ে রয়েছে পাখিটা।

প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠল দিলোয়ার। চোখ দুটো তার জ্বলছে। সমুদ্র থেকে সেদিন এক খণ্ড জাহাজ ভাঙা লোহা তুলে এনেছিল। সেটা বাগিয়ে ধরে দিলোয়ার গর্জাতে লাগল, শালী, আওরতের মত তোর হিংসে? তোর জান নেব।

পিট পিট করে বারকতক তাকিয়ে দিলোয়ারের রাগটা বোঝবার চেষ্টা করল লিমা। তারপর শক্ত কঠিন খোলের মধ্যে মাথাটা ঢুকিয়ে দিল।

কঠিন খোলটার উপর আঘাতের পর আঘাত বসিয়ে যেতে লাগল দিলোয়ার।

লিমার সঙ্গে সুখে-দুঃখে, এই দ্বীপের আদিম নিয়মে দিন কাটাতে লাগল দিলোয়ার। সভ্য দুনিয়ার হিসাবে কত দিন, কত মাস, কত বছর পার হয়েছে দিলোয়ার জানে না; জানার জন্য মাথাব্যথাও নেই।

পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপ, এই সমুদ্র, লিমা, অরণ্য, সিন্ধুশকুন, হাঙর—এগুলিই দিলোয়ারের কাছে সত্য। এদের বাইরে আর কিছুই সে জানে না। এই দ্বীপ তার অতীতের অস্তিত্বকে মুছে দিয়েছে।

এমনই করেই দিন চলছিল। হঠাৎ বাইশ বছর পর ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা সার্ভের জন্য এই দ্বীপে হানা দিল। উলঙ্গ আদিম দিলোয়ারকে ধরে লণ্ড আই-ল্যাণ্ডে নিয়ে এল।

শীতের এই মধ্যদুপুরে লবণদরিয়া জ্বলছে। ক্রুদ্ধ ঢেউগুলো বিপুল আক্রোশে দ্বীপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। জেটির পাশে বাঁধা ডিঙিটা ঢেউয়ের মাথায় দোল খাচ্ছে।

দিলোয়ার ভাবছিল, সাত রোজ তাকে লণ্ড আই-ল্যাণ্ডে আটক করে রাখা হয়েছে। এই সাত রোজে নির্ঘাত কিছুই খায় নি লিমা; যা আয়েসী হয়েছে সে! রাত্রে সিন্ধুশকুনগুলো নিশ্চয়ই তাকে দ্বীপের মাটিতে খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হয়ে গিয়েছে।

দিলোয়ার অস্থির হয়ে উঠল।

থানাদার পাণ্ডে বলল, খুব ভাল করে ইয়াদ কর দিলোয়ার, তোর জরুকে চিনতে পারিস কিনা?

না না।—জড়ানো জড়ানো বিকৃত স্বরে দিলোয়ার চেঁচিয়ে উঠল। এই প্রথম কথা বলল সে।

তারপরেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

কেউ কিছু করবার আগেই লাফ দিয়ে জেটির সঙ্গে বাঁধা সেই ডিঙিটার উপর পড়ল দিলোয়ার। নিমেষে একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে ডিঙিটা অনেক দূরে চলে গেল।

সিপাই জমাদাররা হল্লা করে উঠল জেটিতে। এতোয়ারীর কান্না তুমুল হল।

এতক্ষণে দিলোয়ারের ডিঙিটা দূরে—অনেক দূরে চলে গিয়েছে। লবণদরিয়ায় ডিঙিটাকে একটা বিন্দুর মত দেখাচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরের সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ সভ্য দুনিয়া থেকে দিলোয়ারকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

রজত-জয়ন্তী

কুমারেশ ঘোষ

বিয়ে বাড়ি।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ভিয়েনের বাসন-কোসন উঠোনে ছড়ানো।

অদরকারী আলোগুলো গেছে নিভে। বাড়ির অন্যান্য সবাই তাদের কর্মক্লান্ত দেহ ছড়িয়ে দিয়েছে সুবিধে মত জায়গায়—ঘরে, বারান্দায়, মেরাপ-বাঁধা ছাদে।

সানাই বন্ধ। চারিদিক নিঃস্তব্ধ।

শুধু গুঞ্জন ফুলসজ্জার সুসজ্জিত ঘরে।

দেওয়ালে সুগন্ধী ফুলের তোড়া। নীল আলোয় ঘরখানি রহস্যময়। রোমাঞ্চকর।

খাটখানিতে নানা রঙের সুগন্ধী ফুলের মালা।

নরম গদি-বিছানা তুষার-শুভ্র।

বলা বাহুল্য, সুসজ্জিত বিছানায় নববিবাহিত বর-বধূ!

তখনও সাজসজ্জা খোলা হয় নি।

বরের পরনে গরদের ধুতি-পাঞ্জাবি। জামায় দামী বোতাম, হাতে হীরের আংটি।

বধূর পরনে অতি মূল্যবান সিল্কের বেনারসী। চমৎকার কাজ করা ব্লাউস। হাতে চুড়ি, রুলি, ব্রেসলেট। কানে কানপাশা। গলায় মানতাশা ও নেকলেশ এবং নাম-না-জানা হরেক রকমের গয়না! তা ছাড়া মাথায় ফুলের মুকুট, গলায় জুঁইফুলের মালা। হাতে ফুলের বালা।

বরের লক্ষ্য তার নবপরিণীতা বধূর সাজ-সজ্জার দিকে নয়, বরং তার লজ্জা-রাঙা মুখখানির উপরে।

বধূর চিবুক নেড়ে বর জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কি?

আজকালকার বধূরা কচিখুকী নয়। কাজেই বললে না, ষাঃ। বলল, বন্দনা।

বর হেসে বলল, চমৎকার নাম! আর তুমি চমৎকার দেখতেও।

আহা!—প্রশংসা করলে এই রকমই বলে মেয়েরা।

আহা নয়, সত্যিই বন্দনা। আমি অন্ধ নয়। বর কবিতা লেখে নাকি?

বধূ বলল, আমি কুচ্ছিৎ।

বর বলল, তুমি সুন্দর।

বধূ। আমি বন্ধন।

বর। তুমি ইন্ধন, উৎসাহ!

বধূ। আমি তোমার যোগ্য নই।

বর। আমিই তোমার অযোগ্য!

বধূ চুপ। আবার শুরু।

বর। তোমায় পেয়ে আমি ধন্য।

বধূ। আমি কৃতার্থ।

বর। তুমি কত মিষ্টি।

বধূ। তুমি কত মহৎ।

বর। আমার এখন মরণ হলেও দুঃখ নেই।

বধূ। ছি, বলতে নেই।

ইত্যাদি। ইত্যাদি।

ফুলশয্যার প্রথম আলাপ আর পাগলের প্রলাপ সমতুল্য। বিশেষ করে শেষ রাত্রের ক্রিয়াকলাপ প্রকাশযোগ্য নয়। অলমতিবিস্তরেন।

পঁচিশ বছর পরে।

ওই একই ঘরে। তবে দেওয়ালের বালি ঝরা।

খাটের সঙ্গে বেঞ্চি জোড়া। কোলের মেয়েটির শোবার জন্যে বাড়তি ব্যবস্থা। চুষিমুখে মেয়েটি ঘুমে কাদা। পাশের ঘরে বড় তিনটি ছেলেও ঘুমে অচেতন।

বন্দনা?

কি?

আজ আমাদের বিয়ের পঁচিশ বছর পূর্ণ হল।

হুঁ!

আড়াল থেকে বিনয়বাবু বার করলেন একটা বাণ্ডিল: এই দেখ!

কি?

তোমার জন্যে শাড়ি, ব্লাউজ আর সায়া এনেছি।

কী কাণ্ড!

পর লক্ষ্মীটি!

এই রাত দুপুরে?

হ্যাঁ হ্যাঁ। দেখ, শাড়ির জমিটি ভাল। অথচ দাম খুব বেশী নয়। মাত্তর চোদ্দ টাকা। তাঁত-শিল্প-কুটিরে ধুতি শাড়ির দামও এমন বেশী নয়। ব্লাউজটি পছন্দ হয়েছে? দাম পোনে-পাঁচ। আর সায়াটা আড়াই টাকা।

এত খরচ করতে গেলে কেন?

আমার ইচ্ছে।—বিনয়বাবু এইবার একটা ছোট কাগজের বাক্স খুললেন: এই নাও সন্দেশ। খাও।

ছি ছি, তিন ছেলের মা আমি। এ সব আবার কেন?

আহা, দেখই না কেমন সন্দেশ। আজকে সন্দেশের দরটাও সস্তায় গেছে। ছ টাকা সের। খাও।

আগে তুমি খাও।

আচ্ছা খাচ্ছি।...এবার তুমি খাও।

বিনয়বাবু এবার আর একটা লম্বা মোকড় খুললেন কলাপাতার।

বেলফুলের মালা আর রজনীগন্ধার ডাল।

কী সুন্দর গন্ধ? না?

হুঁ।

পর মালাটা।

আমাকে পাগল সাজাবে নাকি?

আহা-হা, সস্তায় পেলাম, তাই নিয়ে এলাম। মালাটা দেড় টাকা চাচ্ছিল, একেবারে আট আনা বলেছিলাম শেষে দশ আনায় দিল। আর এই রজনীগন্ধাগুলো আট আনায় এক ডজন কিনেছি। বেটা এক টাকা হেঁকেছিল।

সত্যিই বেশ সস্তায় হয়েছে! দেখি প্রণাম করি—

তার চাইতে বরং একটা—

আলিঙ্গন করতে গেলেন প্রিয়তমাকে। এমন সময় কেঁদে উঠল শিশুকন্যা!

ছুটে গেলেন মা।

শিশুর প্রয়োজন আগে মেটাতে হবে।

দাঁড়িয়ে রইলেন স্বামী।

বিদূষক

[৫৮৮ পৃষ্ঠার পর]

আমরা লাহোরে নেমে এলুম। সেখান থেকে অমৃতসর, জলন্ধর হয়ে দিল্লী।

চারটে মাস পেরিয়ে গেল।

এর ভেতরেই অনেকখানি এগিয়েছি আমি। প্যারালাল বারের নানারকম কসরত করতে পারি। জার্মান সায়েব হফম্যান সেই যে মস্ত সাইকেলটা নিয়ে অনেক রকম খেলা দেখায়, তারও কিছু কিছু শিখে নিয়েছি।

হফম্যান বলে, লেগে থাকলে পাকা খেলোয়াড় হতে পারবে।

ম্যানেজার বলে, খেলোয়াড়ের চাইতেও বড় খেলোয়াড় করব ওকে। ও হবে আমার পয়লা নম্বরের ক্লাউন। এমন ক্লাউন কোনও সার্কাস কোনদিন দেখে নি।

কিন্তু ক্লাউন হওয়ার চাইতেও আমার মনে আরও বেশী আকর্ষণ জাগায় ফ্লায়িং ট্র্যাপিজ। যখন মহাশূন্যে সে দুলতে থাকে, তার নিখুঁত নিটোল শরীরটা যখন তীরের মত উড়ে যায় মাথার ওপর দিয়ে, তখন আমার মাথার মধ্যে রক্ত ছল্‌কে পড়ে। যখন হাত ছেড়ে দিয়ে সে ছিটকে চলে আসে আর চিন্নু তাকে লুফে নেয়, তখন চিন্নুর সঙ্গে আমার ভাগ্য বদল করতে ইচ্ছে করে।

সার্কাস শেষ হয়ে গেলে এক একদিন যখন রাত্রে শুয়ে পড়ি অথচ ঘুম আসে না, তখন শুনতে পাই জোশিদো সেই বাজনাটা বাজাচ্ছে। সেই আশ্চর্য সুর—যা শুনলে আমার পিসিমাকে মনে পড়ে, মনে পড়ে বাগান থেকে উঠে-আসা কাঁঠালি-চাঁপার গন্ধ—ঘরের ইট-বের-করা দেওয়ালের ওপর আলো-ছায়ায় যেন রামলীলার ছায়াবাজি। এখন কিন্তু কেবল পিসিমাকেই মনে পড়ে না। যেন দেখতে পাই, ট্র্যাপিজে দুলতে দুলতে হঠাৎ ফসকে নীচে পড়ে যাচ্ছে পদ্মা—আমি দু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে নেবার জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

আর এক-আধদিন কানে আসে হরেন দাসের গান।

কোথায় লাহোর অমৃতসর, কোথায় চাটগাঁ! সার্কাস-পার্টির তাঁবুর ভেতরে রাত জেগে মোটর-সাইক্লিস্ট মোহন পাণ্ডে কোন্ দূর কর্ণফুলীর গান গায়:

> কর্ণফুলীর স্রোতে ভাইস্যা
> চলে বন্ধুর নাও—
> কুচবরণ কইন্যা ডাকে
> বন্ধু ফির‍্যা চাও রে—বন্ধু ফির‍্যা চাও।

বাঙালে ভাষা ভাল বুঝতে পারি না, কিন্তু এ গানটার একটা মানে বুঝতে পারি। একটা ছবি ভাসতে থাকে চোখের সামনে। হরেন দাস গেয়ে চলে:

> আর কত দূর যাও রে পরাণ
> সামনে সমুদ্দ র,
> নিতল জলের উথাল্-পাথাল্
> কাল-নাগিনীর পুর।
> তোমার লাইগ্যা রইতাম বইস্যা—
> কোথায় তুমি যাও—
> সোনার নাইয়া সোনার বন্ধু,
> চাও রে ফির‍্যা চাও!—

শুনতে শুনতে আমার ঘুম আসে। স্বপ্নের ঘোরে দেখি, আমাদের বাগানে গাছ আলো করে কাঁঠালি-চাঁপা ফুটেছে, দুপুরের হাওয়ায় দুলছে তারা। তারপর চাঁপা গাছটা যেন ট্র্যাপিজ হয়ে যায়, অনেকগুলো চাঁপাফুল মিলিয়ে গিয়ে একখানা মুখ হয়ে দোল খায়, আর সেই মুখখানা—

সব এলোমেলো, সব ছেঁড়া-ছেঁড়া। একরাশ জট-পাকানো সুতোর মত একাকার হয়ে যায়।

॥ ছয় ॥

ক্লাউন হয়ে নামলুম এক বছর পরে। পাটনাতে। আরও তিনজন ছিল। তাদের জন দুই অল্প-বিস্তর

খেলাও দেখাত, আর ক্লাউন হয়েও নামত। এই এক বছরে দেখেছি, তাদের হাসাবার উপকরণ সামান্যই। সেই টিনের ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা, চোখের কোণে সরু পাইপ লাগিয়ে চোখের জলের ঝরনা ঝরানো, খেলোয়াড়দের নকল দেখাতে গিয়ে উলটে-পালটে আছাড় খাওয়া।

আর সেই একই ধরনের হাসির কথা। একই রসিকতা।

দড়ির খেলা চলেছে। জাপানী ছাতা হাতে করে হেঁটে চলেছে রাধা। অমনি রসিকতা শুরু হল।

একজন বলল, নিচামে মিট্টি—

আর একজন বলল, মিট্টিকা উপর ডোরি—

প্রথম জন বলল, ডোরিকা উপর লড়কি—

লড়কি কি উপর তাম্বু—

তাম্বুকা উপর বাম্বু—

উস্ কি উপর ?

বুদ্ধু। তো বুদ্ধু চড় যা—

বলেই প্রথমটি দ্বিতীয়টিকে একটা লাথি মারল। দ্বিতীয় জন তাকে তাড়া করতে গিয়ে ধপাস করে একটা আছাড় খেল। এসব লোকের কাছে পুরনো হয়ে গেছে, আর তাদের হাসি পায় না।

ম্যানেজার আমাকে বলেছিল, নয়া নয়া আচ্ছা খেলা দেখলানো চাই বাচ্চু। তাক লাগিয়ে দেওয়া চাই সকলকে।

বলতে ভুলেছি, আমার নাম বদল হয়েছে আবার। মুরারি ভট্টাচার্য সার্কাসে অচল। আমি বাচ্চু।

তাক লাগিয়েছিলুম প্রথম দিনেই।

আমার চেহারাই যথেষ্ট। তার ওপরে রঙ মেখে আরও সেজেগুজে যখন দেখা দিলুম, তখন আমাকে দেখেই চারদিকে হাসির ঝড় উঠল। এমন কি, প্যারালাল বারের উপর থেকে অবাক হয়ে গম্ভীর সুব্বারাও পর্যন্ত কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল আমাকে।

ব্যাঙের মত চার পায়ে লাফাতে লাফাতে ঢুকেছি। সেই অবস্থায় চট্ করে আর এক ক্লাউন রামাইয়া আমার পিঠে চেপে বসল। বলল, চল বাচ্চা আরবী ঘোড়া—জলদি চল—

ঘোড়াকো চাট্ খাও গে ?

বলেই এক ধাক্কায় আমি ছিটকে দিলুম রামাইয়াকে। রামাইয়া গিয়ে পড়ল ঝুলন্ত সুব্বারাওয়ের পায়ের কাছে। লাথির ঘায়ে সুব্বারাও তাকে আরও তিন হাত দূরে পাঠিয়ে দিল।

রামাইয়া উঠে দাঁড়াল। চাপা গলায় বলল, শালা!

সুব্বারাওয়ের খেলা শেষ হলে আমি বারে গিয়ে উঠলুম। কয়েকটা ফিগার দেখিয়ে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেলুম বারের ওপর। বললুম, আর দেখিয়ে দিল্লীওয়ালী মোতিজানকি নাচ্ না—

গ্যালারী থেকে অট্টহাসি আর হাততালি ঝড়ের মত ছুটে এল আমার দিকে। নানা ভঙ্গীতে নাচের কসরত করছিলুম আমি। তারপর চারদিকের আলো আর হাসি আমার মাথার ভেতরে তুফান তুলল। কি করছি না করছি আর খেয়াল রইল না।

তখন আমার পা পিছলে গেল। পড়ে গেলুম মাটিতে। আর পড়বার সময় বারের প্রচণ্ড ঘা লাগল আমার পাঁজরাতে।

যন্ত্রণায়—দারুণ যন্ত্রণায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। আর সেই যন্ত্রণা ছুটে বেরিয়ে এল হাসির দমকে দমকে। মাটিতে বসে পড়ে আমি হেসে চললুম।

আমার সেই অদ্ভুত হাসির আওয়াজ আর তার চাইতেও অদ্ভুত মুখভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে দর্শকেরা থেমে গেল এক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই হাসি আর হাততালিতে তাঁবু ফেটে যেতে লাগল।

অসম্ভব লেগেছিল, ভাল করে দাঁড়াতে পারছিলুম না। আর যন্ত্রণা যত টনটন করছিল, ততই হাসি পাচ্ছিল আমার—ততই হাসাতে ইচ্ছে করছিল সকলকে।

যখন বেরিয়ে এলুম, ম্যানেজার শুদ্ধু হাসছে।

সাবাস্ বাচ্চু, বহুৎ আচ্ছা। আমাদের খেল্ তুই একাই মেরে দিবি মনে হচ্ছে।

রামাইয়া কিন্তু তক্কে তক্কে ছিল। এতদিন ধরে সে-ই ছিল সার্কাসে হাসির রাজা। বুঝতে পেরেছিল, আমি তার আসন টলিয়ে দিয়েছি। আমাকে জব্দ করবার সুযোগ খুঁজছিল সে।

তখন ঘোড়ার খেলা আরম্ভ হয়েছে। তিনটে ঘোড়া তীর বেগে চক্র দিচ্ছে, ক্ষুরের আওয়াজ ছুটছে, আর

াদের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে ঘোড়া বদল করছে রাধা। ল জল করে জলছে তার চোখ, চুলগুলো উড়ছে াওয়ায়, নিঃশ্বাস বন্ধ করে খেলা দেখছে লোকে।

এমন সময় ভাঁড়ামো করা বারণ। যদি একটু অন্যমনস্ক য়ে যায়, একবারের জন্যে লক্ষ্য নষ্ট হয়ে যায়, তা হলে যে-কান অঘটন ঘটে যেতে পারে।

আমি দেখছিলুম রাধাকে। ঠিক সেই সময় পেছন থকে এল রামাইয়া। পা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল ামার।

হুড়মুড় করে পড়ে গিয়েই উঠতে যাচ্ছি, তৎক্ষণাৎ ামাইয়া আমার পিঠে চেপে বসল। পা দুটোকে শক্ত রে আমার পাঁজরে এমন চাপ দিল যে মনে হল যন্ত্রণার নটনানিতে আমার আবার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। ক্ষুণি আমি শব্দ করে হেসে উঠলুম।

রামাইয়া বলল, আরে, মেরা আরব কা টাট্টু—হাস্তা কঁউ? দৌড় লাগাও—দৌড় লাগাও—

আবার পাঁজরায় সেই অসহ্য চাপ!

চার পায়ে যথাসাধ্য দৌড় লাগাবার চেষ্টা করলুম। য় ছিল না।

আমার মাথার ওপর প্রাণপণে একটা ঘুষি মারল ামাইয়া।

জল্‌দি চলো—জল্‌দি চলো। বোলো—চিঁ-হিঁ-হিঁ—

বলতে হল: চিঁ-হিঁ-হিঁ—

জোর কদম লাগাও—

পাঁজরায় যন্ত্রণা, হাঁটুতেও লাগছে, তবুও জোর কদম লাগাতে চেষ্টা করলুম।

দেখিয়ে বাবুজী, ঘোড়া বিগড় গিয়া। অ্যায়সা বদমাশ হো গিয়া—

বলতে বলতে আর এক ঘুষি।

আমি আবার হেসে উঠলুম। তারপর কাত হয়ে পড়ে গেলুম এক পাশে। নিজের পা খুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল রামাইয়া, পারল না। নিজের ফাঁদেই সে আটকে পড়েছিল। আমি আর একটা পাক দিতেই মটাৎ করে হাড় ভাঙবার আওয়াজ হল। বীভৎস যন্ত্রণায় অমানুষিক চিৎকার করে উঠল রামাইয়া। ঘোড়ার উপরে দাঁড়ানো রাধা ভয়ানক ভাবে চমকে উঠে ঘোড়ার গলা ধরে বসে পড়ল।

দর্শকেরা কিছু বুঝতে পারে নি, তারা হেসে উঠেছিল। কিন্তু বুঝেছিল রাধা, বুঝেছিল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যানেজার, বুঝেছিলুম আমি।

চিত হয়ে পড়ে আছে রামাইয়া। চোখ দুটো খোলা, চোখের তারা কপালের দিকে উঠে স্থির হয়ে গেছে। জ্ঞান হারিয়েছে রামাইয়া।

মরে গেল নাকি? মুহূর্তের মধ্যে আমার গা বেয়ে ঘামের স্রোত নামল। তারপরেই বললুম, আব্ তো সোয়ারি পটক গিয়া।

বলে রামাইয়ার পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলুম ভেতরে।

রামাইয়া মরে নি। পায়ের একটা হাড় ভেঙে গিয়েছিল। একটু পরেই চোখ মেলল। আর গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে অশ্রাব্য গালিগালাজে আমার চোদ্দপুরুষকে উদ্ধার করতে লাগল।

কারও কিছু বলবার ছিল না। নিজের চোখেই সব দেখেছিল ম্যানেজার।

দোষ রামাইয়ার। ঘোড়ার খেলার সময় কেন গিয়েছিল ভাঁড়ামো করতে। পাঠাও হাসপাতাল। সেখান থেকে ফিরে এলে মাইনে চুকিয়ে বিদায় করে দোব ওকে।

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রামাইয়া।

পনের বছর এই সার্কাসে কাজ করছি, বুড়ো হয়ে গেলুম এখানে। আজ পা ভেঙে আমাকে বেকার করে দিল। আর এই বিচার হল তার?

খাঁচার বুড়ো সিংহটার চাইতেও জোরে গর্জন করে উঠল ম্যানেজার।

চুপ। একদম চুপ। যাও—পাঠিয়ে দাও একে হাসপাতালে—

তারপরে ফিরে তাকাল আমার দিকে।

দোষ করেছিল রামাইয়া, তাই বলে ওকে জানে মেরে দিবি বাঁদি কী বাচ্চা?

প্রকাণ্ড চাবুকটা হাওয়ায় শিস্ টানল। আমার মুখের উপর দিয়ে যেন আগুনের সাপ খেলে গেল একটা। হেলে

উঠেই আমি ঘুরে পড়লুম। অনেককাল আগে যেখানে বাবা একটা স্থায়ী চিহ্ন এঁকে দিয়েছিল, সেখান থেকে আবার নেমে আসতে লাগল রক্ত—ঠোঁটের কোণা দিয়ে সেই অপরূপ নোনা স্বাদ নেমে এসে আমার মুখ ভরে দিল।

আর দাঁড়াল না ম্যানেজার। বুকে মেডেলের মালা ঝলমলিয়ে চলে গেল ভেতরে। তার সময় নেই। এইবারে বাঘ-সিংহের শেষ খেলা আরম্ভ হবে।

দিনের পর দিন।

রামাইয়া ফিরে এল। চাকরি অবশ্য যায় নি, কিন্তু খুঁড়িয়ে হাঁটে এখনও। ভাল করে সারতে আরও সময় নেবে কিছুদিন। কিন্তু পায়ে আর জোর সে ফিরে পাবে না।

আমি জানি, সার্কাসে আমার রূপ বদলে গেছে। আগে আমাকে দেখে সবাই হাসত, এখন ভয় পায়। জানে, আমি ভয়ঙ্কর। আমি হাসতে পারি, হাসাতে পারি; আর হাসতে হাসতে, হাসাতে হাসাতে যে-কোন লোককে খুন করতে পারি। আর আমাকে গালাগাল দেয় রামাইয়া।

তোর জন্যে আমার সর্বনাশ হল। খুনী, ডাকু কোথাকার।

রামাইয়া লোক খারাপ নয়। আমি ক্ষমা চেয়েছি ওর কাছে, ভাব করতে চেষ্টা করেছি। রামাইয়া খুশীও হয়েছে খানিকটা। কিন্তু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে গিয়ে যখনই পাটা টন্ টন্ করে ওঠে, তখুনি গালাগাল শুরু করে দেয়। আমার রাগ হয় না ওর ওপর, বরং মায়াই হয়।

কিন্তু বিঠ্ঠু আমাকে ক্ষমা করে নি।

আমি মহবুব মিঞার দলে ছিলুম; মহবুবকে দেখেছি, সোনা-বাঁধানো দাঁত কালুকে দেখেছি, গণেশকে দেখেছি। কলকাতার অন্ধকার গলি-ঘুঁজিতে যারা মানুষ শিকার করে, তাদের চিনতে আমার বাকি নেই। চোখের ভাষায় শয়তানের মনের কথা আমি বুঝতে পারি।

বিঠ্ঠু ক্ষমা করে নি আমাকে। একদিন শেষ ফয়সালা হয়ে যাবে ওর সঙ্গে। হয় ও আমাকে হাসাবে, নইলে আমার ওপর দিয়েই নিজে প্রাণখোলা হাসি হেসে নেবে একবার।

আমার সঙ্গে আলাপ করে মিঠে গলায়।

তোমার খেলা খুব ভাল।

আমি ওর দিকে তাকাই। চোখের পাতা নড়ছে না, সাপের চোখের মত স্থির।

তোমার ভাল লাগে বুঝি?

শুধু ভাল লাগে? হাসতে হাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়।

আমি বলি, খুব খুশী হলুম।

বিঠ্ঠু মাথা নাড়তে থাকে।

আমার ভারী শখ ছিল খেলোয়াড় হবার। কিন্তু ম্যানেজার সায়েব বলে, আমাকে দিয়ে হবে না। জীবনটা এই ভাবেই কেটে গেল।

আমি চুপ করে থাকি।

বাচ্চু সায়েব, আমাকে ক্লাউনের খেলা শেখাবে?

বলি, শেখাব।

তারপর আবার বিঠ্ঠুর দিকে চেয়ে দেখি। সেই আশ্চর্য স্থির দৃষ্টি। পাতা পড়ছে না—সাপের চোখের মত জেগে আছে।

জানি, ওর সঙ্গে একদিন আমার বোঝাপড়া হয়ে যাবে। ও আমাকে ছাড়বে না।

সার্কাস শেষ হয়ে গেলে আবার ফিরে আসি নিজের তাঁবুতে। দড়ির খাটিয়ায় ভাল করে নিজেকে এলিয়ে দেবার আগেই কখনও কখনও জোশিদোর সেই তারের বাজনাটা শুনতে পাই। ওদের তিনজনের পরিবারটা সার্কাসের মধ্যে একেবারে আলাদা। নিতান্ত দরকার না থাকলে ওরা কারও সঙ্গে কথা বলে না। এমন কি বাচ্চাটা পর্যন্ত ওদের কাছ থেকে চুপ করে থাকাটা শিখে নিয়েছে।

দড়ির খাটিয়ায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে ওর বাজনা শুনি। শুনি সেই সুরটা—যা আমার মনের ভেতর সেই চাঁপা ফুলের গন্ধটাকে বয়ে আনে। আর—আর মনে পড়িয়ে দেয় পদ্মাকে। কিন্তু পদ্মার কথা এখন নয়।

ওই বাজনার সুর থেকে আমি ভাবতে চেষ্টা করি, কী যেন অনেক কথা ওর মধ্য দিয়ে বলা হয়ে চলেছে। যে কথা মুখে বলতে পারে না তাই যেন সুর হয়ে বেরিয়ে আসে।

কী কথা বলে? কী বলতে চায়?

বলে হরেন দাস। মোটর-সাইকেল নিয়ে তারের

খাঁচার মধ্যে ঘূর্ণির মত ঘুরতে ঘুরতে উঠে যায় সে। রাত্রে আমি তার গান শুনি :

কইন্যার দুঃখে আকাশ কান্দে
কান্দে রাইতের তারা,
ময়নামতী কইন্যা কাঁদে
চইক্ষে জলের ধারা।
সেই কান্দনে পাষাণ গলে
বন্ধুর পরাণ টলে না—

এত কান্না কেন হরেন দাসের? আমি হাসির মানুষ, কান্নাকে আমি বুঝতে পারি না। সেই এক-একদিন যখন বুকের ভেতরে এক-একটা আচমকা মোচড় দেয়, তখন ভাবি, হাসি ছাড়া আরও কিছু আছে। সে যে কী ঠিক বুঝতে পারি না। একটা অস্পষ্ট আভাসের মত কী যেন ছুঁয়ে যায় আমাকে, আমিও কি কেঁদে ফেলব একদিন?

অসম্ভব। হাসি নিয়ে জন্মেছি, হাসির মধ্যেই বেঁচে আছি আমি। সেই হাসিটা যদি কোনদিন শুকিয়ে যায়, তা হলে জল শুকিয়ে গেলে মাছ যেমন করে খাবি খায়, আমারও সেই দশা হবে। সেইদিনই মৃত্যু হবে আমার।

আমি পদ্মাকে ভাবি। আমাকে দেখলেই ও হাসে। সেই প্রথম দিন থেকেই যে হাসি ওর শুরু হয়েছিল, সে আর থামে নি। আমাকে দেখে পদ্মার সব চাইতে বেশী হাসি পায় এই কথাটা ভাবতেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

কিন্তু হরেন দাসের সেই গোপন কথাটা আজও আমার জানা হয় নি। ওর যত কান্না সব বোধ হয় সেই কথাটার পেছনেই লুকিয়ে আছে।

ভাবনার সুর কাটে। জোশিদোর বাজনা থেমে গেছে। হরেন দাসের গলাও আর শোনা যায় না। একটা বাঘ দু-তিনবার হুম-হাম করে সাড়া দিল, দূরে শহরের কতকগুলো কুকুর কেঁউ কেঁউ করে উঠল। মুথু-স্বামীর তাঁবু থেকে খানিকটা চেঁচামেচি কানে এল, রুকমিনীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছে। ওদের মধ্যে প্রায়ই হয় ওরকম।

দিনের পর দিন।

হাসির নতুন নতুন কায়দা আবিষ্কার করি আমি। খেলাতেও যত তৈরি হয়ে উঠছি, হাসিও তত জমছে। দেখতে দেখতে প্রায় দেড় বছর পার হয়ে গেল। এর মধ্যে ফ্লায়িং ট্র্যাপিজের খেলাও শিখে নিয়েছি খানিকটা। আশা আছে একদিন পদ্মার সঙ্গে আমিও ট্র্যাপিজে উঠব।

আর সেইদিন আমার সব চাইতে ভাল খেলাটা দেখাব। তারই জন্যে অপেক্ষা করে আছি।

নতুন ডোরা বাঘটা যখন এল, তখন আমরা গয়াতে।

সার্কাসের বাঘ সিংহ আমার ভাল লাগে না। বেঁচে থেকেও মরে আছে ওরা। নেশার ঘোরে ঝিমোচ্ছে রাতদিন। সার্কাসের সময় চাবুকের আওয়াজ দিয়ে দিয়ে তবে ওদের চেতিয়ে তুলতে হয়। আমি অবাক হয়ে ভাবি এই কাজের জন্যে গলায় কেন এতগুলো মেডেল পরে ম্যানেজার? মড়াগুলোকে মারবার মধ্যে বাহাদুরী কোথায়?

বরং ওর চাইতে আমাদের বাজনার দলটা ভাল। তাদের ব্যাণ্ডের তালে তালে ঘোড়া নেচে ওঠে, হাতির শরীর দুলতে আরম্ভ করে। ম্যানেজার যদি চাবুক না হাঁকড়ে বাজনা দিয়ে ওদের নাচাতে পারত, তা হলেই বোঝা যেত তার বাহাদুরী।

কিন্তু নতুন বাঘটাকে দেখলে মন খুশী হয়।

বড় বাঘ সাধারণতঃ সার্কাসে কেনা হয় না, ধরা পড়লে চলে যায় চিড়িয়াখানায়। কিন্তু ম্যানেজারের এটাকে দেখে খুব পছন্দ হয়ে গেল। বয়েস বেশী নয়—কিন্তু তেজে আর শক্তিতে সারাটা শরীর ভরা। ওকে দেখলে বিশ্বাস

করতে ইচ্ছে করে না, হাজারীবাগের সাঁওতালদের ফাঁদে ও ধরা পড়েছে।

এখনও একেবারে বুনো। হিংস্র আক্রোশে গর্জন করে খাঁচার ভেতরে। মধ্যে মধ্যে এমন করে থাবা মারে যে লোহার শিক ঝনঝন করে ওঠে, ভয় হয়, এক্ষুণি ভেঙে পড়বে বুঝি।

শায়েস্তা করার চেষ্টা শুরু হয়েছে সব রকম। কিন্তু এখনও বশ মানে নি।

সেদিন তখনও আবছা অন্ধকার। ভোরের আলো ভাল করে ফোটে নি। খোলা হাওয়ায় ডন-বৈঠক সেরে আমি তাঁবুর ভেতরে যাচ্ছিলুম। আধ ঘণ্টা ধরে ট্র্যাপিজে ঢুলব এইবার।

সেই সময় নতুন বাঘটার খাঁচার সামনে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। বাঘটাও জেগে উঠেছে। অস্পষ্ট আলোয় তার দুটো লাল চোখ প্রদীপের মত জ্বলছে।

গর্‌-র—গর্‌-র্‌ র্‌—

মৃদু গর্জনে বাঘ আমাকে অভিনন্দন জানাল। ভোরের হাওয়ায় ওর গায়ের গন্ধটা পর্যন্ত আমার নতুন রকমের মনে হল। পুরনো বাঘ-সিংহের ভ্যাপ্‌সা-পচা গন্ধ নয়—এ গন্ধ আলাদা, এর সঙ্গে যেন বনের নতুন পাতা, নতুন ঘাস আর রাতের শিশির জড়িয়ে আছে।

আমি তাকিয়ে দেখছিলুম বাঘের দিকে। গর্‌ র্‌—গর্‌-র্‌-র্‌-র্‌। দাঁত বের করে লক্ষ্য করছে আমাকে। হাসছে নাকি? বাঘ কি হাসতে পারে? হাসাই তো উচিত। অমন বীভৎস যার শক্তি, অমন জোর যার গায়ে, সে হাসবে না তো হাসবে কে?

লক্ষ্য করি নি, পাশ থেকে ছায়ার মত কে এগিয়ে এসেছে। চমক ভাঙল তখন—যখন খটাং করে হঠাৎ উঠে গেল খাঁচার দরজা। আর তৎক্ষণাৎ ছায়ার মত সেই লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

গর্‌-র্‌—গর্‌-র্‌-র্‌—

এবার ক্রুদ্ধ গর্জন করে খোলা দরজার বাইরে লাফিয়ে পড়ল বাঘ।

ব্যাপারটা বুঝতে আমার সময় লাগে নি। ঊর্ধ্বশ্বাসে চিৎকার করে বললাম, শের নিকাল গিয়া—

তারপর ছুটলুম প্রাণপণে।

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই আমায় দাঁড়িয়ে পড়তে হল। একটি মেয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে।

পদ্মা!

কী করে বাঘের সামনে এসে পড়ল কে জানে। কিন্তু বাঘ তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার উপক্রম করেছে, বিরাট ল্যাজটা আছড়াচ্ছে সাপের মত। আর তারই সামনে—মাত্র হাত কয়েক দূরেই মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে আছে পদ্মা, তার যেন নড়বার শক্তি পর্যন্ত নেই!

বাঘ পদ্মার ওপর পড়বার আগে আমিই বাঘের ওপর গিয়ে পড়লুম। শক্ত করে টিপে ধরলুম বাঘের গলা। আর দু হাতের বারোটা আঙুল বাঘের গলায় পাক দিতে লাগল।

বাঘও আমাকে ছাড়ল না।

দুজনে গড়িয়ে পড়লুম মাটিতে। বাঘের থাবার আঁচড়ে আমার বাঁ দিকের পাঁজরার মাংস ছুলে ছুলে যাচ্ছে, আমি তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম। আর বাঘের গলার একটা অস্বাভাবিক গোঙানির মত আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠে আমার হাসি উছলে উঠছিল ঝলকে ঝলকে।

তারপর চারদিকে হৈ চৈ—হট্টগোল। লোক আসছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। সেই অবস্থাতেও দেখলুম ম্যানেজারের দীর্ঘ দেহ একেবারে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে হাত তুলল, কি একটা চক চক করে উঠল হাতে, দুম্‌ দুম্‌ করে রিভলভারের আওয়াজ হল।

ঠিক সময় মতই এসে পড়েছিল ম্যানেজার। তখন আমার দু হাতের বারোটা আঙুলের বজ্র ফাঁসও খুলে গেছে বাঘের গলা থেকে। মুখ নীচু করে সে প্রকাণ্ড হাঁয়ের মধ্যে আমার মাথাটা গিলতে চলেছিল।

বাঘের কানে প্রায় রিভলভার ঠেকিয়েই গুলি করেছিল ম্যানেজার। নিঃশব্দে বাঘ আমার পাশে গড়িয়ে পড়ল। খানিকটা গরম রক্তের ফিন্‌কি ছড়িয়ে পড়ল আমার চোখে-মুখে।

বাঘের তীব্র নোনা রক্ত আস্বাদ করতে করতে আমি টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালুম। আমার বাঁ দিকের পাঁজরায় তখন অসহ্য হাসির সুড়সুড়ি চলেছে। হাসতে হাসতে রক্তমাখা মুখে একবার আমি সকলের দিকে তাকাতে

চাইলুম, কিন্তু তখুনি পায়ের তলার মাটিটাকে যেন টেনে সরিয়ে নিলে কেউ।

আবার ঢেউয়ের পরে ঢেউ। আবার সমুদ্র। নিঃশেষে তলিয়ে চলেছি। শুধু পদ্মার মুখখানা হাজার হাজার টুকরো হয়ে চেতনার সীমান্তে জ্বলে উঠল একবার—যেমন করে মড়ার মাথায় আমি এক ঝাঁক জোনাকিকে জ্বলতে দেখেছিলুম।

॥ সাত ॥

পাঁজরার চোটটা খুব বেশী না হলেও বেশ কিছুদিন ভোগাল।

ডাক্তারেরা বললেন, খুব বেঁচে গেল এ যাত্রা। আর একটু হলেই পাঁজরা ভেঙে হার্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে যেত।

দুটো বাঙালী ডাক্তার। বাংলাতেই বলছিলেন।

এ যে খাস শয়তানের চেহারা মশাই। একে মারবে বাঘে? এমন বাঘের জন্ম হয় নি!

লোকটা ক্লাউন।

ক্লাউনদের সাধারণ মানুষ বলেই জানতুম। কিন্তু ক্লাউনের মেক-আপ নিয়েই যে কেউ মায়ের পেট থেকে জন্মায়—সত্যি বলতে কি, সে অভিজ্ঞতা এর আগে ছিল না। কান দুটো দেখুন—মানুষের এমন হয়? 'চিন' বলে কিছুই নেই। দু হাতে আবার বারোটা আঙুল—ওঃ, হরর!

আমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকলেও প্রত্যেকটি কথা শুনছিলুম ওদের।

ভগবানের রাজত্বে কত সৃষ্টিই আছে।

আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, এর সৃষ্টি ভগবানের হাতে হয় নি। এ আলাদা ফ্যাক্টরির জিনিস। এর জন্যে যা কিছু ক্রেডিট তা শয়তানের পাওনা।

যেতে দিন। আমাদের বাঁচানো নিয়ে কথা।

একে মারে কে! শোনেন নি, বাঘকেই প্রায় স্ট্র্যাংগল্ করে ফেলেছিল?

এ সব কথা শুনতে কি আমার খারাপ লাগে? না। বরং গর্ব বোধ হয়। আমি আলাদা হয়েই জন্মেছি, আমি আলাদা জীব। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কারও সঙ্গে আমার কোন মিল নেই। এ আমার নিন্দা নয়, পরিচয়। আর এই পরিচয়ই তো জন্মের পর থেকে আমি চেয়ে এসেছি।

সব চাইতে বিপদে পড়ত নার্সরা, যখন ঘা-টা তারা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে আসত। যন্ত্রণায় সুড়সুড়ি লাগত, আমি খিলখিল করে হেসে উঠতুম।

চমকে এ ওর দিকে চাওয়া-চাওয়ি করত নার্সরা। যে অবস্থায় মানুষ চিৎকার করে, কেঁদে একাকার করে, সে অবস্থায় এমন করে কেউ যে হাসতে পারে এ ওরা স্বপ্নেও জানত না। প্রথম দিন একজন তো প্রায় পালিয়েই গিয়েছিল সামনে থেকে।

পাগল! নিশ্চয় পাগল!

পাগল বইকি! সাধারণ মানুষের সঙ্গে যার মিল নেই, সে-ই পাগল। সাধারণের মধ্যে যে অসাধারণ হয়ে জন্মায়, লোকে তাকেই পাগল বলে। না, আমার রাগ হয় না। বরং ওদের ভয় দেখে আরও বেশী করে হেসে উঠে ভয় পাইয়ে দিতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু একদিন আমার হাসির মুখে পড়ল এসে প্রথম বাধা—

খবর নিতে অনেকেই আসত সার্কাস থেকে। সেদিন পদ্মাও এল ম্যানেজারের সঙ্গে।

ডাক্তারের কাছে কি বলবার জন্যে আমার কাছ থেকে উঠে গিয়েছিল ম্যানেজার। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে সেদিন আমি ছাড়া আর একজন পেসেন্ট ছিল—একটা অপারেশনের পর সে ঘুমোচ্ছিল ক্লোরোফর্মের নেশায়। সেই মুহূর্তে নার্সরাও কেউ ঘরে ছিল না। শুধু আমার বিছানার কাছে একা বসে ছিল পদ্মা।

পদ্মার চোখের দিকে আমি চাইলুম। করুণ, গম্ভীর তার চোখ। সে চোখে হাসি নেই।

আমি আস্তে আস্তে বললুম, আমাকে আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছে, না? তোমার খুব হাসি পাচ্ছে, না?

না।

এতদিন পদ্মার সঙ্গে আমি কখনও ভাল করে কথা বলতে পারি নি। আজ, এই হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আমার নিজের সব চাইতে গোপন কথাটা ওকে বলতে ইচ্ছে করল।

আমাকে দেখে যখন তুমি হাস, তখন আমার খুব ভাল লাগে।

পদ্মা চুপ করে বসে রইল। ওর দুটো কালো, রাত্রি-মাখানো চোখ কিছুক্ষণ থমকে রইল আমার মুখের ওপর। তারপর পদ্মা আস্তে আস্তে বলল, জান, বাঘের খাঁচা খুলে দিয়েছিল কে?

না।

বিঠু। সেইদিন থেকেই সে পালিয়েছে। তার আর খবর নেই।

বিঠু!

আমি আশ্চর্য হলুম না। বরং এমনি একটা অনুমানই আমার মনে ছায়া ফেলেছিল। আমি ওর সাপের মত পলকহীন চোখ দুটো দেখেছি। জানি, ও আমাকে সহজে ছেড়ে দেবে না।

পদ্মা বলল, আমাকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি মরতে বসেছিলে। আর তার ভেতরেও হাসছিলে হা-হা করে। তুমি কি মানুষ?

বললুম, আমি ক্লাউন।

না, তুমি ক্লাউন নও।

তবে আমি রাক্ষস। আমার বাবা তা-ই বলত, স্কুলের মাস্টারেরা বলত, রাগ করে মহবুব মিঞাও বলত। হয় রাক্ষস, নইলে শয়তান।

তুমি রাক্ষস নও। শয়তানের অনেক ওপরে। হয়তো দেবতারও ওপরে।

পদ্মার গলার আওয়াজ যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল, চোখ দুটো প্রায় বুজে এল। তারপরেই ঘটল সেই ব্যাপারটা। আমার কুৎসিত কদর্য মুখের ওপর দুটি অপরূপ কোমল ঠোঁট নেমে এল পদ্মার।

দু সেকেণ্ড—মাত্র দু সেকেণ্ড। তার বেশী নয়। কিন্তু এর মধ্যেই যেন একটা ঝড় বয়ে গেল আমার ওপর দিয়ে। রক্তের নোনার চাইতেও আরও তীব্র, আরও উন্মাদ আস্বাদ আমার সমস্ত শিরাস্নায়ুর ভেতর দিয়ে বিদ্যুতের মত ছুটে গেল।

আর তখনই বাইরে শোনা গেল জুতোর শব্দ। ঘরে ঢুকল ম্যানেজার।

ডাক্তার বলেছে, কয়েকদিনের মধ্যেই ছেড়ে দেবে তোমাকে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল ম্যানেজারের: আমরা তো মনে করেছিলুম, তোমাকে ফেলে রেখেই চলে যেতে না হয়। ওদিকে আবার মজঃফরপুর যেতে হবে, সেখানে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে, পাবলিসিটিও করা হচ্ছে নিয়মিত।

ম্যানেজার আরও কী বলেছিল, আমি শুনতে পেলুম না। আমার সমস্ত চেতনা তখন বিভোর হয়ে গেছে। দু চোখ অন্ধ করে আমি পড়ে রইলুম। সেখানে দুটি ঠোঁটের স্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। ওরা কখন চলে গেছে, তাও আমি জানতে পারি নি।

কলকাতার সেই সুড়ঙ্গগুলোকে মনে পড়ছিল।

না, এ স্বাদ সেখানে নেই। হাসির সুড়সুড়ি ছাড়া তাদের আর কিছুই ছিল না।

সার্কাসে ফিরে এসেছি। আরও আলাদা—আরও ভয়ঙ্কর হয়ে।

এখন মুথুস্বামীর মত জোয়ান পর্যন্ত আমাকে ভয় করে। জাপানী জোশিদো যেচে আমার সঙ্গে আলাপ করে গেল। যে রাধা চিনু ছাড়া আর কাউকে মানুষ বলে মনে করে না, অথচ আশা দিয়ে দিয়েও চিনুকে এখনও পর্যন্ত বিয়ে করে নি, সে অবধি হেসে কথা কইল আমার সঙ্গে।

হফম্যান এসে আমার হাত ঝাঁকিয়ে বলল, কন্‌গ্র্যাচুলেশনস!

ম্যাথু কিছুক্ষণ মিটমিট করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। বলল, খুব নার্ভ আছে তোমার। শিকারী হওয়া উচিত ছিল। জান, একসময় আমিও আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করেছি। একবার একটা লেপার্ডের সঙ্গে আমাকেও খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে হয়েছিল।

অর্থাৎ, আমার এমন কিছু কৃতিত্ব নেই। ও-কাজটা ম্যাথুও পারত।

আর দু-একদিন পরেই আমার কাছে মুখ খুলল সাইক্লিস্ট হরেন দাস। সার্কাসে মোহন পাণ্ডে যার নাম।

সেদিনও অনেক রাত্রে ওর সেই কান্নার গান শুনছিলুম। তারপর পাশের ক্যাম্পখাটে যখন মুন্নারাও

ঘুমে অচেতন, তখন তাঁবুর পরদা তুলে হরেন দাস ডাকল, মুরারি!

খুব আস্তে আস্তে ডেকেছিল। তবু ওই নামটা শুনে আধো-ঘুম থেকে আমি চমকে উঠলুম। হঠাৎ যেন মনে হল, অনেক দুর থেকে ছেলেবেলার আনন্দ আমাকে ডাকছে।

হরেন দাস বলল, ঘুমুচ্ছ?

না।

তবে বাইরে এস। কথা আছে।

যে মাঠে আমাদের তাঁবু পড়েছিল, তার আশপাশে লোকালয় নেই। চারদিক ফাঁকা, তার মধ্যে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে। আকাশে চাঁদ, জ্যোৎস্নার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে।

একটা কাঠের খুঁটি পড়ে ছিল। বলল, বস।

দুজনে বসলুম পাশাপাশি।

মিনিট কয়েক চুপ করে রইল হরেন দাস। তারপর বলল, আমিও গলা টিপে খুন করেছিলুম। তবে বাঘিনীকে।

বাঘিনী! অবাক বিস্ময়ে আমি ওর দিকে চেয়ে রইলুম।

আমার বউ। অদ্ভুত সুন্দর ছিল দেখতে। কিন্তু ভেতরে তার সাপ লুকনো ছিল। আমি সাবানের এজেন্সি করতুম। প্রায়ই যেতে হত বাইরে। হঠাৎ একদিন অসময়ে ফিরে এসে দেখি—

হরেন দাস একবার থামল। গলাটা ধরে এসেছিল, পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, লোকটা ছুটে পালাল। আর বউটা কিছু বলবার আগেই দু হাতে তার গলা টিপে ধরলুম। একটু বাধা দিলে না, একবার হাত-পা ছুঁড়ল না পর্যন্ত। একতাল কাদার মত যেন গলে গেল গলাটা, ঠোঁট আর নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আমার হাতে লাগল। তারপরেই মিটে গেল সমস্ত।

তুমি খুনী! আমি আবার চমকে উঠলুম। মহবুব মিঞাকে আমার মনে পড়ে গেল।

হ্যাঁ, খুনী।—হরেন দাস আস্তে আস্তে বলল, কিন্তু বউকে আমি বড় ভালবাসতুম। আজও ভালবাসি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। জ্যোৎস্নাধোয়া মাঠের ভেতর দিয়ে হাওয়া বইছিল, এতক্ষণ পরে যেন ঝিঁঝিরাও ডেকে উঠল একসঙ্গে।

খুন করে তুমি সার্কাসের দলে এসেছ!—কিছুক্ষণ পরে আমি বললুম, সকলের চোখের সামনে—

সার্কাস তখন মালয় আর বর্মার পথে চলেছে। ঘুরে এল দেড় বছর পর। তখন ভেবেছিলুম, পালাই।

তারপরে দেখলুম, সকলের চোখের সামনে থাকাই সব চাইতে নিরাপদ। কেউ কোনদিন সন্দেহ করবে না।

আবার চুপচাপ। তারপর একটা ঘোড়া ডেকে উঠল। আর তক্ষুনি আচমকা উঠে দাঁড়াল হরেন দাস। আমার দিকে ভ্রূকুটি করে বলল, তোমাকে কেন বললুম এ সব কথা? কোন দরকার ছিল না।

কিন্তু আমার দরকার ছিল। সে মুহূর্তে অবশ্য তা আমি বুঝতে পারি নি। কেবল আরও অনেকক্ষণ সেই হু-হু করা হাওয়ায়, ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে, সেই জ্যোৎস্নার আলোয় আমার মনে হতে লাগল, একটা নতুন কথা শুনেছি। ভালবাসা। পদ্মাকে আমি ভালবাসি।

সকলের ভিড়ের মাঝখানে ওকে আমি খুঁজে বেড়াতে লাগলুম পরদিন থেকে। দূর থেকে দেখি, দেখি ওর চোখে বিদ্যুতের মত কী খেলে যায়। আমি আর হাসতে পারি না সহজে। কী যেন একটা দুলে দুলে ওঠে হৃৎপিণ্ডের ভেতর। কান্না?

না, কান্নার কথা ভাবতে পারি না। যেদিন আমার কান্না—সেইদিনই আমার মৃত্যু।

ভোরবেলা উঠেছি ট্র্যাপিজে। তাঁবুর মধ্যে তখনও লোক এসে হাজির হয় নি। বড় আলোটা জ্বলছে, আমি ট্র্যাপিজে দোল খেয়ে চলেছি একলা। ভাবছি, পদ্মার শরীরটা এরই ওপরে দুলতে থাকে—হাওয়ার ওপর দিয়ে ভেসে যায়। ওর দেহের প্রত্যেকটা রেখা যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলুম।

আর ঠিক সেই সময় উলটো দিকের দড়ি বেয়ে পদ্মা ট্র্যাপিজে উঠে এল।

স্বপ্ন দেখছি? না, পদ্মাই বটে। সেই শরীর—সেই বিদ্যুতে ভরা চোখ, ঠোঁটের কোণে সেই হাসির আভাস। আমার মাথায় রক্ত ছুটতে লাগল।

পদ্মা বলল, লাগাও খেল্। দেখি, কেমন খেলোয়াড় হয়েছ তুমি।

দু দিক থেকে ট্র্যাপিজে দোল লাগল। আমার মনে হতে লাগল, আজ আমার শরীরটাও পদ্মার মত হালকা হয়ে গেছে—হয়তো পদ্মার চাইতেও বেশী। এখন যদি নিজেকে এই ট্র্যাপিজ থেকে আমি ছেড়ে দিই, তা হলে মাটিতে পড়ব না—হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ে যাব। এই তাঁবু ছাড়িয়ে, এই শহর ছাড়িয়ে, কোথায়—কতদূরে, আমি জানি না।

প্রলয়-দোলায় আমি দুলে চললুম। পদ্মা যেন একবার চিৎকার করে বলল, সাবাস্—সাবাস্—

তারপর ওদিক থেকে আর একটা প্রলয়-দোলা ছুটে এল। দুটো ঝড় মিশল একসঙ্গে। আর সেই মহাশূন্যে, সেই দোলার মাঝখানে পদ্মার ঠোঁট এসে মিশল আমার ঠোঁটে—এক মুহূর্তের জন্যে আমাদের দুটো দেহ একসঙ্গে জড়িয়ে গেল।

নীচে নেট ছিল না। অথচ, সেই মুহূর্তেই আমি আছড়ে পড়তে পারতুম। নিজের রক্তের চাইতেও আরও মাতাল-করা স্বাদে আমার শরীর অবশ হয়ে গিয়েছিল। অথচ আমি পড়লুম না। কেমন করে যে ধরে রইলুম তা জানি না।

আর নীচ থেকে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন ছুটে এল তখন। বাঘের চাইতেও ক্ষুধিত, সিংহের চাইতেও নিষ্ঠুর।

উতার আও—উতার আও বাঁদী কী বাচ্চা—

ম্যানেজার। যেন থাবা পেতে দাঁড়িয়ে আছে।

উতারো বাঁদী কী বাচ্চা!

নেমে এলুম। তখনও আশ্চর্য আস্বাদে ভরা আমার শরীর। তখনও নিজের মধ্যে আমি ডুবে আছি। পৃথিবীতে কাউকে আমি দেখতে পাচ্ছি না—কাউকে আমার ভয় নেই। ম্যানেজার তো সামান্য!

আর পদ্মা হেসে উঠল খিলখিলিয়ে।

একটা ক্লাউনের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলুম। ঠাট্টাও বোঝ না তুমি।

আমি তখনও মাটিতে পা দিই নি। শূন্যেই আমার শরীরটা থমকে গেল। এই তিন বছরে আমি তামিল ভাষা বুঝতে পারি।

ম্যানেজার গর্জন করে বলল, এসব ঠাট্টা তোমাকে বন্ধ করতে হবে এখন, আগে যা চলে চলত। ভুলে যেয়ো না, এক মাস আগে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেছে!

এক মাস আগে! যখন আমি হাসপাতালে ছিলুম।

তারপর ম্যানেজার ছুটে এল আমার দিকে। আমি মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগেই সে একটা প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিল আমার মুখে। বেশ টের পেলুম, দুটো দাঁত আমার খসে গেছে, আমার মুখে রক্তের নোনা আস্বাদ।

হা হা করে হাসতে চাইলুম, হাসি এল না। এক মুহূর্তে আমার হাসির যন্ত্রের তার ছিঁড়ে গেছে। আর একটা লাথি পড়ল পেটের ওপর, আমি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম।

বাঁদী কী বাচ্চা! উল্লুক—রাস্কেল্—জানবর কাঁহাকা!

না, কিছুতেই আমি আর হাসতে পারছি না। পিঠের ওপর লাথির পর লাথি পড়ছে, যন্ত্রণায় টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে শরীর, তবু হাসি আসছে না আমার। মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে, বুকটা যেন ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে এখুনি।

আমি কি কাঁদছি? আমি কাঁদছি?

* * *

রাত শেষ হয়ে এল আজও।

ঠাণ্ডা রেল লাইনটার ওপর শুয়ে আছি মাথা পেতে দিয়ে; সিগন্যালের নীল বাতি জ্বলেছে—গাড়িটা এসে পড়বে এখুনি। আজও একটু পরেই ট্র্যাপিজে দুলতে আসবে পদ্মা। নীচে আজও নেট থাকবে না—নেট রাখবার কথা কারও মনেও হবে না। অনেক যত্নে, অনেকক্ষণ ধরে মাঝরাতে আমি দু দিকের দড়ির বারো আনাই কেটে দিয়ে এসেছি। শূন্য থেকে ত্রিশ হাত দূরে ছিটকে পড়বার আগে পর্যন্ত বুঝতেও পারবে না পদ্মা।

ট্রেন আসছে। বাঁকের মুখে আলো পড়েছে তার। আর দু মিনিট। তার বেশী নয়।

হাসির যন্ত্রটা আর বাজবে না। বিদূষকের কাজ আমার শেষ হয়ে গেছে। আর আমার বাঁচবার কোন দরকার নেই। এখন পৃথিবীতে আমি অনাবশ্যক।

শুধু অপেক্ষা করছি ট্রেনের চাকার জন্যে। ওই এসে পড়ল—এসে পড়ল প্রায়। তবু শেষ আশা এখনও ছাড়ি নি। লোহার চাকার শেষ ঘায়ে শেষ হাসিটা হেসে উঠব।

কেমন লাগবে চাকার ছোঁয়া? পদ্মার ঠোঁটের মত? তার চাইতেও তীব্র? তারও চেয়ে বেশী নেশা লাগিয়ে দেবে মুহূর্তের জন্যে।

থরথরিয়ে লাইনটা কাঁপছে। ছুটে আসছে আলো আর শব্দের তুফান। সেই তুফানটা এসে পড়ার তিন সেকেণ্ড আগে আকাশ-ছেঁড়া একটা উল্কার আলো নিঃশব্দ হাসিতে ছুটে গেল চোখের ওপর দিয়ে।

আমার জন্মলগ্নের নক্ষত্রটা।

সমাপ্ত

আগুন

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে আকস্মিক ভাবে সুইজারল্যাণ্ড ছাড়তে হল। দু মাসের ছুটি নিয়ে দেশে ফিরলুম।

১৯৩৯ সনের প্রথম ভাগ। উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে তখন অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছিল। বেশ একটু গুমোট ভাব। মনে হচ্ছিল, আশেপাশের মানুষেরা সব রুদ্ধশ্বাসে কিছুর অপেক্ষা করছে, কিছুর আশঙ্কা। কোন বিস্ফোরণ হবে কি ইউরোপে!

মারিয়া নেই, মারিয়া বাজলের স্যানাটোরিয়ামে আছে। সেখানে না গেলে তার সঙ্গে দেখা হয় না। জুরিখে আর আমার সঙ্গী নেই, সঙ্গী হয় নি।

একদিন আমার জর্মন সহকারীকে এই উদ্বেগের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলুম। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আপনি ভারতীয়, তাই এ কথা জানতে চাইলেন।

কেন বল তো?

আমি কিছু লজ্জা পেলুম। মুখের উপর অজ্ঞ বললে কে না লজ্জা পায়!

আমার অপ্রস্তুত ভাব লক্ষ্য করে ভদ্রলোক বললেন, না না, আমি আপনার দোষ দিচ্ছি নে। আমি এদেশের রাজনৈতিক জটিলতার কথা বলছি। দীর্ঘদিন এদেশে না থাকলে এ সব আয়ত্ত করা কঠিন ব্যাপার।

এ কথার উত্তর আমি দিলুম না। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবান্তর আমি লক্ষ্য করলুম। এমন স্বল্পবাক্ গম্ভীর প্রকৃতির লোক আজ অনেক কথা বললেন আমাকে। ভারতীয় বলেই বোধ হয় বললেন। আমি আশ্চর্য হলুম সে সব কথা শুনে। বললেন, পুনর্জন্ম নিতে জর্মন জাতের বিশ বছর সময় লাগে।

আমি হিসেব করে দেখলুম যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশ বছর বুঝি পূর্ণ হচ্ছে।

আমার ছুটিতে যাবার খবর পেয়ে এও বলেছিলেন যে, আর বোধ হয় আমি ফিরতে পারব না। ফিরলেও অনেক দেরিতে। ইউরোপে যে আগুন লাগছে, তা অনেক দূর ছড়াবে। নিবতেও সময় লাগবে।

বললুম, কোনদিন নিববে তো?

কড়া করে ছাঁটা গোঁফের ফাঁকে তাঁর সাদা দাঁত দেখতে পেলুম। এই প্রথম আমি তাঁর হাসি দেখলুম। ভদ্রলোক উত্তর দিলেন না।

বললুম, বোধ হয় নিববে না। কি বলেন?

আমার এই কৌতূহল ভদ্রলোকের ভাল লাগল না। গম্ভীর হয়ে বললেন, আগুন কি নেবে! অনুকূল বাতাস না পেলে কিছুদিন চাপা থাকে মাত্র।

আগুনের ধর্মের কথা আমার জানা আছে। আমি আরও কিছু জানতে চেয়েছিলুম। ভদ্রলোকের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আর কোন প্রশ্ন করবার সাহস হল না।

প্লেনে তুলে দেবার সময় ভদ্রলোক বলেছিলেন, একটা খবর দিয়ো।

বললুম, দেব।

কিন্তু মারিয়াকে আমি কোন খবর দিতে পারি নি। ভদ্রলোক কি ভাবছিলেন জানি না। হঠাৎ বললেন, মারিয়াকে আমি খবর দেব।

ধন্যবাদ দেবার সময় আমি চমকে উঠেছিলুম। ভদ্রলোক আমায় ঠাট্টা করলেন না তো?

তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভুল বুঝতে পারলুম, কড়া গোঁফ দিয়ে তো চোখের দৃষ্টি ঢাকা যায় না। তাঁর দৃষ্টিতে বেদনা ছিল।

দেশে ফিরেই বুঝতে পারলুম যে আমার পক্ষে ফিরে যাওয়া আর হয়তো সম্ভব হবে না। বাধা নানা রকমের। নানান দিক থেকে বাধা। সমস্ত অতিক্রম করবার সামর্থ্য আমার নেই।

মার অসুখের সংবাদ মিথ্যা। তিনি চান যে, আমি দেশে বিবাহ করি। সম্ভব হলে এ ব্যবস্থা তিনি আগেই করতেন। কিন্তু আমার আপত্তির জন্যে করেন নি। স্বীকার করলেন যে বিদেশ-যাত্রার পূর্বেই তাঁর ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। তা পারেন নি আমার তাড়ার জন্যে। আমার মনে হল, হঠাৎ কোন দুর্ভাবনার কারণ ঘটেছে। কেব্‌ল্ পাঠিয়ে তাই আমাকে ডেকে আনলেন। সে গল্প পরে বলব। এবারে অনাথবাবুর গল্প বলি।

মানিকতলায় আমাদের পৈতৃক বাড়ি। একতলায় ভাড়াটে আছেন জনকয়েক। অনাথবাবু তাঁদের মধ্যে একজন। পাঁচ-সাতটি ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেকদিন এ বাড়িতে আছেন। চাকরি নিয়ে বিদেশে যাবার আগেও তাঁকে দেখে গিয়েছি, কিন্তু এবার ফিরে আর দেখলুম না। অনাথবাবুরা যে আর এ বাড়িতে থাকেন না, কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। তাঁর বড়খোকা একাই এক শো।

তাঁর ঘরের দরজাটা পেরবার সময় আমি থমকে দাঁড়ালুম। কেন থামলুম, মা এক মুহূর্তে তা বুঝে ফেললেন। বললেন, ওঁরা চলে গেছেন।

সে কি! উঠে গেলেন ওঁরা?

আমি আমার বিস্ময় জানিয়ে দিলুম মাকে।

মা বললেন, আমরাও কম আশ্চর্য হই নি। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ একদিন সকালে দেখি, তল্পি-তল্পা বাঁধা-ছাঁদা হচ্ছে। ওঁরা আর থাকবেন না।

আমার যে আরও কিছু শুনতে বাকী আছে, মা সে কথা বুঝতে পাচ্ছিলেন। বললেন, কেন চলে গেলেন, আমরা বুঝতে পারলুম না। কি সব আবোল তাবোল বললেন, আগুন লেগেছে, ধোঁয়া উঠছে, খবরের কাগজে নাকি খবর বেরিয়েছে।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার জর্মন সহকারীর কথা। তিনিও আমাকে এই কথা বলেছিলেন। অনাথবাবু এসব কার কাছে শুনলেন! আমি তো রোজ খবরের কাগজ পড়ি। আমি তো কিছু জানি নে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মা হেসে ফেললেন। বললেন, সবচেয়ে খুশী হয়েছেন ভূতোগিন্নী। তাঁর আনন্দ আর ধরে না।

তাঁর কিসের আনন্দ? আমি জানতে চাইলুম।

মা বললেন, ভূতোগিন্নীর আমসত্বের গল্প মনে নেই?

মনে আছে বইকি। আমি জবাব দিলুম।

বর্ষার সময় ভূতোগিন্নী আমসত্ব শুকতে দিতেন ছাদের উপর। বুড়ো মানুষ, তার উপর পায়ে বাত। কর্তার শখের জন্যেই রোজ ছাদে ওঠা-নামার কষ্ট স্বীকার করতেন। একতলার বারান্দায় রোদ নেই। তাই উপায় নেই ছাদে না গিয়ে। সেখানেও কাকের উপদ্রব। অথচ আমসত্বের পাহারায় ছাদে বসে থাকলেও সংসার চলে না। তিনি তাই ছাদে উঠতেন এক হাতে পাথরের থালা আর এক হাতে একখানা লাঠি আর একটা টুপি নিয়ে। একটা ময়লা তেল-চিটচিটে মচকানো শোলার টুপি। যৌবনে ভূতোবাবু নাকি টুপি মাথায় দিয়ে অফিস যেতেন। সেই টুপি লাঠির আগায় বসিয়ে তাকে প্রহরীর চেহারা করতে ভূতোগিন্নীর অনেক সময় লাগত। যতক্ষণ তিনি থাকতেন, ততক্ষণ একটাও কাক কাছে আসত না। কিন্তু বিকেলে গিয়ে পাথরের থালাখানা নির্ঘাত খালি দেখতেন।

সেই দিনের কথাও আমার মনে স্পষ্ট আছে। চিলেকোঠায় লুকিয়ে থেকে ভূতোগিন্নী হাতে-নাতে ধরে ফেললেন অনাথবাবুর ছোটখোকাকে। জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে সে লুকিয়ে ছিল। থপথপ করে ভূতোগিন্নী সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই ছোটখোকা বীরের মত বেরিয়ে এল। এদিক সেদিক চেয়েই চুমুক দিয়ে ও চেটে নিঃশেষ করে দিল রসপূর্ণ থালাটা। আর যাবে কোথায়? ভূতোগিন্নী বেরিয়ে এলেন গর্জন করে। তাতে থালাটাও ভাঙল। পুরু কালো পাথরের থালা। ছোটখোকা সেখানা নামিয়ে রাখবার সময় পেল না।

সেদিন প্রথম আমি অনাথবাবুর স্ত্রীর গলা শুনেছিলুম। বারান্দায় কুরুক্ষেত্র যখন কিছুতেই থামছে না, ভদ্রমহিলা আড়াল থেকে বললেন, আজ ছেলেটার দোষ দিচ্ছেন কেন দিদি। আমসত্বের লোভ তো আপনিই দেখিয়েছেন।

কথাটা মিথ্যে নয়। ভূতোগিন্নী নিজেও তা স্বীকার করলেন। ছোট ছেলে দাঁড়িয়ে দেখবে, তাকে এক টুকরো না দিয়ে কর্তাকেই সবটা কী করে দেন।

হাসতে হাসতে মা বললেন, ভূতোগিন্নী নাকি মা কালীর কাছে মানৎ করেছিলেন, এরা বিদেয় হলে নিজে গিয়ে কালীঘাটে পূজো দেবেন। শুনলুম, দিয়েও এসেছেন।

কিন্তু অনাথবাবুদের গৃহত্যাগের রহস্য এতে সরল হল না। ভদ্রলোককে আমি যখন দু বেলা দেখতুম, তখন তাঁর বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে কিংবা পেরয় নি। তাঁর অস্বাভাবিক লম্বা শীর্ণ দেহখানা সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকেছে। মাথার চুলে পালিশ আছে বেশ, কিন্তু দু পাশের পাকা চুল তাতে ঢাকা পড়ে নি। বেশ-বাসে সৌখীন না হলেও চেহারায় সৌখীনতা আছে। কথাবার্তাও সৌখীন ধরনের। তবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী বকেন। ভদ্রতা রক্ষায় সব কথা শুনতে গেলে ক্ষতিস্বীকার করতেই হবে।

ছাত্রজীবনে ভদ্রলোককে আমি ভয়ই পেতুম। বিশেষত; কাজের তাড়া থাকলে। অনাথবাবু বাড়ি আছেন, অথচ পথ আগলে কথা কইলেন না—এ একটা অসম্ভব ব্যাপার। খবরের কাগজে জোরালো কোন খবর না থাকলে নিজের সংসারের কথাই কইবেন। মুখের আগলও আলগা হয়ে যায় এক-একদিন। হঠাৎ একদিন প্রশ্ন করে বসেছিলেন, আপনারা হাসেন তো?

আমি তখন বেড়াতে বার হচ্ছিলুম। থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, কেন বলুন তো?

অনেকক্ষণ থেকেই ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা গণ্ডগোল করছিল। তাদের দেখিয়ে বললেন, এদের দেখে?

খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বললুম, হাসব কেন।

আমার উত্তরটা ভদ্রলোক মেনে নিলেন না, বললেন, হাসবার কথাই তো।

তারপরেই কারণ দেখালেন, বললেন, গরিবের ঘরে সংসার এমনি বড়ই হয়।

ভদ্রলোকের লজ্জার কারণ জানতে পেরে আপত্তি জানালুম, বললুম, সেকি কথা, সংসারে ছোট-বড়র সঙ্গে গরিব-বড়লোকের কী সম্পর্ক!

সম্পর্ক নেই? ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

আমার পক্ষে বিপদেরই কথা। এখন দেখছি মেনে নিলেই ভাল ছিল। ভুল শোধরাবার উপায় নেই বলে ভগবানকে স্মরণ করলুম, ছেলে-মেয়ে তো ভগবানের দান!

আপনি ভগবান মানেন?

বলে ভদ্রলোক ঠোঁট ওল্টালেন।

মানি বইকি।

কিন্তু আমার কথা উপেক্ষা করে ভদ্রলোক বললেন, মানুষের মত যার বিচার, তাকে আপনি ভগবান বলেন?

অনাথবাবু আজ এ কী বলছেন!

আমি আশ্চর্য হলুম তাঁর কথা শুনে।

ঠিকই বলছি, ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, এই দেখুন না পাড়ার ব্যাপার। টাকার অভাব আছে রাইবাবুর! নছি তাঁর খাটে নাকি ছোবড়ার গদি নেই, তুলোও ই। গদি মোহরের। তার ওপর নোটের তোশক। ন্তু ছেলের বেলায় দেখুন, বুড়ো মরলে দু দুটো বউ বিধবা ব, বংশধর থাকবে না পিণ্ড দিতে।

এ আমার জানা গল্প, তাই উৎসাহ পাচ্ছিলুম না। ।নামাতেই একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেলুম। বললেন, থচ আমাকে দেখুন, ষাট টাকার কেরানী—

কথাটা ভদ্রলোক শেষ করলেন না। তার দরকারও হল না।

আমার তাড়া ছিল, পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলুম। ।ধা দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, কারণ জানবার কৌতূহল নই আপনার?

এসবেরও কারণ আছে নাকি! আমি আশ্চর্য হয়ে াঁড়িয়ে গেলুম।

ভদ্রলোক বললেন, কিসের কারণ নেই!

আমার খুব কাছে ঘেঁষে এসে আবার কথা কইলেন। লাটা নামিয়ে খুবই আস্তে আস্তে। বললেন, আমাদের ত মধ্যবিত্ত গরিবদের কাছে নিজের সংসারটাই হচ্ছে ব। স্বাদ-আহ্লাদ-আমোদ-ফুর্তি—সবই এই দুখানা রের ভেতর। কারখানার মজুরেরও বোতল আছে; ।দের শুধুই পরিবার।

তাঁর বক্তব্যটা আমি বুঝতে পেরেছিলুম। তবু ভদ্রলোক থামলেন না, বললেন, দশটা পাঁচটা কলম পেষাকে জীবনের ব্রত করেছি সত্য, কিন্তু ফুর্তির লোভ তো বিসর্জন দিতে পারি নি। আপনাদের থিয়েটার আছে, ক্লাব, পিকনিক, সমাজ, বান্ধবী! আর আমাদের! একদিন থিয়েটারে গেলে উপোস করতে হবে দুদিন।

প্রতিবাদ করার বিষয় ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি ছিল না। কিন্তু অনাথবাবু নিজেই সে কাজ করলেন, বললেন, আপনি কি বলবেন তা জানি। বলবেন, পরিবার বৃদ্ধি করে তো সমস্যার সমাধান হয় না!

তা হয় না। ভদ্রলোক নিজেই এ কথার উত্তর দিলেন, বললেন, তা বলে কেরানীও সন্ন্যাসী হতে পারে না যে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে যোগাভ্যাসে বসবে।

ভদ্রলোক যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, তা দেখতে পেলুম। বললেন, মা লক্ষ্মী কি মা ষষ্ঠীর সতীন? একজনের কৃপাদৃষ্টি ফেললেই আর একজন মুখ ফিরিয়ে নেন!

বিশ্বাস হচ্ছে না?

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, স্ট্যাটিস্টিক্‌স্ নিন একটা। তাতে আমাদের মত ষাট টাকার কেরানী, দু শো পাঁচ শো টাকার অফিসার, আবার দু-দশ হাজারী ব্যবসাদারও থাকবেন। তারপর মিলিয়ে নেবেন আমার কথা। মা সরস্বতীর হিসেব নিলে আরও আশ্চর্য লাগবে। যার ঘরে লক্ষ্মী-সরস্বতীর সমান কৃপা, তার অবস্থা রাইবাবুর মত। পোষ্যপুত্রও বাঁচে না বংশে বাতি দিতে।

অনাথবাবুর হাত থেকে অনেক কষ্টে সেদিন পরিত্রাণ পেয়েছিলুম। বোধ হয় তাঁর স্ত্রীর জন্যেই তা সম্ভব হয়েছিল। ভদ্রমহিলাকে ভাল করে কোনদিন দেখি নি। দূর থেকে একটু বেশী কৃশ মনে হয়েছে। একটু বেশী ফ্যাকাশে। বোধ হয়, অল্প সময়ে বহু সন্তানের জননী হবার জন্যে। স্বল্পভাষীও একটু বেশী। তাই দরজার আড়ালে তাঁর কাশির শব্দ শুনেই অনাথবাবু তার অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। ছাড়া পেয়ে ভদ্রমহিলাকে আমি ধন্যবাদ দিয়েছিলুম মনে মনে।

তাঁর বড়খোকার বয়স তখন বছর বারো। অত্যন্ত আঁট একটা কালো হাফপ্যান্ট পরে সারা বাড়ি দাপাদাপি করে বেড়াত। রোদ্দুরে আচার-মোরব্বা শুকতে দেবার উপায় নেই। চোখের আড়াল হতে যা দেরি। শেষ পর্যন্ত তার নাগাল না পেয়ে তার বাপকেই সবাই গালাগালি দেয়। এমন ধাড়ি ছেলেকে স্কুলে না দিয়ে ধর্মের নামে ছেড়ে দেবার যে কী মানে হয় ইত্যাদি। বড়খুকি বয়সে কিছু বড়, মুখ বুজে বাপের নিন্দে হজম করতে নারাজ। ভাইকে উত্তর দিতে শেখায়, বল্ না, 'একটা বিনি পয়সার স্কুল খুলে দিলেই তো পারেন।' বড়খুকি ফ্রক পরে, শাড়ির অভাবেই পরে। কে একজন তাকে ডেঁপো মেয়ে বলেছিলেন। ভূতোগিন্নী প্রতিবাদ করে বললেন, ডেঁপো কেন হবে। ও বয়সে ময়নামতী আমার কোলে এসেছিল।

মা বললেন, ওঁদের কাণ্ড দেখে অন্য ভাড়াটেরাও কম আশ্চর্য হন নি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভূতোবাবু তাঁদের বাঁধা-ছাঁদার পর্ব দেখছিলেন। অনাথবাবু তো হেসেই আকুল, বললেন, ভারি আশ্চর্য লাগছে, তাই না! বলা নেই কওয়া নেই, নির্ঝঞ্ঝাটে আপদ বিদেয়! মুখ ফুটে যাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁদের বললেন, আগুন লেগেছে, ধোঁয়া উঠছে। খবরের কাগজে খবর দেখেন নি আপনারা।

আমি জানতুম, তাঁর মত মনোযোগ দিয়ে খবরের কাগজ খুব কম লোকেই পড়েন। কোথায় যেন দুর্ঘটনার ইঙ্গিত পেয়েছেন। এমনি আশঙ্কা দেখেছিলুম জুরিখে, আমার জর্মন সহকারীর চোখে।

বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। দিনকয়েক পরে একদিন সকালেই খবরের কাগজে বড় বড় হরপে খবর পড়লুম। যুদ্ধের খবর। জর্মনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করেছে। তারপরেই খবর এল ইংলণ্ড আর ফ্রান্স এগিয়েছে পোল্যাণ্ডকে সাহায্য করতে। ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাস।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই অনাথবাবু এসে উপস্থিত হলেন। সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন আমাকে দেখে, বললেন, পালিয়ে আসতে পেরেছেন দেখছি।

আমি আপত্তি জানিয়ে বললুম, পালিয়ে আসি নি। এসেছি দরকারে।

সমর্থন করে ভদ্রলোক বললেন, ওই একই কথা।

তারপরেই বললেন, খুব বেঁচে গেছেন। গুটিগুটি ইটালী উঠছে ওপর দিকে। সুইজারল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে না যাক, দু পাশ দিয়ে যাবে জর্মনীর সাহায্যে, তারপর—

ভদ্রলোক থামতেই আমি প্রশ্ন করলুম, তারপর কী?

একটুখানি ইতস্তত: করে ভদ্রলোক বললেন, জাপানের চোখ আমাদের ওপর।

বলেন কি! আমি আশ্চর্য হলুম।

উত্তরে ভদ্রলোক শুধু হাসলেন।

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে আমি বললুম, এ বাড়ি আপনি ছাড়লেন কেন?

ভদ্রলোক এবারে গম্ভীর হলেন, বললেন, গত মহাযুদ্ধের কথা ভুলে যান। এবারে আমাদেরও জড়াতে হবে। দেশে যে দুদিন আসছে, তাতে দু মুঠো অন্নের সংস্থান সকলের হবে না। আমরা বস্তির ভেতর ঘর নিয়েছি। আর কিছুদিন পরে স্থানাভাব হবে সেখানে।

অনাথবাবুর কথা শুনে আমি সেদিন হেসেছিলুম। আমি কেন, সবাই হেসেছিলেন। কিন্তু বছর তিনেক পরে তাঁর দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে হল। চল্লিশ টাকা দিয়েও বাজারে তখন চাল পাওয়া যাচ্ছে না। আটা মিলছে তো চিনি নেই, চিনি মিলছে তো কাপড় নেই। রোজগারের সমস্ত টাকা ঢেলে দিয়েও দেশে কেউ প্রয়োজন মেটাতে পারছে না।

অনেকদিন অনাথবাবুর খবর রাখি নি। তিনি নিজেও আর এদিকে আসেন না। আমাদের হাসি দেখে বোধ হয় আঘাত পেয়েছিলেন। মা বললেন, পথে কোনদিন দেখা হয় না?

আমারও আশ্চর্য লাগে: আমি উত্তর দিলুম, কোনদিন ভদ্রলোককে দেখতে পাই নি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, সাবধানী মানুষ, নিশ্চয়ই ভাল আছেন।

মনে মনে আমিও এ কথা সমর্থন করি।

দিনকয়েক পরে আমার ভুল ভাঙল। আকস্মিকভাবে তাঁর দেখা পেলুম সার্কুলার রোডের মোড়ে। ভদ্রলোককে চিনতে একটু কষ্টই হয়। চেহারার পরিবর্তনের চেয়ে অভ্যাসের পরিবর্তনটাই যেন বেশী মনে হচ্ছিল। চেহারার সে সৌখীনতা আর নেই। চুলে নেই পালিশ। অপরিচ্ছন্ন বেশ-বাস মলিন রুক্ষ। কপালের ভাঁজে আর চোখের কালিতে একটা বীতশ্রদ্ধ জীবনের ইঙ্গিত। ভদ্রলোককে দেখে আমি যত বিস্মিত হলুম, তার চেয়ে বেশী বিস্মিত হলেন ভদ্রলোক নিজে। বললেন, কবে এলেন?

আমি তো এখানেই আছি। আমি উত্তর দিলুম।

সেকি! ভদ্রলোক বোধ হয় বিশ্বাস করতে পারছিলেন না আমার কথা, বললেন, তবে যে শুনলুম, আপনি লক্ষ্ণৌয়ে আপনার পুরনো চাকরি পেয়েছেন!

বললুম, চেষ্টা করে পাই নি। নতুন লোক তারা ছাড়াবে না। তবে কিছুদিন পরে হয়তো বহাল হয়ে যাব।

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে যে খানিকটা আশ্বাস ফুটে উঠল, আমার দৃষ্টি তা এড়াল না। বললেন, আপনার কাছে আমার জরুরী দরকার, আজই আসব।

অনাথবাবু সন্ধ্যেবেলাতেই এলেন। গতানুগতিক ভাবেই যুদ্ধ-পরিস্থিতি নিয়েই গল্প শুরু হল। তারপর নিজের কথা। মাইনে হয়েছে আটষট্টি টাকা, তার উপর মাগগি-ভাতা আট টাকা। ছিয়াত্তর টাকায় একটা সংসার চলে? আপনিই বলুন।

ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে চাইলেন।

সত্যিই তো। আমি সহানুভূতি জানালুম।

ভদ্রলোক খুশী হলেন। বললেন, সবাই যদি বুঝতেন এ কথা তো আমাদের দুঃখ ছিল না।

ওঠবার সময় পাঁচটা টাকা ধার চাইলেন। বললেন, লজ্জায় কারও কাছে হাত পাততে পারি নে। আপনাকেই এ কথা বলতে পারলুম।

ভদ্রলোকের পরিবারের আয়তন আমার মনে আছে। মার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা এনে তাঁর হাতে দিলুম।

দিন দশ-বারো পরেই ভদ্রলোক আবার এলেন। বললেন, নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আবার এলুম। মেজো মেয়েটা অসুখে না পড়লে এ মাসটা কোন রকমে চালিয়ে নিতুম।

নিতান্ত নিরুপায় না হলে যে ভদ্রলোক ভদ্রলোকের কাছে হাত পাতে না, এ কথা আমিও বিশ্বাস করি। বললুম, কত হলে চলবে?

ভদ্রলোক ভেবেই এসেছিলেন, বললেন, গোটা দুই দিন।

মাত্র দু টাকা! আমি আশ্চর্য হলুম।

ভদ্রলোক হাতের আঙুলে কী হিসেব করলেন। বোধ হয় মাসের বাকি দিনের হিসেব। তারপর বললেন, আচ্ছা, পুরো তিন টাকাই দিন।

পকেটে টাকা নিয়েই আমি বেরিয়ে ছিলুম। তিনটি টাকা তাঁর হাতে দিলুম। অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

মাসের মাইনে পেয়েই তিনি আসবেন বলেছিলেন, ন্তু, এলেন না। আরও কিছুদিন কাটল। একদিন মা লেন, অনেকদিন অনাথবাবু এদিকে আসেন নি, তাই না!

বললুম, তুমি কি টাকার কথা ভাবছ?

মা লজ্জা পেলেন, বললেন, ছি ছি, সেকথা কেন বব! কটাই বা টাকা! আর ওই টাকা ফেরত দিতে র যত কষ্ট হবে, পেলে আমাদের তত সুখ হবে কি! মি দেব বলেই দিয়েছি, ধার বলে নয়।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মা বললেন, ভদ্রলোক র মেজো মেয়ের অসুখ বলেছিলেন, তাই না!

আমি সমর্থন করলুম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মা বললেন, ওই মেয়েটি দেখতেও লে, ব্যবহারটিও মিষ্টি।

অনাথবাবু এলেন আরও দিন পনের পরে। বললেন, পনার টাকাটা এ মাসে ফেরত দিতে পারলুম না।

তাতে হয়েছে কী! আমি জবাব দিলুম।

ভদ্রলোক বললেন, কিছু না হলেও আমার তো কথা ক্ষা করা উচিত ছিল। মেয়েটা না গেলে দিয়েও দিতুম।

আমি চমকে উঠলুম: কোন্ মেয়ে? মেজো মেয়ে?

হ্যাঁ।—শান্তভাবেই ভদ্রলোক উত্তর দিলেন। ওকে চাতে হলে বাকি দুটোও যেত।

বাকি দুটো! আমার বিস্ময়ের যেন সীমা নেই। ললুম, আর ছেলেমেয়েরা কোথায়?

কঠিনভাবে ভদ্রলোক বললেন, আগুনে পুড়েছে। পনারা শুধু ধোঁয়াই দেখছেন, গায়ে উত্তাপ এখনও গে নি।

আপনি সব খুলে বলুন অনাথবাবু। আমি তাঁকে নুরোধ জানালুম।

ভদ্রলোক একটু থেমে বললেন, মারা গেছে দুটি। ার দুটি হারিয়ে গেছে। শুনতে পাই বড়খোকা বেলুড়ে ক্সা চালাচ্ছে। আর—

দাঁতে দাঁত চাপলেন অনাথবাবু।

আর? আমি জানতে চাইলুম।

ভদ্রলোক বললেন, বড়খুকি বেরিয়ে গেছে একটা পদার্থ মাতালের সঙ্গে। পেটে ভাত না পড়ুক, মদের টেফোঁটা পড়বে।

আমি কথা কইতে পারলুম না। মনে হল, ভদ্রলোক চ্ছে করে আমার সংস্কারে আঘাত দিচ্ছেন। কিন্তু তাই কি তাই, না, আর্থিক অসচ্ছলতায় তাঁর সভ্যতার খোশ খুলে পড়েছে। উস্কোখুস্কো চুল আর খোঁচা খোঁচা াড়িতে অনাথবাবুকে আজ বন্য মনে হল।

এই মেজো মেয়েকেই মা ভালবাসতেন। বললুম, কছুতেই মেয়েটাকে বাঁচাতে পারলেন না?

ভদ্রলোক বললেন, টাকা থাকলে পারতুম। একটার ওষুধ-পথ্যের জন্যে আর দুটোকে অনাহারে রাখতে পারি নে।

মনে হল বলি, আমার কাছে কেন এলেন না! কিন্তু সে কথা বলতে পারলুম না।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ থেমে ছিলেন, তারপর বললেন, বেশী নয়, আজ পাঁচ সিকে হলেই চলবে। ডাক্তারের ফী দু টাকা দিয়েছি, ওষুধটা নিতে পারি নি।

উপর থেকে আমি দশটা টাকা এনে দিলুম।

ভদ্রলোক অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, এ টাকাও আমি আপনার শোধ দেব। সংসারের বোঝা তো কমে এসেছে, বেশী দেরি হবে না।

আমি তাঁর দু চোখে যেন আগুনের জ্বালা দেখলুম। ও তো দৃষ্টির উজ্জ্বলতা নয়, বাইরের আগুনে বোধ হয় তাঁর ভেতরেও আগুন ধরেছে। দরজা দিয়ে বেরবার সময় ভদ্রলোক একবার থেমে ছিলেন। আমি একটা দীর্ঘ-নিশ্বাসের শব্দ যেন স্পষ্ট শুনতে পেলুম।

সেদিন অফিস থেকে ফিরে একটা নতুন মুখ দেখলুম। লোকটা নাকি অনেকক্ষণ ধরে বাড়ির সামনে পায়চারি করছিল। একটা কালো নোংরা হাফ-প্যাণ্টের উপর খাকি বুশ শার্ট পরেছে একটা। তার কাঁধের কাছটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে। সারা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ। নাকের ঠিক নীচেটায় মনে হচ্ছে, একটা বড় মাছি বসে আছে। আমাকে নমস্কার করবার সময় একটু হাসবার চেষ্টা করল। গর্তের ভিতরের চোখ দুটো যেন বুজে গেল। বলল, মায়ের সঙ্গে একবার দেখা করতে এলুম।

বিনয়ের অভাব তার ছিল না। কিন্তু মুখের উপর এমন একটা ভঙ্গী ছিল, যা বিরক্তিকর। নাকের নীচের ওই মাছিটি বোধ হয় একটা উদ্ধত জীবনের সাক্ষ্য দিচ্ছে, আর একটা উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সংকেত তার চোখের চারদিকের কালিতে। কতই বা তার বয়স। বোধ হয় ত্রিশও হয় নি। আমি তার উত্তর দিতে পারলুম না। শুধু থমকে দাঁড়িয়ে তার বক্তব্য শেষ করবার সুযোগ দিলুম।

লোকটা বোকা নয়। ভূমিকা না বাড়িয়ে সোজাসুজি কাজের কথা কইল। বলল, আপনি দান করবার আর লোক পেলেন না সার্, ওই অনাথ মাতালটাকে—

মাথার ভিতর একরাশ খুন ছিটকে-ছড়িয়ে পড়ল। লোকটা আমার কৈফিয়ত নিতে এসেছে জানলে দাঁড়াতুম না।

আমার চোখের দিকে চেয়েই লোকটা পিছিয়ে যাচ্ছিল। বললুম, সে কৈফিয়ত তো তোমাকে দেবার নয়। বলেই বাড়ির ভিতর ঢুকে গেলুম। পিছন থেকে লোকটা বলল, আপনি চটে গেলেন সার্, কিন্তু পরে ভেবে দেখবেন আমি অন্যায় বলেছি কি না! সেই সঙ্গে যোগ করল:

আপনার টাকায় কেউ অধঃপাতে যাচ্ছে, সে তো আপনাকেই জানাব।

দরজাটা তার মুখের উপরেই বন্ধ করে দিলুম।

আশ্চর্য! দিন দুই পরেই অনাথবাবু আবার এলেন। কপালের রেখাগুলো যেন আরও স্পষ্ট হয়েছে। আর ঘন হয়েছে চোখের নীচের কালি। আরও রুক্ষ, আরও অপরিচ্ছন্ন! এই মুহূর্তে আমার আর কোন সন্দেহ রইল না। ভদ্রলোক কিছু বলবার আগে আমিই জিজ্ঞাসা করলুম, এবারে কার অসুখ অনাথবাবু, স্ত্রীর নাকি?

বিদ্রূপের সুর আমি গোপন করবার চেষ্টা করি নি। ভদ্রলোক স্তম্ভিত হয়ে শুনলেন আমার কথা। কোন উত্তর পাবার আগে আমিই আবার বললুম, মদের খরচটা আমার উপরেই চিরকাল চালিয়ে যাবেন?

স্পষ্ট দেখলুম, হিংস্র পশুর মত তাঁর চোখ জোড়া জ্বলে উঠল। তারপরেই নিবে গেল আচমকা। কোন উত্তর দিলেন না। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেলেন।

অনেকদিন কাটল। অনাথবাবু আর এলেন না। ভাবলুম, স্বরূপটা ধরা পড়েছে বলেই আর তিনি আসছেন না। তা না হলে ওই ছিনে-জোঁক ছাড়ানো কঠিন হত।

সেদিনের সেই বেহায়া লোকটা একদিন এসেছিল। আড়ালে থেকে আমার বুদ্ধির তারিফ করে গেছে।

কিন্তু মা আমার কাজের সমর্থন করলেন না। বললেন, ওদের অভাবের কথা তো আমার অজানা নেই। মদ খেয়ে তো পেট ভরে না।

মনে হল, হয়তো ভুলই করেছি। একটা অজানা অচেনা বাজে লোকের কথায় অনেকদিনের পরিচিত একটা মানুষকে অবিশ্বাস না করলেই যেন ভাল হত। কিন্তু আপসোস করে আর ফল কি!

অনাথবাবুর সাক্ষাৎ পেলুম বছর খানেক পরে লক্ষ্ণৌ শহরে। আমার পুরনো কলেজে চাকরি পেয়ে কলকাতা ছেড়ে এসেছিলুম। খুঁজে খুঁজে ভদ্রলোক আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন।

ভোরে খবর পেয়েছিলুম যে এক পাগল আমার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে। দেখা না করে কিছুতেই যাবে না। কিন্তু আমার তাঁকে চিনতে কষ্ট হয় নি। দূর থেকেই আমি তাঁকে চিনে ফেললুম। ভদ্রলোক আমার বসবার ঘরে ব্যস্তভাবে পায়চারি করছিলেন। হাতে একটা নোটবুক আর পেনসিল দেখলুম। হঠাৎ একসময় থমকে দাঁড়িয়ে কড়ি-কাঠের দিকে চাইলেন। সমস্ত মুখখানা তাঁর পরম তৃপ্তিতে ভরে গেল।

আমি জানতুম, আমার পায়ের শব্দে তাঁর ধ্যানভঙ্গ হবে না। তাই কেশে আমার উপস্থিতিটা তাঁকে জানিয়ে দিলুম। ভদ্রলোক চমকে আমার দিকে চাইলেন।

অনাথবাবুকে আজ আমার খারাপ লাগল না। সেই বেয়াড়া লোকটার কথাও সহসা মনে পড়ল না। তাই সাদরে অভ্যর্থনা জানাতে আমার দ্বিধা হল না এতটুকু। বললুম, এই যে, অনাথবাবু এসেছেন! বসুন।

ভদ্রলোক এ কথার উত্তর দিলেন না, কিন্তু একটা চেয়ারে বসে পড়ে তাঁর নোটবুক খুললেন। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জিজ্ঞেস করলেন, কলকাতায় কত টাকা আপনার নিয়েছি, মনে আছে কি?

আমি আশ্চর্য হলুম তার কথা শুনে। কেন উত্তর দিতে পারলুম না।

একটা পাতায় পৌঁছে বললেন, পেয়েছি। সতেরই মে পাঁচ টাকা, আর তিন টাকা আটাশে। তারপর একেবারে তেইশে জুন, পুরোপুরি দশ টাকা। আর আছে কি? উঁহু, নিশ্চয়ই নেই।

তারপরেই লাইন টেনে যোগটা করে ফেললেন। বললেন: মোট হল আঠারো।

অপ্রস্তুতভাবে বললুম, সামান্য টাকারও এত হিসেব রেখেছেন!

পকেট থেকে গুনে দুখানি দশটাকার নোট দিলেন আমার হাতে। বললেন, এই নিন।

আমি আপত্তি করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তাঁর চোখের দিকে চেয়ে আর সাহস পেলুম না। টাকাটা হাতে নিয়ে বললুম, বেশী দিচ্ছেন কেন!

নোটবুক বন্ধ করতে করতে উত্তর দিলেন, সুদ।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ঋণমুক্ত হওয়া গেল।

বললুম, আপনার বাড়ির খবর?

ভদ্রলোক উত্তর না দিয়ে হেসে উঠলেন বিকট ভাবে।

চমকে উঠে প্রশ্ন করলুম, কী হল?

হাসতে হাসতেই ভদ্রলোক বললেন, বাড়ির খবর!

বাইরের দরজাটা খোলা ছিল। ভদ্রলোক সেই দিকেই এগিয়ে গেলেন। পেছন থেকে আমি বললুম, কোথায় চললেন?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় বললেন, স্বর্গদ্বারে।

দুখানা দশ টাকার নোট হাতে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

হাতের তালু আমার জ্বলছিল। মনে হল, এক মুঠো আগুন আমার হাতে দিয়ে গেলেন। একমুঠো বিদ্রূপ। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে বিদ্রূপ করে গেলেন দূরদর্শী অনাথনাথ ঘোষ।

বাঘিনীর আবেদন

শ্রীকৃষ্ণধন দে

ঘন অরণ্যে বেতসগুল্মপাশে
পাহাড়ী ঝরনা নেচে নেচে নেমে আসে,
কুরচি ফুলের উগ্র গন্ধে মেতে
হরিণীরা আসে নববল্লরী খেতে,
গোধূলির আলো কাঁপে চিত্রিত কায়ে,
ঝরনার কাছে আসে তারা ভীরু পায়ে।
তুমি খাবা পেতে শিকারের সন্ধানে
ক্ষুধিত চক্ষে হের যে তাদের পানে ;
তোমার সে রূপ রুদ্রমধুরে-মেশা
আমার বাঘিনী-নয়নে আনে যে নেশা,
তৃষিত চক্ষে ওগো শার্দূলবর,
হেরি তব রূপ লাঙ্গুল সুন্দর।

কালো ডোরা-কাটা সোনালী তোমার দেহ,
রূপের পরখে হারাতে পারে নি কেহ,
এ বনের যত বরাহ সিংহ করী
ভল্লুক বৃক, কার এত রূপ মরি !
আমি যে বাঘিনী, গুহার আড়ালে রহি
তব লাগি হায় প্রেমজ্বালা বুকে বহি।
আমারো এ দেহে তোমার ও-দেহ সম
জ্বেলেছে আগুন যৌবন অনুপম ।
আমার এ দেহ তোমারে জড়াতে চায়
থাবা ও লাঙ্গুলে যৌবন-তৃষ্ণায়।
দেখ, মাঝরাতে রূপো ঢালে নির্ঝর,
এস অভিসারে ওগো শার্দূলবর।

বন কেঁপে ওঠে শুনি তব হুঙ্কার,
আমার কর্ণে বরষে সে সুধাধার।
তোমার দেহের গন্ধ বাতাসে ভাসে,
পশু-পাখি যত পথ ছেড়ে দেয় ত্রাসে,
আমি বারে বারে সে গন্ধ লই টানি',
নিঃশ্বাসে মোর কত সুখ অনুমানি'।

যেখানে তোমার থাবার চিহ্ন পড়ে,
লুটাই সেখানে কত না কামনাভরে।
হে প্রিয়, তোমার সৃক্কণী-লালা ঝরি
আঁকে মোর তরে প্রণয়লিপি কি মরি!
তুমি বলীরাজ, হে বৃহল্লাঙ্গুল,
বাঘিনীর আশা করো নাকো নির্মূল।

তব হুম-হাম হালুম-হালুম ধ্বনি
অন্তরে মোর ওঠে নিতি রণরণি।
জান না কি তুমি জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে
এ বাঘিনী হায় তোমারই স্বপনে মাতে ?
নিদারুণ শীতে দুরাশায় বুক বাঁধি
তোমারই দেহের উত্তাপ লাগি কাঁদি ;
পাহাড়ী বর্ষা নামে অরণ্য ভরি,
নিরালা গুহায় যাপি একা বিভাবরী ;
নব বসন্তে বনে ফোটে কত ফুল,
এ বাঘিনী-প্রাণ করে তোলে তৃষাকুল।
সাধ যায় শুধু থাবায় থাবাটি রাখি
বুক দিয়ে তব বুকখানি লই ঢাকি।

ওগো বাঞ্ছিত, ওগো চিক্কণ-কায়,
বাঘিনী-চিত্ত ভুলালে কি মহিমায়!
রক্তজিহ্ব শাণিতদন্তধারী,
বিদ্যুৎ-গতি বারণ-দর্পহারী,
অক্ষিযুগল অগ্নিগোলকপ্রায়,
পিঙ্গলমুখে গুম্ফ কি শোভা পায়!
কালো ডোরা দেয় কত শোভা দেহে আনি,
নিভৃতে বিধাতা গড়েছে ও তনুখানি!
নখরনিকর যেন খর তরবারি,
অরাতিশোণিত-রঞ্জন-শোভাধারী,
লীলায়িত দেহ সঙ্কোচ-প্রসারণে
যৌবনতৃষা জাগায় বাঘিনী-মনে।

জেনেছ কি তুমি ওগো শার্দুলবর,
তব লাগি কাঁদে এ বাঘিনী-অন্তর ?
বিরহিণী সম থাকি পড়ে এক ধারে,
কোন মাংসেই রুচি নেই একেবারে।
গিরি-নির্ঝরে কণ্টকীলতাবনে
যাই নাকো আর পীততনুপ্রসাধনে,
মৃৎ-গৈরিকে রাঙায়ে তুলি না বুক,
গিরিনদীজলে হেরি নাকো আর মুখ।
নিজ লাঙ্গুল বুলাই পৃষ্ঠ 'পরে,
ভাবি, তুমি বুঝি ছুঁয়ে গেলে প্রেমভরে !
আপন থাবাটি বক্ষে চাপিয়া রই,
শার্দুলবর, তুমি কই ? তুমি কই ?

কী রূপ বিধাতা করেছে তোমারে দান
তিলে তিলে হায়, দহিতে বাঘিনী-প্রাণ !
মৃদু হুম-হামে গাই যে বিরহ-গীতি,
লুটাই ভূতলে, যাহা বিরহিণী রীতি।
নিরালায় রহি শুব্ধ দুপুরবেলা
যেথা মৃগ-মৃগী করে সুখে প্রেমখেলা,
তৃষিত নেত্রে হেরি সে মিলন-ছবি
কাঁপে যৌবন অতনুর জ্বালা লভি।
ফেলেছে বিধাতা এ কি নিদারুণ ফাঁদে,
শিকার ছাড়িয়া বাঘিনী বিরলে কাঁদে !
এস প্রিয়তম, দূর কর প্রেমজ্বর,
জুড়াও এ জ্বালা, ওগো শার্দুলবর !

ধ্রুবতারার ক্রন্দন

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

(১)

দূরান্তে চাহিয়া দেখ, শ্যামশষ্পে ভ্রূকুটি ভয়াল,
সমুদ্রের নোনা জলে লবণাক্ত দেহের রুধির,
আকাশ উচ্ছ্বাসহীন,—নত দৃষ্টি অবনত শির
পৃথিবীর পাঁজরায় কাঁপে ছায়া মৃতের কঙ্কাল !

ধূমল দিগন্তে হারা ধরার হরিৎ স্বপ্নজাল,
ক্ষুৎপিপাসার দাহ তীব্রতর, মাগি অন্ননীর।
সুজলা সুফলা গঙ্গা পদ্মা আর যমুনার তীর,
বিদ্রূপের অট্টহাসে ফেটে পড়ে আকাশ মাতাল !

বন্ধু ওগো, বলিবে কি কত দূরে এ পথের শেষ,
হবে অবসান এই মরীচি-মায়ার দুঃস্বপন ?
কোথা তীর বন্ধু, আঁধি-নৃত্যে লুপ্ত দিক্‌চিহ্নলেশ,
বায়ু মাঝে গুমরিয়া ফিরে ধ্রুবতারার ক্রন্দন !
বিভ্রান্তি-তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ অন্ধকারে চাহি নির্নিমেষ
ঝিমায় দু চোখ বোজা জরাগ্রস্ত যযাতি-যৌবন।

(২)

আরও দূরে চাহ বন্ধু, তিমিরাবগুণ্ঠিত রাত
অবসন্ন দিবসের ছায়াতলে আসন্ন মৃত্যুর !
ন্যুইয়র্ক মস্কো প্যারী লণ্ডনেরও রক্ত ভয়াতুর—
সুদূর ভবিষ্য মাঝে সুপ্তিলীন প্রসন্ন-প্রভাত !

অন্ন নাই—বস্ত্র নাই—ভিক্ষাপাত্র কলঙ্কিত হাত,
বলিতে পার কি বন্ধু, তার শেষ আরও কত দূর !
এমন বাঁচার চেয়ে মৃত্যু সে যে মধুর—মধুর !
মাথা কুটে মরে আলো অন্ধকারে হানি করাঘাত।

বলিতে পার কি বন্ধু, এমন কাটিবে কতদিন,
হিরণ্যকশিপু-কারা হতে মুক্তি পাবে না প্রহ্লাদ ?
রক্তমূল্য বিনিময়ে হবে শোধা যৌবনের ঋণ ?
রক্তমূল্যে হবে জয় তিমিররাত্রির অবসাদ ?
কতদূরে সুপ্রভাত ? দীর্ঘরাত্রি আশা-আলোহীন।
কান পেতে শোন বন্ধু, ব্যর্থ যৌবনের আর্তনাদ !

মানে

গোপাল ভৌমিক

কখনও সমুদ্র আমি
উদ্দাম ঝড়ে টলমল
কেঁপে উঠি ক্ষণে ক্ষণে ;
ফেণশীর্ষ তরঙ্গ সকল
দেখে ভয়ে দিশাহারা হয়ে
ভাবি কবে হবে অবসান :
কখন আবার হব আকাশের পাখি
কিংবা কোন নক্ষত্রের গান।

সে মন্ত্র তোমার কাছে
জানি বলে চুপ করে থাকি :
ভয়াবহ যন্ত্রণায়
চোখ বুজে কেন যে একাকী
পড়ে আছি, না জেনেই
কখন সহসা
তুমি এসে বল রূঢ় কথা ;
মন্ত্রের বদলে মেলে কশা।

তরঙ্গিত সমুদ্রের হ্রেষা
আবার দু কানে বাজে,
বলে সে তুফানে :
'সময় কাটাও কেন অপ্রেমে অকাজে
বন্দরের শান্তি খুঁজে খুঁজে ?
তার চেয়ে সাগরের গানে
নিজেকে উদ্বুদ্ধ কর,
খুঁজে পাবে বন্দরেরও মানে।'

উত্তরের প্রেমগান

বাণী রায়

(সরোজিনী নাইডুর 'A Love Song From The North'-এর অনুবাদ)

বোল না আমাকে তোমার প্রেমের কথা
আর তো বোল না, পাপিয়া ;
আমার এ মনে এনে দেবে না কি, পাপিয়া,
সুখের স্বপ্ন, যারা দূরে গেল চলে ;
ক্ষিপ্র ধাবনে প্রিয়ের পা-দুটি
আসত যখন পাশে
সন্ধ্যাতারার, শুকতারাটির তলে ?

নদীর জলে যে হালকা পাখায়
দেখি কত মেঘ ভাসে,
বৃষ্টিধারার গয়না-জড়ানো আমের পাতার রাশে ;
প্রান্তরে ফোটে কচি কিশলয় ফুলে ;
তবুও তারা যে রূপহীন আজ, পাপিয়া,
রূপ আর ফুল, বৃষ্টির ধারা, পাপিয়া,
আনে নাকো যারা আমার প্রিয়কে ভুলে।

বোল না আমাকে তোমার প্রেমের কথা,
আর তো বোল না, পাপিয়া ;
আমার এ মনে জ্বালাবে কি বল, পাপিয়া,
বিগতপুলক-বিয়োগ-হুতাশ্বাসে ?
শুনেছি দীপ্ত ময়ূর প্রভাতে
আলো ঝলমল বনে
সঙ্গীকে ডাকে পাশে।
শুনেছি কৃষ্ণ কোয়েলের মৃদু কম্পিত প্রেমালাপ,
বনে বনে শুনি অস্ফুট কি প্রলাপ
প্রেমিক ঘুঘু ও বুলবুল ডাকে ;
তবুও তাদের সঙ্গীত বৃথা, পাপিয়া,
হাসি আর প্রেম তাদের ব্যর্থ, পাপিয়া,
আমার এ মনে—প্রেম ভুলে গেল যাকে।

মা

উমা দেবী

ওই শ্যামলা মেয়েটার চওড়া কপালটার ওপরে
মস্ত একটা সিঁদুরের ফোঁটা।
ওর পাতলা হয়ে-আসা চুলের মাঝখান দিয়ে
চেরা সিঁথিতে সিঁদুর ঢালা।
—ও এই প্রথম মা হতে চলেছে।
তাই ওর ক্ষয়ে-আসা দুই গালে
কেমন যেন বিষন্ন পাণ্ডুরতা,
ওর ঠোঁটের ঈষৎ স্ফীতির অন্তরালে
কেমন যেন রূপ-ঝরে-যাওয়ার ক্লান্তি—
ওর ঝিমিয়ে-আসা দু চোখের মাঝে
শীত-সন্ধ্যার ধূসর কুয়াশা—
তবু সবকিছু উত্তীর্ণ হয়ে
ওর সর্বাঙ্গের আড়ষ্টতার যবনিকার অন্তরালে
কম্পিত হয়ে উঠেছে পাদপ্রদীপের অগাধ প্রত্যাশা।

ও চোখ তুলে চাইল আমার দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন অবুঝ দৃষ্টিতে,
আমিও তার দিকে চাইলাম,
দেখলাম তাকে নূতন রূপে—
ক্লান্ত ব্যথিত বিপন্ন—তবু আগ্রহে উৎসুক।
আমি দেখলাম ওকে স্তূপীকৃত খাতার সামনে—
উলটে পালটে একটির পর একটিতে নম্বর মিলিয়ে যাচ্ছে—
তার রোগা রোগা কালো হাতে
লাল শাঁখা আর সোনালী চুড়ি,
তার ঢিলে করে পরা শাড়ির ভাঁজে ভাঁজে
সুখ ও শ্রান্তির মোলায়েম বিন্যাস—
নিরুৎসুক আঙুলগুলিতে কী এক করুণ কম্পন—
এই প্রথম ও মা হতে চলেছে।

এই প্রথম মৃত্যু এসে নিঃশ্বাস ফেলে গেল ওর দেহে—
তাই অঙ্গে অঙ্গে বিষিয়ে ওঠার যন্ত্রণায় ও কুঁকড়ে গেল—
একটি ছোট হাই তুলে চোখ বুজে ও চেয়ারেই এলিয়ে পড়ল,
এক অসহ্য নিদারুণ উদ্বমন-ইচ্ছাকে
দমন করল আশ্চর্য ইচ্ছাশক্তির বলে।
ওর মৃত্যু হল নিজেরই কাছে।
তাই মৃত্যুর নীল ছায়া নেমে এল চোখের কোণে,
হাতের স্ফীত শিরায়
রগ ঘেঁষে উঠে-যাওয়া চুলের বিশীর্ণতায়
আর শিথিল দেহগ্রন্থির আড়ষ্ট কুশ্রীতায়।
ও হারিয়ে ফেলল নিজেকে মৃত্যুর কবলে
প্রকৃতির চতুর ষড়যন্ত্রে—
যেমন করে ফুল তার সুরভিসৌন্দর্যকে হারিয়ে ফেলে
যেমন করে ফল তার সরস মাংসলতার সুস্বাদু শাঁসকে
হারিয়ে ফে[illegible]
এক কঠিন আস্তরণের কুশ্রী ও মজবুত আশ্বাসে।

তবু একদিন ওই কুশ্রী মৃত্যুর আবরণ ছিন্ন করে ফেলে
জেগে উঠবে নূতন অঙ্কুর—
ওই শ্যামলা মেয়েটার মৃত্যুকে ঠেলে ফেলে
আসবে এক নতুন জীবন—
নতুন প্রভাতের মতই সুশ্রী, সুগৌর আর সুন্দর।
সেই নব প্রভাতের সুধাস্রোত ওর দেহে এখনই নেমেছে,
ও স্নান করতে ডুব দিয়েছে সেই অগাধে—
কে জানে ও ভেসে উঠবে কিনা
শুদ্ধ ও সহাস্য সত্তায়—
কিংবা ডুবে যাবে মৃত্যুর অন্ধকার পাঁকের তলায়—
কারণ এই প্রথম ও মা হতে চলেছে।

আমি দেখলাম জীবন ও মৃত্যুর
এক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি ওর দেহে,
ওই শ্যামলা মেয়েটির সিঁথের সিঁদুরে
দেখলাম একটি একটি করে
কয়েকটি রক্তিম বাসনার রক্তাক্ত পরিণাম—
আমি দেখলাম ওর মধ্যে
এক ধূসর-গোধূলি আলোয় কাঁপা সন্ধ্যাতারার মত
একটি সব হারিয়ে ফেলার রাত্রি নামার অপূর্ব ইঙ্গিত,
সন্ধ্যার পদ্মের মত সমস্ত চঞ্চলতা শুদ্ধ হয়ে গিয়ে
একটি মুদিত কলিকার রূপে ওর অন্তর্লীন বাসনার উত্তাপ[illegible]
নিজেকে ফাটিয়ে দিয়ে পাহাড় যেমন নির্ঝরকে নামিয়ে [illegible]
ধরণীর উষরতাকে সবুজ করে দিতে—
ওই শ্যামলা মেয়েটাও তেমনই
নিজেকে ক্ষয় করে জয়ী হবে, জয়ী করবে
ঈশ্বরের নিগূঢ় ইচ্ছাকে।

ওই শ্যামলা মেয়েটার পাণ্ডুর গালের উপরে যেখানে
চোখের ক্লান্ত দৃষ্টিতে ঘুম মূর্ছিত হয়ে আছে—
আমি সেখানে দেখলাম এক আশ্চর্য সম্ভাবনাকে,
এক কুসুমিত সম্ভাবনা—
মন গেয়ে উঠল—তুমি সুন্দর—কত সুন্দর!

কুহকিনী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

নীরন্ধ্র তামসী নিশা, বাতায়নে কুহক ছড়ানো—
শয্যা'পরে আমি একা, তন্দ্রাজাল নয়নে জড়ানো।
কে আসে সুমুখে মোর? কী এনেছে ঢাকিয়া আঁচলে,
অনুরাগে আঁখি দুটি সকরুণ করিয়া কাজলে?
আকুল আশায় সে কি রচিয়াছে নব-নিমন্ত্রণ;
বিষসিন্ধু বিমথিয়া করিয়াছে অমৃত-মন্থন,
এ জীবন-উৎস মুখে ঢালিবারে প্রাণের আসব
চূর্ণ করি পৃথিবীর আর্তি-ভরা মত্ত কলরব?

এস তুমি হে রঙ্গিনী, পূর্ণ করি কল্পনা-ভৃঙ্গার—
তৃষার্ত অধরে মোর সুধাপাত্র ধর অনিবার।
মৃত্যুনীল আঁধারের অশ্রুবারি নিমেষে মুছাও—
মুগ্ধ এই মরমের অবসাদ পলকে ঘুচাও!

অকস্মাৎ ভেসে আসে দূর হতে সঙ্গীতের প্রায়
সে কোন্ বীণার ধ্বনি হিম-শান্ত হিন্দোলিত বায়!
মর্মে তার গাঁথা আছে বেদনার প্রমূর্ত কাহিনী,
সত্য এই পৃথিবীর মিথ্যা মায়া—প্রক্রতবাহিনী।

রুদ্ধ কর বাতায়ন, কুহকিনী, স্তব্ধ কর সুর,
চাহি না শুনিতে ওই বিশ্রামের বিভ্রান্তি মধুর
ক্লান্তিভরা গানখানি; তার চেয়ে তুলিয়া ঝঙ্কার
সমাপ্তি ঘোষণা কর আলুণ্ঠিতা মত্ত তমসার।

ওগো সাকী, যৌবনের দ্রাক্ষাকুঞ্জে বাসর-শয্যায়
মধুব্রতা তুমি মোরে তিলে তিলে আপন ইচ্ছায়
করেছিলে দান, সেই বিন্দু বিন্দু অমৃত ক্ষরণ
আকণ্ঠ করিয়া পান সুধাময় মুগ্ধ সমীরণ
আনন্দের জয়গানে পূর্ণ করে অপূর্ণ জগৎ—
যৌবন ভঙ্গুর নহে, জানি তার পূর্ণ মনোরথ
মিশে আছে বিচিত্র এ জীবনের রঙীন আশায়।
নিত্য তারে রূপ দিতে, অন্তহীন ভাবে ও ভাষায়
রহস্যের মায়াপুরে রচি তব প্রাণের লিপিকা
সঙ্গোপনে দেখা দিয়ো, চিত্ততলে, হে প্রিয়দর্শিকা!
বিস্মৃতির সৌধশিরে বারে বারে করিয়া আহ্বান
কী যাদু ছড়ালে, সখি, আমার এ দেহ মন প্রাণ
আধো আলো আধো ছায়ে, অনির্দেশ স্বপ্নের দিশায়
ক্লান্তিহীন খুঁজে ফেরে, অন্ধ ঘন তামসী নিশায়।

সহে না সহে না আর অনিরুদ্ধ নির্বাক হেঁয়ালি,
নির্মোক খুলিয়া এস, শান্ত হও দুরন্ত খেয়ালী;
মিথ্যার বেসাতি আজি বন্ধ কর; জাগর সঙ্গীতে
দিগন্তে আঁকিয়া দাও নিশান্তের ললিত ভঙ্গীতে
আকাশের আমন্ত্রণ। অঞ্চলের গ্রন্থি দাও খুলে
জীবন-কুহকে প্রেম-নবারুণ-বৈজয়ন্তী তুলে।

বৈশালী

আর্যপুত্র সুপ্রিয়

বৈশালীকে দেখলাম অপ্রখর পৌষালী প্রভাতে।
উজ্জ্বল নগরী রূপ! অতীতের অমর অটবী
লুপ্ত বুঝি রৌপ্যরূপী মৃত্তিকা শয্যাতে।
কী সম্ভার আছে আর বৃজি ও লিচ্ছবী!
ধাতুস্তূপ হল কূপ, তারপর লাখ লাখ ইঁট
মুখদু'ম ইমারতে হয়েছে শামিল।
কিছু নিল একালীন গির্জার কিরীট
তারপর জল আর স্থল—
সে ইঁটের ধুলোতেই রাজপথ কিছুটা পিঙ্গল।

একালীন বৈশালীর বিরূপ আকাশ;
হাটে মাঠে ঠিকরায় কুঞ্চিত নয়ন
তাম্বূলরঞ্জিত দন্তে লিচ্ছবীরা হাসে অট্টহাস।
এই আম্রকুঞ্জের ছায়ায়
মহাভিক্ষু বসেছেন অভয়মুদ্রায়।
কালোবাজারের জীপ আজকাল এরই আশেপাশে
নিরালোক মধ্যরাতে গীয়ার চড়ায়।

শেষ বিদায়ের দিন পার হয়ে নগর-প্রাকার
অস্তালোকে লোকশ্রেষ্ঠ
বৈশালীকে দেখলেন আর একবার।
আনন্দ, এ পথে আসা হবে না তো আর:
আমরণ মনে রাখিলাম—
বৈশালীতে পরম আরাম।

পরিণাম

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক দম্ভের চূড়া ধ্বসে ধ্বসে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে
ধ্বংসের নিঃশ্বাসে উড়ে
লুপ্ত হয়ে গেছে দূর বিস্মৃতির তমোলীন দিগন্তের পার :
আজ কোন চিহ্ন নেই আর।

তোমারও এ নভোস্পর্শী অহংয়ের ফাঁপা বুনিয়াদ
ভূমিকম্পে চিড় খেয়ে
ধ্বসে ধ্বসে বহ্নি-দীর্ণ মৃত্তিকার জ্বলন্ত নিঃশ্বাসে
ছাই হয়ে যাবে ইতিহাসে।

মৃত্যুর পাতাল বেয়ে নিশ্চিহ্নের পিছল সিঁড়িতে
গড়িয়ে গড়িয়ে কোন
অশেষ, অপরিণামী, চিরনিদ্র সুষুপ্তির শৈবাল গুহায়
অনন্ত অবাঙ্‌ময়তায়
মিশে যাবে। কেউ তারে জানিবে না, মনে রাখিবে না—
কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের
বাহু, সময়ের কুয়ো খুঁড়ে পাবে না তা কোনদিন খুঁজে :
মৃত মৌন মৃত্তিকার কুঞ্জে।

কুৎসিত ক্ষয়িষ্ণু জীর্ণ ধূলি-গর্ভ উই-ঢিবি কোনও
হয়তো বলবে ডেকে,
কোন শুষ্ক বনাকীর্ণ নিষ্প্রাণ প্রান্তর হতে, শোন শোন,
এখানে কল্পনা-জাল বোনো।

খোঁড় কিছু মরা মাটি কল্পনার ধারাল শাবলে :
হয়তো লাগবে কিছু
অনামী ধ্বংসের গুঁড়া, ধূলীভূত কিছু লুপ্ত কঙ্কালের ঘ্রাণ
ভূগর্ভের বাষ্পে ভাসমান।

প্রাগৈতিহাসিক এই বিস্মৃতির কৌটার কোটরে
হয়তো খুঁজিয়া পাবে
কিছু স্মৃতি-ভস্ম শেষ : চূর্ণিত সে মহত্ত্বের ছাই—
কিন্তু প্রমাণ কিছু নাই।

মত্ত কত অহঙ্কার, স্পর্ধার নির্লজ্জ অভিমান
যেই হতভাগ্যদের
শিরে সিংহাসন পেতে একদিন বহু রক্তে বহু অশ্রুজলে
কালের ও ললাটের তলে
অট্টহাস্যে লিখেছিল আপন জয়ের ইতিহাস,
নর-কঙ্কালের ভিতে
গড়েছিল রাজদুর্গ, দম্ভ-দৃঢ় গজদন্ত-মসৃণ মিনারে,
সে দর্পের কবর-কিনারে।
গত গরিমার সাথে, ভূমিনিম্নে ধূলি-ভস্মাধারে
কি আশ্চর্য, আছে মিশে
একসঙ্গে তাহাদেরও ঘৃণ্য তুচ্ছ অবজ্ঞাত জীবনের ছাই :
আজ তো প্রভেদ কিছু নাই!

নিশির ডাকের মত হয়তো বলবে ডেকে কোন হাহাকার,
দেখ দেখ কি অদ্ভুত!
দর্পানলে বিস্ফোরিত সেই মূঢ় মাৎসর্যের দিগ্বিজয়ী বাজ
দগ্ধ কর্পূরের মত আজ!

একটু ভস্মের শেষ, তাও নাই কোনখানে পড়ে!
সময়-সমুদ্রজলে
মুহূর্তে সে নভ-চুম্বী দর্প-গিরি গলে গেল ধূলিকার মত!
তুলিল না একটি বুদ্‌বুদও!

মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা সব ; সত্য শুধু লুপ্তির আকাশ :
আদি-অন্ত অবলুপ্ত
সে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে অস্তিত্বের সর্বশেষ যেই পরিণাম
সেখানে নিশ্চিহ্ন সব নাম।

রাত্রি এল

অসিতকুমার

াত্রি এল দীর্ঘদেহ বাদুড়ের মত
াখায় পাখায় তার নিষেধের নিঃশব্দ সঞ্চার
ন্ধ বোবা অন্ধকারে মনের মুখর প্রশ্ন যত
েপে দিল শূন্যতায়।
লয়িত সৃষ্টিসীমানায়—
ছে দিল চিহ্নরাগ চিরক্ষুধা জন্মজনতার।
নে মনে স্বপ্ন দেখিলাম
াসের ঘ্রাণেতে ভরা হেমন্তে সোনালী কত গ্রাম
ানমিত ধানশিষে ধীরে ধীরে হয়ে গেল ছাই,
িঃসঙ্গ ভিটের বুকে বাতাসের নির্বেদ শানাই
ী করে যে শূন্য হল। মনে মনে স্বপ্ন দেখিলাম
ংসম্ভাবনাহীন শূন্যতায় নির্জন পৃথিবী
ারাইল আপনার নাম
নে মনে স্বপ্ন দেখিলাম॥
রাত্রি এল দীর্ঘদেহ বাদুড়ের মত
মসার হিমরসে মুছে মুছে হৃদয়ের কথা
একাকার সব স্বর। গড়িল নিরুদ্ধ নীরবতা
দিক্‌দেশ লুপ্ত এক অবিচল আবদ্ধ সমাধি
দেখাল নিরর্থ অন্ত; দেখাল সে দুর্বিরোধ আদি
আমি দেখিলাম
দিগন্ত বলয় জুড়ে নেমে এল নীরব নগ্নতা,
মুছে গেল স্বর্ণদেহ গ্রাম।
অন্ধকারে ভরে গেল মন
সমস্ত কালের ক্লান্তি পাষাণের মত নিশ্চেতন
ব্যাপিল জীবন।
সর্বঅবয়ব হারা শূন্যতায় হারাল সংসার
ভূগর্ভে প্রোথিত কোনও খনিজের ব্যর্থ হাহাকার
জাগাইল নীরব স্পন্দন
অন্ধকারে ভরিল জীবন।
নেতিনিষ্ঠ এ হৃদয়ে রাত্রি এল লুপ্তকামনার—
দীর্ঘদেহ সে বাদুড় নেমে এল নিঃশব্দ হৃদয়ে
পাখায় পাখায় তার নিষেধের তুহিন সঞ্চার
রাত্রি এল লুপ্তকামনার।

অশেষ

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

ময়-মৃত্যুর নদী—এ কী তার কুটিল কল্পনা,
 মর্ত্যের রঙ্গভূমে যে এসেছে নৃপতির বেশে
সই হবে বিদূষক; অট্টহাসে আপন বঞ্চনা—
ভুলে থাকা যায় যদি কালান্তকে অন্তিম নিমেষে!

কছুই রাখে না সে তো তার সেই সমুদ্র জঠর
বেই তো ফিরায়ে দেয়, বিপরীত ঢেউয়ের খেলায়—
য পথিক তার কূলে ভালবেসে বাঁধে ছোট ঘর
উদ্গীরিত তারই শব একদিন অস্থির বেলায়।

কালের নিষ্ঠুর হাত—তার এই অদ্ভুত তামাশা
সাম্রাজ্যে শ্মশান করে, ঔদ্ধত্যের পথের ধূলিতে
কখনও বিলীন করে; কিন্তু আমি পারি না ভুলিতে
আমার ময়ূরপঙ্খী পার হয়ে শেষ কীর্তিনাশা
মর্ত্য-পরিণাম-তীরে, অমর্ত্যের নিত্যসহচর
মৃত্যুর চরম-অঙ্কে রাখে তার শেষ ভালবাসা।

নিদ্রিতা

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

রাত্রির তিমিরে দেখি, পৃথিবীর গাঢ় আলিঙ্গন
দূর আকাশের সাথে, ওপারের সুপ্তিমগ্ন বন,
অনাবাদী মাঠ, নদী, জলাভূমি ক্ষেত,
যেন এক বিরাটের অতলান্ত অশ্রুত সঙ্কেত।
আমি একা জেগে আছি, আর সব নির্জীব নিথর—
গ্রামে গ্রামে ভরে গেছে শিলীভূত ঘুমের প্রহর।

দিনের পৃথিবী নয়,
রাত্রির পৃথিবী তার বিছিয়েছে অনন্ত বিস্ময়।
আনন্দ বা বেদনার চেতনার উত্তরিত তীরে
এ মুহূর্তে আমি যেন ডুবে গেছি তাহারই গভীরে।
কী অসীম অর্থহীন জীবনের সারা ইতিহাস
এই রাত্রি, এই সুপ্তি তারই পাণ্ডুলিপির আভাস।

ভয় হয়! মনে হল, প্রসারিত ঘুমের পৃথিবী
সহস্র চোখের প্রশ্নে বলে গেল কি চাস্? কি নিবি?
আমি চাই, কোন এক আশ্বিনের দূর নদীতীরে
আমার শ্মশানটুকু ভরে দিয়ো ভোরের শিশিরে।

সম্বোধন

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

জীবন, তোমাকে আমি কেন খুঁজে মরি এত
বিচিত্র আবেগে!

আকণ্ঠ অনেক জ্বালা এখনও; এখনও হৃদয়ে
আকাঙ্ক্ষার পদ্মকলি নিমীলিত অবজ্ঞাত ভয়ে;
এবং দুশ্চিন্তা থেকে পায় না রেহাই
এমন কি সদ্যোজাত আশার কোরক;
অতৃপ্ত আগুনে যেন ঝলসায় সারা বিশ্বলোক।

এই আগুনেই তুমি পুড়ে পুড়ে আজও খাঁটি সোনা
আশ্চর্য দহনে;
বিভ্রান্ত সংঘাতে ছিন্ন বার বার জলন্ত কামনা,
তবু আশা জাগে সঙ্গোপনে!
বারংবার দেখি,
কী এক দুরন্ত ঢেউয়ে সমগ্র পৃথিবী কাঁপে ত্রাসে,—
সবাই একত্র আছি অথচ সবাই
আশ্চর্য একাকী;
অব্যক্ত গভীর কোন যন্ত্রণায় অবনত থাকি,—
তবুও রক্তের ঢেউয়ে কী আশ্চর্য আশা এক হাঁকে!

এই জীবনের সেই সুগোপন অব্যক্ত গভীরে
ফিরে ফিরে যাই তাই,
বিমর্ষ যন্ত্রণা ভাঙে সযতনে যখন তাকাই
আস্থা ও সংহতিযুক্ত উদ্যোগের তীরে
কেন্দ্রে কেন্দ্রে উত্তোলিত কর্মদৃপ্ত বাহুদের দিকে,
তন্দ্রাভাঙা কৌতুকে বিস্ময়ে,—
মুহূর্তেই ঘোচে ভয় উদ্যোগের অনন্য অভয়ে।

জীবন, তোমাকে আমি খুঁজে খুঁজে যন্ত্রণার দেশে
জাগব কি একদিন শেষে
প্রত্যয়ের আভাময় সজ্জিত মশাল নিয়ে হাতে?
গুমোট উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রের হাওয়া ভোররাতে
ছড়াবে কি মুঠি মুঠি জুঁই
ধীরোদাত্ত নায়কের মত মৃদু হেসে!
এবং আনবে সাথে রুদ্ধবাক্ অপ্রেমের দেশে
প্রণয়ের আকর্ষণ, বাসনার বিন্যস্ত আভাস,
কৃষ্ণচূড়ার লাল, অরণ্যের নীল—
সব নিয়ে অন্য এক ক্ষোভহীন তৃপ্তির আকাশ।

দিকে দিকে ভাঙা-গড়া, আক্রমণ, ঘূর্ণিত পতন,
অন্ধকার পথে পথে শত্রু খোঁজে সন্দিগ্ধ বাহিনী;
সমস্ত পৃথিবী এক শরবিদ্ধ পাখির মতন
যন্ত্রণায় দিশেহারা, সকরুণ তার সে কাহিনী।
তবু তো তোমাকে এরই মাঝে
খুঁজে মরি ঝড়োযুগে সহ্যাতীত আলো-অন্ধকারে
কুয়াশায় মরুঝড়ে বন্যায় দু হাতে
প্রেমিকের মত বারে বারে।

জীবন তোমাকে আমি দুঃখ-নিশাশেষে
একদিন নিয়ে যাব শান্তির সভাতে॥

শনিরঞ্জন প্রেস, ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা-৩৭ হইতে
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন : ৫৬-২৮৩৮